"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc kabirul.dmc@gmail.com

শ্রীভারতী

[ভারতীয় শাস্ত্র-জ্ঞান প্রচারের মুখ্য মাসিক পত্রিকা]

৪র্থ বর্ষ

(ভাদ্র, ১৩৪৮—শ্রাবণ, ১৩৪৯)
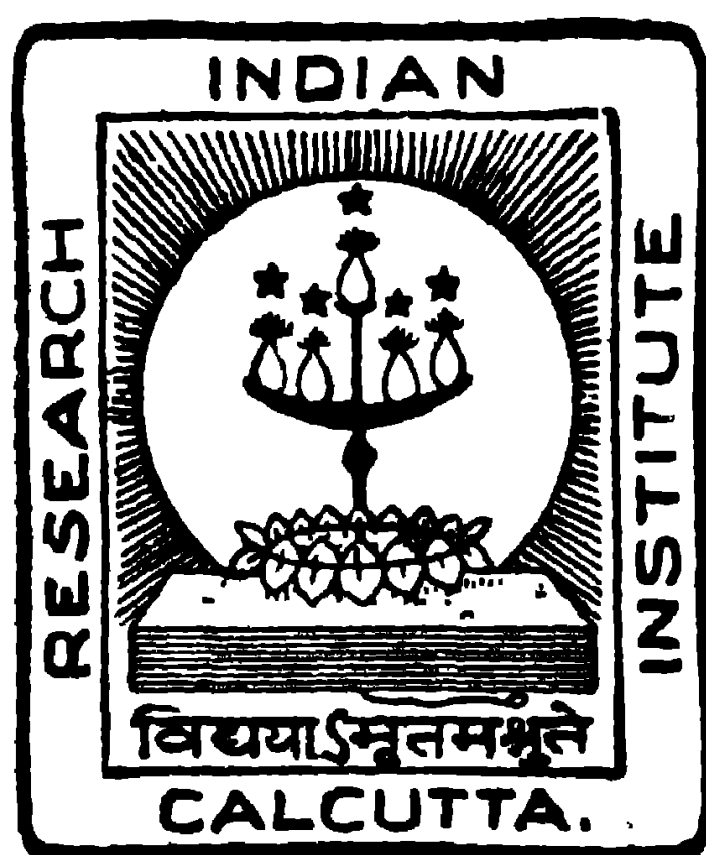
প্রধান সম্পাদক—রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্. এ.

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শাস্ত্রী, এম্. এ.

পরিচালক—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্. এ., বি. এল্.

প্রকাশ-কার্যালয়—

ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্‌টিটিউট্

১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ শীল কর্তৃক প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

১। ভাদ্র মাস হইতে শ্রীভারতীর বৎসর আরম্ভ হয়। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যায় অন্যূন ৭২ পৃষ্ঠা থাকে।

২। ইহার বার্ষিক মূল্য ৪৲ ও ষাণ্মাষিক মূল্য ২।০ আনা (ডাকমাশুল সমেত)। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

৩। বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

৪। কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাহার জন্য গ্রাহকদিগকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে না।

৫। মূল্য শোধ হইয়া যাইবার একমাস পূর্ব্বেই পুনরায় চাঁদা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে, নতুবা পরবর্ত্তী সংখ্যা ভি. পি. যোগে পাঠান হইবে। আর যিনি পরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিবেন না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা জানাইলে পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ বাধিত হইবেন।

৬। গ্রাহকের ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইলে তাহা অবিলম্বে জানাইতে হইবে।

৭। নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রাহকগণ পত্রিকা না পাইলে খোঁজ করিয়া শ্রীভারতী অফিসে জানাইবেন।

৮। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠাইবেন। প্রবন্ধের প্রুফ একবার মাত্র লেখকের নিকট পাঠান হইবে।

৯। লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রিকায় ব্যবহৃত বানান-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সামঞ্জস্য

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

সমালোচিত পুস্তক-সূচী

নূতন প্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা

আর্ষেয় ব্রাহ্মণম্—অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম্-এ, কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত—
(ভাদ্র হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত)

তত্ত্বার্থসূত্রম্—পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত—
(বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্যন্ত)

শ্রীগৌরচন্দ্র সেন, বি. কম্. কর্তৃক ১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীভারতী প্রেস হইতে মুদ্রিত।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ১ম সংখ্যা

সংহিতা-পরিচয়

স্বামী ভূমানন্দ

(কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

১। পুরাকালে মানবগণ সাধারণতঃ স্বভাবতঃই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ধর্মই তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল এবং সংসার ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কর্ম ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহারা সর্বদাই মনে রাখিতেন, মৃত্যুর কোনও নির্দিষ্ট কাল নাই, তাই সর্বাবস্থাতেই ধর্ম সঞ্চয় করা কর্তব্য বলিয়া তাঁহাদিগের দৃঢ় ধারণা ছিল—

"নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্তব্যো ধর্মসংগ্রহঃ"॥ ব্যাস-সংহিতা ৪।১৯।

ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে তখন লোকে সঙ্কুচিত হইত না, ইহার প্রমাণ শাস্ত্রাদিতে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। দেশ কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে ধর্মের আকার ও প্রকারের ভেদ তখনও বিদ্যমান ছিল। তাই, সেই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, ধর্মকে যথাযথভাবে রক্ষা করিবার জন্য ঋষিগণ কতকগুলি সাধারণ বিধিব্যবস্থা-বিশিষ্ট শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থী ও যতি এই চতুরাশ্রমীর নিত্য-নৈমিত্তিক আচার-ব্যবহার সাধারণভাবে নির্দিষ্ট আছে। এই শাস্ত্রগুলিই "ধর্মশাস্ত্র" নামে আখ্যাত। মনে হয়, সে যুগের মানব ধর্মাচরণকেই জীবনের সম্যক হিতকর মনে করিতেন, তাই ধর্মসম্বন্ধে মহর্ষিগণের উক্তি ও বিধিগুলি "সংহিতা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ঐ সমস্ত বিধিসমন্বিত গ্রন্থগুলিও "সংহিতা" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

২। সংহিতাগুলির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পূর্বে বেদের প্রত্যেক শাখার জন্য পৃথক্ পৃথক্ কল্পসূত্র রচিত হইয়াছিল। ঐ কল্পসূত্রের তিনটি বিভাগ আছে—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র অনেকাংশে লোপ পায়। কিন্তু ধর্মসূত্রগুলি, সামাজিক ও পারিবারিক আচার-ব্যবহারের নিয়ামক বলিয়া, বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু সূত্রমাত্রই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সাধারণের দুর্বোধ্য, তাই পরবর্তী কালে ঋষিগণ সহজ ভাষায় ছন্দোবদ্ধ সংহিতা রচনা করেন। কাত্যায়ন-সংহিতায়

স্পষ্টই বলা হইয়াছে, গোভিল-গৃহ্যসূত্রাদি সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন সহজ ভাষায় এই সংহিতা রচনা করিয়াছেন—

"অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্মণাম্।
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্ দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ ॥"

ধর্মসূত্র অবলম্বনে সংহিতাগুলি রচিত হইলেও, ধর্মসূত্র হইতে ইহাদিগের বিশেষত্ব এই যে ইহারা বেদের শাখাবিশেষের সহিত সম্বদ্ধ নয়। এই জন্যই সংহিতাগুলি সর্বশাখী-দিগেরই সমভাবে আদরণীয়। এই সংহিতা-রচনাকে বৈদিক ধর্মের অবনত যুগের একটি ঘটনা বলা যাইতে পারে। এই জাতীয় সংহিতাগুলিকে "ধর্মসংহিতা" বলাই বিধেয়; কারণ 'সংহিতা' শব্দটি একটি বিশিষ্ট অর্থে ও ব্যাপকভাবে বৈদিক যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব।

৩। সংহিতাগুলি পাঠ করিলে দেখা যায়, ধর্মজিজ্ঞাসু মুনিগণের বা রাজর্ষিবৃন্দের প্রশ্নানুসারে, মহর্ষিগণ যে সমস্ত উত্তর প্রদান করেন, তাহাই সংহিতাগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। আত্মবিৎ মহর্ষিগণ সর্বজ্ঞ ছিলেন, তাই ধর্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা বা ধ্যান করিতেন ও বেদে বিহিত ধর্মের বিধিনিষেধগুলি **স্মরণ করিয়া** তৎকালোচিত ব্যবস্থাদি বিধান করিতেন। মনে হয় এই জন্যই, ঐ জাতীয় ধর্মশাস্ত্রসমূহ "স্মৃতি" নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দেখিতে পাই মুনিদিগের প্রশ্নে, ক্ষণকালমাত্র ধ্যান করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়াছিলেন—

"মিথিলাস্থঃ স যোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্মুনীন্" ॥ ১।২

আপস্তম্ব-সংহিতায়ও দেখি—

"এবমুক্তঃ ক্ষণং ধ্যাত্বা প্রণিপাতাদধোমুখান্
দৃষ্ট্বা ঋষীণুবাচেদমাপস্তম্বঃ সুনিশ্চিতম্ ॥" ১।৮

পরাশর সংহিতায় দেখি, পরাশর মুনিদিগকে বলিতেছেন, সর্বধর্মাশ্রয় বেদ কাহারও কর্তৃক রচিত নয়; ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়াই উপদেশ প্রদান করেন এবং মনুও কল্পে কল্পে ধর্ম স্মরণ করিয়াই আচার-ব্যবহারের বিধি নির্দেশ করেন। আমিও সেই ধর্ম স্মরণ করিয়া তোমাদিগকে অদ্যই উপদেশ দিব—

(ক) "ন কশ্চিদ্ বেদকর্তা চ বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ
তথৈব ধর্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে ॥"

(খ) "অহমদ্যৈব তদ্ধর্মমনুস্মৃত্য ব্রবীমি বঃ
চাতুর্বর্ণ্য-সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥"

ব্যাস-সংহিতায়ও ঠিক এইভাবেরই উক্তি দেখিতে পাই—

"স পৃষ্টঃ স্মৃতিমান্ স্মৃত্বা স্মৃতিং বেদার্থগর্ভিতাম্।
উবাচাথ প্রসন্নাত্মা মুনয়ঃ শ্রূয়তামিতি ॥" ১।২

এই উক্তিগুলি হইতে নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, মহর্ষিগণ স্বকীয় স্মৃতি হইতে ধর্মের স্বরূপ ও তদনুরূপ আচারাদি বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের উক্তিগুলি "স্মৃতি" নামে অভিহিত হইয়াছে। কাহারও মতে এই শাস্ত্রদ্বারা বেদার্থের স্মরণ হয় বলিয়া ইহার নাম "স্মৃতি"। কেহ বলেন, বেদার্থ স্মরণ করিয়া মহর্ষিগণ এই সকল ধর্মাচার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের নির্দিষ্ট আচারগুলির নাম "স্মৃতি" এবং ঐ গুলি অবলম্বন করিয়া যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তাহাদিগের নামও "স্মৃতি"—

(ক) "স্মরন্তি বেদমনয়া স্মৃতিঃ।"

(খ) "মহর্ষিভির্বেদার্থস্মরণং স্মৃতিঃ।"

"তদ্‌যোগাৎ গ্রন্থোঽপি স্মৃতিঃ॥"

৪। শাস্ত্রাদিতে অনেকগুলি সংহিতার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কুড়িখানি প্রধান। বক্তার নামানুসারেই এই সংহিতাগুলির নামকরণ হইয়াছে; যেমন মনু-সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, ব্যাস-সংহিতা প্রভৃতি। এই কুড়িজন সংহিতাকারের নাম যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় নির্দেশ করা আছে—

১। মনু	৬। উশনা	১১। কাত্যায়ন	১৬। লিখিত
২। অত্রি	৭। অঙ্গিরা	১২। বৃহস্পতি	১৭। দক্ষ
৩। বিষ্ণু	৮। যম	১৩। পরাশর	১৮। গৌতম
৪। হারীত	৯। আপস্তম্ব	১৪। ব্যাস	১৯। শতাতপ
৫। যাজ্ঞবল্ক্য	১০। সম্বর্ত	১৫। শঙ্খ	২০। বশিষ্ঠ

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবাল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ
যমাপস্তম্বসম্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতাঃ দক্ষগৌতমৌ
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ১।৫

আমরা উপস্থিত এই কয়েকখানি সংহিতারই আলোচনা করিব।

৫। এই কুড়িখানি ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনু, অত্রি, হারীত, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠপ্রোক্ত এগারখানি শাস্ত্র সাধারণতঃ 'সংহিতা' নামে প্রচলিত এবং বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি-রচিত নয়খানি শাস্ত্র "স্মৃতি" নামে প্রসিদ্ধ। আমরা এই কুড়িখানি শাস্ত্রকেই "সংহিতা" নামে উল্লেখ করিব। সংহিতাগুলির মধ্যে কয়েকখানি, উপদেশের সংক্ষিপ্ততা ও বিস্তার অনুসারে, দুই বা তিন আকারেও দেখা যায়, যেমন—

(ক) লঘু অত্রি-সংহিতা
অত্রি ,,
বৃদ্ধাত্রি ,,

(খ) লঘুহারীত-সংহিতা
বৃদ্ধহারীত ,,

(গ) পরাশর-সংহিতা
বৃহৎ পরাশর ,,
(ঘ) লঘুব্যাস সংহিতা
ব্যাস ,,
(ঙ) গৌতম-সংহিতা
বৃদ্ধগৌতম ,,

"বৃদ্ধবশিষ্ঠ-সংহিতা" নামে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু উহা ধর্মশাস্ত্র নহে; উহা একখানি জ্যোতিষ শাস্ত্র। আবার, একই নামে দুইখানি পৃথক শাস্ত্রও আছে, যেমন—

(১) উশনঃ ধর্মশাস্ত্র।
(২) উশনঃ স্মৃতি।

অপর পক্ষে একই শাস্ত্রও দুই নামে দেখিতে পাওয়া যায়। মনু-সংহিতা ও মনু-স্মৃতি একই গ্রন্থ। অন্যান্য শাস্ত্রে এক মনুসংহিতারই, "মানব-সংহিতা" "মানব-শাস্ত্র", "মানব ধর্ম-শাস্ত্র", "মানবীয় শাস্ত্র" ও "মানবীয় শাস্ত্র" বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশে যে গ্রন্থ "বশিষ্ঠ সংহিতা" নামে প্রচলিত, সেই পুস্তকই উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে "বশিষ্ঠ-স্মৃতি" নামে প্রসিদ্ধ। কতকগুলি 'সংহিতার' অধ্যায়শেষে দেখা যায়—"ইতি—স্মৃতিশাস্ত্রে" বা ইতি—"ধর্মশাস্ত্রে"। আবার যেগুলি "স্মৃতি" নামে পরিচিত, তাহাদিগেরও অধ্যায়শেষে "ইতি—সংহিতায়াং" দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, মনু-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের শেষে আছে—"ইতি মানবে ধর্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ"; এবং কুল্লুক-ভট্টের টীকায় অধ্যায়শেষে দেখি—"ইতি মনুস্মৃতৌ প্রথমোঽধ্যায়ঃ"। বিষ্ণু-স্মৃতির অধ্যায়-শেষে আছে—"ইতি বৈষ্ণবধর্মশাস্ত্রে"। পুস্তকান্তেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

(ক) অঙ্গির-স্মৃতি............অঙ্গিরসা মহর্ষিণা প্রণীতং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্।
(খ) অত্রি-সংহিতা.........শ্রীঅত্রিমহর্ষিস্মৃতিঃ সমাপ্তা।
(গ) লিখিত-সংহিতা......শ্রীমহর্ষিলিখিতপ্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তং।
(ঘ) কাত্যায়ন-স্মৃতি......সমাপ্তেয়ং কাত্যায়ন-সংহিতা।

উল্লিখিত ও অন্যান্য এবংবিধ উক্তি হইতে দেখা যায়, সংহিতাগুলিকে কখনও "ধর্ম-শাস্ত্র", কখনও "স্মৃতি" ও কখনও "সংহিতা" বলা হইয়াছে। আলোচ্য কুড়িখানি সংহিতা ব্যতীত আরও তিনখানির উল্লেখ পরাশর সংহিতায় পাওয়া যায়—

১। কশ্যপ (কাশ্যপ)
২। গর্গ (গার্গেয়)
৩। প্রচেতঃ (প্রাচেতস)

বৃদ্ধগৌতমীয় সংহিতায় আরও অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশেরই প্রচলন এক্ষণে নাই এবং কতকগুলির অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৬। সংহিতাগুলির মধ্যে মনুসংহিতাই আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সংহিতায় দেখিতে পাই, মনু ধর্মজিজ্ঞাসু মুনিদিগকে বলিতেছেন—"ব্রহ্মা এই শাস্ত্র, সৃষ্টির আদিতে আমাকে অধ্যয়ন করান ও পরে আমি মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণকে উহা প্রদান করি এক্ষণে মহর্ষি ভৃগু তোমাদিগকে এই ধর্মশাস্ত্র বলিবেন।" মহর্ষি ভৃগু, মনুকর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইয়া মুনিগণকে এই ধর্মশাস্ত্রানুরূপ উপদেশ প্রদান করেন—

"ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ
বিধিবদ্ গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥
এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥" মনু ১।৫৮-৫৯

এই জন্যই মনুসংহিতার অধ্যায়ান্তে "ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং" দেখিতে পাই। মনুসংহিতার এই উক্তিকে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করিলে, ইহাকে আদি ধর্মশাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করা যায় সন্দেহ নাই এবং কেহ কেহ এই প্রমাণ বলেই এতদনুরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কোনও শাস্ত্রেরই নিজের উক্তি অবলম্বন করিয়া তাহার আদিত্ব স্বীকার করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ দেখিতে পাই, পৌরাণিক যুগে শাস্ত্রারম্ভের একটি বিশেষ ধারা ছিল। শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদিগের স্বপ্রণীত গ্রন্থাদিতে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মর্ষিগণ ও মহর্ষিবর্গকে বক্তারূপে কল্পনা করিয়াছেন, নিজেদের কোনও প্রকার পরিচয় দেন নাই এবং গ্রন্থপ্রণয়ন কালেরও কোনও ইঙ্গিত দেন নাই। এইজন্য শাস্ত্রগুলির পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার নিঃসন্দেহ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বর্তমানকালেও এই ধারার প্রচলন কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিবৎসরেরই পঞ্জিকার প্রারম্ভে দেখি—

"কৈলাসশিখরাসীনং হরং পপ্রচ্ছ পার্বতী
অধুনা ব্রূহি মে নাথ নবপঞ্জী ফলাফলম্॥"
হর উবাচ— "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নবপঞ্জীফলাফলম্
যস্য শ্রবণমাত্রেণ দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ॥"

কাজেই কেবলমাত্র স্বকীয় উক্তি স্বীকার করিয়া তাহার আদিত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

৭। বিচার করিলে দেখা যায়, মনুসংহিতাকে আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র বলিবার অন্যান্য কারণও আছে। প্রথমতঃ দেখিতে পাই, এই সংহিতার প্রাধান্য অনেক শাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে—

(ক) "মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ ভেসজম্।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ

(খ) "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥

তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ
ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্যাবন্ন দৃশ্যতে ॥" বৃহস্পতি

৮। দ্বিতীয়তঃ, মনুসংহিতায় অপর কোনও সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র বশিষ্ঠ-সংহিতার উল্লেখ অবশ্য একস্থানে আছে—

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্বিত্তবিবর্ধিনীম্"। মনু ৮।১৪০

এবং বৃদ্ধি দ্বারা বৃত্তিবর্দ্ধনের ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোকটিও উভয় সংহিতায়ই দেখি—

"দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং চ পঞ্চকং চ শতং সমম্
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্নীযাদ্বর্ণানামনুপূর্বশঃ ॥" মনু ৮।১৪২, বশিষ্ঠ ২

কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিযা বশিষ্ঠ-সংহিতাকে মনুসংহিতার পূর্ববর্তী বলিয়া নির্ধারণ করা যায না। কারণ, অপর পক্ষে দেখিতে পাই, বশিষ্ঠ-সংহিতায় মনুসংহিতার উল্লেখ বহু স্থানে আছে—

(ক) 'দেশধর্মজাতিধর্মান্ শ্রুত্যভাবাদব্রবীন্মনুঃ ॥" বশিষ্ঠ—১
(খ) "মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্মণি
অত্রৈব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥" ঐ ৪
(গ) "প্রাক্ সংস্কারপ্রমীতানাং প্রবেশনমিতি শ্রুতিঃ।
ভাগধেযং মনুঃ প্রাহ উচ্ছিষ্টোচ্ছেষণে উভে ॥" ঐ ১১
(ঘ) "পর্য্যগ্নিকরণং হ্যেতন্মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥" ঐ ১২

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিলে, মনুসংহিতায় বশিষ্ঠ-সংহিতার উল্লেখ, প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই ধারণা হয়। পুরাণাদি ও অন্যান্য শাস্ত্রগুলি আমরা এক্ষণে যে আকারে ও যে অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহাদিগের অনেকগুলিই প্রক্ষিপ্ততাদোষদুষ্ট। এই দোষ কালে মনুসংহিতায়ও সংক্রামিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বর্তমান মনুসংহিতাকে অনেকে ভৃগুপ্রোক্ত আদি সংহিতা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে উহা ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। মনুসংহিতায় বশিষ্ঠসংহিতার উল্লেখও ঐ সমস্ত পরিবর্ধনের মধ্যে একটি। কাজেই মনুসংহিতা যে আদি ধর্মশাস্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৯। তৃতীয়তঃ, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা, বৃহৎ পরাশর-সংহিতা ও বৃদ্ধগৌতমীয় সংহিতায়, যে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের নাম আছে, তাহাদিগের প্রথমেই মনুসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই—

(ক) "মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত" ... ... ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪
(খ) "শ্রুতাস্তু মানবা ধর্মা গার্গীয়া গৌতমাস্তথা" ইত্যাদি। বৃহৎ পরাশর ১।১৪
(গ) "শ্রুতা মে মানবা ধর্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা" ইত্যাদি। বৃদ্ধগৌতম ১।১৪

অন্যান্য সংহিতায়ও মনুসংহিতার উল্লেখ আছে। প্রমাণ স্বরূপে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

(ক) "অপি বাপ্সু নিমজ্জন্ বা ত্রিপঠেদঘমর্ষণম্
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ তাদৃশং মনুরব্রবীৎ ॥" লঘু অত্রি ২।৮

(খ) "পশুবেশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে
গবাং গমনে মনুপ্রোক্তং ব্রতং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥" অত্রি ১।২৬৯

(গ) "মনুনা চৈবমেকেন সর্বশাস্ত্রাণি জানতা
প্রায়শ্চিত্তন্তু তেনোক্তং গোষু চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥" পরাশর ৯

(ঘ) "যুগাদিষু চ কর্তব্যং মন্বন্তরাদিকেঽপি চ
শ্রাদ্ধকালোঽয়ং প্রোক্তো মন্বাদ্যৈর্ধর্মকর্তৃভিঃ ॥" বৃহৎ পরাশর ৫।৩

(ঙ) "বেদমধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ ধারয়েচ্চ বিপাঠয়েৎ
অপেক্ষতে চ শাস্ত্রাণি মন্বাদীনি দ্বিজোত্তমাঃ ॥" লঘুব্যাস ২

(চ) "অগ্নিদাতা তথাচান্যে পাপচ্ছেদকরাশ্চ যে
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥" লিখিত ১

(ছ) "তস্মাদ্ বেদান্ বিশিষ্টান্ বৈ মনুরাহঃ প্রজাপতিঃ ॥" বৃদ্ধগৌতম ৪

(জ) "মনুস্তু ধর্মশাস্ত্রন্তু সামান্যেনোক্তবান্ স্বয়ং ॥" বৃদ্ধহারীত ৮।৩৪৫

(ঝ) "শূদ্রান্নেনোদরস্থেন যদি কশ্চিন্ম্রিয়তে যঃ
স ভবেৎ শূকরো নূনং তস্য বা জায়তে কুলম্
গৃধ্রো দ্বাদশ জন্মানি সপ্ত জন্মানি শূকরঃ
শ্বানশ্চ সপ্তজন্মানি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥" ব্যাস্ ১।৬৬

ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, মনুসংহিতা অন্যান্য সংহিতাগুলির পূর্ববর্তী।

১০। চতুর্থতঃ, অন্যান্য সংহিতাগুলির বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ গ্রন্থের বিধিগুলি মনুসংহিতাকে অনুসরণ করিয়াই বিরচিত হইয়াছে। উহাদিগের কোনও কোনও স্থলে মনুসংহিতার শ্লোক সম্পূর্ণভাবে, কোনও স্থলে আংশিকভাবে ও কোনও কোনও স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাই। এবম্বিধ কয়েকটিমাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

১। "কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞীয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশাস্ততঃ পরম্ ॥" মনু ২।৩

(ক) "কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ
তস্মিন্ দেশে বসেদ্ধর্মঃ সিদ্ধ্যতি দ্বিজসত্তমাঃ ॥" লঘু হারীত ১।১৬

(খ) "স্বভাবাৎ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদা মৃগঃ
ধর্ম্যদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্মসাধনম্ ॥" সম্বর্ত ১।৪

(গ) "যত্র যত্র স্বভাবেন কৃষ্ণসারো মৃগঃ সদা
চরতে তত্র বেদোক্তো ধর্মো ভবিতুমর্হতি ।।" ব্যাস ১।৩

২। আদ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নাদ্রপাদস্তু সংবিশেৎ
আদ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো দীর্ঘমায়ুববাপ্নুয়াৎ ।।" মনু ৪।৭৬, লঘুঅত্রি ৪।২৬,
বৃদ্ধাত্রি ৫।২৪

৩। "উপাধ্যায়ান্দশাচার্য আচার্যানাং শতং পিতা
সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥" মনু ২।১৪৫
(ক) "উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা
পিতুর্দ্দশগুণং মাতা গৌরবেণাতিবিচ্যতে ॥" বৃদ্ধগৌতম ১৪।৬২
(খ) "উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা
পিতুর্দশশতং মাতা গৌববেণাতিরিচ্যতে ॥" বশিষ্ঠ ১৩

৪। "আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ
শ্রিয়ং প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে হ্যুদঙ্মুখঃ ॥" মনু ২।৫২
বৃদ্ধাত্রি ৫।২৬, উশনঃ, ৩।৩৯

৫। "অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥" মনু ৩।৭৩, কাত্যায়ন ১৩।৩

৬। "একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরং তপঃ ॥" মনু ২।৮৩, বৃদ্ধাত্রি ১।১৫

উল্লিখিত যুক্তিগুলি প্রণিধানপূর্বক বিচার কবিলে নিঃসন্দেহেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মনুসংহিতা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রগুলির পূর্ববর্তী।

১১। মনুসংহিতায় মহাভারতের বহু শ্লোক ও শ্লোকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটিমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

(১) "তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥" মনু ১।৮৬
মহাভারত, শান্তিপর্ব। ২০১।২৮

(ক্রমশঃ)

সুদূর গ্রহত্রয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতীরত্ন এম. এ.

যে তিনটী গ্রহ লইয়া আলোচনা করিব তাহাদের ইংরেজী নাম Uranus, Neptune এবং Pluto. আমাদের দেশে Uranusর "প্রজাপতি", Neptuneর "বরুণ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। Plutoর নামকরণ এখনও বোধ হয় হয় নাই*। ১৭৮১ সালে প্রজাপতি, ১৮৪৬ খ্রী° অ° বরুণ এবং ১৯৩০ খ্রী° অ° Pluto গ্রহের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়। বরুণ আমাদের পৃথিবী হইতে ২৭৯২ লক্ষ মাইল দূরে এবং প্রজাপতি ১৬৮৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। মোটামুটী হিসাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রজাপতির ৮৪ বৎসর, বরুণের ১৬৫ বৎসর এবং Plutoর ২৪৮ বৎসর লাগে।

পুরাণে আদিকাল হইতে বিভিন্ন যুগে মানব-ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া, বিভিন্ন মন্বন্তরের কথা বলা হইয়াছে। এই ইতিহাস অতীব বিচিত্র। মনুকে প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনা করিব। পূর্বে বলা হইয়াছে যে ৮৪ বৎসর প্রজাপতির পরিভ্রমণ-কাল। অঙ্ক দ্বয়ের সমষ্টি—১২ দ্বারা ৮৪কে গুণ করিলে ১০০৮ বৎসর পাওয়া যায়। ইহাকে এক মন্বন্তর বলা যাইতে পারে, তাহার কারণ পরে বিবৃত হইবে।

১৯২৭ সালের বসন্তকালে Uranusর (Heliocentric) হেলিকেন্দ্রীয় স্ফুট মেষের শূন্য অংশে ছিল। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে ২৫০০ বৎসরে এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে অয়নের স্থিতি ধরা হয়। যেমন বর্তমান কালকে Piscean age বলা হয় এবং স্বল্পকাল পরে Aquarian age আরম্ভ হইবে। এই যুগ-লক্ষণ বিভিন্ন রাশির স্বভাব অনুযায়ী কল্পনা করা হয়। এক এক যুগে স্বতন্ত্র কৃষ্টির (culture) অভ্যুদয় দেখা যায় এবং তাহার স্থিতিকাল ২৫০০ বৎসরের (পাশ্চাত্য মতে ২১০০ বৎসর) বেশী নহে। এই হিসাবে ১৯২৭ খ্রী° অ° হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্বে—৫৭৩ খ্রী° পূ° পাওয়া যায়। ইহার সম-সাময়িক কালে (অর্থাৎ ৫৯২ খ্রী° পূ°) গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধি, Solon এবং গ্রীসের সপ্ত মহাজনের যুগ। ঐ যুগে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার চরম উন্নতি হইয়াছিল। কলিযুগের আরম্ভ ৩১০২ খ্রী° পূ° ধরিয়া ১০০০ বৎসর (Uranian Cycle of 1008 years) পরে ২১০৫ খ্রী° পূ° ব্যাবিলনীয় সভ্যতার আরম্ভ এবং

---

* "মন্দ মান্দি যুতে দৃষ্টে"—রণবীর। (মান্দি)—উপশনি—"দেবগণের মর্ত্যে আগমন। "ইউরেনস—বরুণ নেপচুন—ইন্দ্র"—মাধব চট্টোপাধ্যায়

"সদা বক্রী—সদা রুষ্টঃ সদাবলি বুভুক্ষিতঃ
কন্যা রাশৌ স্থিতো নিত্যং জামাতা দশমোগ্রহঃ"।

Quoted by Khatranath

Hammurabiর রাজত্ব কাল। মধ্যবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৬০১ খ্রী° পূ° মিশর দেশে "New Empire" এবং Cretan সভ্যতার বিকাশ। আরো ৫০০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১০৯৭ খ্রী° পূ° গ্রীক Archaic সভ্যতার অভ্যুদয় এবং হিব্রু রাজাদের রাজত্ব-কাল।

* * * *

মেষে প্রজাপতির স্থিতি (৮৯ খ্রী° পূ°) কালে Civil war in Rome ; Asia Minorএ এক লক্ষ রোমানদের একদিনে বলিদান এবং রোমানদের Athens আক্রমণ। জুলিয়াস সিজারের অভ্যুদয় (৬১—৪৪ খ্রী° পূ°)

বৃষে স্থিতিকালে (খ্রী° পূ° ৪।৫) যিশুখ্রীষ্টের জন্ম, রোমের সার্বভৌমিক রাজত্ব—বিশ্বজনীন কৃষ্টির কেন্দ্র Alexandriaয়। মিথুনে স্থিতিকালে (খ্রী° ৭৯) ভিসুভিয়াস অগ্ন্যুৎপাতে পম্পিনগর ধ্বংস হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের বহুল প্রচার এবং Nero কর্তৃক রোমে অগ্নি-প্রদান।

* * *

তুলায় স্থিতিকালে (৪১৫ খ্রী°)—Attilaর অধীনে হুণ-বাহিনীর ইয়ুরোপ আক্রমণ এবং ৪৭৬ খ্রী° রোমক সাম্রাজ্যের অবসান ও পারস্য সভ্যতার পুনরভ্যুদয়। ১৪২৩ খৃ° পুনরায় তুলায় আসিলে, ফরাশী জাতীয়তাবাদ ও Joan of Arcএর অভ্যুদয়। Spain হইতে Moor বিতাড়িত। Constantinople তুর্কীগণ কর্তৃক অধিকৃত এবং বিপশ্চিতগণ বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম ইয়ুরোপে জ্ঞান বিস্তার করেন। ৫০০ বৎসর পরে (১৯২৩—১৯৩১) Hitlerএর অভ্যুদয় এবং সমগ্র Germany একটী Totalitarian জাতিতে পরিণত।

৭৫১ খ্রী° কুম্ভ রাশির স্থিতিকালে Charlemagne (ফরাশী সম্রাট) কর্তৃক মুসলমানদের পরাজয় এবং পশ্চিম ও মধ্য ইয়ুরোপে তাঁহার একছত্র রাজত্ব। আরব সভ্যতা ও হারুণ-অল-রসিদের অভ্যুদয়।

১৭৫৯ খ্রী° পুনরায় কুম্ভ রাশির আগমন কালে দেখা যায় যে Canada ও ভারতবর্ষে ইংরাজদের রাজত্ব কায়েম হইতে থাকে। France ও Americaএর মধ্যে বৈপ্লবিক যুগ এবং ইয়ুরোপে সার্বভৌমিক রাজত্ব স্থাপনে নেপোলিয়ানের অদম্য চেষ্টা।

Dane Rudhyar সাহেব এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"I believe that the Cycle of Uranus (1843—1927) was the last one of the 1008 year "Great Cycle"—a sort of twelfth house cycle, which precipitated the end of a civilization ; Napoleon I followed Charlemagne by almost exactly 1000 years. The last 84 year period within the 'Great cycle' of 1008 years (the Pisceian phase) saw the rise of nationalism. It saw also the spread of occultism and mysticism through Spain in the earlier period ; through America in the present age (Kabalistic and Theosophic

doctrines). Saturn and Jupiter refer to the organization and fulfilment of particular racial national and cultural groups : while the more distant planets represent everything transcendant to such particular groups, everything tending to disturb, unsettle, transform, regenerate them in terms of larger horizons and broader and more universal realizations. In the direction of individuals, the three remote planets stand as the symbols of the deeper metamorphosis of consciousness and inner attitude, which has been called the Path of Holiness, the Path to Initiation and Spiritual Rebirth. The first step is Illumination (Uranus); the second is Dissolution (Neptune) the third Regeneration (Pluto.)"

৫০০ বৎসরের Cycleকে অর্ধযুগ বলার হেতুবাদ এই—

(ক) Plutoর পরিভ্রমণ কাল ২৪৮ বৎসর। দশগুণ করিলে ২৪৮০ বৎসর পাওয়া যায়।

(খ) বৃহস্পতির পরিভ্রমণ-কাল (=১১'৮৬ বৎসর)। যদি প্রজাপতির ৮৪ বর্ষ দ্বারা গুণিত হয় তাহা হইলে ৯৯৬ বৎসর (অর্থাৎ প্রায় ১০০০ বৎসর) পাওয়া যায়।

'This can be considered as the Cycle of Uranian operation upon all Jupiterian types of activity—a Cycle of social, religious, governmental transformation."

(গ) শনির periodকে Uranian period দ্বারা গুণ করিলে, প্রায় ২৫০০ বৎসর (অর্থাৎ ২৪৭৫ বর্ষ+২৫ বর্ষ 'Seed period') পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও Pythagorasর আবির্ভাব-কাল হইতে ১৯২৭ খ্রী° পর্যন্ত ২৫০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। "Saturn rules the structure of all organisms and the intellect of man ; also logic—the frame-work of all mental operation. The 2500 year Cycle is thus a Cycle of deep structural changes in the very constitution of human society and of human civilization.'

(ঘ) Neptune Cycle × Jupitor Cycle = 1954½ yrs. এবং নেপচুণের পরিভ্রমণ কাল × শনির ভগন = ৪৮৪৪'৮ (অর্থাৎ ৫০০০ বর্ষ মোটামুটী)।

(ঙ) বরুণ ভগন × ৩ = ৪৯৪'৩৭ বর্ষ এবং Pluto period × ২ = ৪৯৬ বর্ষ। অর্থাৎ দুই হিসাবে প্রায় ৫০০ বৎসর পাওয়া যায়।

"In other words, all these Cycles are approximately multiples of the 500 year Cycle, the common denominator for all deep changes in the fabric of Civilization, for all Avataric descents or the descent of Cosmic or divine impulses into earth-conditioned organisms'

Alan Leo বলিয়া গিয়াছেন—

"Neptune symbolized the perfected spiritual 'body' of the adept : the most positive expression of Neptune. But this body is a transcendental manifestation, a spiritual Matrix (অর্থাৎ নির্বাণ-কায়া) It will take some time before the Spiritual Matrix releases its seeds. And the operation of the seeds is under Pluto's rulership".

১৮২২ খ্রী° Pluto মেষের 0 অংশে ছিল। প্রজাপতি ১৮৪৩ খ্রী° এবং বরুণ ১৮৬১ খ্রী° হেলিকেন্দ্রীয় মেষের শূন্য অংশে ছিল।

"All within 40 years. This was the time of the great Romantic movement, of the birth of modern socialism and of communism, of modern spiritualism, of modern industry, commerce, transportation. It was a seed-period indeed. And the seed, as always, kills the plant."

খ্রী° ৯১৯ অব্দে খ্রীষ্টীয় কৃষ্টির আরম্ভ-কাল। ৮৭৩ খ্রী° বরুণ হেলিকেন্দ্রীয় মেষের শূন্য অংশে ছিল। ৮৩৫ খ্রী° প্রজাপতি এবং Pluto উভয়ে উক্ত স্থানে আসিয়াছিল। খ্রী° ৮৩৫—৯১৯ প্রজাপতির ১০০৮ বর্ষ cycleর শেষ অংশ (অর্থাৎ Piscean phase) (আরম্ভ ৮৯ খ্রী° পূ°)

"During that seed-period Pluto and Neptune were beginning their Cycles. It marks the end of the Dark ages and the beginning of European Culture. Prominent in that rebirth were not only Charlemagne, who stands at the threshold of it, but a great number of Irish Monks, who left Ireland and streamed through Western Europe, building monasteries and bringing to the barbarians, the great heritage of Celtic wisdom, which they had kept within the gates of Irish Universities—Monasteries."

এক্ষণে স্বতন্ত্র ভাবে প্রজাপতি (Uranus) এবং বরুণের সংযোগ ও প্রেক্ষার ফলে, যুগে যুগে মানব ইতিহাসে কি কি বিচিত্র প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে—"Uranus is the awakener, the impulsive, experimental, revolutionary and explosive ruler of change and adaptation to new life experiences and relations between the individual and the society. Uranus is the link or channel, through which the transcendental, universal and occult forces reach the embodied consciousness. It opens the doors to prophetic and visional dreams, to inspirations of genius, to everything which brings down power and light into the soul.

"Neptune represents the masses. He is the planet of Socialism *per Se*, of Universal love or of universal chaos : Neptune is mysterious, subtle ruler of imagination, illusion and creative image. He is full of sympathy and tenderness towards those in need of charity. and forgiveness, when placed in the 12th, he is often in contact with the seamy side of life, with the helpless or out-caste people. Neptune likes isolation and solitary meditation and he knows not, in what way to move, to satisfy his restless yearnings after the **abstract unattainable.**

"This is the seed he plants the consciousness of man—the hope and longing for a better world—which seed eventually blossoms forth under the dynamic and resourceful. Uranus going in his own way, with no regard for any law but his own desire, the seed sown by the will-o-the-wisp Neptune bursts forth into flower, as Uranus unlooses the personal ideal on to a material plane. Both vibrate on a high level of consciousness.

"Pluto is responsible for emotional storms. jealousies, ruthlessness, war, death, violence, sex-errors, divorces fight for inheritance, for social ideals and for the right to free self-expression. Pluto has a cleansing action and endeavours to place new values upon all things and to achieve regeneration for the people."

বৈদেশিক ভাষায় গ্রহত্রয়ের যে অপূর্ব পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা অনুবাদে পূর্ণতা লাভ করিত না বলিয়া উদ্ধৃত করা হইল। ইউরেনাসকে আবিষ্কর্তার নামে হার্শেল বলে।

প্রত্যেক ১৭০ বৎসর অন্তর, মোটামুটী হিসাবে হার্শেল সহ নেপচুণ, একই রাশিতে সংযুক্ত (Conjunction) হইয়া থাকে। উভয় গ্রহই মানুষের সাধারণ আত্মবোধ-শক্তিকে (consciousness) বহু উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। অস্থির-চিত্ত নেপচুণের দিবাস্বপ্ন, জল্পনা-কল্পনা, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও চাতুর্য-কলা, মানবের ভাবরাজ্যে অভিনব আকুল স্পৃহার বীজ স্বরূপ হইয়া উঠে। হার্শেলের অদম্য তেজ ও প্রচণ্ড শক্তি (dynamic power) স্বকীয় আদর্শবাদের প্রেরণা দ্বারা ঐ বীজকে পুষ্পিত করিয়া তোলে।

প্রায়শঃ এইরূপ দৃষ্ট হয় যে হার্শেল নেপচুণের সহিত সংযুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফল-পাক-কাল উপস্থিত হয় না, কিন্তু হয় ২১ বৎসরে, যখন হার্শেল উক্ত স্থানের ৯০ অংশ দূরে আসে, অথবা ৪২ বর্ষে, যখন ১৮০ অংশ (opposition aspect) তফাতে আসে, তখনই উৎকট ভাবে ফল-পাক-কাল আরম্ভ হয়। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে আরও কোন গ্রহের সাহায্য (major planets forming aspects) পায়, তাহা হইলে আরও শীঘ্র এবং উত্তমরূপে ফল-সিদ্ধি ঘটে।

পঞ্চবিংশতি শতাব্দী অতীত হইয়া গেল, এই ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম, মানবের দুঃখ দুর্দশায় বিগলিত-প্রাণ গৌতম বুদ্ধের অমোঘ বাণী, জাতি-নির্বিশেষে প্রচারিত হইয়াছিল এবং বিশ্ববাসী জনগণের চিত্ত বিমোহিত করিয়া, একদিকে সামাজিক সঙ্কীর্ণতা, অন্যদিকে দার্শনিক কঠোরতা হইতে মুক্ত করিয়া মানবাত্মাকে উদার, সরল ও সহজ আদর্শবাদ দেখাইয়া দিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্মমত কি ভাবে মানব-সমাজে ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন।

ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি যে Uranusর Great Cycle ১০০৮ বর্ষে পূর্ণ হয়। বুদ্ধের স্বর্গারোহণ ৪৮৭ খ্রী° পূ° অব্দে হয়; তদবধি ৬২৩ খ্রী° প্রায় ১০০৮ বর্ষ। শেষোক্ত বর্ষ হইতে মহামানব হজরত মোহাম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ধরা হয়। ভারতবর্ষে ইহার শত বর্ষ পরে, কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য সিন্ধু দেশের যে আরবগণকে প্রচণ্ড যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন—সেই আরব জাতিই অলঙ্ঘ্য-বীর্য হইয়াছিল—মোহাম্মদ প্রচারিত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার তিরোধানের ৬ বৎসর পরে সিরিয়া, এসিয়া-মাইনর, উত্তর আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি দেশ ইসলামের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং এক শতাব্দীর মধ্যেই সুদূর ফরাসী দেশের লয়ার নদীর তীর হইতে, কাবুল ও মধ্য এসিয়া পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, এই দুর্ধর্ষ জাতির প্রচণ্ড শক্তিতে অধিকৃত হইয়াছিল। মহামানব মোহাম্মদ কর্তৃক নব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, এই অসাধারণ শক্তিশালী জাতির অভ্যুদয় এবং অতি অল্পকালে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন, এক অতীব বিস্ময়কর ও বিচিত্র ইতিহাস।

খ্রী° ৬২৩ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে) (o. s.) হার্শেল এবং নেপচুণ কন্যা রাশির ৯°।৩৮´ ছিল। সঙ্গে শুক্রও ৮°।১৯´ ছিল। শনি সিংহের ২০°।৫১´, মঙ্গল কর্কটের ২৯°।৯´: বৃহস্পতি মেষের ১১°।৩৬´। রাহু কর্কটের ১৪ অংশে ছিল।

খ্রী° ৬৪৪ অব্দের মধ্যে (অর্থাৎ Square aspect হইলে) ধর্ম-প্রাণ ইসলাম জাতি, সাম্রাজ্যবাদী হইয়া পড়িল এবং হার্শেল যখন স্বস্থান হইতে ১৮০ অংশ দূরে আসিল (৬৬৫ খ্রী°), তখন সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশ খলিফাদের অধিকারভুক্ত হইয়া গেল।

খ্রী' ৭৯৬, ১৬ই সেপ্টেম্বর (o. s.) তারিখে, হার্শেল নেপচুণ পুনরায় কন্যা রাশির ২৫ অংশ ৫ কলায় সংযুক্ত হওয়ার পর, ইয়ুরোপে আর এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির অভ্যুদয় হইয়া ছিল। Charlemagne (পরে ফরাসী সম্রাট) ভিন্ন ভিন্ন বর্বর সর্দারদের অধিকার-ভুক্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গুলিকে জয় করিয়া, কৃষ্ণ সমুদ্র হইতে Ebro (Spain) নদীর তীর পর্যন্ত এবং ইতালীতে Tiber পর্যন্ত, এক সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৭০ বৎসর পরে পুনরায় আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন সাম্রাজ্যের সংঘটন হইয়াছিল। Charlemagneকে লোকে Protector of Jerusalem বলিত এবং খ্রীষ্ট ধর্মের যে অবনতি ইউরোপে দেখা দিয়াছিল, তাহা হইতে Charlemagne রক্ষা করিয়াছিলেন।

৮৭১ খ্রী° যখন শনি মকর রাশিতে উক্ত হার্শেল নেপচুনের ত্রিকোণে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে Alfred the Great নামক আর এক বহু গুণান্বিত প্রবল পরাক্রান্ত Saxon রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল।

পুনশ্চ ৯৬৫ খৃষ্টাব্দে তুলারাশির একাদশ অংশে হার্শেল-নেপচুন সমাযোগে, জার্মাণীতে Otto II নামে একজন বিখ্যাত সম্রাটের এবং ফরাশী দেশে, Hugh Capet নামক একজন সুবিখ্যাত জন-নায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের অবদান-পরম্পরার ফলে, আরব-শক্তি সাময়িক ভাবে প্রতিহত হইয়াছিল। Jerusalemর খৃষ্টান তীর্থ-যাত্রীদের উপর অসহনীয় অত্যাচার করিয়াছিল এবং Saracen দিগের দখল হইতে Sicily হস্তচ্যুত হইয়াছিল।

"In 1060 A.D. when Uranus reached Scorpio (Moon was also in Scorpio in the Cycle Chart of 865 A.D.) aim and impulse to the **mass emotions** were given and the first Crusade got under way in November 1096." এই প্রসঙ্গে William the Conquerorর (Coronation Dec. 15, 1066 in Westminister Abbey) নামও উল্লেখ-যোগ্য। তৎকালে শনি বৃহস্পতিরও Mutation Conjunction ঘটিয়াছিল।

পুনশ্চ ১১৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুলা রাশির সপ্তবিংশতি অংশে, যখন হার্শেল-নেপচুনের সমাগম হইয়াছিল, তৎকালে রবি ও তুলার অষ্টাবিংশ অংশে এবং ভৌম মীনের পঞ্চবিংশতি অংশে থাকিয়া কন্যাগত ২৮ অংশে স্থিত শুক্রের সহিত opposition aspectএ ছিলেন।

'It is one of the most wildly active periods in the history of the world. One of the greatest military leaders of all time Chengiz Khan, who rose from a tent on the Siberian plains, to rend asunder almost the entire civilized world and leave the greatest empire ever conquered by one man.

"Saladin (declared Sultan in 1177) covered a period, when there was a **conscious demand** for political union to defend the Islamic faith.

"Frederic Barbarossa was crowned Emperor of Germany in 1155 A.D. when Uranus Squared the conjunction.

"Louis IX ascended the throne of France just before the conjunction took place.

"Richard I (the Lion-hearted) was King of England from 1189 to 1199 A. D. He led the Third Causade and was victorious."

এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য এই যে হার্শেল-নেপচুনের সমাগমকালে মীন রাশি-গত মঙ্গল, মিথুনে বুধ এবং ধনু রাশিতে রাহু অবস্থিত ছিল। মীন রাশির প্রকৃতি "Charitable,

religious, sensitive, emotional, psychic and mediumistic." মঙ্গল এই রাশিতে থাকিয়া শুক্রকে (অর্থাৎ হার্শেল নেপচুন-স্থিত রাশিপতিকে) পীড়িত করায় (opposition), "Mars goes to war for a Piscean ideal and the configurations are very significant in the chart of this era of incessant Crusades."

ইতিপূর্বে (১৯২৩-১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে) Hitlerর অভ্যুদয়ের সঙ্গে হার্শেলের তুলা রাশি ঘটিত সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি এবং ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তিও সকলের লক্ষ্যের বিষয় হইতেছে।

এক্ষণে আপনাদের দৃষ্টি আর একটি গুরুতর বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। পাছে আপনাদের ধৈর্যের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার করা হয়, এই ভয়ে বলিবার অনেক কিছু থাকিলেও ছাড়িয়া দিয়াছি। তথাপি এই বিপুল রহস্য এতই বিস্ময়কর ও চিত্ত-বিনোদনে সক্ষম, যে কিঞ্চিৎ আভাষ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

(১) ১৬৫০ খ্রী° Oct. মাসে হার্শেল-নেপচুন যোগ ঘটে। পাঁচ বৎসর পরে বিশেষ শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং Huygens সাহেব ঐ যন্ত্র যোগে, শনির সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পার্শ্বচর চন্দ্রকে (Titan) আবিষ্কার করেন।

(২) ১৭১০ খ্রী° হার্শেল প্লুটো কন্যায় সংযুক্ত হয়। Hadley সাহেব এই সময়ে Reflecting Telescope আবিষ্কার করেন। ১৭৪৫ খ্রী° Leyden jar সংক্রান্ত বহু গবেষণা হয়। প্লুটো ১৭৭৭ খ্রী° অ° জুন মাসে কুম্ভে আগমন করার পর, ১৭৮১ খ্রী° অব্দের মার্চ মাসে হার্শেল গ্রহের অস্তিত্ব ধরা পড়ে এবং ১৭৯৩ খ্রী° অ° হার্শেল opposition প্লুটো হওয়ার পর, Llande সাহেব গণনার দ্বারা নেপচুনের স্থিতি নির্দেশ করিয়াছিলেন। পরে প্রত্যক্ষ করিয়া নেপচুনের অস্তিত্ব গৃহীত হয়। এই সময়ে Ampere (1775-1836), Davy (1778-1829) Faraday (1791-1867), Franklin (1706-1790) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের আবির্ভাব এবং বৈদ্যুতিক গবেষণার পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

(৩) ১৮২১ সালের মার্চ মাসে হার্শেল মকর রাশিতে নেপচুন সহ মিলিত হওয়ার পর—বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে বহু আবিষ্কার সাধিত হয়। ১৭২০-১৮২৬ খ্রী° মধ্যে Oersted, Ampere (টেলিগ্রাফ যন্ত্র), Secbeck, Ohm Arago প্রভৃতির গবেষণা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য।

(৪) হার্শেল conjunction নেপচুন মেষে খ্রী° ১৮৫০। ইহা বৈদ্যুতিক যন্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে আবিষ্কারের যুগ। যথা—Telephone, dynamo, electric lamp, commercial generators. Clerk-Maxwell ও Edison প্রভৃতি এই যুগের লোক।

(৫) ১৮৯২ খ্রী° অ° নেপচুন conjunction Pluto হওয়ার পর, Lorentzর electronic theory, Marconi's Wire-less এবং Roentgen's X-ray সম্বন্ধে অভিনব আবিষ্কার ঘটিয়াছিল।

(৬) ১৯০১ খ্রী° অ° হার্শেল conjunction Plutoর পর হইতে, automobiles,

aeroplanes প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাশ্চর্য ও প্রয়োজনীয় যানবাহনের আবিষ্কারে জাগতিক ব্যাপারে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। অতীব দুঃখের সহিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে—এই সকল আবিষ্কারগুলি মানবের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য কল্পিত হইলেও, আজ যে বিশ্বজনীন নরহত্যা চলিতেছে —ইহারই অসীম শক্তি প্রভাবে।

হার্শেল genius দের রাশি চক্রে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আবিষ্কর্তাদের (Inventors) জন্ম-চক্রে প্লুটোর শক্তি যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

"Neptune the planet of illusion, makes concrete the product of imagination, through the zeal of Mars and the desire for manifestation due to the position of the Sun, assisted by the will-power of Uranus. The artists find concrete expression in a creative field, which appeals to emotions when Neptune joins the Moon.

বোধ হয় এস্থলে আমাদের জগৎ-পূজ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম কুণ্ডলীর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। নিরয়ণ মতে—তাঁহার নেপচুণ মীনে, চন্দ্রযুক্ত এবং কর্কটস্থ বৃহস্পতি কর্তৃক পূর্ণ দৃষ্ট—সুতরাং অনন্যসাধারণ ভাবরাজ্যে Universality ও collective consiousnessর অতি মধুর ও নিপুণ অভিব্যক্তি—তাঁহার শিল্পের বৈশিষ্ট্য।

বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া Miss Margaret Morrell (*Vide* American Astrology, April, 1939) দেখাইয়াছেন যে—জগতের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক inventorদের (যথা Volta, Roentgen, Hiram Maxim, Tesla, Edison, Bell প্রভৃতি) জন্ম কুণ্ডলীতে ৪২ জনের মধ্যে ৩৯ জনের হার্শেল অথবা প্লুটোর সঙ্গে conjunction অথবা opposition যোগ আছে। ৩৫ জনের তদ্রূপ শনি অথবা নেপচুণের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং ৩২ জনের বৃহস্পতির সহিত সম্বন্ধ আছে।

তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে—১৮৮৩ খ্রী° পরবর্তীকালে, হার্শেল নেপচুণ বৃষ ও কন্যা রাশি আশ্রয় করিয়া, ত্রিকোণ সম্বন্ধে অবস্থিত থাকায়, (১৮৮০ সালের ৪ঠা নভেম্বর হইতে ৩০এ জুলাই ১৮৮৩ সালের মধ্যে পাঁচ বার trine সম্বন্ধ ঘটিয়াছে) চিকিৎসা জগতে নিম্নলিখিত আবিষ্কার হইয়াছে:—

১৮৭৯ খ্রী°—Gonococcus bacillus.

১৮৮০ খ্রী°—Typhoid এবং pneumonia bacillus.

১৮৮১ খ্রী°—Streptococcus bacillus.

১৮৮২ খ্রী°—Tuberculosis bacillus.

১৮৮৪ খ্রী°—Cholera and Diptheria bacillus.

১৯১২ খ্রী° প্লুটো কর্কট রাশিতে আগমন করিয়াছিল এবং ১৯৩৯ সালের শেষভাগ হইতে সিংহ রাশিতে প্রবেশ করিয়াছে। Mr. A. R. Wood দেখাইয়াছেন যে ১৯১২

সালের পর, "29 million homes in U. S. A. equipped with a radio, 20 millions with electric irons, 11½ million each with electric toasters and washing machines and 9 million with electric refrigerators."

"With Pluto in Leo, we look for vast changes in the care, feeding, training and education of children : changes that will far exceed the dreams of the Social worker. The present ponderous school system, will give way to a broader and more practical system, in which the thought, that it is necessary to be within the four walls of some school building, will be discarded Radio and Television will be in increasing order of demand by advertisers, in the remote parts of the country and by theatre-goers. Idle capital will flow into new enterprises. Leo is the sign of faith and faith is the real foundation, on which money, credit and the business contract rests.'*

মহানির্বাণ তন্ত্র

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

'তন্ত্র' শব্দের নির্দিষ্ট কোন অর্থ নাই। ইহা 'তন্‌' ধাতু 'ত্র' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তন্‌' ধাতুর অর্থ বিস্তার করা। ইহা হইতে শিব শক্তির উপাসনা বিস্তারক শাস্ত্রকেই তন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। 'তন্ত্র' বলিতে আগম , যামল ও তন্ত্র এই বিশিষ্ট তিনটি অংশের সমষ্টি বুঝায়। এই তিনটী একত্র হইয়া যে শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই তন্ত্র নামে বিখ্যাত। এই বিভাগ সত্বাদি গুণ ভেদে করা হইয়াছে। আগমে সৃষ্টি ও প্রলয় ইত্যাদির বিবরণ, ষট্ কর্ম সাধন, চতুর্বিধ ধ্যানযোগ ইত্যাদি মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যথা :— সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চনম্‌
সাধনঞ্চৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ ॥
ষট্ কর্ম সাধনঞ্চৈব ধ্যান যোগশ্চতুর্বিধঃ।
সপ্তভিঃ লক্ষণৈর্যুক্তাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥

যামলে গৃহ্যকল্প প্রভৃতি সূত্র গ্রন্থের উপযোগিতা এবং সৃষ্টির সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

* ১১ই আগষ্ট তারিখে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের জ্যোতিষ সভায় পঠিত প্রবন্ধ।

যথা :—　　সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্য প্রদীপনম্।
ক্রম সূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈবচ।
যুগধর্ম্শ্চ সংখ্যাতে যামলস্যাষ্টলক্ষণম্॥

তন্ত্রবিভাগে দেবতাদিগের কল্পনা ও সংস্থান, যুগধর্ম, রাজধর্ম ও মানবধর্মকথন, তীর্থ-মাহাত্ম্য, শিবচক্রের আখ্যান, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রামাণিকতা, প্রাণায়ামাদি যৌগিকক্রিয়া, ধর্মের সংস্থিতি এবং অধ্যাত্মবিদ্যার অবতারণা ইত্যাদি বহুতর বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যথা :—　　সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ তন্ত্র নির্ণয় এবচ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থনাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্শ্চ বিপ্র সংস্থানমেবচ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রানাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্প সংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেবচ।
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্॥
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকানাঞ্চ বর্ণনম্।
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসাশ্চৈব লক্ষণম্॥
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্মস্তথৈবচ।
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্ম বর্ণনম্॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তং তন্তন্ত্রিত্যভিধীয়তে॥

এই তিন বিভাগ ব্যতীত 'ডামর' নামে ইহার আর এক বিভাগ আছে। কিন্তু তাহা সব সময় ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় না।

তন্ত্র একটী পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। ইহাতে মানব জাতির প্রগতির পথ অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা কেবল অধ্যাত্ম সাধনা ও পরকালের চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকে নাই। ইহলোককে কিভাবে সম্যক্ সমৃদ্ধ করিয়া তুলা যায় তাহাও ইহাতে দেখান হইয়াছে। ফলতঃ মানবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আদিদৈবিক উন্নতির মূলে তন্ত্র যেরূপ সহায়ক অন্য কোন শাস্ত্রই সেরূপ নহে। ইহাতে কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় অতি পরিষ্কারভাবে করা হইয়াছে। বেদে যদিও কর্ম ও জ্ঞানের কথা বা ঐহিক ও পারমার্থিক জীবনের উন্নতির কথা লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতই জটিলতা-পূর্ণ যে বৈদিক শাস্ত্রে ও বৈদিক ভাষায় বিশেষ জ্ঞান লাভ না হইলে তাহা আয়ত্তাধীন করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তন্ত্রে এমনি সরল ভাষায় বেদের বিধি ও তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, আপামর সর্বসাধারণ বেদেরই তত্ত্বগুলি সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। মূলতঃ বেদে যে একেশ্বরবাদ (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) প্রচারিত হইয়াছে সেই একেশ্বরবাদ তন্ত্রেও প্রতিপাদিত হইয়াছে—

যদিও ভিন্ন প্রকারে ও ভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া। প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়া কিভাবে কলি-কালের চঞ্চলচিত্ত দুর্বল মানবজাতি নিবৃত্তিমার্গে পৌঁছিতে পারে তাহাই উহাতে বিশদ-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরুষ ও প্রকৃতি বা শিব ও শক্তির আরাধনাই তন্ত্র। এইজন্য তন্ত্রে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় ভাবই প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে কখনও শিব ও শক্তির উপাসনা মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়া দ্বৈতভাব প্রকটিত হইয়াছে, আবার কখনও বা শক্তিকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অদ্বৈতভাব প্রকটিত হইয়াছে। তন্ত্রের লক্ষ্য মুখ্যতঃ শক্তি উপাসনা, যে ব্রহ্মশক্তি জীব-জগতাকারে নিত্য প্রকাশিত বা যে শক্তিমূলে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিতেছে সেই শক্তির সান্নিধ্যলাভ বা তাঁহাকে লাভ করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। উপনিষদে যাহাকে আত্মা বা পরমাত্মা বলা হইয়াছে এবং পুরাণে যাঁহাকে ভগবান, নারায়ণ প্রভৃতি নামে বিশেষিত করা হইয়াছে তন্ত্রে তাহাকেই পরমা প্রকৃতি, মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাদেবী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি নামে বিশেষিত করা হইয়াছে। নির্গুণ চৈতন্যে যখন 'এক আমি বহু হইব' (একোঽহং বহুস্যাম্) এই ইচ্ছা প্রকাশ পায় তখনই সেই চৈতন্য ব্রহ্মশক্তি রূপে প্রকট হন। এই ব্রহ্মশক্তি মহামায়া, সুতরাং ব্রহ্মের চিচ্ছক্তি বা স্বয়ং ব্রহ্ম। ভাষার অনুরোধে যদিও ব্রহ্মকে সকল (শক্তির সহিত) এবং নিষ্কল (শক্তি-বিরহিত) বলা হয়, কিন্তু মূলে ব্রহ্মে ও শক্তিতে বা শক্তিমান্ ও শক্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন, "অবিনাভাব সম্বন্ধং তয়োরেব পরস্পরং" অর্থাৎ তাঁহাদের (শিব ও শক্তি) মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, পিতৃভাব ও মাতৃভাব শব্দতঃ পৃথক, স্বরূপতঃ ইহারা একই পদার্থ। যেমন অগ্নি হইতে তাহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করা যায় না, যেস্থানে অগ্নি তথায়ই দাহিকা শক্তি এবং যেখানে দাহিকা শক্তি তথায়ই অগ্নি, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তিকে বা মহামায়াকে পৃথক করার উপায় নাই। সৃষ্টির পূর্ব হইতেই এই শক্তির অস্তিত্ব থাকায় তিনি আদ্যা প্রকৃতি। আদ্যাপ্রকৃতি যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ কার্য করেন তখনই শক্তি বা মহামায়া। পরব্রহ্মরূপে তিনি নির্গুণ, নির্বিকার, কিন্তু মহামায়ারূপে তাঁহার পরা, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই ত্রিবিধ আকার, তাঁহার পরমরূপ কাহারও বোধগম্য নহে। (তন্ন জানাতি কশ্চন) তাঁহার সূক্ষ্মরূপ মন্ত্রময় কিন্তু অবয়বহীন। অবয়বহীন কিছুতে মন স্থির হয় না বলিয়া তাঁহার হস্তপদাদিযুক্ত স্থূলরূপের অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্রী ঘনীভূত মূর্তির কল্পনা। সৃষ্টিকর্ত্রীরূপে তিনি ব্রহ্মা, স্থিতিকর্ত্রীরূপে বিষ্ণু এবং প্রলয়কর্ত্রীরূপে শিব।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে মহামায়াকে অবিদ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি আদি নানা বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। তন্ত্র কিন্তু ইহার কোনটাই স্বীকার করেন না। তন্ত্রমতে তিনি মিথ্যা নহেন, ভ্রান্তি নহেন, অবিদ্যা নহেন, অধ্যাস নহেন। তিনি সত্যস্বরূপা, পরমাত্মস্বরূপিনী আদ্যাশক্তি এবং জীবজগতরূপে প্রকাশশীলা মহাশক্তি। প্রকটিত হওয়াকালে তিনি দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকট হয়েন—মহতী প্রকৃতি ও জীবভাবীয় প্রকৃতি।

এই উভয়বিধ প্রকৃতিই গুণত্রয়-বিভাবিনী অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমময়ী। শ্রীমৎ ভগবদ্গীতায় এই মহতী প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতি ও জীবভাবীয় প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। পরা প্রকৃতি তমগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্ত্বগুণরূপে এবং অপরাপ্রকৃতি সত্ত্বগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া তমগুণরূপে অভিব্যক্ত। গুণবিভাবিতারূপে ক্রম বিবর্তিত হইয়া প্রকৃতি পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে বহুনাম ও বহু আকার ধারণ করিয়া থাকেন। বহুভাবের বীজ গর্ভে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাকে জননী, শ্রীমাতা প্রভৃতি স্ত্রীপদবাচ্য বহু নামে অভিহিত করা হয়। তিনিই ক্ষিতি, অপ, তেজ ইত্যাদি তত্ত্বরূপে, কাম ক্রোধাদি বৃত্তিরূপে, রূপ, রস ইত্যাদি বিষয়রূপে, ইন্দ্রিয়গণ ও ভূতাদির অধিষ্ঠাত্রীরূপে ও জন্মমৃত্যুরূপে আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তিনিই চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও নিদ্রারূপে, তুষ্টি ও পুষ্টিরূপে, লক্ষ্মীরূপে ও লজ্জারূপে শান্তি, কান্তি ও স্মৃতিরূপে, দয়া ও ক্ষমারূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে সর্বভূতে বিদ্যমান। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও এইরূপ উক্তিই করা হইয়াছে। যথা—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা 'যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা' ইত্যাদি (উত্তরচরিত ১১ হইতে ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

আগম ও নিগম ভেদে তন্ত্র দ্বিবিধ। যে তন্ত্র মহাদেবের মুখ হইতে বহির্গত এবং মহাদেবী যাহার শ্রোত্রী তাহা আগম এবং যে তন্ত্র দেবীর মুখনিসৃত ও মহাদেব যাহার শ্রোতা তাহা নিগম। নিগমের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না বলিয়া সাধারণতঃ আগম শব্দটাই আজকাল তন্ত্রপদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তন্ত্রের সংখ্যা অসংখ্য, তন্মধ্যে আগমসার, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী, সারদাতিলক, প্রাণতোষিণী, রুদ্রযামল, কুলার্ণবতন্ত্র ও মহানির্বাণতন্ত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তান্ত্রিকগণ অশ্বক্রান্তা, বিষ্ণুক্রান্তা ও রথাক্রান্তা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মহানির্বাণতন্ত্র রথাক্রান্তা সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ।

"একোহহং বহুস্যাম্" এই যে স্পন্দন বা ব্রহ্মের ইচ্ছা তন্ত্রমতে ইহাই অব্যক্ত সৃষ্টি। অব্যক্ত সৃষ্টি হইতে সত্ত্ব, রজো ও তমগুণ সমন্বিত মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাধিক অহঙ্কারের সৃষ্টি। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকে যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার বলা হয়। ভূতাদিক বা তামসিক অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকা এই পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি। এইরূপে ক্রমে পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কথা তন্ত্রে লিখিত আছে। সত্ত্ব, রজো ও তমগুণের সাম্যাবস্থায়ই অব্যক্তা প্রকৃতি। যখন প্রকৃতির এই সাম্যাবস্থা ভগ্ন হয় তখনই প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিয়া সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় ও সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থ কয়েকটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করে। প্রথম 'জায়তে' অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে; দ্বিতীয় 'অস্তি' অর্থাৎ আপন সত্ত্বাকে বর্তমান রাখে; তৃতীয় 'বর্ধতে' অর্থাৎ বৃদ্ধি পায়; চতুর্থ 'বিপরিণতি' অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, পঞ্চম 'অপক্ষয়তি' অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ষষ্ঠ 'নশ্যতি' অর্থাৎ বিনাশ পায়। এই ছয় পরিবর্তনকে সংক্ষেপে সৃষ্টি স্থিতি ও লয় বলা হয়। সৃষ্ট প্রত্যেক পদার্থে আবার ত্রিগুণের তারতম্য হয়। কোন্ পদার্থে

সত্ত্বগুণের, কোন পদার্থে রজোগুণের, এবং কোন পদার্থে তমগুণের প্রাধান্য হয়। প্রকৃতির বিকৃতি যাহা সুখকর তাহা সত্ত্বপ্রধান, যাহা দুঃখকর তাহা রজোপ্রধান এবং যাহা মোহকর তাহা তমপ্রধান। সত্ত্বগুণের কার্য প্রকাশ করা, রজোগুণের কার্য ক্রিয়াশীল করা এবং তমগুণের কার্য ভ্রান্তি উৎপাদন করা। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে অনুরাগ, লোভ ইত্যাদি এবং তমগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ আর মোহ জন্মে। এই তিন গুণের মধ্যে রজোগুণই সক্রিয়। রজোগুণ না হইলে সত্ত্বগুণের প্রকাশক শক্তি বা তমগুণের আবরক শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না।

সাংখ্য ও বেদান্তের ন্যায় মহানির্বাণতন্ত্রেও প্রকৃতি হইতে সংসারের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই আবার তাহার লয় লিখিত হইয়াছে। (প্রকৃত্যা জায়তে সর্বং প্রকৃত্যা পূজ্যতে জগৎ। তোয়াত্তু বুদ্‌বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥) তবে সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত তন্ত্রের কিছু পার্থক্য আছে। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই সদ্‌বস্তু। তাহারা স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু এবং তাহাদের উভয়ের সংযোগে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। বেদান্ত মতে ইহারা স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ নহেন। উভয়ের অতীত অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর আছেন এবং ইহারা উভয়েই সেই পরমেশ্বরের বিভূতি বিশেষ। তাই বেদান্তে 'জন্মাদস্য যতঃ' বলিয়া ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই সদ্বস্তু কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র নহেন। যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি এবং তিনিই ব্রহ্ম। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম বা পুরুষ, সক্রিয় অবস্থায় তিনি প্রকৃতি।

তন্ত্র মতে দীক্ষা অপরিহার্য অনুষ্ঠান। দীক্ষিত না হইলে দেহ ও মন পবিত্র হইতে পারে না এবং সিদ্ধি লাভও হয় না (দীক্ষাং বিনা ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিব শাসনাৎ) রুদ্রযামলেও আছে যে, দীক্ষ দ্বারা চিত্তমল নাশ হয়। যথা—'দদাতি শিব তাদাত্ম্যং ক্ষিণোতি চ মলত্রয়ম্'। যোগিনী তন্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, কর্ম বাক্য ও মন দ্বারা যে সকল পাপ সঞ্চয় হয় দীক্ষা দ্বারা সেগুলি নষ্ট হয় এবং পরিণামে পরাজ্ঞান লাভ হয়। যথা—

কর্মণা মনসা বাচা যৎ পাপং সমুপার্জিতম্।
তেষাং বিনশ্য করনী পরম জ্ঞান দায়কং॥

বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল ধর্ম সম্প্রদায় মধ্যে দীক্ষা গ্রহণের বিধি রহিয়াছে—যদিও সম্প্রদায় ভেদে ইহা বহু প্রকারের। তন্ত্রমতে গুরু নির্বাচন করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে হয়। পুস্তকে মন্ত্র পড়িয়া জপ করিলে হয় না। যথা—

পুস্তকে লিখিতো মন্ত্রো যেন জপ্যেত সুন্দরি।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধি হানিরেব পদে পদে॥ (কর্ম দীপিকা)

তন্ত্রমতে গুরু যে বীজমন্ত্র প্রদান করেন সেই মন্ত্রানুসারে ইষ্টদেবতার আরাধনাদি করিতে হয়। তন্ত্র বলেন মানব-গুরু মহাকালের প্রতীক স্বরূপ। মানবগুরু ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূলে এক মহাকালই সকলের গুরু। মন্ত্র গ্রহণকালে সেই আদিনাথ গুরুই মানব-গুরু মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া মন্ত্র প্রদান করেন। যথা কামাখ্যা তন্ত্রে—

গুরু সদা শিব প্রোক্ত আদিনাথ স উচ্যতে।
মহাকাল যুতো দেবঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ॥
সনাতনঃ পরং ব্রহ্ম শ্রীধর্মা স্ত্রিগুণ প্রভুঃ।
অতএব গুরুনৈব মনুজ কিন্তু কল্পনা॥

আবার আছে—

'মানুষে গুরুতা দেবি কল্পনা ন তু অন্যথা।

পুরাণ ইতিহাস আলোচনায়ও আমরা দেখিতে পাই যে, ধ্রুবকে দীক্ষিত করার জন্য ভগবান স্বয়ং মহর্ষি নারদের ভিতর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, ভগবানই গুরুরূপে মানব-গুরু মধ্যে আবির্ভূত হয়েন। তন্ত্র মতে গুরুই দীক্ষার মূল, দীক্ষা মন্ত্রের মূল, মন্ত্র দেবতার মূল এবং দেবতা সিদ্ধির মূল; ফলতঃ দেবতা, গুরু ও মন্ত্রে কোনও পার্থক্য নাই। তন্ত্র মতে স্ত্রীলোকও গুরু হইতে পারেন। বরঞ্চ স্ত্রীলোক হইতে মন্ত্র গ্রহণ অধিক ফলদায়ক এবং মাতা হইতে মন্ত্র গ্রহণে তাঁহার গুণ অষ্ট গুণ বৃদ্ধি পায়।

যার তার নিকট মন্ত্র গ্রহণ তন্ত্রের ব্যবস্থা নহে। যিনি শান্ত দান্ত প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন তিনিই গুরু হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ তন্ত্রের ব্যবস্থা। তন্ত্রসারে গুরুর সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে।

যথা :—

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধ বেতবান্।
শুদ্ধাচার সুপ্রতিষ্ঠ শুচির্দক্ষ সুবুদ্ধিবান্।
আশ্রমী ধ্যান নিষ্ঠাশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরু রিত্যভিধীয়তে॥

কুলীন শব্দে, আবার আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান এই নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্রে আশ্রমী গুরুকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শিষ্য কিরূপ হবেন তন্ত্রে তাহাও বলা হইয়াছে। শিষ্যও উন্নত চরিত্রের ব্যক্তি হওয়া দরকার। যাকে তাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করা তন্ত্রের মত নহে। কঠোপনিষদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদেও আছে যে, বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করা গুরুর কর্তব্য নহে। ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয় যে, বেদের সময় হইতেই দীক্ষার

প্রথা প্রচলিত আছে। ফলতঃ, সকলেরই দীক্ষিত হওয়া যে একটা প্রধান কর্তব্য শাস্ত্রালোচনায় তাহাই উপলব্ধি হয়। ইতিহাস আলোচনায়ও দেখা যায় যে, মহাপুরুষগণ সকলেই গুরুকৃপা প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শঙ্করাচার্য, তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ সকলেই দীক্ষিত ছিলেন। ভারতের বাহিরেও দীক্ষার প্রচলন দৃষ্ট হয়। বাইবেলে আছে যে যিশুখ্রীষ্টের অনুরোধে জন্ (John) তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত (Baptised) করিয়াছিলেন। ফলতঃ একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় প্রায় সব সভ্যদেশে সভ্যজাতির মধ্যে কোন না কোন ধরণের দীক্ষা প্রচলিত আছে।

তন্ত্র শাস্ত্রমতে দীক্ষা তিন প্রকার (১) শাক্তী দীক্ষা (২) শাম্ভবী দীক্ষা এবং (৩) মান্ত্রী দীক্ষা। সদাশিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনীর যোগ সাধন শাক্তী দীক্ষা। সহস্রার পদ্মে সদাশিব আছেন, মূলাধার চক্র হইতে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্থান করার ক্রম শিক্ষা দেওয়াই এই দীক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দেওয়ার নাম শাম্ভবী দীক্ষা। এই দীক্ষায় গুরু প্রথমতঃ শিষ্যকে আত্মা ও আত্মার স্বরূপ উপদেশ দিবেন, শিষ্যের ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে পর আত্মার সর্বব্যাপকত্ব এবং তৎপরে আত্মাই ব্রহ্ম এইরূপ উপদেশ দিবেন এবং সর্বশেষ আত্মা, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ সম্বন্ধের উপদেশ দিবেন। এই উপদেশ বা দীক্ষা শিব-ভাষিত বলিয়া ইহাকে শাম্ভবী দীক্ষা বলা হয়। মন্ত্রময়ী দীক্ষাকে মান্ত্রীদীক্ষা বলা হয়। গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র উপদেশ দেন ইহাই মান্ত্রী দীক্ষা। এই মান্ত্রী দীক্ষাকে কোন কোন তন্ত্রে আণবী দীক্ষা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ক্রিয়া প্রাধান্য হওয়াতে 'সারদাতিলক' তন্ত্রে ইহাকেই ক্রিয়াবতী দীক্ষা বলা হইয়াছে। এই ক্রিয়াবতী দীক্ষা ছাড়াও সারদাতিলকে কলাবতী দীক্ষা, বর্ণময়ী দীক্ষা ও বেধময়ী দীক্ষা নামে আরও তিন প্রকারের দীক্ষার কথা লিখিত আছে।

(ক্রমশঃ)

জাপানী যুযুৎসুতে ভারতীয় প্রভাব

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু

এই যুগে যুযুৎসুশিক্ষার্থীরা শক্তি ও সহিষ্ণুতা বাড়াইবার জন্য এক রকম ব্যায়াম করিত বলিয়া প্রকাশ; ইহার নাম ছিল তাই আতারি (Tai Atari). ইহাতে দুই ব্যক্তি দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভীষণ বেগের সহিত একে অপরের বুকে বুক ঠেকায়। শ্রীহট্ট অঞ্চলের মল্লগণ ভীমসেনী কুস্তি লড়িবার সময় এখনও মধ্যে মধ্যে এই জাতীয় আঘাত প্রত্যাঘাত করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন দোল, দুর্গোৎসব, পৌষ-সংক্রান্তি, চৈত্র-সংক্রান্তি বা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দেশের বিখ্যাত ব্যায়ামী ও শ্রেষ্ঠ মল্লগণ কোন এক বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া পরস্পর শক্তির পরীক্ষা দেয়, জাপানেও সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল; এতদ্ব্যতীত যুযুৎসুবিদেরা তারিউজিয়াই (Taryujiai) নামে এক বিখ্যাত প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হইত। অবশ্য সেই যুগে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিত শুধু হিংসামূলক মনোভাব লইয়া এবং সময়ে সময়ে এই কারণে কোন কোনও প্রতিযোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিত। এমন কি সময়ে বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত বাঁধিত। পরে দেশের কয়েকজন হিতকামী বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য সময়ে তোকুগাওয়া (Tokugawa) যুগে যুযুৎসু-বীরদের মধ্যে কিঞ্চিৎ সহযোগিতার ভাব জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়।

জাপানী যুযুৎসুর ক্রমোন্নতি

১৮৬৭—১৯১২ অব্দ জাপানে মেইজি (Meiji) রাজত্ব। জাপানী ইতিহাসে ইহা একটি সুবর্ণ যুগ; তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার যাহা কিছু উন্নতি, এই যুগেই তাহা পূর্ণভাবে বিকাশ পাইবার সুযোগ হয়। এই সময় শোগুন্ (Shogun) শক্তির সহিত জাপানের পুরাতন নীতিধর্মও লোপ পায় এবং সামুরাই সম্প্রদায় নূতন রাজশক্তি মেইজির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ফলে তাহারা রাজশক্তির নির্দেশমত এই যুযুৎসু বিদ্যাটাকেও সর্ব সাধারণকে শিক্ষা দিতে থাকে।

কিন্তু এই বিদ্যা সর্বসাধারণের প্রকৃত শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হয় আরও পরে, যখন জাপানের সুযোগ্য শিক্ষামন্ত্রী ও প্রখ্যাতনামা ব্যায়াম-বিশেষজ্ঞ কানো জিগোরো (Kano Jigoro) এই বিভিন্ন প্রণালীর বিভেদজনিত মূল সূত্রের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। বস্তুতঃ জাপানী যুযুৎসুকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দায়ী

এই একটি মাত্র ব্যক্তি। তাঁহার একাগ্র সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সর্বোপরি তাঁহার মৌলিক স্বাধীন চিন্তাধারা জাপানী রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে, যাহা জাপানী ইতিহাসে আজও অতুলনীয় ও একক।

এই যুগে ফুকুদা হাচিনোশুকে (Fukuda Hāchinoshuke) ছিলেন তেজিনৃশিনিও ধারার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তোকিওতে ছিল তাঁহার আখড়া। জিগোরো প্রথমতঃ তাঁহার নিকট বন্ধনীবহুল তেজিনৃশিনিও ধারাটা শিক্ষা করেন। পরে তিনি নিক্ষেপণবহুল কিতোরিউ প্রণালী শিক্ষা করেন। পরে তিনি নিক্ষেপণবহুল কিতোরিউ প্রণালী শিক্ষা লাভ করেন আইকুবো সুনেতোশির (Iikubo Tsunetoshi) কাছে। ক্রমান্বয়ে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের কাছ হইতে অন্যান্য প্রণালীগুলিও মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া লন। এইবার জিগোরো তাঁহার মস্তিষ্কপ্রসূত তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে এই সমস্তগুলি প্রণালীর সংমিশ্রনে এক নূতন ধারার বৈজ্ঞানিক যুযুৎসুর আবিষ্কার করিয়া উহার নাম দেন যুডো (Judo) এবং ইহাকে প্রধানতঃ রান্দোরি (Rāndori), কাতা (Kātā), আতেমি (Atemi), লেক্‌চুরেস্ (Lectures), কাংগেইকো (Kāngeiko) ইত্যাদি চারি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়।

এতদ্ব্যতীত যুযুৎসুর মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিভাগ আছে; তাহা কুয়াৎসু (Kuātsu) নামে জগদ্বিদিত। যুযুৎসুর মধ্যে এমন কতকগুলি মারাত্মক প্যাঁচ আছে, যাহা প্রয়োগ করিলে হঠাৎ শ্বাস বন্ধ হওয়া বা জ্ঞান হারান ত সামান্য কথা, মৃত্যু ঘটারও আশঙ্কা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই মামুলী চিকিৎসা-বিজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই সময় একমাত্র কুয়াৎসু পরিচর্যা করিলে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে ও মৃতকল্প ব্যক্তির মধ্যেও পুনরুত্থান-শক্তি সহজে সঞ্চারিত হয়। জলমগ্ন ব্যক্তির চৈতন্য ফিরিয়া পাইবার কার্যেও এই পরিচর্যা প্রায় অদ্বিতীয়। অথচ বাহির হইতে ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ নয়। বস্তুতঃ মৃতপ্রায় ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে একটা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধারায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করা ও তাহার দেহস্থ শিরা-উপশিরা, ধমনী ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর মৃদুভাবে হস্ত-মর্দন করার উপরই এই প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। জাপানীদের মতে এই বিদ্যাটি তাহাদের বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতালব্ধ।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন অনুরূপ প্রণালীর এক রকম মর্দন-প্রক্রিয়া ভারতবর্ষেরও নানা স্থানে প্রচলিত আছে, যাহার সাহায্যে আকস্মিক কারণে অঙ্গের কোনও অংশের স্ফীতি বা অস্থি-সন্ধির মস্কিয়া যাওয়াকে অতি সহজে নিরাময় করা যায়। অপরকে শিক্ষা না দিবার হীন মনোবৃত্তির দরুণ আজ এই ধারার মর্দন-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে একান্ত দুর্লভ হইয়াছে। সাধারণতঃ এই মর্দন প্রক্রিয়া চলতি কথায় 'ঝাড়া' বলিয়া পরিচিত। তবে হঠাৎ অজ্ঞান বা শ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে এই প্রণালীর ঝাড়া বোধ হয় খুব কার্যকরী হইত না। এই হিসাবে জাপানী কুয়াৎসুই শ্রেষ্ঠতর।

১৮৮২ অব্দ হইতে জিগোরো তাঁহার নবাবিষ্কৃত যুডোর প্রচার কার্য আরম্ভ

করেন এবং ১৮৮৫ অব্দে তোকিওতে তাঁহার কোদোক্ওয়ান্ (Kodokwan) নামে বিখ্যাত ব্যায়ামশালার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তথাপি দুই এক বৎসরের মধ্যে বড় একটা কেহ আগ্রহ দেখাইল না। শেষে সুৎসুমি (Tsutsumi) ও হোশিনো (Hoshino) নামে তাঁহার দুই সহকর্মীর নিঃস্বার্থ সহযোগিতা ও প্রচারকার্যের ফলে শীঘ্রই ইহা জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপান সম্রাট কর্তৃক ইহা স্কুল, কলেজ, নৌ ও সামরিক বিভিন্ন বিভাগে বাধ্যতামূলক শিক্ষা হইয়া দাঁড়ায়।

দেশ-বিদেশে প্রসারলাভের কথা

১৯০৪ অব্দে বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই সময় প্রথম বৈদেশিকগণ যুডোর প্রকৃত কার্যকারিতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। কেননা এই সময় রুশ ও জাপানীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সময়ে সময়ে যেসব দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা হাতাহাতি হইয়াছিল, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে প্রায় ছয় ফিট এক একজন রুশ-সৈন্য মাত্র সওয়া বা সাড়ে পাঁচ ফিট উচ্চ, এক একজন জাপানী-সৈন্যের হাতে চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় সেই সময়ই বিখ্যাত জাপানী যুযুৎসুবিদ্ উকিও তানি (Yukio Tani) ইংল্যাণ্ডে যাইয়া যুযুৎসুর প্রচারকার্য বা ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাইতে আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ এই বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত তখন যুযুৎসুর প্রচার কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুযুৎসুবীর উয়েনিশি ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ করেন। ইনি প্রধানতঃ 'রাকু' (Rāku) নামেই সমগ্র জগতে পরিচিত। রাকু প্রথমতঃ তানিকে যুযুৎসুর দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন। কিন্তু তানি এই কার্যে অগ্রসর না হওয়ায় রাকু ক্রমান্বয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বীর ও মুষ্টিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে তাঁহার আহ্বান ঘোষণা করেন। ফলে ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলক ১৪½ ষ্টোন ওজনের বিরাট বলী টমাস্ ইঞ্চ (Thomas Inch) রাকুর সম্মুখীন হন। ইঞ্চ এক সময়ে কাম্বার্ল্যাণ্ড ও উয়েস্টমোর্ল্যাণ্ড কুস্তি প্রণালী অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং ভার তোলায় এক হাতে কাঁধ হইতে প্রায় ৩০০ পাউণ্ড ও এক হাতে যে কোনও ভাবে ৩৫০ পাউণ্ড তুলিতে সমর্থ ছিলেন। অতএব তাঁহার উপর লোকের যথেষ্টই বিশ্বাস হইল।

১৯০৮ অব্দে লণ্ডন নগরে পিকাডিলি অঞ্চলের একটি স্কুলে তাঁহাদের এই প্রতিযোগিতা হয়! ফলাফল সম্বন্ধে ইঞ্চ নিজেই লিখিয়াছেন, "We got to grips and for a while nothing happened, but suddenly I was subjected to a terrific fall, turning a complete somersault and landing quite a distance away from my opponent who, it should be stated, only weighed some 9 st. 7lbs."*

ইঞ্চের পরবর্তী কথাগুলি খুবই মজার! তিনি লিখিতেছেন, "I did my best to put

*'The Superman Magazine' Vol. IV. Number 7, Page 818

up a show, but it began to dawn on me that my strength, instead of helping me, was really detrimental as the more I pulled and hauled the worse I took each fall. I also had wit enough to realise that my opponent was merely playing with me and deliberately delaying the end whilst he gave an exhibition, interesting enough to the onlookers, but painful to me, proving to the hilt that brawn was of no earthly use against brain, as exemplified by this 'new' form of wrestling."

বস্তুতঃ এই ঘটনার পর যুযুৎসু ইংল্যাণ্ডে বিশেষ সমাদৃত হইয়া যায়। অতঃপর ১৯০৯ অব্দে জাপান হইতে তারো মিয়াকে (Taro Miyake) ইংল্যাণ্ডে যান। তিনি পর পর অনেকগুলি দ্বন্দ্বযুদ্ধে কয়েকজন ইউরোপীয় ও আমেরিকান মল্লকে পরাজিত করেন; পক্ষান্তরে তিনিও কতিপয় পাশ্চাত্য পালোয়ানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী সময়ে ১৯১০ অব্দে গামা, ইমাম্ বখ্শ্ ইত্যাদি কয়েক জন ভারতীয় পালোয়ান লণ্ডননগরে উপস্থিত হন। গামা তারো মিয়াকেকে তাঁহার ২৯ জন সঙ্গীসহ মাত্র এক ঘণ্টায় পরাজিত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু মিয়াকে তখন এই অহ্বান এড়াইবার জন্য দলবল লইয়া গুটি গুটি সরিয়া পড়িলেন। ইহার পরে যে কয়জন প্রতীচ্য মল্ল গামা বা তাঁহার সঙ্গীদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই অতি শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এই সময়ে যুযুৎসুটা ইউরোপে খুব আদর পাইয়া যায়। পার্সি লংহার্স্ট (Percy Longhurst), ল্যাফ্ক্যাডিও হার্ণ (Lafcadio Hearn) ইত্যাদি ইউরোপীয় ব্যায়াম-বিশেষজ্ঞগণও তখন ইহার প্রচারকার্য শুরু করেন। তবে যুযুৎসু আমেরিকায় প্রচলিত হইবার মূলে ছিল কাট্সুকুমা হিগাশি (Katsukuma Higashi) ও আর্ভিন্ হ্যান্ককের (Irvine Hancock) অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

বাংলায় নব পর্যায়ের যুযুৎসু

অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে যুযুৎসু চীনের মধ্য দিয়া জাপানে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই যুযুৎসুই জাপানীরা আবার নূতন করিয়া ভারতবর্ষকে পরিবেশন করিল ১৯০৬ অব্দে যখন ঢাকা জেলায় বলধার জমিদার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী একজন জাপানীকে যুযুৎসু শিক্ষা দানের জন্য নিজ বলধা-ভবনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এই উপলক্ষে তখন জাপানী যুযুৎসু শিক্ষা করিবার সুযোগ পান। বলধা হইতে এই জাপানী যুযুৎসুবিদ্কে পরে শান্তি নিকেতনে শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ইহার পরে ১৯১৬ অব্দে মুক্তাগাছার স্বর্গগত রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয় যুযুৎসু শিখাইবার জন্য আভোয় (Avoy) নামে এক জাপানী যুযুৎসুবিদ্কে

আনাইয়াছিলেন। তখন জগৎকিশোর নিজেও এই বিদ্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। আরও পরে ১৯২৯ অব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান হইতে শ্রেষ্ঠ যুযুৎসু পণ্ডিত সিঞ্জো তাকাগাকিকে (Sinjo K. Takāgaki) শান্তি নিকেতনে আনয়ন করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেব তখন তাঁহার নিকট এই বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে আরও কয়েকজন জাপানী যুযুৎসুবীর এদেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইশিহারা (Ishihāra), ইয়ামাকি (K. Iyamaki) ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন যুযুৎসু বিশারদের শিক্ষাপদ্ধতির সামান্য পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস যে প্রণালীতে শিক্ষা দেন, তাহা হইল প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক জাপানী যুযুৎসুর সংমিশ্রণে তৈয়ারী ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি অভিনব প্রণালী। এই প্রণালীর আবিষ্কারের জন্য দায়ী শুধু তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তাশক্তি। এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহভাবে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। আর দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেবের শিক্ষায় ভারতীয় ভেজাল বিন্দুমাত্র নাই। বিশুদ্ধ জাপানী প্রথায় শিক্ষাদান ব্যাপারে তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। বাঙ্গালীর মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র তিনিই তাকাগাকির নিকট হইতে 'কালো কোমরবন্ধ' (Black Belt) লাভ করিয়াছেন, যাহা জাপানী জাতীয়তার দিক হইতে যুযুৎসুবীরদের পক্ষে পাওয়া একটা গৌরব। তাহা ছাড়া তাঁহার সহিত যুযুৎসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সক্ষম ব্যক্তি বাংলা দেশে কেহই নাই। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুযুৎসু শিক্ষাদান ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন।

জাপানের সুমোকুস্তি

প্রায় ১৫০০ বৎসর যাবৎ জাপানে এক ধরণের কুস্তি বর্তমান আছে; জাপানে ইহা সুমো (Sumo) নামে পরিচিত। তবে তোকুগাওয়া যুগে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য অর্থাৎ মেইজি আমলের পূর্ব পর্যন্ত ইহা জাপানে জাতীয় ক্রীড়ারূপে পরিগণিত ছিল। সেই সময় দেশের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ব্যয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী সুমো কুস্তিগীরদের পালন করিতেন, যেমন বর্তমানে ভারতবর্ষে হয়। বিভিন্ন পালোয়ান-পালকেরা অর্থ বাজী রাখিয়া পরস্পরের পোষা মল্লদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উপস্থিত করিতেন এবং জয়-পরাজয় অনুসারে তাঁহাদের কেহ অর্থ লাভ করিতেন, কেহ বা হারাইতেন। কিন্তু মেইজির আমল হইতে জাপানীরা সুমো ছাড়িয়া যুযুৎসুর উপর অতিমাত্র ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া সুমো কুস্তি একেবারে নির্বাসিত হয় নাই এবং ইহা সত্য যে স্কুল কলেজের ছেলেরা এখনও ইহার অল্পাধিক চর্চা করে।

সুমো কুস্তিগীরদের মল্লক্ষেত্র থাকে চক্রাকার এবং জাপানীরা ইহাকে কোকুগিকান্ (Kokugikan) বলে। সুমো পালোয়ানদের শরীরের ভার অনুযায়ী কোনও শ্রেণী

বিভাগ নাই; এবিষয়েও জাপান ভারতেরই অনুগামী। এই শ্রেণী বিভাগ না থাকার কারণেই ৫½ ফিট উচ্চ ও ১৫০ পাউণ্ডের কম ভারী মল্লদের প্রায়ই এই প্রতিযোগিতায় নামিতে দেখা যায় না, এই মল্লদের সাধারণ উচ্চতা প্রায় ৬ ফিট ও ওজন প্রায় ২৫০ পাউণ্ড হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ স্থূলকায় হইলেও এই মল্লরা খুব ক্ষিপ্র ও কৌশলী। সুমো কুস্তির অধিকাংশ লড়াই দুই এক মিনিটের মধ্যেই মীমাংসিত হইয়া যায়—খুব বড দরের রোমাঞ্চকর কুস্তিও মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয় কিনা সন্দেহ! কেননা ইহার জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিযোগিদ্বয়ের মধ্যে কেহ বৃত্তরেখার বাহিরে গেলে বা কাহারও পা ছাড়া শরীরের কোনও অংশ মুহূর্তের জন্য ভূমি স্পর্শ করিলেও সে বিজিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

ব্যবসায়ী সুমো মল্লগণ ব্যায়ামাগারের পার্শ্বেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। তাহারা স্বভাবতঃই খুব নিয়মানুবর্তী। প্রত্যহ ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে তাহাবা শয্যাত্যাগ করে এবং ৬টা হইতে বেলা ১১টা পর্যন্ত তাহাবা নিয়মিতভাবে কুস্তি লডে ও ব্যায়াম-চর্চা করে। সুমো মল্লরা শক্তি ও সহিষ্ণুতা বাডাইবাব জন্য জু-জু-কি (Dzu-Dzu-ki) নামে এক রকমের ব্যায়াম করে। ইহাতে মধ্য যুগীয যুযুৎসুবীবদেব ঠিক তাই আতারি ব্যায়াম বা শ্রীহট্ট জেলার মল্লদের ভীমসেনী কুস্তির মত বুকে বুকে ঠুকাঠুকি করিতে হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে জাপানীদের জাতীয় ব্যায়াম সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা দরকার। সাধারণ স্কুল কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বালক ও যুবকগণ যে সব ব্যায়ামেব অনুশীলন করে, তাহাকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়। উহা যথাক্রমে তাইসো-নো-কাতা (Taiso-no-kāta),—বালকবালিকাদের দেহ সক্ষম রাখিবার জন্য সাধাবণ ব্যাযাম, গো-নো-কাতা (Go-no-kāta),—শক্তি বৃদ্ধি করিবাব জন্য পৈশিক ব্যাযাম এবং জু-নো-কাতা (Ju-no-kāta)—ক্ষিপ্রতা ও কমনীয়তা সম্পন্ন হইবার জন্য ধীর ব্যায়াম। তবে বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগের যুযুৎসুবীরগণ এই ব্যায়ামগুলির উপর বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করে না।

সাধারণতঃ ৩৫ বৎসরের পবে সুমো-বীবগণ প্রকাশ্যে আর দঙ্গল লড়ে না; তখন তাহারা হয় একেবারে অবসর লয়, না হয় ত পয়সা লইয়া সকলকে কুস্তি শিক্ষা দেয়। সমগ্র জাপানের মধ্যে সুমো কুস্তিতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করা আজও অত্যন্ত গৌরবের বিষয় এবং এই জাতীয় কোন কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখিতে বহু লোক সমবেত হয়। কিন্তু ১৯৩৪ অব্দের দঙ্গলে বিখ্যাত সুমো-মল্ল তামানিশিকি (Tamanishiki) যখন সমগ্র জাপানের প্রাধান্য লাভ করেন, তখন তোকিওর কোকুগিকানের চতুষ্পার্শে একেবারে অতি অভাবনীয়রূপ বিরাট জনসমুদ্র দেখা গিয়াছিল! অতএব জনপ্রিয়তার দিক হইতে জাপানে যুডোর পরেই যে সুমোর স্থান, একথা নিঃসন্দেহ।

জাপানী কুস্তির প্রকার ভেদ

কেম্পো (Kempo) নামে জাপানে এক জাতীয় কুস্তি আছে; ইহার অর্থ নিধন

পন্থা (Method of Killing People). ইহার মধ্যে অনেক সাংঘাতিক প্যাঁচ ও আঘাত দেওয়ার বিধি আছে, যাহার ফলে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। কিন্তু সভ্যতা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কেম্পো কুস্তির আদর জাপানে ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ইংরেজি ভাষায় এক সময়ে কেম্পারি লোক (Kempery Man) বলিতে লোকে কেম্পো-মল্লকে বুঝিত। অ্যাংলো-সাক্সন্ মতে কেম্পা (Cempa) অর্থ শুধু যোদ্ধা।

আর এক শ্রেণীর কুস্তি আছে; উহা কোথাও তোরি (Tori) আবার কোথাও বা শিমে (Shime) নামে পরিচিত। অনেকের মতে তোরি কুস্তি হইতে বহু প্যাঁচ যুযুৎসুতে আমদানি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যুযুৎসুতে নিম্নাঙ্গের সাহায্যে যে সব প্যাঁচ কষা হয়, তাহার অধিকাংশের সহিতই তোরি কুস্তির অতি আশ্চর্য রকম মিল আছে। এই সব কুস্তির আদরও এখন জাপানে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

আর এক ধারার কুস্তি আছে; তাহার নাম লে সাভাতে (Le Sāvate). ইহার সহিত বোধ হয় প্রাচীন গ্রীসের পাংক্রাশন (Pāncration) কুস্তির তুলনা চলিত। বলা বাহুল্য জাপানে এখন এই কুস্তিও বড় একটা প্রচলিত নাই।

বাংলায় যুযুৎসুর প্রয়োজনীয়তা

উপসংহারে বাংলা দেশে যুযুৎসু-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দুই একটি কথা মাত্র বলিব।

কুস্তি-বিজ্ঞান ভারতের একটি বিশিষ্ট বিষয় হইলেও এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে যে পরিমাণ দৈহিক সামর্থ্য প্রয়োজন, বাঙালীর সাধারণতঃ তাহা নাই। অবশ্য সমগ্র জাতির মধ্যে কয়েক ব্যক্তির শক্তিমত্তা উল্লেখযোগ্য নয়—এখানে ব্যাপকভাবে জাতির কথা বলা হইতেছে। দৈহিক শক্তি ও আকৃতিতে বাঙালী পাঞ্জাবীদের কাছে নগন্য। তদুপরি শুধু দুই বেলা দুই মুষ্টি ভাত (তাহাও সকলের যেখানে নিয়মমত জোটে না) খাইয়া উপযুক্তভাবে কুস্তি লড়া খুব আশার কথা নয়। বরং খালি পেটে কুস্তি-লড়াজনিত অতিরিক্ত শ্রম অত্যল্প-কালের মধ্যে দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা—একথা গত প্রায় ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিবার দাবী রাখি।

পক্ষান্তরে যুযুৎসু শিক্ষায় পরিশ্রম কম হয়। কেননা অপরের শক্তি-প্রয়োগের উপরই এই বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। শত্রু সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যত বেগে আসিয়া পড়িবে, এই বিজ্ঞানের বলে তাহাকে তত বেশী সহজে আয়ত্তে আনা যাইবে। বিশেষতঃ বাঙালীর দৈহিক গঠন ও জীবনযাত্রাপ্রণালী অনেকটা জাপানীদের অনুরূপ। অতএব জাপানীরা যদি যুযুৎসুর সাহায্যে বিরাট বিরাট বলীকে সহজে কাবু করিতে পারে, তবে বাঙালীও পারিবে—অনেকটা এই বিশ্বাস লইয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক ডক্টর হেমচন্দ্র রায় কয়েক বৎসর পূর্বে যুযুৎসু শিক্ষা দিবার জন্য এবিষয়ের যোগ্যতম বাঙালী শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোমোহন দেবকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের দুই হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র দশ জন ছাত্রও এখানে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে উপস্থিত হন না। প্রায় একই সময়ে যুযুৎসু বাংলায় ও পাশ্চাত্য দেশে পরিচিত হয়। অথচ এই সময়ের মধ্যে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় এই বিজ্ঞান জঁাকিয়া গেলেও বাংলা দেশে ইহা আজও লোকের সমাদর পাইল না! পূর্বাপর বিবেচনা করিলে ইহার যে সমস্ত কারণ মনে আসে, তাহা এই :—

১। দেশের অর্থশালী লোকের অমনোযোগিতার দরুণ উপযুক্ত যুযুৎসু শিক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন না।

২। শিক্ষিত ছাত্রসমাজেব উদাসীনতা।

৩। উপযুক্তভাবে অর্থাৎ পুস্তক, পত্রিকাদিতে লিখিত বা বিভিন্ন ব্যায়ামোৎসাহীগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে ইহাব অনুশীলন বা প্রচার কার্য হয় না।

৪। যুযুৎসুবিদ্‌দের দৈহিক গঠন সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করিবার মত পালোয়ানের মত বিবাট বা সাধাবণ ব্যায়ামীর মত পৈশিক ও নয়নলোভন হয় না।

৫। সাধাবণতঃ যুযুৎসুব প্রদর্শনী (Demonstiations) কুস্তি, ঘুসাঘুসি. মোটর ধরা, ভার তোলা, পেশীব খেলা ইত্যাদির মত রোমাঞ্চকর বা চমকপ্রদ নয়।

৬। যুযুৎসু শিক্ষায় কিছুদূব অগ্রসর না হইলে সহসা ইহার অন্তর্নিহিত মহাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

৭। যুযুৎসু শিখিবার উপযোগী বাঙালীর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসের অভাব।

বস্তুতঃ বাঙালী জাতি অনেকটা ফাঁকিব উপবে বাতারাতি কোন বিষয়ে দক্ষ হইতে চায়; সেইভাবে যুযুৎসু শিক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব। আমাব বিশ্বাস, জাপানীদের মত অল্পভাষী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহিষ্ণু না হইলে এই যুযুৎসু-বিজ্ঞান সম্যকরূপে কাহারও পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। অপব জাতির পক্ষে এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে না পারার রহস্যের মূল হইতেছে এই যে, তাহারা শুধু জাপানীদের বাহিরের আবরন অর্থাৎ তাহাদের সাধারণ ক্রিয়া-কলাপকে নকল করিলেও জাতির মনে ডুব দিবার চেষ্টা কবে না; অথচ জাতীয় উন্নতি-অবনতির মূলে রহিয়াছে জাতিব মন। এই কারণে প্রথমেই দরকার মন ও মনোবৃত্তির সহিত পরিচিত হওয়া। তাহা না হইলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার কথা।

এ কথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্বাপেক্ষা এখন বাঙালী হীনবীর্য ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙালীর পক্ষে যুযুৎসুর শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়ঃকর বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা দুর্বলের নিকট অব্যর্থ মহাস্ত্র এবং অত্যাচারীর কাছে শক্তিশেল! অতএব জাপানের শিক্ষামন্ত্রী দূরদর্শী কানো জিগোরোর আদর্শ স্মরণ করিয়া যদি এদেশের শিক্ষাব্রতীগণ এখনও এই বিজ্ঞানের উপযুক্ত প্রচার ও অনুশীলনের ব্যবস্থা না করেন, তবে নিকট ভবিষ্যতে বাংলার বুকে রাষ্ট্রবিপ্লবের যে বহ্নিশিখা হয়ত জ্বলিয়া উঠিবে, জানি না, তাহাতে বাঙালী জাতির ভস্মাবশেষ তাহার প্রভাব, প্রতিপত্তি ও পূত চরিত্রের সাক্ষ্য দিবে কি না!

প্রত্যক্ষ (২)*

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কুমারিলের কথা এই ঃ—

অস্তি হ্যালোচনাজ্ঞানমাদ্যং চেন্নির্বিকল্পকম্।
বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্॥ ১২৮৬॥
ন বিশেষো ন সামান্যং তদানীমনুভূয়তে।
তয়োরাধারভূতা তু ব্যক্তিরেবাবসীয়তে॥ ১২৮৭॥
ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া।
বুদ্ধ্যাবসীয়তে সাপি প্রত্যক্ষত্বেন সংমতা॥ ১২৮৮॥

বস্তু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কিরূপে জন্মায়—কুমারিল এখানে তাহাই বুঝাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন যে ইন্দ্রিয় সংযোগের পর মানুষের মনে প্রথমে বস্তু সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনাজ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞানের এই অবস্থায় বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই জন্মে না, সকল বস্তু সম্বন্ধেই অনুভূতি হয় সমান। অথচ ইহা কেবলমাত্র অস্তিজ্ঞান নহে, কারণ অস্তিক্রিয়ার কর্তা সম্বন্ধে মন এই স্তরে সম্পূর্ণ সচেতন না হইলেও সম্পূর্ণ অচেতনও নহে; ইহাই হইল আলোচনা জ্ঞান। ইহার পর আলোচ্যমান বস্তুটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বুদ্ধি নিশিত হইয়া উঠিলে তবে পূর্ণ সবিকল্প জ্ঞানের উদয় হয়। জল দেখিয়া মানুষের যে বুদ্ধির উদয় হয় তাহাতে এতদনুযায়ী চারিটি স্তরনির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমে মনে হইবে "অস্তি"; এই স্তরে কর্তাকে ক্রিয়া হইতে পৃথক্ করার কথাও মনে আসিবে না; ইহাই হইল "অস্তি-জ্ঞান"। ইহার পরের স্তরে মনে হইবে "কিঞ্চিদস্তি"; ইহা অস্তিজ্ঞান ও আলোচনাজ্ঞানের মাঝামাঝি অবস্থা; এই অবস্থায় কর্তাটি ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে মাত্র, কিন্তু কর্তার পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে মন এখনও সচেতন হয় নাই। তৃতীয় স্তরে মনে হইবে "জলমস্তি"; ইহাই হইল আলোচনাজ্ঞান, এখানে কর্তার পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে মন সচেতন হইয়াছে, কিন্তু কর্তাটির বিশেষ অস্তিত্ব এখনও অধিগত হয় নাই। ইহা চতুর্থ স্তরে সমাধা হইবে, যখন মনে হইবে "জলত্ববিশিষ্টজলমস্তি"; ইহাই হইল পূর্ণ সবিকল্প জ্ঞানের অবস্থা। মনোবিশ্লেষণে ভারতীয়গণ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের কথিত জ্ঞানোদয়ের এই চারিটি স্তর পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়:—অস্তি, কিঞ্চিদস্তি, জলমস্তি, জলত্ববিশিষ্টজলমস্তি। কুমারিল এখানে অপ্রয়োজনীয় বোধে প্রথম দুই স্তরের জ্ঞানের উল্লেখ করেন নাই।—উদ্ধৃত

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 11.

কারিকাত্রয়ে তিনি বলিতেছেন, প্রথমে জন্মে নির্বিকল্প আলোচনাজ্ঞান ; শিশু ও মূকাদির জ্ঞান যেরূপ ইহাও তদ্রূপ ; গৃহ্যমাণ বস্তুটিই এখানে বুদ্ধ্যুৎপত্তির একমাত্র কারণ (শুদ্ধবস্তুজম্), চিত্ত স্বয়ং এই অবস্থায় এক প্রকার নিষ্ক্রিয় ; এই আলোচনাজ্ঞানে সামান্য বা বিশেষ কিছুই অনুভূত হয় না, এতদ্দ্বয়ের আধারভূত ব্যক্তিটিই কেবল জ্ঞানগোচর হইযা থাকে। ইহার পর বস্তুটি যে-বুদ্ধির দ্বারা জাত্যাদি ধর্ম সহকারে গৃহীত হইয়া থাকে তাহাই হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান।

কুমারিলের এই কথার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রিয় সংযোগের প্রথম ক্ষণেই যদি সমুদয় জাত্যাদি ধর্ম সমন্বিত বস্তুটি বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত না হয় তবে পরেই বা তাহা সম্ভব হইবে কিরূপে ? উত্তরে কুমারিল বলিতেছেন :—

> ন হি প্রবিষ্টমাত্রাণামুষ্ণাদ্গর্ভগৃহাদিষু।
> অর্থা ন প্রতিভান্তীতি গম্যন্তে নেন্দ্রিয়ৈঃ পুনঃ ॥ ১২৯০ ॥
> যথা ত্বাভাসমাত্রেণ পূর্বং জ্ঞাত্বা স্বরূপতঃ।
> পশ্চাত্তত্র বিবুধ্যন্তে তথা জাত্যাদিধর্মতঃ ॥ ১২৯১ ॥

অর্থাৎ, আলোকিত স্থান হইতে অন্ধকার গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে প্রথমে যেমন সেখানকার জিনিষপত্র ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু ক্রমশঃ সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সংযোগের প্রথম ক্ষণে বস্তুবও আভাসমাত্র অনুভূত হইলেও পরে ক্রমশঃ তাহার জাত্যাদি ধম ও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে।

বৌদ্ধ কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন যে আলোচনা জ্ঞানের পর যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই যদি পূর্বপক্ষীর মতে প্রামাণ্য হয় তবে দৃষ্টি সংযোগের পরমুহূর্তেই (পর্যবেক্ষণের পূর্বে !) চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি কোন বস্তুর জাত্যাদি ধর্ম কল্পনা করা যায় তবে তাহাও কি সবিকল্প প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইবে ? কুমারিল অবশ্যই উত্তরে বলিয়াছেন যে তাহা হইতে পারে না, কারণ ঐ জ্ঞান যে ইন্দ্রিয সংযোগ অনুসারে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে (সম্বন্ধানন্নুসারতঃ)।

কুমারিলের এই সকল যুক্তি খণ্ডনোদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। তিনি বলিতেছেন, যদি স্বলক্ষণ (specific individuality)দৃষ্টিসংযোগের পরমুহূর্তের জ্ঞানের বিষয় হয় তবে ঐ বিষয়ের জাত্যাদির গ্রহণের পরেও তাহা অনির্বচনীয় থাকা উচিত, কারণ স্বলক্ষণ যে শব্দের অতীত তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে ; সুতরাং যে-বিজ্ঞান স্বলক্ষণ বিষয়ক তাহাও নির্বিকল্প, যেহেতু সবিকল্প জ্ঞান শব্দবাচ্য (১২৯৩—১২৯৪)। আর কুমারিল যদি বলেন যে সামান্যই হইল ঐজ্ঞানের বিষয় তাহা হইলে বিশেষ্য হইতে বিশেষণটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে—যাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে বিশেষণ যদি বিশেষ্য হইতে একান্ত পৃথক্ হয় তবে বিশেষণের অনুরূপ বুদ্ধি বিশেষ্যে উৎপন্ন হয় কিরূপে (কা ১২৯৬) ?

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয়সংযোগের পরবর্তী ক্ষণাবলীতেও যদি স্বলক্ষণই গৃহীত হইতে থাকে, তবে জ্ঞানটি হইবে অবিকল্প। কিন্তু যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে জ্ঞানটি হইবে সবিকল্প, তাহা হইলেও সে-জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না, কারণ সে-জ্ঞানের নূতন কোন গ্রাহ্য বিষয় নাই—পূর্ববর্তী নির্বিকল্প জ্ঞানের বিষয়টিই হইল এই সবিকল্প জ্ঞানের বিষয় :—

একান্তেনান্যতাভাবাজ্জাত্যাদ্যাত্মেন চেদ্গতম্।
বিজ্ঞাতার্থাধিগন্তৃত্বাৎ স্মার্তজ্ঞানসমং পরম্ ॥ ১২৯৮ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষী কুমারিল নিজেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে জাত্যাদি হইতে ব্যক্তির ঐকান্তিক পার্থক্য কিছু নাই, সুতরাং প্রাথমিক আলোচনা জ্ঞানের দ্বারাই যখন জাত্যাদি অধিগত হইতেছে তখন পরবর্তী সবিকল্প জ্ঞানের দ্বারাও তাহাই অধিগত হইতে থাকিবে; এইরূপে তথাকথিত সবিকল্প জ্ঞান হইয়া পড়িবে স্মৃতির অনুরূপ—যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন জ্ঞানই নহে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে জাত্যাদি স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে—কিন্তু পারমার্থিক অর্থে জাত্যাদির অস্তিত্ব নাই, সুতরাং যে-প্রত্যক্ষের বিষয় হইল এই জাত্যাদি তাহা কখনও সবিকল্প হইতে পারে না :—

তত্ত্বান্যত্বোভয়াত্মানঃ সন্তি জাত্যাদয়ো ন চ।
যদ্বিকল্পকবিজ্ঞানং প্রত্যক্ষত্বং প্রযাস্যতি ॥ ১৩০৪ ॥
অন্বয়াসত্ততো ভেদাদ্ভেদেনাপ্রতিভাসনাৎ।
অন্যোন্যপরিহারেণ স্থিতেশ্চান্যত্বতত্ত্বয়োঃ ॥ ১৩০৫ ॥

জাত্যাদির যদি প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে, তবে ব্যক্তি হইতে তাহা হয় অনন্য হইবে, না হয় পৃথক্ হইবে, অথবা অনন্য ও পৃথক্ দুইই হইবে। কিন্তু প্রথম পক্ষটি সম্ভব নহে, কারণ সমস্ত ব্যক্ত্যাবলীতে অন্বিত হইয়া আছে এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহা সামান্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; আরও বিবেচ্য এই যে কোন বিশেষ ব্যক্তি সমস্ত ব্যক্তিতে অন্বিত হইয়া থাকিলে বিশ্বে কেবল এক প্রকারের রূপ দেখা যাইত এবং তাহাতে সামান্যের অভাব ঘটিত, কারণ অনেকাধারত্বই হইল সামান্যের লক্ষণ। দ্বিতীয় পক্ষটিও অসম্ভব, কারণ সামান্য যে ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাসিত হয় তাহা নহে, এবং যাহা প্রতিভাসিত হয় না তাহা প্রত্যক্ষেরও বিষয় হইতে পারে না। তৃতীয় পক্ষও সম্ভব নহে, কারণ ব্যক্তি ও জাতি যুগপৎ অনন্য ও পৃথক্ হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী এখন আপত্তি করিতেছেন, প্রত্যক্ষ যদি অবিকল্প হয় তবে তদনুযায়ী কার্য নিষ্পাদন সম্ভব হয় কিরূপে? কর্মোদ্যত মানুষ কিরূপে বলিতে সমর্থ হয় কোন্ কার্যের ফল সুখ? এ-সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া মানুষ কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক কার্যেরই উদ্দেশ্য সুখলাভ বা দুঃখপরিহার। আরও বিবেচ্য এই

যে প্রত্যক্ষ অবিকল্প হইলে অনুমানও সম্ভব হইত না। কারণ যাহা অনুমান করিতে হইবে (ধর্ম) অথবা অনুমেয় বিষয়টী যাহাতে আছে (ধর্মী) তাহা অনুমানকালে প্রমাণান্তর দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকা দরকারি; এই প্রমাণান্তর বৌদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কারণ বৌদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন। ধর্ম ও ধর্মী অনুমান দ্বারাই নিশ্চয় করিয়া তৎপ্রতি অনুমান প্রয়োগ করিলে অবশ্যই অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়িবে। সুতরাং অবিকল্প প্রত্যক্ষ কার্যপ্রবৃত্তির পরিপন্থী ও অনুমান-বিরুদ্ধ।—ইহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন:—

অবিকল্পমপি জ্ঞানং বিকল্পোৎপত্তিশক্তিমৎ।
নিঃশেষব্যবহারাঙ্গং তদ্দ্বারেণ ভবত্যতঃ ॥ ১৩০৬ ॥

অর্থাৎ, অবিকল্প জ্ঞানেরও সবিকল্প বুদ্ধি উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে, এবং এই উপায়ে অবিকল্প জ্ঞান সর্বপ্রকার কার্যেরও অঙ্গস্বরূপ।—কমলশীল এই কথা সবিস্তারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অবিকল্প হইতেই যখন সবিকল্প জ্ঞানের উৎপত্তি তখন "বিকল্পদ্বারেণ" অবিকল্প জ্ঞান নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ বাস্তবিকই কল্পনা-স্পর্শশূন্য (কল্পনাপোঢ), কিন্তু তথাপি তাহা একটি বিশিষ্ট রূপেই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে যাহা সজাতীয় ও বিজাতীয় বিবিধ রূপাবলী হইতে পৃথক্; এবং এই প্রত্যক্ষ যে-হেতু একটি নির্দিষ্টরূপে ব্যবস্থিত বস্তুই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, এবং যে-হেতু তাহা বিজাতীয় হইতে পৃথক্ এবং সজাতীয়ের অনুরূপ—সেইজন্য প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তু বিবিধ বিধি ও নিষেধের দ্বারা সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে; এই উপায়েই লোকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে "ইহা অগ্নি", "কুসুমস্তবক নহে"। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই দুইটি বিকল্পবুদ্ধি, প্রকৃত-পক্ষে অন্যোন্যাশ্রয়ী, সুতরাং তাহাদের কোনটিই প্রামাণ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে এইপ্রকার বিকল্পবুদ্ধির মূলে আছে দৃশ্য ("ইহা অগ্নি") ও বিকল্পের ("ইহা কুসুমস্তবক নহে") একত্বসাধনের চেষ্টা মাত্র, কোন অনধিগত বস্তুর অধিগম যে এতদ্দ্বারা সংসাধিত হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু যদ্দ্বারা অনধিগত বিষয় উপলব্ধ না হয় তাহাকে জ্ঞানও বলা যায় না।

ভাবিবিক্তাদি মণীষী স্বীকার করেন না যে অবিকল্প হইতে সবিকল্প জ্ঞানের উদয় হয়। তাঁহারা বলেন যে অবিকল্প ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান সবিকল্প মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন করিতে পারে না, কারণ এই উভয়বিধ বিজ্ঞানের বিষয়ই হইল পৃথক্। কিন্তু এ-কথার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, প্রকৃত-পক্ষে বিকল্পজ্ঞানেরও কোন অবলম্বন (rational basis) নাই, এবং তাহার বিষয়ও এমন কিছু নাই যাহার কোন বৈশিষ্ট্য আছে (কা ১৩০৯)। উপরন্তু ইহাও বিবেচ্য এই যে অবিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের বিষয় পৃথক্ হইলেই যে তাহাদের একটি অপরটি হইতে উৎপন্ন হইতে পারিবে না তাহা নহে, কারণ ধূম ও অগ্নি সম্বন্ধীয় বুদ্ধির বিষয় পৃথক্ হইলেও ধূমবুদ্ধি হইতে অগ্নিবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে (কা ১৩১১)।

লক্ষণকার দিগ্নাগ বলিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ কল্পনাস্পর্শশূন্য ও অভ্রান্ত। প্রত্যক্ষের কল্পনাস্পর্শশূন্যত্ব উপরোক্ত পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্তরক্ষিত এইবার দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় 'অভ্রান্ত' কথাটি গ্রহণ করিবার কি প্রয়োজন। এখানে 'অভ্রান্ত' কথাটির অর্থ অবিসংবাদী, অর্থাৎ অপরাপর বিষয়ের অবিরুদ্ধ; 'অভ্রান্ত' বলিতে এখানে বুঝাইতেছে না যে প্রত্যক্ষের অবলম্বন বাস্তবিক যেরূপ সেইরূপই হওয়া চাই (ন তু যথাবস্থিতালম্বনাকারতয়া); কারণ যোগাচার মতে অবলম্বনই যখন অসিদ্ধ তখন 'অভ্রান্ত' কথাটির এইরূপ অর্থ করিলে দিগ্নাগের সংজ্ঞা দ্বারা যোগাচার সম্মত প্রত্যক্ষের ব্যাপ্তি ঘটিবে না। অথচ দিগ্নাগের সংজ্ঞাটি হইল 'উভয়নয়সমাশ্রয়', অর্থাৎ যোগাচার এবং সৌত্রান্তিক এই উভয় পক্ষেরই অভিসম্মত। সুতরাং অভ্রান্তত্ব অর্থাৎ অবিসংবাদিত্ব বলিতে এখানে বুঝাইতেছে অভিমত অর্থক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ যে অর্থ তাহা অবধারণের সামর্থ্যবিশিষ্টতা।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ভ্রান্তি কেবলমাত্র 'মানস' ব্যাপার, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নহে; সুতরাং তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় 'অভ্রান্ত' কথাটি গ্রহণ করিবার সার্থকতাই নাই। কিন্তু ভ্রান্তি মানস ব্যাপার হইলেও প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় 'অভ্রান্ত' কথাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন, কারণ প্রত্যক্ষ বলিতে এখানে যে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানই বুঝাইতেছে তাহা নহে, যোগিগণের মানসজ্ঞানও এই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত।—ভ্রান্তি কিন্তু মানস নহে; তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ইন্দ্রিয়শক্তি যখন বর্তমান তখনই কেবল ভ্রান্তি সম্ভব হয় (ইন্দ্রিয়ভাবতঃ ভাবাৎ) এবং ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইলে ভ্রান্তিও সম্ভব হয় না। ভ্রান্তি কেবল মানস ব্যাপার হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে মানসিক বিপর্যয়ই তাহার একমাত্র কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; এবং মানসিক বিপর্যয়ের অবসানে এই ভ্রান্তিরও অবসান হইবে—ইন্দ্রিয়বিপর্যয় তখনও থাকিলেও (অনিবৃত্তেঽপ্যক্ষবিপ্লবে), রজ্জুতে সর্পভ্রমের বেলায় বাস্তবিকই যেরূপ দেখা যায়।

পূর্বপক্ষী কিন্তু ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, ইন্দ্রিয়শক্তি বর্তমান থাকিলে তবেই ভ্রান্তি সম্ভব হয়—এই যুক্তি অসিদ্ধ কারণ বৌদ্ধ একথা বলিতে পারেন না যে ইন্দ্রিয় হইতে সাক্ষাৎভাবেই ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে; ভ্রান্তির সহিত ইন্দ্রিয়শক্তির পারম্পর্যক্রমে একটা সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যে নাই তাহা নিশ্চিত। কিন্তু পারম্পর্যক্রমেও ভ্রান্তির সহিত ইন্দ্রিয়শক্তির যে সম্বন্ধ তাহাও অনৈকান্তিক, কারণ ভ্রান্তির সহিত এই প্রকারের পারম্পর্য সম্বন্ধ স্মৃতিব পক্ষেও সম্ভব যাহা আদৌ ইন্দ্রিয়শক্তি নহে। যাঁহারা বলেন যে ভ্রান্তি হইল ইন্দ্রিয়ের বিকারোৎপন্ন মানসিক বিকার তাঁহাদের কথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অসিদ্ধ এবং পরম্পরাক্রমে অনৈকান্তিক। এই কথা বুঝাইবার জন শান্তরক্ষিত বেগসরের (mule) দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; গর্দভ কর্তৃক অশ্বাতে উৎপন্ন বেগসরের জন্মের পূর্বে কললাদি বিভিন্ন অবস্থার ব্যবধান সত্ত্বেও বুঝিতে পারা যায় না যে যে-জন্তুটি জন্মিবে তাহার

উৎপাদক একটি গর্দভ, জন্মের পরে জাত জন্তুটির গর্দভের অনুরূপ আকার দেখিয়া তবে তাহা অনুমান করা যায়, এবং বুঝা যায় যে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে গর্দভ হইতে উৎপন্ন নহে। —এই দৃষ্টান্তটীর সার্থকতা বুঝিতে পারা গেল না।

এই পূর্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহাও খুব স্পষ্ট নহে। তিনি বলিতেছেন, ইন্দ্রিয়শক্তি বর্তমান থাকিলে তবেই যে ভ্রান্তি সম্ভব হয় এই কথা ঠিক নহে, কারণ দ্বিচন্দ্র দর্শনের যে ভ্রান্তি তাহা দ্বিচন্দ্র দর্শনকালের মধ্যেই একচন্দ্র দর্শনরূপ তাত্ত্বিক বুদ্ধির দ্বারা যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা নহে; চিত্ত অন্যার্থে নিষক্ত থাকিলেও লোকে যে সেই ভ্রমাত্মক দ্বিচন্দ্রই দেখিতে থাকে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভ্রান্তিটি এস্থলে যে পারম্পর্য ক্রমে উৎপন্ন হইতেছে তাহা নহে (কা ১৩২১-১৩২২)।

বৌদ্ধদিগের মধ্যেই আবার এমন অনেকে আছেন যাঁহারা দিগ্নাগপ্রদত্ত প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় "অভ্রান্ত" কথাটি রাখিতে ইচ্ছা করেন না (কেচিত্তু স্বযূথ্যাঃ ইত্যাদি), কারণ তাঁহারা বলেন যে পীতশঙ্খের জ্ঞান ভ্রান্ত হইলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান,* যেহেতু ইহা কখনই অনুমানজ হইতে পারে না এবং ইহার প্রামাণ্যও তথ্যের পরিপন্থী নহে (প্রমাণং চাবিসংবাদিত্বাৎ)। এই সকল কারণে এই মতের বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন যে দিগ্নাগ প্রত্যক্ষের সংজ্ঞায় "অভ্রান্ত" কথাটির ব্যবহারই করেন নাই।—ইহার পরেই মনে হয় যে কমলশীল দিগ্নাগের নিজের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু "পঞ্জিকার" পাঠ এখানে দুষ্ট; ভাবার্থ এই যে দিগ্নাগ যখন ভ্রান্তিকে প্রত্যক্ষাভাস বলিয়াছেন তখন যে-জ্ঞান তথ্যের সহিত সুসমঞ্জস ও কল্পনাস্পর্শশূন্য তাহাই তাঁহার মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান (অবিসংবাদিকল্পনা-পোঢ়মিত্যেবংবিধমিষ্টমাচার্যস্য লক্ষণম্)।

এই মতের প্রতিবাদকল্পে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন কমলশীলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাহার মর্মার্থ এই:—প্রামাণ্য জ্ঞান দুই প্রকারের; হয় তাহা জ্ঞেয় বস্তুর প্রতিভাসিত (apparent) রূপের অনুরূপ, না হয় তাহা জ্ঞেয় বস্তুর অধ্যবসিত (apprehended) রূপের অনুরূপ। এখন পীত শঙ্খের জ্ঞান যে প্রতিভাসের অনুযায়ী (compatible with appearance) নহে তাহা সুস্পষ্ট; কারণ যাহা প্রতিভাসিত হয় তাহা হইল শ্বেত শঙ্খ, পীত শঙ্খ নহে। আবার পীত শঙ্খের জ্ঞান অধ্যবসিত রূপের অনুযায়ীও নহে, কারণ যদিও অর্থক্রিয়াকারীরূপে পীত শঙ্খই অধ্যবসিত হইতেছে তথাপি রূপানুযায়ী অর্থক্রিয়া পীত শঙ্খে দেখা যায় না। সুতরাং পীত শঙ্খের জ্ঞান কোন ক্রমেই প্রমাজ্ঞান হইতে পারে না।—আরও বিবেচ্য এই যে বস্তুর আকার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কেবল অর্থক্রিয়া উৎপাদনের দিক্ হইতে যাহা সুসমঞ্জস যদি তাহারই প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় তবে পূর্বপক্ষী যে বলিয়া থাকেন বস্তু কেবল স্বরূপেই নিশ্চিত হইয়া থাকে (তদ্রূপো হ্যর্থনিশ্চয়ঃ) তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায় না কি? সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে পীত শঙ্খ সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত অর্থক্রিয়ার

* কিন্তু ইহাই কি প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মত নহে?

সহিত জ্ঞেয়ার্থের সামঞ্জস্য পূর্বানুভূত বাসনার (impression) পরিপাকের (maturation) ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ পীত শঙ্খের জ্ঞান পূর্বানুভূত শ্বেত শঙ্খের বাসনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।—কমলশীল এইখানে ভারতীয় দর্শনে বহুবিচারিত এক সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভাষা এখানে এত সংক্ষিপ্ত যে কোন স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

ইহার পরেই শান্তরক্ষিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বৈশেষিক মত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈশেষিকগণ বলিয়া থাকেন :—

অবেদকাঃ পরস্যাপি স্ববিদ্ভাজঃ কথং নু তে।
একার্থাশ্রিতবিজ্ঞানবেদ্যাস্ত্বেতে ভবন্তি চেৎ ॥ ১৩৩১ ॥

অর্থাৎ, বৈশেষিকদিগের মতে সুখাদি জ্ঞানস্বভাবই নহে। সুখাদি যে কেবল স্বসংবেদনে অসমর্থ শুধু তাহাই নহে, বাহ্যার্থ সংবেদনেও তাহা সমভাবেই শক্তিহীন। তথাপি সুখাদির অনুভূতি ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান একই আত্মায় সমবেত হওয়ায় সুখাদির সংবেদন সম্ভব হইয়া থাকে।

কিন্তু বৈশেষিকদিগের এই মত প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। বাস্তব জগতে দেখা যায় যে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সু াদির অনুভূতি ঘটিতেছে। এ ক্ষেত্রে সুখাদির সহিত সমাশ্রয়ী অপর কোন্ জ্ঞানের দ্বারা সুখাদি সংবিদিত হইবে? সুখাদি যে দৃষ্টিজ্ঞানাদির দ্বারা সংবিদিত হইতে পারে না তাহা সুস্পষ্ট, কারণ সেই প্রকার জ্ঞানের অবলম্বন হইল বাহ্য, এবং সুখাদি হইল অন্তঃসংবেদ্য এবং সেইজন্যই তাহার কেবল মানস সংবেদনাই সম্ভব। ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই যে মানস সংবিত্তি সম্ভব হইবে তাহাও নহে, কারণ বৈশেষিকগণই বলিয়া থাকেন যে জ্ঞানাবলী ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈশেষিক যদি বলেন যে জ্ঞানাবলীর উৎপত্তিই হইল তাঁহাদের মতে ক্রমিক, বিবিধ জ্ঞানের সহভাব স্বীকার করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, তবে উত্তর এই যে ক্ষণিকত্ববশতঃ উৎপন্ন বস্তু যখন ক্ষণকালের অধিক স্থায়ী হইতে পারে না তখন চিত্তে একাধিক উৎপন্ন জ্ঞানের সহভাব স্বীকার করা যায় না।

বৈশেষিক মত সত্য হইলে আহ্লাদ, পরিতাপ প্রভৃতির স্পষ্ট প্রতিভাসও সম্ভব হইবে না, কারণ আহ্লাদ ও পরিতাপ সবিকল্প জ্ঞানের বিষয় হইলেও বৈশেষিক বলিয়া থাকেন যে এই সমস্তই সেই একই মানস চেতনার দ্বারা সংবিদিত হইয়া থাকে। আমাদের মতে কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিতে বুঝায় সেই জ্ঞান যাহার মুখ্য কারণ হইল জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষণে উৎপন্ন বিষয়ের অবধারক ইন্দ্রিয়জ্ঞান, এবং যাহার সহকারী* কারণ হইল এই ক্ষণের অব্যবহিত পরবর্তী ক্ষণে উৎপন্ন অন্য বিষয়ের জ্ঞান।

সুখাদির জ্ঞান যদি বাস্তবিকই গ্রাহ্য হইত তবে তাহাদের প্রতিভাসও বিচ্ছিন্নরূপেই ঘটিত—নীলাদির যেমন হইয়া থাকে। কিন্তু বাহ্য বাস্তবিক জ্ঞান হইতে সুখাদি বুদ্ধি পৃথক্

---

* এখানেও কমলশীলের ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য :—অস্মাভিস্তু স্ববিষয়ানন্তরবিষয়সহকারিণেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন জনিতস্যৈব প্রত্যক্ষত্বেনাভ্যুপেতত্বাৎ।

হইলে কোন বস্তুকেই সুখকর বা অসুখকর বলিয়া বোধ হইত না। যদি বলা হয় যে বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে পৃথক্ এই প্রকারের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি ভ্রান্তি মাত্র, তবে স্বীকার করা হইবে যে সুখাদি প্রকৃত পক্ষে স্বসংবিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কারণ সুখকরত্বাদি ভিন্ন সুখাদির অপর কোন লক্ষণ নাই। এতদ্দ্বারা স্বীকার করা হইবে যে সুখাদিই হইল জ্ঞানের স্বরূপ, অর্থাৎ সুখাদি জ্ঞানস্বভাব।—অনুরূপ আরও কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া শান্তরক্ষিত বৈশেষিককে এই চরম উত্তর দিলেন যে সুখাদির জ্ঞান হইতে পৃথক্ সুখাদির কোন অনুভূতি নাই, সুখাদির জ্ঞানই হইল সুখাদির অনুভূতি। এই কথার বিরুদ্ধে কিন্তু শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন :—

সুখাদীত্যেব গম্যন্তে সুখদুঃখাদয়ো ন তু।
জ্ঞানমিত্যেব গম্যন্তে তন্ন জ্ঞানং ঘটাদিবৎ ॥ ১৩৪০ ॥

অর্থাৎ, সুখাদি কেবল সুখাদি রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে, কখনও তাহা সুখাদির জ্ঞান বলিয়া অনুভূত হয় না। সুতরাং সুখাদি ঘটাদির মত, কেবল মাত্র জ্ঞান নহে।—শঙ্করস্বামীর এই কথার ঠিক উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে শান্তরক্ষিত কিছু ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, শব্দসঙ্কেত পরিবর্তন দ্বারাই যদি বস্তুস্বভাবও পরিবর্তন করা যাইত তাহা হইলে অজ্ঞানকেও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করার ব্যবস্থা করিলেই অজ্ঞানও জ্ঞান হইয়া পড়িবে!—ইহার পরেই শান্তরক্ষিত প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল সম্বন্ধে নানাবিধ মতের আলোচনা করিয়াছেন :—

প্রমেয়ার্থ যখন বাহ্য তখন সেই বাহ্যার্থের অধিগমই হইল প্রমাণফল এবং জ্ঞান ও বাহ্যার্থের সারূপ্যই হইল প্রমাণ। স্বসংবিত্তিতেও প্রমাজ্ঞান ও প্রমেয় বস্তু সমরূপ। কিন্তু প্রমেয় স্বয়ং যখন জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে তখন স্বসংবিত্তিই হইল প্রমাণফল এবং যোগ্যতা হইল প্রমাণ; এখানে যোগ্যতা বলিতে বুঝাইতেছে স্বব্যাপারের প্রতীতি উৎপন্ন করিবার সহজাত যোগ্যতা (সব্যাপারপ্রতীতত্বমুপাদায় জ্ঞানস্যৈব সা তাদৃশী যোগ্যতা)।

যাঁহারা বলেন যে প্রমাণফল প্রমাণ হইতে পৃথক্ তাঁহাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন যে প্রমাণ এবং তৎফলের ভেদ স্বীকার করিলে আরও স্বীকার করিতে হয় যে প্রমাণ ও ফলের বিষয়ও বিভিন্ন। কিন্তু তাহা অসম্ভব, পরশুদ্বারা খদির বৃক্ষছেদন করিলে কি কখনও পলাশবৃক্ষ ছিন্ন হয়? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে প্রমাণ (means of cognition) এবং প্রমাণফলের (result of cognition) বিষয় অভিন্ন, এবং অভিন্নবিষয় হওয়ায় প্রমাণ এবং প্রমাণফলও অভিন্ন। বৌদ্ধের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া কুমারিল বলিয়াছেন :—

বিষয়ৈকত্বমিচ্ছংস্তু যঃ প্রমাণং ফলং বদেৎ।
সাধ্যসাধনয়োর্ভেদো লৌকিকস্তেন বাধিতঃ।

অর্থাৎ, প্রমাণ ও প্রমাণফলের একবিষয়ত্ব প্রতিপাদনে অভিলাষী হইয়া যিনি প্রমাণকেই প্রমাণের ফল বলিয়া অভিহিত করেন তিনি কার্য ও কারণের মধ্যে যে লোকপ্রসিদ্ধ পার্থক্য আছে তাহাই নষ্ট করিয়া ফেলেন।—কুমারিলের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত এইবার বলিতেছেন :—

ন ব্যবস্থাশ্রয়ত্বেন সাধ্যসাধনসংস্থিতিঃ।
নিরাকারে তু বিজ্ঞানে সা সংস্থা ন হি যুজ্যতে ॥ ১৩৪৬ ॥

অর্থাৎ কার্য ও কারণের প্রভেদ যে এই প্রকারের ব্যবস্থিত প্রভেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাহা নহে; বিজ্ঞান যখন নিরাকার তখন এই প্রকারের ভেদব্যবস্থা সম্ভবই হইতে পারে না।—নীলকে যে পীত বলিয়া মনে হয় না তাহার কারণ অর্থসারূপ্য (analogy ?) ভিন্ন আর কিছুই নহে, কার্য ও কারণের ভেদও সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থাপ্য ও ব্যবস্থাপকের ভেদ; উৎপাদ্য ও উৎপাদকের সম্বন্ধ ইহাদের মধ্যে সম্ভব নহে, কারণ ক্ষণিকত্ববশতঃ সর্ব ধর্মই যখন নির্ব্যাপার তখন কর্তৃভাব বা করণভাব স্বীকারই করা যায় না। জ্ঞান যখন জ্ঞেয় বিষয়ের আকারে উদ্ভূত হয় তখন তদ্দ্বারা জ্ঞেয় বিষয়টি পরিচ্ছিন্ন হইতেছে মনে হয় বলিয়াই লোকে ভ্রান্তিক্রমে মনে করে যে উহা সব্যাপার। গ্রাহ্য বিষয়কে এইভাবে গ্রহণীয় রূপে উপস্থাপিত করাই হইল জ্ঞানের কার্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ার্থের মধ্যে কেবল যে অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান তাহা নহে। সুতরাং একথা ঠিক্ নহে যে স্বয়ং জ্ঞানই প্রমাণ। জ্ঞান ও প্রমাণের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দিবার জন্য এই কারণেই বলা হয় যে নিরাকার জ্ঞান প্রমাণ নহে, সাকার জ্ঞানই প্রমাণ।—প্রমাণ ও প্রমাণফল যে পৃথক্ নহে তাহা বুঝাইবার জন্য শান্তরক্ষিত একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একই অর্থ বুঝাইবার জন্য লোকে কখনও প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ করিয়া বলে "ধনুর্বিধ্যতি", কখনও তৃতীয়া বিভক্তি প্রয়োগ করিয়া বলে "ধনুষা বিধ্যতি", কখনও বলে "ধনুষো নিঃসৃত্য শরো বিধ্যতি" ইত্যাদি। বিভিন্ন বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেও এই সকল বাক্যে অর্থের কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন প্রমাণ ও প্রমাণফল হইল প্রকৃতপক্ষে প্রমার তৃতীয়া ও দ্বিতীয়া বিভক্তি; সুতরাং এতদ্দ্বয়েরই বা অভিন্নত্ব সম্ভব হইবে না কেন?

কুমারিল বলিয়াছেন যে প্রমাণ হইল উৎপাদক এবং প্রমাণফল হইল উৎপাদ্য। এ-কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কারণ আচার্য (দিগ্নাগ ?) বলিয়া গিয়াছেন, "প্রত্যক্ষের কারণ চক্ষুরাদিতে প্রত্যক্ষত্বের উপচার অযৌক্তিক নহে।" আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাই তাহা এই:—সাধ্য ও সাধনের যে ভেদ তাহা অবশ্যই আদিতেই ব্যবস্থিত কোন ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, কেবল বিষয়ভেদ অনুযায়ী বুদ্ধিভেদ স্বীকার করা যাইবে না; এবং বিভিন্ন বুদ্ধির মধ্যে যে ভেদ তাহা নির্ধারণ করিবার একমাত্র ভিত্তি হইল সারূপ্য (অর্থাৎ, সমরূপ চেতনাবলী একত্র সমন্বিত হওয়ার ফলে যেগুলি ভিন্নরূপ সেগুলিও আপনা হইতেই ধরা পড়িয়া যায়, কারণ বিবিধ সামগ্রীর কোন স্তূপ হইতে সমজাতীয় বস্তুগুলি একত্র করা বা বিজাতীয় বস্তুগুলি পৃথক্ করা একই কথা)। ইহা হইতে সামর্থ্যক্রমে (by implication) বুঝিতে পারা যায় যে সারূপ্যই হইল পাণিনি যাহাকে বলিয়াছেন "সাধকতমং করণম্" (the most efficient cause), এবং এই সারূপ্যের দ্বারা সুনির্ধারিত বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই মানুষ স্ব স্ব কর্মে প্রবর্তিত হয়। এবং

প্রমাণই যে মানুষকে কর্মে প্রবর্তিত করিয়া থাকে তাহা সেই লোকেই বুঝিতে পারে যাহার কর্মে প্রবৃত্তি আছে। কথিত আছে যে প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তি মাত্রেই সার্থক কর্মের অনুরোধে সকল ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন কোন্ বস্তু প্রমাণ এবং কোন্ বস্তু অপ্রমাণ। সুতরাং জ্ঞানের যে অংশ মানুষকে কর্মে প্রণোদিত করে কেবল সেই অংশই অনুসন্ধেয়। কিন্তু প্রমাণ ও প্রমাণফলকে উৎপাদক ও উৎপাদ্য জ্ঞান করিয়া পৃথক্ বলিয়া মনে করিলে আর সেই সারূপ্যটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যাহা মানুষের কর্মপ্রণোদনার কারণ। সুতরাং প্রমাণ ও প্রমাণফলের মধ্যে যে পার্থক্য করা হইবে তাহাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

স্বধর্ম

অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী**, শাস্ত্রী, স্মৃতি-মীমাংসা-তীর্থ, এম্. এ.

বেদপ্রতিষ্ঠ হিন্দুসমাজে মূলতঃ ধর্মের আদর্শ ও প্রেরণাই ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেইজন্য উহাকে ধর্মাশ্রিত সমাজ বলা হয়। কোন পদার্থের স্বরূপ বা স্বভাবে স্থিতিই তাহার ধর্ম। জলের যাহা স্বভাব—যাহাকে দেখিয়া বা বুঝিয়া জলকে জল বলিয়া চিনিতে পারি তাহাই জলের ধর্ম। স্বভাব-রক্ষক বা 'ধারক' বলিয়াই তাহাকে ধর্ম বলা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির পশ্চাতেও এই স্বভাবশক্তি ক্রিয়া করিতেছে। কারণ এই ধর্ম বা নিসর্গনীতি (Natural law)[১] সৃষ্টিসত্তাকে নিরন্তর রূপ, প্রকাশ, শক্তি ও বিকাশের মহিমায় মণ্ডিত করিতেছে[২]।

Divine Reason বা ঐশ্বরী প্রজ্ঞার সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। তাই বৈদিক ঋষির কল্পনায় বিশ্বপ্রকাশ ও সৃষ্টিরক্ষার মূলীভূত শক্তি একাধারে 'ঋত', 'সত্য' ও তপশ্চৈতন্যে আবির্ভূত।

'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত'—ঋ. বে. ১. ১৯০. ১

ইহার প্রধানতঃ দুই বৃত্তি—স্বভাব পরিপালন ও শাশ্বত সামঞ্জস্য বা ছন্দঃ সংস্থাপন। অতএব 'ঋত' বলিতে এক কথায় যাহা eternal ordering principle বা শাশ্বত নিয়ামক

---

১ Natural law-এর তত্ত্ব সম্বন্ধে Korkunov-এর Theory of Law (Modern Legal Philosophy Series, IV) পৃঃ ২৩—২৭ দ্রষ্টব্য।

২ মহানারায়ণ উপনিষদ্ বলেন—'ধর্মো বিশ্বস্য প্রতিষ্ঠা।' (২২.১)

শক্তি৩। এই ঋত বা বিশ্বনিয়ামক শক্তি আছে বলিয়াই সূর্য একই নিয়মে দেয় কিরণ, চন্দ্র একই নিয়মে দেয় জ্যোৎস্নার আলোক৪ ও বায়ু একই নিয়মে দেয় স্নিগ্ধ স্পর্শ। বৈদিক ঋষি যথার্থই বলেন—

'ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে ঋতায় ধেনু পরমে দুহাতে'—ঋ. বে. ৪. ২৩. ১০

উহা বিশ্বসত্তার স্বভাব স্থাপন করিয়া শৃঙ্খলা ও কল্যাণ সাধিত করে। লোকস্থিতি ইহাকে আশ্রয় করিয়াই 'অভ্যুদয়' ও 'নিঃশ্রেয়সের' পথে অগ্রসর হয়। এই ধর্ম অবশ্যই ঈশ্বর-প্রণিহিত শ্রেয়ঃস্বরূপ ও সত্যপ্রাণ। 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ্' এই তত্ত্বটীকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :—

স নৈব ব্যভবত্তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মং—তদেতৎ ক্ষত্রস্য ক্ষত্রং যদ্ধর্মস্তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্তি। * * যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ'—(বৃ. আ. উ. ১. ৪. ১৪.)৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিবার পরও কিসের অভাবে যেন ব্রহ্মা নিজেকে শক্তিশালী মনে করিতে পারিতেছেন না—'তাই তিনি তেমন শক্তিশালী হইতে পারিলেন না; অতএব শ্রেয়ঃস্বরূপ ধর্মের সৃষ্টি করিলেন, উহা ক্ষত্রকুলের ক্ষত্র,—এই ধর্মের উপরে শ্রেষ্ঠ বা শক্তিশালী আর কিছুই নাই এবং যাহা ধর্ম নিশ্চয়ই তাহা সত্য।'

হিন্দুব কল্পনায় ধর্মের শাসন মানিয়া বিশ্বপ্রকৃতি নিরন্তর আপনার লক্ষ্যপথে চলিতেছে। অতএব ধারণ, রক্ষণ, পোষণ, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের শক্তিপদ্ধতি লইয়াই ধর্মের ধর্মত্ব৭। ধর্ম বিশ্বসত্তার রূপকে প্রকাশিত করে, স্বরূপে তাহাকে স্থাপিত করে এবং তাহার বিকাশ বা উর্ধ্বগ পরিণতির পথে ইহাকে পরিচালিত করে। তাই মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—

'অত্র নিঃশ্রেয়সং যন্নস্তদ্ব্যায়স্ব পিতামহ।
তৎপ্রভাবসমুত্থোঽসৌ স্বভাবো নো বিনশ্যতি॥'—

মহাভারত, শান্তি, ৪৯. ২৯

'হে পিতামহ, আপনি সেই নিঃশ্রেয়েসের কথা বলুন যাহার প্রভাব হইতে উৎপন্ন আমাদের "স্বভাব" বিনষ্ট না হয়।'

---

৩ শ্রীরাধাবিনোদ পাল-কৃত Hindu Philosophy of Law গ্রন্থে (Chs. II-III.) ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৪ দ্রষ্টব্য :— 'ঋতেনাদিত্যাস্তিষ্ঠন্তি দিবি সোমোঽধিশ্রিতঃ'—অথর্ব বে. ১৪. ১. ১

'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥'—ঋ. বে. ১০. ১৯০. ৩

৫ দ্রষ্টব্য :— 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—ঋ. বে. ১. ৯০. ৬

৬ বৃ. আ. উ. ১. ৪. ১১—১৪ দ্র°।

৭ শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রীর Hindu Conception of Law (Calcutta Review, Nov. 1938) প্রবন্ধে ইহার আলোচনা আছে।

ঋত বা ধর্মের এই উচ্চ আদর্শ প্রাচীন ভারতের চিন্তাজগতে একটী অমূল্য সম্পদ্। ইহার প্রভাব কম নয়;—গ্রীস ও রোমের পরবর্তী যুগের দার্শনিক নীতিতত্ত্বেও ইহার দান স্বীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডক্টর 'বিরোজিমর' (Berolzheimer) বলেন—

"That closely connected with the religious and the philosophical views of the Vedic Aryans are certain fundemental positions in regard to the philosophy of law, which in turn became the antecedents of later legal and ethical developments among the Greeks and Romans" – Modern Legal Philosophy Series, Vol. II, Page, 37.

অর্থাৎ—'বিধিব্যবস্থা' বা law-এর দার্শনিকতা বিষয়ে বৈদিক আর্যবৃন্দের ধর্ম ও দার্শনিক মতের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ এমন কতকগুলি মূল সূত্র আছে যাহা গ্রীক্ ও রোমকদিগের মধ্যে যথাক্রমে পরবর্তী কালের আইনগত ও নীতিগত চিন্তা বিকাশের পূর্ববর্তী উপাদান রূপে (গৃহীত) হইয়াছিল।' ঋত বা ধর্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন—

"We may recall, to the Vedic Aryans the central philosophic conception of organized nature was **'rita'**, which included the natural and human order. A closely related conception was **Dharma**." (Ibid, page, 97).[৮]

হিন্দুরা চিন্তা করিয়াছেন মানবজীবন তাহার সমগ্রতায় একটা organised whole বা অঙ্গাঙ্গিভাবে সংহত এক বস্তু। তাহার ব্যষ্টিক ও সমষ্টিগত জীবনের সহিত যাহা কিছু ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত সবই এক ধর্মের নিয়মে মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত। মহাভারতে ভীষ্ম বলিয়াছেন—ধর্মই পরস্পরকে একদিন শৃঙ্খলার আবেষ্টনে রক্ষা করিয়াছিল—

'ন বৈরাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্॥'—শান্তিপর্ব, ৪৯. ১৪.

ভারতীয় সমষ্টি-জীবন ও ব্যষ্টি-জীবন বর্ণ ও আশ্রম বিভাগের ধর্মনীতিতে নিয়ন্ত্রিত। **Status quo** বা স্বরূপে স্থিতিই বর্ণাশ্রমধর্মের মূল লক্ষ্য। হিন্দুর ধর্ম যে কেবল উপাসনা পদ্ধতির কয়েকটী মূল সূত্র বা অনুশাসন তাহা নহে। বাস্তব সমাজ জীবনের যথার্থ বিকাশের উপযোগী প্রত্যেক কর্মপদ্ধতির সহিত ইহার সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন। মহামতি 'হ্যাভেল' (Havell) বলেন—"Religion in India is hardly a dogma but a working hypothesis of human conduct adapted to different stages of spiritual developments and different conditions of life." দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত ইহার অতি নিকট সম্পর্ক আছে।

---

৮ ইহার মর্মার্থঃ—'আমরা মনে করিতে পারি, সুসংহতভাবে গঠিত নিসর্গের যে দার্শনিক তত্ত্ব বৈদিক আর্যগণের নিকট তাহা 'ঋত'। প্রাকৃতিক ও মানবীয় জীবনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ধর্মতত্ত্বের সহিত ইহার নিবিড় সম্পর্ক।'

কাজেই হিন্দুধর্মের প্রবাহ প্রাণহীন বা শুষ্ক হইয়া যায় নাই। এবং সে সম্পর্কের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মে। বাস্তবিক বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে বাদ দিয়া হিন্দুর ধর্মনীতিকে যথার্থভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কি শাস্ত্রীয় উপাসনাপদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় শাসনপদ্ধতি বা দণ্ডনীতি, কি আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনের আচার ব্যবহারের রীতি—সমস্তই মূলতঃ বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্ভুক্ত। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচারে ইহার স্বরূপ ও তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে এবং এই ধর্মকে বিদ্বজ্জন 'আত্মহৃদয়ের অভ্যনুজ্ঞায়' শ্রেয়স্কর বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। মনু বলেন—

'বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তন্নিবোধত ॥—২. ১
বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥'—২. ৫

পূর্বপ্রবন্ধে[৯] আমরা বর্ণবিভাগ বৈশিষ্ট্যের কথা কিছু আলোচনা করিয়াছি। স্বাভাবিক গুণ-কর্ম-বিভাগ অনুসারে[১০] ইহা ভারতীয় সমাজশরীরের মূল চারিটী শ্রেণীবিভাগ। এই নৈসর্গিক শ্রেণীবিভাগ নীতির বিকাশ কোন না কোন পদ্ধতিতে সকল সমাজেই যে ঘটিয়াছে, তাহার প্রমাণ বিরল নহে। চারি শ্রেণীর বিভিন্ন স্বকীয় শক্তির মূল বৈশিষ্ট্য এই যে—ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রজ্ঞানের শক্তি, ক্ষাত্র অর্থাৎ শৌর্য ও বীর্যের শক্তি, বৈশ্য অর্থাৎ ধন ও সম্পৎশক্তি এবং শৌদ্র অর্থাৎ শারীর শ্রমশক্তি। ঋষির অন্তরাত্মায় এই নৈসর্গিক বিভিন্ন সমাজ শক্তির বৈশিষ্ট্য অতি উজ্জলপ্রভায় প্রতিভাত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বিশ্বব্যাপ্ত বিরাট্ পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গের রূপকচ্ছলে চাতুর্বর্ণ্যের এই আদর্শ এমনভাবে মূর্ত হইয়াছে, যাহার তুলনা অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ।

'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥'—ঋ. বে. ১০. ৯০. ১২

ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ পুরুষসূক্তকে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার প্রমাণ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহাদের মতে বৈদিক যুগের শেষ ভাগে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার সময় ভারতীয় চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ প্রথম স্থাপিত হয়। আমরা এই ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেবল সমাজতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই রূপকটীর মূলগত উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদির কর্মগত স্বরূপের পরিচয় অতি প্রাচীন সূক্তেও দৃষ্ট হয়[১১] এবং দেবলোক সম্বন্ধেও এইরূপ ব্রাহ্মণাদিক্রমে বর্ণ বিভাগের নীতি বৈদিক ঋষির পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

মস্তক, বাহু, ঊরু ও চরণ—ইহারা সকলই এক দেহের বিভিন্ন অঙ্গ। সকল

---

৯ 'শ্রীভারতী' (বৈশাখ, ১৩৪৮,) পৃ° ৫৫৯–৬২ দ্র°।

১০ 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—গীতার (৪. ১৩) এই উক্তি এ বিষয়ে সারগর্ভ প্রমাণ।

১১ ঋ. বে. ৮. ২৫. ৪. দ্র°—'ঋতবানা নিষেদতু সাম্রাজ্যায় সুক্রতু। ধৃতব্রত ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ ॥'

অঙ্গ লইয়া যেরূপ দেহের পরিপূর্ণতা তদ্রূপ এই অঙ্গগুলির প্রতীক ব্রাহ্মণাদি বর্ণনিচয়কে লইয়া সমাজদেহের পরিপূর্ণতা। গুণভেদে কর্মের ভেদ যাহাই হউক না কেন, দেহের এই অঙ্গগুলির মধ্যে যে কোন একটী যদি তাহার নিজের কর্মভাগ ত্যাগ করে বা দুর্বল ও রুগ্ন হয়, তাহা হইলে যেমন সমগ্র দেহের অপূর্ণতা—তেমনি চতুর্বর্ণ সমাজের কোন শ্রেণী যদি তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করে তবে সমগ্র সমাজ দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় হইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। দেহের কোন অঙ্গই তুচ্ছ নয়—সকলেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধিকার ও স্বধর্ম রহিয়াছে। বর্ণবিভাগ ধর্মেও এই সত্য নিহিত আছে। পরস্পরের সহায়তায় পরস্পর সকল কর্ম ও ব্যবহারের স্ব-স্ব ভাগ নিষ্পন্ন করিবে। অপরকে ক্ষীণ ও দুর্বল না করিয়া নিজ নিজ অধিকার সীমায় স্থিত হইয়া চতুর্বর্ণসমাজ সুখ, শান্তি ও সামঞ্জস্যে যাহাতে সমাজদেহের রক্ষা বিধান করে, স্থিতি সাধিত করে ও কল্যাণভূয়িষ্ঠ পরিণতির পথ আয়ত্ত করে—এই স্পষ্ট ইঙ্গিত পুরুষসূক্তের মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে।[১২] মনুও বলিয়াছেন—

'সর্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্কর্মাণ্যকল্পয়ৎ॥'—১. ৮৭

অর্থাৎ—'সমুদায় সৃষ্টি যাহাতে রক্ষা পায় সে জন্য সেই মহাতেজাঃ (স্রষ্টা পুরুষ) মুখ, বাহু, উরু ও পদজাত চতুর্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসকল নির্দেশ করিয়া দিলেন।' ইহা নৈসর্গিক নীতিতে সামাজিক কর্মবিভাগ কিন্তু সকলের কর্মই অপরের কর্মের সঙ্গে পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ। সত্য বটে—ব্রাহ্মণ জ্ঞানবলে মুখ বা মস্তিষ্কস্থানীয়, ক্ষত্রিয় শৌর্য-বলে বাহুস্থানীয়, বৈশ্য ধন-বলে সমাজদেহকে অন্যূন্য ও দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখে বলিয়া উরুস্থানীয় এবং শূদ্র শ্রম ও সেবাবলে চরণস্থানীয়। কিন্তু নিজেদের এই বল নিজেদের স্বার্থপুষ্টি বা পরার্থ-অপহৃতির জন্য নয়। উহা বিশ্ব সমাজের মঙ্গলে যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনরূপ ধর্মপালনের জন্য এবং এই মহাধর্ম-পালনের ব্রত উদ্‌যাপনে সকলেই সকলের সহায় ও সহযোগী। ইহাই স্বধর্মপরিপালন। এই মহাব্রতের মর্যাদা রক্ষায় লৌকিক অপবাদ এমন কি শরীরপাত বরণীয়। মহাভারতে বেদব্যাস বলিয়াছেন—

'স্বধর্মে বর্তমানস্য সাপবাদেঽপি ভারত।'[১৩]

গীতা আরও দৃঢ়ভাবে বলেন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরো ধর্মো ভয়াবহঃ॥'—৩. ৩৫

কারণ তাহাতে মর্ত্য দেহের নাশ হইলেও অমর্ত্য আত্মার অধঃপতন হয় না। অন্যথায়

---

১২ শ্রীকালিপ্রসন্ন দাশ 'হিন্দুসমাজ-বিজ্ঞান' গ্রন্থে ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। (১৬৭—৭০ পৃ° দ্র°)।
১৩ মহাভারত, শান্তি, ৩২. ২১

চরম অধোগতি। 'স্বধর্মস্য পরিত্যাগঃ পরধর্মস্য চ ক্রিয়া'[১৪]—ইহার মত পাপ বা ধ্বংসের শক্তি আর কোথাও নাই।

কর্ম ধর্মের বহিঃস্বরূপ। সত্ব, রজঃ ও তমঃ ইত্যাদি গুণভেদে কর্ম বৈষম্য স্বভাবসিদ্ধ। স্বভাবের সকল গুণ ও সকল শক্তি সকলের মধ্যে সমানভাবে বিকাশ পায় না। এই বৈষম্যের জন্য অবশ্য জীবের আত্মকৃত কর্মই দায়ী। অনাদিকাল হইতে যে যেরূপ কর্ম করিয়া আসিতেছে সে সেইরূপ ফল বা অধিকার অর্জন করিয়াছে। বৃহদারণ্যক বলেন—

'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন'—৩. ২. ১৩

কঠোপনিষদে উক্ত হয়—

'যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥'[১৫] —২. ২. ৭

'ছান্দোগ্য উপনিষদ্' স্পষ্ট বলিয়াছেন—'জীব শুভকর্মের তারতম্যভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি উচ্চ যোনি ও অশুভ কর্মবশতঃ পশু প্রভৃতি নীচ যোনি লাভ করে।'[১৫] কার্য-কারণভাবের মর্যাদা স্বীকার করিতে হইলে এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। জন্মান্তর নীতি এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্ব-স্ব-অধিকার লাভ করিয়া যদি মানব সমাজ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মের বা ধর্মের অনুশীলন না করে তাহা হইলে তাহার স্বধর্ম ভ্রংশ হয়। এবং তাহাতে নিজের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ ও বিশ্বের কল্যাণ প্রতিহত হয়। প্রারব্ধ বা শরীর আরম্ভক অদৃষ্টের নাশ না হইলেও পূর্বার্জিত বা প্রাক্তন সঞ্চিত অদৃষ্টের ক্ষয় সাধনে মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে ও নির্দিষ্ট জীবনের স্বধর্মানুগ কর্ম পদ্ধতির দ্বারাই সে অধিকারের সার্থকতা প্রকাশ পায়। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্মের মর্যাদা পালনই সে কর্মপদ্ধতির মূল তত্ত্ব। ধর্মস্থাপক ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন বর্ণের উপযোগী কর্মের রীতি ও অধিকারের যে সীমারেখা নির্দেশ করিয়াছেন, সকলেই যাহাতে স্ব-স্ব-অধিকার সম্মত কর্মসম্পাদনে সমাজ ও বিশ্ব-সংহতি স্থাপিত করে, এই সামঞ্জস্যই (balance) তাঁহারা চাহিয়াছিলেন এবং উহাই চতুর্বর্ণ হিন্দুসমাজের সনাতন ধর্ম। গৌতমও তাই বলেন—'বর্ণাশ্রমাঃ স্ব-স্বধর্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্মফলমনুভূয় ** জন্ম প্রতিপদ্যন্তে'[১৬]—২. ২. ২৯। স্বকর্মনিষ্ঠার অনুশীলন ব্যতীত মানুষের কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। একদিকে মূলতঃ সমাজস্থিতির জন্য যেমন চাতুর্বর্ণ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অপরদিকে ব্যক্তিগত জীবনে মোক্ষাভিমুখ চতুর্বর্গ সাধনার জন্য তেমনি চতুরাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা। অতএব কি সমষ্টিগত, কি ব্যক্তিগত—উভয়ের সমগ্রতায় ও সহায়তায় হিন্দু জীবনের 'স্বধর্মই' বর্ণাশ্রম ধর্ম নামে পরিচিত।

---

১৪ মহাভারত, শান্তি, ৩৪. ১০.

১৫ মনুও বলেন—'শুভাশুভফলং কর্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবম্।
কর্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ॥' (১২. ৩)

১৬ ছান্দোগ্য উপ' ৫. ১০. ৭

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

বাঙালী শৈব সাধু বিশ্বেশ্বর শম্ভু

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ., পি. আর. এস., পি-এচ্. ডি.

এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হইবার পর বঙ্গের বাহিরে অনেক বাঙালী প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ইংরাজ আমলের আদি যুগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রহ্মদেশ এবং উত্তরভারতের একমাত্র জ্ঞান-বিস্তারের কেন্দ্র ছিল, এবং নৈকট্যবশতঃ বাঙালীরাই এই কেন্দ্র হইতে উৎসারিত জ্ঞানালোকের অধিক ফলভাগী হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, একথা মিথ্যা নহে। কিন্তু বাঙালীর প্রতিভাও যে বাঙালীকে প্রতিষ্ঠা লাভে সহায়তা করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকালেও অনেক বাঙালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে বাঙালী মহাপুরুষের কথা বলা হইল, তিনি খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। বিশ্বেশ্বর শম্ভুর ন্যায় কৃতী ব্যক্তি জগতের যে কোন দেশের গৌরবের বস্তু সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ তার এই অদ্বিতীয় সন্তানকে স্মরণ করিয়া রাখে নাই।

অন্ধ্রদেশের অন্তর্গত মল্কাপুর নামক স্থানে একটী শিলাস্তম্ভে ১১৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐ লিপিটীর অক্ষর তেলুগু, কিন্তু ভাষা মূলতঃ সংস্কৃত। উহা অন্ধ্রদেশের কাকতীয়বংশীয়া মহারাণী রুদ্রাম্বা বা রুদ্রম্মর সময়ে লিখিত হইয়াছিল। এই রাণী বিশ্রুতকীর্তি মহারাজ গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। গণপতি ১১৯৯—১২৬১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এবং রুদ্রাম্বা ১২৬১—১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে অন্ধ্রদেশ শাসন করেন। স্তম্ভলিপিটীতে ভাগীরথী ও নর্মদার মধ্যবর্তী ডাহল দেশে অবস্থিত একটী শৈব মঠের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সদ্ভাবশম্ভু নামক এক শৈব সাধু কলচুরি বংশীয় নৃপতি যুবরাজদেবের নিকট হইতে বহু ভূসম্পত্তি ভিক্ষা স্বরূপ লাভ করিয়া এই মঠ স্থাপন করেন এবং ইহার গোলকীমঠ নাম রাখা হয়। সদ্ভাবশম্ভুই গোলকীমঠের প্রথম মোহন্ত। তিনি দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। কারণ পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, কলচুরিবংশে যুবরাজ নামধারী যে দুইজন রাজার কথা জানা যায়, তাঁহারা উভয়েই দশম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সদ্ভাবশম্ভুর পর তদীয় শিষ্য সোমশম্ভু গোলকীমঠের মোহন্ত পদ লাভ করেন। ইনি "সোমশম্ভুপদ্ধতি" নামক শৈবাগম সম্বন্ধীয় একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সোমশম্ভুর ঐ গ্রন্থ হইতেই সম্ভবতঃ "সর্বদর্শনসংগ্রহে" নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

"সোমশম্ভুণাপ্যভিহিতম্।
বিজ্ঞানাকলনামৈকো দ্বিতীয়ঃ প্রলয়াকলঃ।
তৃতীয়ঃ সকলঃ শাস্ত্রেঽনুগ্রাহ্যস্ত্রিবিধো মতঃ॥" (শৈবদর্শন, ২৬ শ্লোক)

সোমশম্ভুর পর মহাপ্রাজ্ঞ বামশম্ভু গোলকীমঠের মোহন্ত হন। তিনি যে কলচুরি-রাজ কর্ণদেবের গুরু ছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কর্ণদেব ১০৪২—১০৭১ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বামশম্ভুর মৃত্যুর শতাধিক বৎসর পরেও কর্ণের উত্তরাধিকারিগণ আপনাদিগকে "বামদেবের চরণাশ্রিত" বলিয়া প্রচার করিতেন এই বামশম্ভুর পর শক্তিশম্ভু, কীর্ত্তিশম্ভু, বিমলশিব, এবং ধর্মশিব বা ধর্মশম্ভু পর পর গোলকীমঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন। বাঙালী শৈবাচার্য বিশ্বেশ্বর এই ধর্মশম্ভুর শিষ্য।

মল্কাপুরের স্তম্ভলিপিটীতে বিশ্বেশ্বরকে বিশ্বেশ্বরশম্ভু, বিশ্বেশ্বরশিব, বিশ্বেশ্বরশিবাচার্য এবং বিশ্বেশ্বরদেশিক বলা হইয়াছে। "দেশিক" কথাটীর অর্থ মোহন্ত। বিশ্বেশ্বর গৌড় দেশের অন্তর্গত রাঢ়ভূমির দক্ষিণাঞ্চলস্থ পূর্বগ্রামে* জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেজন্য কখনও কখনও তাঁহাকে গৌড় চূড়ামণিও বলা হইয়াছে। তিনি একজন সর্ববিদ্যাবিৎ ছিলেন। লিপিটীর অনেকস্থলে, শৈবসিদ্ধান্ত, শৈবাগম বা শৈবরহস্যে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী পণ্ডিত যখন বিদ্যামণ্ডপ অর্থাৎ কলেজ-গৃহে আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার কম্পিত জটাজুট, হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং অংসস্পর্শিমুক্তাকুণ্ডলশোভিত কর্ণযুগলের প্রতি লোকে শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিপাত করিত। এই বাঙালী শৈব আচার্যের বিদ্বাবত্তা এবং তপশ্চর্যার খ্যাতি দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফলে, চোল, ও মালব দেশের রাজগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কাকতীয়রাজ গণপতি ও তৎকালীন কলচুরিরাজ তাঁহাকে দীক্ষাগুরুপদে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

কাকতীয় গণপতি তদীয় গুরুদেব বিশ্বেশ্বরকে মন্দর নামক একটী গ্রাম দান করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই গ্রাম কৃষ্ণানদীর দক্ষিণদিকে বোলিবাড নামক বিষয় অর্থাৎ জিলার কন্দ্রবাটী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। যথারীতি তাম্রশাসনাদি দ্বারা দানসম্পাদিত হইবার পূর্বেই গণপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর গণপতির কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রুদ্রাম্বা সিংহাসন লাভ করিয়া পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী পূর্বোক্ত মন্দরগ্রাম বিশ্বেশ্বরকে দান করেন। মন্দরের সহিত নূতন রাণী বেলঙ্গপুতি নামক অপর একটী গ্রাম এবং কৃষ্ণানদীর গর্ভস্থ কয়েকটী চরও দান করিলেন। রাণীর নিকট হইতে এই ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া বিশ্বেশ্বর সেই স্থানে একটী মঠ এবং সর্বসাধারণের জন্য একটী সত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মঠটীর নাম দেওয়া হইল

---

* রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের যে ঘোষপূর্বগাঁই আছে, ঐ গ্রামটীকে কেহ কেহ মুর্শিদাবাদের সাড়ে তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত পূর্বগ্রাম বলিয়া মনে করেন। এই পূর্বগ্রাম বিশ্বেশ্বরের জন্মভূমি কিনা সন্দেহ, কারণ এ গ্রামটীকে দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত বলা যায় না।

"বিশ্বেশ্বরগোলকী"। এই মঠের মোহন্তরূপে বিশ্বেশ্বর একশত মোহর আচার্য-ভোগ পাইতেন।

স্তম্ভলিপিটীতে বিশ্বেশ্বরের অন্যান্য বহু সৎকার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণিজ্য-ব্যপদেশে সেই অঞ্চলে ষাটজন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; বিশ্বেশ্বর তাহাদিগকে বাসভূমি, গৃহ প্রভৃতি দান করেন এবং উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। মণ্ডর এবং বেলঙ্গপুতি গ্রাম দুইটীকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। উহার প্রথম ভাগ শিবপূজার জন্য উৎসর্গ করা হয়; দ্বিতীয় ভাগ বিদ্যামণ্ডপের ছাত্রগণের এবং বিশ্বেশ্বর-স্থাপিত মঠের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নির্দিষ্ট রহিল; তৃতীয় ভাগটীকে তিন অংশে পরিণত করিয়া তিনটী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হিতার্থে দান করা হইয়াছিল। এই তিনটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটী প্রসূতিশালা, একটী আরোগ্যশালা এবং একটী ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য সত্র। এই প্রতিষ্ঠানত্রয় অবশ্যই বিশ্বেশ্বরগোলকী নামক মঠের সহিত সংযুক্ত ছিল। প্রসূতিশালা এবং আরোগ্যশালার কথায় বোঝা যায় যে, সেই ছয় শত বৎসর পূর্বেও আমাদের দেশে সাধারণের প্রতিষ্ঠিত মাতৃসদন ও হাঁসপাতালের অভাব ছিল না। অবশ্য বাইশ শত বৎসর পূর্বেও এদেশে রাজকীয় হাসপাতাল ও পিঁজরাপোলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহামতি অশোক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি নিজ রাজ্যের সর্বত্র, সাম্রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত সিংহল ও তামিল রাজ্যগুলিতে এবং সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও গ্রীসদেশে মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বোঝা যায়, অশোক বহুসংখ্যক হাসপাতাল ও পিঁজরাপোল স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর-স্থাপিত বিদ্যালয়ের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক ঋক্, যজুঃ এবং সামবেদ অধ্যাপনা করাইতেন। অপর পাঁচজন শিক্ষক পদ (অভিধান), বাক্য (ব্যাকরণ), প্রমাণ (ন্যায়শাস্ত্র), সাহিত্য এবং আগম (শৈবশাস্ত্র) ব্যাখ্যা করিতেন। ঐ বিদ্যালয় সম্পর্কে একজন বৈদ্য ও একজন কায়স্থের উল্লেখ আছে; কিন্তু তাঁহারা কি কাজ করিতেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ বৈদ্যের উপর চিকিৎসার এবং কায়স্থের উপর পুস্তকাদি নকল করিবার ভার অর্পিত ছিল।

বিশ্বেশ্বর-স্থাপিত মঠে 'বিশ্বেশ্বরদেব' নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ লিঙ্গ-দেবতার দশজন নর্তকী, আটজন মাদলবাদক এবং দুইজন তালরক্ষক ছিল। উল্লিখিত সমস্ত লোকই বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে ভূমিদান লাভ করিয়াছিল। অপর যাহারা তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছিল একজন কাশ্মীর-দেশবাসী, চৌদ্দজন গায়িকা, ছয়জন করতাল-বাদক, দুইজন পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন ভৃত্য, মঠ ও সত্রের ছয়জন ব্রাহ্মণকর্মী, চোল-দেশবাসী দশজন জটিল (সাধু) এবং দশজন কারু, নাপিত, শিল্পী ও স্থপতি। এই স্থপতিগণ কেহ স্বর্ণের, কেহ তাম্রের, কেহ প্রস্তরের, কেহ বাঁশের এবং কেহ লৌহের ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন।

বিশ্বেশ্বরের সময়ে সম্ভবতঃ তাঁহার স্বগ্রামবাসী কতিপয় বাঙালী ব্রাহ্মণ অন্ধ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ পূর্বোক্ত লিপিতে দেখা যায়, তিনি রাঢ়দেশের পূর্বগ্রামবাসী কয়েকজন শ্রীবৎসগোত্রীয় সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা মঠের আয়ব্যয় সম্পর্কিত হিসাব রক্ষার কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বিশ্বেশ্বর কালীশ্বর নামক নগরে প্রস্তর দ্বারা একটী মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মন্ত্রকূট নামক অপর কোন নগরে তিনি একটী মঠ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কতকগুলি গুহানিবাস এবং নন্দপদ নামক অঞ্চলে নিজ নামে একটী নগর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মল্কাপুরের লিপিতে, কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাঞ্চলে বিশ্বেশ্বর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এইরূপ বহু লিঙ্গ, মঠ ও নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, আজ ছয়শত বৎসর পরে উহাদের অধিকাংশেরই স্থাননির্ণয় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

---

(২)

জন্মাষ্টমী

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল.

যে অষ্টমী তিথিতে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল, উহার নাম জন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির রাত্রিকালে বাসুদেব-পত্নী দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই তিথি ব্রহ্মপুরাণে এইভাবে লিখিত হইয়াছে—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কালৌ যুগে।
অষ্টাবিংশতিতমে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥"

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আবার আর একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে নিশীথকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

যথা—

"প্রাবৃটকালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপস্যসি॥"

ভগবান্ মহামায়া দেবীকে বলিতেছেন যে, আমি বর্ষাকালে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমীতিথিতে আবির্ভূত হইব, আর তুমি তার পরদিন নবমী তিথিতে আবির্ভূত হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রাবণ ও ভাদ্র উভয় মাসই শ্রীকৃষ্ণের জন্মমাস হইতেছে। কিভাবে ইহার সমাধান হইতে পারে? জ্যোতিষ্কগণনার মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র ভেদ দ্বারা

ইহার সমাধান করিতে হইবে। যে সময় মুখ্যচান্দ্র শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী, গৌণচান্দ্র ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী হইয়া থাকে; সে সময় ভিন্ন ভিন্ন বচনে ভিন্ন ভিন্ন মাসের উল্লেখ যে থাকিবে তাহা সঙ্গত। যাহা হউক, সাধারণতঃ ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী, তিথিই জন্মাষ্টমী। স্মার্তদিগের মতে যেদিন রাত্রে অষ্টমী তিথি থাকে সেই দিনই জন্মাষ্টমী-ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবদিগের মতে যদি সেদিন প্রাতঃকালে সপ্তমী তিথি থাকে, তবে পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু তিথি অনুযায়ী (অর্থাৎ চান্দ্রমাস অনুযায়ী) ইহার দিন নির্দিষ্ট হয়, সেজন্য কোন বৎসর সৌর ভাদ্রমাসে এবং কোন বৎসর সৌর শ্রাবণমাসেও (যেমন বর্তমান বৎসরে) জন্মাষ্টমী হইয়া থাকে। ঐদিন অর্ধরাত্রসময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় কংস রাজার কারাগারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ঐদিন জন্মাষ্টমীব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রতের নিয়ম ও ফল বিভিন্ন পুরাণে বিশদ্ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ঐদিন পিতৃতর্পণাদিব বিধান আছে। স্কন্দপুরাণমতে এই ব্রতে ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ হইযা থাকে। আবার এই তিথি যদি নিশীথ সময়ের পূর্বদণ্ডে বা পবদণ্ডে সামান্য সমযের জন্যও রোহিণী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হয়, তবে উহার নাম জয়ন্তীযোগ। উহাতে উপবাসাদিব অধিকতর ফললাভ কীর্তিত হইয়াছে। জয়ন্তীব্রতের অন্যনাম রোহিণীব্রত। ভবিষ্যপুবাণ ও ভবিষ্যোত্তরপুবাণে জন্মাষ্টমী দিবসে পূজা ও উপবাসাদিব বিধি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে, সেজন্য তাহার বিষয় বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

---

(৩)

কবি গোবিন্দদাস

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য এম্. এ., কাব্যতীর্থ

কবি গোবিন্দদাসের নামের অন্তরালে কত আধুনিক ও প্রাচীন কবির প্রতিভা লুকায়িত রহিয়াছে তাহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আজ বিশেষ আলোচনার বিষয়। গোবিন্দ দাস ঝাঁ।[১] একজন বিখ্যাত মৈথিলী কবি ছিলেন। ইঁহার উপাধি ছিল 'কবিরাজ'।

---

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৈথিলী ভাষায় অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র মহাশয় বলেন যে আজ পর্যন্ত গোবিন্দ দাস ঝাঁর বাস্তু ভিটা বর্তমান রহিয়াছে ও মিথিলায় উহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। Grierson সাহেবও এইমত পোষণ করেন। তাঁহার 'Linguistic S urvey of India'র মধ্যে গোবিন্দ দাস ঝাঁ মৈথিল কবি রূপে পরিচিত। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' হইতে প্রকাশিত নগেন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি পদাবলীর মধ্যে মৈথিল কবি গোবিন্দ দাস ঝাঁর রচিত বিদ্যাপতির বন্দনা-সূচক পদ পাওয়া যায়। শেষ অংশে আছে "গোবিন্দ দাস অতিমন্দে. এক সুখসম্পদ রহইত আনবম জেহেন বামন ধরবহি চন্দে॥"

ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর কতক অংশ পরিবর্তন করিয়া মাঝে মাঝে নিজ নাম সংযোজিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি পদাবলী'র মধ্যে বহু অংশে অসম্পূর্ণ পদের পূরণে বা পরিবর্তনে বিদ্যাপতি নামের পাশে গোবিন্দ দাসের নাম দেখা যায়। 'ভজি নায়ক কোর বিলসই রাহি সুখক নাহি ওর' ইত্যাদি পদের শেষ অংশে 'বিদ্যাপতি কবি ভাব। কহতহি হেরত গোবিন্দ দাস' এরূপ দেখা যায়[২]। অন্যত্র "প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল ন ভেল যুগল পলাশা। প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈসে যামিনী সুখ নব ভৈ গেল নিরাশা ॥" "সখি হে অবমোহে নিঠুর মধাই অবধি রহন বিসরাই" ইত্যাদি পদের শেষ অংশে "পাপ পরাণ আন নহি জানত কানু কানু করি ঝুর। বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রস পূর ॥"[৩]

'বেলজ সঞো যব বসন উতারল লাজে লজাওনি গোরী
করে কুচ ঝাঁপইতে বিহুসি বয়ান ধনী অঙ্গ কয়ল কত মোরি

* * * *

ভনই বিদ্যাপতি গোবিন্দ দাস তাষ পুরণ ইহ রস ওর ॥'
'মুদিত নয়নে হিয়ভুজযুগচাপিশুতিরহনতযিকিছুন অলাপি।'

* * * *

বিদ্যাপতি ভণ মিথনহভাখি গোবিন্দদাস কহ তুহুতথিসাখী ॥'

"বিদ্যাপতি-কৃত ত্রিচরণগীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দ কবিরাজেন চবণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্" এই গোবিন্দদাস বলরামদাসের সমসাময়িক এবং Grierson সাহেবের মতে ইনিই বিঠল দাস-শিষ্য ও জন্ম ১৫৬৭ খ্রী° অ°। ইহা ছাড়া বর্দ্ধমান জিলায় শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি দামোদরের দৌহিত্র ও চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দদাস একজন বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। পরমভাগবত চিরঞ্জীব চৈতন্য দেবের সহচর ছিলেন। গোবিন্দ দাস ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত শাক্ত-মতাবলম্বী ছিলেন পরে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া বহুদিন রোগভোগ ও আদিষ্ট হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণে রোগ মুক্ত হন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার জন্ম ১৫৩৭ খ্রী° ও মৃত্যু ১৬১২ খ্রী°। তাঁহার 'কর্ণামৃত ও 'সঙ্গীত মাধব' নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়া বহু পদ পাওয়া যায়। হুগলী জেলায় জাঙ্গীপাড়া গ্রামের নিকটে বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের (অধিকাবী) জন্ম হয়। ইনি একজন উচ্চাঙ্গের সাধকও ছিলেন। গোবিন্দদাসের নামের পশ্চাতে আরও কত বিখ্যাত পদলেখক আছেন কে জানে? যাহা হউক গোবিন্দদাসের স্থান বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিম্নেই করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে গোবিন্দদাস এমন পদলালিত্য ও ভাবের গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের সমাবেশ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি হইতেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তথায় প্রমাণিত হয়। বাংলা গীতিকাব্যে চণ্ডীদাসের তুলনা হয় না। এইরূপ সহজ কথায় উচ্চভাব ও লালিত্যের সমাবেশ কোথাও দেখা যায় না। গোবিন্দদাস

২ বৈষ্ণব পদাবলী ১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৩ ঐ ১৮১ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদানুকরণে পদ লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁর লেখায় 'ব্রজবুলীর' প্রাচুর্য হেতু অতীব শ্রুতিমধুর হইয়াছে। অন্যত্র মৈথিলী পদের সমাবেশ। গোবিন্দদাস বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী ব্রজবুলীর চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রথম স্ফুরণে ভাব প্রকাশই লক্ষ্য ছিল, ভাষায় প্রতি দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু গোবিন্দদাসের ভাব ও ভাষা উৎকৃষ্ট।:— "কেবল কান্ত কথা কহি কাঁদয়ে কাম কলঙ্কিনী গোরী" "মুকুলিত মল্লী মধুর মধু- মাধুরী মালতী মঞ্জুল মাল" 'ও নব জলধর সঙ্গ ইহথির বিজরী তরঙ্গ; ও বর মরকত ঠাম, হই কাঞ্চন দশ বান; ও তনু তরুন তমাল, ইহ হেম যুথিরসাল; ও নব পদ্মিনী সাজ, ইহ মত্ত মধুকর রাজ; ওমুখ চাঁদ উজোর হই দিঠি লুব্ধ চকোর; অরুণ নিবড়ে পুণচন্দ, গোবিন্দদাস রহুধন্ধ। ইত্যাদির ভাব ও ভাষা অতুলনীয়। অন্যত্র:—'মন্দির বাহির কঠিণ কপাট চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট'......মাণিনি কৈসে করবি অভিসার, হরি রহু মানস সুরধুনী পার।" ইত্যাদি পদের পর কুলমরিষাদ ও নিজ মরিষাদ (মর্যাদা) কিভাবে বিসর্জন দিয়া রাধা অভিসারে যাইতেছেন তাহা সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। যেন পটে আঁকা ছবি! তিনি বলিয়াছেন নিজ পরিষাদ কপাট উদ্ঘাটনু তাহে কি কাঠকী বাধা। কুল মর্যাদা তুচ্ছ করিলাম, সামান্য কাঠের কপাট আমার কি প্রতিবন্ধক হইবে? "নিজ মরিষাদ সিন্ধু সঙে পঙারনু তাহে কি তটিনী অগাধা" আমি নিজ কুল মর্যাদা সাগরের জলে ভাসাইযা দিয়াছি, তাহার আমার সামান্য নদীর ভয় কিসের? গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন:—"যাঁহা ২ নিকশয়ে তনু ২ জ্যোতিঃ তাঁহা ২ বিজরী চমকয়ে হোতি। যাঁহা ২ অরুণ চরণে চলই তাঁহা ২ থলকমল দল খলই। যেন সখি কো ধনী সহচরী মেলি, আমারি জীবন সঞ্চে করতহি খেলি। যাঁহা ২ ভঙ্গুব ভাঙ বিলোল, তাঁহা ২ উছলই কলিন্দী হিলোল যাঁহা ২ তরণ বিলোচন পড়ই তাঁহা ২ নীল উৎপল বন ভরই, যাঁহা ২ হেরি এ মধুরিম হাস, তাঁরুহা ২ কুন্দ-কুমুদ পরকাশ; গোবিন্দদাস কহ মুগধন কানচিলরাহ জান। গোবিন্দদাসের অন্যান্য পদ:—কাহে পুন গৌর কিশোর অবতন মাথে লিখত মহীমণ্ডল নয়নে গলায় ঘনলোর। কনকবরণ তনু ঝামর ভেল জনু জাগরে নিদ নসই ভোর; সোই পরশে পুন তাকবদন মন ছল ছল লোচনে চায়।" গোবিন্দ দাসের পদাবলী পাঠকালে চিত্তসায়রে যে স্বর্গীয় ভালবাসার অগণিত লহরী ভক্তি হিল্লোলে আন্দোলিত হইতে থাকে তাহা একমাত্র ভাবুকেরই অনুভূতি-সাপেক্ষ। নিম্নলিখিত পদাবলী হইতে গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত হইবে—

"এ সখি রসময় অন্তর যার
শ্যাম সুনাগর গুণগণ সাগর কোধণি বিছুরই পার;
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি তরজন, কুলবতি কুবচনভাষ
যত পরমাদ সবহু পুন মেটই মধুর মুরলী আশোয়াশ;

কিয়ে করব কুল, জীবনদীপতুল, প্রেম পবনে ঘন ডোর
গোবিন্দ দাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোর ;

* * * *

"সহচরি মঝু পরীখন কর দূর
যৈসে হৃদয় করি পন্থ হেরত সোঙরি সোঙরি মন ঝুর !

* * * *

গোবিন্দ দাস ভনে শুন বর নারি
ধৈরজ ধরহচিত্তে মিলিব মুরারি ;

গোবিন্দ দাসের বিরহ ব্যাকুলা রাধার সহিত চণ্ডীদাসের রাধার সাদৃশ্য এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন :—

'সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয়ে যুগ চারি'
'যা বিনে না জীয়ে আঁখির পলক তিলে কুত যুগ মানি'
'কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে পাঁজর হইল শেষ' ইত্যাদি সাদৃশ্য আছে।

চণ্ডীদাসের রাধিকা যমুনায় জল আনিতে গিয়া শ্যামসুন্দরের অপরূপ রূপ দর্শনে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে হেরিয়া ঘরে আইলা বিনোদিনি
ও রূপ হেরিয়া ব্যথিত হইয়া ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল মহাযোগিনীয় পারা
ও দুটী নয়নে বহিছে সঘনে শ্রাবণ মেঘের ধারা ;

চণ্ডীদাসের রাধিকা মহাযোগিনী—গোবিন্দদাসের রাধিকাও কুলত্যাগিনী 'অরূপ রতনের রূপের আকর্ষণে'। প্রাকৃতিক কোন বাধাই আজ তাঁর বাধা জন্মাইতে পারিতেছে না এ যেন সেই রবীন্দ্রনাথের 'কাছে পেয়ে কাছে না পাই—কেন গো তাঁর মালার পরশ বুকে বাজেনি' অবস্থা। রাধিকা আজ শ্যামহারা তাই 'শূন ভেল মন্দির—শূন ভেল নগরী শূন ভেল দশদিক্'।

"হরি রহু মানস সুরধুনী পায়" অংশে দীনেশ সেন যে আধ্যাত্মিক ব্যাখা করিয়াছেন, বৈষ্ণব শাস্ত্রবিশারদ রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম.এ, মহোদয় সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তিনি মানস গঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। পণ্ডিত ক্ষীরোদচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের ৪০০ পৃষ্ঠায় "মানসগঙ্গা কালিন্দী ভুবন পাবন নদী কৃষ্ণ যদি তাতে করেন স্নান" এই পদ পাওয়া যায়। আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে গোবিন্দ দাসের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম, পরে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। এই প্রবন্ধে যে সকল গোবিন্দ দাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি তাহা হইতেই গোবিন্দদাস যে একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

(৪)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও গীতাধর্ম

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল.

প্রায় পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে যে অবতার বা মহামানব পূণ্যভূমি ভারতে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র মানব জাতিকে একটী সর্বাঙ্গীন আদর্শ দেখাইয়াছেন ও তাঁহার মুখনিঃসৃত গীতার মধ্য দিয়া একটী সার্বভৌমিক ধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সেই আদর্শ ও তত্ত্বের মূর্তিমান্ প্রতীক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতাররূপে আজ শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদিগের দ্বারা গৃহে গৃহে বিশেষরূপে পূজিত হইবেন। মন্দিরে মন্দিরে ও তীর্থভূমিতে তিনি প্রতিনিয়তই পূজিত হন, তবে আজ তাঁহার আবির্ভাব-সূচক বিশেষ পূজা। তাঁহার অপূর্ব দৈবী জীবনীর বিষয় সকলেই অবগত। গত বৎসরের শ্রীভারতীতে এ বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। আজ তাঁহার পূণ্য আবির্ভাব-তিথি-দিবসে গীতা-প্রোক্ত তাঁহার সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ বিষয়ে দুই একটি কথার অবতারণা করিতেছি।

গুণ ও কর্মানুযায়ী তিনি মানবসমাজকে ৪টী বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যা ও ধর্মাদিকার্যে ব্যাপৃত থাকিবেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা দেশ ও সমাজ রক্ষা ও রাজ্যপালনাদি কার্যে সহায়তা করিবেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহারা ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পাদি দ্বারা দেশের উন্নতি বিধান করিবেন তাঁহারা বৈশ্য; এবং যাঁহারা অন্যান্য বর্ণের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহারা শূদ্র। এই বর্ণবিভাগ জন্মগত নহে এবং সমগ্র মানবসমাজেই প্রযোজ্য।

প্রতি মানবের জীবন একটি পরম উদ্দেশ্যের অনুগামী করিয়া সফলতাপূর্ণ করিবার জন্য তিনি ৪টী আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সংযম ও নিষ্ঠাসহ গুরুগৃহে (বিদ্যালয়ে) বাস করিয়া বিদ্যাধ্যয়নকরতঃ জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কর্তব্য; সৎবৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জনকরতঃ আত্মীয় প্রতিপালন ও দেশসেবা করা গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য; পুত্র বা আত্মীয়ের উপর সংসার ভারার্পণ করিয়া ৫০ বর্ষ বয়সে অরণ্যে গমনকরতঃ ভগবৎ উপাসনায় মগ্ন থাকা বাণপ্রস্থাশ্রমের কর্তব্য; আর পরাবিদ্যায় অধিকারী হইলে সমস্ত ত্যাগ করতঃ ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকা সন্ন্যাসাশ্রমের কর্তব্য। জীবনকে এই ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা সার্বজনীন।

পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলানুযায়ী ও বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী প্রতি মানবের সংস্কার বিভিন্ন। সুক্ষ্মশরীরস্থ সব সংস্কারের জন্যই মানবে মানবে প্রভেদ, নচেৎ প্রত্যেকেই ব্রহ্মের বিকাশ। এই সংস্কারের জন্য মানবের প্রবৃত্তি ও কর্মপদ্ধতি অবশ্য ভিন্ন প্রকার। সুতরাং একই প্রকার সাধনমার্গ বা উপদেশ সকলের নিকট সমানভাবে প্রযোজ্য

নহে। সেই কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য তিনি বিভিন্ন মার্গের ব্যবস্থা করিলেন—কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। এই সব মার্গেরই গন্তব্যস্থল এক। যে যে-কোন কর্মই করুক না কেন, সমাজের যে কোন স্তরেই অবস্থান করুক না কেন, কর্মযোগ দ্বারা তাহার চিত্ত-শুদ্ধি ও সংস্কার-পাশ মোচন হইবে। সুতরাং কর্মের মধ্যে উচ্চনীচতা নাই—কর্মযোগীর নিকট সকল কর্মই সমান; প্রয়োজন কেবল নিষ্কাম ও নিরহংকারভাবে কর্ম করা। ভক্তিযোগীদের মধ্যে যিনি যে ভাবেই পরমপুরুষকে ভজনা করুক না কেন, প্রয়োজন কেবল সম্যক্ আত্মনিবেদন ও শুদ্ধা ভক্তি। শরীর ও মনকে জ্ঞানলাভের যথোপযুক্ত করিবার জন্য তিনি রাজযোগের ব্যবস্থা করিলেন। যাঁহারা রাজযোগ, ভক্তিযোগ বা কর্মযোগে আগ্রহান্বিত ন'ন সেই প্রকার সাধকদিগের জন্য তিনি জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিলেন।

প্রতি মানবের জন্য বর্ণভেদে ও আশ্রমভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্যপন্থা এবং অধিকারীভেদে বিভিন্ন সাধনমার্গ-ব্যবস্থা গীতার ধর্মকে জগতের অদ্বিতীয় সার্বজনীন ধর্ম করিয়াছে। আর এই গীতাধর্ম আর্যঋষিদের সাধনা-লব্ধ উপনিষদের ঘনীভূত সারাংশ। ভাবগাম্ভীর্যের ও ভাষার লালিত্যের একত্র সন্নিবেশ এই গীতায়। যদিও ইহা মহর্ষি ব্যাসদেব-রচিত মহাভারতের অন্তর্গত, কিন্তু ইহার ভাষা ব্যাসদেবের নয়, ইহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত। স্বীয় তপোপ্রভাবে ব্যাসদেব ইহা অবিকলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জগৎ আজ দ্বেষ, হিংসা ও সংকীর্ণতার শতধা-বিচ্ছিন্ন, দুঃখ দৈন্য ও দারিদ্র্যে-নিপীড়িত। আর তদুপরি বিরাট সমরানল জগতকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। গীতার সুমহান্ বাণী ও ধর্ম জগতে পুনরায় শান্তি আনয়ন করুক, দুঃখ দৈন্য দূরীভূত করুক, দিকে দিকে, দেশে দেশে এই মহামানবের বিজয়শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের কথা

বর্তমান ভাদ্র সংখ্যার সহিত 'শ্রীভারতী'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইল। সুধীবৃন্দের ও পাঠকবর্গের নিকট ইহার উত্তরোত্তর আদর আমাদিগের কার্যে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। সেজন্ম আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। আশাকরি বর্তমান বর্ষেও আমরা তাঁহাদের সহানুভূতি পাইব এবং অন্যান্য লেখক ও গ্রাহকবর্গও আমাদের কার্যে সহযোগিতা প্রদান করিবেন। যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁহাদের গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি দ্বারা 'শ্রীভারতী'র শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিকে পাথেয় স্বরূপ করিয়া আমরা নববর্ষে নব-উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করি।

* * * *

শ্রীভারতীর উদ্দেশ্য পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উহারই সামান্য পুনরালোচনা করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'শ্রীভারতী'র উদ্দেশ্য—যাহাতে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও কৃষ্টির অপূর্ব অবদানের বিষয় বর্তমান ভারতের প্রত্যেক বাংলা-ভাষা-সেবী ব্যক্তিই অবগত হইতে পারেন, আর সেই লব্ধ-জ্ঞান দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষা-পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন ও ইহার বহুবিধ সমস্যা সমাধান করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, অতীতের জ্ঞান ও কৃষ্টি অতীতের মধ্যেই লুপ্ত হয় নাই। জ্ঞান ও কৃষ্টি চিরন্তন। ইহার মধ্যে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সীমা রেখা নাই। বর্তমান মানব ও তাহার সমাজ এবং জ্ঞান, অতীত মানবের জ্ঞান, প্রচেষ্টা ও কৃতকার্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্যলাভ, শান্তিলাভ, পরমানন্দলাভ। এই উদ্দেশ্য চিরকালেরই আদর্শ। বিভিন্নকালের ও দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতায় এই উদ্দেশ্যের বিধেয়গুলির পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ চিরন্তন সত্য। গৌরবময় অতীত গৌরবময় ভবিষ্যতেরই সূচনা করে। এই মহান্ জাতির উজ্জ্বল অতীত ইহার বর্তমান ও ভবিষ্যতকে জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বলতর করিবে, ইহাই আশা করা যায়।

যে মহামানবের শুভ জন্মতিথি-দিবসে এই 'শ্রীভারতী'র প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাঁহারই করুণা ও প্রেরণায় 'শ্রীভারতী' ইহার সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

* * * *

এই তিন বৎসরের মধ্যে 'শ্রীভারতী' ভারতীয় কৃষ্টির অনেক বিষয়ের পরিচয় পাঠক-বর্গের নিকট উদ্ঘাটিত করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অনন্ত জ্ঞানরত্নের তুলনায় তাহা অতি

সামান্ত। অন্যান্য বিষয়ক শাস্ত্রের সামান্য পরিচয় যাহাতে পাঠকবর্গকে দিতে পারা যায় তাহার জন্য আমরা সচেষ্ট আছি। বর্তমান বর্ষ হইতে ইহার কলেবর কিছু বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাগজ ও ছাপার অন্যান্য জিনিষের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন বর্তমানে উহা কার্যে পরিণত করিতে পারা যাইতেছে না।

* * * *

বিশেষ আনন্দের বিষয় যে অস্তকার শুভ জন্মাষ্টমী তিথি-দিবসে ভারতী মহা-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহার অন্তর্গত, 'সমাজ-সেবা-শিক্ষা বিদ্যালয়,' 'মহিলা-শিল্প বিদ্যালয়' ধর্মতত্ত্ব-শিক্ষা বিদ্যালয় ও 'ব্যবসায-শিক্ষা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। মাননীয় লর্ড সিংহ, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও ডক্টর বিনয় কুমার সরকার যথাক্রমে এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিবেন। ইহাদের কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী সংখ্যায আলোচনা করিব। বর্তমানে কলিকাতা নগরীর বিভিন্ন স্থানে এই সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। পরে ইহারা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের নিজস্ব ভূভাগে স্থানান্তরিত হইবে ও ইতিমধ্যে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে গঠন করা হইবে।

এই সব প্রচেষ্টা শুভ ও জয়যুক্ত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিণী (তৃতীয় সংস্করণ)—ভুলুয়া-বাবা-কৃত। আলোচ্য সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত। দ্বিচত্বারিংশৎ পরিচ্ছেদ এবং দীর্ঘ পরিশিষ্ট-সম্বলিত ও বিংশাধিক চিত্রে শোভিত। কাগজ, মুদ্রণ-পারিপাট্য প্রভৃতি ভাল। আদ্যন্ত সহজ, সাবলীল বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে লিখিত। প্রকাশক শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। পোঃ—বনওয়ারীনগর (পাবনা)।

গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার পরস্পরের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, উভয়েই বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের প্রায় সর্বত্র সাধক-সমাজে সুপরিচিত এবং সম্বর্ধিত। গ্রন্থে গ্রন্থকার যখন পারমার্থিক জগতে মগ্ন হইয়াছেন, তখন ইহজগত স্মৃতি হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। সমগ্র জীবনের প্রতি একটি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি গ্রন্থখানিকে মণ্ডিত করিয়াছে। ইহাতে সাধন-জগতের বিহিত তত্ত্বসমূহের সহিত মন-শিক্ষা প্রভৃতি, যৌগিক, পিতৃভক্তি প্রভৃতি গার্হস্থ্য, দেশপ্রেম, 'অস্পৃশ্যতা' ইত্যাদি সামাজিক এবং পশুবলি প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক, ধর্ম-সমূহের অবতারণাও স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক অবতারণাও যেরূপ করা হইয়াছে, সেইরূপ হিন্দুধর্মের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এক-প্রাণতার একান্ত প্রয়োজন তাহাকেও গ্রন্থের অন্যতম লক্ষীভূত বিষয় করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, কেবলমাত্র এই গ্রন্থখানি হইতেই প্রণয়নকর্তা শাক্ত কি বৈষ্ণব, শৈব কি সৌর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কি আলোচিত বিষয়-সমূহের ব্যাপকত্বে এবং বিভিন্নত্বে,—কি অসাম্প্রদায়িক, সার্বভৌম মতবাদে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি যুগোপযোগী ধর্মবিষয়ক ইতিহাস।

প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে দ্বৈতবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু পরোক্ষভাবে অথবা দ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া ইহাতে অদ্বৈতবাদই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও পাঠকের স্কন্ধে শাস্ত্রকে দুর্বোধ্য জবরদস্তি রূপে বিক্ষিপ্ত করা হয় নাই। শ্রীশ্রীগীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, মহানির্বানাদি তন্ত্র, শ্রীরূপগোস্বামীকৃত শ্রীসজ্জনতোষিনী প্রভৃতি বিভিন্ন মার্গের প্রামাণিক গ্রন্থাদি হইতে শ্লোক ও ভাষ্য সমূহের অবতারণা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রণয়নকর্তা নিজের সাধন-অভিজ্ঞতা এবং বহু মহাপুরুষের আচরিত ধর্মজীবন হইতে প্রত্যক্ষভূত বিভূতি এবং উদাহরণ সমূহের অবতারণা করাতে গ্রন্থখানি সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। সর্বত্রই প্রাণস্পর্শী, সরল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে যে-সকল সত্য বা পৌরাণিক বা কল্পনাপ্রসূত গল্প উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সুনির্বাচিত এবং যথাযথ হইয়াছে। সর্বসম্প্রদায়ের চিত্তবান্ ব্যক্তিই ইহাতে গ্রহণযোগ্য উপকরণ পাইবেন এবং উপকৃত হইবেন।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ

শ্রীশ্রীসদ্ভাব তরঙ্গিণী—(দ্বিতীয় সংস্করণ) ভুলুয়া-বাবা-কৃত। চারি খণ্ডে মুদ্রিত। প্রকাশক শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। পোঃ—বনওয়ারীনগর (পাবনা)।

সাধু উদ্দেশ্যে সদ্ভাবসমূহের আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের নাম "সদ্ভাব-তরঙ্গিণী।" কিন্তু গ্রন্থখানিতে উক্ত ভাবসমূহ সূক্ষ্ম তত্ত্বহিসাবে সন্নিবেশিত হয় নাই। উহা বিভূতি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের জীবনী এবং পবিত্র তীর্থসমূহের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম এবং সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত হইতে হইলে কেবলমাত্র অধ্যয়নাদিই যথেষ্ট নহে। পরন্তু যে সব মহাজনেরা 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখান' তাঁহাদের সঙ্গ, সান্নিধ্য এবং আচরিত পথই একমাত্র উপায়। 'জীবনী' কি ব্যক্তি, কি জাতি সকলেরই জীবনে পরশমণি তুল্য। শত দিবসের সহস্র অধ্যয়নেও যাহা না হইতে পারিয়াছে শ্রেষ্ঠতর জীবনের কেবলমাত্র সান্নিধ্যেই তাহাকে সংঘটিত হইতে দেখা গিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি পরশমণির স্পর্শতুল্য একটী 'স্পর্শ'।

ভুলুয়া-বাবা অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া সমগ্র আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের যে সব স্থানে পরিব্রাজক-জীবন যাপন করিয়াছেন, যে সকল সাধক এবং মহাপুরুষগণের সংস্পর্শে আসিয়াছেন—আলোচ্য গ্রন্থখানি মূলতঃ তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত। কিন্তু, তাঁহাদের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু, ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর হইতে তুলসীদাস, রামানুজ প্রভৃতি প্রেরিত-পুরুষগণের জীবনী মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। জীবনী নির্বাচনে এমন কি হিন্দু, মুসলমান্,খ্রীস্টানের মধ্যেও কোন পার্থক্য রাখা হয় নাই। যিনিই মহাভাগবত তাঁহার জীবনী শ্রদ্ধার সহিত লিখিত হইয়াছে। 'বিভূতিযোগ' প্রভৃতি অধ্যায় এবং 'মণিমন্দির' গ্রন্থখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। নেপাল, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলসমূহের অনেক তথ্যই গবেষণাকারী ইহা হইতে পাইতে পারিবেন।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ

নূতন গ্রন্থসংবাদ

সাহিত্য ও ভাষা

১। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এ, পি. আর. এস, ডি-লিট্। কলিকাতা।

২। বঙ্গীয় মহাকোষ—২য় খণ্ড, ২০শ সংখ্যা।

৩। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দধামদর্শন—শ্রীঅনাদিরঞ্জন ভারতী ভক্তিভূষণ ও শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সাউ।

৪। জ্ঞানের পথে—প্রথম খণ্ড—শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন, এম. এ.

ইতিহাস

৫। গল্পে বারভূঁইয়া—শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ দেববর্মা শাস্ত্রী। কলিকাতা।

৬। Administration and Social life under Vijayanagar—By T. V. Mahalingam. Madras University Historical Series, Madras.

৭। The Travancore Tribes and Castes, Vol. III—The Aborigines of Travancore—By T. Krishna Iyer, M. A., Trivandrum,

বিবিধ

৮। শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ভববাসিনী কাব্য—শ্রীরাধারমণ পণ্ডিত কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা।

৯। ঐতিহাসিক জড়বাদ—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ, বি. এ., কর্তৃক সংকলিত

'সাহিত্য' (১৩২৪ সাল)

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—বাঙ্গালা সাহিত্য—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—সাহিত্যসম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের Calcutta Review নামক পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ। আলোচ্য প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র মহাশযের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা আছে।

জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ—বঙ্গ সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি—বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধ—লেখক শ্রীদেবেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী—শূন্য পুরাণের আমল হইতে লেখকের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার যে উন্নতি ও পুষ্টি হইয়াছে তদ্বিষয়ক অতি উপাদেয় প্রবন্ধ। ইহাতে সাহিত্যের ব্যাপ্তি ও স্থিতির বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধটী ছোট হইলেও নানা তথ্যে পূর্ণ এবং অনুপম। যাঁহারা বাংলা ভাষার স্থায়িত্বের কামনা করেন তাহাদিগের অবশ্য পাঠ্য। চৈতন্যযুগের বাংলা সাহিত্য কিরূপে প্রাণে প্রাণে বাঙ্গালীকে স্পর্শ করিয়াছিল ও বর্তমান ইংরেজী-শিক্ষিত লেখকগণের গ্রন্থ কি দোষে সাধারণের বোধগম্য হয় না তাহার আলোচনা অতি সুন্দরভাবে, অতি উপাদেয় যুক্তির সহিত দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধলেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে বর্তমানের সাহিত্য তেমন প্রাণস্পর্শী নয়—উহা আমাদিগের মর্মে আঘাত করে না। সাহিত্যের সেই 'মরমের পরশ' লোপ পাইতেছে। ইহা সাহিত্যের পক্ষে দুর্লক্ষণ।

পৌষ—প্যারীচাঁদ মিত্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনী ও তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা। ইহাতে "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় আছে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) সম্বন্ধে যে উচ্চভাব পোষণ করিতেন তাহারও উল্লেখ আছে। প্রবন্ধটী ভাবে ও তথ্যে সমুজ্জ্বল।

সাময়িক সাহিত্য—শ্রাবণ, ১৩৪৮

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—গীতায় সাম্যবাদ—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

ভারতবর্ষ—স্বামী বিবেকানন্দ ও মায়াবাদ—চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

" —ভাগবত জীবন—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই-সি-এস্।

প্রবর্ত্তক—তন্ত্রের আত্মাশক্তি কল্পনা—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

উদ্বোধন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মযোগ—স্বামী রমানন্দ।

" —ত্যাগ ও সেবা—শ্রীহরিবোলানাথ রায়চৌধুরী।

সাহিত্য

প্রবাসী—বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ—ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

" —শব্দানুশাসন—শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ

বঙ্গশ্রী—বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালী মুসলমান—শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল।

" —প্রাচীন বাঙলা কাব্যে ভোজন-বিলাস ও রন্ধন-বিজ্ঞান

—শ্রীস্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী।

প্রবর্ত্তক—ছবির প্রাণবস্তু কল্পরূপ না প্রতিরূপ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

উদ্বোধন—পাশ্চাত্য সভ্যতা—স্বামী সুন্দরানন্দ।

বিবিধ

প্রবাসী—নেপালের প্রবাসী বাঙালী—শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়;

" —বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

" —রুষের সমস্যা—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ—জ্যোতিষের চোখে চিকিৎসাতত্ত্ব—জ্যোতি বাচস্পতি।

" —কয়লার উৎপত্তি ও গঠন—অধ্যাপক শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

" —শিল্পজগতে মনোবিদ্যার স্থান—শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায় এম্-এস্-সি।

বঙ্গশ্রী—ভারতীয় ফিল্ম শিল্প—শ্রীভোলানাথ ঘোষ।

" —ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস

প্রবর্ত্তক—ত্রিবেণীর প্রাচীন ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্।

উদ্বোধন—প্রাচীন গৌড়বাসীর সমুদ্রযাত্রা—

ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি।

সাময়িক সংবাদ

মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—মাধ্যমিক শিক্ষা বিল যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে শিক্ষার উন্নতি অপেক্ষা সম্প্রদায় বিশেষের সুবিধার দিকেই বেশী নজর আছে—ইহাই বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দু সাধারণের ধারণার ফলে এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত তীব্র ভাষায় প্রকাশিত হয়। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি যে আকারে গৃহীত হইয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটিতে যে সব সদস্য গৃহীত হইয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল: মিঃ এ, কে, ফজলুল হক (চেয়ারম্যান), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর স্যর আজিজুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভাইস চান্সেলর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কামেরণ, প্রেসিডেন্সী কলেজেব অধ্যক্ষ মিঃ ভূপতিমোহন সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টব এম আহ্সান, স্যর যদুনাথ সরকাব, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও ডক্টর জেঙ্কিন্স। জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিমতও এই কমিটি বিচার করিবেন।

বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের নূতন কমিটি নিয়োগ—উত্থাপিত বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্বন্ধে দেশবাসীর বিবোধের সমাধানকল্পে বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী সরকার পক্ষীয় দল হইতে কয়েকজন সদস্য ও বিরোধীদলেব মধ্য হইতে কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত করিয়া পূর্বনিযুক্ত কমিটির আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন। শীঘ্রই এই কমিটির কার্য আরম্ভ হইবে। দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ে মতদ্বৈধের আশু একটী সুচারু সমাধান বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের দ্বিতীয় সংশোধন বিল—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্তমান অধিবেশনে উক্ত বিলটী উত্থাপিত হইবার কথা ছিল। এই বিলের বিরুদ্ধে দেশবাসী তীব্র বিরোধিতা করায়, মন্ত্রীমণ্ডলী এ বিষয় সমাধানের জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী বিশেষ কমিটি গঠন করিয়াছেন। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে কমিটিকে তাহার কার্য শেষ করিয়া সরকারের নিকট তাহার সুপারিস দাখিল করিতে হইবে।

রামগোপাল ঘোষের দান—স্বনামখ্যাত বাগ্মী ও সমাজসংস্কারক ঘোষ মহাশয় পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দেড়লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া যান এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হইবে এইরূপ উইল করিয়া যান। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বৎসর জীবিত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করায় বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রাপ্য অংশ পাইবার দাবী জানাইয়াছেন। উইলের সর্ত্তানুযায়ী এই টাকা শিক্ষাকার্যে ব্যয়িত হইবে। ঘোষ মহাশয় জীবিতকালেও লক্ষাধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র ৯ বৎসর পরে তিনি শিক্ষার জন্য অর্থ দানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া এইরূপ উইল করিয়াছিলেন।

যোনিষ্ট ইন্দ্র সদনে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দুটীই গৃৎসমদ কর্তৃক দৃষ্ট। যোনিশব্দ রহিয়াছে বলিয়া ইহারা গৃৎসমদের যোনি বলিয়া খ্যাত। অদর্দরুৎ সমসৃজো বিখানি এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুটীই উরুক্ষয় নামে প্রসিদ্ধ। সুম্বাণাস ইন্দ্রাস্তমসিত্বা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এদুটীই পার্থ নামে খ্যাত।

জগৃহ্মা তে দক্ষিণম্ এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুটীর দেবতা সুপর্ণ। পরের তিনটী বৎসপ নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। অথবা ইহাদের পাঁচটী সামই বৎসপ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

ইন্দ্রন্নরো নেমধিতা হবন্তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা গোরীবিতি ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। বয়ঃ সুপর্ণাঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বেদস্বান্ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়া বৈদস্বত নামে খ্যাত। বেদস্বান্ ভার্গবেরই অন্য নাম। অথবা ইহার দেবতা যম বা পার্থিব অগ্নি, সুতরাং ইহা যাম নামে পরিচিত।

নাকে সুপর্ণমুপয়ৎপতন্তম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম মহাষাম। ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাৎ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুটীর নাম ঋত সাম অথবা ইহারা ব্রহ্মপুত্র জজ্ঞান কর্তৃক দৃষ্ট। অপূর্ব্যা পুরুতমান্যস্মৈ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রের বারবন্তীয় নামে খ্যাত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ড

इन्द्रस्य क्षुरपविणी द्वे स्यौमरश्मे द्वे घृषतो मारुतस्य सामनी द्वे द्युतानस्य वा मारुतस्य सोमसामनी द्वे इन्द्रवज्रे द्वे भृष्टिमतः सूर्यवर्चसः सामनी द्वे वसिष्ठस्याङ्कुशौ द्वौ कश्यपस्य वा प्रतोदौ भारद्वाजं च वैश्वदेवं च पुरीषं चाथर्वणम् ॥ ७ ॥

অবদ্রপ্সো অংশুমতী এই ঋকে চারিটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুটীর নাম ইন্দ্রের ক্ষুরপবি। এবং দ্বিতীয় দুইটীর নাম সৌমরশ্ম।

বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথা দীষমাণা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা মারুতের ধৃষ্ণু সংজ্ঞক। অথবা ইহারা দ্যুতান মারুতের সাম।

বিধুং দদ্রাণং সমনে বহুনাম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুটী সোমসাম। ত্বং হত্যৎ সপ্তভ্যোজায়মানঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বজ্র নামে কথিত। মেড়িং নত্বা বজ্রিণে ভৃষ্টিমন্তম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভৃষ্টি এই শব্দ আছে এবং ইহারা সূর্যের বর্চঃ নামে প্রসিদ্ধ।

প্র বো মহে মহে বৃধে ভরধ্বম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বশিষ্ঠের অঙ্কুশ বা কশ্যপের প্রতোদ নামে খ্যাত।

শুনং হুবেম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজ কর্তৃক দৃষ্ট। উদু ব্রহ্মাণ্যৈরত শ্রবস্য এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বৈশ্বদেব। চক্রং যদস্যাপ্স্বানিষত্তম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অথর্বা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট এবং পুরীষ নামে কথিত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তম খণ্ড

आदित्याः सामनी द्वे ताक्ष्र्यसामनी वेन्द्रस्य च त्रात्रं याज्ञतुरं च वार्त्रतुरं वा धृषतो मारुतस्य सामनी द्वे आत्रं गृत्समदस्य मदौ द्वौ गोतमस्य वानुतोदौ वैश्वामित्रं सावित्राणि षट् कुतीपादस्य च वैरूपस्य सामामहीयवं च ॥ ८ ॥

ত্যমূষু বাজিনম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুইটীর দেবতা আদিত্য অথবা তার্ক্ষ্য।

ত্রাতার মিন্দ্রম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রাতংত্রাত শব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম ত্রাত্রম্। যজামহে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা যাজ্ঞতুর অথবা বার্ত্রতুর নামে প্রসিদ্ধ।

সত্রাহণন্দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা মরুতের পুত্র ধৃষতের সাম।

যোহ্ন বনুষ্যন্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অত্রি কর্তৃক দৃষ্ট বলিয়া আত্র নামে প্রসিদ্ধ।

যং বৃত্রেষুক্ষিতয়স্পর্দ্ধমানা যম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা গৃৎসমদ কর্তৃক দৃষ্ট এবং মদনামে প্রসিদ্ধ। অথবা গোতমের অনুতোদ নামে খ্যাত।

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দ্রষ্টা বিশ্বামিত্র।

ইন্দ্রায় গিরো অনিষিতসর্গা এই ঋকে ছয়টী সাম * উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা সবিতা, সুতরাং ইহারা সাবিত্র নামে প্রসিদ্ধ। আত্বা সখায় সখ্যা ববৃত্যুঃ এই ঋকে

---

* গান গ্রন্থে এখানে একটী সাম আছে। ইহার ছয়টী ভাগ আছে। বোধহয় ভাষ্যকার ঐ ভাগগুলিকে সাম বলিয়াছেন। আমাদের মতে পাঁচটী সাম লুপ্ত হইয়াছে। এরূপ অন্যত্র ও দেখা যায়। সত্যব্রত সামশ্রমী।

একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিরূপের পুত্র কুতীপাদ কর্ত্তৃক দৃষ্ট। কোঅদ্য যুঙ্‌ক্তে ধুরিগা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম আমহীয়ব।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ড

शैखण्डिने द्वे विश्वेषां देवाना मुद्वंशीयं तृतीयं शैखण्डिनानि चैव त्रीण्याष्टादंष्ट्रे द्वे महावैश्वामित्रे द्वे इन्द्रस्य प्रियाणि चत्वारि वसिष्ठस्य वा गौतमं वैषां द्वितीयं गृत्समदस्य वीङ्कानि चत्वारि वसिष्ठस्य वाकूपारं वैषां तृतीयन्तिरश्चयाङ्गिरसस्य सामनी द्वे तैरश्चे वा वैश्वामित्रं च काण्वे च वैश्वामित्रश्चैवेन्द्रस्य शुद्धाशुद्धीये द्वे वसिष्ठस्य वा गोतमस्य रयिष्ठे द्वे ॥ ९ ॥

গায়ন্তিত্বা গায়ত্রিণঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে ইহাদের প্রথম দুইটী শিখণ্ডী কর্ত্তৃক দৃষ্ট। তৃতীয়টী বিশ্বেদেবার উদ্বংশীয়, যেহেতু ইহাতে উদ্বংশশব্দ রহিয়াছে।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধৎ এই ঋকে সাতটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটী শিখণ্ডী কর্ত্তৃক দৃষ্ট। চতুর্থ ও পঞ্চম সাম আষ্টাদ্রংষ্ট্র নামে কথিত। ষষ্ঠ ও সপ্তম মহাবৈশ্বামিত্র নামে পরিচিত।

ইমমিন্দ্র সুতংপিব এই ঋকে চারিটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটীই ইন্দ্রের প্রিয় অথবা ইহারা বশিষ্ঠের প্রিয়। অথবা ইহাদের দ্বিতীয়টী গৌতম কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি এই ঋকে চারিটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটী সামই গৃৎসমদ অথবা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং ঋক নামে পরিচিত। অথবা ইহাদের তৃতীয়টী অকুপার কর্ত্তৃক দৃষ্ট। অকুপার কশ্যপেরই নামান্তর।

শ্রুধী হবস্তিরশ্চ্যা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে ইহারা আঙ্গিরসে তিরশ্চ্য সংজ্ঞক অথবা ইহারা শুধু তিরশ্চ্য নামেই প্রসিদ্ধ।

অসাবি সোম ইন্দ্রতে এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট। এন্দ্র যাহি হরিভিঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুইটিই কণ্ব ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট। আত্বা গিরোরথীরিব এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

এতোম্বিন্দ্রং স্তবামঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের শুদ্ধাশুদ্ধীয় নামে কথিত। অর্থাৎ ইহারা পরিশুদ্ধের উৎপাদক। অথবা ইহারা বশিষ্ঠের

শুদ্ধাশুদ্ধীয়। যো রয়িং বো রয়িন্তম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা গৌতম কর্তৃক দৃষ্ট এবং রয়িষ্ঠ সংজ্ঞক।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের নবম খণ্ড

কৌল্মলবর্হিষে দ্বে ইন্দ্রস্য নানদং তৃতীয়ং নদতো বাঙ্গিরসস্য শাকপূতশ্চ কৌল্মলবর্হিষেচৈব প্রজাপতেশ্চ মধুশ্চুন্নিধন মুষসশ্চ সাম ভারদ্বাজং চাগ্নেশ্চ দধিক্রং মারুতশ্চ মাধুচ্ছন্দসং বা ॥ ১০ ॥

প্রত্যস্মৈ পিপীষতে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী কুল্মল বর্হি নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। তৃতীয়টী ইন্দ্রের নানদ অথবা অঙ্গিরার পুত্র নদৎ কর্তৃক দৃষ্ট।

আনো বয়োবয়ঃ শয়ম্ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দ্রষ্টা ঋষি শাকপূতি। আত্বারথং যথোতয়ঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুটীই কুল্মলবর্হি কর্তৃক দৃষ্ট।

স পূর্ব্বো মহোনাম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা প্রজাপতি এবং নিধনে মধুশ্রুত শব্দ রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম মধুশ্চুন্নিধন। যদী বহন্ত্যাশবঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা উষা। ত্য মু বো অপ্রহম্ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দ্রষ্টা ভরদ্বাজ। দধিক্রাব্ণো অকারিষম্ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা অগ্নি এবং ইহাদধিক নামে প্রসিদ্ধ পুরাম্ভিন্দুর্যুবা কবিঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা মরুৎ। অথবা ইহা মধুছন্দো নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের দশম খণ্ড

বামদেব্যং চ কাশ্যপং চাপ্সরসং বা মৈযমেধং চ বার্হদুক্থং চাগ্নে-বৈশ্বানরস্য সামনী দ্বে শাকপূতে দ্বে বরুণান্যাঃ সামৌষসশ্চ দেবানাং চ রুচিরুচের্বা রোচন মৃক্সাম্নোঃ সামনী দ্বে ঋচঃ পূর্ব্বম্ সাম্ন উত্তরম্ ॥ ১১ ॥

পপ্রবস্ত্রিষ্টুভমিষম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দ্রষ্টা বামদেব। কশ্যপস্য স্বর্বিদঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কশ্যপ শব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কাশ্যপ। অথবা ইহার নাম অপ্সরস। অর্চত প্রার্চতা নরঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন

হইয়াছে। ইহা প্রিয়মেধ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। উক্থমিন্দ্রায় শংস্যম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বৃহদুক্থ সম্বন্ধীয়।

বিশ্বানরস্য বস্পতিম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা বিশ্বানর নামক অগ্নি। সঘা যস্তে দিবোনরঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম শাকপূত। বিভোষ্ট ইন্দ্র রাধসঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বরুণান্যায়। অর্থাৎ ইহা বরুণানীয় সাম। বয়শ্চিত্রে পতত্রিণঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা উষা।

অমী যে দেবা স্থনঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দেবতাদের রোচণ, অথবা রুচিরুচির রোচণ।

ঋচং সাম যজামহে এই ঋকে দুইটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ঋকসামের সাম। অর্থাৎ ইহাদের প্রথমটী ঋকের পূর্বের এবং দ্বিতীয়টী সামের পরের সাম।

ইতি আর্ষের ব্রাহ্মণের প্রপাঠকের একাদশ খণ্ড

त्रैशोकं शैखण्डिने द्वे अत्रेर्विवर्त्तौ द्वौ महासावेतसे द्वे महाशैरीषे द्वे इन्द्रस्य प्रियाणि त्रीणि वसिष्ठस्य वेन्द्रस्य वैरूपाणि त्रीणि वसिष्ठस्य वा वार्हदुक्थं च त्रासदस्यवे च सौभरे द्वे सोमसाम वैनयोः पूर्वं द्यावापृथिव्योः सामनी द्वे वरुण-सामनी वेन्द्रस्य च श्येनो वैरूपश्च च्यावनं वा ॥ १२ ॥

বিশ্বাঃ পৃতানা অভিভূতরন্নরঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ত্রৈশোক। ইহা ত্রৈলোক্যের শোকাপহরণ করিয়া থাকে।

শ্রত্তে দধামি প্রথমায় মন্যবে এই ঋকে আটটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুটী শিখণ্ডী কর্তৃক দৃষ্ট। পরের দুটী অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থটী অত্রির বিবর্ত সংজ্ঞক। তৎপর-বর্তী দুটী মহাসাবেতস নামক। এবং অন্তিম দুটী মহাশৌরীষ সংজ্ঞক।

সম্মেত বিশ্বা এই ঋকে তিনটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই ইন্দ্রের প্রিয় বা বশিষ্ঠের প্রিয়। ইমেত ইন্দ্র তে বয়ম্ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। তিনটীই ইন্দ্রেরবৈরূপ সংজ্ঞক বা বশিষ্ঠের বৈরূপসংজ্ঞক।

চর্ষণীধৃতং মঘবানমুক্থম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বৃহদুক্থ কর্তৃক দৃষ্ট। আচ্ছাব ইন্দ্রম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ত্রসদস্যু নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। অভিত্যং মেষং পুরুহুত মৃগ্মিয়ম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ত্বং সুমেষং

মহয় স্ববিদম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্দ্বয়াশ্রিত সাম দুটী সুভরি ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। অথবা ইহাদের প্রথমটী সোমসাম।

ঘৃতবতী ভুবনানাম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এদুটীর দেবতা দ্যাবাপৃথিবী অথবা বরুণ।

উভে যদিন্দ্রং রোদসী এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ইন্দ্রের শ্যেন। প্রমন্দিসে পিতুর্মদর্চতাবচ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বৈরূপ অথবা ইহা চ্যবনের পুত্র দধীচি কর্তৃক দৃষ্ট।

ইনি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ড

इन्द्रस्य क्रोशानुक्रोशे द्वे कौत्सं तृतीयं वसिष्ठस्य वा क्रोशानि दैवोदासे द्वे प्रहितोः संयोजने द्वे ओकोनिधनं वैनयोः पूर्वम् हारिवर्णानि चत्वारि त्रैतानि चत्वारि सुराधसश्च प्रराधसश्चाङ्गिरसयोस्त्रीणि सामानि मारुतं वैषां तृतीयं वैश्वमनसम् सौमित्राणि त्रीणि त्रैककुभानि त्रीण्यौक्ष्णोनियानानि त्रीण्यौक्ष्णोरन्ध्राणि वा ॥ १३ ॥

(इति द्वितीयप्रपाठकस्यार्द्धः)

ইন্দ্র সুতেষু সোমেষু এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী ইন্দ্রের ক্রোশানুক্রোশ নামক। তৃতীয়টী কুৎস কর্তৃক দৃষ্ট অথবা বশিষ্ঠের ক্রোশানুক্রোশ সংজ্ঞক।

তমু অভিপ্রগায়ত এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুটী দিবোদাস কর্তৃক দৃষ্ট। দ্বিতীয় দুটীর নাম প্রহিতসংযোজন। অথবা তৃতীয়টীর নাম ওকনিধন।

তংতে মদং গৃণীমসি এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা হরি বর্ণ নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

যৎ সোমমিন্দ্রবিষ্ণবি এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটীই ত্রিতনামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

এদুমধোর্মদিস্তরম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে এবং এন্দুমিন্দ্রায় সিঞ্চত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্দ্বয়াশ্রিত তিনটী সাম আঙ্গিরসের সুরাধস বা প্ররাধস নামে খ্যাত। অথবা ইহাদের তৃতীয়টী অর্থাৎ দ্বিতীয় ঋকে উৎপন্ন সাম মরুদ্দেবতাক।

এতোন্বিন্দ্রং স্তবামঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিশ্বমনা কর্তৃক দৃষ্ট। ইন্দ্রায় সাম গায়ত এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সুমিত্র কর্তৃক দৃষ্ট। সুমিত্র কুৎসেরই অন্য নাম। য এক ইদ্‌বিদয়তে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ত্রিকবুভ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

সখায় আশিষীমহে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ঔক্ষোনিধান অথবা ঔক্ষোরন্ধ্র নামে প্রসিদ্ধ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ত্রয়োদশ খণ্ড

এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় প্রপাঠকের অর্দ্ধ তৃতীয় অধ্যায়

प्रयस्वच्च प्राजापत्य मक्षरं चाक्षरं वा प्रयस्वञ्चैव दैवोदासानि चत्वारीन्द्रस्य सांवर्ते द्वे संवर्त्तस्य वाङ्गिरसस्याक्षारश्चैव यामं वा प्रजापतेश्च दीर्घायुष्यं भरद्वाजस्य च शन्धुग्ररादित्यस्यापामीवेन्द्रस्य वैराजे द्वे वसिष्ठस्य वा प्रजापतेर्वा सहो दैर्घतमसो वा ॥ १४ ॥

গৃণে তদিন্দ্র তে শব এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটীর দেবতা প্রজাপতি। দ্বিতীয়টীর নাম অক্ষর বা আক্ষর এবং তৃতীয়টীর নাম প্রয়স্বন্।

যস্য ত্যচ্ছম্বরম্মদে এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটী সামই দিবোদাস নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

এন্দ্র নো গধি প্রিয় এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের সাংবর্ত নামে কথিত। অথবা ইহারা আঙ্গিরসের সাংবর্ত। রাক্ষসগণের নিরসন করে বলিয়া ইহাদিগকে সাংবর্ত বলে।

য ইন্দ্র সোম পাতম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম আক্ষার। আক্ষার শব্দের অর্থ ক্ষরণসাধন। অথবা এই সামের নাম যাম। তু চে তুনায় তৎসুন এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রজাপতির দীর্ঘায়ুষ্য। বেথা হি নির্ঋতীনাম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজের শুন্ধ্যু অর্থাৎ এই শব্দযুক্ত। অপামী বা মপ স্মৃধম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আদিত্যের অপামীবা অর্থাৎ রোগবিনাশক।

পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বৈরাজ নামক। বিরাট্ ছন্দে রচিত বলিয়া ইহাদের নাম বৈরাজ। অথবা ইহারা বসিষ্ঠের বৈরাজ; অথবা প্রজাপতির সহ। অথবা ইহারা দীর্ঘতমানামক ঋষির বৈরাজ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ড

इन्द्रस्याभ्रातृव्यम् शार्क्करे द्वे बृहत्कम् सौयवसानि त्रीणि मरुतां धेनु मरुतां च सवेशीयम् सिन्धुषाम वेन्द्रस्याभरे द्वे वसिष्ठस्य वा बायो रैषिराणि त्रीण्यैषिरस्य वार्प्रैयमेधस्य प्रजापतेः सीदन्तीये सामनी द्वे पथो वा पत्थस्य वा सौभरे वा सौभ्रवे वा ॥ १५ ॥

অভ্রাতৃব্যো অনাত্বম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রের অভ্রাতৃব্য অর্থাৎ অভ্রাতৃব্য শব্দযুক্ত।

যোন ইদমিদং পুরা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুটীই শার্কর অর্থাৎ শর্কর ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। আগন্তা মারিষণ্যত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বৃহৎক।

আয়াহ্যয়মিন্দবে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ তিনটীই সৌযাবস অর্থাৎ সুযবা কর্তৃক দৃষ্ট। ত্বয়াহ স্বিদ্যুজাবয়ম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম মরুতের ধেনু। গাবশ্চিদ্‌গা সমন্যবঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মরুতের সবেশীয় অথবা ইহা সিন্ধু সাম।

ত্বন্ন ইন্দ্রাভর ওজঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্র বা বসিষ্ঠের আভরসংজ্ঞক অর্থাৎ আভর শব্দবিশিষ্ট।

অধা হি ইন্দ্র গীর্বন্ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বায়ুর ঐষির নামে খ্যাত। অথবা ইহারা ইষির নামক ঋষির অপত্য প্রিয়মেধ কর্তৃক দৃষ্ট।

সীদন্তস্তে বয়োযথা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রজাপতির সীদন্তীয় অর্থাৎ সীদন্তশব্দযুক্ত।

বয়মুত্বা অপূর্ব্যঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সুভরির পুত্র কর্তৃক দৃষ্ট। অথবা ইহারা পথের সাম। অথবা পথের সাম। অথবা পথের সামদ্বয় সোভরি কর্তৃক দৃষ্ট। অথবা ইহারা সুভ্রবিনামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের পঞ্চদশ খণ্ড

यामक्रुत्ससदस्य मदौ द्वा वाभीके द्वे आभीशवे द्वे बार्हद्गिराणि त्रीणीन्द्रस्य च स्वाराज्यं कश्यपस्य च धृष्णु यामं वा मरुतां च सवेशीयम् सिन्धुषाम वा यामे चैव त्रैतानि त्रीणि सौपर्णे द्वे लौशम् ॥ १६ ॥

স্বাদোরিত্থাবিষুবতঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা যম অর্থাৎ

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ { ২য় সংখ্যা

বিষ্ণু

অধ্যাপক **শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী**, এম্. এ., শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ

বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদিশাস্ত্রে বিষ্ণু প্রসিদ্ধ দেবতাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈষ্ণব-দর্শনও দর্শনজগতে এক সমুন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন প্রভৃতি বিষ্ণুর দশাবতারের বর্ণনাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও নিরতিশয় গৌরব লাভ করিয়াছে। বর্তমান হিন্দুধর্মেও বিষ্ণুর অতিশয় প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই সমস্ত কারণে ইহা দৃঢ়তা সহকারে বলা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণু প্রসিদ্ধ দেবতারূপে, অবিচ্ছিন্ন-ভাবে, স্তুতি ভক্তি ও পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বিষ্ণুদেবতার স্বরূপ কি? বৈদিক ও পৌরাণিক বিষ্ণুর স্বরূপে কোন পার্থক্য আছে কি না? যদি থাকে তবে বৈদিক ও পৌরাণিক বিষ্ণুদেবতাকে এক অভিন্ন দেবতারূপে কল্পনা করা যায় কি না? বেদের প্রসিদ্ধ দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি, পৌরাণিক যুগে, পূর্বের ন্যায় স্তুতি ও পূজা পাইতেছেন না। কিন্তু বিষ্ণুর বিষয়ে এইরূপ ঘটে নাই কেন?

ইহা সত্য যে, এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমাদের মনে প্রায়ই উদিত হয়, এবং ইহাদের সমাধানও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে দুই একটি মাত্র কথা বলিব।

প্রথমে দেখা যাউক—বেদের বিষ্ণু দেবতার স্বরূপ কি, এবং ঋষি ও ভাষ্যকারগণ বিষ্ণু-স্বরূপের কিরূপ বর্ণন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় মাত্র ক'একটি বিষ্ণুসূক্ত পাওয়া যায়। বিষ্ণুসূক্তের একটি মন্ত্র—

"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে॥"

এই মন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যাস্ক ঋষি ও সায়ণাচার্য বলিয়াছেন—'যিনি সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হন, প্রবেশ করেন বা বিদ্যমান থাকেন তিনিই বিষ্ণু'। উক্ত ঋগ্‌বেদের মন্ত্র হইতে জানা যায় যে—বিষ্ণুদেব তিন বিভিন্ন প্রকারে পাদবিক্ষেপ করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। আচার্য শাকপূণির মতের ব্যখ্যা হইতে মনে হয়—বিষ্ণুশব্দের অর্থ বিশ্বব্যাপক সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি। বিষ্ণু সূর্যরূপে দ্যুলোকে, বিদ্যুৎরূপে অন্তরীক্ষলোকে ও পার্থিবাগ্নিরূপে ভূলোকে পদ স্থাপন করেন। কিন্তু আচার্য ঔর্ণবাভ বিষ্ণুর ত্রিপ্রকার পাদ-বিক্ষেপের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ঔর্ণবাভের মতে বিষ্ণু সূর্য। তাঁহার প্রথম পাদ উদয়াচলে, দ্বিতীয়পাদ মধ্যাকাশে ও তৃতীয়পাদ অস্তাচলে স্থাপিত হয়। ঋগ্‌বেদের—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র শুক্লযজুর্বেদ সংহিতাতেও পাওয়া যায়। শুক্ল যজুর্বেদের ভাষ্যকার আচার্য উবট ও মহীধরের মতে বিষ্ণুর ত্রিপাদ—পৃথিবীতে অগ্নি, আকাশে বায়ু ও দ্যুলোকে সূর্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিষয়ে আচার্য শাকপূণি, উবট ও মহীধরের মত প্রায় একরূপ। নিরুক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য বলিয়াছেন—'যখন সূর্য রশ্মিজাল দ্বারা পরিব্যাপ্ত হন, বা সর্বত্র প্রবিষ্ট হন, কিংবা সর্ববস্তু পরিব্যাপ্ত করেন তখন বিষ্ণুনামে অভিহিত হন।' সুতরাং আচার্যগণের এই সমস্ত মতবাদ সম্যক্ অনুধাবন সহকারে বিচার করিলে ইহাই মনে হয় যে বৈদিক বিষ্ণু সূর্য হইতে অভিন্ন। আধুনিক মনীষিগণও এই মতেরই পরিপোষণ করিয়াছেন। এখন তবে এই বিষয়ে সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে যে—মিত্র, সবিতা, সূর্য ও পূষার মত বিষ্ণুও সূর্যের নামান্তর, এবং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মধ্যাকাশবর্তী সূর্যই বিষ্ণুশব্দের মুখ্য প্রতিপাদ্য অর্থ। কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বেদ সংহিতায় বিষ্ণুর ত্রিপাদ, বামন অবতারের বামনের ত্রিপাদ হইতে স্বতন্ত্র। বামন-বিষ্ণুর কথা প্রথমে শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে ইহা রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ ও বামনপুরাণাদিতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে জানা যায়, যে ভগবান্ বিষ্ণু দেবতাদিগের হিতের জন্য, দেবমাতা অদিতির ও দেবজনক কশ্যপের পুত্ররূপে, বামন মূর্তিতে অবতীর্ণ হন। বামনদেব, দেবদ্রোহী দৈত্যরাজ বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান লাভ করেন ও ত্রিবিক্রমরূপে ত্রিপাদ প্রসারিত করিয়া সমস্ত পৃথিবী, আকাশ ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলেন এবং দৈত্যরাজ বলিকে পাতালে প্রেরণ করিয়া দেবতাদিগকে বলির অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। শাস্ত্রে আছে—এই বামনই বিষ্ণুনামক অদিতিনন্দন আদিত্য। যাস্ক ঋষি বলিয়াছেন—'আদিত্য শব্দের অর্থ সূর্য'। লোকব্যবহারেও আদিত্যমণ্ডল বলিতে সূর্যমণ্ডলই বুঝায়। সুতরাং এই সমস্ত বিচার হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, বেদের বিষ্ণুই পুরাণে বামন অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার কারণ কি তাহা এখন দেখা যাউক। আর্য মুনি-ঋষিগণের মতে—স্ত্রী, বালক ও শূদ্রাদির বেদ শ্রবণেও অধিকার নাই। অতএব তাহাদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও শাস্ত্রকর্তা অন্যান্য মুনিগণ সকলের বোধগম্য করার জন্য

বেদে বর্ণিত বিষয়গুলিকে সরল ও প্রাঞ্জলভাবে পুরাণে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। বেদবাক্য গূঢ়ার্থ প্রতিপাদক, কিন্তু পুরাণবাক্য বন্ধুবাক্যের তুল্য প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। বেদের গূঢ় অর্থ সহজভাবে কথাচ্ছলে, স্ত্রীশূদ্রাদির বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই পুরাণে স্থানবিশেষে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বেদের বিষ্ণু ও পুরাণের বামন-অবতার। বেদে ইন্দ্র শব্দের প্রকৃত গূঢ় অর্থ 'সূর্য' এবং বৃত্রশব্দের অন্যতম প্রসিদ্ধ অর্থ 'আবরক অন্ধকার'। সুতরাং বেদের ইন্দ্র-বৃত্র-যুদ্ধ আলোক ও অন্ধকারের যুদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই ইন্দ্র, বিষ্ণু হইতে অভিন্ন। ইন্দ্রসূক্ত ও বিষ্ণুসূক্ত পাঠে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈদিক ভাষায় দেব শব্দের এক অর্থ 'দ্যোতমান কিরণ,' ও বলি শব্দের অন্যতম অর্থ—'আবরক অন্ধকার'। অতএব এইরূপ নিরুক্তি ও অর্থ প্রতীতি হইতে ইহাই বোঝা যাইতেছে যে, বিষ্ণুরূপী সূর্য নিজের ত্রিমূর্তিতে অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও সূর্যরূপে,অথবা উদয়াচল, মধ্যাকাশ ও অস্তাচলে পাদস্থাপনরূপ নিজের কার্য-দ্বারা, অন্ধকাররূপী বলি দৈত্যকে গুহাবিবরাদিরূপ অথবা পৃথিবীর অধস্তলরূপ পাতালে প্রেরণ করিয়া কিরণরূপী দেবতাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেছেন। মনে হয়, বিষ্ণুসূক্তের গুরুগম্য এই গূঢ়ার্থ অবলম্বন করিয়াই, স্ত্রীশূদ্রাদির বোধের জন্য, সরল ভাব ও ভাষায় বলি-বামন উপাখ্যান পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। আকাশবিহারী সূর্য্যমণ্ডলকে খ-গ-পতি গরুড়রূপে সৌর-চক্রকে চক্ররূপে, ও আকাশগুণ শব্দকে শঙ্খরূপে বল্পনা করিয়াই, সূর্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু-নারায়ণকে—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি পৌরাণিক ধ্যানমন্ত্রে, ধ্যান করিবার বিধান, উপাসনা-শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বেদের প্রসিদ্ধ উষা দেবতার কথাও আসিয়া পড়ে। বেদে উষাদেবীকে 'সূর্যস্য যোষা' অর্থাৎ সূর্যের পত্নী বলা হইয়াছে। বিশ্বব্যাপক মধ্যাকাশবর্তী সূর্যই বিষ্ণু। সুতরাং উষাদেবী বিষ্ণুর পত্নী। এই উষা দেবীকে বেদে কখনও 'হিরণ্যবর্ণা', কখনও বা 'শুভ্রা' অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাতঃকালে উষাদেবীর এই উভয় বর্ণই বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। 'মঘোনী', 'রেবতী', 'বাজিনীবতী' ও 'চিত্রমঘা' প্রভৃতি উষার বিশেষণ হইতে বুঝা যায়—উষা ধনের দেবী বা ঈশ্বরী। এবং 'বুধানা' ও 'প্রচেতাঃ' প্রভৃতি উষার বিশেষণ হইতে বুঝা যায়—উষা জ্ঞানেরও ঈশ্বরী। সুতরাং বেদের উষার বর্ণনা হইতে ইহাই মনে হয় যে, হিরণ্যবর্ণা ও ধনদা বিষ্ণুপত্নী উষাই ঋগ্বেদের খিলভাগের শ্রী ও লক্ষ্মীসূক্তে এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীরূপে দেখা দিয়াছেন। মহাভারত ও ভাগবত পুরাণাদিতে অমৃতমন্থন প্রসঙ্গে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও বিষ্ণুকে পতিরূপে বরণের যে বর্ণনা আছে তাহা হইতেও এইরূপ অনুমানেরই পরিপুষ্টি সাধিত হয়। পুনরায় এই স্থলে ইহাই সঙ্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে যে, শুভ্রবর্ণা ও জ্ঞানের ঈশ্বরী এই উষাদেবীই ঋগ্বেদের সরস্বতীসূক্ত ও বাক্‌সূক্তের শুভ্রবর্ণা সরস্বতী ও সর্বজ্ঞানময়ী বাগ্‌দেবতার সহিত, বিশিষ্ট সাদৃশ্যবলে, ক্রমশঃ একতাপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগে বিষ্ণু-পত্নী সরস্বতীরূপে দর্শন দিয়াছেন। সেইজন্য বিষ্ণুর ধ্যানে বলা হইয়াছে—"লক্ষ্মী-সরস্বতীকান্তং গরুড়াসনমাশ্রয়ে"। এইরূপে

কালক্রমে বেদের প্রসিদ্ধ দেবতা উষা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন বলিয়াই, বোধ হয়, তাঁহাকে আমরা পুরাণ ও তন্ত্রাদিশাস্ত্রে আর একেবারেই উষা নামে দেখিতে পাই না। অতএব এখন ইহাই দেখা যাইতেছে যে, বেদের বর্ণিত উষার পতি সূর্যরূপী বিষ্ণুই পুরাণে লক্ষ্মী-সরস্বতী-পতি, গরুড়বাহন বিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছেন; এবং বেদের বিষ্ণুর ত্রিপ্রকার পাদস্থাপন ও অন্ধকার দূরীকরণই পুরাণে বামন ও বলি-সংবাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে—বেদের শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি, ঐ সকল মূর্তিতে, পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু বৈদিক যুগে তেমন প্রতিষ্ঠা না থাকিলেও পরবর্তীকালে, বিষ্ণুর এত প্রতিষ্ঠা কিরূপে সম্ভবপর হইল? এই কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আর্যদের যে যে দেবতা, ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যদের যে দেবতার সঙ্গে ঐক্য-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেবল সেই সেই দেবতাই পরবর্তী যুগে নিরতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ও আজ পর্যন্ত পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার উদাহরণ স্বরূপ, বিশেষরূপে বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ করা যায়। মহেঞ্জদরো প্রভৃতি স্থানে, ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মুদ্রাদি হইতে ইহাই প্রতীত হয় যে বহু পূর্বকাল হইতেই এই ভারতবর্ষে শিব ও শক্তি প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। আর্যদের এইদেশে সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তারের পরে, আর্য ও অনার্য জাতির মধ্যে ধর্মাদি সমস্ত বিষয়েই, চিরন্তন নিয়ম অনুসারে, এক 'আদান-প্রদাননীতি' চলিয়াছিল। পৌরাণিক শিব ইহার অন্যতম উদাহরণ। ঋগ্‌বেদে ক'একটি রুদ্রসূক্ত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোনও শিবসূক্ত নাই। বেদে ঈশান প্রভৃতি শব্দ কেবল রুদ্রের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী যুগে, ঐগুলিই শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, বৈদিক রুদ্র ও ভারতীয় শিবের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় 'আর্য-অনার্য সংমিশ্রণ যুগে' রুদ্র ও শিব এক অভিন্ন দেবতা হইয়া গিয়াছেন, এবং রুদ্র, ঈশান, মহাদেব ও শিব প্রভৃতি শব্দ একই দেবতার বাচকরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এইখানেই বোধ হয়, শিবের প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ প্রচ্ছন্নরূপে রহিয়া গিয়াছে। এখন বিষ্ণুর বিষয় ভাবিতে গেলেও এইরূপই একটা কিছু কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। বামন অবতারের কথা পুরাণেই বিশেষরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বেদ সংহিতায় ঐ অবতারবাদের স্পষ্ট বর্ণনা নাই। বামন অবতারের কথার মত কোনও একটি কথা বোধ হয়, কোনও একরূপে, আদিম ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরে 'আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের' যুগে ও আর্যদের প্রচেষ্টায়, অনার্যদের বামন বা ঐরূপ কোনও দেবতা, বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন ও বিষ্ণুরূপে পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারের মধ্যেও এইরূপই একটা কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয়।

এই বিষ্ণু ও শিবের প্রসঙ্গে আর একটি পৌরাণিক দেবতার কথা আসিয়া পড়ে। ইনি পৌরাণিক হংস-বাহন ব্রহ্মা। বর্তমান হিন্দুধর্মের প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের প্রসিদ্ধির মত ব্রহ্মার প্রসিদ্ধি হয় নাই—ইহা শাস্ত্রজ্ঞ সকলেই জানেন। ব্রহ্মা কেবল পুরাণে

তীর্থেই বর্ত্তমান সময়ে বিশেষরূপে পূজিত হইতেছেন, অন্যত্র তাঁহার পূজা প্রায় এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? মনে হয়, বেদের ব্রহ্মা বা প্রজাপতির সহিত পৌরাণিক ও প্রাগ্‌বৈদিক ভারতীয় হংসবাহন ব্রহ্মা বা ঐরূপ কোন দেবতার ঐক্য সুস্পষ্ট-রূপে সকলের হৃদয়গ্রাহী না হওয়ায়, ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর ন্যায় ভারতবর্ষে সর্বত্র নিরন্তর সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, অন্ততঃ একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বেদের অনেক দেবতাই কোনও বিশিষ্ট কারণে, পুরাণে এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছেন। পুরাণের ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ। পুরাণ ও তন্ত্রে এই বিষয়ের আরও অনেক বিস্ময়কর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। পরে এই বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলার ইচ্ছা রহিল।

মনসামঙ্গলে মথন-পালা
ও
পৌরাণিক সমুদ্র-মন্থন

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী এম. এ.

সমুদ্র-মন্থন ঘটনাটি মহাভারতাদি কাব্য এবং প্রায় সকল পুরাণেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘটনাটি মূলতঃ এক হইলেও বিস্তার-বাহুল্যে পুরাণগুলি একমত নয়। বাংলা ভাষায় রচিত মঙ্গল কাব্যেও এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ দেখা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে *একটি অনুরূপ মথন-পালা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনার মুখ্য উদ্দেশ্যে এবং তাহার সন্নিবেশ ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে সকল দিক দিয়াই ইহা পুরাণোক্ত সমুদ্র-মথন হইতে স্বাতন্ত্র্য দাবী করিতে পারে। পুরাণগুলিও যে পরস্পর একমত নয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি, কিন্তু কেতকাদাসের সঙ্গে তাহাদের অমিল এত বেশী যে ইহাকে এক প্রকার নূতন রচনা বলিয়াই ধরিতে হয়। এই প্রবন্ধে কেবল বিষ্ণুপুরাণ ও

---

* কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-বিরচিত মনসামঙ্গল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এম. এ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইতেছে। উদ্ধৃত অংশগুলি উক্ত গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সমুদ্র-মন্থনের সঙ্গে কেতকাদাসের মন্থন-পালার তুলনামূলক সমালোচনা করিব।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে সমুদ্র-মন্থনের প্রশ্ন উঠিলেও ঘটনা এক। দুর্বাসা-শাপে শ্রীদেবী স্বর্গ ত্যাগ করিলে দেবতাগণ হতশ্রী হইয়া অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হন। এবং ব্রহ্মা পুরঃসর নারায়ণকে স্তবে তুষ্ট করিয়া ক্ষীরোদ সাগর মন্থনের আদেশ প্রাপ্ত হন। তারপর সকল দেবতা ও অসুরে মিলিয়া নানা ওষধি আনিয়া সাগরে ফেলেন এবং মন্দরকে মন্থন-দণ্ড এবং বাসুকিকে বন্ধন-রজ্জু করিয়া সাগর-মন্থনে নানাদ্রব্য সহ শ্রীদেবীকে পুনর্লাভ করেন।

বিষ্ণুপুরাণ দুই শ্লোকে সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়াছেন :—

"মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা মৈত্রেয় তরসামৃতম্॥১।৯।৮৩
ক্ষীরোদ মধ্যে ভগবান্ কূর্মরূপী স্বয়ং হরিঃ।
মন্থানাদ্রেরধিষ্ঠানং ভ্রমতোঽভূন্মহামুনে॥১।৯।৮৭

ভাগবতে এইটুকু বেশ রসালভাবে রচনা করা হইয়াছে। দেবাসুরগণ মন্দর পর্বতের ভার বহিতে না পারিয়া পথের মধ্যে ফেলিয়া দিল। তাহাতে বহু দেবাসুর হতাহত হইল। তারপর নারায়ণ গরুড়ে করিয়া আসিয়া একহাতে করিয়া তাহা সমুদ্রে ফেলিলেন।

গিরিঞ্চারোপ্য গরুড়ে হস্তেনৈকেন লীলয়া।
আরুহ্য প্রযযাবব্ধিং সুরাসুরগণৈর্বৃতঃ॥৮।৬।৩৮

বাসুকিও বিনা আশায় আসে নাই। অমৃত ভাগ পাইবে এই লোভে স্বীকৃত হইয়াছে।

তে নাগরাজমামন্ত্র্য ফলভাগেণ বাসুকিম্।
পরিবীয় গিরৌ তস্মিন্ নেত্রমব্ধিং মুদান্বিতাঃ॥৮।৭।১

কূর্মরূপ ধারণ করিয়া পর্বত ধারণের কারণও ভাগবতে পরিষ্কার। গুরুভার মন্দর বার বার সমুদ্রে ডুবিয়া যায়—তাই ভগবান্ তাহা কূর্মরূপে পৃষ্ঠে ধরিলেন।

বিলোক্য বিঘ্নেশবিধিং তদেশ্বরো
দুরন্তবীর্যোঽবিত আভিসন্ধিঃ।
কৃত্বা বপুঃ কচ্ছপমদ্ভুতং মহৎ
প্রবিশ্য তোয়ং গিরি মুজ্জহারহ॥ ভাগবত, ৮।৭।৮

এই বিষয়গুলিতে অর্থাৎ মন্দর, বাসুকী ও কূর্মের সাহায্যে যে সমুদ্র-মন্থন হইয়াছিল তাহাতে কেতকাদাস একমত আছেন। কেবল অধিক হনুমানকে আনিয়াছেন বাসুকীর পুচ্ছ ধরিয়া টানিতে। কারণ বোধ হয় এই যে, গন্ধমাদন মাথায় করিয়া যে

শৃঙ্গে আসিয়াছিল সেই মহাবীর ছাড়া এ মহাকর্মে কোন যোগ্য ব্যক্তি কেতকাদাসের চোখে পড়ে নাই। মনসা মঙ্গলে আছে—

বাসুকী ছাদন দণ্ড কূর্ম আসি হৈল ভাণ্ড
হনুমান টানেন ছাদনি ॥—মথন পালা, পৃঃ ২৫

আবার—

হনুমন্ত টানে দড়ি শুনি সিন্ধু হুড় হুড়ি
মন্দার করিয়া তাহে দণ্ড ॥—মথন পালা, পৃঃ ২৬

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে, কেতকাদাস দেবাসুরের যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, এবং বাসুকির পুচ্ছদেশে দেবতা এবং মুখের দিকে অসুরগণের ধরিবার যে উদ্দেশ্য ও বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে আছে, তেমন কোন কথা বা ইঙ্গিত মনসামঙ্গলে নাই। অবশ্য মথন-পালার আরম্ভের আকস্মিকতায় স্পষ্টই মনে হয় পালা খণ্ডিত, তবুও দেবাসুর এখানে প্রতিপক্ষ বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। সকলের সঙ্গে যেন তাহারাও আসিয়াছে। কেবল একটা লাইনে অসুরদের আছে—

'অসুর প্রবল বলে শেষপতি কাল'—মথন-পালা, পৃ° ১৯

আর বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে যেমন শ্রীহরির আদেশে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, মনসা-মঙ্গলে তেমনি হর সমস্ত কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক, কারণ অমৃত সংগ্রহ ও লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধারই পুরাণে সমুদ্র-মন্থনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এবং অন্য সব উদ্ধৃত বস্তু অনেকট আকস্মিক। কিন্তু মনসা-মঙ্গলে ঠিক তাহার বিপরীত। বিষোৎপত্তি এবং নাগমাতা মনসার মাহাত্ম্য ও শিবের উপর একাধিপত্যের বিষয়ই এস্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। কেতকাদাস সমুদ্রমন্থনেই চাঁদ সদাগরে সৃষ্টি করিয়া মনসার সহিত বিবাদের কথাও স্পষ্টভাবে কহিয়াছেন।

মনসামঙ্গলে একটি চমৎকার গবেষণা আছে। দেবগণসহ মহেশ সমুদ্রতীরে আসিয়া অবাক হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—

আছিল উত্তম জল অগাধ নির্মল।
শ্বেতবর্ণ দেখি কেন সমুদ্রের জল ॥ মথন পালা, পৃ. ১৯

ব্রহ্মা ইহার কারণ কহিলেন—

ব্রহ্মা বলেন শুন হর তেজোময়
ধিয়ানে জানিল এই কপিলার পয়। মথন পালা, পৃ° ১৯

কিন্তু কেন যে ইহা কপিলার দুধ হইল ব্রহ্মা তাহা বলেন নাই।

ব্রহ্মা বলেন ইহার আছে পূর্ব কথা।
কপিলার দুগ্ধ এই কভু নহে মিথ্যা। মথন পালা, পৃ ১৯

কিন্তু পূর্ব কথা কি তাহা হর জানেন নাই, কেবল শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু

অসুবিধা হইল অন্যত্র, দুধ যদি দধি না হয় তবে মন্থন করা হইবে কেমন করিয়া ? তাই অমৃত পাইবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসিলেন—

উপদেশ বলহ কেমনে হব দধি—মথন পালা,— পৃ° ২০

ব্রহ্মা বুদ্ধি দিলেন –

প্রজাপতি বলে শুন শান্ত শূল।
দুগ্ধ আছে দধি হয আনিলে তেঁতুল॥ মথন পালা, পৃ. ২০

শুধু যে ইহা বাঙালী জীবনের প্রত্যক্ষ ও রিয়ালিষ্টিক রচনা তাহাই নয়, মনে হয় ইহার মৌলিকত্বও অবিসম্বাদিত। তাবপব বাবণেব লঙ্কা হইতে টিয়াপাখী তেঁতুল আনিয়া দুধসাগরকে দধিসাগরে রূপান্তবিত করিল। এই বর্ণনাগুলি আলোচ্য পুবাণদ্বযে নাই।

ইহার পব মন্থন আবন্ত হইল।

বিষ্ণুপুবাণে মন্থনলব্ধ দ্রব্যগুলিব ক্রম এইরূপ—সুবভি, বারুণী, পাবিজাত, অপ্সরাগণ, চন্দ্র, বিষ, অমৃতসহ ধন্বন্তবি ও সর্বশেষে লক্ষ্মী। ভাগবতেব ক্রম অন্যরূপ – প্রথমেই বিষ, তৎপব সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐবাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজগণ, কৌস্তুভমণি, পাবিজাত, অপ্সবাগণ, লক্ষ্মীদেবী, বারুণী অমৃত-কলসসহ ধন্বন্তবি। উচ্চৈঃশ্রবা ও কৌস্তুভমণিব কথা বিষ্ণুপুরাণে নাই।

মনসা মঙ্গলে এইরূপ—

প্রথম মথনে মুনি হবষিত চক্রপাণি
তবে লক্ষ্মী দ্বিতীয মথনে।
তৃতীয় মথনে চন্দ্র ধন্বন্তবি বোগ অন্ত
পঞ্চম মথনে পঞ্চজনে॥ মথন-পালা, পৃ° ২৬

পঞ্চজন কথাটিব আভিধানিক অর্থ পঞ্চভূতে জন্মে যে, কিন্তু এই পঞ্চজন বোধ হয় অপ্সরা। তাবপর—

অসপ্ত মথনে জন্ম ঐরাবত করি কর্ম
তাহা হইল ইন্দ্রের বাহন।
অমৃত জন্মিল তবে দেখিয়া দেবতা সভে
হবষিতে করিলা ভক্ষণ॥ মথন পালা, পৃ° ২৬

ষষ্ঠ মথনে ঐরাবত এবং সপ্তম মথনে অমৃত উঠিল। অমৃত ভক্ষণে এখানে দেবাসুর বিরোধের ইঙ্গিত মাত্র নাই।

তারপরে—

অষ্টম মথনে হইল হংস।
নবম মথনে বস্ত্র দেবগণে লাগে ধন্দ
দশম মথনে চাঁদ কন্যা

একাদশে অগ্নিজ্বলে মহেশে নারদ বলে
সমূল সঙ্কুল ইহা জন্যা ॥ মথন পালা, পৃ° ২৬

হংস, দ্বন্দ্ব, চাঁদকন্যা ও অগ্নি এই চারিটি দ্রব্যই নূতন। অগ্নি মানে বাড়বানল বোঝা গেল, কিন্তু দ্বন্দ্ব মানে কি ?—কলহ ?

তারপর উঠিল—"কালকূট দ্বাদশ মথনে।"

বিষ্ণুপুরাণ মতে সমুদ্রমন্থনে উঠিয়াছিল আটটি দ্রব্য এবং বিষ, অমৃত ও লক্ষ্মীর স্থান যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম। ভাগবত মতে মন্থন-জাত দ্রব্যের সংখ্যা দশ এবং বিষ, অমৃত ও লক্ষ্মীর স্থান যথাক্রমে প্রথম, দশম ও অষ্টম। এই পুরাণদ্বয়ের মতে সমুদ্র-মন্থনের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রী-লাভ এবং তাহার ক্রম উভয় পুরাণেই অষ্টম হইয়াছে। কেতকাদাস মন্থন-জাত দ্বাদশটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিষ, অমৃত ও লক্ষ্মীর উত্থানক্রম যথাক্রমে দ্বাদশ, সপ্তম ও দ্বিতীয় হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার লবণ, হংস, দ্বন্দ্ব, চাঁদকন্যা ও বাড়বাগ্নি এই পাঁচটি নূতন অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে ইহা নাই।

তারপর কোন জিনিসগুলি কাহার অধিকারে আসিল সে সম্বন্ধেও কেতকাদাস ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ক্ষীরোদ করিলা হর দ্বাদশ মথনে।
লক্ষ্মী দেবী সপিলা দেব নারায়ণে ॥—মথন পালা, পৃ° ২৭

বিষ্ণুপুরাণে—

দিব্য মালাম্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা।
পশ্যতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষস্থলং হরে ॥ ১।৯।১০৪

ভাগবতে—

বব্রে বরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং
রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষমীপ্সিতম্ ॥ ৮।৮।২৩ (অর্ধ)

দেখিবার বিষয় এই যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত মতে রমা নিজেই শ্রীহরিকে বরণ করিলেন, কিন্তু মনসামঙ্গলে দেখা যাইতেছে, লক্ষ্মীদেবীকে নারায়ণের হাতে সমর্পণ করিলেন শিব-ঠাকুর। খুব সূক্ষ্ম প্রভেদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাদ্বারা মঙ্গল-সাহিত্যে শিব-প্রাধান্য বিষয়ে আলোকপাত খুব স্পষ্টভাবে করা হইয়াছে।

তারপর—

গগনে আসিয়া চন্দ্র করিলা প্রকাশ।
ঐরাবত নিল ইন্দ্র ব্রহ্মা নিল হাঁস ॥—মথন পালা, পৃ° ২৭

ভাগবতে চন্দ্রের কথা নাই। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে, চন্দ্রকে চন্দ্রশেখর মহাদেব গ্রহণ করিলেন।

ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগৃহে তৎ মহেশ্বরঃ ॥—১।৯।৯৬

সুতরাং চন্দ্র যে আকাশে স্থান পাইলেন এটা প্রত্যক্ষ দর্শনাভিজ্ঞতা-জাত এবং মনসা-মঙ্গলে বোধ হয় মৌলিক। আমি কেবল মন্থন পালার কথা কহিতেছি। কেতকাদাস আকাশে যাইবার কারণও কহিয়াছেন।

বিষে জ্বলে সর্ব সিন্ধু গরল দাহনে ইন্দু
গগনমণ্ডলে কৈল বাস ॥—মথন পালা, পৃঃ ২৭

ঐরাবতের কথা বিষ্ণুপুরাণে নাই, ভাগবতে আছে, কিন্তু কাহার ভাগে ঐরাবত পড়িল সে কথা এ স্থানে বলা হয় নাই। হাঁস মনসা-মঙ্গলের নিজস্ব সম্পদ্।

তারপর দেখি—

ব্রহ্মমন্ত্র দিল ব্রহ্মা ধন্বন্তরি কানে।
রোগের বিনাশ হেতু সেই মহাজনে ॥—মথন পালা, পৃঃ ২৭

বিষ্ণুপুরাণ এ বিষয়ে নীরব। ভাগবতে শ্লোকার্ধে ধন্বন্তরিকে আয়ুর্বেদপারদর্শী বলা হইয়াছে।

ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥—৮।৮।৩৫

মনসামঙ্গলে তারপর আছে—

চাঁদকে দিলেন হর ব্রহ্ম-জ্ঞান কয়্যা।
মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পায়্যা ॥
সিন্ধু সমর্পণ হৈল বাড়ল আনল।—মথন পালা, পৃঃ ২৭

এগুলি উক্ত পুরাণদ্বয়ে নাই। বাড়বানল সম্বন্ধে পৌরাণিক মত আছে, তাহা অন্য প্রসঙ্গে। শৈব-ধর্মের সহিত লৌকিক ও শাক্ত-ধর্মের বিরোধের আভাস 'মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পায়্যা' কথার মধ্যে খুব স্পষ্ট হইয়াছে।

শিবের বিষ পাণ লইয়া কেতকাদাস খানিক করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন; এবং মনসা ও চণ্ডীর বিবাদ খুব অকৃপণ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই অংশের শেষে মনসা বিষ-পাণে মৃতকল্প হরকে জিয়াইলেন এবং উদ্গীরিত বিষ নিয়া একেবারে নিক্তি ধরিয়া মাপিয়া জুপিয়া নাগকে পরিবেশন করিলেন। এই অংশ বিস্তৃত ও বর্ণনাচাতুর্যে জীবন্ত হইয়াছে।

শিবের বিষ-পাণ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ নীরব। কিন্তু ভাগবতে ইহা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ-পাণের জন্য শিবকে কৈলাস হইতে ডাকিয়া আনা হইল এবং সমস্ত প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি তাহা পান করিলেন।

ততঃ করতলীকৃত্য ব্যাপি হলাহলং বিষম্।
অভক্ষয়ন্মহাদেবঃ কৃপয়া ভূতভাবনঃ ॥—৮।৭।৪২

তস্যাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্যং জল-কল্মষঃ।
যচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্॥ ৮।৭।৪৩

মনসা-মঙ্গলে আছে—

বীজ মন্ত্র করিয়া পড়েন বিষহরি।
গরল উগারি দিল দেব ত্রিপুরারি॥
অবশেষে বিষ রহিল শিবের গলায়।
নীলকণ্ঠ নাম রহিল দেবতা সভায়।—মথন পালা, পৃ° ৪৩

বিষহরির মন্ত্র প্রয়োগ ও মহেশের বিষ উদ্গীরণ ছাড়া ঘটনা এক।
তারপর মনসা-মঙ্গলের মতে সেই বিষ দেবগণ মনসাকেই দিলেন।

মনসার তরে বলে দেবতাসকল।
সভে মেলি সমর্পিল তোমারে গরল॥
আজি হৈতে নাম তোমার বিষ-বিনোদিনী।
গরল বাটিয়া দেহ ডাক যত ফণী॥—মথন পালা, পৃ° ৪৩

তারপর দেখা যায়—

ত্রিভুবনে আছিল দেবীর যত ফণী।
ডাকিল সভার তরে বিষ-বিনোদিনী॥—মথন পালা, পৃ° ৪৯

এবং ডাকিয়া সকলকে বিষ বণ্টন করিয়া দিলেন।

বিষের ভাগ যে সর্পে পাইল তাহা বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে আছে। ভাগবতে আছে, মহাদেবের বিষ পানের সময় যতটুকু হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাই সর্পাদি দংশকগণ পাইয়াছিল।

প্রস্কন্নং পিবতঃ পানের্যৎ কিঞ্চিজ্জগৃহুঃ স্ম তৎ।
বৃশ্চিকাহি বিষৌষধ্যো দন্দশূকাশ্চ যেহপরে॥ ৮।৭।৪৬

বিষ্ণুপুরাণে মহাদেবের বিষপাণ সম্বন্ধে কিছু নাই। সুতরাং কি হস্ত-গলিত, কি উদ্গীরিত কোন বিষই সেখানে উল্লিখিত নাই। কেবল বিষ উত্থিত হইলে নাগগণ তাহা গ্রহণ করিল। ইহা শ্লোকার্ধে লিখিত হইয়াছে।

জগৃহুশ্চ বিষং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুত্থিতম্॥১।৯।৯৬

ইহা ব্যতীত কেতকাদাসের মথন-পালার সঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ কিম্বা ভাগবতের মন্থন প্রসঙ্গের কোন মিল নাই।

সংহিতা-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বামী ভূমানন্দ

২। "যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥" মনু ২।৯৫

"যঃ কামানাপ্নুয়াৎ সর্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাংস্ত্যজেৎ
প্রাপণাৎ সর্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে ॥" মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৭৭।১৬

৩। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥" মনু ২।৯৪ / মহাভারত, আদিপর্ব ৭৫।৫০, ৮৫।১২

৪। "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্নাপ্যন্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জ্ঞানবানপি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥" / জড়বৎ সমুপাবিশেৎ ॥ মনু ২।১১০ / মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৮৭।৩৫

৫। "গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং / বনমেব সমাশ্রয়েৎ ॥" মনু ৬।২ / মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৪৩।৪

৬। "অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥" মনু ৯।৩২১ / মহাভারত, শান্তিপর্ব ৫৬।২৪

মহাভারতের এই সমস্ত ও অন্যান্য শ্লোক মনুসংহিতায় দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, মনুসংহিতা মহাভারতের পরে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না; কারণ মহাভারতেও মনুসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই। শরতল্পগত ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট জলদান-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা কীর্তন প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"পানীয়ং পরমং দানং দানানাং মনুরব্রবীৎ
তস্মাৎ কূপাংশ্চ বাপীশ্চ তড়াগানি চ খানয়েৎ ॥" মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ৬৫।৩

অন্যত্রও দেখি—

"পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাঙ্গবেদশ্চিকিৎসিতম্
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ ॥" মহাভারত

উল্লিখিত উক্তি দুইটি হইতে অনুমান করা যায় যে, মনুসংহিতা মহাভারতেরও পূর্ববর্তী। এই সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইলে, একথাও স্বীকার করিতে হয় যে, মনুসংহিতায় মহাভারতের শ্লোকগুলি পরে

সন্নিবেশিত হইয়াছে। মনুসংহিতা ও মহাভারতের পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে পি. ভি. কাণে (P. V. Kane) প্রণীত 'History of Dharmasastra' গ্রন্থে বিশেষ গবেষণাপূর্ণ তথ্য দৃষ্ট হয়। মহাভারত সম্বন্ধে জার্মান্ প্রফেসার ডক্টর হ্বুইণ্টারনিস্ (Dr. Winternitz) বহু গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্তমানেও ডক্টর সুকৃথঙ্কর, এম. এ., পি. এইচ্. ডি মহাশয়, পুনা ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে, মহাভারত সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণামূলক অনেক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলে কালে মহাভারত ও মনুসংহিতার পৌর্বাপর্যও নিঃসন্দেহ ভাবেই নির্দেশিত হইবে।

১২। অন্যান্য সংহিতাগুলির পৌর্বাপর্য সম্বন্ধে কোনও প্রকার নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে যে সংহিতায় অপর সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরবর্তী বলা যাইতে পারে মাত্র—

(ক)	অত্রি-সংহিতায়	শঙ্খ ও আপস্তম্ব	সংহিতার উল্লেখ আছে।
(খ)	যাজ্ঞবল্ক্য ,,	আলোচিত ২০ খানি	,, ,, ,,
(গ)	কাত্যায়ন ,,	বশিষ্ঠ ও গৌতম	,, ,, ,,
(ঘ)	বৃহস্পতি ,,	ব্যাস	,, ,, ,,
(ঙ)	পরাশর ,,	যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম ও বশিষ্ঠ	,, ,, ,,
(চ)	শঙ্খ ,,	যম	,, ,, ,,
(ছ)	লিখিত ,,	যম	,, ,, ,,
(জ)	বৃদ্ধগৌতম ,,	আলোচিত ২০ খানি সংহিতার মধ্যে ১৪ খানির উল্লেখ আছে। বিষ্ণু, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি শাতাতপ ও দক্ষ সংহিতার উল্লেখ নাই। "প্রাজাপত্যা ধর্মাঃ" শব্দ দেখিয়া মনে হয় দক্ষ-সংহিতাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্ববর্তী পাঁচখানির উল্লেখ নাই।	

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এবংবিধ এক সংহিতায় অপরের উল্লেখমাত্র দেখিয়া সর্বত্র তাহাদিগের পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ দেখিতে পাই, দুইখানি সংহিতার প্রত্যেক খানিতে অপরের উল্লেখ আছে; যেমন যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় পরাশর-সংহিতার ও পরাশরে যাজ্ঞবল্ক্যের, এবং গৌতমে পরাশরের ও পরাশরে গৌতমের উল্লেখ আছে। তবে এই সমস্ত সংহিতায় যেরূপ মহাভারতের শ্লোকপাচুর্য দেখা যায়, তাহাতে তাহাদিগের রচনাকাল, মহাভারত রচনার পরে বলিয়াই অনুমিত হয়।

১৩। পদ্মপুরাণে দেখি, সংহিতাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক। বশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস ও পরাশর সংহিতাকে সাত্ত্বিক, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি,

দক্ষ, কাত্যায়ন ও বিষ্ণু সংহিতাকে রাজসিক এবং গৌতম, বৃহস্পতি, সম্বর্ত, যম ও উশন সংহিতাকে তামসিক শাস্ত্র বলা হইয়াছে—

"বাশিষ্ঠং চৈব হারীতং ব্যাসং পরাশরং তথা
ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ ॥
চ্যবনং যাজ্ঞবল্কঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেব
কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ সর্বদা স্মৃতাঃ ॥
গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সম্বর্তঞ্চ যমং স্মৃতম্
সাংখ্যং চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ ॥"

কিন্তু সংহিতাগুলি পাঠ করিলে এবংবিধ বিভাগের বিশেষ কারণ কি, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

১৪। যুগভেদেও সংহিতাগুলির প্রাধান্য ও প্রচলনভেদের নির্দেশ আছে। সত্যযুগে মনু-সংহিতা, ত্রেতাযুগে গৌতম-সংহিতা, দ্বাপরযুগে শঙ্খ ও লিখিত সংহিতাদ্বয়, এবং কলিযুগে পরাশর-সংহিতাই প্রধান—

"কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশর স্মৃতঃ ॥" পরাশর—১

১৫। সংহিতাগুলিতে যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, সে সমস্তই ধর্ম, অর্থ ও কাম্য-লাভের উদ্দেশ্যেই উপদিষ্ট। যোগবাশিষ্ঠও বলেন ধর্মার্থকামলাভের জন্যই সংহিতাদির সৃষ্টি হয়—

"বহূনি স্মৃতিশাস্ত্রাণি যজ্ঞশাস্ত্রাণি চাবনৌ
ধর্মকামার্থসিদ্ধ্যর্থং কল্পিতান্যুচিতান্যথ ॥" ২।১৬।১২

মুনিদিগের প্রশ্নগুলি লক্ষ্য করিলেও বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম জানিবার জন্যই মহর্ষিদিগের নিকট উপদেশপ্রার্থী হইয়াছিলেন; কাজেই তাঁহারাও তদনুরূপ উত্তরই দিয়াছিলেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এবংবিধ কয়েকটি প্রশ্ন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

(ক) "বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মান্নো ব্রূহি ভার্গব ॥" হারীত
(খ) "বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্মানশেষতঃ ॥" যাজ্ঞবল্ক্য
(গ) "চতুর্বর্ণসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥" পরাশর

এই জন্যই অধিকাংশ সংহিতায় মোক্ষধর্মের উপদেশ নাই। কেবলমাত্র মনু প্রভৃতি কয়েকখানি সংহিতায় অতি সংক্ষেপে আত্মজ্ঞান ও যোগসম্বন্ধে উল্লেখ আছে—

(ক) "সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ" ॥ মনু ১২।৮৫
(খ) "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥" মনু ৬।৩৫
(গ) "ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১১

(ঘ) "সর্বেষামেব যোগানামাত্মযোগঃ পরঃ স্মৃতঃ
যোগেন বিধিনা কুর্যাৎ স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥" লঘুব্যাস ২।৭৯

১৬। মহর্ষিগণ বর্ণাশ্রম-ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সংহিতার উপদেশ দিয়াছেন, এই জন্য সেগুলিতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। কেবলমাত্র বিষ্ণু-সংহিতা, বৃদ্ধ হারীত-সংহিতা ও বৃদ্ধ গৌতম-সংহিতায় বিষ্ণুপূজাদি সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা দেখা যায়। এই জন্য ইহাদিগকে "বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র" বলা হয়। ইহাদিগের সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

১৭। পূর্বেই বলিয়াছি মুনিদিগের প্রশ্নের উত্তরে, মহর্ষিগণ যে সমস্ত ধর্মনীতি, আচার ও ব্যবহার প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন, তাহাই "সংহিতা" নামে প্রচলিত। যে সংহিতাগুলি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি, তাহাদিগের কতকগুলিতে প্রশ্ন নাই, কিন্তু বক্তার নামোল্লেখ গ্রন্থারম্ভে বা স্থানান্তরে আছে। মনে হয়, যাঁহারা বর্তমান পুস্তকগুলি সংকলন করিয়াছেন তাঁহাদিগের সতর্ক দৃষ্টির অভাবেই প্রশ্নগুলি বাদ পড়িয়াছে। যাহাই হউক, এই জাতীয় সংহিতাগুলির আরম্ভ-বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

উশনঃ সংহিতা ... "অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তিবিধানকম্
অনুলোমবিধানতঃ প্রতিলোমবিধিং তথা ॥"

অঙ্গিরঃ ,, ... "গৃহাশ্রমেষু ধর্মেষু বর্ণানামনুপূর্বশঃ
প্রায়শ্চিত্তবিধং দৃষ্টা অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥"

যম ,, ... "অথাতো হ্যস্য ধর্মস্য প্রায়শ্চিত্তবিধায়কম্
চতুর্ণামপি বর্ণানাং ধর্মশাস্ত্রং প্রবর্ততে ॥"

কাত্যায়ন ,, ... অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্মণাম্
অস্পৃষ্টানাং বিধিং সম্যগ্ দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ" ॥

শঙ্খ ,, ... "স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য সৃষ্টিসংহারকারিণে
চাতুর্বর্ণ্যহিতার্থায় শঙ্খ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥"

দক্ষ ,, ... "ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা
এতেষাস্তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পৎ ॥"

বশিষ্ঠ ,, ... "অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্মজিজ্ঞাসা ॥"

লঘুব্যাস, লিখিত, গৌতম ও শাতাতপ-সংহিতায় আবার এবংবিধ কোনও রূপ সূচনা-বাক্যও নাই; প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দিয়াই উহাদিগের আরম্ভ।

১৮। কয়েকখানি সংহিতায় দেখিতে পাই, আদি বক্তার নাম উল্লেখ করিয়া অন্য কোনও মুনি উপদেশ দিতেছেন, কিন্তু এই পরবর্তী বক্তার নাম ঐ গ্রন্থে নাই; যেমন,

(ক) শঙ্খ-সংহিতায় ... ... শঙ্খপ্রোক্তমিদং শাস্ত্রম্

(খ) অত্রি ,, ... পূর্বসঙ্কল্পিতার্থস্য ন দোষশ্চাত্রিরব্রবীৎ ॥ ১।৯৮

(গ) উশন „ ... ... ভার্গবং পিতরং নত্বা উশনাধর্মমব্রবীৎ ॥"
(ঘ) আপস্তম্ব „ ... ... আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়ম্ ॥"
(ঙ) সম্বর্ত „ ... ... ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যং সম্বর্তেন তু ভাষিতম্ ॥"

এবংবিধ উক্তি অন্যত্রও আছে। কেহ কেহ বলেন, এই সমস্ত উক্তি গ্রন্থসংকলন-কর্তার।

১৯। সংহিতাগুলি বর্ণাশ্রমধর্মের সাধারণ আচার ব্যবহার নির্দেশ করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, কাজেই তাহাতে সাধারণ নিয়মাবলীই দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ শৌচ, শুদ্ধি, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, আতিথ্য, দান প্রভৃতি বিষয়ই অধিকাংশ সংহিতায় আলোচিত হইয়াছে। আমরা প্রথমে এইগুলিরই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

২০। ধর্মকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দেহের শৌচ বিধান প্রয়োজন। এইজন্য প্রাতঃ-স্নানের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাই—

(ক) 'প্রাতঃস্নানে তু পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।' লঘুব্যাস ১।৪

(খ) 'অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্।' দক্ষ ২।৭

যাঁহারা প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগের বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস, প্রাতঃস্নান করা কর্তব্য—

'প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ ॥' বিষ্ণু ৯০

শৌচপরায়ণ না হইলে কখনও মনের পবিত্রতা সম্পাদিত হয় না; এবং অপবিত্র জলে যাহা কিছু ধর্মকার্য করা যায়, তাহা হইতে কোনও প্রকার ফললাভ হইতে পারে না। তাই ধর্মশাস্ত্রগুলি একবাক্যেই বলিয়াছেন—

'শৌচাচারবিহীনানাং সর্বাঃ স্যু নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।'

শৌচ অবলম্বন করিতে কোনও প্রকার ধনব্যয় বা কায়ক্লেশও নাই, কারণ মৃত্তিকা ও জল দ্বারাই শৌচকর্ম সম্পন্ন হয়—

'মৃদা জলেন শুদ্ধিঃ স্যান্ন ক্লেশো ন ধনব্যয়ঃ।' দক্ষ ৫।১০

স্নানের জন্য নদীজলই প্রশস্ত। 'নদী' শব্দটির একটি বিশেষ সংজ্ঞাও দেওয়া হইয়াছে। যে জলস্রোত অন্ততঃ অষ্টসহস্রধনু পর্যন্ত (প্রায় পাঁচ ক্রোশ) প্রবহমান, তাহারই নাম নদী—

"ধনুঃ সহস্রাণ্যষ্টৌ তু গতির্যাসাং ন বিদ্যতে
ন তা নদীশব্দবহা গর্তাস্তাঃ পরিকীর্তিতা ॥" কাত্যায়ন ১০।৬

সর্বত্র নদী থাকা সম্ভব নয়, তাই অকৃত্রিম জলাশয়, সরোবর, তড়াগ, নির্ঝর প্রভৃতিতেও স্নানের ব্যবস্থা আছে—

"নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ।
স্নানং সমাচরেন্নিত্যং গর্তপ্রস্রবণেষু চ ॥" মনু ৪।২০৩

সকলের পক্ষে সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় অবগাহন-স্নান সম্ভব নয়, সেইজন্য পঞ্চবিধ স্নানের ব্যবস্থা আছে; যথা—আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম, বায়ব্য ও দিব্যস্নান। অঙ্গে ভস্ম-লেপনের নাম আগ্নেয় স্নান, অবগাহনের নাম বারুণ স্নান, আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক কুশাগ্রজল দ্বারা প্রমার্জনের নাম ব্রাহ্মস্নান, ধূলি দ্বারা মার্জনার নাম বায়ব্য-স্নান, সূর্যরশ্মি-বিশিষ্ট বৃষ্টিধারায় স্নানের নাম দিব্যস্নান। (কাহারও মতে গোধূলোত্থিত ধূলি দ্বারা অঙ্গ-লেপনের নাম বায়ব্য স্নান ;—

"স্নানানি পঞ্চ পুণ্যানি কীর্তিতানি মনীষিভিঃ।
আগ্নেয়ং বারুণং ব্রাহ্মং বায়ব্যং দিব্যমেব চ ॥
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহ্য তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং রজসা স্মৃতং ॥
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
তত্র স্নানে তু গঙ্গায়াং স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥" পরাশর ১২।৯-১১

শাস্ত্রাদিতে অন্য দ্বিবিধ স্নানের ব্যবস্থাও আছে—'ভৌম' ও 'মানস'। কেবলমাত্র গাত্রাদি পরিমার্জনের নাম ভৌম স্নান—'ভৌমং দেহপ্রমার্জনম্'* ও বিষ্ণুচিন্তার নামই মানস স্নান—'মানসং বিষ্ণুচিন্তনম্'। লঘুব্যাস-সংহিতায় এই মানস স্নানকেই যৌগিক স্নান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—

'যৌগিকং স্নানমাখ্যাতং যোগেঽয়ং বিষ্ণুচিন্তনম্।'

কিন্তু যোগ দ্বারা আত্মাতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থানেরই নাম প্রকৃত যৌগিক-স্নান বা আত্মতীর্থ স্নান—

'আত্মতীর্থমিদং খ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ
মনঃশুদ্ধিকরং পুংসাং নিত্যং তৎ স্নানমাচরেৎ ॥' লঘুব্যাস ১।১৪

উপনিষৎ ও তন্ত্রাদিতে এই আত্মতীর্থস্নানের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাই—

(ক) 'আত্মতীর্থং সমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থানি যো ব্রজেৎ
করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতে ॥ জাবালদর্শনোপনিষৎ ৪।৫০

(খ) ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মুক্তা বরাননে ॥' জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র
প্রাণতোষিণী ,,

শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—

যঃ সাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ
স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ ॥ আত্মবোধ ৬৭

---

* কাহারও মতে অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন ও গঙ্গা মৃত্তিকার তিলকাদি ধারণের নামও ভৌম স্নান।

অপরপক্ষে শাস্তুতপ-সংহিতা, ব্রাহ্মণকেই নির্জল তীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের বাক্যরূপ জল দ্বারাই মানবের সর্বপ্রকার মলিনতা দুরীভূত হয়—

"ব্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জলং সর্বকামিকং
তেষাং বাক্যোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনাঃ ॥" শাতাতপ ১।৩১

ব্যাস-সংহিতায়ও এই ভাবের উক্তি দেখিতে পাই—

"ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥" ব্যাস ৪।১২

বৃহৎপরাশর সংহিতা আবার ভাবশুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ শৌচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচমাহুরভ্যন্তরং বুধাঃ ॥"

মহানির্বাণ তন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

তন্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর অনুসারে আচারভেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার আচার পদ্ধতিতে পঞ্চ মকার সর্বথা পরিবর্জন করিতে হয়। শৈবাচার তৃতীয় সোপান; ধর্মের রক্ষা ও অধর্মের বিনাশ এই স্তরের কার্য। দক্ষিণাচার চতুর্থ সোপান; "দক্ষিণ" অর্থে সহায়, যে সমস্ত কার্য উচ্চাঙ্গ সাধনার সহায় তাহাই দক্ষিণাচার। এই আচার পালন করা কালে সাধক দক্ষিণাকালীর পূজা করেন এবং গায়ত্রী জপ করেন। এই আচারের পরই পঞ্চম সোপান বামাচার। বাম অর্থ বিপরীত অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিপরীত নিবৃত্তির পথ—ইহাকে পরা প্রকৃতির অন্তর্মুখী গতি (inward motion) বলা হয়। বামাচারে সেই পথেই চলিতে হয়। ইহাই বীর ভাবের সাধনা এবং ইহাকেই পঞ্চ মকারের সাধনা বলা হয়। পঞ্চ মকার লইয়া নিবৃত্তির পথে চলা যে কত বড় শক্ত সাধনা, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাতে প্রয়োগকুশল নিষ্ঠাবান্ গুরু চাই। এইরূপ গুরু আজকাল খুবই বিরল। অথচ যাঁহারা বিবাহ করেন নাই, তাহাদের পক্ষে এই সাধনায় পতনের আশঙ্কা খুবই বেশী। এই জন্য তন্ত্রে দীক্ষিত আপামর সকলকেই জায়াভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হয় না। যাঁহারা পূর্বের আচারগুলি নিয়মিতভাবে পালন করিতে পারিয়াছেন কেবল তেমন সংযমী শিষ্যকেই

এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে দেওয়া হয়। এই আচারে সাধককে "বামা" হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয় (বামাচারো ভবেত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম্)। এই "বামা" শব্দের দ্বারাই সাধককে কেমন কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা বেশ বোধগম্য হয়। এই স্তরে গুরুর বিশেষ সাহায্য ও উপদেশ মত সাধক প্রবৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে চেষ্টিত হন। তাহাকে ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি অষ্টপাশ ছিন্ন করিতে হয় এবং লালসা বাসনা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি যাহা এতকাল নিম্নগামী বা বহির্মুখী ছিল তাহাদিগকে উর্ধ্বগামী বা অন্তর্মুখী করিতে হয়। সিদ্ধান্তাচার ষষ্ঠ সোপান; এই আচার পালন করিবার সময় সাধককে ভেদ-জ্ঞান দূর করিতে হয়। এই সময় তিনি সংসার-বন্ধন ছিন্ন করতঃ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে কোন সময় এই স্তরের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা বেশ পরিস্ফুট ভাবেই দেখা গিয়াছিল। অঘোরাচার সপ্তম সোপান। এই স্তরের সাধকের সংসারের ঘোর কাটিয়া গিয়া ভেদবুদ্ধি ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি একেবারে লোপ পায়। যোগাচার অষ্টম সোপান। এই সোপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব হইতেই যদিও সাধককে যোগ সাধনে দীক্ষিত হইতে হয়, কিন্তু এই সময় তাহাকে শ্মশানবাসী হইয়া মহাযোগী মহাদেবের ন্যায় যোগে মগ্ন থাকিতে হয়। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনার পর সাধক কৌলাচারী হওয়ার অধিকারী হন। কৌলাচার নবম সোপান। এই সময় সাধকের সোহংভাব, দিক্‌কাল বিচার, ভেদাভেদ জ্ঞান বা মানাপমান—এ কোন কিছুরই প্রতীতি থাকে না। সবই এক সমান বলিয়া মনে হয়। বিশ্বসারতন্ত্রে কৌলের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে:—

দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিদ্ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূত পিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দমে বন্ধনেঽভিন্নং মিত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥

কৌলের অন্তর কামনা, বাসনা ক্ষয়ে শ্মশান সদৃশ হয় এবং মহাশক্তি মহাকালী তাঁহার অন্তরে বাস করিতে থাকেন। কৌলাচারে উপনীত হইলেই সাধকের মোক্ষলাভ হয়। এক জীবনের সাধনায় কৌল নাও হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনায় পথ আগুয়ান হইয়া না রহিলে এক জীবনে হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনা বৃথা যায় না। এই সকল সাধনায় যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, পরজন্মে তথা হইতেই সাধনা আরম্ভ হয়, ক্রমে কোন এক জীবনে কৌল হওয়া যাইবেই। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় এই ভাবের কথাই বলা হইয়াছে।

আচার যদিও নয়টী বলা হইল, কেহ কেহ কিন্তু অঘোরাচার ও যোগাচারকে সিদ্ধান্তাচারের অন্তর্গত ধরিয়া আচার সর্বশুদ্ধ সাতটী বলেন। তন্ত্রমতে এই সকল আচারীদের মধ্যেও তিন ভাবের বা স্বভাবের লোক আছেন। সাধকের মনোবৃত্তি ধরিয়া গুণের অভিব্যঞ্জন অনুসারে এই বিভাগ করা হইয়াছে। ভাব তিনটী যথা—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। দিব্যভাব সর্বশ্রেষ্ঠ, তন্নিম্নে বীরভাব ও সর্ব নিম্নে পশুভাব। পশুভাবে তমোগুণ সত্ত্বগুণের উপর বেশীভাবে ক্রিয়াশীল হয়। বীরভাবে রজোগুণ যদিও সত্ত্বগুণের উপর ক্রিয়া করে কিন্তু আপন ক্ষেত্রেই তাহার ক্রিয়া বেশী। দিব্যভাবে রজোগুণ সত্ত্বগুণের উপরই বেশী ক্রিয়া করে। প্রত্যেক জাতীয় ভাবের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাধকগণ মধ্যে কেহ উচ্চ স্তরে কেহ নিম্নস্তরে অবস্থান করেন।

তন্ত্রের সাধনা শিবশক্তির মিলন। তন্ত্রের মতে নিখিল বস্তু মাত্রেই শক্তিস্বরূপা, আধুনিক বিজ্ঞানেরও ইহাই মত। তন্ত্র মতে ঐ শক্তিই প্রকৃতির বৈষ্ণবীশক্তি এবং এই শক্তিই চরাচর জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমভাবে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান আছেন। নিজের মধ্যে এই যে শক্তি রহিয়াছে সাধনামূলে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া শিবের সহিত মিলন করিতে পারিলেই পরমানন্দ বা মুক্তি লাভ হয়। সুতরাং বেদান্তের ন্যায় তান্ত্রিক সাধনারও লক্ষ্য পরমানন্দ লাভ বা মুক্তি। বেদান্তাদি শাস্ত্রেও নিত্য শাশ্বত সুখলাভকেই মুক্তি বলা হইয়াছে। মন কি উপায়ে এই নিত্য সুখ লাভ করিতে পারে তন্ত্রে সেই প্রক্রিয়া বা সাধন প্রণালীগুলি বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন তন্ত্রে যুগের ভিতর দিয়া, কোন তন্ত্রে মন্ত্রজপের মধ্য দিয়া আবার কোন তন্ত্রে পূজা, হোম ইত্যাদির ভিতর দিয়া মুক্তিলাভের উপায় নির্দেশিত হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে এই সবগুলি উপায়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। তবে ইহাও বলা হইয়াছে যে এইগুলি তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র।

যথা :— ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি।
ব্রৈহ্মবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥
(১৪ উঃ, ১১৫ শ্লোক)

অর্থাৎ জপ, হোম ও শত উপবাসেও মোক্ষলাভ হয় না। আমি ব্রহ্ম ইত্যাকারজ্ঞান জন্মিলেই জীব মুক্ত হয়। এখন প্রশ্ন হবে—তবে ক্রিয়া কাণ্ডের আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা এই যে, ক্রিয়াকাণ্ড করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া পরে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। হোম জপ ইত্যাদি সিদ্ধিলাভের সোপান মাত্র।

মহানির্বাণ তন্ত্রে সাধনাকে উত্তম, মধ্যম, অধম ও অধমাধম এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মসদ্ভাবকে উত্তম, জ্ঞানভাবকে মধ্যম, স্তুতিজপ ইত্যাদিকে অধম এবং বাহ্যপূজাকে অধমাধম বলা হইয়াছে, যথা :—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা॥ (১৪ উঃ, ১২২ শ্লোক)

এই শ্লোকটার গোড়ার্থ বা ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসদ্ভাব লাভ করাই সাধনার লক্ষ্য, কিন্তু তাহা লাভ করিতে হইলে প্রথমে বাহ্য পূজা, তৎপর স্তুতি, জপ ইত্যাদি এবং তৎপর ধ্যানভাব অবলম্বন করিতে হইবে। বাহ্য পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ধ্যানভাব পর্যন্ত সাধনা দ্বারা ব্রহ্মসদ্ভাব লাভ হইয়া নিত্য শাশ্বত সুখ বা মুক্তিলাভ হইবে। অধিকারী ভেদে সাধক আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) মৃদু সাধক—যিনি মন্দোৎসাহী, পরিশ্রম-কাতরলোভী ও বহ্বাশী তিনি মৃদুসাধক। (২) মধ্য সাধক—যিনি সমবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং ভাল বা মন্দ কোন কার্যেই লিপ্ত নহেন তাহাকে মধ্যসাধক বলা হয়। (৩) অধিমাত্রক সাধক—যিনি স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, লয়-সাধনে নিযুক্ত এবং সর্বদা যোগাভ্যাসে রত তিনি অধিমাত্রক সাধক। (৪) অধিমাত্রতম সাধক—যিনি জনসঙ্গ-বিরক্ত, বিজিতেন্দ্রিয়, সর্বযোগাধিকারী এবং সকল বিষয়ে অগ্রসর, তিনিই অধিমাত্রতম সাধক। অধিকার ভেদে কৌল সাধকগণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) প্রকৃতি সাধক—যিনি বীরাচারী এবং পঞ্চতত্ত্ব নিয়া সাধনা করেন। (২) মধ্যম কৌলিক—যিনি প্রকৃতি সাধকের ন্যায়ই কার্য করেন, কিন্তু যাহার মন ধ্যান ধারণার দিকেই বেশী অগ্রসর: (৩) কৌলিকোত্তম—যিনি ক্রিয়ানুষ্ঠান ত্যাগে কেবল আত্মারই ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

পূজা বলিতে প্রধানতঃ পূজ্য পূজক, উপাস্য উপাসক এই দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই দ্বৈতভাবের পূজা হইতেই ক্রমে অদ্বৈতভাব উপস্থিত হওয়া মাত্র উপাস্য উপাসক ভাব বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞান দূর হইয়া জীবজগৎ সমস্তই ব্রহ্ম এই জ্ঞান লাভ হয়। অদ্বৈতভাব পূজার সর্বোচ্চস্তর। এই ভাবকে ব্রহ্মভাবও বলা হয়। এই ভাব অধিগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সব ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় যেমন—স্তব, স্তুতি ও ধ্যান ইত্যাদি এই সব-গুলিই দ্বৈতভাবের অন্তর্গত; অথচ এই গুলির মধ্যেও উচ্চ নিম্ন ভেদ আছে। পূজার সাধারণ ক্রিয়ানুষ্ঠান নিম্নভাব, তদূর্ধ্বে স্তব স্তুতি এবং তদূর্ধ্বে ধ্যান।

পূজা দ্বিবিধ—নিত্য পূজা এবং কাম্য বা নৈমিত্তিক পূজা। ইষ্টদেবতা ও কুলদেবতার পূজা এবং সন্ধ্যাদি নিত্য পূজা। কোন অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য যে পূজা করা হয়—যেমন, যজ্ঞ ও ব্রতাদি তাহা নৈমিত্তিক বা কাম্য পূজা। নিত্য পূজা অবশ্য করণীয়, কিন্তু কাম্য পূজা করা না করা ইচ্ছাধীন কাজ। কাম্য পূজায় সর্বদাই সঙ্কল্প করিতে হয়। পূজার কার্যারম্ভের পূর্বে ফল কামনা করিয়া কতকগুলি বাক্য পাঠ করার নাম সঙ্কল্প। সঙ্কল্পে বুদ্ধির সহিত ঐকান্তিক ইচ্ছাকে সংযোগ করিতে হয়, অন্যথা সঙ্কল্প পাঠে কোন ফলোদয় হয় না। কতকগুলি বাক্যোচ্চারণ করা মাত্রই সার হয়। সঙ্কল্পের তিন অঙ্গ (১) মনে স্থির করা (২) বাক্যে তাহা প্রকাশ করা এবং (৩) কার্য সম্পন্ন করা (মনসা সঙ্কল্পয়েৎ বাচা অভিলপেৎ কর্মনা উপপাদয়েৎ)। দেশ ভেদে, কাল ভেদে ও ঋতু ভেদে কোন কোন বাক্যের পরিবর্তন করিয়া সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্প করিতে দক্ষিণ জানু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া কুশ, তিল, ফল, পুষ্প-সমন্বিত তাম্র পাত্র বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে এই তাম্র পাত্র আচ্ছাদনপূর্বক সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। সঙ্কল্পের

মন্ত্র সাধারণতঃ এইরূপ—"বিষ্ণোরম্ তৎসদস্ত (অমুক) মাসি (অমুক) পক্ষে (অমুক) তিথৌ (অমুক) গোত্রঃ শ্রী (অমুক) অর্থাৎ সঙ্কল্পকর্তার নাম (অমুক) ফলপ্রাপ্তি কামঃ (শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামো বা) (অমুক) কর্ম্মহং করিষ্যে"—এই মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া পাত্রস্থিত জলের কিঞ্চিৎ ঈশান কোণে ভূমিতে ফেলিয়া দিতে হয়।

সঙ্কল্পেরও সূক্ত আছে। সূক্তগুলি বৈদিকমন্ত্র বিধায় দ্বিজাতি ভিন্ন অন্যের তাহা উচ্চারণ করিবার বা পাঠ করিবার বিধি নাই। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পুরোহিতই তাহা আওড়াইয়া থাকেন। সামবেদ, যজুর্বেদ ও ঋগ্বেদ ভেদে সূক্ত ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সামবেদীয় সূক্ত, যথা :—

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণং বিবষ্ট্যাসিচং।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥

যজুর্বেদীয় সূক্ত, যথা :—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদেতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবেতি।
দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥

ঋগ্বেদীয় সূক্ত, যথা :—

ওঁ যা গুঙ্গূর্যা সিনীবালি যা রাকা যা সরস্বতী।
ইন্দ্রাণী মাহ্ব উতয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।

প্রতিমায়, মণ্ডলে ও যন্ত্রে সাধারণতঃ পূজা করা হয়। মণ্ডলে সকল দেবতারই পূজা হইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রে সেরূপ হয় না। যে যন্ত্র যে দেবতার উপযোগী বা বিহিত সেই যন্ত্রে সেই দেবতারই পূজা হইতে পারে, অন্য দেবতার নহে। তন্ত্রসারে বিশেষ বিশেষ দেবতার উপযোগী অনেকগুলি যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। যন্ত্রে পূজা আবার সকল পূজকের পক্ষে বিহিত নহে। সাধনায় একটু অগ্রসর হওয়ার পর যন্ত্রে পূজা করার অধিকারী হওয়া যায়। কোন ধাতু দ্রব্য, কাগজ, পাথর এবং আরো কোন কোন পদার্থে যন্ত্র অঙ্কিত হয়। কোন কোন বিশিষ্ট কার্যে মানুষের মস্তকের খুলি, বানরের চামড়া প্রভৃতিও যন্ত্র অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়। প্রতিমা পূজায় যেরূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া করিতে হয়, যন্ত্র পূজায়ও ঠিক তদনুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া করিতে হয়। প্রথমে দেবতার ধ্যান, তৎপর যথাযোগ্য মন্ত্র দ্বারা তাঁহার আবাহন এবং তৎপর প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কার্য করিতে হয়। এইরূপ করার পর যন্ত্রে দেবতার আবির্ভাব হয় এবং তখনই তাহাতে পূজা হয়। যন্ত্রে কি ভাবে পূজা করিতে হয় তাহা মহানির্বাণ তন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে বিবৃত হইয়াছে। (ষষ্ঠ উল্লাস, ৬৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

অনেক পূজা আছে যাহা সকলে করার অধিকারী নহে। বেদের বিধানুসারে যে সকল দেবতার পূজা করা হয় বা যেগুলি বৈদিক পূজা সেই সব পূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহারা কেবল মৃত্তিকা নির্মিত শিবের ও বাণলিঙ্গ শিবের পূজা তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মন্ত্রানুসারে করিতে পারেন। কিন্তু তান্ত্রিক সব পূজাই শূদ্রে করিতে পারেন, ইহাতে কোন বাধা নিষেধ

নাই। তান্ত্রিক পূজায় শূদ্রের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সমান অধিকার আছে। তন্ত্রে চক্রপূজারও বিধি আছে; এই পূজা শুধু তন্ত্রের বিহিত। শক্তি-সমন্বিত চক্রেশ্বর এবং ভৈরব ভৈরবী সহযোগে চক্র গঠিত হয়। কিন্তু ইহাও সকল শ্রেণীর তান্ত্রিকের পক্ষে বিহিত নহে। পশ্বাচারী কাহাকেও চক্রে যাইতে দেওয়া হয় না। পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা এই পূজা করা হয়। চক্র পূজায় জাতি বিচার নাই। সকলে একত্রে পান ভোজন করিতে পারেন। এই পূজারও প্রকারভেদ আছে, যেমন, বীরচক্র, রাজচক্র, দেবচক্র ও মহাচক্র। বিভিন্ন চক্রপূজায় বিভিন্ন ফল লাভ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজার মন্ত্র, ধ্যান ও স্তোত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কিন্তু পূজার উপচার সব পূজায়ই সমান। সক্ষম পক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা করার বিধি। ইহাতে অক্ষম হইলে দশোপচারে পূজা করিতে হয়। তাহাতেও অক্ষম হইলে পঞ্চোপচারে এবং তাহাও না পারিলে কেবল গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করারও ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোন কোন তন্ত্রে শক্তি পূজায় চতুঃষষ্ঠী উপচারের কথা লিখিত হইয়াছে। কোন তন্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ এবং কোন তন্ত্রে অষ্টাদশ উপচারের কথাও লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এইভাবে উপচার প্রদান করা প্রায়ই দেখা যায় না। সাধারণতঃ ষোড়শ উপচার কিংবা দশোপচার কিংবা পঞ্চোপচারই প্রদান করা হয়। ষোড়শোপচার, যথা—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং বন্দন'। দশোপচার যথা :—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য। পঞ্চোপচার, যথা :—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়-প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

বিশেষ পদার্থের আশ্রয়গুলিকেই স্বতোব্যাবৃত্ত বলিলে কোনও ক্ষতি হয় না; অতএব তাহাই বলা সঙ্গত এই দৃষ্টিতে দীধিতিকার বিশেষের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

কোন নব্য সম্প্রদায় বিশেষ-পদার্থ মানিবার পক্ষে অন্যরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—যদিও নিত্য পদার্থের কোন কারণ সম্ভবে না তথাপি উহাদিগের প্রযোজক কল্পনা করা আবশ্যক। নতুবা, 'কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ' অর্থাৎ কার্যের অভাব কারণাভাবের প্রযোজ্য (কারণাভাব জন্য নহে, যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য ইহাই সিদ্ধান্ত) এইরূপ সর্বসম্মত ব্যবহার অন্য প্রকারে উপপন্ন করা যায় না।

অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ নিত্য পদার্থ সুতরাং বিভিন্নক্ষেত্রে উহারও প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে।

গুণ, কর্ম এবং জাতিসকলের পারস্পরিক ভেদে উহাদিগের আশ্রয় বস্তুর ভেদ প্রয়োজক অবয়বিদ্রব্যসমূহের পরস্পর ভেদেও উহার আশ্রয়ভূত অবয়বের ভেদ প্রযোজক হইতে পারে। কিন্তু যাহা চরম অবয়ব—কোনরূপেই যাহাকে অবয়বী বলা যায় না সেইরূপ বস্তুর (পরমাণুর) এবং আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব দ্রব্যের ও পরস্পর ভেদ আছে। উহাদের প্রয়োজক কে? কোন অবয়ব না থাকায় পূর্বোক্তরূপে এই সকল ভেদের প্রয়োজক কল্পনা সম্ভব নহে। এজন্য "বিশেষ" নামে একবিধ পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করা প্রয়োজন।

লক্ষণ। যাহা স্বয়ং ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যাহাতে স্বভিন্ন স্বসজাতীয় যাবতীয় বস্তুর ভেদ সাধন করিতে হইলে উহা স্বয়ংই হেতুরূপে গণ্য হয়, (অন্য কোন পদার্থ হেতু হইতে পারে না) তাহা **বিশেষ**। অথবা যাহা জাতিমান্ অথবা জাতি স্বরূপ নহে অথচ সমবেত তাহা **বিশেষ** (স্বতো ব্যাবৃত্তো বিশেষঃ, স্বতোব্যাবৃত্তত্বঞ্চ স্বভিন্নলিঙ্গজন্য-স্ববিশেষ্যকস্বসজাতীয়স্বেতরভেদানুমিত্যবিষয়ত্বং, অথবা জাতি-জাতিমদ্ভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বং)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

বিশেষত্ব জাতি নহে। বিশেষে জাতি স্বীকার করিলে উহার স্বরূপ হানি হয় অর্থাৎ স্বতোব্যাবৃত্তত্ব থাকে না। ফলতঃ বিশেষ স্বীকার নিরর্থক হইয়া পড়ে।

বিশেষের কোন বিভাগ নাই।

সমবায়

সমবায় একটী সম্বন্ধবিশেষ। 'সম্বন্ধ'শব্দটী এতই লোক-প্রসিদ্ধ যে উহার পরিবর্তে অন্য শব্দ প্রয়োগ করিলে যাহা বুঝাইতে হইবে হয়ত তাহা দুর্বোধ হইয়া পড়িবে। অতএব বুঝাইবার অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক।

'সম্বন্ধ'কথাটী বিবাহ ব্যাপারে লোকে অধিক প্রয়োগ করে। বিবাহে একটী কন্যা ও একটী পুরুষের মিলন হয়। ফলে কন্যাতে পুরুষের ভার্যাত্ব-সম্বন্ধ এবং পুরুষে কন্যার পতিত্ব-সম্বন্ধ হয়। এই প্রকারে উভয়সম্পর্ক সাধারণতঃ সকল সম্বন্ধেরই স্বভাব। সম্পর্ক উভয়ের, এই দৃষ্টিতে কন্যা এবং পুরুষের তুল্যতা আছে সত্য. কিন্তু এমন বৈষম্যও আছে যাহার ফলে কন্যাটীকে পতি বা পতিত্ব সম্বন্ধযুক্ত অথবা পুরুষটীকে ভার্যা বা ভার্যাত্ব-সম্বন্ধবিশিষ্ট বলা হয় না। ব্যবহারের এই বৈষম্যে স্থির হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটী পদার্থ সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং অপরটী অনুযোগী। সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া যেখানে ব্যবহার হয় তাহা অনুযোগী এবং অপরটী প্রতিযোগী। যেমন—উক্তস্থলে ভার্যাত্ব-সম্বন্ধের অনুযোগী কন্যা ও প্রতিযোগী পুরুষ; পতিত্ব-সম্বন্ধের অনুযোগী পুরুষ এবং প্রতিযোগী কন্যা।

উল্লিখিত পদার্থসমূহের মধ্যে সংযোগও (১২শ গুণ) একটি সম্বন্ধ। কলসের সহিত জলের এবং টেবিলের সহিত পুস্তকের সম্বন্ধ সংযোগ। এই দুই স্থলে কলস ও টেবিল সংযোগের অনুযোগী এবং জল ও পুস্তক উহার প্রতিযোগী। বিভিন্ন স্থলের সংযোগ সম্বন্ধও পৃথক্। সমবায় সম্বন্ধ[১] কিন্তু একটিমাত্র, প্রতিযোগী নানা হইলেও উহা বস্তুতঃ

---

১ টেবিলের উপরে পুস্তক রাখিলে এবং কলস জলে পূর্ণ করিলে উহাদিগের সংযোগ স্পষ্ট দেখা যায়। শরীরে অস্থিগুলির পরস্পর সংযোগও শবব্যবচ্ছেদে প্রত্যক্ষ হয়। হস্ত পাদ প্রভৃতি দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলও পরস্পর সংযুক্ত' কিন্তু পরস্পর সংযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিই শরীর নহে, পরন্তু উহাদিগের উক্ত প্রকার সংযোগের ফলে উৎপন্ন আর একটি স্বতন্ত্র বস্তুই শরীর। ন্যায়মতে অবয়ব ও অবয়বী পৃথক্ বস্তু। অবয়বীর স্বতন্ত্র সত্তা বা পৃথক্ অস্তিত্ব মতান্তর খণ্ডন পূর্বক নৈয়ায়িকেরা এমন যুক্তিবলে সমর্থন করিয়াছেন যাহাতে উহা হৃদয়ঙ্গম হয়। সত্য বটে, অবয়বগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সংযোগ, কিন্তু ঐরূপে সংযুক্ত অবয়বগুলির সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ কি হইবে? এইরূপে দুগ্ধাদির সহিত উহার ধবলতা-বর্ণ (গুণ), বৃক্ষ শাখাদির সহিত উহার কম্পন (ক্রিয়া) এবং জাতিমানের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি তাহাও বলা প্রয়োজন। টেবিল এবং পুস্তকের যে সম্বন্ধ (সংযোগ) উহা হইতে এই সকল স্থলের সম্বন্ধ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। নৈয়ায়িকেরা বলেন এই সম্বন্ধেরই নাম 'সমবায়।' সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী যুগলকে (প্রতিযোগী—সমবেত, ও অনুযোগী—সমবায়ীকে) অযুতসিদ্ধ বলা হয়। সংযোগ-সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী (পুস্তক ও টেবিল) যুতসিদ্ধ অর্থাৎ পৃথক্ভাবে সিদ্ধ ; কিন্তু সমবেত পদার্থের সমবায়ী হইতে পৃথক্ভাবে অবস্থান সম্ভব হয় না এজন্য উহারা অযুতসিদ্ধ। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যে 'অযুতসিদ্ধ'পদার্থ বিচার পূর্বক সমবায়ের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। তথাপি তিনিও সংযোগ অপেক্ষা ঐসমুদয় স্থলের সম্বন্ধ-গত বৈলক্ষণ্য অনুভব করিয়াছিলেন। বেদান্তমতে ঐ সম্বন্ধকে 'তাদাত্ম্য' বলা হয়। নৈয়ায়িকসম্মত তাদাত্ম্যের স্থলে বেদান্তমতে কোন সম্বন্ধই স্বীকৃত হয় না;

পৃথক্ নহে[১]। সমবায়ের প্রতিযোগীকে সমবেত এবং অনুযোগীকে সমবায়ী বলে। দ্রব্য প্রভৃতি পাঁচটী পদার্থ সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে নিত্য দ্রব্যগুলি 'সমবায়ী' হয় কিন্তু সমবেত হয় না। জাতি ও বিশেষ 'সমবেত'ই হয়, সমবায়ী হইতে পারে না। উৎপন্ন দ্রব্যসকল এবং গুণ ও কর্মসমূহ সমবেত এবং সমবায়ী উভয় প্রকারই হইয়া থাকে।

অবয়বী দ্রব্যসকল স্ব স্ব অবয়ব গুলিতে, গুণ ও কর্ম দ্রব্যে, জাতিসকল (যথা সম্ভব) দ্রব্য, গুণ ও কর্মে এবং বিশেষগুলি নিত্য দ্রব্যে সমবেত হয়। সমবায় নিত্য[২]। সমবায়ী ও উহাতে সমবেত বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য হইলে উহাদিগের সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়[৩]।

লক্ষণ। যে সম্বন্ধ নিত্য তাহাই সমবায়। (নিত্যসম্বন্ধঃ সমবায়ঃ)।

লক্ষ্য ও সমন্বয়। স্পষ্ট।

সংযোগ সম্বন্ধ কিন্তু নিত্য নহে; আত্মা আকাশ প্রভৃতি বস্তু নিত্য কিন্তু সম্বন্ধ নহে। অতএব "নিত্য"পদের দ্বারা সংযোগে এবং 'সম্বন্ধ' পদের দ্বারা আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তি দোষ বারিত হইল। একত্ব নিবন্ধন সমবায়ের কোনও বিভাগ নাই।

নব্যন্যায়ে অনেক সম্বন্ধের নাম পাওয়া যায়। উহাদিগের মধ্যে বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্ত্যনিয়ামক এইরূপে শ্রেণীবিভাগ আছে। এই শ্রেণীবিভাগের মূলে যে সূক্ষ্ম অনুভব আছে একটি দৃষ্টান্ত লইলে উহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

পর্বত এবং আকাশ উভয়ের সহিতই বৃক্ষের সংযোগ আছে; কিন্তু ঐ সংযোগের ব্যবহারে বৈষম্য আছে। পর্বত বৃক্ষবান্' বা "পর্বতে বৃক্ষ আছে" এইরূপ ব্যবহার সর্বসম্মত;

সংযোগ হইতে সমবায়ের শাস্ত্র সম্মত আর একটি বৈলক্ষণ্য এই যে সংযোগ স্বয়ং সমবেত অর্থাৎ দ্রব্যে সংযোগের আধেয়তা নির্বাহক সম্বন্ধ সমবায়, কিন্তু সমবায়ী বস্তুতে থাকিবার জন্য সমবায় অপর কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না; উহা স্বরূপ (অর্থাৎ সমবায় হইতে যাহা ভিন্ন নহে এরূপ) সম্বন্ধে থাকে। ফলত. শাস্ত্রীয় ব্যবহারে কোথায় ও সম্বন্ধের সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা হইলে সংযোগ স্থলে সমবায়ের ন্যায় সমবায়ের স্থলে কোনও সম্বন্ধ উল্লিখিত হইবে না। অধিকন্তু সংযোগ প্রভৃতির সম্বন্ধতা (সংসর্গতা) যেরূপ সংযোগত্বাদি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় সেইরূপ সমবায়ের সংসর্গতা সমবায়ত্ব-ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় ঐ সংসর্গতা নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

১ দ্রব্যের সমবায়, রূপের সমবায় ইত্যাদি প্রকারে সমবায়েরও পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ হয় সত্য, কিন্তু উহা কালের (ষষ্ঠ দ্রব্য) রাত্রি দিনাদি ব্যবহারের ন্যায় ঔপাধিক ভেদ মাত্র। রঘুনাথ শিরোমণি সমবায়ের নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

২ মতান্তরে সমবায় অনিত্য।

৩. বৈশেষিকমতে সমবায় অবৃত্তি—অর্থাৎ কুত্রাপি উহা আধেয় হয় না, এজন্য লৌকিকসন্নিকর্ষ অসম্ভব হওয়ায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ন্যায়মতে সমবায় দ্রব্য, গুণ এবং কর্মে বৃত্তি অর্থাৎ আধেয় হয় বটে; তবে ঐ আধেয়তানির্বাহক সম্বন্ধ স্বরূপ বা বিশেষ্যতা। অর্থাৎ উহা সমবায়স্বরূপ হইলেও সম্বন্ধরূপে কিছু ভিন্ন। এজন্য সংযুক্ত। বিশেষণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উহার প্রত্যক্ষ সম্ভবে ভাষা পরিচ্ছেদ ৬১ তম কারিকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু 'বৃক্ষে আকাশ রহিয়াছে' কিংবা 'বৃক্ষ আকাশবান্' এই প্রকার ব্যবহার কেহ করে না। 'আকাশ বৃক্ষবান্' বা 'বৃক্ষটি আকাশে আছে' এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিলে বক্তা উপহাসাস্পদ হয়।

সম্বন্ধ একজাতীয় হইলেও বিভিন্নক্ষেত্রে জ্ঞানের এই বৈষম্য দ্বারা স্থির হয় যে প্রথম স্থলের সম্বন্ধ (সংযোগ) প্রতিযোগী এবং অনুযোগী উভয়ের আধার-আধেয়ভাব নির্বাহ করে এবং দ্বিতীয়স্থলে তাহা করেনা ; এজন্য প্রথম ক্ষেত্রে সম্বন্ধ (সংযোগ) বৃত্তিনিয়ামক এবং দ্বিতীয় স্থলে উহা বৃত্ত্যনিয়ামক[১]।

সংযোগ-সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক এবং বৃত্ত্যনিয়ামক উভয় প্রকারই হইতে পারে কিন্তু অন্যান্য সম্বন্ধ সাধারণতঃ বৃত্তিনিয়ামক অথবা বৃত্ত্যনিয়ামক একপ্রকারই স্বীকৃত হয়। নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রতিযোগী, অনুযোগী ও প্রকারভেদ উল্লিখিত হইল—

সম্বন্ধ	প্রতিযোগী	অনুযোগী	প্রকার
সমবায়	উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্যসমূহ	অবয়ব দ্রব্য	বৃত্তিনিয়ামক
,,	গুণ ও কর্ম	দ্রব্য	,,
,,	জাতি	দ্রব্য, গুণ, কর্ম	,,
,,	বিশেষ	নিত্যদ্রব্য	,,
একার্থ সমবায়[২]	উৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম	উৎপন্ন দ্রব্য গুণ, কর্ম, জাতি	,,
,,	জাতি, বিশেষ, সমবায়	বিশেষ সমবায়	

১ বিশেষ বিশেষ সংযোগ আধার আধেয়ভাব নির্বাহ করে না ইহা শাস্ত্রসম্মত। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভবধ অধ্যায়ে—

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ। তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা॥

এই শ্লোকে আকাশ-সংযোগের বৃত্ত্যনিয়ামকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২ সমবায়-সম্বন্ধ ঘটিত সামাধিকরণ্যই একার্থসমবায় সম্বন্ধ। যে দুইটি বস্তু কোন এক অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—একার্থসমবায়। যেমন—সূত্রের রূপ (বর্ণ) ও বস্ত্র উভয় সূত্রে সমবায় সম্বন্ধে থাকে এজন্য উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ—একার্থসমবায়।

সংযোগ	দ্রব্য	দ্রব্য	ক্বচিৎ বৃত্তিনিয়ামক ও ক্বচিৎ বৃত্ত্যনিয়ামক
স্বরূপ	দ্রব্য, গুণ কর্ম সামান্য ও বিশেষ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ	পদার্থমাত্র	বৃত্তিনিয়ামক
কালিক বা কালিকবিশেষণতা	নিত্য দ্রব্য[1] ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ	কাল (৭ম দ্রব্য) ক্রিয়া[2]	বৃত্তিনিয়ামক
দৈশিক বা দিক্-কৃত বিশেষণতা	,,	দিক্ (৬ষ্ঠ দ্রব্য)	,,
বিষয়িতা	যাবতীয় পদার্থ	জ্ঞান[3]	বৃত্ত্যনিয়ামক
বিষয়তা	জ্ঞান	যাবতীয় পদার্থ	,,

এতদ্ব্যতীত 'তাদাত্ম্য' নামে যে অন্য একটি সম্বন্ধের প্রচুর ব্যবহার দৃষ্ট হয় তাহার বিশেষ বৈলক্ষণ্য এই যে—উহার প্রতিযোগী ও অনুযোগী বিভিন্ন বস্তু নহে অর্থাৎ কোন বস্তুর নিজের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই তাদাত্ম্য। যেমন—আকাশের সহিত আকাশের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য, ঘটের সহিত ঘটের সম্বন্ধ তাদাত্ম্য[4]।

---

১ নিত্যদ্রব্য—আকাশ ইত্যাদিও কালিক-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হইতে পারে এইরূপ মতান্তর সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতির শেষে উল্লিখিত হইয়াছে।

২ জন্য পদার্থ মাত্রই কালিকসম্বন্ধের অনুযোগী হইতে পারে ইহাও প্রসিদ্ধ মতান্তর। বিশেষ এই যে যে বস্তুদ্বয় সমসাময়িক (contemporary) অর্থাৎ কোনও এক সময়ে বিদ্যমান, কালিক সম্বন্ধে আধার-আধেয়ভাব উহাদিগেরই পক্ষে স্বীকৃত, বিভিন্নকালবর্ত্তী পদার্থ সকলের কালিক সম্বন্ধে ও আধার আধেয়ভাব স্বীকৃত হয় না।

৩ ইচ্ছা, যত্ন এবং দ্বেষ ইহারাও স্ব স্ব বিষয়ের বিষয়িতা সম্বন্ধের অনুযোগী হইতে পারে। কেবল প্রসিদ্ধি বশতঃই জ্ঞানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪ অন্য কোনও সম্বন্ধের প্রতিযোগী এবং অনুযোগী একই বস্তু হইতে পারে না। তাদাত্ম্যের এই বৈলক্ষণ্য থাকায় সম্প্রদায় বিশেষের মতে উহা সম্বন্ধ নামে গণ্য হইবার অযোগ্য। সম্বন্ধরূপে গণ্য করিলেও উহা বৃত্তি-নিয়ামক নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভাব

ভাব কি তাহা বলা হইয়াছে। এখন দ্বিতীয় পদার্থ[1] **অভাব** নিরূপিত হইবে।

অভাব-শব্দটি ভাব-শব্দের সহিত নঞ্-পদের সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন [নঞ্ (অ)+ভাব—অভাব]। নঞ্-পদের অন্যতম প্রসিদ্ধ অর্থ[2] ভেদ এবং বিরোধ। তদনুসারে যদি উহার (নঞ্-পদের) 'ভিন্ন' এবং 'বিরুদ্ধ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অভাব-কথাটির অর্থ হয়—যাহা ভাব হইতে ভিন্ন তাহা **অভাব**, অথবা যাহা ভাবের বিরুদ্ধ তাহা **অভাব**।

মতবিশেষে ভাব-পদার্থ হইতে অভাব স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে কিন্তু বিভিন্ন ভাব পদার্থ সমূহই অবস্থা বিশেষে অন্য ভাব-বস্তুর অভাব রূপে প্রতীত হয়[3]। যাহা হউক্, ভাবের সহিত অভাবের বিরোধিতা অনুভবসিদ্ধ ; এজন্য বলা যায় যে—যে ভাব যাহার বিরোধী তাহাই (ঐ ভাবের) **অভাব**। যেমন—(শূন্য) কলসে জলাভাব। এই অভাবের বিরোধী 'জল'রূপ ভাব। কারণ, কলস জলপূর্ণ থাকিলে উহাতে ('জল নাই' এইরূপে) জলাভাব প্রতীত হয় না।

অসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র থাকিতে না পারাই বিরোধ। ইহা পারস্পরিক বা উভয়গত ধর্ম। সুতরাং জলে যদি জলাভাবের বিরোধ থাকে তবে জলাভাবেও জলের বিরোধ থাকিবেই। ফলে, যেমন জল জলাভাবের বিরোধী বা প্রতিযোগী সেইরূপ জলাভাবও জলের (অর্থাৎ জলাভাবাভাবের) বিরোধী বা প্রতিযোগী। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যায়—জ্ঞানগত বিরোধের উপপাদনই পৃথক্ অভাবপদার্থ স্বীকার করিবার মূল[4]। যদি তাহাই হয় তবে জল এবং জলাভাব এই উভয় পদার্থ স্বীকারই যথেষ্ট, ঐ জন্য জলাভাবেরও স্বতন্ত্ররূপে অভাব স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। ফলে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে—অভাবের অভাব প্রতিযোগি-স্বরূপ[5]। যেমন—জলাভাবের অভাব (জলাভাবাভাব) 'জল' স্বরূপ।

১, ভাষাপরিচ্ছেদে বর্ণিত বিভাগ অনুসারে ইহা সপ্তম পদার্থ। "সপ্তম পদার্থ"—এইভাবে অভাবের উল্লেখ অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২, তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ।

৩, ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্ ব্যপেক্ষয়া—১২ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। আচার্য কুমারিল ভট্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মত অভাব পদার্থ স্বতন্ত্ররূপে মানিয়াছেন।

৪, 'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তুনঃ প্রতিযোগিতা' কুসুমাঞ্জলি।

অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, উহাও অভাব বিশেষ এইরূপ মতান্তরও নানা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৫, জল অগ্নির বিরোধী কিন্তু অগ্নির অভাবই জল নহে। যদি ঐরূপ স্বীকার করা যায় তবে যেখানে জল নাই সেস্থানে অগ্নির অভাব প্রতীত হইতে পারিত না। জলযুক্ত স্থানে অগ্নির অভাব জলস্বরূপ অন্যত্র যথাসম্ভব অন্য বস্তু স্বরূপ ইহা স্বীকার অপেক্ষা ভাব পদার্থ হইতে পৃথক অভাব স্বীকারই যুক্তিসঙ্গত।

যে-ভাব যে-অভাবের বিরোধী সেই ভাবই[১] ঐ অভাবের **প্রতিযোগী**। যেমন জলাভাবের প্রতিযোগী জল, ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম

প্রতিযোগীর ধর্ম—প্রতিযোগিতা[২]।

প্রতিযোগিতা, অবচ্ছেদকতা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ইত্যাদি শব্দ নব্যন্যায়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত অভাব সমূহের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্টরূপে বুঝা সম্ভব নহে। অভাব সমুদায়ের পরস্পর পার্থক্য বুঝিতে না পারিলে অভাব বিষয়ে জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অভাব জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ব্যতীত নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করা অসম্ভব। অতএব ঐ সমস্ত বিষয়েরও আলোচনা প্রয়োজন।

পারিভাষিক শব্দের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রথমতঃ পরিভাষা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কোন উদাহরণের সাহায্য ব্যতীত ঐ প্রয়োজন ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এজন্য (১) দ্রব্যাভাব (২) নীলঘটাভাব এবং (৩) ঘটাভাব এই তিনটি অভাব এস্থলে উদাহরণ স্বরূপে গৃহীত হইতেছে।

১ম—দ্রব্যাভাব—ইহার প্রতিযোগী যাবতীয় দ্রব্য; সুতরাং অন্ন বস্ত্র টেবিল চেয়ার প্রভৃতি অন্য সমস্ত দ্রব্যের ন্যায় ঘটেও ইহার প্রতিযোগিতা স্বীকার্য্য। কারণ, অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি কোন একটি দ্রব্য যেখানে বিদ্যমান, সেইস্থানে যেমন "দ্রব্য নাই" (অত্র দ্রব্যং নাস্তি) এই প্রকারে দ্রব্যাভাব প্রতীত হয় না তদ্রূপ একটি ঘট থাকিলেও ঐ স্থানে দ্রব্যাভাব প্রতীত হয় না। অতএব মানিতে হইল—দ্রব্যাভাবের প্রতিযোগী ঘটও বটে। তবে ঘট ব্যতীত ইহার (দ্রব্যাভাবের) আরও অনেক প্রতিযোগী আছে সত্য।

২য়—নীলঘটাভাব—ইহার প্রতিযোগী কেবল নীলবর্ণ ঘটসমূহ। কারণ, একটিমাত্র নীলবর্ণ ঘট থাকিলে সেই স্থানে নীল ঘট নাই এই প্রকারে নীলঘটাভাবের জ্ঞান হয় না, কিন্তু

---

১ গগনকুসুম শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অলীক বিষয় অভাবের প্রতিযোগা হয় না ইহা বুঝাইবার জন্য 'ভাব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ফলে, শশশৃঙ্গাভাব, গগন-কুসুমাভাব ইত্যাদি অভাবের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। নাস্তিক, বৌদ্ধ, কুমারিল ভট্ট এবং মাধ্ব সম্প্রদায় মতে অলীকও অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে সুতরাং ঐ সকল মতে শশশৃঙ্গাভাব ইত্যাদিও স্বীকৃত। বঙ্গীয় মহাকোষ 'অত্যন্তাভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য। মতবিশেষে শশশৃঙ্গাভাব প্রভৃতিই অত্যন্তাভাবের উদাহরণ। ইহা অত্যন্তাভাব নিরূপণে ব্যক্ত হইবে।

২ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি পারিভাষিক পদার্থসকল প্রতিযোগী ঘট প্রভৃতি বস্তুতেই থাকে তথাপি উহারা ঘটত্ব বা ঘটের রূপ রসাদি স্বরূপ নহে। একই পদার্থে এই প্রকার নানা পদার্থ স্বীকার নব্য ন্যায় শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

দ্রব্যাভাবের ন্যায় অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য ইহার (নীলঘটাভাবের) প্রতিযোগী নহে; রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ ঘটও ইহার প্রতিযোগী নহে। তথাপি এই নীল ঘটাভাবেরও প্রতিযোগী ঘটই বটে।

৩য়—ঘটাভাব—ইহার প্রতিযোগী যাবতীয় ঘট। সুতরাং শ্বেত রক্ত নীল ভগ্ন বক্র অতীত অনাগত বর্তমান সমস্ত ঘটেই এই অভাবের ('ঘটো নাস্তি' এই প্রকার ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা স্বীকার্য, কিন্তু ঘট ব্যতীত চেয়ার টেবিল অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুই ইহার প্রতিযোগী নহে। কারণ, উল্লিখিত প্রকারের কোন একটি ঘট থাকিলে সেই স্থানে "ঘট নাই" (অত্র ঘটো নাস্তি) এইপ্রকারে ঘটাভাব প্রতীত হয় না কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য থাকিলেও যেস্থান একেবারেই ঘটশূন্য সেখানে "ঘট নাই" এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে—উল্লিখিত তিনটি অভাবেরই প্রতিযোগী ঘট তথাপি ইহাদের পরস্পর ভেদ আছে। এই ভেদ কিরূপে সম্ভবে যাহা চিন্তা করিলে বুঝা যায়—প্রথম অভাবের (দ্রব্যাভাবের) প্রতিযোগিতা প্রত্যেকতঃ সমস্ত দ্রব্যে আছে কিন্তু গুণ কর্ম ইত্যাদি অন্য কোন পদার্থে উহা নাই।

২য় অভাবের (নীলঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা নীলবর্ণ প্রত্যেক ঘটে বিদ্যমান, উহা রক্ত ঘটেও নাই।

৩য়—অভাবের (ঘটো নাস্তি—এইরূপ ঘটাভাবের) প্রতিযোগিতা কেবল প্রত্যেকতঃ ঘটসমূহে সীমাবদ্ধ—ঐ প্রতিযোগিতা কোন ঘটে বাদ পড়ে নাই আবার উহা ঘট ভিন্ন অন্য কুত্রাপি নাই।

এক্ষণে এই তিনটি প্রতিযোগিতাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করিতে হয় তবে ইহাদের সীমা নির্ধারণই প্রশস্ত পথ। তদনুসারে ১ম অভাবের (দ্রব্যাভাবের) প্রতিযোগিতার সীমানির্দেশক বা অবচ্ছেদক (কিংবা বিশেষক) হইল দ্রব্যত্ব-ধর্ম, ২য়—প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল নীলঘটত্ব এবং ৩য়—প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল ঘটত্ব। আর দ্রব্যত্ব, নীলঘটত্ব এবং ঘটত্ব ইহারা যদি প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল তবে প্রতিযোগিতাও হইল দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন, নীলঘটত্বাবচ্ছিন্ন এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্ন[১]। ফলে

১ম—অভাবের প্রতিযোগিতা—দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা,

২য়—অভাবের প্রতিযোগিতা—নীল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, এবং

৩য়—অভাবের প্রতিযোগিতা—ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা।

১। অবচ্ছেদক—অব+ছিদ্+ণক (কর্তৃবাচ্য)। ইহার অর্থ—বিশেষক বা বিশেষণ, ব্যাবর্তক, সীমানির্ধারক; অবচ্ছিন্ন—অব+ছিদ্+ক্ত (কর্মণি) ইহার অর্থ—বিশেষিত, ব্যাবর্তিত, স্বতন্ত্রীকৃত বা নির্ধারিতসীম অর্থাৎ যাহার সীমা নির্ধারিত হইয়াছে এরূপ। উল্লিখিত প্রতিযোগিতা এবং উহাদের অবচ্ছেদক ধর্মগুলির অধিকরণ এবং কর্তৃবাচ্যে প্রত্যয়ের অর্থগত বৈলক্ষণ্য চিন্তনীয়

উপনিষদে কর্মের প্রসার*

অধ্যাপক **শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র**, এম. এ., কাব্যতীর্থ

আচার্য জৈমিনি সূত্র করিয়াছেন, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে (জৈমিনি-সূত্র, ১, ২. ১),"—অর্থাৎ কর্মবিধানাত্মক শ্রুতিভিন্ন অপরাপর শ্রুতির অপ্রামাণ্য, সেগুলি অর্থবাদ। তাঁহার মতে উপনিষদও অর্থবাদ, কারণ সেখানে কর্মের বিধান নাই। ধর্মের সংজ্ঞা তিনি দিয়াছেন, "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ (১. ১.২)।"—যাহা বেদবিধি-প্রতিষ্ঠিত হইয়া সার্থককর্মে প্রেরণা দেয়, তাহাই ধর্ম। অতএব কর্ম বলিতে তিনি শ্রুতিবিহিত কর্মই বুঝেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, মীমাংসকমতে উপনিষদ্ ধর্মের সাধন নহে। আপস্তম্বের "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি, ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদঃ, (যজ্ঞপরিভাষা-সূত্র, ৩২—৩৩)"—এই উক্তিও আরণ্যক ও উপনিষদের অর্থবাদত্ব সমর্থন করিতেছে। ইহারা ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সত্যকার ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন। আরণ্যক প্রধানত প্রতীক-উপাসনার বিধান এবং উপনিষদে প্রধানত পরতত্ত্বের উপদেশ রহিয়াছে। 'প্রধানত' বলিবার উদ্দেশ্য এই, কখনও কখনও ব্রাহ্মণের শেষ এবং আরণ্যকের আরম্ভ যে কোথায়, তাহা জানিতে পারা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণভাগ গৃহস্থ গ্রামবাসীর চর্চার বিষয়, এবং আরণ্যক বানপ্রস্থাশ্রমীর জন্য বিহিত। বনবাসীরা যাহাতে কায়ত না হইলেও মানসিকভাবে যাগযজ্ঞ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রতীক-ভাবনার উপদেশ পাই আরণ্যকে। এই পার্থক্যটুকু ছাড়িয়া দিলে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শেষ ও প্রারম্ভ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। উভয়েরই বিষয় এখানে এক। মহাব্রত[১] লইয়াই এই আরণ্যকের সূচনা। কাজেই বিষয়বস্তুর আলোচনাদ্বারা ইহাদের ভেদনির্ণয়-প্রচেষ্টা নিষ্ফল। এই মহাব্রতেরই সূত্র ধরিয়া ঐতরেয় উপনিষদের আরম্ভ। শঙ্করাচার্য যে ঐতরেয় উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহা ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকস্থ চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় লইয়া গঠিত। তিনি এই উপনিষদের নাম দিয়াছেন বহ্বৃচ-ব্রাহ্মণোপনিষদ্। তাঁহার এইরূপ নামকরণের হেতু খুব স্পষ্ট। কৌষীতকি আরণ্যকের অন্তর্গত হইলেও কৌষীতকি উপনিষদ্‌কে বলা হইয়াছে কৌষীতকি-ব্রাহ্মণোপনিষদ্।

উপনিষদের মূল তত্ত্বগুলি প্রচারের সূত্রপাতকালে অনুসন্ধিৎসু দেখিতে পাইবেন,

---

* ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কৌষীতকি, শ্বেতাশ্বতর, এবং মৈত্রী—এই প্রধান ও প্রাচীনতম উপনিষদ্‌গুলিই এই নিবন্ধের উপজীব্য হইবে।

১ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-কথিত গবাময়ন-সত্রের (১৭শ অধ্যায়) উপান্ত্যদিনে বিহিত যাগ।

প্রচারকগণ উপনিষদীয় ভাববিপর্যয়কে যজ্ঞ-প্রধান আর্যসমাজে সম্পূর্ণভাবে চালু করিতে পারিতেছেন না। উপনিষদের প্রধান তত্ত্বসমূহ কর্মকাণ্ডের একেবারে বিপরীত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ভাগবত বিদ্রোহকে উপনিষদের স্থানে স্থানে অনুশাসকগণ মৃদুকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন দেখা যায়। অর্থাৎ তাঁহারা কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে ঘরোয়াভাবে আপোষ করিয়া লইয়াছেন। ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, উপনিষদ্ যদিও ব্রাহ্মণ বা আরণ্যকের অঙ্গীভূত (যথা,—ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি), তথাপি এমন সুপ্রাচীন উপনিষদও আছে, যাহা সংহিতা সংলগ্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, যথা, বাজসনেয়িসংহিতোপনিষদ্ বা সংক্ষেপে ঈশোপনিষদ্। প্রাচীন উপনিষদের বিশেষ বিশেষ অংশ সংহিতা, ও আরণ্যকের প্রভাবে যুগপৎ প্রভাবান্বিত। অনেক সময়েই শেষোক্ত তিনটী হইতে উপনিষদ্‌কে বিচ্ছিন্ন করিলে অর্থবোধে কষ্ট হয়।

এখন দেখা যাইতেছে, উপনিষদ্ বেদের ব্রাহ্মণভাগের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেইজন্য উপনিষদের সহিত ব্রাহ্মণের ভাষাগত ও বিষয়গত সাদৃশ্যও খুব কম নহে। আমরা প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব, ব্রাহ্মণ বা কর্মকাণ্ডের অনুরূপ অনেক অংশই এখানে সুলভ।

ভাষার ঐক্য সম্বন্ধে রাশি রাশি উপনিষদীয় অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া অনর্থক পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহিনা। মাত্র কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

"ভবতি হাস্য স্বং য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ (বৃ. উ., ১. ৩. ২৫)।" "অনন্তবানস্মিঁল্লোঁকে ভবত্যনন্তবতো হ লোকাঞ্জয়তি য এতমেবং বিদ্বান্, (ছা. উ, ৪. ৬. ৪)।"

জ্ঞান-প্রশংসা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণে অনেকস্থলেই "য এবং বেদ" এই অংশটী ভূরি ভূরি দৃষ্ট হয়। যেমন, "সর্বমায়ুরেতি য এবং বেদ, (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮. ৩)।" প্রজা, পশু, হিরণ্য, আয়ু, এই সকল ছিল ব্রাহ্মণাংশের কামনার বস্তু। উপনিষদের উপাসনাবিধান-প্রসঙ্গে ফলশ্রুতিতে বহুস্থলে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা,—"তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি, (ছা. উ., ৫. ১৯—২০)।" "য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ ন হাস্য প্রজা হীয়তেঽমৃতো ভবতি, (প্র. উ., ৩. ১১)।" "স য এবমেতদ্ রথন্তরমগ্নৌ প্রোতং বেদ ব্রহ্মবর্চস্যন্নাদো ভবতি সর্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্ কীর্ত্যা, (ছা, উ., ২. ১২. ২) ।"

ব্রাহ্মণাংশের দেবাসুর যুদ্ধের আখ্যায়িকা লইয়া বিষয়ের অবতারণা করার ভঙ্গীও উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা,—"দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাঃ, (ছা. উ., ১. ২. ১)।" "দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ......ত এষু লোকেষস্পর্ধন্ত তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি, (বৃ. উ., ১. ৩. ১);" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণের নির্বচন-পদ্ধতিও (Etymology) উপনিষদের নানাস্থানে অনুসৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে বিভিন্ন যজ্ঞের প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকারের নির্বচন বিহিত হইয়াছে। উপনিষদেও প্রয়োজনের অনুকূলে এমন অনেক কল্পনাপ্রসূত নির্বচন পাওয়া যায়। যথা,—

অশ্ব, অশ্বমেধ—"......ততোঽশ্বঃ সমভবদ্ যদশ্বৎ, তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বম্,—(বৃ. উ., ১. ২. ৭)।" সাম—"এষ উ এব সাম বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি তৎ সাম্নঃ সামত্বম্ (বৃ. উ., ১. ৩. ২২)।" গায়ত্রী—"গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ, (ছা. উ., ৩. ১২. ১)।" আঙ্গিরস—"অঙ্গানাং হি রসঃ প্রাণঃ, (বৃ. উ., ১. ৩. ১৯)।"[২] উদ্গীথ—"এষ উ বা উদ্গীথ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদং সর্বমুত্তব্ধম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ, (বৃ. উ., ১. ৩. ২৩)।" ইন্দ্র—"এতমিন্ধং সন্তমিন্দ্র ইত্যাচক্ষতে পরোক্ষেণৈব, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষদ্বিষঃ, (বৃ. উ., ৪. ২)।" যজ্ঞ—(<যো জ্ঞাতা); সত্ত্রায়ণ—(<সতঃ ত্রাণম্); অনাশকায়ন[৩]—(<ন নশ্); অরণ্যায়ন—(<অর+ণ্য); (ছা. উ., ৮. ৫. ১—৪)। উক্থ, যজুস্, সামন্, ক্ষত্র (বৃ. উ., ৫. ১৩); সত্য (বৃ. উ., ৫. ৫; ছা. উ., ৮. ৩); বৃহস্পতি (ছা. উ. ১. ২)—এই সকলেরও নির্বচন পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণের "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যাদি ভাক্ত-প্রয়োগকে আরণ্যক ও উপনিষদের প্রতীক-উপাসনার অন্যতম মূল বলা যাইতে পারে। যেমন, উপনিষদের বিধান, গায়ত্রীকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিবে। কেন? উত্তর খুব সহজ। গায়ত্রী ছন্দঃ-শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণ-প্রতিপাদিত। ব্রাহ্মণের অনেক স্থলে গায়ত্রীকে ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। জগতী ও ত্রিষ্টুভ্ স্বর্গ হইতে সোম আনয়নে অসমর্থ হইলে গায়ত্রীই শ্যেনরূপ-পরিগ্রহ করিয়া এই কার্য সমাধান করিয়াছিল, (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪. ৩. ৭)। তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীর উদ্ভব, তাই গায়ত্রী মুখ্য ছন্দঃ। এই শ্রেষ্ঠতা-সামান্য লইয়া ব্রহ্ম এবং গায়ত্রীকে সমস্তরে রাখা হইয়াছে।

ছন্দের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থের ন্যায় উপনিষদেও কিছু কিছু কথা পাই। একস্থলে সামোপাসনায় অক্ষর সংখ্যা সামান্য অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে—'একবিংশত্যাদিত্যমাপ্নোতি ... ... অসাবাদিত্যঃ, (ছা. উ., ২. ১০. ৫।'[৪] —উল্লিখিত একুশটী অক্ষর দ্বারা মৃত্যুরূপী আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়, কারণ ওই আদিত্য এই লোক হইতে গণনায় একবিংশ-স্থানীয়। শঙ্করাচার্য ভাষ্যে ব্রাহ্মণাংশ উদ্ধৃত করিয়া একবিংশতি সংখ্যা নিষ্পন্ন করিয়াছেন—"দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ ইতি।"—দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু

---

২ 'অঙ্গার হইতে জাত', যাস্ক এইরূপ নির্বচন দিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের উল্লিখিত অংশে 'প্রাণকেই রস বলা হইয়াছে। কারণ এখানে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞাপনই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই গ্রন্থের অন্যত্র (১. ৩. ৮) "অঙ্গানা হি রসঃ", এই নিরুক্তি পাওয়া যায়।

৩ ইহা একটী অনশন-প্রধান সত্র বা দীর্ঘদিন ব্যাপী যজ্ঞ।

৪ 'একবিংশত্যৈকবিংশত্যৈবেমাল্লোঁকান্ রোহতি ... ... (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ. ১. ৫)'।

৫ "পঞ্চর্তবো হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন, (ঐ. ১. ১)"—শীতত্ব সাম্যবশত হেমন্ত ও শীত এই দুইটী ঋতুকে একটী বলিয়া ধরা হয়।

তিন লোক এবং আদিত্য,—এইরূপে আদিত্যের স্থান একবিংশ। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুভ্‌ ও জগতী ছন্দের অক্ষর সংখ্যা এবং সবনত্রয়ের সহিত সম্বন্ধের কথা পাওয়া যায় ছান্দোগ্যে (৩. ১৬)।

ব্রাহ্মণে মন্ত্রের অর্থ করা হইয়া থাকে যজ্ঞীয় প্রয়োজনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া। উপনিষদেও এইরূপ দেখা যায়। যেমন, 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যমিত্যসৌ বা আদিত্যঃ … … ধিয়ো যো ন প্রচোদয়াদিতি বুদ্ধয়ো বৈ ধিয়ঃ … … (মৈ. উ., ৫. ৭)।' এখানে যজ্ঞীয় প্রয়োজন না থাকিলেও প্রয়োজন অনুসারে মন্ত্রের অর্থ বিকৃত করিতে হইয়াছে। আবার 'তাবানস্য মহিমা°—পুরুষসূক্তস্থ এই ঋকের ব্যাখ্যা কালে ছান্দোগ্য (৩. ১২. ৬) 'অস্য' অর্থে 'গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ' বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণে যেমন নানা সংহিতা হইতে মন্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে, উপনিষদেও তদ্রূপ; অবশ্য সংখ্যানুপাতে অল্প। ঈশোপনিষদের ১৭শ মন্ত্রটী ঈষৎ বিকৃতরূপে বাজসনেয় সংহিতা হইতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতরের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে কতকগুলি সংহিতামূলক মন্ত্র লক্ষ্য করা যাক্‌।

শ্বে. উ. ২. ১. = তৈত্তিরীয় সংহিতাঃ ৪. ১. ১. ১. ১ ; বাজসনেয়ি সংহিতাঃ ১১. ১.
" " ২. ২. = " " ৪. ১. ১. ১. ৩ ; " ১১. ২.
" " ২. ৪. = " " ৪. ১. ১. ৪ ; ইত্যাদি ; " ৫. ১৪ ; ১১. ৪. ; ইত্যাদি ; ঋগ্বেদ. ৫. ৮১. ১.
" " ২. ৫. = " " ৪. ১. ১. ২. ১ ; " ১১. ৫ ; অথর্ববেদ, ১৮. ৩. ৩৯ ; ঋগ্বেদ, ১০. ১৩. ১.

ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রয়োজনমত এই প্রবন্ধে উপনিষদের অনেক অংশ সংহিতামূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণে অনেকস্থলে যজ্ঞাদিকে পাঙ্‌ক্ত বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেও (১. ৪. ১৭) সেইরূপ পাই,—'স এষ পাঙ্‌ক্তো যজ্ঞঃ পাঙক্তঃ পশুঃ পাঙ্‌ক্তঃ পুরুষঃ … …।'

মানুষের জাতিভেদ দেবতাদিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-দৃষ্টে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২. ৩) দেখিতে পাই—'দেববিশঃ কল্পয়িতব্যা ইত্যাহুঃ।' এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে সায়ণ বলেন, দেবতাদের মধ্যে জাতিভেদ স্বয়ং শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন। অগ্নি ও বৃহস্পতি দেবতাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ। বৃহদারণ্যক প্রমাণে জানিতে পারি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান—ইঁহারা ক্ষত্রিয়। গণবদ্ধ দেবগণ বৈশ্য,—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ। পূষন্‌ হইলেন শূদ্র। এইভাবে দেবগণের জাতি সৃষ্টি হয়। বৃহদারণ্যকের (১. ৪) বর্ণনাকে সায়ণ এস্থলে লক্ষ্য করিয়াছেন। এই শ্রুতি অনুযায়ী 'দেববিশঃ' শব্দের অর্থ তিনি দিয়াছেন—'দেবগণের মধ্যে যাঁহারা বৈশ্য।' অর্থের অসঙ্গতি এখানে কিছুই নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতাগণের সংখ্যা ধরা হইয়াছে তেত্রিশ। বৃহদারণ্যকেও (৩. ৯. ২.)

তেত্রিশ-সংখ্যার উল্লেখ আছে। বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণ মিলিয়া একত্রিশ। বাকী দুইটী দেবতার নাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। কোথায়ও দ্যাবাপৃথিবী, কোথায়ও প্রজাপতি ও বষট্‌কার, কোথায়ও বা ইন্দ্র ও প্রজাপতি (যেমন বৃহদারণ্যকে)।

এইরূপ নানাবিষয় আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যে কথঞ্চিৎ ভাষা ও ভাবগত ঐক্য অনুভূত হয়।

শঙ্করাচার্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ভাষ্যে (৩. ১০ ৩) শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।" উপাসনা বা ভাবনা যজ্ঞনিষ্ঠ মানুষকে অনেক উপরে তুলিয়া দেয়। গীতায় আছে—"ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্ (৩. ২৬)।" যাহারা অজ্ঞান এবং কর্মে (যাগাদি) আসক্ত, তাহারা যে বুদ্ধি লইয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহার হানি করিতে গীতা নিষেধ করিতেছেন। তাহাতে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ" হইতে হয়। নিম্নস্তরের বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে একেবারে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝানো যাইবে না। তাহার ধারণা শক্তিকে ধীরে ধীরে উন্নত করিতে হইবে। সেইজন্য উপনিষদে এত কর্মমূলক উপাসনার কথা। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ অধ্যায় বা এইরূপ অবিমিশ্র দার্শনিকতা-মূলক অধ্যায় উপনিষদের সর্বত্র নাই। যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছে নানাবিধ আপাতমধুর ক্ষণস্থায়ী ফললাভের আশায়, তাহাকে অব্যবহিত উপরের স্তরে লইতে চাহিলে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে। বৃহদারণ্যক (১. ১. ১.) তাহাকে নির্দেশ দিলেন,—উষাকে যজ্ঞীয় অশ্বের মস্তক, সূর্যকে চক্ষু, বাতাসকে প্রাণ, দ্যুলোককে পৃষ্ঠদেশ, অন্তরিক্ষকে উদর, দিক্‌সকলকে পার্শ্বদেশ, নক্ষত্রগণকে অস্থি-সমষ্টি, মেঘকে মাংস, ইত্যাদিরূপে উপাসনা কর। মনে রাখিতে হইবে, মুখ্যত উপাসনার কথা রহিয়াছে আরণ্যকে। অরণ্যবাসী হইয়া বিপুল অর্থব্যয়ে যজ্ঞ করা সম্ভব নহে, কাজেই ভাবনা করিয়াও তৎ তৎ কর্মের ফল পাওয়া যায়, এইরূপ শ্রুতির আবশ্যক হইল। আবার আর্যজীবনের চরম আশ্রমের উপযোগী করিতে হইলে এইরূপেই ধীরে ধীরে তাহাকে অগ্রসর করাইয়া দিতে হইবে, এই জন্যও উপাসনার কার্যকারিতা আর্যগণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিলেন। এই সকল উপাসনার মধ্যে ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে স্তরভেদও রহিয়াছে। হিন্দুধর্মের বিশিষ্টতাই হইল, সকলকে ধর্মসাধনের সুযোগ দেওয়া। সেইজন্য যে ব্যক্তিটী ধর্মসাধনের অতি নিম্নস্তরে অবস্থান করিতেছে, এবং যে ব্যক্তিটী এই পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের উভয়ের জন্যই নানারূপ উপাসনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যাহার যেমন অভিরুচি, সে তেমনটী বাছিয়া লইবে। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক—এইগুলিই হইল উপাসনার স্তরবিভাগ। এখানে প্রবন্ধের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আমরা শুধু কর্মাঙ্গ-উপাসনা লইয়াই সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। কর্মকাণ্ডের নানা কথা এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে।

সোমযজ্ঞাদিতে নানাবিধ সাম গান করা হইয়া থাকে। উপাসনার অঙ্গ হিসাবে এইরূপ অনেক সামের নাম উপনিষদে পাওয়া যায়। যথা—বৃহৎ (ছা. উ., ২. ১৪. ১-২; কৌ. উ., ১. ৫); রথন্তর (ছা. উ., ২ ১২. ১—২ কৌ., উ. ১. ৫); শৈত্য, নৌধস, বৈরূপ,

বৈরাজ, শাকর, রৈবত, ভদ্র (কৌ. উ., ১. ৫) ; যজ্ঞাযজ্ঞিয় (কৌ. উ., ১. ৫ ; ছা. উ., ২. ১৯. ১) ; পঞ্চবিধ সাম অর্থাৎ হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, নিধন (ছা. উ., ২. ২. ১ ; ইত্যাদি) ; প্রস্তাব (বৃ. উ., ১. ৩) ; সপ্তবিধ সাম অর্থাৎ হিঙ্কর, প্রস্তাব, আদি, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন (ছা. উ., ২. ৮) ; বাসব, রৌদ্র, বৈশ্বদেব (ছা. উ., ২. ২৪) ; বিনর্দি, অনিরুক্ত, মৃদু শ্লক্ষ, শ্লক্ষ বলবদ্‌, ক্রৌঞ্চ, অপধ্বান্ত (ছা. উ., ২. ২২. ১) ; গায়ত্র (ছা. উ., ৩. ১২. ৮) ; বামদেব্য।[৬]

কর্মাঙ্গ উপাসনা বর্ণনায় অনেকগুলি স্তোভাক্ষরও পাওয়া যায়। সামগানে যেখানে কোনও পদ থাকিবে না, সেখানে স্বরের পূরণ করিবার জন্য এই অক্ষরগুলির প্রয়োজন হয়। সামবেদের অংশবিশেষের নাম স্তোভ। ছান্দোগ্যে (১. ১৩) ১৩টী স্তোভাক্ষর লিখিত আছে ; যথা—হাউ, হাই, অথ, উ, এ, ঔহোয়ি, হিং, স্বর, যা, বাগ্‌, হুং।

বহিষ্পবমান স্তোত্র (ছা. উ., ১. ১২. ৪) এবং স্তোম (ছা. উ., ১. ১০) ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ সামবেদীয় বলিয়া সাম সম্বন্ধে অনেক কথাই ইহাতে আছে।

কৌষীতকি উপনিষদে (২. ৫) সংযমন বা অন্তরগ্নিহোত্রের কথা আছে। কথা বলিবার সময়ে নিশ্বাস লওয়া যায় না, লোকে তখন প্রাণকে বাক্যে আহুতি দেয়। আবার নিশ্বাস লইবার সময়ে কথা বলা যায় না, লোকে তখন বাক্যকে প্রাণে আহুতি দিয়া থাকে। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় লোকে নিরন্তর এই দুইটী অন্তহীন অমৃতাহুতি দেয়। অগ্নিহোত্রের উপকরণ (দুগ্ধাদি) অন্তযুক্ত বলিয়া জ্ঞানিগণ এইপ্রকার অগ্নিহোত্রের বিধান দিয়াছেন।[৭]

উপাসনায় ভূঃ ভুবঃ স্বরাত্মক ব্যাহৃতির প্রয়োগের কথা পাওয়া যায় মৈত্রী উপনিষদে (৫. ২)। কয়েকটী স্থানে ব্যাহৃতি-সৃষ্টির বর্ণনা আছে। "প্রজাপতিস্তপস্তপ্ত্বাম্নব্যাহরদ্‌ ভূর্ভুবঃ স্বরিত্যেষা হাথ প্রজাপতেঃ স্থবিষ্ঠা তনূর্যা লোকবতীতি স্বরিত্যস্যাঃ শিরো নাভির্ভুবো ভূঃ পাদাঃ ; (মৈ. উ., ৫. ৬.)।" এই সকল হইতেছে তাঁহার ত্রিভুবনাত্মক শরীর। স্বর্লোক তাঁহার মস্তক, ভুবর্লোক নাভি এবং ভূলোক চরণ।

---

৬ "হাই" নামক স্তোভাক্ষর (ছা. উ., ১. ১৩) বামদেব্য সামে গান করিতে হয়। ছান্দোগ্যে বামদেব্যের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও স্তোভাক্ষর প্রমাণে ধরিয়া লইতে হইবে।

৭ অগ্নিহোত্রের উল্লেখ উপনিষদে আরও আছে, যথা – বৃ. উ, ৪. ৩. ১. ; ছা. উ., ৫. ২৪. ; মু. উ., ১. ২. ৩.। সংযমনের অনুরূপ উপাসনা পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩২. ১০)। অপত্নীক ব্যক্তির অগ্নিহোত্র আহুতি কিরূপ হইবে, ইহার উত্তরে শ্রুতি বলেন, "শ্রদ্ধা পত্নী সত্যং যমমানঃ শ্রদ্ধা সত্যং তদিতুত্তমং মিথুনং শ্রদ্ধয়া সত্যেন মিথুনেন স্বর্গাল্লোঁকান্‌ জয়তি।"—শ্রদ্ধা (কর্মশ্রদ্ধা) পত্নী, সত্য বা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ যজমান ; ইহারাই দম্পতী-স্বরূপ। শ্রদ্ধা সত্যরূপ মিথুনরূপে ভাবিত হইয়া মানস অগ্নিহোত্র হোম করিতে স্বর্গলাভ হইবে।

আবার—

"প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ, তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ী বিদ্যা সম্প্রাস্রবৎ, তামভ্যতপৎ, তস্যা অভিতপ্তায়া এতান্যক্ষরাণি সম্প্রাস্রবন্ত ভূর্ভুবঃস্বরিতি॥ (ছা. উ., ২. ২৩. ২)"—লোক সকলকে উদ্দেশ করিয়া প্রজাপতি তপস্যা করিলেন। চিন্তিত (অভিতপ্ত) সেই লোকসমূহ হইতে ঋক্ যজুস্ ও সামাত্মক ত্রয়ী বিদ্যা (বৃ.উ., ৫. ১৪; ছা.উ., ১. ১. ৯; ১. ৪. ১) নির্গত হইল, অভিতপ্ত ত্রয়ী হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বর্, এই অক্ষরগুলি নির্গত হইল।

আবার—

"প্রজাপতির্লোকানভ্যতপৎ তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরীক্ষাদাদিত্যং দিবঃ॥ স এতা স্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ, তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নের্ঋচো বায়োর্যজূংষি সামান্যাদিত্যাৎ॥ স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপৎ, তস্যা স্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ ভূরিত্যৃগ্‌ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ॥ (ছা. উ., ৪. ১৭. ১—৩)।[৮] অর্থাৎ প্রজাপতি কর্তৃক অভিতপ্ত লোকসমূহের এইরূপ রস বা সার উদ্‌ভূত হইল—পৃথিবীর সার অগ্নি, অন্তরীক্ষের সার বায়ু এবং দ্যুলোকের সার আদিত্য। অভিতপ্ত এই তিনটী দেবতা হইতে রসের উৎপত্তি হইল এইরূপ:—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্বেদ ও আদিত্য হইতে সামবেদ। অভিতপ্ত এই বেদত্রয়ের সাররূপে যথাক্রমে ভূঃ ভুবঃ স্বর্ উৎপন্ন হইল।

যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের কার্যে কোনওরূপ ভুলভ্রান্তি হইলে ব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। "তদ্‌যদ্যৃক্তো রিষ্যেদ্ ভূঃস্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুয়াদৃচামেব তদ্রসেনর্চাং বীর্যেণর্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি॥ অথ যদি যজুষ্টোবিষ্যেদ্ ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুয়াৎ। ......অথ যদি সামতো রিষ্যেৎ স্বঃস্বাহেত্যাহবনীয়ে জুহুয়াৎ, (ছা. উ., ৪. ১৭)।"[৯]—সেই যজ্ঞে ঋঙ্‌মন্ত্র-শংসনাদিবশত দোষ হইলে 'ভূঃ স্বাহা' এই বলিযা গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিবে। তাহা হইলে ঋকের রস ও প্রভাবে ঋগ্‌বিষয়ক সেই যজ্ঞের দোষ নষ্ট হয়। যদি যজুর্নিমিত্ত স্খলন হয়, তবে 'ভুবঃ স্বাহা' এই বলিযা দক্ষিণাগ্নিতে (অন্বাহার্যপচন অগ্নিতে হোম করিবে। ··· ··· সাম নিমিত্ত স্খলন হইলে 'স্বঃ স্বাহা' বলিযা আহবনীয় অগ্নিতে হোম করিবে।[১০] উপনিষদে অতঃপর বলা হইয়াছে, বৈদ্য যেমন রোগীকে নিরাময় করে, সেইরূপ উক্ত ব্যাহৃতি দ্বারা যজ্ঞীয় ভ্রংশের প্রতিকার করা হয়।

(ক্রমশঃ)

---

৮. ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও (২৫. ৭) ব্যাহৃতি সৃষ্টির অনুরূপ বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার সহিত ছান্দোগ্যের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

৯. তুলনীয়—"তে দেবা অব্রুবন্ প্রজাপতিং যদি নো যজ্ঞ ঋক্ত আর্তিঃ স্যাদ্ যদি যজুষ্টো যদি সামতঃ···কা প্রায়শ্চিত্তিরিতি স প্রজাপতিরব্রবীদ্দেবান যদি বো যজ্ঞ ঋক্ত আর্তির্ভবতি ভূরিতি গার্হপত্যে জুহবাথ যদি যজুষ্টো ভুব ইত্যাগ্নীধ্রীয়েঽন্বাহার্যপচনে বা হবির্যজ্ঞেষু যদি সামতঃ স্বরিত্যাহবনীয়ে······জুহবাথেতি। ·· যজ্ঞস্য বিশ্লিষ্টং সন্দধাতি। (ঐ, ২. ৭)।" ব্রাহ্মণের সহিত উপনিষদের ভাষাগত সারূপ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১০ উল্লিখিত অগ্নিত্রয়কেই 'ত্রেতাগ্নি' বা সংক্ষেপে ত্রেতা' বলে; ছা. উ. ২. ২৪, ৪. ১৭; প্র. উ. ৪. ৩; মু. উ. ১. ২. ১; মৈ. উ. ৫.; ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

চতুরাশ্রম ধর্ম

অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, শাস্ত্রী**, স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ, এম্. এ.

ধর্মের আদর্শ অতি উচ্চ সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তব জীবনের কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়াই সেই আদর্শের অনুশীলন দরকার। হিন্দুর বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় মূলতঃ এই নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজস্থিতির কল্যাণব্যবস্থায় একদিকে যেমন চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের কল্যাণসাধনে চতুরাশ্রম ধর্মের পরিকল্পনা। আশ্রমধর্মকে কেন্দ্র করিয়া ব্যক্তিগত জীবনের সর্ববিধ শারীরিক, আর্থিক, নৈতিক, মানসিক ও মোক্ষাভিমুখ আধ্যাত্মিক কল্যাণের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ব্যষ্টিগত জীবনের সমষ্টিগত রূপই সমাজ। অতএব যে ধর্ম হিন্দুর জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণকর যোগসূত্র স্থাপিত করিয়াছে তাহাকেই এক কথায় বর্ণাশ্রম ধর্ম বলা হয়।

সত্য বটে মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা নিবৃত্তিমুখী মোক্ষসাধনায়। কিন্তু অর্থ, কাম প্রভৃতি জৈব প্রবৃত্তিকে (biological impulse) একেবারে অস্বীকার করা চলে না। উহাকে বর্জন করিলে বা অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিলে জীবনযাত্রাই যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার ইহলোকসর্বস্ব হইয়া কেবল কামনা বা বাসনাভোগ করিলে উহা উত্তরোত্তর অশান্ত ও দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে[১], এবং জ্ঞান ও ধর্মের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলে উহাতে পাশব বা অসুর বৃত্তিই প্রাধান্য লাভ করে। কারণ—'ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'।

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল পরস্পর অবিরোধে ব্যক্তিগত জীবনের কর্মানুষ্ঠানে মানুষ কিরূপভাবে আয়ত্ত করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্ট রাখিয়া শাস্ত্রকারগণ চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কামনা বাসনা ইত্যাদি জীববৃত্তি এই ব্যবস্থায় প্রধানতঃ ধর্মপ্রয়োজনে নিয়ন্ত্রিত। মনুর নিম্নোক্ত বচনের বেশ একটী গূঢ় তাৎপর্য আছে সন্দেহ নাই:

'কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা'। (মনু ২. ২)

অর্থাৎ 'কামনাপর হওয়া উচিত নহে, কিন্তু কামনার অতীত হওয়াও এ জগতে দেখা যায় না।' কামনাকে বাদ দিয়া এসংসারে জীবনযাত্রা অসম্ভব, কারণ 'অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্‌দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ' (মনু ২. ৪)। আবার কামনাতেও শ্রেয়োলাভ হয় না। (গীতা ৩. ৫ ; ৬. ৭; বশিষ্ঠ সং° ৩০. ১০-১১)। অতএব ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। হিন্দুর আশ্রমধর্মে সেই সামঞ্জস্যই বিশেষভাবে প্রকটিত। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'—আশ্রমধর্মের পরিকল্পনায় ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়।

---

১ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥'—(মনু ২. ৯৪)।

সংযম ও শিক্ষার মধ্য দিয়া সাংসারিক ও সামাজিক সর্ববিধ কর্তব্য পালন করিয়া যাহাতে মানুষ মোক্ষের চরম আদর্শ অনুশীলন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই আশ্রমধর্মের ব্যবস্থা। আশ্রমধর্মের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মপদ্ধতির অনুশীলনে ত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধির অভ্যাস আয়ত্ত হয় এবং অবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে আত্মদর্শনে মোক্ষলাভ হয়। তাই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস (ভৈক্ষ্য বা পরিব্রজ্যা)—এই চারি আশ্রমের বিধান। সর্বাগ্রে যমনিয়মের অনুশীলনে উন্নত চরিত্রের ভিত্তিগঠন, সংসারজীবনে বহুবিধ অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে যথাশক্তি সেই চরিত্র-মহিমায় স্থিতি, ধর্মনিয়মিত প্রবৃত্তিমার্গ হইতে, ক্রমশঃ নিবৃত্তির পথে মনের উন্নয়ন এবং তাহা হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে বদ্ধাবস্থার মুক্তি বা মোক্ষ লাভ—এইরূপ একটী সুসমঞ্জস ধারায় চতুরাশ্রম ধর্মে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত। ইহাকে জীবনের Spritual discipline বা ধর্মানুবর্তিতার অনুশীলন বলা যাইতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্ভাগে বিভিন্ন আশ্রম ধর্মের স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'বৃহদারণ্যক'[২] ও 'মৈত্রায়ণী'[৩] উপনিষদে আশ্রম ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। 'ছান্দোগ্য'[৪] উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত আছে—ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নরূপ ধর্মপালন করিয়া এবং গৃহস্থ পুত্রোৎপাদনে জীবধারা রক্ষা করিয়া ও অন্যান্য ধর্মাচার প্রতিপালনে আত্মোন্নতি সাধিত করে এবং তাহাতে জন্মান্তরের বন্ধনপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। উক্ত উপনিষদের অন্যত্র উল্লেখ আছে—

'ত্রয়ো ধর্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি। প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্যাচার্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্যকুলেঽবসাদন্ সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি।' (ছান্দোগ্য উ°. ২. ২৩. ১)

যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এই ত্রিবিধ ধর্মবিভাগ। প্রথম ধর্ম গৃহস্থের পক্ষে বিহিত, তপস্যা ইত্যাদি অন্যের (সম্ভবতঃ বানপ্রস্থীর) পক্ষে বিহিত[৫] এবং অধ্যয়ন গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারীর কর্তব্য। এই ত্রিবিধ ধর্মবিভাগে অবশ্য পৌর্বাপর্য ক্রমের কোন ইঙ্গিত নাই। কেবল উল্লেখ আছে—ইহাতে 'পুণ্যলোক' লাভ হয়। কিন্তু এই আশ্রমধর্মের সহিত ভেদ দেখাইয়া উক্ত 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ্ বলিয়াছে—'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি (২. ২৩. ১);—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মৃত্যু অর্থাৎ কর্মবন্ধ অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। 'বৃহদারণ্যক'[৬]

---

২ ৬. ২:

৩ ৪. ৩

৪ ৮. ৫

৫ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে উহা পরিব্রাজকের ধর্ম।

৬ 'ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি'—৩. ৫; এবং ৩. ৮. ৯., ৪. ২. ২২ দ্র°।

উপনিষদেও এইরূপ গৃহস্থ-আচরিত ধর্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'মুণ্ডক' উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের কৃতকৃত্যতা সম্বন্ধে উক্ত হয়—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥' ২. ২. ৮

অনেকে ইহাতে অনুমান করেন ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠার শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনায় তদুপযোগী চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসের পরিকল্পনা পরবর্ত্তী কালে স্থান পাইয়াছে।[৭] ব্রহ্মচর্য্য[৮] ও গার্হস্থ্য[৯] সম্বন্ধে বৈদিক সংহিতায় উল্লেখ আছে। 'আরণ্যক' শ্রুতি হইতেও বানপ্রস্থীর প্রতীক-ভাবনা, তপশ্চর্যা ও উপাসনা বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। উপনিষদের ঠিক পরবর্ত্তী যুগে 'বৈখানসধর্মসূত্র' বলিয়া যে পৃথক্ এক সূত্রসাহিত্য রচিত হইয়াছিল তাহা হইতেও বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন হয়। তবে সন্ন্যাস আশ্রমের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতার অভাব থাকিলেও 'জাবাল'[১০] ও 'মুণ্ডক'[১১] উপনিষদে ইহাকে স্পষ্ট চতুর্থ আশ্রম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক বিবেচনায় ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রাচীন ধর্মসূত্র রচনাকালে চারি আশ্রমের পৌর্বাপর্য ক্রম, ও বর্ণধর্মের সহিত ইহার সংযোগ বিশেষভাবে উপলব্ধি হইয়াছিল। এবং ইহা বলা বাহুল্য যে স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতে প্রধানতঃ বর্ণাশ্রম ধর্ম। যাহা কিছু ব্যবস্থা ধর্মশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণাশ্রম ধর্মের সহিত তাহার কোন না কোন সম্বন্ধ আছে এবং হিন্দুর জীবনে ইহা অবশ্য-প্রতিপাল্য ব্যবস্থা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ দিয়াছেন।

বর্তমানে আমরা চতুরাশ্রমের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব ও উহাদের মূলগত উদ্দেশ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও ভৈক্ষ্য, প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস—এই চারিটী আশ্রমের মধ্য দিয়া হিন্দুর সমগ্র জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত।[১২]

ব্রহ্মচর্যাশ্রম জীবনের প্রথম আশ্রম। উপনয়ন সংস্কারের পরই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশের বিধান।

---

৭ কীথ্ (Keith) প্রণীত 'Vedic Index,' Vol. I, পৃ° ৬৮ দ্র°।

৮ ঋ. বে ১০. ১০৯. ৫; অথর্ব বে ৬. ১০৮. ২, ১৩১. ৩; ১১. ৫. দ্র°।

৯ ঋ. বে. ৬. ৫৩. ২; অথর্ব বে. ১৪. ১. ৫১; ১৯. ৩১. ১৩ দ্র°।

১০ ৪ অধ্যায় দ্র°।

১১ 'তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ।
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যথামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা॥'—১. ২. ১১; (২. ১. ৭৩ দ্র°)।

১২ ইহা উল্লেখ করা দরকার যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে আজীবন গুরুগৃহে থাকার ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। (বশিষ্ঠ ধ° সূ° ৭. ৩, বিষ্ণু সূ° ২৮. ৪৩-৪৬, যাজ্ঞ° ১. ৪৯. ৫০)। তাহাকে আর আশ্রমান্তরে প্রবেশ করিতে হইত না। পক্ষান্তরে যাহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পর গৃহী হইবে তাহাদিগকে উপকুর্বাণক ব্রহ্মচারী বলা হয়। আবার ইহাও শ্রুতিতে উল্লেখ আছে—'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ'।

'উপনয়ন' বলিতে 'গুরোঃ সমীপে নয়নম্'। ইহাতে দ্বিজত্ব লাভ হয়।[১৩] গুরুগৃহে বাস করিয়া উপনয়ন-সংস্কৃত বালক প্রধানতঃ 'ব্রহ্ম' বা বেদপাঠে নিযুক্ত থাকে বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মচারী বলা হয়। সাধারণতঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বর্ষ বয়সের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার হয়।[১৪] তৎপর সাধারণতঃ ন্যূনাধিক চব্বিশ বা অষ্টাদশ বৎসরকাল গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারীকে বেদাভ্যাস, গুরুশুশ্রূষা, ইন্দ্রিয়সংযম ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিভিন্ন ব্রতচর্যা পালন করিতে হয়। মনু বলেন—

'কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্বকম্॥ (২. ১৭৩)
সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥' (২. ১৭৫)

শাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বিশ্লষণ করিলে দেখা যায় শিক্ষা, সাধনা ও চারিত্রিক সংযম অভ্যাসই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বেদাধ্যয়নে শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, গুরুসেবায় একান্ত বিনয় শিক্ষা এবং ব্রতচর্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমে চারিত্রিক দৃঢ়তা গঠন—ইহাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যার্জনের উপযোগিতা চিরপ্রসিদ্ধ—সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? গুরুশুশ্রূষায় যে ঐকান্তিক বিনয় ও সেবাব্রতের অনুশীলন হয় পরবর্তী জীবনে সমাজ ও ধর্মসেবাব্রতে তাহার যথেষ্ট উপযোগ আছে সন্দেহ নাই। এবং যম নিয়মের অভ্যাসে চারিত্রিক দৃঢ়তার যে প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় ধর্মমুখ্য হিন্দুজীবনের কর্তব্যপালনে—বিশেষ করিয়া গৃহস্থজীবনের কঠোর দায়িত্ব প্রতিপালনে—উহার বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। সংযমের অভাবে নিবৃত্তি-মুখী ধর্মসাধনার প্রয়াস কিছুতেই সফল হইতে পারে না। এই অভিসন্ধি লইয়াই সম্ভবতঃ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে গৃহস্থাশ্রমের পূর্ববর্তী প্রথম আশ্রম বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

প্রথম আশ্রমের ব্রত সমাপনান্তে গুরুর আদেশে সমাবর্তন সংস্কারের পর যথাশাস্ত্র বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়—ইহাই শাস্ত্রের বিধান। সংবর্ত বলেন—'অতঃ-পরং সমাবৃত্তো কুর্যাদ্দারপরিগ্রহম্।' যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন—'অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ' (১. ৫২)। মনে রাখিতে হইবে সাংসারিক ধর্মচর্যায় গৃহিণীকে বাদ দিয়া গৃহের কল্পনা শাস্ত্রে নাই। ভট্টভাষ্যধৃত স্মৃতির বচনে দৃষ্ট হয়—

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥'

'ধর্মার্থকাম' ত্রিবর্গ সাধনায় স্বামীর সহিত স্ত্রীর সহাধিকার—ইহা শাস্ত্রকারগণ এক-বাক্যে স্বীকার করেন।[১৫]

---

১৩ 'মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে'—মনু ২. ১৬৯ ; যাজ্ঞ° ১, ৩৯ দ্র°।

১৪ ব্রাহ্মণাদিভেদে উপনয়নের কাল সম্বন্ধে মনু ২. ৩৬—৩৭ ; গৌতম ধ. সূ. ১. ৭, ৮, ১৩ ; যাজ্ঞ°. ১. ১৪ দ্র°।

১৫. 'মীমাংসা দর্শন' – 'অর্থেন চ সমবেতত্বম্'—৬. ১. ১৪ সূত্র (শবর ভাষ্য সমেত) দ্র°।
মনু ৯. ২৮ ও দক্ষসংহিতা ৪. ২ দ্র°।

স্মৃতিপ্রণেতা আচার্যগণ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। গৌতমপ্রণীত প্রাচীন ধর্মসূত্রে দৃষ্ট হয়—

'তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্' (৩. ৩)।

তিনি আরও বলেন—'ঐকাশ্রম্যন্ত্বাচার্যাঃ' (৪. ৩৫)।

অর্থাৎ 'আচার্যগণের মতে গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। অপর তিন আশ্রমে সন্তান উৎপাদনে জীবধারা বিস্তারের সম্ভাবনা নাই'। 'আপস্তম্বধর্মসূত্র'[১৬] এবং 'বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রেও'[১৭] গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছে। সংসারস্থিতি ও সমাজস্থিতি রক্ষাকল্পে মানব জীবনের যাহা কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহা এই আশ্রমেই পালিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইহারই উপযোগী শিক্ষা ও সাধনার প্রথম স্তর মাত্র। আবার বানপ্রস্থ আশ্রম কেবল নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ-সাধনের উপযোগী আশ্রম। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে জীবনের বিভিন্ন ঋণ পরিশোধের মধ্য দিয়া অবশ্যকর্তব্য দান যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদনে, যাঁহারা অন্যাশ্রমী তাঁহাদের প্রতিপালনে এবং পারিবারিক ও সামাজিক সর্ববিধ কর্মপালনে যে আত্মোন্নতি সাধিত হয় তাহাতে আনুষঙ্গিক রূপে সমগ্র সমাজের উপকার হয়। মনু চমৎকারভাবে এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিয়াছেন—

'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥
যথা ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্রমী গৃহী॥' (৩. ৭৭—৭৮)

গৃহস্থাশ্রমের আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে বর্ণানুরূপ কর্মবিভাগের রীতি এই আশ্রমেই বিশেষভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে। যে চাতুর্বর্ণ্য ধর্মে সাংসারিক ও সামাজিক কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থাশ্রমই সেই ধর্মের কর্মভূমি। এই আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া একেবারে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস অবলম্বন সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও শাস্ত্রকারগণ তাহা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন না।[১৭(ক)]

শাস্ত্রে দেখিতে পাই জন্মিবামাত্র আমরা ঋণী। 'জায়মানো হবৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি র্ঋণৈ-

---

১৬ ২ প্র. ২৩—২৪ কণ্ডিকা দ্র'।

১৭ 'সর্বেষাশ্রমেষু গৃহস্থ এব বিশিষ্যতে'– ৮. ১১.

১৭ (ক) ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানঃ ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ মনু ৬. ৩৫ – ৬।

ঋণবান্ জায়তে' (তৈত্তিরীয় সং° ৬. ৩. ১০. ৫)। ঋণের বোঝা লইয়া জীবন যাপন কষ্টকর। অতএব দেবতা, ঋষি ও পিতৃকুল—এমন কি মনুষ্যলোক ও নিখিল ভূত জগতের ঋণ পরিশোধ অবশ্যই দরকার। পঞ্চযজ্ঞরূপ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয় (আশ্বালায়ন গৃ° ৩. ১৪ দ্র°) কর্মপদ্ধতিতে এই ঋণ পরিশোধের ইঙ্গিত রহিয়াছে। মহাযজ্ঞ পাঁচটীর স্বরূপ বিবৃত করিয়া মনু বলিয়াছেন—

'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥' (৩. ৭০.)

অর্থাৎ 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নাম ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞ, পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তর্পণ শ্রাদ্ধ পিতৃযজ্ঞ, দেবোদ্দেশে হোম দেবযজ্ঞ, ইতর প্রাণিদের উদ্দেশ্যে অন্নাদি বলিদান ভূতযজ্ঞ, ও অতিথিসেবা নৃ-যজ্ঞ।'

বেদাধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বেদজ্ঞান সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মায় প্রতিভাত হয়; অতএব বেদপাঠে সেই সত্যপ্রচুর জ্ঞানমূর্তির সহিত আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। এবং অধ্যাপনা দ্বারা সেই জ্ঞানের আলোক অন্যত্র বিতরণ করিয়া বিদ্যা বা সংস্কৃতিরূপ যজ্ঞসাধনারই সহায়তা করা হয়। ইহাই ব্রহ্ম বা ঋষিযজ্ঞের মর্মনিহিত তত্ত্ব। তাই ইহা নিত্য কর্তব্য। উহা হইতে বিরত হইলে কি দুর্দশা হয় 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকে' বড় সুন্দর একটী রূপকে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার মর্মার্থ এইরূপ :—'সূর্য গতিশীল, জলরাশি গতিশীল, নক্ষত্র গতিশীল, ইহাদের গতিক্রিয়া বন্ধ হইলে জগদ্‌যন্ত্রের যে অবস্থা হয় গৃহস্থ যেদিন অধ্যয়ন হইতে বিরত হন তাঁহার গৃহেরও তদ্রূপ অবস্থা ঘটে।'

মাতাপিতার ঋণ কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রমতে সে ঋণভার লাঘব হয় বংশধারা রক্ষায় অর্থাৎ ধর্মার্থ সৃষ্টিপ্রয়োজনের সহায়তায়। তাই পিতৃপুরুষের ঋণপ্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন—'প্রজয়া পিতৃভ্যঃ'[১৮]। হিন্দুর দাম্পত্য-সম্বন্ধ অন্যান্য জাতির ন্যায় সামাজিক চুক্তি বা Contract নহে। ধর্মের নিমিত্তই বিবাহ সংস্কার—'ধর্মাদ্ধি সম্বন্ধঃ'।[১৯] এবং ধর্মের নিমিত্তই সন্তানোৎপাদন। পিতৃলোকের সহিত আমাদের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রহিয়াছে। অনাদিকাল হইতে কোটি কোটি জীবধারার অনন্ত প্রবাহ বহিয়া চলিতেছে। সে ধারার সহিত আমাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে—ইহা স্মরণ করিয়া পিতৃযজ্ঞের তর্পণ মন্ত্রে গৃহী 'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতাম্' বলিয়া বিশ্ববেদীর মূলে অর্ঘ্য নিবেদন করে।

দেবযজ্ঞে দেবলোকের তুষ্টিবিধানে হোম নিষ্পন্ন করা হয়। দেবগণ জীবলোকের সৃষ্টি, পালন ও সংরক্ষণে বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাঁহাদের ঋণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গীতা বলেন—

'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুংক্তে স্তেন এব সঃ'—৩. ১২

---

১৮ তৈত্তিরীয় সং° ৬. ৩. ১০. ৫। 'ঋণমস্মিন্ সন্নয়তি'—ঐত° ব্রা. ৭ প° দ্র°।

১৯ আপস্তম্ব ধ. সূ. ২. ১৩. ১১; এবং ২. ১১. ১২ দ্র°।

অর্থাৎ 'তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদির অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণ তাঁহাদিগকে উৎসর্গ না করিয়া যে অন্ন ভোজন করে সে চৌর্যাপরাধী'। দেবযজ্ঞে দেব ও মনুষ্যলোকের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধিত হয়।[২০] গীতার বাণী তাহাই প্রকাশ করে—

'দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥'—৩. ১১

মনুষ্যের নিম্নতর স্তরে ইতর প্রাণিগণ। কিন্তু সকলের মধ্যে জীবসত্তা ক্রিয়া করিতেছে। 'স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ' (প্রশ্ন উ° ১. ৭)। সকলের সঙ্গেই আমাদের ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেখানেই প্রাণসত্তা ও যেখানেই ভোজ্য ও পেয় বস্তুর ক্ষুধা তাহার তৃপ্তি বিধান করাই মনুষ্যের ধর্ম। উহাই প্রাণাগ্নিতে আহুতি সমর্পণ (ছান্দোগ্য ৫. ২৪. ৫. দ্র°)। যেহেতু দানেই মনুষ্য জীবনের কৃতকৃত্যতা। প্রাণসেবাই ভূতযজ্ঞের চরম কথা।

মনুষ্যমাত্রেই আমাদের অতি আপনার জন। গৃহীর গৃহ কেবল তাহার নিজের উপভোগের স্থল নহে। যে কেহই সেখানে আসুক না কেন তাহাকেই অন্নপানীয় ও আশ্রয় দানে সেবা করিতে হইবে। শুধু তাই নয়—অতিথি সেবায় বিশ্বদেবের সেবা করা হয়। কারণ সমাজ ও বিশ্বের সহিত মনুষ্যের যে-আত্মীয়তার পরম সম্পর্ক রহিয়াছে সেই বিশ্বাত্মতার প্রতীক রূপে অতিথি সেবা করিতে পারিলেই সেবার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—'সর্বদেবময়োঽতিথিঃ'। ইহজন্ম এবং পূর্ব পূর্ব জন্মের পরম্পরা সম্বন্ধে নিখিল বিশ্বের সহিত কোন না কোন যোগসূত্র বা আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের আছে। সেই আত্মীয়তার উপলব্ধি হয় বলিয়াই গৃহীর অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ ও মহাযজ্ঞে ব্রহ্মভাব লাভ হয়। মনু স্পষ্টই বলেন—

'মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ'—২. ২৮

আত্মীয় জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে বাস্তবিকই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন হয়, আত্মপর ভেদ অবলুপ্ত হইয়া যায়—তখন 'একের' উপলব্ধি সমগ্র অনুভূতি ছাপিয়া উঠে।[২১]

গৃহস্থাশ্রমে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ও অন্যান্য বর্ণানুগ কর্তব্য পালন করিয়া যে চিত্তশুদ্ধির অভ্যাস হয় তাহার ফলে জীবনের গতি নিবৃত্তিমুখী হয়। এবং তাহার পর বাস্তবিক যখন ইন্দ্রিয় বা কর্মশক্তি শিথিল হইবার উপক্রম হয় তখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ত্যাগব্রতে তপঃক্লিষ্ট জীবন যাপন করিবার ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে। মনুর বিধান—

---

২০ 'অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥' (গীতা. ৩. ১৪)

২১ যজ্ঞের তত্ত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা' দ্র°। শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রীর 'Philosophy of the Panca Yajnas' (Calcutta Review, Nov. 1937) দ্র°।

'এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিবিধং স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেত্তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্য চৈবাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥' (৬. ১-২)

বানপ্রস্থাশ্রমী সাধারণতঃ অরণ্যজাত ফলমূলে যথাশক্তি পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। নিয়ত বেদাধ্যয়নে রত থাকিয়া সংযতচিত্ত হইয়া কৃচ্ছ্রাদি তপশ্চর্যায় নিযুক্ত থাকিবে। প্রকৃত জিতেন্দ্রিয়তার অনুশীলনে শীতাতপ বা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসহনশীল হইবে। মনুর বচনে উল্লেখ আছে—

'স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ॥' (৬. ৮)

বানপ্রস্থ ধর্মাভ্যাসের যে বিবরণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে হয় সর্ববিধ ত্যাগ-সাধনাই এই আশ্রমের প্রধান আচরণ। লেশমাত্র বাসনা বা আসক্তি থাকিলে আত্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। অতএব কর্মচক্র বা সংস্কার পাশ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আত্মদর্শন যে একমাত্র পথ তদুপযোগী সাধনা প্রয়োজন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে পরবর্তী সন্ন্যাসাশ্রমের সহিত বানপ্রস্থাশ্রমের অতি নিবিড়তম সম্বন্ধ আছে। বানপ্রস্থ আশ্রমে শম, দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ সংযম অভ্যাসে যে যোগ্যতা অর্জন করা হয় তাহাকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গে অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান অধিগত হয়।

বানপ্রস্থাশ্রমে এইরূপ দুশ্চর তপঃ ও কৃচ্ছ্রাদিবহুল জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থ ভাগে সর্বাসক্তিশূন্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। 'শঙ্খলিখিত' সূত্রে উক্ত হয়—

'বনবাসাদূর্ধ্বং শান্তস্য পরিণতবয়সঃ কামতঃ পরিব্রজনমগ্নিমাত্মন্যারোপ্য' ২২

সন্ন্যাসাশ্রমে আত্মাতে অগ্ন্যাধান করিয়া অর্থাৎ সকল কর্তব্য অন্তর্মুখী করিয়া মৌনব্রত অবলম্বনে নির্বিকার ও স্থিরমতি হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া কাল কাটাইতে হয়। তৎকালে জীবন বা মরণ—কোন কিছুই কামনা থাকিবে না (মনু. ৬. ৪৫ দ্র°)।

'অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥' (মনু ৬. ৪৯.)

অর্থাৎ—'সর্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে; কোন বিষয়ের (আমিষ অর্থে বিষয়—কুল্লুক টীকা দ্র°) অপেক্ষা রাখিবে না। সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ থাকিয়া কেবল আত্মসহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করিবে।' পরমহংস যতি ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া মোক্ষপদ লাভ করে। সংসারচক্রের দুঃখময় আবর্তন হইতে যদি পরমনিঃশ্রেয়স মোক্ষ লাভের উপায় আশ্রমধর্মে না থাকে তাহা হইলে ইহার চরম সার্থকতা কোথায়? তাই সর্বশেষ সন্ন্যাস আশ্রমে জীবনের সেই পরম প্রয়োজন নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মলাভের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে।

২২ 'কাণে' সম্পাদিত 'শঙ্খলিখিত ধ. সূ.' ১৬১ সূত্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

ভারতী পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ আর্টস্ কলেজ

(বাংলা বিভাগ)

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল.

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের, নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের, মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রপ্রমুখ কবিগণের এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অমর অবদান বঙ্গভাষাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। সর্বোপরি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অতুলনীয় লেখনীর সাহায্যে এই ভাষাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাষাকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী কবিতে হইলে বাংলায় জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দার্শনিক গ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, শিল্প-গ্রন্থ, কৃষ্টিগ্রন্থ প্রভৃতি বাংলা ভাষায় বিরল। সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি ভাষায় আর্যসংস্কৃতি ও কৃষ্টির যে সব অত্যুজ্জ্বল রত্ন আছে সেগুলি বাংলাভাষায় অনুবাদ করা ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বৃহৎ কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে একদল উৎসাহশীল ও শিক্ষিত ছাত্র তৈয়ারী করা একান্ত প্রয়োজন। যে সব দার্শনিক ছাত্র, বৈজ্ঞানিক ছাত্র বাংলা ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগী তাঁহাদিগকে এই কার্যে প্রেরণা দিতে হইবে ও বাংলাভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইতে হইবে। ইহার জন্য পরিভাষা সংকলন করিতেও হইবে।

এই সব বিষয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনার জন্য কিছুদিন পূর্বে ভারতী মহাবিদ্যালয়ের কার্যালয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও পণ্ডিত 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিক ইহাতে যোগদান করেন।

এই সভায় ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ইহার সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল মহাশয় কর্তৃক বিবৃত হয়। এই ভারতী মহাবিদ্যালয়কে প্রাচীন গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ও পরবর্তী যুগের তক্ষশিলা, নালন্দাপ্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে, বর্তমান ভারতের ও বাংলার অন্যতম আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইলে সর্বাগ্রে যে বাংলাভাষার সম্যক্ অনুশীলন ও এই ভাষায় বহুপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন একান্ত আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করেন। তদনুযায়ী এই সভায় ইহা গৃহীত হয় যে, শীঘ্রই এই মহাবিদ্যালয়ের একটি 'বাংলা ভাষা ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য' বিভাগ আরম্ভ করা হউক। যে সব ছাত্র বা ছাত্রী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ও বাংলাসাহিত্যের অনুশীলন ও এই ভাষায় উপরিলিখিত গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা

করেন, তাঁহারা এই বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীরূপে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন।

এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য গত ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ (ইং ১৫ই আগষ্ট) শুভ জন্মাষ্টমী দিবসে 'বিচিত্রা'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই বিভাগের শুভ উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বল, ডক্টর বটকৃষ্ণ ঘোষ, পণ্ডিত অমরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা ভাষায় এম্. এ পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থিনীদের শিক্ষা দেওয়া এই বিভাগের গৌণ উদ্দেশ্যমাত্র, পরন্তু বাংলাভাষাকে শিক্ষণীয় সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ করা ও বাংলা ভাষার ও দেশের একনিষ্ঠ সেবক তৈযারী করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বাংলা বিভাগ বা যে সব শিক্ষায়তন এই বিষয়ে সচেষ্ট আছেন তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করাও উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু তাহাদের সহিত একান্ত সহযোগিতাই ইহার কাম্য। আশা করা যায়, তাঁহাদের কর্তৃপক্ষও এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করিবার জন্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন।

কেবল বি. এ. উপাধিযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে এই বিভাগে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইতেছে না; যাঁহারা এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাঁহারাও যাহাতে ইহার অন্তর্গত থাকিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন তাহাও বাঞ্ছনীয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগের তদনুযায়ী পাঠ্য-তালিকা নির্দিষ্ট থাকিবে ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা থাকিবে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য গবেষণাকারীদিগকেও তাঁহাদের গবেষণামূলক গ্রন্থ পরীক্ষা-বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হইলে উপযুক্ত উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হইবে। বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ দ্বারা এই পরীক্ষাবোর্ড গঠিত হইবে।

ইহাই সংক্ষেপে এই বিভাগের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি।

নিম্নে ছাত্র-ছাত্রীদিগের ও গবেষণাকারী ও গবেষণাকারিণীদিগের অবগতির জন্য কয়েকটী নিয়ম, যাহা পূর্বোল্লিখিত প্রথম সভায় আলোচিত ও দ্বিতীয় সভায় গৃহীত হইয়াছে, উদ্ধৃত হইল :—

১। যাঁহারা এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরূপে ভর্তি হইবেন, তাঁহাদের মাসিক বেতন ৮৲ টাকা। ভর্তি ফি ৮৲ টাকা। সেসন ফি ৫৲।

২। তাঁহাদের প্রত্যেককেই ভারতী মহাবিদ্যালয়ের সভ্যরূপে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহার জন্য বাৎসরিক ১২৲ চাঁদা দিতে হইবে।

৩। ভারতী মহাবিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও নিয়মাবলী এই কলেজে প্রযোজ্য।

৪। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী নিযমিতভাবে বাংলায় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান- ইতিহাসাদি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিতে সচেষ্ট থাকিবেন। ঐ সব প্রবন্ধ শ্রীভারতী বা অন্যান্য বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। ইহার অন্তর্গত সভ্য ও গবেষকমণ্ডলী যাহাতে বাংলাভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান,

সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ও কলা, প্রত্নতত্ত্ব, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থ এবং আদর্শ পাঠ্য-পুস্তকাদি রচনা করিতে পারেন তজ্জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া কার্য করিতে পারিবেন। ঐ সব গ্রন্থ মনোনীত হইলে তাঁহারা যথোপযুক্ত উপাধি প্রাপ্ত হইবেন। ভারতী মহাবিদ্যালয় এই সব গ্রন্থ প্রকাশ করিবে ও স্বত্বভোগ করিবে।

৬। এই বিভাগের যে সব ছাত্র-ছাত্রী ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত অন্যান্য কলেজের ক্লাসে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকে তাহার জন্য পৃথক বেতন দিতে হইবে না।

৭। ইহার অন্তর্গত ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পান তাহার জন্য ভারতী মহাবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকিবেন।

৮। যাহাতে গবেষণাকারিগণ মাসিক কোন প্রকাব সাহায্য পান তাহার জন্য যথাসাধ্য শীঘ্রই চেষ্টা করা হইবে।

৯। এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সব ব্যক্তি এই বিভাগে গবেষকরূপে ভর্তি হইতে চান তাঁহাদিগকে কোন বেতন দিতে হইবে না, কিন্তু ভাবতী মহাবিদ্যালয়ের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।

আপাততঃ এই মহাবিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহ, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষা, শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী এখানে দুই বৎসব অধ্যয়ন করিয়া 'নন্-কলেজিয়েট' ছাত্র-ছাত্রী রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলায় এম্-এ পরীক্ষা দিতে পারিবেন। ভবিষ্যতে অন্য সকল বিভাগেরও ব্যবস্থা করা হইবে।

যাঁহারা দ্বিপ্রহরে কোনও স্কুল বা কলেজে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীরূপে নিযুক্ত আছেন এবং উচ্চতর ডিগ্রীলাভের বাসনাসত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়েব 'পোষ্ট-গ্রাজুযেট' শ্রেণীতে যোগ দিতে পারিতেছেন না, বিশেষ কবিয়া তাঁহাদের সুবিধাব প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইতেছে। ইহা ছাড়া অন্য চাকুরীজীবী অনেকেই উচ্চশিক্ষার বাসনা মনে মনে পোষণ কবিয়া থাকেন। ইঁহাদের সকলের কথা চিন্তা করিযাই সকাল সাডে ছযটা হইতে সাডে নযটা পর্যন্ত ক্লাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রত্যেক অধ্যাপকের ব্যক্তিগত সাহায্য পাইবেন এবং শিক্ষায়তনের পাঠাগারের সুবিধা ভোগ করিবেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—এখানে গবেষণা (রিসার্চ) কার্যেরও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি অধ্যাপনারও আয়োজন করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, কোনও প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মহা-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে, অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষার প্রবর্তনা দেওয়াই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্তমানে বাংলা বিভাগ লইয়াই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ ক্লাশ খোলা হইয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে অতি সহজেই 'প্রাইভেটে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ (বাংলা) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন, তাহার জন্য এই কলেজে মূলতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এর পাঠ্যতালিকাই অনুসৃত হইবে। তাহা ছাড়াও ভারতীয় আর্যসংস্কৃতিগত বহুপ্রকার

শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়িতে হইলে যেমন পালি, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, আসামী, সংস্কৃত প্রভৃতি পড়িতে হয়, এখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। তদ্ব্যতীত, এখানে গুরুমুখী, গুজরাতী ও মারাঠী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বর্তমান পরিকল্পনামতে ভারতী পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ আর্টস্ কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে এই মহাবিদ্যালয় হইতেও বিশেষ উপাধি দেওয়া হইবে, এবং এই উপাধি ভবিষ্যতে মহাবিদ্যালয়ের উন্নতির দিনে কর্মপ্রার্থিদের বিশেষ যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হইবে। অবশ্য এই প্রকার উপাধির জন্য এই বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট অতিরিক্ত পাঠ্য ও পরীক্ষা সমাপন করিতে হইবে।

প্রতিদিন সকাল ৬-৩০টা হইতে বেলা ৯-৩০ পর্যন্ত এই ক্লাশ বসিবে। যাঁহারা দ্বিপ্রহরে কোনও স্থানে কার্যে নিযুক্ত আছেন, অথচ ক্লাশের অভাবে এম্-এ পরীক্ষা দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইবে মনে করিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইল।

মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত অন্যান্য বিদ্যালয়ে যোগ দিবার অধিকারও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের থাকিবে। যাঁহারা দ্বিপ্রহরে অন্য কোনও কলেজে পড়িতেছেন তাঁহাদেরও এই বিদ্যালয়ে পড়িবার অধিকার থাকিবে।

যাঁহারা বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসাদি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তত্তৎ বিষয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। নিম্নপ্রাথমিক, মধ্য ইংরেজী, এবং উচ্চ ইংরেজী ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্যসংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর ভিত্তি করিয়া বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক রচনাও এই মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই কলেজের গবেষণাকারিগণ এই কার্যেও সহযোগিতা করিতে পারিবেন এবং এই কার্যের জন্য তাঁহারা পারিশ্রমিকও প্রাপ্ত হইবেন।

কিভাবে এই প্রকার গ্রন্থপ্রণয়ন হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইতেছে। প্রত্যেক বিষয়ের পুস্তক ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। যেমন বিজ্ঞানের অন্তর্গত পদার্থ বিদ্যা। ইহার ১ম খণ্ডে সহজ ও সরল ভাষায় মূলতত্ত্বগুলি লিপিবদ্ধ থাকিবে ও ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী হইবে। ইহার ২য় খণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করিয়া রচিত হইবে ও ৩য় খণ্ড কলেজের (বি. এ. পর্যন্ত) ছাত্রছাত্রীদের এবং সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিয়া রচিত হইবে। অন্যান্য বিষয়ক পুস্তকও এইভাবে রচিত হইবে।

ইংরেজী ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় বহু প্রকার কোষগ্রন্থ আছে—যেমন সমাজবিজ্ঞান কোষগ্রন্থ (Encyclopædia of Social Sciences), ধর্মবিজ্ঞান কোষ গ্রন্থ (Encyclopædia of Religion and Ethics) ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাভাষায় এই প্রকার কোষগ্রন্থ নাই। যাহাতে এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ এবংপ্রকার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ভবিষ্যতে উপার্জনের ব্যবস্থা ও মাতৃভাষার সেবা করিতে পারেন তাহার জন্যও তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

বাংলা বিভাগের ছাত্র ও গবেষকদিগের জন্য যে প্রকার শিক্ষা ও কর্ম প্রণালীর ব্যবস্থা করা হইতেছে, ভবিষ্যতে যখন হিন্দী বা অন্যান্য বিভাগের কার্য আরম্ভ হইবে তাহাদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। বিশেষ করিয়া হিন্দী ভাষাতেও যে এই প্রকার পুস্তক ও কোষগ্রন্থাদির একান্ত প্রয়োজন তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

(২)

প্রাচীন ভারতে আর্থিক জীবন

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি. এ.

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে চারিটি প্রধান বিবর্তন (evolution) আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। এই বিবর্তনের মূলে তখনকার ধীশক্তিসম্পন্ন ও সুচিন্ত্য নৃপতিগণের প্রভাব বিশেষভাবেই লক্ষীভূত হয়। কিন্তু এই সঙ্গে মানবসমাজের স্বাভাবিক গতি এবং যুগোচিত শিক্ষাও যে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে, সে বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।

বৈদিক যুগেই মানবসমাজ স্বীয় জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অর্থনীতির দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে। ব্যক্তিগত পরিবার ও পরিজনদিগের সামাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্বও তাঁহারা গ্রহণ করেন। ইহার ফলে প্রথমতঃ পল্লীগ্রামের সুন্দর ইতিহাস আমাদের গোচরীভূত হইয়া থাকে। মানুষ দলে দলে পল্লীবাস আরম্ভ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার জন্য সহজলভ্য ভূমির দিকে লক্ষ্যপাত করে। ভূমির উপর মানুষের পৃথক. এবং ব্যক্তিগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু চারণ ভূমিগুলি তখনও সর্ব সাধারণের কর্তৃত্বেই থাকিয়া যায়। ভূমির উপর কোন সাম্প্রদায়িক অধিকার, ভূমি-বিক্রয় বা দান সম্পর্কে কোন বিধি নিষেধ তখনও ছিল না বলিলেই চলে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে সর্বপ্রথম কলাশিল্পের প্রচলন হয় এবং এতৎ সঙ্গে শিল্পব্যবসায়ীদিগের "সম্মেলন" রীতিরও প্রচলন আরম্ভ হইতে থাকে। কিন্তু কৃষিকার্যই ছিল সমাজের একমাত্র অবলম্বন, এবং এই নিমিত্তই মানুষ ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে স্ব স্ব ভূমিকর্ষণ রীতির অবলম্বন করে। সমাজের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত সহজ ও সরল ছিল। অর্থের অপ্রচুর আমদানী এবং অভাব মানুষকে সমান জীবনযাত্রার যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু এই সময়ই একটা নূতন পরিবর্তন সমাজে দেখা দেয়। ভূমির অধিকার সম্পর্কে নূতন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়, ফলে সমাজের এক শ্রেণীর লোককে ভূম্যধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ভূমিতে কর্ম করতঃ জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময় হইতেই স্বাধীন শ্রমজীবীর প্রথা চলিতে থাকে।

বৈদিক যুগের শেষভাগ হইতে চতুর্থ খ্রীস্টপূর্বাব্দের প্রথম ভাগে মগধ সাম্রাজ্যের পূর্বকাল পর্যন্ত ভারতে সামাজিক অর্থনৈতিক বিবর্তন চলিতে থাকে। এই সময়ে নাগরিক জীবনের সূত্রপাত হয়; লোক-সম্মুখে সহরের নিরপত্তার ছবি স্পষ্ট হইয়া উঠে। অচিরেই সহরগুলি শ্রম ও ধন-কেন্দ্রে পরিণত হয়। পল্লীবাসী জনসমাজেও ইহার সাড়া পড়িয়া যায়, ফলে দ্রুত সহরের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কলাশিল্পের বিশেষ উন্নতি নূতনভাবে পরিচালিত হইতে থাকে; "ব্যবসায়ী সম্মেলন" (guild) সহরের ব্যবসায়কে সুশৃঙ্খলভাবে

পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে; ফলে ইহা দেশের অর্থনৈতিক সমাজে একটি বিশেষ শক্তি লাভ করে। বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে, এবং সামুদ্রিক ব্যবসায় দ্বারা ভারতে প্রচুর ধনাগম হইতে থাকে; আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীরা নিজেদের মধ্যে সমিতি (union) গঠন করিয়া নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্য-যুগে আর্থিক সমাজে একটা তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মৌর্য বংশের পূর্বে ভারতে কখনও এত সুদৃঢ় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; মৌর্য নৃপতিগণ স্বীয় বাহুবলে ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন; এবং রাজ্যের সমুদয় বিষয়েই তাঁহারা বিশেষ উৎসাহের সহিত হস্তক্ষেপ করেন; ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে এই সময় একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতের সমুদয় খণ্ড রাজ্য প্রবল নৃপতিগণের প্রভাবে একত্রিত হওয়ায় সারা ভারতের আর্থিক শক্তি তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়। নিখিল ভারতের বন, উপবন, মাঠ, নদী, খাল, খনি প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকারে আসে। এই ভাবে অর্থাগমের উপায়গুলি তাঁহাদের অধিকৃত হওয়ায় মৌর্য নৃপগণ নূতন নূতন গ্রাম, কৃষিকেন্দ্র প্রভৃতি দেশের বিভিন্নাংশে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে অর্থনীতি নূতন শক্তিলাভ করে, এবং সর্বসাধারণও ঐ শক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এই সময় হইতে সাধারণের আর্থিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাজা স্বয়ং "হস্তক্ষেপ" (intervention) করেন এবং উৎকৃষ্ট পন্থার নির্দেশ দেন। রাজকর্মচারিগণ 'ব্যবসায়ী সম্মেলনে'র অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন; তাহা ছাড়া রাজার মহাজনী ব্যবসায় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করেন। লবণ শিল্প প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের হস্তে লইয়া যাওয়া হয়, এবং অন্যান্য অনেক বস্তু সম্পর্কেও তাহাদিগকে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু এই সময় কৃষি ও শিল্প কার্যের উন্নতি; বৈদেশিক বাণিজ্যের উৎকর্ষ, দেশীয় শ্রমিকদের সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারে রাজশক্তি হইতে যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার জন্যও এই সময় মৌর্য সম্রাট্‌গণ সচেষ্ট ছিলেন। ফলে এইকালে এমন সুন্দর ও স্পষ্ট অর্থ নৈতিক উন্নতি দেখা দেয় যে ইহার প্রভাব সুদূর ভবিষ্যতেও ভারতের বুকে প্রতিফলিত হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আমরা অর্থনৈতিক বিষয়ে শেষ বিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে ভারতে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য আত্মশক্তি বিস্তার করে; ফলে পূর্ব প্রচলিত আর্থিক নিয়মাদির সমূল পরিবর্তন ঘটে। এই সময় গ্রীস্ ও রোম দেশের সঙ্গে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে; ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই কারণেই ভারতের আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গেও এই সময় স্থল বাণিজ্য প্রচলিত হয়। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ইহা বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে; তারপর মুসলমান প্রভাবে নূতনভাবে পরিবর্তন শুরু হয়। ব্যবসায়ী সম্মেলন (guild) আবার পূর্বশক্তি লাভ করে। হস্তক্ষেপ নীতির প্রচলন রহিত

হইয়া যায়। পূর্ব ভারতীয় উপনিবেশগুলি এই সময় আর্থিক পদ্ধতিতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করে; ভারতও ঐ অর্থের অংশ লাভ করিয়া যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। মুসলমান ভ্রমণকারীদের ইতিবৃত্ত হইতে তখনকার ভারতের ধন ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে সবিশেষ সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায়। গজনীর সুলতান ও সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বিবরণ পাঠে বর্তমান ভারত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়। অন্যান্য মুসলমান আক্রমণকারীগণ সময় সময় ভারতবর্ষ হইতে আশাতীত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

এই সমস্ত বিবরণ হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হই।

---

(৩)

"কোটীবর্ষ"—প্রাচীন নিদর্শন

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি. এল্.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকদলের খনন কার্যের ফলে প্রাচীন 'কোটীবর্ষ' নগরে (বর্তমান দিনাজপুর জেলার বনগড়ে) অনেক নূতন ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত খননকার্যের ফলে বিভিন্ন স্তরের ইষ্টকনির্মিত ইমারতাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমানে খননকার্যের দ্বারা চতুর্থস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং পঞ্চমস্তরে খনন কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এই পঞ্চমস্তরে একটী কাঁচা কূপের আবিষ্কার হইয়াছে। এই কূপটী প্রাচীন বনগড়ের অধিবাসিগণ কর্তৃক খনিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমান বৎসরে এই কূপের উপরিস্থ অর্ধবৃত্তাকৃতি প্রান্তভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায় যে প্রাচীন ভারতে পয়ঃপ্রণালীপ্রথা কিরূপ ছিল এবং তখনকার দিনে যে এদেশবাসিগণ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন তাহারও অনেকটা ধারণা করা যায়। এই খননকার্যের দ্বারা তখনকার যুগের কয়েকটী বসতবাটী, বাটীর প্রাঙ্গনের চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ও ১৬টী ছোট ছোট স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্তিকানির্মিত "টরপেডোর" মত অনেকগুলি বস্তু পাওয়া গিয়াছে। এই জিনিষগুলি শুঙ্গযুগের জিনিস বলিয়া অনুমিত হয়। একটী সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক মৃত্তিকা নির্মিত জিনিস পাওয়া গিয়াছে, তাহা একটী সুন্দর রমণীমূর্তি। এই মূর্তির বামহাতে একটী পক্ষী এবং বাম পদের নিকট একটী হরিণ ও দক্ষিণ পদের নিকট একটী রাজহংস। স্ত্রীলোকের মূর্তি নির্মাণের প্রাক্ খ্রীষ্টান যুগের দুইটী মৃত্তিকানির্মিত ছাঁচ ও কতকগুলি মৃত্তিকানির্মিত নরমূর্তি ও জীবজন্তুর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বিভিন্ন আকারের প্রস্তরনির্মিত কতকগুলি মালা, কতকগুলি মাটীর বাসন, নানা কারুকার্যবিশিষ্ট কতকগুলি স্বর্ণ অলঙ্কার এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি মাটীর সীল মোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর উৎকীর্ণ লিপি হইতে উহারা বিভিন্ন যুগের বলিয়া অনুমিত হয়। কতকগুলি এত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় যে তাহারা বোধ হয় খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কার হইবে। আবার কতকগুলি আছে তাহারা পালবংশীয় নৃপতিগণের সময়কার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট্ বিভাগের ছাত্রগণ ও গবেষকমণ্ডলী কর্তৃক এই খননকার্য আরম্ভ হয়। এই দলের নেতৃত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই গবেষণাকার্যের সুবিধার জন্য এইরূপ খননকার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

(৪)

দেবী দুর্গা

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম. এ., বি. এল.

আগামী ১০ই আশ্বিন হইতে ১৩ই আশ্বিন পর্যন্ত আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার পূজা। এই মহাপূজার বিধি, ইতিহাস ও মূর্তিতত্ত্বাদি গত বৎসরের শ্রীভারতীতে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে এবং তৎপূর্বেও দেবী দুর্গা সম্বন্ধে অনেক তথ্য শ্রীভারতীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেজন্য উহাদের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা মূর্তিপূজা বিষয়ে ২।১টি কথার অবতারণা মাত্র করিব।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইহা একটী ভ্রান্ত ধারণা যে হিন্দুরা মূর্তি-পূজক সুতরাং পৌত্তলিক। তাঁহারা জানেন না যে হিন্দুরা কোন মূর্তিকে পূজা করে না। প্রত্যেক দেব-দেবীর ধ্যানমন্ত্রে সেই সেই দেবতা যে যে বিশেষ গুণের দ্যোতক তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। ঐ সব ধ্যানমন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া প্রত্যেক দেবতার মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী যথাসাধ্যরূপে মূর্তি নির্মিত হইয়া থাকে। তারপর এই সব মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পূজার মন্ত্রগুলি বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে মূর্তিকে পূজা করা হইতেছে না—মূর্তিতে আরোপিত যে দেবতা তাঁহাকে পূজা করা হইতেছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা মূর্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। সেই বিরাট পুরুষকে সীমাবদ্ধ মনের বা বুদ্ধির সাহায্যে ধারণা করাও অসম্ভব। সেজন্য প্রতীক উপাসনা বা প্রতিমা-উপাসনার আবশ্যকতা আছে। এই যে প্রতিমা বা মূর্তি ইহা সেই পরমপুরুষেরই প্রতীক। তিনি অনন্ত কল্যাণগুণ

বিশিষ্ট। তাঁহারই বিশেষ গুণের একত্র সন্নিবেশ হইতেই বিভিন্ন দেবতার ধ্যান ও উপাসনার উৎপত্তি। প্রশ্ন হইতে পারে এই প্রকার ধ্যান বা উপাসনা মানব-মনেরই কল্পনা হইতে প্রসুত ত? তাহা নিশ্চিত, কিন্তু তাহা সাধারণ মানব-মন প্রসূত নহে; অতিমানব ঋষিরা তাঁহাদের ধ্যানের বা উপাসনার উচ্চস্তরে পরমপুরুষের যে জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করিয়াছেন তাহাই ধ্যান-মন্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইরূপ তাঁহাদের কষ্ট কল্পনা নহে; তাঁহাদের মহাধ্যানের মধ্যে স্বতঃ উদ্ভাসিত। পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে যে অনন্ত পুরুষকে এইভাবে একটি মূর্তি বিশেষের মধ্যে আরোপ করিয়া পূজা করা কি তাঁহার অসীমতাকে খর্ব করা নহে? আদৌ নহে। বরং যদি বলা যায় যে ঈশ্বর নির্বিকার নিরাকার সুতরাং তাঁহাকে কোন বিশিষ্ট আকারযুক্ত মূর্তিতে পূজা করা যাইতে পারে না। তাহ হইলেই তাঁহার বিরাটত্বকে খর্ব করা হয়। তিনি সাকার, নিরাকার, তিনি সগুণ-নির্গুণ তিনি সমস্ত অথচ সমস্তের অতীত। এই ভাবেই তাঁহার ধারণা করা অন্ততঃ কিছুটা ধারণা করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটা সুন্দর দৃষ্টান্তে বর্ণনা করিয়াছেন—জলের কোন আকার নাই কিন্তু ইহা (ভক্তের ভক্তি হিমে) বরফের আকার ধারণ করিতে পারে। আর একটি কথা; বহু সাধক মহাপুরুষ এই প্রকার মূর্তি পূজার মধ্য দিয়াই সেই বিরাট পুরুষের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহার সত্বাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সব বিষয় বিচার দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না। বিচার বুদ্ধি প্রকৃত পন্থার নির্দেশ করিতে পারে মাত্র কিন্তু সেই ভূমার সন্ধান অনুভূতিসাপেক্ষ। ঋষি-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিলে সেই বিরাটকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। তবে যাঁহাদের মন খুব উচ্চস্তরে এবং কোন প্রতীক অবলম্বন না করিয়াই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুশীলন করিতে পারেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সেই প্রকার আদর্শ জ্ঞানমার্গী জগতে বিরল। তারপর প্রশ্ন উঠিতে পারে হিন্দু জনসাধারণ কি এই প্রকার জ্ঞান সাহায্যে ও এই দৃষ্টিতে মূর্তিপূজা করিতেছে? হাঁ। কোন লোকই বোধ হয় মাটি বা পাথরকে পূজা করিতেছে না; তাঁহাকে দেবতা বা ঈশ্বরের প্রতীক জ্ঞানেই পূজা করিতেছে। তবে এই জ্ঞান বা ধারণার তারতম্য থাকিতে পারে; কারণ সকলেই মন্ত্রের অর্থ সম্যক উপলব্ধি না করিতে পারে। আর সেজন্য তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বা হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতামূলক বলা একান্ত মূঢ়তা।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে এই প্রতীক উপাসনা সকল ধর্মেই আছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করা হইবে।

আমাদের কথা

আনন্দময়ী আদ্যাশক্তির আবির্ভাব উপলক্ষে বাংলার প্রতি জনপদ ও নিভৃত পল্লীগুলি আনন্দ মুখরিত হয়। প্রকৃতি দেবীও শরৎরাণীর নবসাজে সজ্জিতা হ'ন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় শারদীয়া প্রভাতের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বাংলা ভাষাসেবী প্রত্যেকেই বিদিত। কিন্তু কবি-প্রদত্ত বাংলার এই ছবি কি বর্তমান বাংলায় প্রযোজ্য? আজ বাঙালী অন্নবস্ত্রাভাবে শীর্ণ ও মলিন, বিবিধ ব্যাধিপ্রকোপে জীর্ণ আর তদুপরি দ্বেষ, হিংসা ও শিক্ষাভাবে শতধা বিচ্ছিন্ন। আমাদের মনে হয়, ভারতের অন্যান্য অধিকাংশ প্রদেশ অর্থ, স্বাস্থ্য ও একতায় বাংলা অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহার মূল কারণ কি? প্রকৃত শিক্ষাভাব, একতা ও দৃঢ় সংকল্পের অভাব ও পরিশ্রম-বিমুখতা। চাকুরী-জীবিকা দ্বারা দৈনন্দিন অভাব-বিমোচনে বাকী সময় গল্প ও আলস্যে যাপন করাই তাহাদের দৈনিক কার্যধারা।

বাঙালীকে অথবা ভারতবাসীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে হইলে জাতির সর্বনিম্ন স্তর হইতে এবং বাল্যাবস্থা হইতেই ইহাদের জীবনের ভিত্তি আদর্শ শিক্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর এই জাতিকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ইহা এক সুমহান্ আর্যজাতির বংশধর। ইহার কৃষ্টি, জ্ঞান, শৌর্য ও ঐশ্বর্য এক সময়ে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাহা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয় ও কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির আদর্শমাত্র হইয়াছে। যে জাতির অতীত উজ্জ্বল গরিমায় প্রভাযুক্ত, তাহার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বলতর হইতে পারে তাহা অবিসংবাদী সত্য।

*   *   *   *

জগজ্জননীর পূজার দিনগুলি ভারতের সকলেই আনন্দে অতিবাহিত করেন। দেশের বহুস্থানে সার্বজনীন পূজার অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু এই উৎসব ও আনন্দের মধ্য দিয়া যে কত প্রকার শিক্ষা ও দেশের কাজ হয় তাহা বোধ হয় সকলে জানেন না। এই উপলক্ষে প্রত্যহ পূজার ৩ দিন অপরাহ্নে পূজামণ্ডপে ধর্ম-সভার ব্যবস্থা করিয়া ধর্মের মূলতত্ত্ব ও আদর্শ সরলভাষায় সকলকে বুঝান যাইতে পারে; সন্ধ্যায় কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং পরে ছায়াচিত্রযোগে গ্রামবাসী ও জনসাধারণকে বহু শিক্ষনীয় বিষয় জানান হইতে পারে। স্বাস্থ্য-শিল্প-কৃষ্টি ও ধর্মমূলক প্রদর্শনীর দ্বারা জনসাধারণকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। পূজা উপলক্ষে সহরবাসী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি স্ব স্ব পল্লী গ্রামে যান। এই সময় যদি তাঁহারা গ্রামবাসীদের গ্রামোন্নতিমূলক কার্যপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ

দেন তাহা হইলে গঠনমূলক কত কার্য অনায়াসে সম্পন্ন হয়। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা পূজার ছুটী উপলক্ষে মাসাধিককাল স্ব স্ব গ্রামে ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারে ও গ্রামেরই কতিপয় কর্মীকে তৈয়ারী করিয়া যাহাতে এই সব কার্য তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে পারে।

যদি গঠনমূলক দেশসেবা করিবার আগ্রহ থাকে তাহা হইলে সমান্য ব্যয়েও সংঘবদ্ধ হইয়া এইরূপে অনেক কার্য করা যাইতে পারে।

* * * *

আদর্শ শিক্ষা মূলতঃ ৪টী বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—উদার ধর্মনীতি ও নৈতিক চরিত্র, বিবিধ বিস্থাদ্বারা যথার্থ জ্ঞানসঞ্চয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কৃষিকার্য প্রসার ও শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি ও দেশসেবক এ সব বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহাদের সেই সব আলোচনা ও চিন্তার ধারাকে কার্যে পরিণত করা যায়—অন্ততঃ আংশিকরূপেও, তাহার জন্য বর্তমানে প্রথমে দেশের বালক বালিকাদের মধ্যে আদর্শ শিক্ষা বিস্তারকল্পে সম্প্রতি ভারতী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি 'শ্রীভারতী'তে সংক্ষেপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ইহার কার্য কতটা অগ্রসর হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। এই সংখ্যার অন্যত্র ইহার অন্তর্গত **'ভারতী পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্ আর্টস্ কলেজ'** (বাংলা বিভাগ) এর কার্যপদ্ধতি প্রকাশিত হইল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা ও তজ্জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্তরূপে শিক্ষা দেওয়াই এই বিভাগের উদ্দেশ্য।

গত শুভ জন্মাষ্টমী দিবসের প্রাতঃকালে মাননীয় লর্ড সিংহ ইহার অন্তর্গত **"ভারতী সোসিয়্যাল সার্ভিস্ ট্রেনিং কলেজ"**এর (সমাজসেবা-শিক্ষা কলেজ) উদ্বোধন করিয়াছেন। 'বেঙ্গল সোসিয়্যাল সার্ভিস্ লীগ'এর (বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী) ১৬নং, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে বর্তমানে এই কলেজের অফিস, পুস্তকাগার ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহযোগিতার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এই কলেজের পাঠ্য-তালিকা ও নিয়মাবলী ইহার পুস্তিকার মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে যে এক সার্বজনীন ধর্ম তাঁহার গীতার মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তিই স্বীকার করেন। তাঁহার শুভ জন্মতিথি দিবসেই যাহাতে এই মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'ধর্মতত্ত্ব-শিক্ষা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা অনেক সভ্যেরই বাঞ্ছনীয় ছিল। সেজন্য ঐ দিবস অপরাহ্ণে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী মহোদয়া **"ভারতী থিওলজিক্যাল কলেজ"**-এর উদ্বোধন করেন। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্. এ., পি. এচ্. ডি: এই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং তিনিই এই কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত হ'ন। এই সভার পরেই ডক্টর বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে **"ভারতী কমার্শিয়্যাল কলেজ"**-এর (ভারতী ব্যবসায়-শিক্ষা কলেজ) উদ্বোধন হয়।

ঐ দিবসেই পূর্বাহ্নে ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারাণী সুচারু দেবী **"মহিলা শিল্প-বিদ্যালয়"**এর শুভ সূচনা করেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয় ভারতী মহাবিদ্যালয় ও হিন্দুমিশনের সম্মিলিত উদ্যোগে পরিচালিত হইবে।

বিভিন্ন পুস্তিকায় ইহাদের বিশদ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে ভারতী মহাবিদ্যালয় ইহার প্রতিষ্ঠার অল্পসময়ের মধ্যে ইহার কার্য বিস্তার করিতেছে। ভগবানের আশীর্বাদ, কতিপয় স্বার্থত্যাগী কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা এবং সাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাকে সম্বল করিয়া এই প্রতিষ্ঠান ইহার কার্যে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষাবিস্তার-কার্য ও দেশসেবার জন্য বহু ধনী ব্যক্তির প্রদত্ত অনেক দান আছে। মন্দির-সম্পত্তিও অনেক আছে। আশা করা যাইতেছে, এই সব সম্পত্তির বর্তমান কর্তৃপক্ষ এই সব কাজের জন্য তাঁহাদের সম্যক্ সহানুভূতি ও সাহায্য প্রদান করিবেন।

পুস্তক সমালোচনা

উপমা কালিদাসস্য—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., পি. আর. এস্ প্রণীত ও রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্ কর্তৃক ২১এ, রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (১৩৪৫) মূল্য ১।০ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা—৪ + ১২৫।

মহা-কবি কালিদাসের মহাকবিত্বের তৃতীয়-চতুর্থাংশ নির্ভর করে তাঁহার কাব্য-রাজির প্রত্যেক শ্লোকে, এক বা ততোধিক মনোহারিণী ও সার্থকভূতা উপমালঙ্কারের সংযোগে। সংস্কৃত সাহিত্যে যে কয়জন মহাকবি আছেন উপমালঙ্কারের দ্বারা কালিদাস যে শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় একটী সাধারণ সংস্কৃত শ্লোকে—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়গুণাঃ॥"

আলোচ্য পুস্তকে গ্রন্থকার উপমার ধারাগুলি সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া মহা-কবির কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কালিদাসের উপমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলি যাহা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় সেইগুলির সহজ ও প্রাঞ্জল বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক যেমন একদিকে মহাকবির দৃষ্টিনিপুণতার ও রচনা-পারিপাট্যের পরিচয় দিয়াছেন, অন্যদিকে আবার ইহা হইতে আমরা লেখকের সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের ও রসবোধের নিদর্শন পাই। মহাকবির উপমায় আনুপাতিক সম্বন্ধ, স্থিতিস্থাপকতা-গুণ, উপমার ঔচিত্যবিচার, উপমার বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব ও উপমায় বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের যোগ ইত্যাদি বিষয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা লেখক পুস্তকখানিকে পাঠকবর্গের নিকট বেশ মনোহর করিয়া তুলিয়াছেন। এ পুস্তকে লেখক কোনরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা করেন নাই। এ সম্বন্ধে লেখক তাঁহার ভূমিকায় বলিয়াছেন—"এ জাতীয় গ্রন্থে পাঠক হয়ত সাধারণতঃ একটী তুলনামূলক সমালোচনার আশা করেন; কিন্তু সে পন্থা অবলম্বন করিতে গিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, এ জাতীয় তুলনামূলক সমালোচনায় আলোচনাটি যেন একটী নিবিড় ঐক্যতানে জমাট বাঁধিয়া ওঠে না। তাই আমি তুলনামূলক সমালোচনার পদ্ধতি গ্রহণ করি নাই—আলোচনাকে আমি কালিদাসের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি।" লেখকের উপরিউক্ত কথাগুলি যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। উপমায় কালিদাস শ্রেষ্ঠ ইহা সর্ববাদিসম্মত। সেই কারণ অন্যান্য কবির রচনার সহিত কালিদাসের রচনার তুলনা না করিয়া লেখক যে কেবল মহাকবির প্রধান প্রধান শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের নিগূঢ়ার্থ ও উপমাগুলি-সংযোগের প্রকৃত তাৎপর্য কি তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে লেখকের বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

পুস্তকের প্রাঞ্জল ও সাবলীল রচনাভঙ্গী দেখিয়া বুঝা যায় ইহা একজন পাকা লেখকের লেখা। দুই একস্থলে যে ভাষাদুষ্টি ও ভুল দেখা যায় তাহাতে আমরা লেখককে বিশেষভাবে অপরাধী করিতে পারি না। তাহার জন্য প্রকাশক ও মুদ্রাকর অনেকাংশে দায়ী। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া পাঠকগণের মনস্তুষ্টি সাধন করিবে।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

মহাভারতমঙ্গল—তৃতীয় খণ্ড—শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ সাহা, বিদ্যাবিনোদ কৃত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৬। মূল্য—বার আনা।

আলোচ্য পুস্তকখানি পুরাণমঙ্গল সিরিজের ত্রয়োদশ সংখ্যা। পূর্ব পূর্ব সংখ্যাগুলির ন্যায় আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মহাভারত সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আছে জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞের বিবরণ। মহাভারতে ও পুরাণ সকলে একই নামে বিভিন্ন লোকের ইতিহাস সন্নিবদ্ধ হওয়ায় অনেক স্থলে অনেক বিসাদৃশ্যের সমাবেশ আছে, গ্রন্থকার পুরাণাদি হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সেই বিসাদৃশ্যগুলির সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে লেখকের পুরাণাদি গ্রন্থে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশিষ্টে রাম ও কৃষ্ণ আর্য, না অনার্য শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। লেখকের মতে ব্রহ্মার বাস মেরুপর্বতে এবং ঐটাই ভৌম স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষ। মেরু বর্তমান আলতাই পর্বত। সুতরাং, ব্রহ্মা মধ্য এশিয়ার লোক ও অভারতীয়। অথচ স্বায়ম্ভুব মনু এবং মৎস্য-বিষ্ণু কিন্তু এতদ্দেশীয়। স্বায়ম্ভুব মনু জম্বুদ্বীপের অধিপতি। জম্বুদ্বীপের কেন্দ্রভূমি খুব সম্ভব বর্তমান ভারতের কাশ্মীর প্রদেশ। জম্বু আজিও ঐ অঞ্চলের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। মৎস্য-বিষ্ণুর রাজধানীটী আবার দেখা যায় পাণ্ডুশিলা (মণিকূট পর্বত) এবং সেটা কামখ্যা প্রদেশ—ইত্যাদি বিষয়গুলি গবেষকগণের বহুল খোরাক যোগাইতে পারে। লেখকের মতে মহাভারতে যাঁহারা দেবতা ও অসুর, পরবর্তীযুগে তাঁহারাই আর্য ও অনার্য—এবিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পুস্তকগুলিতে মূল বিষয়বস্তুর তুলনায় এত অধিক ফুটনোট সংযোজিত হইয়াছে যে পাঠকের মন ফুটনোটের ভারে বিশেষ ভারাক্রান্ত হয় এবং বিষয়বস্তু হইতে পাঠক অনেক সময় 'খেই' হারাইয়া ফেলে। মোটের উপর লেখকের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, এ বিষয় আমরা ইহার পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

ধর্ম ও দর্শন

১। ধর্ম সাধনা—শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা সেন, বি. এ., বি. টি. কলিকাতা।

২। পরমাত্মসন্দর্ভ—পণ্ডিত শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ, কলিকাতা।

৩। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বাক্যবৃত্তি ও আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি—দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

৪। দাক্ষিণাত্য—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা।

৫। Old Persian Inscriptions of Achamenian Emperors. by **Dr. Sukumar Sen.** M. A. Ph. D; Calcutta.

৬। Early Career of Kanhoji Angria and other Papers—by **Dr. Surendranath Sen** M. A., Ph. D., B. Litt.

৭। Manual of Buddhist Historical Traditions,—by **Dr. Bimala Churn Law.** M.A., B.L., Ph. D.; Calcutta.

বাংলা সাহিত্য

৮। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

জ্যোতিষ

৯। Khandakhādyaka,—an Astronomical Treatise by **Brahmagupta,** edited by the Prabodh Chandra Sengupta, M. A.; Calcutta

বিবিধ

১০। Kamala Lectures—by Mr. Hirendranath Dutta, **M. A., B. L. P.R.S., Vidyaratna.**

———

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ, বি. এ., সংকলিত

সাহিত্য (১৩২৫)

বৈশাখ—সোমযাগ—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত বৈদিক 'সোম যাগ' কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত সে সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ। ইহা পরে গ্রন্থকারের "যজ্ঞ কথা" নামক গ্রন্থে অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ়—আর্য ও ইব্রীয় (Hebrew) জাতির বিবাহ—আজিমুদ্দিন আহাম্মদ—গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে প্রাচীন আর্যগণের বিবাহ পদ্ধতির সহিত প্রাচীন Hebrew জাতির বিবাহ পদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। উভয় জাতির বিবাহ সম্বন্ধীয় আচারের ঐক্য দর্শনে বিস্মিত হইতে হয়।

ভাদ্র—আর্য ও ইব্রীয় জাতির আচার ব্যবহার—কেশরক্ষা, সমাধি, দাহ, অক্ষক্রীড়া, পাদুকা ব্যবহার ইত্যাদি অনেক আচার ব্যবহারে আর্যগণ ও Hebrew জাতি একই-রূপ অনুষ্ঠান করিতেন। আচারে উভয়জাতির সাদৃশ্য প্রচুর। পরবর্তী কয়েকটী প্রবন্ধে উভয় জাতির কৃষিকার্যের প্রণালী এবং বেদে বর্ণিত জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার দ্বারা দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য ও Hebrew জাতি অনেকাংশে সমভাবাপন্ন ছিলেন। Aryan ও Semitic জাতির ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও এরূপ ভাবগত সৌসাদৃশ্য বাস্তবিকই কৌতূহলোদ্দীপক।

কার্ত্তিক—তন্ত্রের ইতিহাস—শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ—শ্রীমৎ পূর্ণানন্দগিরি প্রণীত "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' নামক তান্ত্রিকগ্রন্থের বিশেষ পরিচয়। গ্রন্থখানি ২৫ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহাতে তান্ত্রিক নানা বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ৬৭ খানি তন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা তন্ত্র-শাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁহারা ইহাতে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন।

পৌষ—বৈদিক সাহিত্যে নাটকের অভিব্যক্তি—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়—ঋগ্বেদীয় ১০ম মণ্ডলের 'উর্বশী ও পুরূরবার' উপাখ্যান, 'যম যমী' সংবাদ ইত্যাদি অনুবাদ করিয়া লেখক প্রমাণ করিয়াছেন যে অতি প্রাচীনকালেও নাটকের অস্তিত্ব ছিল।

মাঘ—ঋগ্বেদে আর্য ও অনার্য—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়—বৈদিক সুচিন্তিত প্রবন্ধ।

চৈত্র—রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেমের বিকাশ—শ্রীপ্রিয়লাল দাস—অতি উত্তম প্রবন্ধ। কবির বাল্যকাল হইতে "চিত্রা" লেখার সময় পর্যন্তের আলোচনা।

সাময়িক সাহিত্য—ভাদ্র, ১৩৪৮

ধর্ম ও দর্শন

প্রবর্তক · ব্রহ্মসূত্র—শ্রীমতিলাল রায়।
ব্রহ্মবিদ্যা—যুদ্ধ ও জাতীয় কর্ম—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, —শ্রীভগবতীর আবির্ভাব—অতীত ও অনাগত—শ্রীদুর্গাচৈতন্য ভারতী।
,, —জীবের ক্রমোন্মেষ—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।
,, —কালপরিমাণ—শ্রীবিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য।
,, —সর্বজনীন ধর্ম—শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—জ্ঞানদাসের কাব্য-প্রতিভা—শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ.।
,, —শেক্‌সপীয়ারের জন্মভূমিতে—শ্রীমতিলাল দাশ।
,, —রুশ-সাহিত্যের দুইজন—শ্রীপ্রভাত হালদার।
,, —দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতিবাসর—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
প্রবাসী—সংস্কৃত-সাহিত্যে নারীর দান—ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি-এইচ্‌.ডি (লণ্ডন)।
,, —রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।
,, —ছাপাখানার ভূতের সমস্যা—শ্রীবিজয়কুমার ভৌমিক।
,, —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—রাজা রামমোহন রায়ের তিব্বত গমন—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এ, পি-এচ্‌-ডি, বি-লিট্‌।
,, —আরব জাতীয়তার গোড়ার কথা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, —সেকালের ইংরেজ-সমাজ—শ্রীহরিহর শেঠ।
,, চলতি ইতিহাস—শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
প্রবাসী—লামার দেশ তিব্বত—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।
প্রবর্তক—সিংহলের গৌরবময় যুগের একটী অধ্যায়—শ্রীঅজিত ঘোষ।

প্রত্নতত্ত্ব

ভারতবর্ষ—বুদ্ধের জীবনকাহিনীর চিত্র—শ্রীগুরুদাস সরকার।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—প্রত্যাবর্তনের পথে—ডক্টর অক্ষয়কুমার ঘোষাল, এম্‌-এ, পি-এইচ্‌-ডি।
,, —কালাজ্বর ও তাহার প্রতিকারের ইতিহাস—আচার্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, —আধুনিক সভ্যতার নূতন আদর্শ—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এম্‌-এস্‌-সি।
প্রবাসী—বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের শ্রীনাথ মন্দিরে বাঙ্গালী সেবক—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।
,, —রাজপথ—শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ।
,, —ভারতের খনিজ সম্পদ—ক্রোমাইট—শ্রীকালীচরণ ঘোষ।
,, —ইংলণ্ডের দুইজন ভাস্কর—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর।
প্রবর্তক—হিন্দু-সংগঠন-সমস্যা—শ্রীনলিনীরঞ্জন ঘোষ এম্‌-এ, বি-এল।

সাময়িক সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদ—স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ্ উক্তপদ পরিত্যাগ করিবার পর ইহা কয়েক মাস খালি ছিল। সিনেট-সভা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, এম্. এ., পি-এইচ.ডি (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি (ক্যাণ্টাব), ডি. লিট (রোম) মহাশয়কে তিন বৎসরের জন্য উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। ডক্টর দাশগুপ্তের নূতন পদপ্রাপ্তির জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পদ—বাংলার গভর্ণর মহোদয় ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ পি-এইচ. ডি মহাশয়কে তাঁহার ষষ্টিতম বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে উক্ত পদে পুনর্নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

বাংলার লোকগণনার ফল—বাংলার লোকগণনার ফল প্রকাশিত হইয়াছে, বিস্তারিত ফল অবশ্য এখনও অজ্ঞাত। এই ফল দৃষ্টে জানা গেল যে বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৩১ সালে যাহা ছিল এই দশ বৎসর পরেও ঠিক তাহাই আছে, একটিও বাড়ে কমে নাই, অর্থাৎ সংখ্যানুপাত সেই ৫৪·৮ই রহিয়া গিয়াছে। দেশের জনসংখ্যা এবারে প্রায় এক কোটী বাড়িয়াছে, কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যানুপাত ঠিক পূর্বের মতই আছে, একটি বাড়িল না, কমিলও না; ইহা আশ্চর্যের বিষয়।

শোক সংবাদ

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজের মহাপ্রয়াণ—গত ১২ ভাদ্র (ইং ২৯শে আগষ্ট) অপরাহ্নে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাব হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বাংলা দেশের প্রধান জমিদার ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান্, সংস্কৃতিমান ও স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন। এক সময়ে তিনি বঙ্গের শাসন পরিষদের সদস্যের কাজ অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৯২৬ সালের ইম্পীরিয়্যাল কন্‌ফারেন্সে তিনি ভারতগবর্মেণ্টের প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল। বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং তাহার উদ্যোগেই বর্ধমানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। নিজের লেখা কয়েকটী বই ও কিছু গান আছে।

তিনি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

স্যর বিজয়চন্দ্রের মত নানাগুণের অধিকারী মানুষ আজকাল সত্যই দুর্লভ। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং প্রার্থনা করি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

পার্থিব অগ্নি। ইত্থাহিসোম ইন্মদ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা গৃৎসমদের মদ নামে খ্যাত।

ইন্দ্রোমদায় বাবৃধে এই ঋকে সাতটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী আভীকসংজ্ঞক। তৃতীয় ও চতুর্থটীর নাম আভীশব। শেষ তিনটীর নাম বার্হদ্গির।

ইন্দ্রতুভ্যমিদদ্রিব এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ইন্দ্রের স্বারাজ্য। অর্থাৎ স্বারাজ্যশব্দযুক্ত। প্রেহ্যভীহিধৃষ্ণুহি নতে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কশ্যপের ধৃষ্ণু অর্থাৎ ধৃষ্ণুপদযুক্ত। অথবা ইহার দেবতা যম।

যদ্দ্যীরত আজয় এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম মরুতের সবেশীয় অথবা ইহা সিন্ধু সাম।

অক্ষন্নমীমদন্ত হি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। উপোষু শৃণু হী গিরঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটীর দেবতা যম।

চন্দ্রমা অপ্স্বরন্তর এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটী তৃত নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। পরের দুইটী সৌপর্ণ অর্থাৎ সুপর্ণ পদযুক্ত।

প্রতিপ্রিয়তমংরথম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম লৌশ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ষোড়শখণ্ড

इन्द्रस्य सञ्जये द्वे स्रौते वा स्रौग्मते वा द्विहिङ्कारं वा वामदेव्यं द्वितीय मङ्गिरसाञ्चोत्सेधनिषेधौ सत्यश्रवसश्च वाय्यस्य साम पौशं च लौशं च यामं वाङ्गिरसाञ्चैव निषेधो गौरेराङ्गिरसस्य सामाम् होमुचो वा ॥ १७ ॥

আতে তে অগ্ন ইধীমহি এই ঋকে দুইটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অসুর দমনের হেতুভূত বলিয়া ইহারা ইন্দ্রের সঞ্জয় নামে খ্যাত। অথবা ইহাদের নাম স্রৌত বা স্রৌগ্মত। অথবা দ্বিতীয় সামটী দুইটী হিঙ্কার যুক্ত বলিয়া হিহিঙ্কার বাম দেব্য।

অগ্নিন্নস্ববৃক্তিভিঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা অঙ্গিরসার উৎসেধ নিষেধ নামে খ্যাত। মহে নো অদ্য বোধয় এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সত্যশ্রবানামক বায্য ঋষির সাম। ভদ্রন্নো অপি বাতয়ঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা পূষা। ক্রত্বা মহাং অনুষ্বধম্ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা উষা। সঘাতং বৃষণং রথম্ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম লৌশ বা যাম।

অগ্নিস্তম্নে যো বসুঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম অঙ্গিরসের

নিষেধ। নতমংহোহ্নুরিতম্। এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা গৌরি অঙ্গিরস কর্তৃক দৃষ্ট অথবা অংহোমুচ্ ঋষির সাম।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তদশ খণ্ড

इन्द्रस्य संक्रमे द्वे वसिष्ठस्य वा सौहविषाणि त्रीणि सर्वाणि वा सौहविषाणि बाकानि त्रीणि प्रजापतेर्धर्मविधर्माणि चत्वारि भागश्च वाजिनाश्च साम प्रजापतेर्हिकविकनिकानि त्रीणि विकनिकहिकानि वा निकविकहिकानि वाश्वे द्वे ऐटते वा वाजिनाश्चैव सामादित्यानां च पवित्रम् ॥ १८ ॥

পরিপ্রধন্ব এই ঋকে পাঁচটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটি ইন্দ্রের বা বসিষ্ঠের সংক্রম। পরের তিনটি সৌহবিষ। সুহবি অঙ্গিরারই নামান্তর। অথবা এই পাঁচটি সামই সৌহবিষ।

পর্যষুপ্রধন্ববাজসাতয়ে এই ঋকে সামত্রয়* উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটিই বাকনামে খ্যাত।

পবস্ব সোম মহান্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম নিধনে রহিয়াছে বলিয়া ইহারা প্রজাপতির ধর্ম নামে কথিত। পবস্ব সোম মহে দক্ষায় এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রজাপতির বিধর্ম নামে পরিচিত। ইহাদের প্রথম সামের নিধন বিধর্ম। এখানে ধর্ম ও বিধর্ম নিধনযুক্ত ঋগ্দ্বয়াশ্রিত চারিটি সাম রহিয়াছে।

ইন্দুঃ পবিষ্টঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ভাগ। ইহার নিধনে ভগায় শব্দ রহিয়াছে। অনুহিত্বা এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। বাজশব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম বাজি সাম।

কঈং ব্যক্তা নরঃ সনীডা এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রজাপতির হিকবিকও নিক সংজ্ঞক। অথবা বর্ণবিপর্যাসের দ্বারা ইহারা ক্রমে বিকনিকহিক অথবা নিকবিকহিক নামে খ্যাত।

অগ্নেত মদ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুইটী অশ্বশব্দযুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম আশ্ব। অথবা ইহারা ইটত নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

আবিমর্য্যা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বাজিসাম। পবস্ব সোম দ্যুম্নী সুধারঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা আদিত্যগণের পবিত্র নামে খ্যাত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের অষ্টাদশ খণ্ড

* ভাষ্যে সামদ্বয় আছে, বোধ হয় ছাপার ভুল।

इन्द्रस्याभरे द्वे वसिष्ठस्य वा वासुमन्दे द्वे कावषाणि त्रीणि प्रजापतेः श्लोकानुश्लोकानि चत्वारि वाचःसामनी द्वे मारुतञ्च माधुच्छन्दसं वा मारुतश्चौ वोद्वं शपुत्रश्च ॥ १९ ॥

বিশ্বতোদাবন্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্র বা বসিষ্ঠের আভর নামে খ্যাত।

এষ ব্রহ্মা য ঋত্বিয়ঃ এই ঋকে সামপঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বসুমন্দনামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। পরের তিনটী কবষ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

ব্রহ্মাণ ইন্দ্রং মহয়ন্তঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সামদ্বয়ের ক্রমে "শ্লোকতয়া ও শ্লোকাঃ" এই শব্দদ্বয় নিধনে রহিয়াছে। অনবস্তে রথমশ্বায় তক্ষুঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই সামের নিধনে "স্বরাতা" শব্দ রহিয়াছে। সম্পদং মঘং রয়ীষিণঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নিধনে "ওঈড" এই শব্দ রহিয়াছে। এই ঋক্-ত্রয়াশ্রিত চারিটী সাম প্রজাপতির শ্লোকানুশ্লোক নামে খ্যাত।

সদাগাবঃ শুচয়ো বিশ্বধায়সঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অনবস্তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্দ্বয়াশ্রিত সামদ্বয় বাচসংজ্ঞক। উরঃপ্রক্ষে মধুক্ষিযন্তঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মারুত সংজ্ঞক অথবা ইহা বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা কর্তৃক দৃষ্ট।

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কাঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মারুত সংজ্ঞক। প্রব ইন্দ্রায় বৃত্রহন্তমায় এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম উদ্বংশপুত্র।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ঊনবিংশ খণ্ড

धुरोः शम्ये द्वे प्रजापतेश्च गूर्द्दः कूर्द्दौ वा विश्वामित्रस्य चात्यर्द्दः प्रजापतेश्चैव गूर्द्दौ विश्वामित्रस्य चैवात्यर्द्दः प्रजापतेः सान्तनिके द्वे प्रजापतेर्धनधर्मणी द्वे उषसश्च साम भारद्वाजं चेन्द्रस्य च राति भारद्वाजश्चैवैषं चेन्द्रस्य वैराजे द्वे वसिष्ठस्य वा प्रजापतेर्वा विशां वा सामनी ॥ २० ॥

অচেত্যগ্নিশ্চিকিতিঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম "ধুরোঃ শম্যে"।

অগ্নে ত্বং নো অন্তমঃ এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটির নাম

প্রজাপতির গূর্দ অথবা গূর্দ সংজ্ঞক। দ্বিতীয়টীর নাম বিশ্বামিত্রের চাত্যর্দ। তৃতীয়টী প্রজাপতির গূর্দসংজ্ঞক। চতুর্থটীর নাম বিশ্বামিত্রের অত্যর্দ।

ভগো ন চিত্রঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রজাপতির সান্তনিক নামে নামে প্রসিদ্ধ।

বিশ্বস্য প্রস্তোভ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ধনাম্ ও ধর্মাম্ নিধনে রহিয়াছে বলিয়া ইহারা প্রজাপতির ধনধর্ম নামে প্রসিদ্ধ।

উষা অপ স্বসুষ্টমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা উষা। ইমামুকং ভুবনাসীষধেম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। বিক্রুতয়ো যথাপথঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। রাতিশব্দযুক্ত বলিয়া ইহা ইন্দ্রের রাতি নামে প্রসিদ্ধ। অযাবাজন্দেবহিতং স নেম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ঋষি ভরদ্বাজ। উর্জা মিত্রোবরুণঃ পিন্বতেড়াঃ এই ঋকে একটি সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইষ শব্দ যুক্ত বলিয়া ইহার নাম ঐষ।

ইন্দ্রোবিশ্বস্য রাজতি এই ঋকে দুইটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বৈরাজ। অথবা ইহারা বসিষ্ঠের বৈরাজ। অথবা ইহারা প্রজাপতির বৈরাজ বা বিশ্বের সাম যেহেতু বিশার্থবাচক বিশ্ব শব্দ এখানে বর্তমান রহিয়াছে।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের বিংশখণ্ড

প্রজাপতেশ্চ বাজজিদ্বৌশ্বাঙ্গিরস্য সামনী দ্বে প্রয়স্বচ্চ প্রাজাপত্যং মক্ষর্যঞ্চ রৈবঘ্নতুরশ্চৈবয়ামরুতশ্চ সাম ভরদ্বাজস্য বিষমানি ত্রীণীন্বকানি বা সৈন্ধুক্ষিতানি বা সবিতুশ্চ সাম ভারদ্বাজে দ্বে পারুচ্ছেপে বাগ্নের্বৈশ্বানরস্য রাক্ষোঘ্নে দ্বে বার্হস্পত্যে বা-বভৃথসাম বৈনয়োঃ পূর্বং প্রবর্গ্যসামোত্তর মৈষঞ্চ ॥ ২১ ॥

ত্রিকদ্রুকেষু মহিষো যরাশিরন্তবিশুষ্মম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রজাপতির বাজভৃৎ নামে প্রসিদ্ধ। অয়ংসহস্র ভানবোদৃশঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই সামদ্বয় অঙ্গিরার পুত্র গোনামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। এন্দ্রয়া হ্যপ নঃ পরাবতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রয়ঃশব্দযুক্ত বলিয়া ইহা প্রজাপতির প্রয়স্বৎ নামে খ্যাত। তমিন্দ্রং জোহবীমি মঘবানম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা রৈশব্দযুক্ত আক্ষর্য্য নামে পরিচিত। অস্ত শ্রৌষট্ পুরো অগ্নিন্ধিয়া দধে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম যজ্ঞতুর অর্থাৎ যজ্ঞের তরীতাগ্নিসম্বন্ধীয়। প্রবোমহেমতয়ো যন্ত বিষ্ণবে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা এবয়া মরুত নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

অয়া রুচা হরিণ্যা পুনানঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভরদ্বাজের বিষম নামে প্রসিদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয়ের অর্দ্ধর্চে ও তৃতীয়ের সমুদয়ে সাম রহিয়াছে বলিয়া ইহারা বিষম। অথবা ইহাদের নাম ইষক বা সৈন্ধুক্ষিত।

অভিত্যন্দেবং সবিতারমোণ্যোঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দেবতা সবিতা।

অগ্নিং হোতারং মন্যে দাস্বন্তম এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী ভরদ্বাজ অথবা পরুচ্ছেপ নামক ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট। অন্তিম দুটীর দেবতা বৈশ্বানর নামক অগ্নি, ইহারা রাক্ষোঘ্ন অর্থাৎ রক্ষের হননের নিমিত্তভূত। অথবা ইহাদের দেবতা বৃহস্পতি। অথবা ইহাদের প্রথমটী অবভৃথ সাম এবং দ্বিতীয়টী প্রবর্গ্য সাম।

তব তন্নর্য্যং নৃপোত ইন্দ্র এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এষশব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম ঐষ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের একবিংশখণ্ড।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণেয় চতুর্থ অধ্যায়।*

आजिगश्चाभीकश्च ऋषभश्च पावमान औक्ष्णोरन्ध्रो वाभीकश्चैव बाभ्रवे द्वे इन्द्राण्याः साम शैशवे द्वे प्रजापतेर्दोहादोहीये द्वे इन्द्राण्याश्चैव सामामहीयवश्चाजिगम् सुरूपे द्वे जमदग्नेः शिल्पे द्वे समृहितश्च वसिष्ठस्य च शकुलो जमदग्नेश्च गम्भीरम् समृहितश्चैव सोमसामनी चाशु च भार्गवं वैश्वदेवे द्वे इन्द्रसामनी द्वे यौक्ताश्वे द्वे भासश्च सोमसाम च प्राजापत्यश्च सोमसाम चैव भागश्चैव प्राजापत्यं चैवाद्यद्वैडं वा सोमसाम रैवतर्षभे द्वे पार्ष्ठौहे द्वे वैरूपश्चैव कुल्मल्बर्हिषं वा पार्ष्ठौहं वैदेषोद्धीयं चेन्द्रसाम च वैश्वदेवे द्वे आग्नेये द्वे वैश्वदेवं चैवाग्नेयश्चैव शैशवानि चत्वारि च्यावनानि चत्वारि प्राजापत्ये द्वे वैदन्वतानि चत्वारि रजे राङ्गिरसस्य पदस्तोभौ च वौर्णायवे द्वे ॥ २२ ॥

উচ্চাতে জাত মন্ধসঃ এই ঋকে ত্রয়োদশ সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী আজিগ অর্থাৎ যুদ্ধযুক্ত অর্থাৎ দ্বাদশাহ যজ্ঞের গমন সাধন। দ্বিতীয়টী আভীক অর্থাৎ অভিক্রম সাধন। তৃতীয়টী ঋষভ পাবমান। ঋষভ শব্দের অর্থ ঋষভের ন্যায় চেষ্টাযুক্ত। অথবা ইহার নাম উক্ষোরন্ধ্র অর্থাৎ ইহা উক্ষরন্ধ্র নামক ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্ট। চতুর্থ

---

* কোনও পুথিতে এখানে প্রপাঠকের অর্দ্ধ বা প্রপাঠকের শেষ বলিয়া উল্লিখিত নাই। সায়ণাচার্য্য এখানে 'ইতি.....মাধবীয়ে বেদার্থপ্রকাশে চতুর্থে আর্ষেয়াখ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ' এরূপ পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বেদাচার্য্য সামশ্রমী মহাশয়ের মতে ইহা সঙ্গতই হইয়াছে; যেহেতু এখানে ঐন্দ্র পর্ব্বের সমাপ্তি হইয়াছে।

সামের নাম আভীক। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সামের দ্রষ্টা কুৎস গোত্রীয় বভ্রু। সপ্তম সামের দেবতা ইন্দ্রাণী। অষ্টম ও নবম সাম শিশু অর্থাৎ আঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্ট। দশম ও একাদশ সাম প্রজাপতির দোহাদোহীর নামে প্রসিদ্ধ। এই সামদ্বয়ে দোহাদোহ শব্দ বর্ত্তমান। দ্বাদশ সামের দেবতা ইন্দ্রাণী এবং ত্রয়োদশ সাম আমহীয়ব নামে প্রসিদ্ধ।

স্বাদিষ্ঠয়া মাদিষ্ঠয়া এই ঋকে নয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী আজিগ নামক এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী সুরূপ সংজ্ঞক। চতুর্থ ও পঞ্চমটী জমদগ্নির শিল্প নামে প্রসিদ্ধ। ষষ্ঠটীর নাম সংহিতা এবং সপ্তমটী বশিষ্ঠের সুকুল নামে পরিচিত। অষ্টমটী জামদগ্নির গম্ভীর এবং নবমটী সংহিত নামে খ্যাত।

বৃষাপবস্ব ধারয় এই ঋকে নয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী সোম সাম। তৃতীয়টীর নাম আশু ভার্গব। চতুর্থ ও পঞ্চম সাম বৈশ্বদেব অর্থাৎ ইহাদের দেবতা বিশ্বদেব। ষষ্ঠ ও সপ্তম সামের দেবতা ইন্দ্র। অন্তিম দুইটী যুক্তাশ্ব নামক আঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

যস্তে মদো বরেণ্যম এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম সামের নাম ভাস অর্থাৎ প্রকাশক। দ্বিতীয়টী সোম সাম এবং তৃতীয়টী প্রাজাপত্য। চতুর্থটী সোমসাম। এবং পঞ্চমটী ভাস। ষষ্ঠ সাম প্রাজাপাত্য। অথবা ইহা অর্দ্ধেড়ং সোম সাম।

তিস্রো বাচ উদীরত এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বৈষ্টম্ভসংজ্ঞক। মধ্যম দুইটী যাষ্ঠৌহ। পঞ্চমী বৈষ্টম্ভ অথবা ক্ষুল্লক বৈষ্টম্ভ। ষষ্ঠটী যাষ্ঠৌহ অর্থাৎ ষষ্ঠবাড (আঙ্গিরস) কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

ইন্দ্রায়েন্দো মরুত্বতঃ এই ঋকে সামাষ্টক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী ইববৃধ শব্দযুক্ত বলিয়া ইযোবৃধীয়া দ্বিতীয় সামের দেবতা ইন্দ্র। তৃতীয় ও চতুর্থ সাম বৈশ্বদেব। পঞ্চম ও ষষ্ঠ আগ্নেয়, সপ্তম বৈশ্বদেব এবং অন্তিম অর্থাৎ অষ্টম আগ্নেয়।

অসাব্যংশুর্মাদায় এই ঋকে সামাষ্টক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম চারিটী শৈশব অর্থাৎ শিশু নামক আঙ্গিরস কর্ত্তৃক দৃষ্ট। অন্তিম চারিটী দধীচির পুত্র চ্যবন কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

পবস্ব দক্ষসাধনঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রাজাপত্য অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতাক।

পরিস্বানো গিরিষ্ঠা এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম চারিটী বৈদম্বত অর্থাৎ বিদন্বান্ (ভার্গব) কর্ত্তৃক দৃষ্ট। অন্তিম দুইটী প্রতি পদে স্তোভ রহিয়াছে বলিয়া পদস্তোভ নামে খ্যাত। ইহারা অঙ্গিরার পুত্র রজি কর্ত্তৃক দৃষ্ট।

পরিপ্রিয়া দিবঃ কবিঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা উর্ণায়ুনামক গন্ধর্ব সম্বন্ধীয় বলিয়া ঔর্ণায়ব নামে প্রসিদ্ধ।

ইতি আর্ষের ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাকের দ্বাবিংশখণ্ড

सौभरे द्वे सौश्रवे वेन्द्रस्य वृषकाणि त्रीणि देवानां वर्षीणां वार्षेयं प्रथमं बभ्रोः कौम्भास्य सामानि त्रीणि बभ्रोः कार्त्तवेशस्य त्रीणि साम्मदे द्वे ऐटते वा वसिष्ठस्य जनित्रे द्वे मरुतां प्रक्रीड़ा वा संक्रीड़ा वा निक्रीड़ा वा त्रय औशनम् ॥२३॥

প্রসোমাসো মদচ্যুতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে প্রসোমাসো বিপশ্চিতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্দ্বয়াশ্রিত দুটী সাম সৌভর বা সৌশ্রব।

পবস্বেন্দো বৃষাসুত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াচে। বৃষাহ্যসি ভানুনা এই ঋকে দুইটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্দ্বয়াশ্রিত তিনটী সাম ইন্দ্রের বৃষক নামে খ্যাত। অথবা ইহাদের মধ্যে প্রথম সাম দেবঋষিগণের আর্ষেয়।

ইন্দুঃ পবিষ্ট চেতনঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে ; ইহারা কুম্ভ্যপুত্র বভ্রু কর্তৃক দৃষ্ট। অসৃক্ষত প্রবাজিনঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের ঋষি কার্ত্তবেশ বভ্রু।

পবস্বদেব আয়ুষম এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে ইহাদের নাম শাম্মদ অথবা ঐটত। *।

পবমানো অজীজনৎ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বশিষ্ঠের জনিত্র অর্থাৎ জনিত্র শব্দযুক্ত।

পরিস্বানাস ইন্দবঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা মরুদ্গণের প্রক্রীড়া, সংক্রীড়া অথবা নিক্রীড়া সংজ্ঞক।

পরি প্রাসিষ্যদৎকবিঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ঔষণ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশখণ্ড

यामानि त्रीणि देवानां वर्षीणां वार्षेय मुत्तम मङ्क्तेश्च वैरूपस्य सामौशने द्वे देवानां वार्षीणां वार्षेयं पूर्वम् सोमसाम च कार्ष्णे द्वे वैश्वदेवे द्वे सोमसाम वैनयोः पूर्वम् सूर्यसामोत्तर मिन्द्रस्य च वात्रघ्नम् सोमसामानि चैव त्रीणि भारद्वाजश्च ॥२४॥

উপোষু জাতমপতুরম্ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীর দেবতাই যম। অথবা ইহাদের তৃতীয়টী দেবর্ষিগণের আর্ষেয়।

পুনানো অক্রমীদভি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বৈরূপ অঙ্কতির সাম।

আবিশন্ কলশংসুতঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ঔশন সংজ্ঞবঃ। অথবা ইহার প্রথমটী দেব ঋষিগণের আর্ষেয়।

অসৃগ্রিরক্ষ্যো যথা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সোম সাম।

প্রঘদ্গাবো ন ভূর্ণয়ঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কার্ষ্ণ নামে খ্যাত।

---

* এস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুস্তকের শেষ পর্যন্ত সায়ণা চার্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। রামাচার্য অনুগ্রহ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আপন্নন্ পবসে মৃধ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। আয়া পবস্ব ধারয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্ দ্বয়াশ্রিত াম দুইটী বৈশ্বদেব সংজ্ঞক। অথবা ইহাদের পূর্বটী সোম সাম এবং উত্তরটী সূর্য সাম।

স পবস্ব য আবিথ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ইন্দ্রের বার্ত্রঘ্ন।

অয়াবীতী প‍ি‍স্রব এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই সোম সাম।

পরিদ্যুক্ষং সনদ্রয়িম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজ কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের চতুর্বিংশ খণ্ড।

বাষাহরং বার্ত্রাণি ত্রীণীন্দ্রস্য বৈরূপে দ্বে তরন্তস্য চ বৈদদশ্বেস্সাম সোমসাম সূর্যসাম চ দার্ঢচ্যুতানি ত্রীণীন্দ্রস্য চ বৃষক মৈষঞ্চ শ্যাবাশ্বঞ্চায়াস্যঞ্চায়াসোমীয়ং বা সোমসাম বাগ্নেয়ঞ্চায়াস্যে চৈব ভারদ্বাজং চ ॥ ২৫ ॥

অচিক্রদদ্ বৃষা হরিঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। বিষাহরি শব্দ যুক্ত বলিয়া ইহার নাম বার্ষাহর।

আতে দক্ষং ময়োভুবম্ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই বৃশ কর্তৃক দৃষ্ট।

অধ্বর্যো অদ্রিভিঃ সুতম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বৈরূপসংজ্ঞক।

তরৎ স মন্দী ধাবতি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বৈদদশ্ব নামক ঋষির পুত্র তরন্ত কর্তৃক দৃষ্ট।

আ পবস্ব সহস্রিণম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সোম সাম।

অস্য প্রত্নাস আয়বঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সূর্য সাম।

অর্ষা সোমা দ্যুমত্তম এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই দৃঢচ্যুত ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

বৃষা সোম দ্যুমাং অসি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রের বৃষক।

ইষে পবস্ব ধারয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার সাম ঐষ।

মন্দ্রয়া সোমধারয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম শ্যাবাশ্ব।

অয়া সোম সুকৃত্যয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম আয়াস্য বা আয়ো সোমীয়। অথবা ইহা সোম সাম।

অয়ং বিচর্ষণি হিতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম আগ্নেয়।

প্র ন ইন্দ্র মহে তুন এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম আয়াস্য।

অপঘ্নন্ পবতে মৃধঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজ কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় প্রপাঠকের পঞ্চবিংশ খণ্ড

ইতি দ্বিতীয় প্রপাঠক সমাপ্ত

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ৩য় সংখ্যা

ভারতে গো-জাতির দৈবত্ব

অধ্যক্ষ **শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু** এম্. এ, পি. আর. এস্.

ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রে 'বার্তা' অর্থে অর্থাগমের যে চতুর্মুখী পন্থা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কৃষি ও গো-পালন প্রধান ও বহুজনানুসৃত পথ ছিল। যদিও মনুস্মৃতিতে (৯।৩২৭) এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে (৬০।২২, ২৫) এই যুগল বৃত্তি বৈশ্যবর্ণের জন্য বিশেষ-ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে—তবুও দেখা যায়, কার্যতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ নির্বিশেষে সকলেই গোজাতির অনুশীলন করিত এবং এই বৃত্তি আভিজাত্যের হানিকর ছিল না। গো-পালন সর্বসাধারণে প্রচলিত ছিল বলিয়াই মুদ্রা প্রচলনের পূর্ববর্তী কালে ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যস্বরূপে গাভীর প্রভূত ব্যবহার লক্ষিত হয়।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পর্যন্ত সর্বত্র গো-দানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে নৃপতি ও রাজন্যবর্গ স্ব স্ব ঘোষ-পল্লীতে সহস্র সহস্র গো-যূথ রক্ষা করিতেন। অনেক শ্রেষ্ঠী ও ভূস্বামীরও বর্ধিষ্ণু গোশালা ছিল এবং তাহারা বহুতর ভৃত্য রাখিয়া এই সমস্ত পশুর তত্ত্বাবধান করিত (পরমত্থজোতিকা—সুত্তনিপাত ১।২ টীকা ; মহাবগ্‌গ ৩৪।১৯ ; জাতক ১।৩৮৮) এবং উহার উৎপন্ন দ্রব্য ভক্ষণ কিম্বা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সাধারণ গ্রামবাসী ও গৃহস্থদিগেরও প্রত্যেকের কয়েকটী করিয়া পশু থাকিত। তাহারা নির্দিষ্ট বেতন অথবা গো-রসের দশমাংশ (অর্থশাস্ত্র ৩।১৩ ; নারদ ৬।২-৩ ; যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৯৪) দান করিয়া যৌথভাবে কয়েকজন গোপালক নিযুক্ত রাখিত। এই গোপালকগণ যৌথভূমিতে গোচারণ করিয়া প্রদোষকালে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে স্ব স্ব পশু বুঝাইয়া দিত (ঋগ্বেদ ১০।১৯ ; অঙ্গুত্তরনিকায় ১।২০৫ ; ধর্মপদাট্‌ঠকথা ১।১৫৭)।

এই সকল বেতন বা লভ্যাংশভোগী গোপগণের দায় বড় সহজ ছিল না। আরণ্যদেশের বিহারক্ষেত্রে ও ব্রজপল্লীতে হিংস্র পশুর উৎপাতে সর্বদা তটস্থ থাকিতে হইত (জাতক ১।৩৮৮ ;

৩।১৪৯, ৪৭৯ ; দীঘনিকায় ২৪।২।৫ ; অর্থশাস্ত্র ২।২৯)। ইহা অপেক্ষা অধিক আশঙ্কাজনক ছিল তস্করের উপদ্রব। বৈদিক যুগ হইতে মধ্যযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত গো-হরণের প্রকোপ এমন দুর্নিবার মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে সসাগরা জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য ক্ষুদ্রলোভী তস্কর (জাতক ১।২৪০ ; ৪।২৫১) কেহ এই দুষ্কর্মের মোহ এড়াইতে পারিত না। গো-হরণের সূত্রে রাজা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠ ঋষির বিবাদের সূচনা এবং অষ্টবসুর মর্ত্তে জন্মলাভ হয়। এমন কি, রাজা দুর্যোধন স্বয়ং বিরাটের ঘোষপল্লী লুণ্ঠন করিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। এই চৌর্যবৃত্তির দৌরাত্ম্যে বিরক্ত ও অনন্যোপায় হইয়া অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থকার গোহ্নপহারী ও প্ররোচকদের জন্য প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন (২।২৯)।

এই দুষ্কর কর্তব্য ব্যতীত গোপালদিগের আরও একাদশ গুণাবলীর বর্ণনা করা হইয়াছে যাহা হইতে গো-বর্ধনের সহায়তা হয়। গোপাল রূপজ্ঞ এবং লক্ষণ-কুশল হইবে, পশুর গাত্র হইতে দুষ্ট কীট তুলিয়া ফেলিবে ও আঘাত সুশ্রূষা করিবে, মশক নিবারণের জন্য যথাযুক্ত ধূম প্রজ্জ্বলন করিবে, তীর্থ (জলদেশ উত্তরণের প্রশস্ত স্থান), পানভূমি, বীথি ও গোচর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে, মাত্রাধিক দোহন করিবে না এবং যূথপতি ঋষভবৃন্দকে সবিশেষ যত্নে পরিচর্যা করিবে (মজ্ঝিমনিকায় ৩৩ ; অঙ্গুত্তরনিকায় ৫।৩৫০)।

উপরোক্ত প্রথা ও অনুষ্ঠান হইতে অনুমিত হয় যে ভারতীয়গণ আদিম কাল হইতে গো-ধনের মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিল। এই উপযোগবোধে প্রণোদিত হইয়া সম্রাট্ অশোক মানব এবং গো-জাতির আহার, আরাম ও চিকিৎসার জন্য সমভাবে যত্ন করেন (শৈল-শাসন ২, স্তম্ভশাসন ৭) এবং অর্থজ্ঞ শাস্ত্রকার গোবংশ এবং গোদুগ্ধ যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় সে জন্য বিধি নির্দেশ করেন (অর্থশাস্ত্র ২।২৯)। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে অশোকের অহিংসামূলক শাসনগুলির (স্তম্ভশাসন ২, ৫) কোথাও অন্যান্য পশুর তুলনায় গোজাতির প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না এবং অর্থশাস্ত্রের অর্থনীতিতে অশ্ব ও গজ অপেক্ষা গোজাতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই (২।৩০-৩২)। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে—তাহা 'বাস্তব'ই হউক বা 'দৈব'ই হউক, কোথাও পুণ্য অথবা অশৌচের ছলনায় কোনও পশুমাংস নিষেধ করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয় না। গাভীতে দৈবত্ব আরোপ করিয়া রক্ষা করিবার রীতি পুরাকালে প্রচলিত ছিল না। ক্রমশঃ বৈদেশিকদের সংমিশ্রণে উত্তর ভারতে যে শঙ্কর-সভ্যতার উদয় হয়, তাহার মধ্যে এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষ করিয়া বৃষের দৈবত্ব বিজাতীয় সংস্কারের মধ্যে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। কুষাণ রাজগণ তাঁহাদের মুদ্রায় শিব ও ষণ্ডের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন। স্যাসানীয় রাজ বরহরণ (খ্রী' ৪২২-৪৪০) ও গৌড়-রাজ শশাঙ্ক (খ্রী' ৬০০-৬২৫) ও মুদ্রায় অনুরূপ মূর্তি খোদিত করিয়াছেন। অতঃপর হূনরাজ মিহিরগুলের মুদ্রায় দেখা যায় এক পৃষ্ঠে বৃষ চিহ্ন মুদ্রিত হইয়াছে, অন্যপৃষ্ঠে 'জয়তু বৃষঃ' ইত্যাকার লিপি খোদিত হইয়াছে। (Catalogue of Coins in the Indian Museum.—V. Smith, 236). কুমারিল বা শঙ্করের সময় হইতে যখন হিন্দু সমাজ কঠোর নীতি ও অনুশাসন

দ্বারা সংগঠিত হইতে লাগিল সম্ভবতঃ তখন হইতে এই প্রথা দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। অর্থশাস্ত্রে গো-হত্যা-নিবারণী নিয়মাবলীর মধ্যে কেবল বৎস, ধেনু (দুগ্ধবতী গাভী) ও অনদ্বর্গের মুক্তি বিহিত হইয়াছে (২।২৬)। সম্রাট অশোক পঞ্চম স্তম্ভশাসনে যে সকল জীব-হত্যা নিষেধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে 'ষণ্ডকে'র উল্লেখ আছে,—কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে এই সমস্ত জীব অভক্ষ্য বলিয়া পরিহার্য। অনুমান করা যায় যে এখানে 'ষণ্ডক' অর্থে শুধু বন্ধ ষণ্ডকে[১] অভক্ষ্য এবং অবধ্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। বৈদিক, পালি, বৌদ্ধ এবং সংস্কৃত স্মৃতি এবং কাব্যসাহিত্যে গো-বধ ও গো-মাংস ভক্ষণের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে গাভী 'অঘ্ন্য' বলিয়া উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্যতঃ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রথা দৃষ্ট হয়[২]। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় কোমল গোমাংস ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রিয় খাদ্য ছিল (৩।১।২।২১)।

পাণিনির ব্যাখ্যা অনুযায়ী অতিথির জন্য গো বধ্য বলিয়া 'গোঘ্ন' অর্থ অতিথি (৩।৪।৭৩)। অতিথির আপ্যায়নে এবং শ্রাদ্ধ বিবাহাদি ক্রিয়াকার্যে গো-হত্যা শাস্ত্রকারগণ অনুমোদন করিয়াছেন (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৪।১।২; আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ১।৩।৯; মনু ৫।৪১; বাশিষ্ঠ ৪।৮; সাংখ্যায়ণ ২।১৬।১; বিষ্ণু ৮০।৯; যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০৯)। ভবভূতির উত্তররামচরিতে চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে বাল্মীকির আশ্রমে বশিষ্ঠের শুভাগমন উপলক্ষ্যে একটী বৎসিনী নিহত হইয়াছিল।

অবশ্য ঋগ্বেদের একটী শ্লোকে গাভীর দৈবত্ব স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিয়া গো-হত্যা নিষেধ করা হইয়াছে :—

"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ
প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম নাগাম দিতিং বধিষ্ঠ ৮।১০১।১৫

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই শ্লোকের সঙ্গে নিম্নলিখিত বাক্যাংশ যুক্ত হইয়াছে—

"পিবতূদকং তৃণান্যত্তু। ওমুৎসৃজত"।

বিভিন্ন কালের ভাষ্যকারগণ এই 'উৎসৃজত' শব্দের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা হইতে কালের ধারা ও যুগধর্ম অনুমান করা যায়। জৈমিনীয় শ্রৌতসূত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"তামুপাষ্টাং হতে পাপ্মানমেব তদ্ধতেঽথ যদি গামুৎসৃজেত্তামেতেনৈবোৎসৃজেদ্গৌ-
র্যেমূর্হব্যা"

পঞ্চদশ কারিকায় 'হব্যাম' স্থলে 'উপাগতাম্' শব্দের প্রয়োগ করিয়া অর্থ আরও

---

১ প্রাচীন প্রাক ঐতিহাসিক ঈলিয়ানের ভারতীয় পশুবর্ণনায় মধ্যে এরূপ ষণ্ড-ষণ্ডের বহুল অস্তিত্ব ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে (২৬।২০)।

২ ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ্‌ রচিত 'বৈদিক সূচী'—দ্বিতীয় খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পরিস্ফুট করা হইয়াছে। শুষ্কা এবং বৃদ্ধা গাভীকে তৃণোদকে ভরণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বলিদান করিলে পাপেরই হনন করা হয়।

জৈমিনীয় গৃহ্যসূত্রের টীকা এইরূপ :

"ঋত্বিগাচার্যঃ স্নাতকো রাজ্যভিষিক্তঃ প্রিয়ঃ সখা শ্রোত্রিয়শ্চেতি তেভ্য আতিথ্যং গাং কুর্যাত্তামতিথেয় ইতি প্রোক্ষেৎ" ১।১২।

'প্রোক্ষেৎ' শব্দের দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ সম্ভব। বর্ণিত অতিথিদিগকে উপরোক্ত গাভী দান করা যাইতে পারে, অথবা অতিথিদের তৃপ্তির জন্য ঐ গাভী হত্যা করা যাইতে পারে। অতিথিকে অকর্মণ্য গাভী দান করা যুক্তি ও নীতিসঙ্গত হয় না। অপর পক্ষে অতিথির জন্য গো-বধের প্রচলন ছিল ইহা 'আপস্তম্ব্য গৃহ্যসূত্র', 'পাণিনি' ও অন্যান্য সূত্র হইতে জানিতে পারা যায়। অতএব স্নাতক ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের ও গোমাংস ভক্ষণে বাধা নাই।

সায়নের ভাষ্য অন্যপ্রকার—

'বধ্যামেনাং রাজগবীং পরিত্যজত'। শুষ্কা বা বৃদ্ধা গাভীকে যজ্ঞে বা অতিথির আপ্যায়নে বধ করা হইবে না—যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া তৃণভক্ষণ এবং জলপান করিবার জন্য পরিত্যাগ করা হইবে। যে সময়ে গো-হত্যা মহাপাতক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে সায়ন সেই যুগের ব্যক্তি।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাবলীতে 'গো-ঘাতকে'র সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এই ব্যবসায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও বহুল প্রচলিত ছিল (জাতক ৪।৩৬১)। ভক্ষণের জন্য গো-বধ কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। (জাতক ২।৫০, ১৩৫ ; সুত্তনিপাত ৩।৮।৭) এবং এই পশুর জন্য নির্দিষ্ট বধ্যভূমি ছিল (গাবঘাতনম্—মহাবগ্‌গ ৫।১।১৩)। এমন কি স্ত্রীজাতীয় পশুও নিস্কৃতি পাইত না (চৈনিক ধম্মপদ—'বীল'এর অনুবাদ পৃঃ ৬০ ; আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১।৫।১৭।৩০)। গ্রাম অথবা নগরের জনবহুল কেন্দ্রস্থলে নিম্নোদ্ধৃত রুচিবিগর্হিত দৃশ্যের অভাব ছিল না—

"গোঘাতকো বা গোঘাতকন্তেবাসী বা গাভীম্ বধিত্বা চাতুমহাপথে বিলসো পটিভজিত্বা নিসিন্নো অস্‌স ... ..."

—দীঘনিকায় ২২।৬, মজ্ঝিমনিকায় ১১৯

"যেমন গো-ঘাতক বা তাহার সহকারী গো-হত্যা করিয়া চতুর্মহাপথের সঙ্গমস্থলে (লোকচক্ষুকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য) বিখণ্ডিত মাংসগুলি সুসজ্জিত করিয়া বসিয়া থাকে—তদ্রূপ ..."ইত্যাদি।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বরং ইহাই বোধ হয় যে গোমাংস অন্যান্য মাংস হইতে অধিক ভক্ষিত হইত। অশুদ্ধির নামেও কোন মাংস নিষিদ্ধ হয় নাই। শূকর ও কুক্কুট ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির পশুশালার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল—ইহার সমর্থক উক্তি ধর্মগ্রন্থেও প্রচুর বর্তমান। অশোকের নিষেধাজ্ঞা অনুসারে শুধু গর্ভবতী ও প্রসূতী শূকরী পরিহার্য। কর্মকারপুত্র চুন্দ ভগবান বুদ্ধকে মহানির্বাণের প্রাক্কালে শূকরমাংসে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল

(দীঘনিকায় ১৬।৪।১৪, উদান ৮।৫; মিলিন্দপঞ্হো)। গাভীর ন্যায় শূকরের জন্যও কোথাও কোথাও স্বতন্ত্র বধ্যভূমি ছিল (সূকরসূনম্—মহাবগগ্ ৬।১০।২) এবং 'গো-ঘাতক' যেমন পণ্যশালায় গোমাংস বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিত, তদ্রূপ 'শূকরিক' শূকরমাংস বিক্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিত। মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমেও রাজসৎকারে বরাহ ও কুক্কুট মাংস রুচিকর আহার্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (রামায়ণ ২।৯১।৬৭, ৭০)। চৈনিক ধম্মপদে একজন ব্রাহ্মণকে নির্বিকার চিত্তে কুক্কুট মাংস ভক্ষণ করিতে দেখা যায় ('বীল'-এর অনুবাদ, পৃ° ১৫০)। জাতক (১।১৯৭) এবং অর্থশাস্ত্রেও (৫।২) অনুরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যজ্ঞকর্মে যে সকল জীব নিহত হইত তন্মধ্যে গো, ছাগ, কুক্কুট এবং শূকরের সংখ্যাই অধিক (দীঘনিকায় ২৩।৩১, জাতক ১।২৫৯, ৪।৩৬৪)। মহাবগ্গে একস্থানে দুর্ভিক্ষ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে ক্ষুৎপীড়িত পুরবাসীরা নিরুপায় হইয়া হস্তী, অশ্ব, কুকুর ও সর্পমাংসে জঠরজ্বালা দূর করিতে প্রবৃত্ত হইল (৬।২৩।১০-১৩)। এই সমস্ত অরুচিকর, স্বভাব-বর্জনীয় পশুমাংসের মধ্যে গো, বরাহ, কুক্কুট স্থান পায় নাই। ব্রাহ্মণে (শতপথ ১।২।১।৮; ঐতরেয় ২।১।৮) স্মৃতিগ্রন্থে (আপস্তম্ব ১।৫।১৭।২৯; মনু ৫।১১।১৮; যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭২, ১৭৬) ও শান্তিপর্বে (৩৭।২৪-২৬) যে সমস্ত পশু ও পক্ষীমাংস ব্রাহ্মণের অখাদ্য বলিয়া নির্ণিত হইয়াছে তাহার মধ্যেও গো-বরাহ-কুক্কুটের উল্লেখ নাই[৩]। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চুয়াঙ্ তাঁহার বিবরণে গোমাংস এবং শূকর মাংস অখাদ্য মাংসের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বহুপরবর্তী কালের কথা এবং তাঁহার সাক্ষ্য অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না।

অবশ্য বৈদিক যুগ হইতে যে ধারাবাহিকভাবে গো-হত্যা নিরোধ এবং গোধন রক্ষণের জন্য একপক্ষে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল তাহাতে সংশয় নাই; এবং সম্ভবতঃ ইউয়ান্ চুয়াঙের বিবৃতি এই মতবাদের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বৈদেশিক লেখকগণ বহুস্থলে প্রমাদবশতঃ শাস্ত্রবাক্যকে বাস্তব রীতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন;—অথবা কোন স্থানীয় প্রথার সার্বভৌমত্ব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভ্রান্ত উক্তির আর একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মেগাস্থিনিসের প্রামাণ্যে গ্রীক্ ঐতিহাসিক ষ্ট্র্যাবো বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ শ্রমকার্যে নিযুক্ত পশুর মাংস ভক্ষণ করিত না (১৫।১।৫৯)। আমরা দেখিয়াছি যে হল, শকট ও ভারবাহী বৃষ ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ছিল না। কিন্তু গ্রীক্ লেখকের ভ্রান্ত উক্তি হইতেও এই অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে কোন জনপদে বা শাস্ত্রগ্রন্থে তৎকালে অনুরূপ নিষেধ প্রচলিত ছিল। এবং ইহা আরও স্পষ্টতঃ বোধ হয় যে ঐ নিষেধের মূলে কোন ধর্মভাব বা উদারতা ছিল না—ছিল পশুশ্রমের মূল্য সম্বন্ধে চেতনা। গো-রক্ষণ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের নিষেধ বাক্যগুলিতে এই ধন-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রকট। এই মনোবৃত্তি বশতঃই রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে গাভীতে পুণ্যত্ব আরোপের প্রচেষ্টা হইয়াছে।

---

৩ অবশ্য কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে স্নাতক ব্রাহ্মণের গৃহপালিত কুক্কুট এবং শূকর অন্যান্য বহু জীবমাংসের সহিত একত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে (গৌতম ২৩।৫ মনু ১১।১৫৭)

কিন্তু এসমস্ত অংশেও গোজাতির দৈবীকরণের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই এবং ধর্মান্ধতা অপেক্ষা বাস্তব চেতনা অধিক পরিস্ফুট। রামায়ণ মহাভারতে গো-হত্যা এবং সদ্যপ্রসূত ধেনুর দোহন পাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (রামায়ণ ৪।৩৪।১২, ২।৭৫।৫৪ মহাভারত ৩।১৭।৩১, ৭৩।২৭)। মহাভারতে দুঃখ করিয়া অতীত শুভযুগের বর্ণনা করা হইয়াছে—যখন বৈশ্যগণ শীর্ণ গাভীকে সযত্নে পুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইত এবং যতদিন বৎসগণ মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করিত ততদিন বৎসবতী ধেনু দোহন করিত না (১৬৪।২২)। 'গাভীকে যেমন নিঃশেষে দোহন করিতে নাই' —এই উপমা নৃপতিবর্গের রাজস্ব-নীতির ব্যাখ্যা করিতে বহুল প্রযুক্ত হইয়াছে। শীর্ণ বলীবর্দ্দকে শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত না করিয়া আহার্যদানে পরিপুষ্ট করা হইত—চেদীরাজ্যের ইহা অন্যতম গৌরব ছিল (১৬৩।১১)। তমসাচ্ছন্ন কলিযুগে যে সমস্ত অনাচার চলিবে তন্মধ্যে দেখা যাইবে ধেনু ও একবর্ষী বৎস হলাকর্ষণ ও ভার বহন করিতেছে (৩।১৪৯।২৭)। গোজাতির প্রতি এ প্রকার অনুকম্পার কারণ এই যে যেমন চতুর্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ সেইরূপ চতুষ্পদজাতির মধ্যে গোজাতি অগ্রগণ্য (৬।১২৩।৩৪, ১২।৯১।১১)। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য স্কন্দ দেবসেনার অধিনায়কত্বে বৃত হইয়াছিলেন (৩।২২৮।২৩, ১২।২১।১৮; বোধায়ন ২।২।৪।১৮)।

পক্ষান্তরে যজ্ঞে বহুল সংখ্যায় বলিদানের নিমিত্ত গাভীই প্রশস্ত (১।৭৪।১৩০)। রাজা রন্তিদেবের যজ্ঞশালায় প্রত্যহ দুই সহস্র জীব এবং দুই সহস্র গাভী বধ করিয়া তাহার মাংস বিতরণ করা হইত (৩।২০৭।৮৯) এবং তাঁহার যজ্ঞের গো-রক্তে চর্মন্বতী নদীর সৃষ্টি হয় (৭।৬৭।৫; ১২।২৯।১২৩; ১৩।৬৬।৪২-৪৩; কালিদাসের মেঘদূত)। ইহার কারণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"অগ্নেয়ো মাংসকামশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ
যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মণ্ বধ্যন্তে সততম্ দ্বিজৈঃ
সংস্কৃতাঃ কীল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুরম্"

৩।২০৪।১১-১২

"অগ্নি[৩] মাংসকামী'—এই শ্রুতি বচন[৪] শ্রুত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ সর্বদা যজ্ঞার্থে পশুবধ করিয়া থাকেন এবং এই সমস্ত পশু মন্ত্রদ্বারা পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করে।"

এই নিঃস্বার্থ পশুপ্রেম বস্তুপ্রবণ বিধর্মী ঈলিয়ানের ধারণাগোচর হয় নাই। তিনি রুক্ষ ভাষায় যজ্ঞে পশু বলির বর্ণনা করিয়াছেন—

"ভারতবর্ষে এরিয়ানোই প্রদেশে ভূগর্ভে একটী গহ্বর আছে এবং তন্মধ্যে রহস্যবিজড়িত মণ্ডপ সকল বিদ্যমান। এস্থানে ভারতীয়গণ ত্রিংসসহস্রাধিক গবাদি পশু লইয়া আসে। মেষ, ছাগ, বৃষ, অশ্ব প্রভৃতি আনীত হয়। কেহ যদি কোন অশুভ স্বপ্ন দেখে বা কোন বিভীষিকাসূচক শব্দ বা দৈববাণী শুনিয়া সন্ত্রস্ত হয় অথবা অমঙ্গলজ্ঞাপক পক্ষী দেখিতে পায় তাহা হইলে সে

---

৩ যজ্ঞাগ্নি।

৪ মনু ৫ (৪০-৪২, বাশিষ্ঠ ৪।৭, বিষ্ণু ৫১।৫৯।৭৮, যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮০-৮১ দ্রষ্টব্য

স্বীয় জীবনরক্ষার জন্য তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী পশু নিষ্ক্রয় স্বরূপ এই গহ্বরে নিক্ষেপ করে।" (১৬।১৬)

স্পষ্টই দেখা যায় যে দুইটী প্রতিকূল ধারার সংঘর্ষ চলিতেছিল। গাভীর উপকারিতা সুধিজন উপলব্ধি করিত। কিন্তু সাধারণের মধ্যে রসনা তৃপ্তির জন্য গো-হত্যা অবাধে অনুষ্ঠিত হইত, শাস্ত্রবচন তাহা সংযত করিতে পারে নাই। গাভী চতুষ্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই দেবগণকে প্রসন্ন করিবার জন্য ইহাকে স্বর্গধামে প্রেরণ করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। ভগবান বুদ্ধ যজ্ঞে পশুবধের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং অর্থনৈতিক কারণে গো-রক্ষণনীতির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালীন ব্রাহ্মণগণ পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গো-বলির গর্হিত প্রথা গ্রহণ করিয়াছে এই বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগের মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়াছেন—

"যথা মাতা পিতা ভাতা অঞ্ঞে বা পি চ ঞাতকা
গাবো নো পরমা মিত্তা যাসু জায়ন্তে ওসধা
অন্নদা বলদা চেতা বন্নদা সুখদা তথা
এতম অথবসং ঞাত্বা নাসু্সু গাবো হনিংসু তে।"

সুত্তনিপাত ২।৭।১৩-১৪

"মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের ন্যায় গাভী আমাদের পরম মিত্র। গাভী হইতে ঔষধ জাত হইয়া থাকে। গাভী আহার্য দান করে, বলদান করে, অঙ্গের বর্ণ উজ্জ্বল করে, সুখ দান করে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ গোহত্যা করিত না।"[৬]

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদিগের প্ররোচনায় নৃপতি লক্ষ লক্ষ গাভী দেবসমীপে বলি দিল। ইহার ফলে লোকসমাজে রোগসংখ্যা ত্রিংশগুণাধিক বৃদ্ধি পাইল।

ভগবান বুদ্ধ যে গাভীর দৈবায়ন সমর্থন করিতেছেন একথা বাতুলেও বলিবে না। ধর্মগ্রন্থ সমূহে স্থানে স্থানে যে গাভীর উপর নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার পশ্চাতেও বুদ্ধের বাণীর ন্যায় গাভীর উপযোগিতা বোধ এবং বাস্তব স্বার্থের প্রভাব ছিল। এই বাস্তব চেতনার ফলে ক্রমশঃ গোবলির পরিবর্তে গোদানের মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় (মহাভারত ১৩।৬৬।৪৪)[৭] অবশ্য রামায়ণ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে গাভীকে পদদ্বারা স্পর্শ করা পাপ (রাঃ ২।৭৫।৩১ মঃ ৭।৭৩।৩০ ; ১৩।৯৩।১১৭, ১২৬।২৮-২৯)। কিন্তু ইহাতে দৈবীকরণের

৬ অবশ্য ব্রাহ্মণগণ কোনকালেই গো-বলির বিরোধী ছিল না। এই অসত্যবাক্য প্রচারবাণীকে শক্তিদান করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

৭ অনুশাসন পর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ব্যাপী গোপ্রশস্তি মূল-মহাভারতের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয় না। সম্ভবতঃ ক্রমশঃ যে সময় গো-বলির প্রথা বন্ধ হইয়া যাইতেছিল সে সময় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। কারণ এই পর্বেই পরবর্তী অধ্যায়ে গোমাংসে পিতৃপুরুষের তর্পণ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে (৮৮।৭)

কোন প্রয়াস নাই। ভারতীয় বিদ্যার্থী যেমন তাহার পুস্তকে পাদস্পর্শ করে না, যান্ত্রিক তাহার যন্ত্রে পদক্ষেপ করে না, মুদ্রা বা স্বর্ণরৌপ্য অর্থচারীর নমস্য, ইহাও সেই মনোবৃত্তির লক্ষণ। প্রাচীন মিশরবাসী যেমন হোরাস, সেৎ, উপুয়াৎ, আনুবিস, সোবেক, থট্ প্রভৃতি জীবাকৃতি জাতিচিহ্ন দেবজ্ঞানে পূজা করিত, গাভী আর্যদের তদ্রূপ জন্তুদেবতা ছিল না। এ বিষয়ে মিশরীয়দের 'এপিস্' ও 'নেভিস্' ঋষভার্চনার সহিত পরবর্তী হিন্দুদের গো-ভক্তির কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মিশরে এই দুই ঋষভ 'টা' ও 'রা' নামক দুই দেবতার প্রতিভূরূপে বংশানুক্রমে অলৌকিক সম্মান পাইত এবং 'সাইট্' যুগে জাতীয় অধঃপতনের সময় তাহারা স্বয়ং দেবতা বলিয়া গণ্য ও পূজিত হইল।[৮] হিন্দুরাও প্রাচীন আর্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া বৃষকে মহেশ্বরের বাহনজ্ঞানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও স্রক্চন্দনে ভূষিত করিল ; ক্রমশঃ মানুষের ষণ্ডত্বপ্রাপ্তি ও ষণ্ডের দৈবত্বপ্রাপ্তিতে সনাতন ধর্মের রূপান্তর ঘটিল।

গাভীতে পুণ্যত্ব আরোপের ধারা জাতকের একটি ক্ষুদ্র আলেখ্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। একদা কোনও গ্রামভোজকের একটী সুলক্ষণ শ্বেতকায় ঋষভ (সব্বসেতো মঙ্গল উসভো) সর্পাঘাতে মৃত্যুলাভ করে। গ্রামবাসিগণ "সকলে একত্র হইয়া রোদন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল এবং ঋষভটীকে গন্ধ মালাদি দ্বারা পূজন করিয়া[৯] ভূগর্ভে প্রোথিত করিল।"

"সব্বে একতো ব আগন্ত্বা কন্দিত্বা তং গন্ধমালাদিহি পূজেত্বা আবাটে লিখনিত্বা···" (৪।৩২৬)

কিন্তু এপ্রকার সম্মান অশ্ব অথবা হস্তীরও অপ্রাপ্য ছিল না। জাতকে 'মঙ্গল উসভ' অপেক্ষা 'মঙ্গলহত্থি'র মহিমা অধিক কীর্তিত হইয়াছে এবং ইহার কল্যাণে দারুণ অনাবৃষ্টির মধ্যে ধারা সঞ্চার হয় (১।৩২০।৬।৫৮৭)। 'হত্থিমঙ্গল' রাজ-রাজন্যদের একটী প্রচলিত উৎসব ছিল। এক রাজা তাহার হস্তীকে ইত্যাকারে পূজা করিত। ঐ পশুর আবাস সুগন্ধ মৃত্তিকায় লেপিত হইত, চতুর্দিক বিচিত্র বস্ত্রপটে সুসজ্জিত হইত, সুবাসিত তৈলে দীপ প্রজ্বলিত হইত, একটী পাত্রে গন্ধধূপ রক্ষিত হইত, মলমঞ্চে একটী সুবর্ণাধার স্থাপিত হইত। ঐ পশু যেখানে বিরাজ করিত তথায় একটী বহুবর্ণ গালিচা বিস্তৃত ছিল এবং তাহাকে রুচিকর রাজভোজ্য আহার করিতে দেওয়া হইত (জাতক ৩।৩৮৪ ; ৪।৯২ দ্রষ্টব্য)। সম্রাট দুর্যোধন ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের এক হস্তীকে সম্মান ও পূজা করিতেন (মহাঃ ৯।২০।৩)। জাতকের গল্পে একটী অশ্বকেও অনুরূপভাবে পূজিত হইতে দেখা যায় (২।২৯১)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধাশ্বগুলিকে স্নান করাইয়া মাল্যদান করা হইত (মহাঃ ৭।১৩২।৫৬)। রাজ-অশ্বকে

---

৮ Breasted—History of Egypt.

৯ 'পূজন' শব্দ 'সম্মান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক দেবপূজাবোধক সঙ্কীর্ণ অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ ছিল না।

মন্ত্রঃপূত জলে অভিষিক্ত করা হইত (জাতক, ২।২৮৭)। অর্থশাস্ত্রে হস্তী ও অশ্বপূজার নিম্নবিধ ব্যবস্থা আছে—

"ত্রিস্রো নীরজনাঃ কার্যাশ্চাতুর্মাস্যর্তু-সন্ধিষু
ভূতানাং কৃষ্ণসন্ধীজ্যাঃ সেনান্যঃ শুক্লসন্ধিষু" ২।৩২

"চাতুর্মাস্যে এবং ঋতুসন্ধিতে তিনবার অগ্নিবিলাস করিয়া আরতি করিতে হইবে এবং সেনাধ্যক্ষগণ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যোগে গজযূথের কল্যাণ কামনায় ভূতদিগকে পরিতুষ্ট করিবেন।"

"দ্বিরহ্নঃ স্নানমশ্বানাং গন্ধমাল্যং চ দাপয়েৎ
কৃষ্ণসন্ধিষু ভূতেজ্যাঃ শুক্লেষু স্বস্তি বাচনম্"
নীরজনামাশ্বযুজে কারয়েন্নবমেঽহনি
যাত্রাদাববসানে বা ব্যাধৌ বা শান্তিকে রতঃ" ২।৩০

"অশ্বকে দিবসে দুইবার অবগাহন করাইয়া গন্ধমালাদি দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে। অমাবস্যায় ভূততুষ্টি ও পূর্ণিমায় স্বস্ত্যয়ণ বিধেয়। আশ্বযুজ কালে প্রতি নবম দিবসে, যাত্রার প্রারম্ভে ও অবসানে এবং ব্যাধি সমাগমে অশ্বের কল্যাণ কামনায় অগ্নিবিলাস করিয়া আরতি করিতে হইবে।"

এই সমস্ত নির্বোধ আচার অনুষ্ঠান দুষ্টযোনী বিতাডন করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইত বটে কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের মঙ্গলাচরণ, সর্ববিধ সঙ্কট হইতে সামরিক উপকরণগুলির রক্ষণাবেক্ষণ,—পরন্ত বিমুগ্ধ মানবের কুসংস্কার ও ভীতি প্রণোদিত পশুবন্দনা নহে। যুদ্ধ ও মৃগয়ায় যেমন গজবাজি অপরিহার্য ছিল, ধান্য ও দুগ্ধের জন্য তদ্রূপ বৃষ ও ধেনু ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। হস্তীর দন্ত, গাভীর দুগ্ধ, মেষের লোম সমভাবে অদূরদর্শী স্বামীর লুব্ধতা হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস অর্থশাস্ত্রে বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে যে পশু-বিদ্যা ও পশু-চিকিৎসার নিয়মিত চর্চা ছিল তাহা অর্থশাস্ত্র, ঈলিয়ানের গ্রন্থ এবং অশোকের শাসনলিপি ভিন্ন আরও বহু সূত্রে জানিতে পারা যায়; এবং জৈবিক শ্রম ও পশুজাত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে ভারতীয়দের জ্ঞান কিরূপ জাগ্রত ছিল ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। প্রাচীন ভারতে পশুরক্ষণ প্রচেষ্টার পশ্চাদ্‌পটে ধর্ম ও অর্থ-বুদ্ধির দ্বৈত প্রভাব ছিল,—অহিংসা ও রক্ষণনীতি (protection) গবাদি পশুর বিনাশ শাসন করিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন গোত্রপ্রতীক পশুমূর্তি (tribal totem) পরে ভক্তিবস্তু (fetish) বা অধিষ্ঠাত্রী পুরদেবতায় পরিণত হইয়াছিল এবং ঐ ঐ দেবকল্পী যাবতীয় জীব ধর্মভয়ে অবধ্য বিবেচিত হইত, ভারতীয় আর্যজাতির মধ্যে সেরূপ ধর্মান্ধতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের পূজাপদ্ধতি (rituals) প্রাক্তন কাল হইতে জড়াত্মবাদের (animism) ঊর্ধ্বে উঠিয়া ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি নৈসর্গিক শক্তির উপাসনায় সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল।

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি. এ.

ভেদাভেদবাদের প্রচারক বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যকে ভোজরাজ 'বিদ্যাপতি' উপাধি প্রদান করেন।

"শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্তী
ত্রিবিক্রমোঽভূৎ তনয়োঽস্য জাতঃ।
যো ভোজরাজেন কৃতাভিধানো
বিদ্যাপতির্ভাস্করভট্টনামা॥"

মহারাষ্ট্রদেশে নাসিকের নিকট একস্থানে প্রাপ্ত একখানি তাম্রফলকে[১] এই শ্লোকটি এবং তৎপরবর্তী আরও সাতটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্লোকগুলির সার এই যে, কবি চক্রবর্তী ত্রিবিক্রমের পুত্র ভাস্করভট্টকে ভোজরাজ 'বিদ্যাপতি' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভাস্করভট্ট 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' প্রণেতা জ্যোতিষী ভাস্করাচার্যের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ।

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নার্য স্বরচিত 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে ভট্টভাস্করের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ধমান উপাধ্যায় এই ন্যায় গ্রন্থের যে টীকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই উভয় ভাস্করের মধ্যে ছয় পুরুষ ব্যবধান। প্রথিতযশা বাচস্পতি মিশ্র বেদান্তভাষ্যের টীকা ভামতীতে বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের মত খণ্ডন করিয়াছেন।

ইতিহাসে দুইজন ভোজরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়,—(১) পাঞ্চালরাজ মিহির ভোজ (রাজত্বকাল ৮৪০—৮৯০ খ্রী° অ°) এবং (২) মালবের অধিপতি ধারানগরীর ভোজরাজ (রাজত্বকাল ৯৯৬—১০৫১ খ্রী° অ°)। 'বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বলেন, 'মিহির ভোজ বৈদান্তিক ভাস্করকে বিদ্যাবত্তার জন্য উপাধিতে ভূষিত করেন।' সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক বলেন, "বৈদান্তিক ভাস্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করেন। খ্রী° নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ভোজরাজ মিহিরের সময় "বিদ্যাপতি" উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাচস্পতি মিশ্র এবং উদয়নাচার্যের পূর্ববর্তী।"

জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য স্বীয় 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে নিজের জন্ম শক ১০৩৬ বলিয়া লিখিয়াছেন। ১০৩৬ শক = ১১১৪ খ্রী° অ°। ১১৫০ খ্রী° অব্দে তাঁহার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থ রচিত হয়। গড়পড়তা প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে ৬ পুরুষে ১৫০ বৎসর হয়।

---

১ শ্রীভাস্করাচার্য বিরচিতস্য শারীরকমীমাংসা ভাষ্যস্য ভূমিকার ৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে দেখা যায় যে, আনুমানিক (১১১৪—১৫০) ৯৬৪ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভট্টভাস্করের জন্ম হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার বিদ্যাবত্তার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়া সম্ভবপর। তাহা হইলে, মালবের অধিপতি ভোজরাজ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, এই প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু, ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ হইবে উদয়নাচার্য এবং বাচস্পতি মিশ্রের জীবিতকালের প্রমাণ দ্বারা ভাস্করাচার্যের সময় নিরূপণ করা। উদয়নাচার্য স্বীয় 'লক্ষণাবলী' গ্রন্থে একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে, ৯০৬ শকে গ্রন্থখানি রচিত হয়। সুতরাং তিনি ৯০৬ শকাব্দে জীবিত ছিলেন ৯০৬ শক = ৯৮৪ খ্রীঃ অঃ। উদয়নাচার্য অপেক্ষা বাচস্পতি মিশ্র অনেক প্রাচীন ছিলেন। 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে' স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বলেন যে, 'লক্ষণাবলী' বিরচিত হইবার ১৪২ বৎসর পূর্বে বাচস্পতি "ন্যায়সূচী নিবন্ধ" বিরচন করেন। সুতরাং (৯০৬-১৪২) অর্থাৎ ৭৬৪ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ৮৪১ কি ৮৪২ খ্রীঃ অব্দে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থের প্রণয়ন কাল বাচস্পতি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—"বস্বঙ্কবসু বৎসরে" বসু—অঙ্ক—বসু = ৮৯৮। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক মহাশয় 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বস্বঙ্কবসু এই অঙ্ক সংবৎ কি শকাব্দ তাহা বাচস্পতি উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু 'বৎসর' শব্দ দ্বারা সংবৎ গ্রহণ করিবার রীতি আছে। বিশেষতঃ বাচস্পতি উদয়নাচার্যের সমসাময়িক নহেন, পরন্তু অনেক প্রাচীন। ... উদয়ন ৯০৬ শকে 'লক্ষণাবলী' রচনা করেন। ... ৯০৬ শক = ৯৮৪ খ্রীঃ অঃ। এরূপ অবস্থায় বাচস্পতিকে ৮৯৮ সংবতে স্থাপন করাই যুক্তিসঙ্গত। ৮৯৮ সংবৎ = ৮৪১ খ্রীঃ অঃ। উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে বাচস্পতি মিশ্র নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন ইহা অবধারণ করা যায়।"

মিহির ভোজের রাজত্বকাল ৮৪০-৮৯০ খ্রীঃ অঃ। ইহা অনুমান করা অসংগত নহে যে, মিহির ভোজের রাজত্বের প্রারম্ভে ভাস্করাচার্যের বৃদ্ধাবস্থা এবং বাচস্পতি মিশ্রের যৌবন।

শঙ্কর ও ভাস্কর সমসাময়িক বলিয়া মাধবাচার্য-কৃত 'শঙ্কর বিজয়' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, ভাস্কর নামে অনেক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কোন্ ভাস্কর বলা কঠিন। তবে যদি শঙ্করাচার্যের কাল ম্যাক্সমুলার সাহেবের মতানুযায়ী ৭৮৮-৮২০ খ্রীঃ অঃ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতগণ শঙ্করের কাল ৬৮৬—৭২০ খ্রীঃ অঃ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হয়বদন রাও সম্পাদিত শ্রীকরভাষ্যের ভূমিকায় বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যের কালনিরূপণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় তাঁহার মতে ভাস্করের সময় একাদশ খ্রীষ্টশতক। কিন্তু, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী বলেন অষ্টম শতাব্দী।

এই সকল আলোচনার ফলে ভাস্করাচার্যের কাল খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। তাম্রফলকে লিখিত ভট্টভাস্কর সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার ভাস্করভট্ট বিদ্যাপতির নামের পূর্বে 'ত্রিদণ্ডীমঠভাষ্যকার' উপাধি যুক্ত থাকায় তিনি ত্রিদণ্ডী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কাহারও কাহারও মতে ভট্টভাস্কর নিম্বার্কীয় বৈষ্ণব ছিলেন। এখন পর্যন্ত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এমন বিশেষ কোন সুদৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে নাই। যাহাতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিক ভট্টভাস্কর নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যকার ভট্টভাস্কর এই বৈদান্তিক ভট্টভাস্কর হইতে পৃথক ব্যক্তি। পূর্বোক্ত ভট্টভাস্কর ত্রিকাণ্ডমণ্ডন ভট্টভাস্কর নামেও পরিচিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত হয়বদন রাও বলেন ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

একটী কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিকযুক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইলে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসকে কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সহজে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এইস্থলে এই কথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ কেহ ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কাচার্যকে পৃথক ব্যক্তি না বলিয়া, একার্থবোধক বলিয়া থাকেন, এবং বলেন যে, ভাস্করাচার্যই পরে নিম্বার্কাচার্য নামে পরিচিত হন। এইস্থলে মাত্র তিনটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি;

(১) বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী-বিরচিত —এই গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য ছিল।"

(২) উক্ত গ্রন্থের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় আছে,—'আমাদের মনে হয় বৈদান্তিক ভট্টভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মতসাদৃশ্যের জন্যও নামসাদৃশ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয়, ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিম্বার্ক 'বেদান্তপরিজ্ঞাত সৌরভ' প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের কাল অষ্টম শতাব্দী। নিম্বার্ক ভাস্করের পরবর্তী। তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিলাম।'

(৩) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য এম্, এ, প্রণীত 'শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও তাঁহার ধর্মমত' নামক পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"৺অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁহার 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক গ্রন্থে নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ নিম্বার্কাচার্য ও ভাস্করাচার্যকে পৃথক পৃথক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এরূপ ধারণার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদবাদ এবং নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ একই। নিম্বাদিত্য ও ভাস্করাচার্যের নামের পশ্চাতে কিম্বদন্তী একই।"

প্রত্যুত্তরে, এই স্থলে জনৈক নিরপেক্ষ লেখকের উক্তি (১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, মহাশয়ের লিখিত "বৈষ্ণবমত বিবেক" নামক প্রবন্ধ) উদ্ধৃত করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতেছি;—"এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকমতে ব্যক্তিগণের মতে শ্রীমদ্ভাস্করাচার্যই

ভেদাভেদবাদের সর্বপ্রথম প্রবর্তক। ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কাচার্য একার্থবোধক, অতএব শ্রীমন্নিম্বার্কের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল না। বৈদান্তিক ভাস্করাচার্যই পরবর্তীকালে সম্প্রদায় কর্তৃক নিম্বার্কনামে অভিহিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্যই ঐ ভাস্করসম্প্রদায়ই পরবর্তীকালে নিম্বার্কসম্প্রদায় নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছেন। এই মত এত অসার, অনৈতিহাসিক ও অমূলক যে, ইহার আলোচনা করাও অনাবশ্যক মনে করি। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন সম্প্রদায়কে যাঁহারা এইরূপ ভাবে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদের বুদ্ধির কোনও রূপে প্রশংসা করিতে পারিনা। ভগবান্ নিম্বার্কদেব ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি নিজে আবির্ভূত হইয়া জীবের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া যে সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়া "বেদান্ত পারিজাত সৌরভ" নামক বেদান্তভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রাচীনকালে বর্তমান কালের বৈষয়িক-জ্ঞানপ্রধান ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রথা না থাকায় শ্রীল নিম্বার্কদেবের জীবনকথা বিস্তৃতভাবে জানিতে পারা যায় না, একথা সত্য; কিন্তু সুপ্রাচীন মহাজনগণের বা অবতারকল্প মহাপুরুষের বৈষয়িক-জ্ঞান-প্রধান ইতিহাস রক্ষা করা হয়ত তখনকার স্বাধীন উন্নত জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হয় নাই। একথাও অসম্ভব নহে যে, নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব ও বিধর্মীর অত্যাচারে বহু ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাসগ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

ভক্তিরত্নাকর প্রণেতা কবি ৺নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত "ব্রজ পরিক্রমা" নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত এবং ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক "ব্রজের পুরাবৃত্ত" লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি বলেন, "মথুরামণ্ডলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনেক কীর্তি ও শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল,—অরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।"

কাশীর চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থপ্রকাশ কার্যালয় হইতে ভাস্করাচার্যের ব্রহ্ম সূত্রভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ১৫৪৬ শকাব্দায় বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত একখানা হাতের লেখা প্রাচীন পুঁথি হইতে এবং দেবনাগর হস্তাক্ষরে লিখিত অন্য একখানা পুঁথির সহিত পাঠ মিলাইয়া এই ভাষ্যখানা প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে ভাস্করাচার্য কেবল বাদরায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়াছেন;—

"জন্মবন্ধবিনিবৃত্তি কারণম্ ব্রহ্মসূত্রমিদমুদ্‌বভৌ যতঃ।
শ্রোতৃচিত্তকমলৈকভাস্করম্ বাদরায়ণঋষিং নমামি তম্॥"

পরবর্তী শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য,—

"সূত্রাভিপ্রায়সংবৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ।
ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥"

শঙ্করাচার্যের পর ভাস্করাচার্যের আবির্ভাব। এই শ্লোকটিতে শঙ্করভাষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত অসংগত নহে।

ঋষি

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল, পুরাণরত্ন, এম্-এ.

শিবের তাণ্ডব আরম্ভ হইয়াছে। মনে হয় জগতের পুনরায় ব্যবস্থার প্রয়োজন। সেই ব্যবস্থার নিয়ন্তা হইবেন কে? ঋষি দ্রষ্টা। দ্রষ্টাত সবই ঋষি—সত্যদ্রষ্টা, জ্ঞান ও সংসারে পারদর্শী। তাই 'নাট্যশাস্ত্র' প্রণেতা ভরত মুনি লিখিয়াছেন—"জ্ঞান সংসারয়োঃ পারগন্তা" সেই দ্রষ্টার দৃষ্টি কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, দেশ বিভাগে বিভক্ত হয় না, ব্যক্তিবিশেষে নানা-রকম হয় না। তাহা গঙ্গা-প্রবাহের মত অচ্ছেদ্য। স্থান কাল পাত্র বিশেষের বুদ্ধি বা দৃষ্টি এই দৃষ্টিতে সূত্রে মণিগণের মত গ্রথিত। সেই ঋষি বেদ। যাস্কাচার্য তাঁহার 'নিরুক্ত' গ্রন্থে বেদকে ঋষি বলিয়াছেন। 'মেদিনীকোষ' বোধ হয় যাস্কাচার্যের মতই গ্রহণ করিয়াছেন, তাই ঋষিশব্দের পর্যায়ে লিখিয়াছেন—"বেদঃ"। এখন প্রশ্ন হইতে পারে ঋষি না বলিয়া বেদ বলিলেই ত সব হাঙ্গামা মিটিয়া যায়, ঋষির অর্থ বেদ দেখাইতে গিয়া এত কারসাজি কেন? প্রয়োজন আছে। 'বিদ্' ধাতু 'অল্' প্রত্যয় করিয়া বেদ শব্দ নিষ্পন্ন। অল্ প্রত্যয় ভাববাচ্যে হইয়াছে। তাহাতে দ্রষ্টৃত্ব বা দৃষ্টিক্রিয়ার কর্তৃত্ব বোঝায় না। আমরা নিয়ন্তাকে দ্রষ্টা বলিতে চাই। সুতরাং 'ঋষী গতৌ'—পাণিনির এই অনুশাসন মানিয়া কর্তৃবাচ্যে ইক্ করিয়া ঋষি শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে।

সেই ঋষির উপদেশ অনেকস্থলে আমরা আখ্যায়িকারূপে পাই। সহজে বুঝিবার জন্য আখ্যায়িকার অবতারণা। আখ্যায়িকা নিজে অর্থবাদ বলিয়া মিথ্যা হউক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অব্যাহত সত্য। তাই মীমাংসকরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অর্থবাদের স্বতঃ প্রামাণ্য নাই কিন্তু যখন বিধিবাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা হয় তখন তাহার প্রামাণ্য আছে। এরূপ একখানা আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে বৃহদারণ্যকোপ-নিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে। তাহারই উদ্দেশ্য আজ আমরা আলোচনা করিব। এই যথার্থ দৃষ্টি যুগসন্ধ্যায় জগদ্ব্যবস্থার ভিত্তি দেখাইবে।

দেবতা, মানুষ ও অসুর তিনই প্রজাপতির সন্তান; তাঁহারা প্রজাপতির গৃহে ব্রহ্মচারি-রূপে বাস করিতেছিলেন। ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া দেবতারা প্রজাপতিকে বলিলেন—আমাদিগকে উপদেশ দিন। প্রজাপতি একটী মাত্র অক্ষর উচ্চারণ করিলেন "দ"। প্রজাপতির সন্দেহ হইল এই দকারের অর্থ দেবতারা বুঝিয়াছেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যজ্ঞাসিষ্টাত ইতি"—বুঝিয়াছ কি? দেবতারা বলিলেন 'আজ্ঞে হাঁ বুঝিয়াছি,' "দাম্যত" 'আমাদিগকে সংযমী হইতে উপদেশ দিয়াছেন'। প্রজাপতি বলিলেন—'হাঁ ঠিক বুঝিয়াছ।' তাহার পর মানুষ শিষ্য। তাহাদিগকেও সেই 'দ' উপদেশ দিয়া প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—বুঝিয়াছ? মানুষগণ বলিলেন "দত্ত"—'দানশীল হইতে বলিয়াছেন।'

প্রজাপতি বলিলেন 'ঠিক্'। আবার যখন অসুরগণ উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, প্রজাপতি সেই পুরাতন অক্ষরটী বলিলেন—'দ' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে অসুরগণ বলিলেন—আজ্ঞে দকারের অর্থ 'দয়ধ্বম্'—'দয়া করিতে শিখ।' প্রজাপতি পুত্রতুল্য তিনটী শিষ্যেরই নিকট একটী মাত্র অক্ষর 'দ' উচ্চারণ করিলেন? আর কেনই বা তিনজন তিন রকম অর্থ করিলেন। আর কিভাবে প্রজাপতি তিনজনকেই 'ঠিক বুঝিয়াছ,' এই কথা বলিতে পারেন। ভাষ্যকার তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

'অত্রৈক আহুঃ অদান্তত্বাদাতৃত্বাদয়ালুত্বৈঃ অপরাধিত্বমাত্মনো মন্যমানাঃ শঙ্কিতা এব প্রজাপতৌ উষুঃ। কিংনো বক্ষ্যতীতি। তেষাঞ্চ দকারশ্রবণমাত্রাদেব আত্মশঙ্কাবশেন তদর্থ প্রতিপত্তিরভুৎ।'

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন—দেবতারা যখন প্রজাপতির নিকট ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিতে ছিলেন তখন তাঁহারা নিজ নিজ দোষ—অদান্তত্ব, অদাতৃত্ব, অদয়ালুত্ব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। এবং প্রজাপতি কি বলিবেন এভাবও তাঁহাদের মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। সুতরাং তাঁহারা প্রজাপতির মুখ হইতে দকার শুনিবামাত্র আপন আপন শঙ্কা অনুসারে দকারের অর্থ গ্রহণ করিলেন। উত্তরটী বাস্তবিকই মনোবিজ্ঞান-অনুযায়ী হইয়াছে যদিও ভাষ্যকার বলিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন ইত্যাদি। তবুও এই মত ভাষ্যকারেরও অভিপ্রেত। তাই আনন্দগিরি টীকাতে লিখিয়াছেন—'পরোক্তং পরিহারম-ঙ্গীকৃত্য'—ইত্যাদি। টীকাকার যথার্থই বলিয়াছেন—কারণ ছান্দোগ্যোপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদেও ভাষ্যকার তাহাই সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, চিত্তগত গুণদোষের জন্যই এক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়। "স্বচিত্ত গুণদোষ বংশাদেব হি শব্দাবধারণং তুল্যেঽপি শ্রবণে খ্যাপিতম্। দাম্যত-দত্ত-দয়ধ্বম্ ইতিদকারমাত্রশ্রবণাৎ শ্রুত্যন্তরে"। অবশ্য গো শব্দের অর্থ যাহারা গলকম্বলযুক্ত একটী চতুষ্পদ জন্তু বলিয়া জানেন, তাঁহারা গো বলিলে সেই জন্তুটীকেই বুঝিবেন। এই বুদ্ধি শব্দের শক্তি বা অভিধা হইতেই হয়। এইরূপে শব্দের সঙ্গে শব্দের অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা নিত্য বলিয়া মীমাংসা দার্শনিকরা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শব্দের অভিধামূলক অর্থ জানেন না তাঁহাদের পক্ষে একটী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক, ইহাতে বুদ্ধির বিচিত্রতা প্রমাণিত হয়। দেবতাদেরও তাই ঘটিয়াছে। লক্ষ্য করিবেন, এখানে ঋষি প্রজাপতির মুখ দিয়া তিনটী উপদেশ দিয়াছেন—দেবতার জন্য 'সংযম', মানুষের জন্য 'দান', অসুরের জন্য 'দয়া'। এই অনুশাসন পৃথক পৃথক ব্যক্তির জন্য হইলেও মানুষের পক্ষে তিনটীই পালনীয়। কারণ তিনটী উপদেশই জগতের হিতসাধন করিবে। হিতজ্ঞ পিতা প্রজাপতি পুত্রের হিতের জন্যই এই উপদেশ দিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—

'প্রজাপতেঃ পুত্রা দেবাদয়স্ত্রয়ঃ, পুত্রেভ্যশ্চ হিতমেব পিত্রোপদেষ্টব্যম্। প্রজাপতিশ্চ

হিতজ্ঞো নান্যথোপদিশতি ; তস্মাৎ পুত্রানুশাসনং প্রজাপতেঃ পরমমেতৎহিতম্। অতো মনুষ্যৈরেব এতৎত্রয়ং শিক্ষিতব্যম্ ইতি।'

আর যাঁহারা দেবাদির অস্তিত্বে সন্দিহান এবং মানুষকেই গুণের তারতম্যে দেবাসুর বলিতে চান তাঁহাদের মতে মানুষই এই তিনটী উপদেশ আচরণ করিবে—দম-দান-দয়া।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এরূপ একদল নির্দেব দার্শনিক ছিলেন। তাঁহারা কর্মমীমাংসক নামে পরিচিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত—দেবতার কোন বিগ্রহ নাই, দেবতা মন্ত্রময়ী। ভাষ্যকার তাঁহাদেরই মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

'অথবা ন দেবা অসুরা ধান্যে কেচন বিদ্যন্তে মনুষ্যেভ্যঃ। মনুষ্যাণামেব অদান্তা যে অন্যৈরুত্তমৈর্গুণৈঃসম্পন্নাস্তেদেবাঃ, লোভপ্রধানা মনুষ্যাঃ তথা হিংসাপরাক্রূরা অসুরাঃ। তে এব মনুষ্যা অদান্তত্বাদিদোষত্রয়মপেক্ষ্য দেবাদিশব্দভাজো ভবন্তি। ইতরাংশ্চ গুণান্ সত্বরজস্তমাংসি অপেক্ষ্য। অতো মনুষ্যৈরেব শিক্ষিতব্যমেত্যত্রয়মিতি।'

ইহার অর্থ এই—অথবা মানুষ ছাড়া দেবতা বা অসুর বলিয়া কেহ নাই। মানুষের মধ্যেই যাহারা অদান্ত কিন্তু অপরাপর গুণের দ্বারা ভূষিত তাহারাই দেবতা। যাহারা লোভী তাহারা মানুষ, এবং যাহারা হিংসাপরায়ণ নির্দয় তাহারাই অসুর। অথবা সত্ব রজঃ ও তমোগুণভেদে মানুষকেই দেবতা, মানুষ ও অসুর বলা হয়। সুতরাং এই উপদেশ তিনটী মানুষেরই শিক্ষার জন্য। ইহাতে কেহ আশঙ্কা করিবেন না যে শঙ্করাচার্যও একজন নির্দেব দার্শনিক ছিলেন। তিনি এই কর্মমীমাংসকদের মত উদ্ধৃত করিয়া শুধু দেখাইলেন—যে এই মতে ও 'দম, দান, দয়া' তিনটিই মানুষের পক্ষে আচরণীয়। দেবতার অস্তিত্ব নিরাস করিতে ভাষ্যকার এই মত উদ্ধৃত করেন নাই। তাহা যে তিনি পারেন না, কারণ তিনি স্বয়ংই এই নির্দেব মত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনের দেবতা অধিকরণে খণ্ডন করিয়াছেন। এবং দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব এমন কি প্রত্যক্ষত্বও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি "ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তিহি" এই সূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—"প্রত্যক্ষাদিমূলমপি সংভবতি। ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্যতে। যস্তু ব্রূয়াদিদানীংতনানামিব পূর্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্‌বৈচিত্র্যং প্রতিষেধঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ দেবাদির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষমূলকও বটে। হইতে পারে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু প্রাচীনদের ইহা প্রত্যক্ষীভূত ছিল। যেমন ব্যাস প্রভৃতি দেবাদির সঙ্গে আলাপালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে। যাঁহারা বলিতে চান আজ যেমন আমরা দেবাদিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা পূর্বেও তেমন ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা জগদ্‌ বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিতে চান ইত্যাদি। আবার ভাষ্যকারের "অথবা" এই পক্ষান্তর গ্রহণের বলে যদি কেহ এই বলিয়া সমাধান করিতে চান যে উপনিষদের ভাষ্য করিবার সময় শঙ্করাচার্য মীমাংসক ছিলেন এবং পরে সূত্রভাষ্য রচনা কালে সেই মত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে ইহা নিতান্তই হাস্যকর ও অসঙ্গত

যুক্তি হইবে। রাজনীতি ক্ষেত্রেই এত দ্রুত সুবিধাবাদী হওয়া যায়। উপনিষদ্ ও সূত্র-ভাষ্যের বেলা তাহা সম্ভব হয় না। কারণ উপনিষদ্ ও সূত্রভাষ্যের মত এক হওয়া চাই। বেদান্তসূত্র উপনিষদ্-মূলক। "বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্"। বাদরায়ণ নিজের কোন বিষয় লইয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। উপনিষদেরই সন্দিগ্ধস্থল 'অধিকরণের বিষয়' (Subject of the topic) করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, অনেক আধুনিক সমালোচক আচার্যের উপনিষদ্ ও সূত্র ভাষ্য সম্বন্ধে এইরূপ বালক-সুলভ উক্তি করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, আমরা উপাখ্যানটী শেষ করিয়াছি। ঋষি যে বাণী দিয়াছেন তাহা 'দৈবী বাক্'। ঋষির বাণী কালবিশেষের জন্য নয়, দেশবিশেষের জন্য নয়, লোকবিশেষের জন্য নয়, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। ইহাতে স্বার্থগন্ধ নাই বলিয়া ঋষির এই সত্যানুশাসন দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্। ইহা অনুসরণ করিলে, জগতে 'ভারসাঁই' বা তদনুরূপ কোন সন্ধির অনুসরণ করা হইবে না। ইহাতে বাস্তবিকই বিশ্বশান্তি সাধিত হইবে, জগদ্ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে। আমরা অনেক সময় চক্ষু রুদ্ধ করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিতে চাই। যত্ন না করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে চাই। কিন্তু সত্যকে তো কখনও অতিক্রম করা যায় না। অতিক্রম করা যায় না বলিয়া ইহাই সত্য, ইহাই ঋষির দৃষ্টি। অদ্বৈত বেদান্তে সত্যের লক্ষণ করা হইয়াছে—'অবাধিতত্বং সত্যত্বম্'। যাহা কখনও বাধিত হয় না তাহাই সত্য। সত্য বিস্মৃত হইতে পারে, উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু সত্য নাই এ কথা কেহ ধারণা করিতে পারে না; কারণ বিরোধ (Contradiction) উপস্থিত হয়। তাই 'পূরবী'তে কবি বলিয়াছেন—

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয়
অস্থির আঘাতে না টলে।

আমাদের স্মৃতিবিভ্রম হইতে পারে, আমাদের স্বার্থবুদ্ধি, আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে পারে, আমরা সেই কল্যাণময় রূপ দেখিতে না পারি, ভাবিতে না পারি, তাই ঋষি সেই লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য বলিতেছেন—তোমরা শুনিতেছ না অনুশাসন মেঘধ্বনিতে নিয়তই রণিত হইতেছে—'দ-দ-দ ইতি। দাম্যত দত্ত দয়ধ্বমিতি। মানুষ তুমি অদান্ত, মানুষ তুমি লুব্ধ, মানুষ তুমি ক্রূর তাই তোমার শিক্ষা—'দমং দানং দয়ামিতি'। আজ তুমি তোমার প্রতিবেশীর যথাসর্বস্ব হরণ করিয়াছ, কাল হয়তো তোমারও সব কিছু হৃত হইবে। জগতে যেমন বুদ্ধিবৈচিত্র্য আছে তেমনই বলবৈচিত্র্যও আছে। ইহাতে জগদ্ব্যবস্থা হয় না। সুতরাং সত্যদ্রষ্টা ঋষিই হইবেন জগতের নিয়ন্তা—ইহাতে মানবের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ। তাই তাঁহার বাণী চির রহস্যময়, চির পুরাতন ও চির নূতন।

'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ, কস্যস্বিদ্ ধনম্'। ত্যাগের ভিতর যে আনন্দ আছে তাই ভোগ কর পরধনে লোভ করিও না।

মহানির্বাণ তন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

বাহ্য পূজা ও মানস পূজা ভেদে পূজা আবার দুই প্রকার। বাহ্য পূজা সাধারণতঃ প্রতিমায় বা যন্ত্রে করা হয়। উভয়বিধ পূজাতেই পূর্বোল্লিখিত উপচার ব্যবহৃত হয়। বাহ্য পূজায় স্থূল উপচার এবং মানস পূজায় এই সকল স্থূল উপচারের বদলে হৃদয়াদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এবং কোন কোন বৃত্তিকে (Faculty) উপচাররূপে প্রদান করা হয়। যেমন হৃদয়কে আসন স্বরূপ, মনকে পুষ্প স্বরূপ, প্রাণকে ধূপ স্বরূপ ইত্যাদি। মহানির্বাণ তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসের ১৪২ শ্লোক হইতে ১৫২ শ্লোক পর্যন্ত মানস পূজা বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্য পূজায় আবার আসন শুদ্ধি, বিজয়া শোধন (কেবল তান্ত্রিক পূজায়) ভূতশুদ্ধি ও তদঙ্গীভূত প্রাণ প্রতিষ্ঠা, প্রাণায়াম্, ন্যাস, ধ্যান, জপ ও স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি করিতে হয়। বাহ্য পূজায়ও মানস পূজা করা বিধেয় এবং মানস পূজার পর জপ করিয়া তৎপর বাহ্য পূজা করিতে হয়। (১) আসন শুদ্ধি—ইহা দুই প্রকারে করা হয়। সাধারণতঃ "কলীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসন শুদ্ধি করা হয়। অন্য প্রকার আসন শুদ্ধি—পূজক বা সাধক আসনে বসিয়া ভাবিবেন যে, তিনি গোল পৃথিবীর উপর বসিয়া আছেন এবং পৃথিবী তাহাকে লইয়া সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছেন ও তিনি সূর্যের জ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া আছেন। এইরূপ ভাবনা করা কালে মনে মনে নিম্নের মন্ত্র আওড়াইতে হয়। মন্ত্র যথাঃ—

পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকাং দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

(২) বিজয়া শোধন—ইহার প্রক্রিয়া মহানির্বাণ তন্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে ৮২ শ্লোক হইতে ৮৭ শ্লোকে লিখিত আছে। (৩) ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ইত্যাদি যে সকল ভূতে শরীর গঠিত, সেইগুলিকে বিলোম চিন্তা দ্বারা প্রকৃতিতে মিশাইয়া দেওয়াই ভূতশুদ্ধি। সাধক স্বকীয় ক্রোড়ে হস্তদ্বয় উত্থানভাবে রাখিয়া হুং পুং বীজ দ্বারা মূলাধার পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে পৃথ্বী মণ্ডল হইতে স্বাধিষ্ঠান চক্রে আনয়ন করিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধতত্ত্বকে জলতত্ত্বে লীন করিবেন। তৎপর রসনার সহিত রসেন্দ্রিয় ও রসতত্ত্বকে অগ্নিতত্ত্বে, পায়ু, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও রূপতত্ত্ব সহিত অগ্নিতত্ত্বকে বায়ুতত্ত্বে, উপস্থ, ত্বগেন্দ্রিয় ও স্পর্শতত্ত্ব সহিত বায়ুতত্ত্বকে আকাশতত্ত্বে, বাক্-শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও শব্দতত্ত্বকে অহঙ্কার-তত্ত্বে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতত্ত্বে এবং বুদ্ধিতত্ত্বকে প্রকৃতিতে লয় করিবেন। ইহার পর পাপ দেহকে শোধন, দাহন ও অমৃত বারিদ্বারা আপ্লাবিত করিয়া নিজ দেহকে দেবতাময় ভাবনা করিলেই ভূতশুদ্ধি করা হয়। (মহানির্বাণ তন্ত্রের ৫ম উল্লাসের ৯৩ হইতে ১০৩ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।

পাপদেহ দগ্ধ করার পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। তান্ত্রিক পূজায় হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্বক "আং হ্রীং ক্রোং হংস সোঽহং" এই মন্ত্র পাঠে আপন দেহে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে

হয় (মহানির্বাণ তন্ত্র ৫ম উঃ, ১০৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কোন কোন স্থলে তান্ত্রিক পূজায় শুধু একটী মন্ত্র দ্বারা ভূতশুদ্ধি করা হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ ধর্মস্কন্ধসমুদ্ভূতং জ্ঞানানলসুশোভনম্।
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরবৈরাগ্যকর্ণিকম্॥
স্বীয় হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্।
কৃত্বা তৎ কর্ণিকা সংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্॥
জীবাত্মানং হৃদিধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীং।।
সুষুম্না বর্ত্মণাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

এই মন্ত্রের ভূতশুদ্ধি করা হইলেও মনে মনে মন্ত্রার্থ চিন্তা করিতে হয়। (৪) প্রাণায়াম—(এই ভূমিকার পরে দ্রষ্টব্য) । (৫) ন্যাস—বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সহ হস্তাঙ্গুলি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংলগ্ন করার নাম ন্যাস। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তিকে কার্যোপযোগী করাই ন্যাসের উদ্দেশ্য। চিত্তশুদ্ধি করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ন্যাস বহু প্রকার, যথা—(১) জীবন্যাস (২) মাতৃকান্যাস (৩) ঋষিন্যাস (৪) ষড়াঙ্গন্যাস (৫) পীঠন্যাস ও (৬) ব্যাপকন্যাস।

(ক) জীবন্যাস—আপন দেহে পূজিতা দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার নাম জীবন্যাস (প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপরে দ্রষ্টব্য)

(খ) মাতৃকান্যাস দ্বিবিধ—অন্তর মাতৃকান্যাস ও বাহ্য মাতৃকান্যাস।

অন্তর মাতৃকান্যাস—আজ্ঞা চক্র হইতে মূলাধার চক্র পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন চক্রের বিভিন্ন দলে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ বিন্যস্ত করার নাম অন্তর মাতৃকান্যাস। যথা—দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞা চক্রে 'হং নমঃ ক্ষং নমঃ'। ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্রে অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ঌং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নম ওঁং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ। দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহত পদ্মে কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ। দশ-দলবিশিষ্ট মণিপুর চক্রে ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ। ষড়দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান চক্রে বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ। চতুর্দলবিশিষ্ট মূলাধার চক্রে বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ।

বাহ্য মাতৃকান্যাস—অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যথাক্রমে নিজ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিন্যাস করার নাম বাহ্য মাতৃকান্যাস। এই ন্যাসে প্রথমতঃ মাতৃকা-দেবীর ধ্যান করিতে হয়[১]। মাতৃকাদেবীর মস্তকে স্বরবর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি

১ পঞ্চাশৎ লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষঃ স্থলাং।
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্র সকলামাপীন তুঙ্গস্তনীম্॥
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈং বিভ্রাণাং।
বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে॥

থাকায় নিজ শরীরে এইরূপ ন্যাস করার বিধি। স্বরবর্ণগুলি যথাক্রমে কপাল, মুখ, দক্ষিণ এবং বাম চক্ষু, দক্ষিণ ও বাম কর্ণ, দক্ষিণ ও বাম নাসিকা, দক্ষিণ ও বাম গণ্ডের উপর ; নিম্ন ও উপর ওষ্ঠ, উর্ধ্ব ও নিম্ন দন্ত পংক্তি, মস্তক এবং মুখগহ্বরে প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যঞ্জন বর্ণ মধ্যে ক হইতে অন্ত্যস্থ ব পর্যন্ত বর্ণগুলি দক্ষিণ ও বাম হাতের মূলে বা গোড়ায় (কাণ্ডের সহিত যে স্থলে সংযুক্ত আছে) ও কনুইয়ের গোড়ায়, কজায় (মণিবন্ধ) আঙ্গুলের অগ্রভাগ, ও অঙ্গুলীমূলে। এইভাবে বাম বাহুতে, দক্ষিণ ও বাম পদে, দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, নাভিদেশে, উদরে, হৃদয়ে, দক্ষিণ ও বাম স্কন্ধে, ককুদে (উভয় স্কন্ধের মধ্য প্রদেশ) বিনিয়োগ করিয়া পরে হৃদয় হইতে দক্ষিণ করতল পর্যন্ত 'শ', হৃদয় হইতে বাম করতল পর্যন্ত 'ষ', হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদ পর্যন্ত 'স', হৃদয় হইতে বাম পদ পর্যন্ত 'হ', এবং হৃদয় হইতে উদর পর্যন্ত 'ক্ষ' বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই সব বর্ণ প্রয়োগে সর্বাগ্রে ওঁ এবং সর্বশেষে 'নমঃ' ব্যবহার করিতে হয়। যথা—কপালে ওঁ অং নমঃ, মুখে—'ওঁ আং নমঃ', দক্ষিণ নেত্রে—'ওঁ ইং নমঃ, বাম নেত্রে—'ওঁ ঈং নমঃ', দক্ষিণ কর্ণে—ওঁ উং নমঃ, বাম কর্ণে—ওঁ ঊং নমঃ', দক্ষিণ নাসিকায়—'ওঁ ঋং নমঃ', বাম নাসিকায়—'ওঁ ৠং নমঃ', দক্ষিণ গণ্ডে—'ওঁ ঌং নমঃ, 'বাম গণ্ডে—'ওঁ ৡং নমঃ', উপরের ঠোঁটে বা ওষ্ঠে—'ওঁ এং নমঃ', অধরে বা নীচের ঠোঁটে—'ওঁ ঐং নমঃ', উপরের দন্তপংক্তিতে—'ওঁ ওং নমঃ', নীচের দন্ত পংক্তিতে—'ওঁ ঔং নমঃ', ব্রহ্মরন্ধ্রে বা তালুমূলে —'ওঁ অং (অনুস্বার) নমঃ' এবং মুখগহ্বরে—'ওঁ অঃ (বিসর্গ) নমঃ'।

ব্যঞ্জন বর্ণ বিন্যাস, যথা—দক্ষিণ বাহুমূলে "ওঁ কং নমঃ" দক্ষিণ কর্পূর বা কনুইয়ে "ওঁ খং নমঃ," দক্ষিণ মণিবন্ধে "ওঁ গং নমঃ" দক্ষিণ অঙ্গুলীমূলে "ওঁ ঘং নমঃ," দক্ষিণ অঙ্গুল্যাগ্রে "ওঁ ঙং নমঃ," বাম বাহুমূলে "ওঁ চং নমঃ", বাম বাহুমধ্যে বা কনুইয়ে "ওঁ ছং নমঃ" বাম মণিবন্ধে "ওঁ জং নমঃ" বাম অঙ্গুলীমূলে "ও ঝং নমঃ" বাম অঙ্গুল্যাগ্রে "ওঁ ঞং নমঃ, দক্ষিণ পাদমূলে "ওঁ টং নমঃ", দক্ষিণ পদের মধ্যভাগে "ওঁ ঠং নমঃ", দক্ষিণ গুল্‌ফে "ওঁ ডং নমঃ", দক্ষিণ অঙ্গুলীমূলে "ওঁ ঢং নমঃ", দক্ষিণ পদের অঙ্গুল্যাগ্রে "ওঁ ণং নমঃ", বাম পাদমূলে "ওঁ তং নমঃ" বাম পদের মধ্যভাগে "ওঁ থং নমঃ" বাম পায়ের গুল্‌ফে "ওঁ দং নমঃ" বাম পায়ের অঙ্গুলীমূলে "ওঁ ধং নমঃ", বাম অঙ্গুল্যাগ্রে "ওঁ নং নমঃ", দক্ষিণ পার্শ্বে "ওঁ পং নমঃ", বাম পার্শ্বে "ওঁ ফং নমঃ", পৃষ্ঠদেশে "ওঁ বং নমঃ", নাভিদেশে "ওঁ ভং নমঃ". উদরে "ওঁ মং নমঃ" হৃদয়ে "ও যং নমঃ" দক্ষিণ স্কন্ধে "ওঁ রং নমঃ, বাম স্কন্ধে "ওঁ লং নমঃ", ককুদে "ওঁ বং নমঃ", হৃদয় হইতে দক্ষিণ কর পর্যন্ত "ওঁ শং নমঃ", হৃদয় হইতে বাম কর পর্যন্ত "ওঁ ষং নমঃ" হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদ পর্যন্ত "ওঁ সং নমঃ'," হৃদয় হইতে বাম পদ পর্যন্ত "ওঁ হং নমঃ" হৃদয় হইতে উদর পর্যন্ত" ও ळং (বৈদিক) নমঃ এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্যন্ত "ওঁ ক্ষং নমঃ।"

ঋষিন্যাস[২] —চতুর্বর্গ লাভের উদ্দেশ্যে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, গুহ্যে, উভয় পদে ও সর্বাঙ্গে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। মন্ত্র যথা :—

২ দুর্গাপূজায় ভিন্ন রকমের ঋষিন্যাস আছে।

মস্তকে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।

মুখে—ওঁ গায়ত্রীছন্দসে নমঃ।

হৃদয়ে—ওঁ মাতৃকায়ৈ সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

গুহ্যে—ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যঃ বীজেভ্যো নমঃ (কেহ কেহ "ওঁ হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ" বলেন।)

পদদ্বয়ে—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

সর্বাঙ্গে—ওঁ বিসর্গায় কীলকায় নমঃ।

অন্য প্রকারের ঋষিন্যাস যথা :—

শিরে—ব্রহ্মণে ব্রহ্মর্ষিভ্যো নমঃ। মুখে—গায়ত্র্যাদিত্যসচ্ছন্দেভ্যো নমঃ।

হৃদয়ে—আদ্যায়ৈ কালীকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। সর্বাঙ্গে—গুহ্যে—ক্রীং বীজায় নমঃ। পদদ্বয়ে হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। সর্বাঙ্গে—শ্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

ষড়াঙ্গ ন্যাস—ষট্ অঙ্গন্যাস ও ষট্ করন্যাস।

(ক) অঙ্গন্যাস, যথা—অং—কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ

ইং—চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসি স্বাহা

উং—টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্

এং—তং থং দং ধং নং ঐং করবাভ্যাং হুম্

ওং—পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্

অং (অনুস্বার)—যং রং লং বং শং ষং সং হং লং (বৈদিক) ক্ষং

অঃ (বিসর্গ) করতল পৃষ্ঠ্যাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্

(খ) করন্যাস, যথা—অং—কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ

ইং—চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা

উং—টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্

এং—তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুম্

ওং—পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্

অং (অনুস্বার)—যং রং লং বং শং ষং সং হং লং (বৈদিক) ক্ষং

অঃ (বিসর্গ) করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

পীঠন্যাস—মাতৃকা স্থলে পীঠ প্রয়োগ করার নাম পীঠন্যাস; কাহারো মতে ৫১ পীঠ আবার কাহারো মতে ৫২ পীঠ।

একটি পুষ্প হাতে লইয়া আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ যোগ করিয়া হৃদয় প্রভৃতি স্থানে হস্তস্পর্শপূর্বক মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। যথা—

হৃদয়ে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কুর্মায় নমঃ,

ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীর সমুদ্রায় নমঃ,

ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিসন্তপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ,
ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।

দক্ষিণ স্কন্ধে—ও ধর্মায় নমঃ
বামস্কন্ধে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ
বামোরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ
দক্ষিণ উরুমূলে—ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ
মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ
বামপার্শ্বে—ও অজ্ঞানায় নমঃ
নাভিদেশে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ
দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ

আবার হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অং সূর্য-মণ্ডলায দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরামাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। পরে প্রদক্ষিণ দ্বারা হৃদয় পদ্মের পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্ট কেশরে ও পীঠশক্তি মধ্যে—আং প্রভায়ৈ নমঃ, ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, উং জয়ায়ৈ নমঃ, এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ, ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ, অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, অং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

ব্যাপকন্যাস—মূলমন্ত্র কিম্বা প্রণব উচ্চারণে হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পা পর্যন্ত এবং পা হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয পর্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণ পূর্বক শরীরের একেবারে নিকট দিয়া (স্পর্শ না করিয়া) হাত সঞ্চালন করিলেই ব্যাপক ন্যাস হয। ব্যাপক ন্যাস সাত বার কিম্বা নয় বার করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

ভাষা-তত্ত্ব

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনকালের মানবের, বর্তমানের ন্যায়, দেহগত ক্রিয়ার আধিক্য ছিল না। তাহাদের দেহের ক্রিয়া অনেক মৃদু ছিল তজ্জন্যই তাঁহাদের ভাষাতে সঙ্কোচাত্মক স্বর ও অনুনাসিকের প্রাধান্য ছিল। তৎকালীন জ্ঞানীরা তাঁহাদের নিজ অবস্থায় থাকিয়া তাঁহাদের অনুগামিগণের বোধগম্য করিবার জন্য যে সমূহ ভাষা ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের বিপরীত অবস্থাপন্ন বর্তমানের জীবের পক্ষে ঐগুলির মর্মার্থ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। পরবর্তীকালে মানব প্রকৃতিতে বহুবিধ কল্পনা প্রবেশলাভ করিয়া বহু ভাষার সৃষ্টি করতঃ মানব-প্রকৃতিতে বিপর্যয় আনয়ন করিয়াছে। তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষা-তত্ত্ব সুবিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। প্রবন্ধাকারে তাহার সম্যক আলোচনা করা দুরূহ। মোটামুটি যদ্দ্বারা বিষয়টার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, তাহাই সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য নিবেদন করা যাইতেছে। বস্তুতঃ ভাষা দ্বারা কদাচ অবস্থাজনিত জ্ঞান জন্মিতে পারে না। এইরূপ বলা হয় যে, যে সমূহ ধ্বনি দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করা যায় তাহাই ভাষা; কিন্তু কার্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমূহ ধ্বনি বা শব্দ দ্বারা প্রকৃত মনোভাব অব্যক্ত বা গোপন রাখা যায় তাহাই ভাষা। ভাষা না থাকিলে মিথ্যা, কপটতা, বঞ্চনা, আত্মগোপন ইত্যাদি সম্ভবই হইত না। ভাষা আত্ম-গোপনের একটা অমোঘ অস্ত্র। "করিয়াও করি নাই"——"না করিয়াও করিয়াছি" বলিয়া মিথ্যাচার, প্রতারণা ইত্যাদি ভাষামূলেই সম্ভব হইয়া থাকে। "হাঁ" কে "না," "না" কে "হাঁ" প্রতিপাদন করা ভাষামূলেই হয়। ভাষার অভাবে মানবেতর প্রাণীতে ছলনা, কপটতা, আত্মগোপন প্রভৃতি নাই, ঘৃণা, লজ্জাদি কল্পনাত্মক কোন অবস্থা নাই।* মানবেতর সর্বপ্রাণীতে কপটতাদি অপ্রকাশ, ভাষার প্রভাবে শুধু মানবেই তাহা স্বপ্রকাশ। যতইতি দ্বন্দ্বভাব তৎসমুদয়ের মূলেই ভাষা। স্বরূপতঃ ভাল মন্দ বলিয়া কোন বিষয় নাই, এই সমূহ অপেক্ষার বুদ্ধিমূলেও ভাষাই। কল্পনাই বস্তুতঃ ভাষার প্রাণ। এই ভাষার মূল কি এবং কি প্রকারে ইহা বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে তাহাই বিচার করা যাইতেছে।

ধ্বনি বা শব্দ দ্বিবিধ, যথা—ক্রিয়াবাচক ধ্বনি ও সংজ্ঞাবাচক ধ্বনি। দেহের ক্রিয়ামূলে ক্রিয়ানুরূপ স্বাভাবিক উৎপন্ন যে সমূহ ধ্বনি অর্থাৎ ক্রিয়ামূলে শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি মানসবিকার স্বতঃই উৎপন্ন করে যে সমূহ ধ্বনি, যাহাতে কোন প্রকার কল্পিত অর্থের সংস্রব থাকে না অর্থাৎ যাহা মনে কোন প্রকার বস্তুছবি বা আকার সংলগ্ন করে না অথচ শোক, হর্ষ, আবেগাদিভাব উৎপন্ন করে, যেমন মনুষ্য-কণ্ঠ নির্গত হাসি-

* এই মত সর্বদা গ্রাহ্য নহে।—সম্পাদক

কান্নাদি, মুরজ-মৃদঙ্গ-বাঁশি, ভেরী ইত্যাদির ধ্বনি পাশব শব্দ ইত্যাদি যাহা বুদ্ধিপূর্বক বা সংস্কার পূর্বক উচ্চারিত নহে অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ামূলে স্বতঃ উৎপন্ন ধ্বনি তাহাই ক্রিয়াবাচক ধ্বনি।

স্বাভাবিক গতি (বিক্ষেপনাত্মক ও আকুঞ্চনাত্মক) মূলে দেহে যে স্বাভাবিক ধ্বনি বা শব্দ তাহাতে অভেদে বর্তমান, এইগুলিরই বিভিন্নরূপ চালনা দ্বারা মানুষ কল্পনা করতঃ বিষয়কে ইচ্ছানুযায়ী বুঝিবার জন্য কতকগুলি কৃত্রিম ধ্বনি বা শব্দ গঠন করিয়া ঐ ধ্বনি বিষয়ে বা কল্পনাসৃষ্ট আকারে আরোপ করিয়া বিষয়কে বা ঐ আকারকে ঐ ধ্বনি বা শব্দ দ্বারা বুঝিতে অভ্যাস করে। এই যে কল্পনা-সৃষ্ট ধ্বনি তাহাই সংজ্ঞাবাচক ধ্বনি, নাম বা ভাষা এই ভাষার সঙ্গে তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনই নিত্য সম্বন্ধ নাই। ইহা বিষয়ে আরোপিত পৃথক ধ্বনি-মাত্র। বৃক্ষশাখে দোদুল্যমান ফলটীকে "আম" নামে অভিহিত করিয়া, এই নাম দ্বারা ঐ ফলটা বুঝিবার অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান এমন এক অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে যে, পরিণামে তাহার ঐ নাম ও ফলেতে ভেদবুদ্ধি বিলোপ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, সত্তাবান কোন বাস্তব পদার্থ না থাকিলেও কল্পনার দ্বারা একটা ভাষাগত আকার গঠন করিয়া ঐ আকারকে, বিষয়-বোধে, তাহাতে কল্পিত নাম আরোপ করিয়া তদ্ভাবে ঐ আকারকে বুঝিতে বুঝিতে জ্ঞান এমনই অধ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, ঐ কল্পনাসৃষ্ট আকার এবং ঐ নাম তাহার নিকট স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, জাত, কুল, শীল এই অষ্টপাশ, পাপ-পুণ্য, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ইত্যাদি এই অবস্থার অন্তর্গত। এই যে অবিষয়ে বিষয়বোধ উৎপাদক ধ্বনি তাহাই ভাষা।

মানবদেহে সর্বমোট ৪৯টী মৌলিক ধ্বনির-বিভিন্নঘাট রহিয়াছে। এই গুলির অবস্থান ও পরিচালনা ইত্যাদি অবগত হইলে ভাষাতত্ত্ব বুঝা সুগম হয়। যেমন বিশ্ব-সৃষ্টি ক্রিয়ার আদি উন্মেষাবস্থাতে, তেমনি মানব-দেহেরও আদিতে ক্রিয়া সহচর যে ধ্বনি বর্তমান, তাহা "ম্" কারানুযায়ী একটা অস্পষ্ট ধ্বনি, যাহা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া "উঁ" = অ-উ-ম্ = ওঁ আকারে পরিণত হইয়াছে। উহারই পর পর ক্রমবিকাশে মৌলিক ৪৯টী ধ্বনি (বা শব্দ) উৎপন্ন হইয়াছে, যথা :—

"ম্" কারাত্মকনাদ

	রূপ	গুণ	বিষয় (আশ্রয়)
উ দীর্ঘ উ—	আকাশ	শব্দ	কর্ণ
ই ,, ঈ—	বায়ু	স্পর্শ	ত্বক্
ঋ ,, ৠ—	তেজ	রূপ	চক্ষু
ঌ ,, ৡ—	জল	রস	জিহ্বা
অ ,, আ—	মৃত্তিকা	গন্ধ	নাসিকা

৫-৫=১০

অ-ই=এ অ-এ=ঐ অ-উ=ও অ-ও=ঔ	=৪ ১৪ মোট স্বরবর্ণ।	এই চারটী মৌলিক নহে। মৌলিক বর্ণে বর্ণে মিলিত হইলে এইগুলি উৎপন্ন হয়। এ-ঐ এই দুইটী উ এবং ই কারের মধ্যবর্তী স্থানে সুক্ষ্মাকারে বর্তমান, এবং ও এবং ঔ এই

দুইটী ম্ এবং উ কারের মধ্যবর্তী বর্তমান। সহস্রার-নিঃসৃত "ম্" কার বিভিন্ন ঘাট অতিক্রম করিয়া কণ্ঠ পর্যন্ত নামিলে "অ" কারে পরিণত হয়। দ্বিদল উ কারের ঘাট।

কণ্ঠস্থ "অ"কার গত্যাধিক্যে সংঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিক্ষিপ্ত বা বিচ্যুত হইলেপর পর পর গতিমূলে যে সমূহ ধ্বনি উৎপন্ন তাহাই ৩৫টী ব্যঞ্জনবর্ণ যথা—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্ প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্ য্ র্ ল্ ব্ শ্ ষ্ স্ হ্ ং ঃ	=৩৫ ব্যঞ্জন বর্ণ ১৪ স্বরবর্ণ ৪৯ মোট ধ্বনি বা শব্দ (দেহস্থ)

"য, র, ল, ব" এই ৪টা "সংযুক্তস্বর" অর্থাৎ স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সংযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। যথা :—

ই+অ=য ঋ+অ=র ঌ+অ=ল উ+অ=ব	মিশ্রিত বলিয়া "ব্যঞ্জনবর্ণের" অন্তর্গত। মূলত "ব্যঞ্জনবর্ণ" নহে।

এইগুলি ছাড়াও "বর্ণমালা"তে "য়, ড়, ঢ়, ক্ষ" এই গুলি ব্যবহৃত হয়। এই গুলি বস্তুত মৌলিক নহে, যথা :—

য়, ড়, ঢ়—য, ড, ঢ যখন পদের মধ্যে ও অন্তে থাকে তখন এইরূপ উচ্চারিত হয়।

ক্ষ—ক+ষ সংযুক্তাকারে এইরূপ হয়।

ং, ঃ—অপর বর্ণের সহিত মিলিত হইলে এই গুলির বর্তমানতা। এই গুলি অপর-সাপেক্ষ বলিয়া ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্গত।

ঁ—বর্ণের উর্ধ্বগতি নির্দেশক সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

সহস্রার-নিঃসৃত "ম্" কারাত্মক প্রণবই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিকৃত হইতে হইতে ৪৯ প্রকারে প্রসারিত হইয়া দেহের বিভিন্ন ঘাটে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। (কি প্রকারে এই

বিকৃতি সংঘটিত হইল তাহা সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহ-তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্বের অন্তর্গত ; এস্থলে সম্যক আলোচনার বিষয়বস্তু নহে)। বিভিন্ন ঘাটসমূহ হইতে উৎপন্ন যে মৌলিক ৪৯টী ধ্বনি, এই গুলিরই পরিচালনা বা সংযোগাদিমূলে মানব-কল্পিত যে সমুদয় সংজ্ঞা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই ভাষা। ভাষা কল্পনা-সৃষ্ট বলিয়াই ভাষার নানাত্ব। একটী বিষয়কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নরূপে কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়া তত্তদ্ভাবে উহা বুঝিবার অভ্যাস করিয়া থাকে। নদী-প্রবাহিত তরল পদার্থটাকে কেহ জল, কেহ অপ্, কেহ অম্বু, কেহ উদক, কেহ তোয়, কেহ পানি, কেহ পয়ঃ, কেহ বারি, কেহ সলিল, কেহ ওয়াটার ইত্যাকারে কল্পনা করিয়া ঐ ঐ বিভিন্নাকারে উহা বুঝিয়া থাকে, তৎফলে এক অন্যের অবোধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু মানবেতর পশু, পক্ষ্যাদিতে তাহা হয় নাই। সর্বদেশীয় কাক, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাতী, বাঘ, ঘোড়া প্রভৃতির শব্দ বা ভাবপ্রকাশক ধ্বনি এক প্রকার। তাহাদের ভাষা নির্দিষ্ট, কিন্তু মানবের ভাষা অনির্দিষ্ট। ইহার কারণ কল্পনা। কল্পনারহিত সর্বমানবের ভাবব্যঞ্জক ধ্বনি একরূপ। ভাষা-জ্ঞানের পূর্বে সর্বজাতীয়, সর্বদেশীয় মানব-শিশু একরূপ ধ্বনির দ্বারাই ভাব প্রকাশ করে। হাসি-কান্না ইত্যাদি ধ্বনি সর্বশিশুরই একরূপ এবং একরূপ ভাবব্যঞ্জক। ক্ষুধার কান্না, নিদ্রার কান্না, অনুকূল অবস্থায় হর্ষ, প্রতিকূল অবস্থায় বিষাদ ইত্যাকার শিশুর অবস্থা, ধ্বনিমাত্র শ্রবণেই অভিজ্ঞ জননী বুঝিতে পারেন। তজ্জন্য ভাষাকল্পনার প্রয়োজন হয় না। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন বিষয় সম্বন্ধে মনোমধ্যে অলক্ষ্যে "কি ও কেন?" ইত্যাকার প্রশ্ন জাগিতে থাকে, তখন হইতেই ভাষা-সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। জ্ঞান স্বরূপহারা হওয়াতেই স্বরূপের জন্য তাহার প্রকৃত অভাব এই অভাবের তাড়নায় অভাবের অভাব করিবার উদ্দেশ্যে সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করে, কিন্তু কোন বিষয় দ্বারাই তাহার বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। কোন বিষয়ই যদি ঐ অভাবের নিবৃত্তি করিতে পারিত, তবে সে সেই বিষয়েই স্থির হইয়া যাইত, বিষয়ান্তরের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকিত না, অতৃপ্ত বাসনার দাস হইয়া পথহারা পথিকের মত পরিভ্রমণ করিতে হইত না। জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়যোগে কোন বিষয় প্রত্যক্ষ বা অনুভব করে, তখন সেই প্রত্যক্ষীভূত বা অনুভূত বিষয়ে তাহার অনুকূল-প্রতিকূল বোধ জন্মে, তন্মূলে আসক্তি-বিরক্তি উৎপন্ন হয়। ঐ আসক্তির বিষয়, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বা অনুভূতের অন্তরাল হইলে, বিষয়টাকে জ্ঞান-গোচর রাখিবার কোন উপায় থাকে না, অথচ জ্ঞানের একটা স্বাভাবিক উদ্ভাবন-শক্তি বর্তমান থাকায়, কি উপায়ে অননুভব্য-বিষয়কে জ্ঞানে আটকাইয়া রাখা যায় তাহা নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; তখন মানব, দেহস্থ প্রাকৃতিক ৪৯টী মৌলিক ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করতঃ তাহাদের চালনা বা সংযোগাদি দ্বারা কল্পিত ভাষা গঠন করিয়া ঐ ভাষা বিষয়ে আরোপ করতঃ ঐ ভাষা দ্বারা বিষয় বুঝিবার অভ্যাস করিতে থাকে ; জ্ঞান তখন এমন এক অবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে যে, পরে তাহার ঐ ভাষা ও বিষয়ে অভেদবোধ বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। তদবস্থায় ভাষা দ্বারা ভাষা-প্রতিপাদ্য বিষয়বোধ এবং বিষয় দ্বারা বিষয়নির্দেশক ভাষাবোধ জন্মিল মনে করে। ভাষার এই স্তরেও একটা বিষয় বর্তমান থাকে, কিন্তু তদ্ব্যতীতও আরও একটা বিষয়-নিরপেক্ষ অবস্থা

আছে, তাহা কিম্ভুতকিমাকার অথচ তদ্দারাই জ্ঞান দৃঢ় পাশাবদ্ধ। তাহা এই, মূলে কোন বিষয়ের সত্তা বর্তমান না থাকিলেও, কল্পনা দ্বারা একটা শব্দগত সত্তা বা আকার গঠন করিয়া, ঐ কল্পনাসৃষ্ট আকারকে বিষয়বোধে, তাহাতে একটা গঠিত শব্দ বা ভাষা (নাম) আরোপ করিয়া ঐ কল্পনাসৃষ্ট বিষয়কে ঐ আরোপিত ভাষা বা সংজ্ঞা দ্বারা বুঝিতে অভ্যাস করিতে করিতে জ্ঞান তদ্দারা অধ্যস্ত হইয়া পড়ে, তন্মূলে ঐ বিষয় ও ভাষা তাহার নিকট একাকারে প্রতিভাত হয় অর্থাৎ উভয়ের পার্থক্যবোধ বিলোপ হইয়া যায়। বিষয় ও ভাষা অভিন্ন, এ বোধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে পর ভাষা দ্বারা বিষয় এবং বিষয় দ্বারা ভাষা-বোধ দৃঢ় হয়। এই যে অবিষয়ে ভাষামূলে বিষয়-বোধ, ইহা কল্পনা ব্যতীত কিছুই নহে। বিষয় ও ভাষা বা নাম ও নামী কদাচ এক নহে ; কেননা বিষয় 'রূপের' জ্ঞান দেয় এবং ভাষা 'শব্দের' জ্ঞান দেয়। 'রূপ' চক্ষুর কাজ এবং 'শব্দ' কর্ণের কাজ ; সুতরাং তাহা এক হয় কিরূপে ? যদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় গুলির এক প্রকার কার্যই হইত, তবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনই ছিল না। বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞান নিষ্পন্ন হইবার জন্যই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। চক্ষু দ্বারা শ্রবণ, কর্ণ দ্বারা দর্শন ইত্যাকারে এক ইন্দ্রিয়কে অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ করিতে কে কখন দেখিয়াছে ? সুতরাং ভাষা দ্বারা (কল্পনা ব্যতীত) বিষয়ানুভূতি হইতেই পারে না। অতীন্দ্রিয় বিষয় (জ্ঞান বা ব্রহ্ম) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে অথচ তন্নিমিত্তই বিচ্যুত জ্ঞানের একমাত্র অভাব, এই অভাব পূরণ করিতে গিয়া যখন অভাবপূরণের বিষয়ের সন্ধান পাইতে অক্ষম হয়, তখনই মানব ভাষার আশ্রয় নিয়া কল্পনা দ্বারা একটা শাব্দিক আকার গঠন করিয়া তাহাতে ইচ্ছানুযায়ী নাম আরোপ করতঃ ঐ নাম দ্বারা তাহা বুঝিতে অভ্যাস করে। হর-হরি, কালী-কৃষ্ণ-দুর্গা, আল্লা, খোদা, গড্ প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি এই ভাবেই গঠিত নহে কি ? বিষয় মূলতঃ একটা, কিন্তু তাহা বুঝিবার জন্য ভাষা সৃষ্টি হইল বহু ও বিভিন্ন। এই যে অতীন্দ্রিয় পদার্থ জানিবার স্পৃহা ইহার অপব্যবহার হইতেই ভাষার সৃষ্টি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়যোগে জ্ঞানের ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইবে, এই ধারণামূলেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় আত্মাতে সংলগ্ন করিয়া রাখিবার প্রয়াস-মূলেই ভাষার সৃষ্টি ; ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আত্মাতে বিষয়-সংস্কারের একটা ভাষাগত স্মৃতিমাত্রই সংলগ্ন করিয়া রাখিতে পারা গিয়াছে। ভাষাই স্মৃতির কারণ। যাহা ভাষা-দ্বারা নির্দিষ্ট হয় নাই তাহা স্মৃতিতেও নাই। ভাষাজ্ঞানের পূর্বের শৈশব অবস্থার কোন স্মৃতি বয়োধিক্যে থাকে কি ? বস্তুতঃ সংজ্ঞাশব্দ দ্বারা বিষয় বা ভাব নির্দেশ হইতেই ভাষার উৎপত্তি। সংজ্ঞা শব্দ বাদ দিলে ভাষার অস্তিত্ব থাকে কি ? সংজ্ঞাশব্দ দ্বারা যে বিষয় নির্দেশ করা হয় সেই বিষয়ের আকার, আয়তন, রং, গন্ধ, স্বাদ, তাপ, কোমলত্ব, কঠিনত্ব আছে, কিন্তু সংজ্ঞার (বা ভাষার) তাহা নাই। তবুও কি স্বীকার করিতে হইবে যে, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞা-প্রতিপাদ্য বিষয় অপৃথক ? তবে যে অভেদ জ্ঞান ইহা কল্পনা বই আর কিছুই নহে। কল্পনা স্বরূপজ্ঞান দিতে অক্ষম। যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বুঝাই কল্পনার ধর্ম। বিভিন্ন মানবের কল্পনা বিভিন্ন। তজ্জন্যই দেশকালাদি ভেদে ভাষারও ভেদ বিভিন্নতা। মানবে মানবে যে পরিমাণ সামঞ্জস্য

থাকে, তাহাদের ভাষারও সেই পরিমাণ সাদৃশ্য থাকে। সুতরাং ভাষাগত ভেদই একতার বিরোধী ও মারামারি-লাঠালাঠির কারণ। মানব কল্পনার দাস হইয়া কতপ্রকার ভাষার সৃষ্টি করিয়া মনে করে ভাষার উন্নতি করিতেছে এবং তজ্জন্য জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে। ইহা যে অবনতি ও জ্ঞানের বিনাশ তাহা বুঝিতেই পারিতেছে না। শব্দ যখন আদিতে শুধু শব্দাকারে অবিচ্ছিন্ন এক ছিল তখন তাহার স্বরূপ ছিল বিশ্বব্যাপী বিরাট, পরে ক্রমে সে ৪৯ প্রকারে বিভক্ত হইয়া ক্ষীণ ও শক্তিহীন হইয়া পড়িল। তৎপরে ভাষা-সৃষ্টিমূলে সে অসংখ্য প্রকারে প্রকারিত হইয়া, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে আকারিত হইয়া কতভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই বিক্ষিপ্ততা হেতু মূল শব্দস্বরূপ অলক্ষ্যের বিষয় হইয়া পড়িল। মূল পদার্থটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন করতঃ ক্ষীণ ও শক্তিহীন করাই যদি উন্নতি হয় তবে উহা উন্নতিই বটে। বস্তুতঃ এই উন্নতির মূলে যে মূল হইতে কতদূরে গিয়া পড়িতে হইয়াছে তাহা ধারণা করাও কল্পনাধ্যস্ত জীবের সাধ্যাতীত। আর এই ভাষা দিয়াই ভাষাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অনুভব করিবার প্রয়াস পণ্ডশ্রম মাত্রই। নিমেষে সমুদ্রগ্রাস, পুষ্পরেণুর অভ্যন্তরে সুমেরুর সংস্থান সম্ভব হইলেও ভাষা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সুদূরপরাহত। শব্দাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে ভাষা-সম্পর্ক বিয়োগ করিয়াই করিতে হইবে। এই জন্যই যোগ সাধনার প্রবর্তন। কোন বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগ-সাধনা নহে, বরং বিষয়-সম্পর্ক এককালীন পরিহারের জন্যই যোগ-সাধনা। পূর্বেই দেখান গিয়াছে, বিষয়-মূলেই ভাষার সৃষ্টি, সুতরাং বিষয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার অস্তিত্ব স্বতঃই বিলয় হইয়া যাইবে। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ (attraction and repulsion) সহচর যে ধ্বনি ইহার একটী অন্যটীর বিধ্বংসী। সুতরাং আকর্ষণ-ধ্বনি অবলম্বন করিলে বিকর্ষণ (বহির্গতি) করিতে হয় বলিয়াই তদবলম্বনে গুরূপদিষ্ট উপায়ে যোগ-সাধনা করিবার বিধান। ইহাই ভাষা ত্যাগের ক্রম। এই উপায়ের সঙ্কেতটা গুহ্য ও গুরুগম্য। অতঃপর ভাষা ত্যাগের উপায় সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।†

---

† ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্র বাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে ভাবে এই প্রবন্ধটী যোগ ব্যাখ্যায় শেষ হইয়াছে—আধুনিক Comparative Philology এই সকল মতের বিরুদ্ধে। প্রবন্ধটীর বিষয়-বস্তু আরও একটু বিস্তারিত হইলে বক্তব্যটি বুঝিবার পক্ষে সহজ হইত। —সম্পাদক

সংহিতা-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম)

২১। দেহশুদ্ধির ন্যায় দ্রব্যশুদ্ধিরও নানাবিধ ব্যবস্থা আছে। একমাত্র জলদ্বারাই সর্বদ্রব্য শোধিত হয়, ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা—

"সর্বং শুধ্যতি তোয়েন"। আপস্তম্ব ২।৬

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই যে, সেই জল অপবিত্র হইলে কি উপায়ে শুদ্ধ হইবে—"তত্তোয়ং কেন শুধ্যতি"। তাহার ব্যবস্থা হইল, সূর্যরশ্মি, নক্ষত্ররশ্মি, বায়ু, গোমূত্রপুরীষ সংযোগে জল বিশোধিত হয়; নদী স্বকীয় বেগদ্বারাই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়—

(ক) "সূর্যরশ্মিনিপাতেন মারুতস্পর্শনেন চ
গবাং মূত্রপুরীষেণ তত্তোয়ং তেন শুধ্যতি ॥" আপস্তম্ব ২।৮

(খ) "দিবার্করশ্মিসংস্পৃষ্টং রাত্রৌ নক্ষত্ররশ্মিভিঃ
সন্ধ্যোভয়শ্চ সন্ধ্যায়াং পবিত্রং সর্বদা জলং ॥" যম।৬৪

(গ) "নদী বেগেন শুধ্যতি"।

অন্যান্য দ্রব্যের শুদ্ধি সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়মও আছে। যেমন কাংস্যপাত্র ভস্মদ্বারা ও তাম্রভাজন অম্লদ্বারা শোধিত হয় ইত্যাদি—

(ক) "ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যং তাম্রমম্লেন শুধ্যতি ॥" পরাশর ৭।৩ অঙ্গিরঃ ১।৪১

(খ) "মৃন্ময়ং ভাজনং সর্বং পুনঃপাকেন শুধ্যতি ॥" শঙ্খ ১৫।২

(গ) "মুক্তামণি প্রবালানাং শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥" শঙ্খ ১৫।৪

২২। শাস্ত্রোপদিষ্ট ধর্ম প্রতিপালন করিতে হইলে আচারপরায়ণ হওয়া কর্তব্য। আচারবিহীন মানব পশুতুল্য। এই জন্য সর্বজাতীয় ধর্মশাস্ত্রে আচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া আছে। মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন আচারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

আচারঃ পরমো ধর্মঃ। মনু ১।১০৮

তিনি আচার প্রতিপালনের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সদাচার দ্বারাই মানব দীর্ঘ আয়ু, অভিমত অপত্য ও ধন লাভ করিতে পারে এবং একমাত্র সদাচারই অন্যান্য অশুভ ফল হইতে মানবকে রক্ষা করিতে সক্ষম—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥" মনু ৪।১৫৬

অন্যান্য সংহিতাগুলিও আচার প্রতিপালন সম্বন্ধে নীরব নয়—

(ক) "চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্মপালকঃ"
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্মঃ পরাঙ্মুখঃ॥ পরাশর ১।৩৭

(খ) "আচারাৎ ফলতে ধর্মমাচারাৎ ফলতে ধনম্
আচারাৎ শ্রিয়মাপ্নোতি আচারো হন্ত্যলক্ষণম্" ॥ বশিষ্ঠ ১৬

(গ) "আচারবৃক্ষস্য ফলং হি নাক
গুচ্ছাচ্ছ সুখাদুরসশ্চ মুক্তিঃ।
তস্মাদনন্তং ফলদস্তু তস্বম
আচারমেবাশ্রয় যত্নপূর্বম্" ॥ বৃহৎপরাশর ৪

২৩। শাস্ত্রাদিতে যেমন ধর্ম অর্জনের নিমিত্ত নানাবিধ আচার প্রতিপালন ও কার্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ জ্ঞানপূর্বক অথবা অজ্ঞানতা বা ভ্রমবশতঃ পাপ কর্ম করিলে, সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবারও ব্যবস্থা আছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার নামই "প্রায়শ্চিত্ত"। প্রায়শ্চিত্ত, সংহিতাগুলিব একটি প্রধান অঙ্গ। সংহিতাগুলিতে প্রায়শ্চিত্তের নানাবিধ ব্যবস্থা আছে; লঘু পাপের জন্য লঘু প্রায়শ্চিত্ত ও গুরুপাপের নিমিত্ত কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তের বিধি নির্দিষ্ট হইয়াছে। কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্তেব মধ্যে চান্দ্রায়ণের উল্লেখ অনেক সংহিতায়ই দেখিতে পাই। চন্দ্রকলার দৈনিক হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে দৈনিক আহার্যের হ্রাস-বৃদ্ধিই এই প্রায়শ্চিত্তের বা ব্রতের বিশেষ বিধি; এই জন্যই ইহার নাম "চান্দ্রায়ণ"—

"একৈকং হ্রাসযেৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণো বিধিঃ॥ পরাশর ১০.২

এই ব্রতে আহার্যের পরিমাণও নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণ অন্নপিণ্ডের নাম "গ্রাস"—

"কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসঞ্চ পরিকল্পয়েৎ।' পরাশর ১০।৩
যম ১।১০

শুক্লপক্ষের প্রতিপদে একটিমাত্র গ্রাস ভোজন করিয়া এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। পরে দ্বিতীয়ায় দুইটি ও তৃতীয়ায় তিনটিমাত্র গ্রাস ভোজন করিতে হয়। এইভাবে প্রতিদিন একটি করিয়া গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমায় ১৫ গ্রাস, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে ১৪, দ্বিতীয়ায় ১৩ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ও প্রতিদিন এক এক গ্রাস কমাইয়া চতুর্দশীতে একটিমাত্র গ্রাস আহার করিতে হয় ও অমাবস্যায় উপবাস করিতে হয়। ইহাই চান্দ্রায়ণের সাধারণ বিধি—

"একৈকং বর্দ্ধয়েন্নিত্যং শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়েৎ
অমাবস্যাং ন ভুঞ্জীত এষ চান্দ্রায়ণবিধিঃ॥" অত্রি ১।২
বৃদ্ধগৌতম ১৬।২৯

এই চান্দ্রায়ণের নাম "যবমধ্য চান্দ্রায়ণ।" যব যেমন মধ্যস্থলেই সর্বাপেক্ষা স্থূল, এই ব্রতেরও সেইরূপ মধ্যভাগেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গ্রাস ভোজনের ব্যবস্থা আছে, এই জন্যই ইহার নাম "যবমধ্য" চান্দ্রায়ণ। অপর এক প্রকার চান্দ্রায়ণ-বিধি আছে, তাহার নাম "পিপীলিকামধ্য"। উহা পূর্ণিমায় আরম্ভ ও শুক্লা চতুর্দশীতে শেষ হয়। পিপীলিকার যেমন মধ্যস্থল সূক্ষ্ম ও উভয়দিক স্থূল, এই চান্দ্রায়ণের সেই প্রকার মধ্যভাগে স্বল্পাহার ও উপবাসের ব্যবস্থা এবং প্রারম্ভে ও অন্তে অধিকতর গ্রাস ভোজনের বিধি আছে বলিয়া নাম "পিপীলিকামধ্য"। আরও তিন প্রকার চান্দ্রায়ণ আছে—"যতি-চান্দ্রায়ণ," "শিশু-চান্দ্রায়ণ" ও "সামান্য চান্দ্রায়ণ"। প্রত্যেকটিই একমাস প্রতিপালন করিতে হয়। যতি-চান্দ্রায়ণে প্রতিদিন একবার মাত্র অষ্টগ্রাসের, শিশু-চান্দ্রায়ণে প্রাতঃকালে চারি গ্রাস, সায়ংকালে চারিগ্রাসের ও সামান্য চান্দ্রায়ণে একমাসে ২৪ গ্রাসের ব্যবস্থা আছে। অতিকৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণের ভোজন আরও সংক্ষিপ্ত—

'একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহানি ত্রীণি পূর্ববৎ
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াদতিকৃচ্ছ্রং তদুচ্যতে॥' অত্রি ১।১১০

২৪। চান্দ্রায়ণের ন্যায় 'প্রাজাপত্য' ব্রতও একটী প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ এবং ইহার ব্যবস্থাও অনেক স্থলে দেখা যায়। এই ব্রত দ্বাদশাহসাধ্য; এই দ্বাদশ দিবসের মধ্যে, তিন দিবস কেবলমাত্র সায়ংকালে ১২ গ্রাস, তিন দিবস কেবলমাত্র প্রাতঃকালে ১৫ গ্রাস, তিন দিবস অযাচিত ২৪ গ্রাস ভোজন করিতে হয় ও তিন দিবস উপবাস করিতে হয়—

'ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতং ত্র্যহং ভুঙ্‌ক্তে ত্বযাচিতম্
ত্র্যহং পরঞ্চ নাশ্নীয়াৎপ্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥
সায়ং তু দ্বাদশা গ্রাসাঃ প্রাতঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরেহন্ত্যনশনং স্মৃতম্॥ অত্রি ১।১১৮-১১৯

অন্যান্য বহু প্রকারের প্রায়শ্চিত্তবিধি সংহিতাগুলিতে থাকিলেও, দেশ, কাল, বয়স, পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়াই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই বিধানও আছে। যে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি শাস্ত্রে নাই, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইলেও পূর্বোক্ত অবস্থাগুলি বিবেচনা করিয়াই ব্যবস্থা প্রদান করিতে হইবে—

(ক) 'দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য সর্বতঃ
প্রায়শ্চিত্তং প্রদাতব্যং ধর্মবিদ্ভির্মনীষিভিঃ। বৃদ্ধহারীত ৬।২৯০

(খ) 'দেশং কালং বয়ং শক্তিঃ পাপঞ্চাবেক্ষয়েত্ততঃ
প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্প্যং স্যাদ্ যত্র চোক্তা ন নিষ্কৃতিঃ॥' অত্রি ১।২৪৫

২৫। কতকগুলি অজ্ঞানকৃত পাপ গৃহস্থকে প্রতিদিনই করিতে হয়। এই পাপগুলিকে স্থূলতঃ পঞ্চভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে— কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও মার্জনী।

ধান্যাদি কণ্ডণ করিতে, দ্রব্যাদি পেষণ করিতে, রন্ধনার্থে চুল্লীতে অগ্নি প্রদানকালে, কলসী প্রভৃতি জলপাত্র স্থাপন ও তাহা হইতে জলগ্রহণকালে, গৃহ পরিষ্কার করিবার সময় সম্মার্জনীর আঘাতে, কর্তার অজ্ঞাতসারে নিত্যই জীবহত্যা হয়। এই পঞ্চবিধ পাপের নাম পঞ্চসূনা—

'কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভোঽথ মার্জনী
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য অহন্যহনি বর্ততে।' পরাশর ২।১১

এই পঞ্চবিধ পাপ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত, সংহিতায় প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে—

১। ব্রহ্ম যজ্ঞ
২। নৃযজ্ঞ
৩। দৈব যজ্ঞ
৪। পিতৃ যজ্ঞ
৫। ভূত যজ্ঞ

'দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ
ব্রহ্মযজ্ঞঃ নৃযজ্ঞশ্চ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতা॥ শঙ্খ ৫।৩

বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ, দেবতা-দিগের উদ্দেশে হোম করার নাম দৈবযজ্ঞ, পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ এবং বৈশ্বদেববলি প্রদানের নাম ভূতযজ্ঞ=

(ক) 'হোমো দৈবো বলির্ভৌত পিত্র্যঃ পিণ্ডক্রিয়া স্মৃতঃ
স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ শঙ্খ ৫।৪

(খ) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্॥ মনু ৩।৭০
কাত্যায়ন ১৩।৩

বৃদ্ধগৌতম-সংহিতায় দেবযজ্ঞের পরিবর্তে ঋষিযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে ও তর্পণকেই ঋষিযজ্ঞ বলা হইয়াছে—

তর্পণং ঋষিযজ্ঞঃ স্যাৎ॥ বৃদ্ধগৌতম ৮।১০

নৃপতিগণের নিমিত্ত রাজধর্মান্তর্গত পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারের—

'দুষ্টস্য দণ্ডঃ সুজনস্য পূজা
ন্যায়েন কোষস্য চ সংপ্রবৃদ্ধিঃ।
অপক্ষপাতোঽর্থিষু রাষ্ট্ররক্ষা
পঞ্চৈব যজ্ঞাঃ কথিতা নৃপাণাম্॥ অত্রি ১।২৮

২৬। চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমকে শ্রেষ্ঠাশ্রম বলিয়া বর্ণনা ও উহার ভূয়সী প্রশংসা, সংহিতাগুলিতে দেখিতে পাই। কারণ প্রকৃত পক্ষে, অপর তিনটী আশ্রম এক গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বারাই রক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়। গৃহস্থগণ ভিক্ষাপ্রদান ও অপর নানাবিধ দানাদি দ্বারাই ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থী ও যতিদিগকে পোষণ করেন। তাই মনু বলিয়াছেন—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্বজন্তবঃ
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥
যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বয়ম্
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জেষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥" মনু ৩।৭৭-৭৮

অন্যান্য সংহিতায়ও এই ভাবের উক্তি অনেক আছে—

(ক) 'গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্মো নাস্তি নাস্তি পুনঃ পুনঃ ॥' ব্যাস ৪।২

(খ) 'দৈবৈশ্চৈব মনুষ্যৈশ্চ তির্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাত্তস্মাজ্জেষ্ঠাশ্রমী গৃহী ॥' দক্ষ ২।৪৩

(গ) "চতুর্ণামশ্রমানাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে ॥
যথা নদীনদাঃ সর্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্‌
এবমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্‌ ॥" বশিষ্ঠ ৮

(ঘ) "বাণপ্রস্থো ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব তথা দ্বিজঃ
গৃহস্থস্য প্রসাদেন জীবন্ত্যেতে যথাবিধিঃ ॥" শঙ্খ ৫।৫

২৭। গৃহস্থাশ্রমের প্রথম কর্তব্য বিবাহ। পুরুষ যতদিন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ না হয়, ততদিন তাঁহাকে অর্ধমানব বলা যায়। এই বিবাহের উপরই গৃহস্থের সুখ, শান্তি প্রভৃতি সমস্তই নির্ভর করে। গার্হস্থ্য যেমন অপর তিন আশ্রমের মূল, স্ত্রীও সেইরূপ গার্হস্থ্যের মূলস্বরূপ। এই জন্য গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে সুলক্ষণা সবর্ণা ভার্যা গ্রহণই বিধেয়—

(ক) "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধো ভবেৎ পুমান্ ॥" ব্যাস ২।১৪

(খ) "সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ॥" মনু ৩।১২

(গ) "ভার্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্যাহীনং গৃহং বনম্‌
ভার্যাধীনা সুখোৎপত্তির্ভার্যাধীনঃ শুভোদয়ঃ ॥
যত্র ভার্যা গৃহং তত্র ভার্যাহীনং গৃহং বনম্‌
ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাৎ ভার্যয়া কথ্যতে গৃহী ॥" পরাশর ২

পতিব্রতা নারীই সংসারের অলঙ্কার-স্বরূপ এবং পতির সুখোৎপাদনে ও শান্তিবিধানে সক্ষম। এই জন্য সর্ব শাস্ত্রই স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়াছেন। পাতিব্রত্যই নারীর একমাত্র ধর্ম; অন্য ধর্ম তাহার পক্ষে নিরর্থক। পতিই নারীর দেবতা, পতিপূজাতেই দেবতাপূজা হয়, অন্য দেবতার পূজা তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন—

(ক) "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥" মনু ৫।১৫৫

(খ) "জীবন্ বাঽপি মৃতো বাঽপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াম্
নান্যচ্চ দৈবতং তাসাং তমেব প্রভুমর্চয়েৎ ॥" বৃদ্ধ পরাশর ৪

(গ) "সা ভার্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্যা যা পতিব্রতা
সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা প্রজাবতী ॥" শঙ্খ ৪।১৫

স্ত্রীর পক্ষে সর্বদাই পতির বশে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্যাদি করাই বিধেয় এবং সকল সময়ই বিনীতা ও মিষ্টভাষিণী হইয়া তাঁহার সেবা করাই স্ত্রীজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবংবিধ গুণসম্পন্না নারী সংসারে দেবতার ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই—

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দানুবর্তিনী
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্যা বশানুগা ॥
গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাচ্চিত্তজ্ঞা বশবর্তিনী ॥
অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী ॥" দক্ষ ১, ৬, ৪।

২৮। অপর পক্ষে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যও সংহিতায় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আছে। যাহাতে স্ত্রী কোনও প্রকারে মানসিক কষ্ট অনুভব না করে, তজ্জন্য স্বামীর সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত ও ভোজ্যালঙ্কারবস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে সর্বদা প্রসন্ন রাখা কর্তব্য—

(ক) "ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্বদা স্ত্রিয়ঃ ॥
যথাকিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্যং তথা নৃভিঃ
আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রী প্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা ॥
স্ত্রিয়শ্চ যত্র পূজ্যন্তে সর্বদা ভূষণাদিভিঃ
দেবাঃ পিতৃমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥
নাপমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ ॥" বৃহৎ পরাশর ৪

(খ) "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥" মনু ৩।৫৬

এইভাবে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিলে সে সংসার নিত্য সুখের আলয় হইয়া উঠে সন্দেহ নাই; তাই মনু বলিয়াছেন—

"সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥" মনু ৩।৬০

২৯। অতিথিসেবা গৃহস্থের নিকট একটি প্রধান ধর্ম। নিরাশ্রয় অবস্থায়ই অতিথি গৃহস্থের শরণাপন্ন হয় এবং অতি অল্পকালের জন্যই অবস্থান করে। কাজেই তাহার পূজা ও সমাদর করা গৃহস্থমাত্রেরই কর্তব্য। অতিথি এক তিথিমাত্র বা এক রাত্রিমাত্র অবস্থান করে বলিয়াই তাহার নাম "অতিথি"—

(ক) "একরাত্রং তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ
অনিত্যং হি স্থিতির্যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" মনু ৩।১০২ / বিষ্ণু

(খ) "অনিত্যং হ্যাগতো যস্মাত্তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" পরাশর ১।৪২

(গ) "অদৃষ্টোঽপৃষ্টগোত্রাদিরজ্ঞাতাচারবিদ্যকঃ
সন্ধ্যামাত্রকৃতাচারস্তজ্ জ্ঞৈঃ সোঽতিথিরুচ্যতে ॥" বৃহৎ পরাশর ২

অতিথি সেবার ফলও বহু প্রকারে বর্ণিত দেখিতে পাই। বেদপাঠ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও তপস্যা দ্বারা যে ফল পাওয়া না যায়, কেবলমাত্র অতিথি সেবা দ্বারাই সেই ফল লাভ হয়—

"স্বাধ্যায়েনাগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞেন তপসা তথা
ন চাপ্নোতি গৃহী লোকান্ যথা ত্বতিথিপূজনাৎ ॥" বিষ্ণু ৬৭

অতিথি গৃহে আগমন করিলে সর্বাগ্রে তাহাকে বসিবার নিমিত্ত আসন ও স্থান দেওয়া কর্তব্য এবং পাদপ্রক্ষালনাদির জন্য জল দিয়া প্রিয়বাক্যে তাহার সহিত আলাপ করা উচিত। ইহাই প্রথম অতিথি সৎকার। পরে সাধ্যানুসারে ভোজনাদি দ্বারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করা বিধেয়—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥" মনু ৩।১০১

(ক্রমশঃ)

গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-রচিত দেবী স্তোত্র

শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী এম্. এ.

স্বর্গীয় পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের নিকট কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারি যে তাঁহার নিকট বাণেশ্বর-রচিত একটি দেবী স্তোত্র আছে। কবিরত্ন মহাশয় পঠদ্দশায় সন ১১০৬ সালে হস্তলিখিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পুঁথির একটি পত্রে উহা লিপিবদ্ধ দেখিতে পান। উহাতে ২০টি শ্লোক আছে। বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের নিকট ঐ স্তোত্রের যে পুঁথিখানি আছে তাহার শ্লোক সংখ্যা ৪৫, তথাপি স্তোত্রটি খণ্ডিত বলিয়াই মনে হয়।

স্তোত্রটিতে বাণেশ্বরের রচনার বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইহাতে যমক ও অনুপ্রাসের অনুপম ঝঙ্কার, পদসৌষ্ঠব প্রভৃতি গুণ বর্তমান। ভক্ত কবির এই রচনা সাধকের কণ্ঠহার হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পাদটীকায় পাঠান্তর ও বিকৃতপাঠ উভয়ই দেওয়া হইল। 'ক' চিহ্নিত পুঁথিখানি কবিরত্ন মহাশয়ের এবং 'খ' চিহ্নিত পুঁথিখানি প্রবন্ধ লেখকের বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য বন্ধনীর মধ্যস্থিত অংশগুলি নূতন বসান হইয়াছে।

ওঁ নমো গণেশায়।

ভবধ্বান্তবিধ্বংসচন্দ্রপ্রকাশাং
ভবস্যেশ্বরীং[১] ভব্যদাং ভীমরূপাম্।
ভজদ্ভূতিদাং[২] ভীতিহন্ত্রীং জগত্যা
ভবানীং ভবানীতিহন্ত্রীং ভজামি ॥ ১

সংসাররূপ অন্ধকারনাশে জ্যোৎস্নাস্বরূপা, জগতের ঈশ্বরী, শুভদায়িনী, ভীমরূপা, ভক্তগণের মঙ্গলদাত্রী, চরাচরের ভয়নাশিনী, ভবের অন্যায়ধ্বংসিনী ভবানীকে ভজনা করি। ১

সুধাসাগরান্তর্মণিদ্বীপ মধ্যে
পুরে ভাস্বরে রত্নপূরাভিরামে।
মহামন্দিরে রত্নসিংহাসনান্ত
নিষণ্ণাং প্রসন্নাকৃতিং ভাবয়ামি ॥ ২

১। 'ক'—ভবপ্রেয়সীম্ অর্থাৎ শিবপ্রিয়াকে।

২। 'খ'—ভজজ্জ্যতিদাং।

নবাম্ভোধরশ্যামলাং কোমলাঙ্গীং
প্রচণ্ডামখণ্ডাববোধস্বরূপাম্।
চতুর্বাহুদণ্ডাং লসচ্চন্দ্রখণ্ডা-
বতংসাং মহাহংসরূপাং প্রপদ্যে ॥ ৩
ত্রয়ীতত্ত্বরূপাং ত্রিদেবস্বরূপাং
ত্রিনেত্রাং ত্রিনেত্রপ্রিয়াং ত্রাণকর্ত্রীম্।
ত্রিলোকপ্রসূং ত্রাসবিধ্বংসহেতুং
ত্রিবেদীময়ীং ত্র্যক্ষরামাশ্রয়ামি ॥ ৪
সদা চন্দনৈর্নন্দনোদ্যানজাতৈ-
র্মহাবারিজাতৈস্তথা পারিজাতৈঃ।
সুরেন্দ্রৈঃ সমারাধিতাং সাধিতার্থৈ-
র্গিরীন্দ্রাত্মজে ত্বাং কথং পূজয়ামি ॥ ৫
দধানাং মহাচন্দ্রহাসঞ্চ পাশং
তথা খেটকঞ্চাঙ্কুশঞ্চারুরূপাম্ ।
অরূপাং বিরূপাক্ষযোগাধিগম্যাং
সুরম্যাকৃতিং বিশ্বধাত্রীং প্রপদ্যে ॥ ৬

সুধা সমুদ্রের মধ্যে মণিময় দ্বীপ, তাহার মধ্যে দীপ্তিযুক্তা রত্নসমূহের দ্বারা রম্য পুরী, তাহার মধ্যস্থিত মহামন্দিরে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা প্রসন্নাকৃতিকে ভাবনা করি। ২

নব মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, কোমলাঙ্গী, প্রচণ্ডা, পূর্ণজ্ঞানস্বরূপা, চতুর্হস্তা, দীপ্তচন্দ্রার্ধ-মুকুটা পরমব্রহ্মরূপাকে আশ্রয় করি। ৩

বেদের তত্ত্বরূপা, ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরস্বরূপা, ত্রিনয়না, ত্র্যম্বকপ্রিয়া, ত্রাণকারিণী, ত্রিলোকজননী, ভয়নাশিনী, বেদত্রয়স্বরূপা, প্রণবরূপার শরণ লই। ৪

হে গিরীন্দ্রনন্দিনি, নন্দনকাননোৎপন্ন চন্দন ও কারণবারিজাত পারিজাতের দ্বারা সিদ্ধ-মনোরথ দেবগণ কর্তৃক সমারাধিত তোমাকে কিরূপে পূজা করিব। ৫

৩। মাতঙ্গীর ধ্যান—

(১) যামলে—

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং সদ্রত্নসিংহাসনে
সংস্থাং রত্নবিচিত্রভূষণযুতাং সংক্ষীণমধ্যস্থলাম্।
আপীনস্তনমণ্ডলাং স্মিতমুখীং ধ্যায়েদ্দধন্তীং ক্রমাদ্
বেদৈর্বাহুভিরঙ্কুশাসিলতিকে পাশংতথা খেটকম্॥

(২) তন্ত্রসারে—

শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটক পাশাঙ্কুশধরাম্॥

মহা চন্দ্রহাস, পাশ, খেটক ও অঙ্কুশধারিণী, চারুরূপা, নিরাকারা, বিরূপাক্ষের যোগ-লভ্যা, মনোহরাকৃতি বিশ্বজননীর শরণ লই। ৬

সমাধৌ সমাধৌত চিত্তৈর্নিবৃত্তৈ-
র্নিরীক্ষ্যাধিভির্ব্যাধিভির্মুচ্যমানাঃ।
পদাম্ভোজসম্ভোজভূচিন্ত্যমানং
ত্বদীয়ং সদা[4] শৈলজে শীলয়ন্তি[5] ॥ ৭
কদা জীবনং জীবনং স্যাত্তথৈবা-
ম্বরং চাম্বরং মন্দিরং কন্দরং মে।
রসজ্ঞা রসজ্ঞা ত্বদীয়াভিধানা-
মৃতানাং মৃতানাং নিকেতে বিনোদঃ ॥ ৮
মহাদ্বীপিচর্মাম্বরামম্বরান্ত-[6]
বিলোলাং জটাজূটনদ্ধাহিমালাম্[7]।
স্ফুরত্তাণ্ডবাড়ম্বরাং শঙ্করোরঃ
স্থলস্থায়িনীং তারিণীং ভাবয়ামি ॥ ৯
মহাভৈরবৈর্ভৈরবৈঃ পর্বতাভৈ
রবৈঃ ফেরবৈঃ সর্বদা স্তূয়মানাম্[8]।
মহাকালবক্ষোভুবি ভ্রাজমানাং
ভজে কালিকাং কালিকাভাং করালাম্ ॥ ১০
সমস্তামরৈশ্চামরৈর্বীজ্যমানাং
নরৈঃ কিন্নরৈঃ পন্নগৈঃ পূজ্যমানাম্।
জগন্মঙ্গলামঙ্গলাবণ্যলক্ষ্মী-[9]
লব[10] ক্রীতচন্দ্রার্ধচূড়াং নমামি ॥ ১১

হে শৈলপুত্রি, সমাধি অবস্থায় শোধিত ও সংসারবিরত চিত্তের দ্বারা ব্রহ্মা কর্তৃক অনুধ্যায়মান তোমার পদকমল নিরীক্ষণ করিয়া আধি-ব্যাধি হইতে মুক্ত ব্যক্তিগণ সর্বদা তাহারই পূজা করিয়া থাকেন। ৭

কবে জল আমার জীবনধারণোপায় হইবে, কবে আকাশ আমার পরিধেয় এবং গুহা

৪। 'ক'—কদা। ৫। 'ক'—চিন্তয়ামি। ৬। তারা কবচে—'দ্বীপিচর্মধরা দেবী।' ধ্যানে—ব্যাঘ্রচর্মা-বৃতাং কটৌ।

৭। কেৎকারিণীতন্ত্রে—নীল বিশাল পিঙ্গল জটাজূটৈকনাগৈর্যুতা।

৮। কালীর ধ্যানে—শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।

৯। 'ক'—'লক্ষ্মীং ১০। 'ক'—'নব'

আমার বাসস্থান হইবে এবং কবে জিহ্বার দ্বারা তোমার নামরূপ অমৃতের আস্বাদন করিয়া আমি শ্মশানে আনন্দ পাইব। ৮

বিশালকায় ব্যাঘ্রের চর্মপরিহিতা, শূন্যে অবস্থানকারিণী, চঞ্চলা, সর্পমালাবেষ্টিত জটাজুটধারিণী, তাণ্ডব নৃত্যশীলা, শঙ্করহৃদিবিলাসিনী তারিণীকে ভাবনা করি। ৯

পর্বতাকার ভয়ানক ভৈরবসমূহ এবং শৃগালগণের রবের দ্বারা সর্বদা স্তূয়মানা, মহাকালের বক্ষঃস্থলে শোভমানা, নবমেঘবর্ণা, করালা কালীকে ভজনা করি। ১০

সমস্ত দেবগণ কর্তৃক চামরের দ্বারা বীজ্যমানা, নর, কিন্নর ও সর্পসমূহের দ্বারা পূজ্যমানা জগতের মঙ্গলদায়িনী নিজের অঙ্গলাবণ্যকণিকার দ্বারা যিনি চন্দ্রচূড়কে ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম করি। ১১

প্রপঞ্চপ্রণেত্রীং ত্রিপঞ্চারগেহাং[১১]
মহানীলদেহাং[১২] জগদ্‌ভাবুকেহাম্[১৩]।
পরেতদ্বয়ীকল্পিতশ্রোত্রভূষাং[১৪]
কলৌ[১৫] জাগ্রতীমুগ্ররূপাং প্রপদ্যে ॥ ১২

১১। কালীযন্ত্র (১) কালীতন্ত্রে—

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ।
ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্ ॥
ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ।
বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ ভূপুরমেককম্ ॥

(২) কালীকল্পলতায়াম্—

মধ্যে ত্রিকোণং বিন্যস্য ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যসেৎ।
ত্রিকোণং তদ্বহির্ন্যস্য নবকোণং ততো ভবেৎ ॥
নবকোণং মহেশানি ষট্‌কোণাভ্যন্তরং কুরু।
যন্ত্রমেতৎ সমাখ্যাতং দশপঞ্চককোণকম্ ॥

১২। 'ক'—লসন্নীলদেহাং। 'নীলবর্ণা সদা পাতু'—তারা কবচে।

১৩। 'ক'—'ভাবগেহাম্। ১৪। 'বিগতাসুকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীম্'—কালীর ধ্যানে। 'শবকর্ণা মহাদেবী'—তারা কবচে।

১৫। কলৌ কালী কলৌ কালী কলৌ কালী তু কেবলা।
সাধিতা কালনাথেন প্রত্যক্ষা কালিকা কলৌ ॥
এষাং মধ্যে মহেশানি কালীরূপং মনোহরম।
বিশেষতঃ কলিযুগে নরাণাং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥—তন্ত্রে।

ত্রয়ীমূর্ধভির্মূর্ধভিঃ[১৬] প্রোহ্যমানা-
সনস্থাং[১৭] নবীনার্ককোটিপ্রকাশাম্।
মহাসুন্দরীং সুন্দরীভির্বশিন্যা-
দিভিঃ[১৮] ষোড়শীরূপভাজং ভজামি ॥ ১৩

মদোত্তুঙ্গমাতঙ্গলীলাবিলাসাং[১৯]
মতঙ্গাশ্রমাভ্যাসরাজন্নিজসাম্।
মতঙ্গেন দিব্যর্ষিণা চিন্ত্যমানাং
মতঙ্গাত্মজাং[২০] বিশ্বধাত্রীং প্রপদ্যে ॥ ১৪

জগতের সৃষ্টিকারিণী, পঞ্চদশকোণাত্মক যন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী, অত্যন্ত নীলবর্ণদেহযুক্তা, জগতের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট, প্রেতদ্বয় দ্বারা বিভূষিতকর্ণা, কলিতে জাগ্রতী উগ্ররূপাকে আশ্রয় করি। ১২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব কর্তৃক মস্তকের দ্বারা উর্ধ্বে ধৃত আসনে উপবিষ্টা, কোটি বালসূর্যের দীপ্তিযুক্তা, রূপসম্পন্না রঙ্গিনী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মহাসুন্দরী ষোড়শীরূপধারিণীকে ভজনা করি। ১৩

মদোন্মত্ত হস্তির লীলা প্রদর্শনকারিণী মতঙ্গাশ্রম সমীপস্থ রম্যস্থলনিবাসিনী, দিব্যর্ষি মতঙ্গের দ্বারা চিন্ত্যমানা, মতঙ্গকন্যা বিশ্বজননীকে আশ্রয় করি। ১৪

(ক্রমশঃ)

১৬। ত্রয্যাঃ ঋগযজুঃসামরূপায়াঃ মূর্ধনিঃ শ্রেষ্ঠাঃ দেবতারূপাঃ যথাক্রমং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ তৈঃ মূর্ধভিঃ।

১৭। তন্ত্রে দেখিতে পাই দেবীর সিংহাসনের চারিটি পাদ ("রত্নসিংহাসনং তস্যা বেদ্যা মধ্যে স্মরেৎশুভম্। বিরিঞ্চিবিষ্ণুরুদ্রেশ রূপ পাদচতুষ্টয়ম্॥" কিন্তু দেবীর ত্রিকণাত্মক অধিষ্ঠান যন্ত্র ("মাতস্ত্রিকোণনিলয়ে—তন্ত্রসার, শ্রীবিদ্যাস্তোত্র) তিনজন দেবতা মস্তকে ধরিয়া আছেন বলিলেও কোনরূপ অসঙ্গতি হয় না।

১৮। রঙ্গিন্যাদয়ঃ ত্রিপুরসুন্দর্যাঃ ষোড়শ্যাশ্চ আসনরূপাষ্টদল পদ্মস্য দলাধিষ্ঠাত্র্যঃ অষ্টৌ দেবতাঃ। তা যথা—পূর্বাদিক্রমেণ রঙ্গিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কৌলিনী (তন্ত্রসার, সংক্ষেপ শ্রীবিদ্যাপদ্ধতি।)

১৯। মাতঙ্গলীলা গমনে ভবত্যাঃ—শারদাতিলক তন্ত্র।

২০। শারদাতিলক তন্ত্রেও দেবী মাতঙ্গ ঋষির কন্যারূপে বর্ণিত হইয়াছেন ('মাতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামঃ'), কিন্তু কালিকা পুরাণে দেখিতে পাই দেবী মাতঙ্গ ঋষির বণিতা রূপে আবির্ভূতা—

অনেক সংস্তুতা দেবী তদা সর্বামরোৎকরৈঃ।
মাতঙ্গবনিতামূর্তির্ভূত্বা দেবানপৃচ্ছত॥ কাঃ পুঃ ৬১ অধ্যায়।

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত

পণ্ডিত শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ

প্রতিযোগিতার এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায়—"দ্রব্যং নাস্তি" এইরূপ অভাব—দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব, "নীলঘটো নাস্তি" এই প্রকার অভাব—নীল ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব এবং "ঘটো নাস্তি" ইত্যাকারেরঅভাব—ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব—এই প্রকারে উল্লিখিত হয়[১]।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ

দ্রব্যত্ব ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্মের ন্যায় সংযোগ সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়।

রূপ পার্থিব জলীয় এবং তৈজস দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কিন্তু বায়ু বা আকাশে উহা থাকে না। অতএব বলা হয—বায়ুতে 'রূপ নাই' (বায়ুঃ রূপাভাববান্ বা বায়ৌ রূপং নাস্তি)।

রূপ সংযোগ-সম্বন্ধে কুত্রাপি থাকে না। সুতরাং যাহা রূপের আশ্রয় সেই বস্তু লক্ষ্য করিয়াও বলা যায়—ইহাতে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই—অর্থাৎ ঘটে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই, জলে সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই ইত্যাদি।

উভয় স্থলেই জ্ঞানের বিষয়—রূপাভাব। উহার প্রতিযোগিতা রূপত্ব-ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন। তথাপি ১ম অভাব রূপবিশিষ্ট কোন দ্রব্যে থাকে না কিন্তু ২য় অভাব সর্বত্র অর্থাৎ রূপশূন্য বায়ু প্রভৃতি এবং রূপবিশিষ্ট যাবতীয় পার্থিব জলীয় এবং তৈজস দ্রব্যে থাকে। অতএব উক্ত দুই স্থলে অভাবের পার্থক্য করিতে হইবে।

অভাবের পার্থক্য উহার প্রতিযোগীর কোন অংশ দ্বারাই সম্ভবে।

প্রতিযোগী পদার্থকে বাদ দিলে উহা (অভাব) নির্বচনের অযোগ্য।

অথচ এক্ষেত্রে পূর্ব স্বীকৃত প্রতিযোগী রূপ এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক রূপত্ব উভয় ক্ষেত্রেই সমান। অবশিষ্ট একমাত্র সম্বন্ধ। অতএব উহা দ্বারাই ভেদ নির্বাহ করিতে হইবে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইল—

১ম রূপাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ— সমবায়।

তদনুসারে ঐ প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। ২য় রূপাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ। তদনুসারে উহা (প্রতিযোগিতা) সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন।

---

১. 'দ্রব্যত্বেন অবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা যস্য' এইরূপে বহুব্রীহি সমাসে 'ক' প্রত্যয় দ্বারা উক্ত প্রকার বাক্য রচিত হইয়াছে।

ন্যায়ের ভাষায় ১ম ও ২য় অভাবের যথাক্রমে পরিচয়—

সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব এবং সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব।

অবচ্ছেদক ধর্ম এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল 'প্রতিযোগিতা'র পক্ষেই স্বীকৃত হয় না; পরন্তু অনুরূপ যুক্তিবশতঃ অবচ্ছেদকতা, বিশেষ্যতা,[১] প্রকারতা, আধেয়তা, অধিকরণতা, প্রতিবধ্যতা, প্রতিবন্ধকতা, কার্যতা, কারণতা, সাধ্যতা, হেতুতা, সংসর্গতা, উত্তেজকতা ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থেরই ঘটত্ব দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম এবং সংযোগ সমবায় ইত্যাদি সম্বন্ধ 'অবচ্ছেদক' রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে—সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা, দণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন-কারণতা, পর্বতত্বাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যতা, বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যতা, ধূমত্বাবচ্ছিন্ন হেতুতা ইত্যাদি শব্দসকল নব্যন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবচ্ছেদকতা

অবচ্ছেদকের ধর্ম—অবচ্ছেদকতা। ইহা ধর্ম এবং সম্বন্ধ উভয়ের পক্ষেই কল্পিত হয়।

ধর্মগত অবচ্ছেদকতা—যেমন—ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব (ধর্ম) সুতরাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা ঘটত্বে স্বীকার্য। এই অবচ্ছেদকতা ঘটত্বগত তথাপি ঘটত্বস্ব-স্বরূপ নহে, উহা হইতে পৃথক্।

সম্বন্ধগত অবচ্ছেদকতা—'সংযোগ-সম্বন্ধে ঘট নাই' (সংযোগেন ঘটো নাস্তি) বলিলে সম্বন্ধ হিসাবে উক্ত ঘটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয় সংযোগ। সুতরাং উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা সংযোগে ও বিদ্যমান। সম্বন্ধরূপে অবচ্ছেদক হওয়ায় সংযোগগত এই অবচ্ছেদকতা 'সাংসর্গিক অবচ্ছেদকতা[২] নামে ব্যবহৃত হয়।

কচিৎ 'অবচ্ছেদকতা'রও অবচ্ছেদক ধর্ম এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। 'দণ্ডী নাই' (দণ্ডী নাস্তি) এই প্রকার অভাবের প্রতিযোগী—দণ্ডী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম—দণ্ডিত্ব অর্থাৎ দণ্ড; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্ম—দণ্ডত্ব; এবং উক্ত অভাবেরই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ; প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সংযোগ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ—সমবায় ইত্যাদি।

দ্রব্যাভাব, নীলঘটাভাব এবং ঘটাভাব এই অভাবত্রয় অবলম্বনে 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে'র যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ বিষয়ে যে একটি সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; তাহা এইরূপ—

---

১. সম্বন্ধ হিসাবে মুখ্য বিশেষ্যতার কোন অবচ্ছেদক স্বীকৃত হয় না; ১০০ পৃঃ দ্রষ্টব্য। বিশেষ্যতা, প্রকারতা ইত্যাদিরও অবচ্ছেদক ধর্ম সর্বত্র স্বীকৃত হয় না। ফলে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা নিরবচ্ছিন্ন প্রকারতা ইত্যাদিও প্রসিদ্ধ।

২. 'অবচ্ছেদকতা' এই সংজ্ঞা তুল্য হইলেও ঘটত্ব ইত্যাদি ধর্মগত 'অবচ্ছেদকতা' এবং 'সংযোগ' ইত্যাদি গত সাংসর্গিক অবচ্ছেদকতার পরস্পর বৈলক্ষণ্য স্বীকৃত হয়।

দ্রব্যত্ব ঘটত্ব ইত্যাদি যে ধর্ম যে 'প্রতিযোগিতা'র 'অবচ্ছেদক' রূপে স্বীকার্য উহার পক্ষে দুইটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ প্রতিযোগিতাসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ প্রতিযোগিতার অধিকরণ প্রতিযোগি পদার্থে (ঘটাদিতে) বাস্তবরূপে বিদ্যমান হওয়া। দ্বিতীয়তঃ প্রতিযোগি-পদার্থের জ্ঞানকালে উহার বিশেষণরূপে প্রকাশিত থাকা। নতুবা, যে-ধর্ম যে-প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ অর্থাৎ যে প্রতিযোগি পদার্থে বিদ্যমান নহে কিংবা যে প্রতি-যোগীর বিশেষণরূপে যাহার প্রকাশ হয় নাই তাহা সেই 'প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক' রূপে স্বীকৃত হয় না[১]। ফলে, গোত্ব অশ্বাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক নহে; কারণ অশ্বাভাবের প্রতিযোগী অশ্ব; উহাতে গোত্ব অবিদ্যমান এবং প্রতিযোগীর বিশেষণরূপে প্রকাশিত না থাকায় দ্রব্যত্ব, প্রাণিত্ব কিংবা অশ্বের রূপ ক্রিয়া ইত্যাদি অশ্বগত অন্য কোন ধর্মও ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে না; কেবল অশ্বত্বই উক্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকরূপে গণ্য করিবার পক্ষে ধর্ম (দ্রব্যত্ব ঘটত্ব-ইত্যাদি) বিষয়ে যে দুইটি বৈশিষ্ট্যের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে সম্বন্ধ (সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি) বিষয়ে অবচ্ছেদক স্বীকারে উহা (উক্ত বৈশিষ্ট্য) নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণতঃ প্রতিযোগী পদার্থ যে-সম্বন্ধে কুত্রাপি বর্তমান থাকে সেই সম্বন্ধই উক্ত পদার্থের অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় এবং "প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক"রূপে অভিমত ধর্ম যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগী পদার্থে থাকে সেই সম্বন্ধই হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ।

গুণ সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে, সুতরাং ('গুণো নাস্তি' এই প্রকার) গুণাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সমবায় এবং গুণত্ব জাতি গুণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; এজন্য উক্ত অভাবের (গুণাভাবের) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও সমবায়। এইরূপে দণ্ড্যভাবের (ইহা 'দণ্ডী নাস্তি' এইরূপ প্রতীতিসিদ্ধ) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও সমবায়; কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ধর্মদণ্ডত্ব দণ্ড-পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে বিদ্যমান।

১, সোন্দড় উপাধ্যায়ের মতে প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ ধর্ম ও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে পারে। অতএব ঐ মতে গোত্ব-রূপে অশ্বের অভাব (গোত্বেন অশ্বো নাস্তি)ও স্বীকৃত। ইহারই নাম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব। ব্যধিকরণ—প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ। অবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ অবচ্ছেদকতা-নিরূপিত। 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্না প্রতি-যোগিতা যস্য' এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'ক' প্রত্যয় দ্বারা 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহা অভাবের বিশেষণ। সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ—যাহার (যে-অভাবের, প্রতিযোগিতা ব্যধিকরণ ধর্ম গত অবচ্ছেদকতা দ্বারা নিরূপিত। ঐস্থলে গোত্ব অশ্বগত প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ। "ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব" ইত্যাদি স্থলে ও এই প্রকার অর্থ বুঝিতে হইবে। প্রকারতা বিশেষ্যতা ইত্যাদির পক্ষে ঐরূপ নিয়ম নাই। ফলে প্রকার অর্থাৎ বিশেষণে অবিদ্যমান ধর্ম ও প্রকারতাবচ্ছেদক হয়। ভ্রমস্থলে এইরূপ অবচ্ছেদক স্বীকৃত।

যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগী পদার্থ কুত্রাপি থাকে না তাহাও সেই পদার্থের অভাবে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইতে পারে। যেমন 'সংযোগ-সম্বন্ধে রূপ নাই' (সংযোগেন রূপং নাস্তি) এই প্রকার ব্যবহারে রূপাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। রূপ কুত্রাপি সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না এজন্য এই জাতীয় অভাব সমূহ 'ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব' নামে নির্দিষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে[১]—অভাব-পদার্থ ভাবপরতন্ত্র। ইহার তাৎপর্য এই যে—প্রত্যেক ভাব পদার্থই অভাবের প্রতিযোগী হয় এবং প্রতিযোগী পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত উহার অভাবের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। একটি দৃষ্টান্ত লইলে কথাটি আরও স্পষ্ট হয়—

মধ্যপ্রদেশের অনেক অধিবাসীর নিকটে বঙ্গদেশপ্রসিদ্ধ পটোল এবং আনারস পরিচিত নহে। ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে পটোল এবং আনারস তাহাদিগের বাজারে আছে কিনা জিজ্ঞসা করিলে ঐ দুই দ্রব্য বাজারে না থাকিলেও সে "উহা (পটোল বা আনারস) নাই" এইরূপে উত্তর দিতে পারে না। কারণ, ঐ অভাবের প্রতিযোগী (পটোল বা আনারস) তাহার পরিচিত না হওয়ায় পটোলের অভাব এবং আনারসের অভাব কিরূপ তাহা সে জানে না এবং যাহা তাহার অজ্ঞাত তাহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগই বা সে করিবে কিরূপে ?

উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে অভাবের স্বরূপত: (প্রতিযোগিনির্দেশহীন অবস্থায়) জ্ঞান অসম্ভব হওয়ায় অভাব স্বরূতঃ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিরূপণের অযোগ্য। তদনুসারে—

অভাব গগনকুসুমাদিবৎ তুচ্ছ বা অলীক এইরূপ মতবিশেষও নানাগ্রন্থে পাওয়া যায়।

এই অভাব পদার্থ বুঝাইতে প্রাচীনেরা 'অসৎ' শব্দও প্রয়োগ করিয়াছেন[২]। 'অসৎ' কথাটির অন্য অর্থ অলীক। যেমন—আকাশকুসুম শশশৃঙ্গ ইত্যাদি অসৎ বা অলীক।

'অসৎ' এইরূপে ব্যবহার হইলেও অভাব (জলাভাবাদি) হইতে আকাশকুসুম প্রভৃতির বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। কারণ, অভাব প্রমাণসিদ্ধ এজন্য উহা পদার্থ এবং গগনকুসুম ইত্যাদি কোন প্রমাণের বিষয় হয় না বলিয়া উহা কোন পদার্থ নহে।

অভাবের প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা আরও পরিস্ফুট হয় উহার অধিকরণ (বা অবস্থিতির স্থান) নির্দেশে। যদিও সাধারণভাবে বলা হয় অভাব সর্বত্রই থাকে অর্থাৎ ছয় প্রকার ভাব এবং অভাব প্রত্যেকতঃ অভাবের অধিকরণ হইতে পারে তথাপি প্রত্যেক অভাবের অধিকরণ স্ব স্ব প্রতিযোগীর অধিকরণ দ্বারাই নির্ধারিত হয়। ফল কথা—যাহা যে-অভাবের প্রতিযোগীর অধিকরণ তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত বস্তুই সেই অভাবের অধিকরণ

---

১. ১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. "তদেবং সতঃ প্রকাশকং প্রমাণমসদপি প্রকাশয়তি" বাৎস্যায়নভাষ্য। 'দ্বিবিধমেব খলু সর্বং সচ্চাসচ্চ' চরক সংহিতা ১১।১১। বঙ্গীয় মহাকোষে 'অত্যন্তাভাব' শব্দ দ্রষ্টব্য।

হয়, কিন্তু যাহা প্রতিযোগীর অধিকরণ তাহা ঐ অভাবের অধিকরণ হইতে পারে না। যেমন—দ্রব্যত্বের অধিকরণ নয়প্রকার দ্রব্য; উহাতে দ্রব্যত্বাভাব থাকে না, গুণ প্রভৃতি অন্য ছয় পদার্থই দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে—যদি প্রতিযোগীর অধিকরণ একটি মাত্র হয় তবে উহার অভাবের অধিকরণ হয় বহু বা অসংখ্য।

এইরূপে প্রতিযোগী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে উহার অভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং প্রতিযোগী অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে উহার অভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া থাকে[১]। যেমন—দ্রব্যত্ব জাতি ব্যাপ্যবৃত্তি এজন্য দ্রব্যত্বাভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি সুতরাং সংযোগাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি।

নিত্যতা এবং অনিত্যতা বিষয়ে অভাব প্রতিযোগিপরতন্ত্র নহে। কারণ, কোন কোন অভাব স্বভাবতই নিত্য, প্রতিযোগীর নিত্যতা এবং অনিত্যতা বশতঃ উহা কখনও নিত্য বা অনিত্য হয় না কিন্তু যে-অভাব অনিত্য কোন অবস্থা বিশেষেও তাহার নিত্যতা স্বীকৃত হয় না; তবে বিশেষ এই যে—এই প্রকার অভাবের প্রতিযোগী অনিত্য পদার্থই হইয়া থাকে কোন নিত্য পদার্থ ইহাদের প্রতিযোগী হয় না। ইহা ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে—অভাব প্রমাণসিদ্ধ। এই বিষয়েও অভাব প্রতিযোগি পরতন্ত্র। কারণ; প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণের দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়[২]। প্রত্যক্ষসিদ্ধ অভাব সম্বন্ধেও বিশেষ এই যে—যে-প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ যে-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় উহার অভাবেরও কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। যেমন—রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় এজন্য রূপাভাব চক্ষুদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়, ত্বক্ বা কর্ণের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করা যায় না[৩]। যে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের অযোগ্য তাহার অস্তিত্ব অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয় এজন্য তাহার অভাবও অনুমানগম্য।

লক্ষণ। যাহা সমুদায় ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন তাহা **অভাব**[৪]। (ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বং)

---

১. গুণাদির ন্যায় অভাবেরও ব্যাপ্যবৃত্তিত্বাদি ধর্ম আছে। এই স্থানে প্রসঙ্গতঃ অভাবের প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য। উক্তরূপ আলোচনা অত্যন্তাভাবের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, অন্যোন্যাভাবের সম্বন্ধে নহে। অন্যোন্যাভাব সর্বত্রই ব্যাপ্যবৃত্তি, ঐ বিষয়ে উহার প্রতিযোগিপরতন্ত্রতা নাই। তবে অব্যাপ্যবৃত্তি ধর্ম বিশিষ্টের ভেদ ('সংযোগী ন' ইত্যাদি) অব্যাপ্যবৃত্তি এইরূপ প্রাচীন মত দীধিতিকার বিশেষব্যাপ্তির টীকায় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

২. কুমারিলভট্টের মতে অভাব বা অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাব সিদ্ধ হয়। জৈনমতে অভাব অনুমান-সিদ্ধ। বেদান্তপরিভাষাকার ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্র বলেন—অনুপলব্ধি প্রমাণ দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

৩. এই আলোচনা অত্যন্তাভাব সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।

৪. ১৩ পৃঃ ভাব নিরূপণ দ্রষ্টব্য। অভাবের নানাবিধ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া উহাতে দোষ প্রদর্শন করতঃ গ্রন্থান্তরে বলা হইয়াছে যে অভাবের নির্দোষ কোন লক্ষণই সম্ভব নহে—চিৎসুখী ২য় অধ্যায়; খণ্ডন খণ্ডখাদ্য ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য। অভাব লক্ষণের লক্ষ্য কি কি তাহা বিভাগে পরিস্ফুট হইবে।

সমন্বয়। অভাবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রথমেই সমর্থিত হইয়াছে। অতএব সমন্বয় স্পষ্ট।

লক্ষণে 'সমুদায়' না বলিলে অগ্নি জল স্বরূপ ভাবপদার্থ হইতে ভিন্ন এজন্য অগ্নিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। 'সমুদায়' পদ থাকিলে আর ঐ দোষ হয় না। কারণ অগ্নিও ভাব (তেজঃ) পদার্থের অন্তর্গত।

অভাব চতুর্বিধ[১] —অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংস।

অন্যোন্যাভাব।

অন্যোন্যাভাবের প্রসিদ্ধ নামান্তর ভেদ। অন্য, ভিন্ন, অপর, পৃথক্, (বঙ্গভাষায়) নহে, নয় ইত্যাদি শব্দ হইতে অন্যোন্যাভাবের প্রতীতি হয়। যেমন—রস রূপ হইতে অন্য (রসে রূপের ভেদ) গুণ দ্রব্য হইতে ভিন্ন (গুণে দ্রব্যের ভেদ) বিশেষ সামান্য হইতে অপর বস্তু (বিশেষে সামান্যের ভেদ) ক্রিয়া গুণ হইতে পৃথক[২] (কর্মে গুণের ভেদ) রাম শ্যাম নহে (রামে শ্যামের ভেদ) তেঁতুল মিষ্ট নয় (তেঁতুলে মিষ্টের —মধুররসযুক্ত দ্রব্যের ভেদ) ইত্যাদি।

সম্বন্ধের ন্যায়[৩] অভাবেরও কোন পদার্থ প্রতিযোগী এবং কোন পদার্থ অনুযোগী নামে ব্যবহৃত হয়। যাহার অভাব, সে প্রতিযোগী এবং যাহাতে ঐ অভাব থাকে তাহা অনুযোগী। জলে অগ্নির অভাব থাকে এজন্য জল অগ্ন্যভাবের অনুযোগী এবং অগ্নি উহার (অগ্ন্যভাবের) প্রতিযোগী।

---

১ ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবের বিভাগেও মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিয়াছেন—অভাব দ্বিবিধ—সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব ত্রিবিধ—অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব এবং ধ্বংস।

মতান্তরে উৎপত্তি এবং বিনাশশীল পঞ্চম অভাব স্বীকৃত হইয়াছে। মুক্তাবলী-অভাব নিরূপণ দ্রষ্টব্য। অত্যন্তাভাব নিরূপণে এই বিষয় আলোচিত হইবে।

মহারাজ ভোজরাজের মতে অভাব ছয় প্রকার—অন্যোন্যাভাব, অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংস, অপেক্ষাভাব এবং সামর্থ্যাভাব। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

জয়ন্ত ভট্টের মতে অভাব দুইপ্রকার মাত্র প্রাগভাব ও ধ্বংস এই মতে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাব প্রাগভাবের অন্তর্গত। ন প্রাগভাবাদন্যো তু ভিদ্যতে পরমার্থতঃ। স হি বস্ত্বন্তরোপাধিরন্যোন্যাভাব উচ্যতে। স এবাবধি-শূন্যত্বাদত্যন্তাভাবতাং গতঃ।—ন্যায়মঞ্জরী।

২ 'অগ্নি জল হইতে পৃথক্' এই স্থলে পৃথক্-শব্দে পৃথকত্ব-গুণ বুঝায়, ৭১ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। উল্লিখিত উদাহরণে পৃথকত্ব ক্রিয়ার ধর্ম অতএব উহা গুণ নহে।

৩. ১১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'অন্যোন্য'শব্দের অর্থে—পরস্পর। প্রকৃত স্থলে উহা প্রতিযোগী ও অনুযোগী। অন্যোন্যের অভাব—অন্যোন্যাভাব। ইহার স্বাভাবিক অসাধারণ্য দুই প্রকার। প্রথমতঃ—যে-ভেদ-বিশেষের যাহা প্রতিযোগী তাহা উহারই অনুযোগী হয় না। জলভেদের প্রতিযোগী জল, উহা (জল) জলভেদের অনুযোগী নহে। যদি তাহা হইত তবে জল 'জল ভিন্ন হইয়া পড়িত ভেদের প্রতিযোগী এবং অনুযোগী পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ ই হইবে এইরূপ স্বভাব নির্ধারিত থাকায় জল কখনও জল ভিন্ন হয় না কিন্তু জলভিন্ন হয় অগ্নি।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রতিযোগী পদার্থের ভেদ যে-অনুযোগী পদার্থে থাকে সেই অনুযোগী পদার্থের ভেদও সেই প্রতিযোগী পদার্থে অবশ্যই থাকে। রাম শ্যাম হইতে ভিন্ন সুতরাং শ্যামও রাম হইতে ভিন্ন হইবেই। প্রতিযোগী এবং অনুযোগার পরস্পর এই বৈপরীত্য হইতে ভেদের অন্যোন্যাভাব-সংজ্ঞার তাৎপর্য বুঝা যায়[১]।

ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য, অন্য কোনও সম্বন্ধ ইহার প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক হয় না। পরন্তু তাদাত্ম্যও অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় না। ভেদ নিত্য এবং ব্যাপ্যবৃত্তি[২]।

প্রত্যেক পদার্থেরই অন্যোন্যাভাব সম্ভবে। এজন্য বলা যায় অন্যোন্যাভাব সর্বত্র থাকে।

লক্ষণ। ভেদত্ব বা অন্যোন্যাভাবত্ব অখণ্ডোপাধি[৩], এবং উহাই **অন্যোন্যাভাবের** লক্ষণ।

লক্ষ্য। দ্রব্যভেদ, গুণভেদ, ঘটভেদ ইত্যাদি।

সমন্বয় —স্পষ্ট

ন্যায়শাস্ত্রে অন্যোন্যাভাবের কোন বিভাগ প্রদর্শিত হয় নাই[৪]।

অত্যন্তাভাব

অভাবগুলির মধ্যে অত্যন্তাভাবের ব্যবহার সমধিক। 'অত্যন্ত' অংশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র 'অভাব' বলিলেও সাধারণতঃ অত্যন্তাভাবই বুঝাইয়া থাকে। কচিৎ 'অত্যন্তাভাব' অর্থে 'বিরহ'-শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়।

---

১. অত্যন্তাভাবে এই রূপ পারস্পরিকতা সর্বত্র সম্ভবে না তাহা যথা স্থানে ব্যক্ত হইবে।

২. সকল ভেদই ব্যাপ্যবৃত্তি ইহাই বহুসম্মত সিদ্ধান্ত। ১৭৩ পৃঃ ১নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩. ১০৫ পৃঃ ২নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৪. সংস্কৃত ভাষায় 'নঞ্‌' শব্দের দ্বারা অত্যন্তাভাব বুঝাইতে হইলে সাধারণতঃ প্রতিযোগিবোধক পদে প্রথমা এবং অনুযোগিবোধক পদে সপ্তমী বিভক্তি হয়। উপরিস্থ উদাহরণে তাহা পরিস্ফুট। কিন্তু উহা নিয়ম নহে। ন পচতি রামঃ (রাম পাক করে না) ইত্যাদি বহু স্থলে অনুযোগী পদে (চৈত্র-পদে) সপ্তমী হয় নাই। অভাব এবং নির্‌ (বা নিস্‌) উপসর্গে ও অত্যান্তাভাব বুঝায়, যথা ভূতলং ঘটাভাববৎ (ভূতলে ঘট নাই), ব্রহ্ম নির্গুণম্‌ (ব্রহ্ম নির্গুণ)।

অত্যন্তাভাব একটি অখণ্ড নাম, ইহা অল্পতাব্যঞ্জক নহে। 'অত্যন্ত' শব্দের অর্থ—অতিশয়, এবং সাধারণতঃ উহা অন্যক্ষেত্রের অল্পতা প্রকাশ করে। "জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীর মধ্যাহ্নে অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছিল" বলিলে অন্যসময়ে উষ্ণতা অল্প ইহা বুঝা যায় কিন্তু ঐ সময়ে উষ্ণতা একেবারেই নাই এরূপ বুঝা যায় না। উক্ত দৃষ্টান্তানুসারে 'এই কলসে জলের অত্যন্তাভাব' এই বাক্য হইতে বুঝা যাইতে পারে যে—এই কলসটিতে এক বিন্দুও জল নাই তবে অন্য কলসে যে জলের অভাব আছে উহা অল্প অর্থাৎ উহাতে জলের অভাব আছে এবং জলও একটু আছে। শাস্ত্রানুসারে কথাটী কিন্তু অন্যরূপ। যেখানে একটিমাত্র প্রতিযোগী থাকে সেখানে উহার অত্যন্তাভাব থাকে না অথবা উহার দ্বারা অন্যত্র অল্প পরিমাণে প্রতিযোগী পদার্থের অস্তিত্বও বুঝায় না। কলসে একবিন্দু জল থাকিলেও উহাতে জলের অত্যন্তাভাব থাকিবে না অথবা অন্য কলসে অল্প জল এবং জলাভাব আছে ইহাও শাস্ত্রসম্মতভাবে উহার দ্বারা বুঝায় না। এইরূপ—গাছের কোন একটী শাখায় একটীমাত্র ফুল থাকিলে ঐ বৃক্ষ পুষ্পের অত্যন্তাভাববিশিষ্ট হইবে না। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে গাছে ফুল নাই (বৃক্ষে পুষ্পং নাস্তি) বলিলে যদি কেহ—উহা অল্পমাত্রায় পুষ্পাভাব বিশিষ্ট ('বৃক্ষঃ পুষ্পাভাববান্' এইরূপে) বুঝে তবে ভুল হইবে। অতএব অত্যন্তাভাব অভাব মাত্র; অল্পতার সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই। অভাবরূপেই উহার জ্ঞান ও ব্যবহার হইয়া থাকে, অত্যন্ত পদটী নামের অন্তর্গত থাকিয়া উহাকে ভেদ, প্রাগভাব ও ধ্বংস হইতে পৃথক্ করিতেছে মাত্র।

সাধারণতঃ 'নাই' (নাস্তি) এই প্রকারে অত্যন্তাভাবের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—কলসে জল নাই (কলসে জলং নাস্তি) গাছে ফুল নাই (বৃক্ষে কুসুমং নাস্তি) বায়ুতে রূপ নাই (বায়ৌ রূপং নাস্তি)। উক্ত উদাহরণ গুলিতে কলস, বৃক্ষ ও বায়ু অত্যন্তাভাবের অনুযোগী, জল, ফুল এবং রূপ যথাক্রমে প্রতিযোগী।[১]

অত্যন্তাভাব স্বীয় প্রতিযোগীর অধিকরণ ব্যতীত অন্য সকল স্থানেই থাকে। শীতল স্পর্শ জলের ধর্ম সুতরাং জল ব্যতীত সর্বত্র শীতলস্পর্শাভাব আছে। এইরূপ—পৃথিবীত্বাভাব জলাদি অষ্টবিধ দ্রব্যে এবং গুণাদি ছয় পদার্থে সর্বত্র বিদ্যমান।[২] ইহা

১. বেদান্তে (১) স্বগত ভেদ (২) সজাতীয় ভেদ (৩) ও বিজাতীয় ভেদ এইভাবে ভেদের বিভাগ দেখা যায়। পুষ্প ফল, শাখা, পল্লবাদির সহিত বৃক্ষের যে-ভেদ অনুভূত হয় উহা (১) স্বগত ভেদ। এক বৃক্ষের সহিত অপর বৃক্ষের যে ভেদ উহা (২) সজাতীয় ভেদ। প্রস্তর প্রভৃতির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ উহা (৩) বিজাতীয় ভেদ। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্যে 'একম্' 'এব' 'অদ্বিতীয়ম্' এই পদত্রয়ের দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ ভেদ বুঝাইতেছে। পঞ্চদশী।

২. আকাশ, আত্মা প্রভৃতি সকল দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত কিন্তু কোন দ্রব্যই সংযোগ সম্বন্ধে উহাদিগের অধিকরণ নহে। কারণ, জ্ঞানবিশেষের অনুসারে অধিকরণতা স্বীকৃত হয়। যেমন "ভূতলং ঘটবৎ" এই স্থানে ভূতলে ঘটের অধিকরণতা স্বীকৃত হইয়াছে তদ্রূপ কোন বস্তুতেই 'ইহা আকাশবান্' অথবা 'ইহা আত্মবান্' এই প্রকার বিশেষ বুদ্ধি হয় না। এজন্য আকাশাভাব, আত্মাভাব প্রভৃতি বিভুদ্রব্যাভাব সপ্তবিধ পদার্থে-সর্বত্র থাকে। এইরূপ সর্ব পদার্থে অবস্থিত বস্তুকে 'কেবলান্বয়ী' কহে।

নিত্য। প্রতিযোগী ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে অত্যন্তাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি এবং প্রতিযোগী অব্যাপ্যবৃত্তি হইলে অত্যন্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত হয়।

অত্যন্তাভাবের জ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানের তুল্যস্বভাবসম্পন্ন অর্থাৎ যে-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রতিযোগীর যে প্রকার জ্ঞান হয় উহার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেইভাবে জ্ঞাত হয়। যেমন—শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতএব শব্দাভাবও কর্ণের দ্বারাই গৃহীত হইবে, চক্ষু বা ত্বক্ শব্দাভাব বিষয়ে জ্ঞান উৎপাদনে অসমর্থ।

লক্ষণ। যে-অভাব অন্যোন্যাভাব হইতে ভিন্ন অথচ নিত্য তাহা **অত্যন্তাভাব** (নিত্য সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ)

লক্ষ্য। দ্রব্যত্বাভাব, গুণাভাব ঘটাভাব ইত্যাদি অত্যন্তাভাব।

সমন্বয়। অভাব পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার দ্বারাই উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যে সমন্বয় স্পষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে—কোন একটি কলসে এখন জল নাই, কিছুক্ষণ পরে কেহ উহা জলপূর্ণ করিল; পুনরায় উহার সম্পূর্ণ জল ফেলিয়া দেওয়া হইল, এইরূপ অবস্থায় কলসে যে জলাভাব প্রতীত হয়, উহা নিত্য কিনা? যদি উহা নিত্য না হয় তবে ঐস্থলে লক্ষণ সঙ্গত না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হইল। আর যদি বলা যায়—উহা নিত্য তবে জলপূর্ণতা কালে উহা গেল কোথায়? ঐসময়ে উহা (জলাভাব) প্রতীত না হওয়ায় উহার বিনাশ হইয়াছে ইহাই ত স্বীকার করা উচিত।

ইহার উত্তরে বলা হয়—উক্ত স্থলেও জলাভাব নিত্য; কারণ, নির্দিষ্ট কলসের জলপূর্ণতা কালেও অন্যত্র জলাভাব প্রতীত হইয়া থাকে, ঐসময়ে জলাভাবের বিনাশ স্বীকার করিলে অন্যত্রও জলাভাবের প্রতীতি সম্ভব হইত না। তবে নির্দিষ্ট কলসে পূর্বে যে জলাভাব ছিল জলপূর্ণতাকালে তাহা ঐস্থানে প্রতীত হয় না কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে বলিব যে—ঐসময়ে জলাভাবের সহিত কলসের সম্বন্ধ নাই, এই জন্যই ঐ সময়ে কলসে জলাভাব জ্ঞাত হয় না। কারণ, স্ব স্ব অধিকরণের সহিত অভাবের স্বরূপ বা বিশেষণতা নামে যে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় উহা কালঘটিত অর্থাৎ প্রতিযোগী পদার্থ যে অধিকরণে যে-কালে সেই অধিকরণে থাকে, কেবল তদ্ভিন্ন-কালাবচ্ছিন্ন-বিশেষণতাই অভাবের সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, উহা কেবলমাত্র বিশেষণতা নহে। সুতরাং জলপূর্ণতাকালে উহাতে জলাভাব নিয়মিত সম্বন্ধে বিদ্যমান নহে এই কারণে উক্ত স্থলে জলাভাবের প্রত্যক্ষ সম্ভবে না।

মতবিশেষে উল্লিখিত স্থলে এবং ঐ জাতীয় অন্যান্যক্ষেত্রে নূতন এক প্রকার অভাব স্বীকৃত হয়; তাহা উৎপত্তিশীল এবং বিনাশযোগ্য।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

হিন্দু রাজনীতির মধ্যে বিবাহের স্থান

শ্রীনিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য বি. এ.

ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট ইতিহাস খ্রী° পূ° ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্বে ভারতবর্ষ অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ইহাদের কোন সংযোজক তালিকা এখনও পাওয়া যায় নাই। হর্ষঙ্কবংশীয় সম্রাট বিম্বিসার ভারতের সর্বপ্রথম সম্রাট বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। খ্রী° পূ° ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনিই প্রথম মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্য। এই সময় ভারতবর্ষে আরও কয়েকটি বিশেষ জনপদ লক্ষিত হয়। কিন্তু বিম্বিসার স্বীয় রাজনীতির ফলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি কোশল রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন; কারণ, বিবাহে তাঁহার পত্নী যৌতুক স্বরূপ কাশীগ্রাম স্বীয় পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। বিম্বিসার এই গ্রাম হইতে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাশীগ্রাম লইয়া অবশেষে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে পুনঃ পুনঃ কোশলরাজ সমীপে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল।

ইহার প্রায় নয় শত বৎসর পরে গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ে ভারতের রাজসিংহাসন গুপ্তনৃপগণের অধিকারে আসে। এই বংশের তৃতীয় রাজা চন্দ্রগুপ্ত নেপালের লিচ্ছবী রাজবংশীয়া কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া নূতন এবং ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণে চন্দ্রগুপ্ত ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, চন্দ্রগুপ্তমৌর্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য গুপ্তসাম্রাজ্য হইতে কোনও অংশে কম ছিল না। তবে গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে কুমারদেবীর পিতৃপক্ষীয়দিগের যথেষ্ট সহযোগিতা ছিল।

এই বংশেরই চতুর্থ রাজা সমুদ্রগুপ্ত দিগ্‌বিজয়ী বীর ছিলেন। পৈতৃক সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি ভারতের খুব অল্প নৃপতিকেই রেহাই দিয়াছেন। এমন কি, অনেক স্থলে দেখা যায়, স্থানীয় রাজন্যবৃন্দ তাঁহার প্রতাপ ও বিক্রম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজ নিজ কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। শক্‌, কুশান্‌ ও সীমান্ত রাজন্যবৃন্দ গুপ্তসম্রাটকে কন্যাদান করিয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত। তিনি নাগ-বংশীয়া কুবেরনাগা নাম্নী রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে বিক্রমাদিত্য বাকাটক রাজবংশের সঙ্গে সৌহৃদ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুবের নাগার গর্ভে প্রভাবতী

নাম্নী তাঁহার এক কন্যা জন্মে। তাহাকে বাকাটকরাজ দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা ও ইহার রক্ষা-কল্পে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ বিবাহের সুযোগ লইয়া নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডেও এইরূপ আদর্শ দেখা যায়। সপ্তম হেন্‌রী শুধু বিবাহনীতি দ্বারা প্রকাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতের চিত্র বর্ত্তমান ভারতেও লক্ষিত হয়। অধুনা ভারতে যে সমস্ত করদ ও মিত্র রাজ্য আছে ইহাদের প্রায় সকলেই এই বিবাহ নীতিব সাহায্যে আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করে। অবশ্য এই শক্তি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক নহে, পরন্তু সম্মান প্রতিষ্ঠারই নিদর্শন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে যৌতুক প্রথা ভারতের হিন্দু সমাজে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। ইহার ফলে অধুনা সমাজেব মধ্যে "পণ-প্রথার" উদ্ভব হইয়াছে। পরন্তু এই প্রথা যে প্রাচীন ভাবতীয় রাজন্যবৃন্দ হইতে উদ্ভূত সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।*

(২)

কবি মাঘ

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ, বি. এ.

সংস্কৃত সাহিত্যে যে সকল কবির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে কবি কালিদাস নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা হইলেও পরবর্ত্তী ভারবি, মাঘ ও শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তিও কম নয়। কালিদাসের আলোচনা এত বেশী হইয়া থাকে যে, এই সকল কবির কথা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই। ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘের শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের নৈষধ—প্রকৃতই উচ্চস্তরের কাব্য। কাব্যরসিকেরা বলেন 'কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ'—মাঘের মধ্যে কবির সমস্ত শক্তি বর্ত্তমান। কি ভাষার লালিত্যে, কি বর্ণনার ছটায়, কি অলঙ্কারের সমাবেশে মাঘ প্রকৃতই অতুলনীয়। আমরা—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্
নৈষধে পদলালিত্যম্ মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ"

এই উক্তির মধ্যে ইহার প্রতিধ্বনি দেখিতে পাই। মহাকাব্যসকলের অতুলনীয় টীকাকার মল্লিনাথের মাঘ সম্বন্ধে উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"ধন্যো মাঘকবির্বয়ন্তু-কৃতিনস্তৎসূক্তিসংসেবনাৎ" কবি মাঘ ধন্য আর আমরাও তাঁহার কাব্য পড়িয়া ধন্য।

---

* ইংলণ্ডের নৃপতিরা যে ভারতীয় আদর্শে তাঁহাদের রাজ্যকে বিবাহনীতির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার কোনও সুদৃঢ় প্রমাণ নাই।—সম্পাদক।

মাঘের কৃতিত্ব প্রকৃতই অসাধারণ। যাঁহারা 'কিরাতার্জুনীয়' পাঠ করিয়া 'শিশুপাল বধ' পাঠ করিবেন তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন কবি মাঘ 'কিরাতার্জুনীয়ের' কবি ভারবিকে পদে পদে অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু অনুকরণ করিলেই যে হীন হইতে হয় তাহা নহে, ভারবির সংক্ষিপ্তার্থ বিষয়কে মাঘ বহুল পরিমাণে উন্নত করিয়াছেন। প্রথমে ছন্দের কথাই ধরা যাউক। ভারবি তাঁহার কাব্যে ২৪ প্রকার ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু মাঘ ৪১ প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উদ্গাতা, মঞ্জুভাষিনী, রুচিরা, স্বাগতা প্রভৃতি অল্প প্রচলিত ছন্দেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিরাতার্জুনীয়ের দ্বিতীয় সর্গের মন্ত্রণাসভা ও শিশুপাল বধের দ্বিতীয় সর্গে মন্ত্রণাসভার তুলনা করিলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে কবি মাঘ, অর্থশাস্ত্রে কিরূপ বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাহার পর মহাকাব্যের নিয়মানুসারে কবি ভারবি যে প্রাকৃতিক নানা প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, মাঘ তাহা করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাঁহারা কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মাঘ কবির 'রৈবতক' বর্ণনা পাঠ করুন। মহাকবি নগরাজ হিমালয়কে যে অতুলনীয় শোভায় শোভিত দেখিয়াছিলেন কবি মাঘ সামান্য 'রৈবতক' পর্বতেও তদপেক্ষা কম সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেন নাই। মহাকাব্যে সাধরণতঃ উদয়াস্ত, ঋতুবর্ণনা, জলকেলি, পর্বতবর্ণনা, যুদ্ধবর্ণনা প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায়; মাঘের মধ্যে এসকলের কোনটীরই অভাব নাই। এক এক স্থানে বর্ণনাও যেমন স্বাভাবিক, পদলালিত্যও সেইরূপ মাধুর্যপূর্ণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একাদশ সর্গের—

"বিকচকমলগন্ধৈরন্ধয়ন্ ভৃঙ্গমালাঃ
সুরভিতমকরন্দং মন্দমাবাতি বাতঃ।
প্রমদমদনমাদ্যদ্ যৌবনোদ্দামরামা-
রমণরভসখেদস্বেদবিচ্ছেদদক্ষঃ॥ ১১।১৯।

শ্লোকটী উপস্থাপিত করিতে পারি। ইহার টীকায় মল্লিনাথ মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন, 'আচার্যোক্ত শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারতা, ওজঃ, কান্তি, সমাধি এই দশটী কাব্যের গুণই ইহাতে বর্তমান আছে। রসিকেরা ইহা উপভোগ করুন।' মালিনী-ছন্দে রচিত এই শ্লোকটী সত্যই অপূর্ব—যেন হীরার টুক্‌রা।

তারপর—

"লুলিতনয়নতারাঃ ক্ষামবক্ত্রেন্দুবিম্বা
রজনয় ইব নিদ্রাক্লান্তনীলোৎপলাক্ষ্যঃ

* * *

* * * ।১১।২০।

যেন একখানি ছবি। এরূপ সুন্দর প্রভাত-বর্ণন আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার অন্তঃপুরের নটীগণের প্রভাতকালীন অবস্থার সহিত ইহা তুলনা করিতে পারেন। সমগ্র

একাদশ সর্গটাই এইরূপ সুন্দর সুন্দর বর্ণনায় পূর্ণ। কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়া মাঘের একাদশ সর্গ আবৃত্তি করুন পদলালিত্যে প্রাণ মুগ্ধ হইয়া যাইবে। আমরা ইংরেজ কবি Shelley, Swinburn, Tennyson এর পদলালিত্যে মুগ্ধ হইয়া পড়ি কিন্তু আমাদের ভারতীয় কবিগণের পদলালিত্যও অল্প নয়। অবশ্য শ্রীহর্ষের 'নৈষধকাব্য' পদলালিত্যের খনি। তাহার পর 'শিশুপাল বধের' চতুর্দশ সর্গে 'ভীষ্মের' শ্রীকৃষ্ণস্তুতি ছলে অবতারবর্ণন প্রকৃতই আনন্দদায়ক। যেমন সুন্দর ছন্দ সেইরূপ সুন্দর বর্ণনা। বস্তুতঃ ভারবির অনুকরণে রচিত হইলেও প্রতিভাবলে অনুকরণ কিরূপ অপরূপ রূপ ধারণ করে, তাহা মাঘের কাব্য হইতে সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। বিগত সহস্রাধিক বর্ষ কবি মাঘ তাঁহার পীযূষনিষ্যন্দিনী বাণীর দ্বারা ভারতবাসীকে তৃপ্ত করিতেছেন ইহা তাঁহার কম গৌরবের পরিচয় নহে (অনেকের মতে কবি মাঘ অষ্টম অথবা নবম শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন)। আমরা তাঁহার পরিচয় অতি অল্পই জানি। তিনি কবিপরিচয়ে বলিয়াছেন, তাঁহার পিতামহের নাম সুপ্রভদেব। তিনি রাজা বর্মলের[১] মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সর্বাশ্রয়। এই মাত্র জানিলেও তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে পারি। তিনি যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বিচারচতুর ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন উক্তির সহিত আমরা আবার আবৃত্তি করি—

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥"

(৩)

বেঙ্গল টাইম

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম. এ.

কালপরিমাপক ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব হইতেই দিবারাত্রিকে ২৪ অংশে বিভক্ত করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। ঐরূপ অংশের নাম হোরা। আমাদের দেশে জন্ম পত্রিকা রচনায় এখনও জন্মলগ্নের হোরা উল্লেখ করিতে হয়। হোরা হইতে hour হইয়াছে, তাহাকে আমরা ঘটিকা বা ঘণ্টা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকি। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে দিবারাত্রির ষষ্ট্যংশ কাল অর্থাৎ এক দণ্ডকে বুঝাইতে ঘটি বা ঘটিকা শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কারের পরে মধ্যাহ্নকালের সহিত ১২ ঘটিকার ঐক্য করিয়া কাল

১ পণ্ডিত প্রবর A. B. Keith রাজার নাম "বর্মলাতা" ধরিয়াছেন (Classical Sanskrit Literature, Heritage of Indian Series, p. 51)। ইহা ভুল বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত পাঠ 'বর্মল'।

গণনার ব্যবস্থা হইল। এই মধ্যাহ্ন প্রতিদিন কিন্তু একই সময়ে সংঘটিত হয় না। সারা বৎসরের মধ্যাহ্ন কালের গড়মান লইয়া তাহাকেই ঘড়ির ১২টা বলিবার ব্যবস্থা হইল। ঘটিকা যন্ত্র যদি নিভুর্লভাবে সমগতিতে চলিতে থাকে, তবে প্রকৃত মধ্যাহ্ন (অর্থাৎ middle of the day) বৎসরের কতক সময়ে ১২টার পূর্বে এবং কতক সময়ে ১২টার পরে সংঘটিত হইতে দেখা যাইবে। কিন্তু ১২ ঘটিকা হইতে এই পার্থক্য কখনই ১৫।১৬ মিনিটের অধিক হইবে না। এই প্রকার ঘড়িকেই স্থানীয় মধ্যম সময় (local mean time) রক্ষক ঘড়ি বলা হয়। কোন স্থানের জন্য গণনালব্ধ সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও মধ্যাহ্নকাল এই ঘড়ি অনুসারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। এই ঘড়ি নির্দেশিত কালই স্থানীয় সময়। পূর্বপশ্চিম ভেদে বিভিন্ন স্থানে সূর্যোদয় কাল বা মধ্যাহ্নকালের বিভিন্নতা হেতু স্থানীয় সময়ও ভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে। যেমন গ্রীণউইচ হইতে কলিকাতার মধ্যাহ্নকাল ঘঃ ৫।৫৩।২১ সেঃ পূর্বে হওয়া জন্য উভয় স্থানের স্থানীয় সময়ের পার্থক্যও উহাই। এই উপায়েই প্রতিস্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হইয়া থাকে এবং তদনুসারে স্থানীয় সময়রক্ষক ঘড়িও চালান হইয়া থাকে। স্থানীয় সময় অনুসারেই দৈনন্দিন কার্যাদি করা সুবিধাজনক। জন্ম-পত্রিকা প্রভৃতি গণনাতেও স্থানীয় সময়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রমশ রেল ও টেলিগ্রাফের বিস্তার হওয়াতে স্থানীয় সময়ের ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা দেখা গেল। স্থানীয় সময় প্রতিস্থানে ভিন্ন প্রকার; তৎপরিবর্তে দেশের সর্বত্র একই প্রকার সময় প্রবর্তন রেল ও টেলিগ্রাফের কার্যের জন্য অপরিহার্য হইয়া উঠিল। প্রতিদেশে উক্ত প্রকার সময়ের প্রবর্তন করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইল Standard time. ভারতে পূর্বে যে Standard time বা রেলওয়ে টাইম ছিল তাহা কলিকাতার সময় অপেক্ষা ৩৩ মিনিট পশ্চাৎবর্তী। প্রকৃত পক্ষে উহা মাদ্রাজের স্থানীয় সময় এবং গ্রীণউইচ সময় অপেক্ষা উহা প্রায় ঘঃ ৫।২১ মিঃ অগ্রবর্তী। কিছুকাল পরে ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময়কে পরিবর্তিত করিয়া গ্রীণউইচের ঘঃ ৫।৩০ মিঃ পূর্ববর্তী করা হইল। এই সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় অপেক্ষা মিঃ ২৩।২১ সেঃ পশ্চাৎবর্তী। বর্তমানে ইহাই সর্বভারতীয় অভিন্ন স্ট্যাণ্ডার্ড সময় বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে। ব্রহ্মদেশে যে Standard time বা রেলওয়ে টাইম ব্যবহৃত হয়, তাহা উক্ত সময় হইতে একঘণ্টা অগ্রবর্তী এবং কলিকাতার সময় অপেক্ষা মিঃ ৩৬।৩৯ সেঃ অগ্রবর্তী।

বর্তমানে শত্রুপক্ষীয় আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতের স্থানে স্থানে যে নিষ্প্রদীপ অবস্থা চলিতেছে, তাহারই অছিলায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বাংলাদেশে বেঙ্গলটাইম নামক অন্য একপ্রকার স্ট্যাণ্ডার্ড সময় প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় অপেক্ষা এক ঘণ্টা অধিক এবং কলিকাতার স্থানীয় সময় অপেক্ষা মিঃ ৩৬।৩৯ সেঃ অধিক। প্রকৃত পক্ষে ইহা ব্রহ্মদেশের স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। পূর্বে সমগ্র ভারতের সহিত আমাদের যেরূপ সময়-গত ঐক্য ছিল বর্তমানে আমাদের ঐক্য হইল ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপ ও সুমাত্রাদ্বীপের সহিত। গভর্ণমেণ্টের

এইরূপ সময়নির্ণয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপকে অনেকেই অহেতুক ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছে। এইরূপ সময়ের পরিবর্ত্তন না করিয়াও যে উদ্দেশ্যে ইহা করা হইয়াছে তাহা অন্য প্রকারে অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিত। ইহাতে অকারণে লোককে নানা অসুবিধার মধ্যে টানিয়া আনিয়া ফেলা হইয়াছে। কলিকাতার সময়ের পরিবর্ত্তে যদি ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় বাংলার সর্বত্র প্রবর্ত্তন করা হইত তাহা হইলে সর্বভারতীয় ঐক্যের খাতিরে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে আমাদিগকে ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টার সূক্ষ্ম পূর্বাভাস বলিয়া মনে হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে অনেকস্থলে Summer time এর প্রচলন আছে। তথায় গ্রীষ্মকালে ঘড়িগুলিকে একঘণ্টা ফাস্ট করিয়া সময় অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে ১৯২৫ খ্রী° অব্দে Summer Time Act করিয়া এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই Summer timeকেই আইনসঙ্গত সময় বলিয়া চালাইবার ব্যবস্থা হয়। দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডে যাহা করিবার জন্য আইনের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, এদেশে তাহা গভর্ণমেণ্টের আদেশ দ্বারাই হইয়া গেল, আইন সভায় মতামত গ্রহণ আবশ্যক হইল না।

এই বেঙ্গল টাইম যাহা বার্মা টাইমের নামান্তর ইহা ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখা আমাদের কর্তব্য। কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে সময়ের আবশ্যকতা, তাহা নহে। অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে ঘটনার সময়ের উল্লেখ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে বেঙ্গল টাইম ব্যবহার না করিয়া কলিকাতা সময় অথবা স্থানীয় সময় (কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানের জন্য) উল্লেখ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করা উচিত। তাহা করিলে ভবিষ্যতে অনেক প্রকার অনিশ্চয়তা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। বিশেষতঃ শিশুর জন্মসময় লিপিবদ্ধ করিতে হইলে জন্মসময়কে কলিকাতার সময়ে পরিবর্তিত করিয়া রাখাই সঙ্গত, তাহাতে গণনারও সুবিধা হইবে এবং ভবিষ্যতে জন্মসময় সম্বন্ধে কোন প্রকার ভুল ধারণাও আসিতে পারিবে না।

কেহ কেহ বলিতেছেন যে, যেহেতু কলিকাতা-সময়ের বর্তমানে আর অস্তিত্ব নাই, কলিকাতার সময়ের উল্লেখ অতঃপর কি করিয়া আমরা করিতে পারি? এ যুক্তি ঠিক নহে। কেননা সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও মধ্যাহ্নকাল হইতেই সময় নির্ণয় করিতে হয়—উহা দ্বারা পরিদর্শকের স্থানের স্থানীয় সময়ই প্রথমে নির্ণীত হইবে। প্রতিস্থানের জন্য যে স্থানীয় সময় আছে আমরা কোন প্রকারেই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারি না, কেননা উহা স্ট্যাণ্ডার্ড সময়, Summer time, Bengal time প্রভৃতির ন্যায় স্বীকৃত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালা দেশে যে সকল পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে অতঃপর পূর্বের ন্যায়ই কলিকাতার স্থানীয় সময়েই সূর্যোদয়াদি ও তিথি প্রভৃতির কাল প্রদর্শিত হইতে থাকিবে।

আমাদের কথা

কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি ভারতের ধর্মজগতে একটী স্মরণীয় দিন। এই দিন শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক পাঞ্জাব প্রদেশে আবির্ভূত হ'ন। তাঁহার উদার মতবাদ ধর্মরাজ্যের এক অতুলনীয় অবদান। আর তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বীরা বর্তমানে বীর ও যোদ্ধজাতিরূপে ভারতের গৌরবস্থল।

নানকের অতিমানব জীবনীর বিষয় ইতিপূর্বে শ্রীভারতীতে (৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পাঠকবর্গকে এই শুভদিনে গুরু নানকের জীবন চরিত ও উপদেশাবলী আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

আমরা এই বীরজাতির ধর্ম গুরুকে তাঁহার জন্ম তিথি দিবসে প্রণাম করি ও প্রার্থনা করি যেন ভারত আবার শৌর্য-বীর্যে পূর্বকীর্তি অর্জন করে।

* * *

বহুকাল পূর্বে (প্রায় ৫ সহস্র বৎসর) পুণ্যময়ী এই কার্ত্তিকী পূর্ণিমা রজনীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে অপূর্ব প্রেম ধর্মের প্রকট লীলা দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই অপ্রাকৃত রাসলীলা সাধারণের বোধগম্য নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রাকৃত ও স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ মাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহার বিকৃত ব্যাখ্যা করে। আত্মবিস্মৃত প্রেমের পূর্ণ পরিণতি অদ্বৈত জ্ঞানে। ব্রজ গোপিনীরা কৃষ্ণভাবনায় বিভোরা হইয়া প্রত্যেকেই নিজকে কৃষ্ণ মনে করিতেছেন—ইহাই অদ্বৈত তত্ত্বের মূল কথা নয় কি? পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব রাসলীলার ব্যাখ্যায় অক্ষম, ইহার গভীরতায় স্তব্ধ, আর সাধারণ লোকে ইহার সমালোচনায় ব্যগ্র!

* * *

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে ভারতের অন্যতম গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য অনেকে উৎসুক। কিন্তু আমাদের মনে হয় ইহার দ্বারা বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হইবে। কবিগুরু কি ভাব ও আদর্শ লইয়া বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা ও রূপ দিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই অনেক স্থলে বলিয়াছেন এবং বিশ্বভারতীর ২৯ সংখ্যক পুস্তিকাতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীকে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল করা ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনভূমি করাই ইহার বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব দানকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রকৃষ্ট পন্থা।

পুস্তক সমালোচনা

রামদাস ও শিবাজী—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস্ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৭৩।

গ্রন্থকার একজন অবসর প্রাপ্ত সিবিলিয়ান। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি কথাসাহিত্য আছে। সে পুস্তকগুলি বাজারে খুব প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও সাহিত্যের দিক দিয়া তাহাদের মূল্য আছে। আলোচ্য পুস্তকখানি একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা' প্রদান করিবার জন্য আহূত হইলে তিনি মারাঠা ইতিহাসের একাংশ নিজ বক্তৃতার বিষয় নির্বাচিত করিয়া মারাঠাজাতির অভ্যুত্থানে সমর্থ রামদাস স্বামী ও তদীয় শিষ্য মহারাজ শিবাজীর দান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই দুই মহাপুরুষের জীবনেতিহাস যথাযথ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ও সেই সঙ্গে তৎকালের মারাঠা দেশের ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। পরে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজ শিবাজীর জীবনবৃত্তান্ত সাধারণে পরিচিত থাকিলেও তাঁহার প্রকৃত ইতিহাস অনেকেই জানেন না। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি একজন ঠগ বা পিণ্ডারীর অধিক কিছু ছিলেন না। তাঁহারা বলেন, শিবাজীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরস্বাপহরণ পূর্বক আপন শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। ঐ সমস্ত বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের পুস্তক পড়িয়া আমাদের দেশের অনেক ইতিহাসলেখকও ঐ মত পোষণ করেন। এই মত যে বৈদেশিকগণের বিদ্বেষ-প্রসূত তাহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং বর্তমান লেখকও নানা প্রমাণের দ্বারা মহারাজ শিবাজীর লোকোত্তর চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি কত উদারহৃদয় ও মহানুভব ছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস, ছত্রপতি শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন। গ্রন্থকার প্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে এ ধারণা ভ্রান্তিমূলক। শিবাজী কিছু কিছু লেখাপড়া জানিতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিবাজী' শীর্ষক কবিতায় এই মহাপুরুষের জীবনের উদ্দেশ্য এক কথায় বলিয়া গিয়াছেন—'এক ধর্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিব অখণ্ড ভারত।' অখণ্ড ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করাই শিবাজীর মূলমন্ত্র ছিল এবং এই সংকল্প সাধনের জন্য তিনি জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন।

রামদাস ছিলেন শিবাজীর গুরু, ইহা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু তাঁহার জীবনেতিহাসের বিষয়ে আমরা অতি অল্পই জানি ও তাঁহার বিস্তৃত জীবনেতিহাস জানিবার উপায়ও নাই। রামদাস স্বামীর নিজ গ্রন্থসকল ও তদীয় শিষ্যদের লেখা হইতে স্বামিজীর সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, লেখক তাহা এই পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামদাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'দাসবোধ'। তাঁহার শিষ্যেরা গুরুর প্রধান প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া এক পঞ্জী প্রস্তুত করেন। এই পঞ্জী 'বাকেনিশী প্রকরণ' নামে খ্যাত। গ্রন্থকার এই দুইটী

পুস্তক হইতে রামদাসের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রামদাসী সম্প্রদায়ের গিরিধর নামে এক মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি 'গিরিধর সমর্থ-প্রতাপ' নাম দিয়া স্বামিজীর এক জীবন চরিত রচনা করেন। এই পুস্তক হইতে সমর্থ সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। রামদাস স্বামী শিবাজীর উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকার বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন। গ্রন্থকার একস্থানে বলিতেছেন—রামদাসের কার্য ছিল স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মসংঘঠন ও শিবাজীর কার্য ছিল স্বধর্ম স্থাপনের জন্য স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠা। অন্যত্র লেখক লিখিয়াছেন—দুইজনেই অবতারী পুরুষ, আধুনিক ভাষায় অতিমানব; কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু। একজন যুক্তি অপর জন শক্তি, ইত্যাদি। পুস্তকখানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য বলা যাইতে পারে। ভারতের ইতিহাসের ছাত্রদের ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে, আশা করা যায়।

পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ইহাতে ভূমিকাসমেত তিনটী পরিচ্ছেদ আছে। এই বিশাল পুস্তকে একটী বিষয়সূচী সম্বলিত থাকা উচিত ছিল; তাহাতে পাঠকের পড়িবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইত। বিদ্যালয়সমূহের পাঠাগারে ও সাধারণ পাঠাগারে পুস্তকখানি রাখিবার বিশেষভাবে উপযুক্ত।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

আমাদের সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, এম. এ., পি. আর. এস. লিখিত। প্রকাশক শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় এম. এ। প্রাপ্তিস্থান ভারতী ভবন, ১১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের নাম বাঙলাসাহিত্যরসিকদের নিকট অজ্ঞাত নহে। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। "আমাদের সাহিত্যে" বাঙলা সাহিত্যের এক সংক্ষিপ্ত অথচ সরস ইতিহাসের সহিত আমরা পরিচিত হই। ইহা বাঙলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শনী স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। নীরস ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্য ইহাতে নাই। লেখক দরদের সহিত বাঙলা সাহিত্যের গৌরবোজ্জ্বল দিকই তাঁহার পাঠকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় সন্নিবেশ করিয়া অধ্যাপক সেন মহাশয় বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছেন। বর্তমানে বাঙলা শিক্ষার বাহনে পরিণত হওয়ায় এই জাতীয় গ্রন্থের সহিত প্রত্যেক প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

নূতন গ্রন্থসংবাদ

প্রত্নতত্ত্ব

১। Buddha and Bodhisattva in Indian Sculpture, Part III—Tables (supplementary) by Dr. Raghu Vir and Yamamoto, Lahore

২। বাস্তুবিদ্যা—কে. মহাদেব শাস্ত্রীর "লঘুবিবৃত্তি" টীকা সমেত। এল্. এ. রবিবর্মা কর্তৃক সম্পাদিত।

ইতিহাস

৩। Ancient India, Vol. IV by Dr. T. L. Shah. History of Ancient India for 1000 years in 4 Vols. (from 900 B C to 100 A D)

৪। রামদাস ও শিবাজী—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

দর্শন

৫। ব্রহ্মসূত্রম্—সর্বভাষ্যকারকৃত পাঠভেদসহিতম্—নিত্যানন্দ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিতম্। শান্তিনিকেতন।

বেদ

৬। সামবেদীয় সুবোধিনী পদ্ধতি—পণ্ডিত দুর্গাদত্ত ত্রিপাঠী কর্তৃক সম্পাদিত। বারাণসী।

সাহিত্য

৭। আমাদের সাহিত্য—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, কলিকাতা।

সাময়িক সাহিত্য—আশ্বিন, ১৩৪৮

সাহিত্য

প্রবাসী—দারা-বাবুলাল সংবাদ—ডাঃ শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো।

ভারতবর্ষ—ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ—অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

,, —রবীন্দ্রনাথের গল্প কবিতার ভাব-উৎস—ডক্টর শ্রীসুরেশ দেব ডি. এস্. সি.

,, বাংলার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য।

,, —বিদ্যাপতি—শ্রীকালিদাস রায় বি. এ. কবিশেখর।

উদ্বোধন—মধুকান্—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

,, —চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার।

বঙ্গশ্রী—বাংলার বৈষ্ণবধর্মে ভক্তিবাদ—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

,, —রকমারি লোকবিদ্যা—বিনয় সরকার।

ধর্ম ও দর্শন

উদ্বোধন—তন্ত্রে অদ্বৈত সাধনা—স্বামী সুন্দরানন্দ।

,, —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—ম. ম. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

,, —কবীরের গুরুবন্দনা—অধ্যাপক শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, এম্. এ.

,, —বাচস্পতি মতে জগৎ কারণ—অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

,, —অন্যথাখ্যাতিবাদ—ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়।

,, বাংলার শাক্ত উৎসবের প্রাচীনতা—অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম্. এ.

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৮ শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

১। সর্বজ্ঞ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য এম. এ. বি. এল্.

২। সেকালের সংস্কৃত কলেজ (৬)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। রামকৃষ্ণের শিবায়ণ—শ্রীপাঁচুগোপাল রায়।

৪। জগদীশ পঞ্চানন—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এ.

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ, বি. এ. কর্তৃক সংকলিত

সাহিত্য (১৩২৬)

বৈশাখ—সুদাসের রাজধানী ও বিশ্বামিত্রের বাসস্থান—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধকারের মতে রাভী নদীর তীরে সুদাসের রাজধানী ছিল এবং সেই স্থানেই বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ বাস করিতেন।

আষাঢ়—সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব—শ্রীঅনন্তকুমার শাস্ত্রী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "The Educative influence of Sanskrit" নামে ইংরেজীতে একটী বক্তৃতা দেন ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ। প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত সুন্দর। যাঁহারা মনে করেন সংস্কৃত গ্রন্থসকল কেবল পারমার্থিক আলোচনায় ব্যাপৃত তাঁহাদিগের ইহা বিশেষভাবে পাঠ করা উচিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃতের দান কিরূপ বিরাট তাহা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। জ্ঞানের এমন কোন বিভাগই নাই যাহাতে সংস্কৃতের কিছু না কিছু স্থায়ী দান আছে। শাস্ত্রী মহাশয় তাহার অপূর্ব ভাষায় ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন।

আশ্বিন—প্রাচীন বাংলার ইতিহাস—শ্রীবিমলাচরণ মৈত্র। মহীপাল ও নরপালের রাজত্বের বিবরণ এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বত যাত্রার কাহিনী।

পৌষ—বৈবস্বত মনু—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়। বৈদিক নানাপ্রকার অগ্নি ও দেবতার বিভাগ সম্বন্ধীয় আলোচনা। শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্যে" (১৩২৪।২৫।২৬ সালে) অনেকগুলি বৈদিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক নূতন তথ্য আছে। যাঁহারা বৈদিক আলোচনায় উৎসুক তাঁহারা এইগুলি পাঠ করিতে পারেন।

সাময়িক সংবাদ

ডাঃ বিমলাচরণ লাহার নূতন সম্মানলাভ—ডাঃ বিমলাচরণ লাহা এম. এ., বি. এল্, পি. এইচ্. ডি., লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডি. লিট্" উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তকে বর্ণিত ভারত"।

শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজীর জন্মোৎসব—আগামী ১৫ই কার্তিক শনিবার ইংরেজী ১লা নভেম্বর শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের বাৎসরিক তিরোভাব তিথি। এই তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ আশ্রমে বিশেষরূপ উৎসবের আয়োজন হইবে। শিবপুরস্থ আশ্রমেও এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

শোক সংবাদ

গত ১৩ই আশ্বিন বিজয়া দশমীর দিন ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'ইণ্ডিয়ান্ কালচারের' ভূতপূর্ব অন্যতম সম্পাদক ডাঃ বিমলাচরণ লাহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র লাহা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। ডাঃ লাহার এই শোকে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার আমাদের ভাষা নাই। একমাত্র ভগবানই তাঁহার এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে পারেন।

॥ ओ३म् हरिः ॥

आयास्यं माण्डवञ्च वसिष्ठस्यापदासे द्वे सोमसाम वैनयो रुत्तर मायास्यञ्चैव माण्डवञ्चैवोद्वच्च प्राजापत्य मायास्यञ्चैव कण्वरथन्तर मायास्यञ्चैव तिरश्चीननिधनं प्रजापतेः सदोविशीयं जमदग्नेः स्वबासिनी द्वे वसिष्टस्य प्लवो ऽग्ने रौरव मिन्द्रस्य यौधाजयं युधाजेर्वाङ्गिरसस्य युधाजीवस्य वा विश्वामित्र-स्यैन्द्रस्याच्छिद्रयिष्ठे द्वे वसिष्ठस्य वा भारद्वाजे द्वे आभीशवे द्वे माण्डवे द्वे अङ्गिरसा मभीवास परिवाससी द्वे वैणसौमक्रतवीये द्वे माण्डवं वैनयो रुत्तरं प्रजा षदेर्गद्दौ द्वौ कश्यपस्य वा प्रतोदा वङ्गिरसां गोष्टा पुंस्तिनी द्वे महारौरवं च महायौधाजयञ्चाश्वानि चत्वारि सोमसामानि वाग्नेयं चाग्नेर्वा त्रिणिधनं कौत्सं वा यज्ञसारथि वाग्नेवैश्वानरस्य सामनी द्वे द्विहिङ्कारं वा वामदेव्यं द्वितीय मङ्गिरसां चोत्सेध्ननिषेधौ सोमसामानि षड़ाश्वानि वा विष्णोरयमणी द्वे वैष्णवे वाङ्गिरसानि त्रीण्यौक्ष्णोनियानानि त्रीण्यौक्ष्णोरन्ध्राणि वाग्नेयानि त्रीणि द्व्रध्यासं च सौषाम वसिष्ठस्य वा पिप्पल्यौक्ष्णोनियानं वौक्ष्णो रन्ध्रं वा प्रजापतेश्च वाजजिद्व वैश्वदेवे द्वे इन्द्रसामानि त्रीणि सोमसामनी द्वे स्वःपृष्ठं चाङ्गिरसमिन्द्र-सामानि त्रीणि सोमसामनी च स्वः पृष्ठञ्चैवाङ्गिरसं सोमसागनी चैव देवानां च पवित्र मादित्यानां वा ॥ १ ॥

পুনানঃ সোম ধারয়া এই ঋকে ষোলটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম সামের নাম আয়াস্য, দ্বিতীয় সামের নাম মাণ্ডব এবং তৃতীয় ও চতুর্থ সাম বসিষ্ঠের অপদাস নামক। অথবা শেষোক্ত দুইটী সামের পরবর্ত্তীটী সোম সাম। পঞ্চম সাম আয়াস্য। ষষ্ঠ সাম মাণ্ডব, সপ্তম উদ্বৎ প্রজাপত্য এবং অষ্টম আয়াস্য। নবম সামের নাম কণ্বরথন্তর তিরশ্চীন নিধনযুক্ত দশম সাম আয়াস্য। একাদশ সাম প্রজাপতির সদোবিশীয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সাম জমদগ্নির স্ববাসিনী। চতুর্দ্দশ সাম বশিষ্ঠের প্লবসংজ্ঞক। পঞ্চদশ সাম অগ্নির রৌবব নামে খ্যাত এবং ষোড়শ সাম ইন্দ্রের যৌধাজয় সংজ্ঞক অর্থাৎ যুদ্ধ-জয়ের সাধন। অথবা ইহা অঙ্গিরার পুত্র অঙ্গিরসের যৌধাজয়। অথবা ইহা বিশ্বামিত্রের যুধাজীব। যুধাজীব শব্দের অর্থ বলবত্তম।

পরিতোষিঞ্চতা সুতম্ এই ঋকে পঞ্চদশ সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী ইন্দ্রের অচ্ছিদ্ররয়িষ্ঠ নামে খ্যাত। প্রথমটী অচ্ছিদ্র এবং দ্বিতীয়টী রয়িষ্ঠ। অথবা ইহারা বশিষ্ঠের অচ্ছিদ্ররয়িষ্ঠ। তৃতীয় ও চতুর্থ সাম ভরদ্বাজ কর্তৃক দৃষ্ট। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সামের নাম আভীষব। সপ্তম ও অষ্টম মাণ্ডব। নবম ও দশম সাম অঙ্গিরসের অভিবাস ও পরিবাস নামে খ্যাত। একাদশ ও দ্বাদশ সাম ক্রমে বৈণ ও সোমক্রতবীয় নামে পরিচিত। অথবা ইহাদের অন্তিমটী মাণ্ডব। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সাম প্রজাপতির গূর্দ্দ সংজ্ঞক। অথবা ইহারা কশ্যপের প্রতোদ সংজ্ঞক। পঞ্চদশ সাম অঙ্গিরসের গোষ্ঠ নামক।

আসোম স্বানো অদ্রিভিঃ এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী পুংস্তিনী অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর সাম। তৃতীয় সামের নাম মহারৌরব। চতুর্থ সামের নাম মহা যৌধাজয়।

প্র সোম দেববীতয়ে এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী আগ্নেয় অথবা অগ্নির ত্রিনিধন নামক অথবা কুৎস কর্তৃক দৃষ্ট। অথবা যজ্ঞসারথি নামধেয়। পরের দুটীর দেবতা বৈশ্বানর নামক অগ্নি অথবা ইহাদের অন্তিমটী হিহিংকার বামদেব নামক। চতুর্থ ও পঞ্চম সামের নাম অঙ্গিরসের উৎসেধ ও নিষেধ।

সোম উষ্বাণঃ সোতৃভিঃ এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ছয়টীই সোম সাম অথবা ইহারা আশ্বসংজ্ঞক।

তবাহং সোম রারণ এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বিষ্ণুর রয়মনী নামে খ্যাত অথবা বিষ্ণুদেবতাক। পরের তিনটী আঙ্গিরস।

মৃজ্যমানঃ সুহস্ত্য এই ঋকে আটটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটী উক্ষোনিয়ান অথবা উক্ষোরন্ধ্র নামে খ্যাত। পরের তিনটীর দেবতা অগ্নি। সপ্তম সাম দ্বাধ্যাস নামক অথবা বসিষ্ঠের সীষাম নামক। অথবা বশিষ্ঠের পিপ্পলী অথবা উক্ষো-নিয়ান বা ঔক্ষোরন্ধ্র। অন্তিমটী প্রজাপতির বাজজিৎ যেহেতু ইহাতে বাজ শব্দযুক্ত রহিয়াছে।

অভি সোমাস আয়বঃ এই ঋকে আটটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বৈশ্বদেব—এবং তৎপরের দুইটী ঐন্দ্র। পঞ্চমটী আঙ্গিরস এবং শেষ তিনটী ঐন্দ্র।

পুনানঃ সোম জাগৃবিঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রায় পবতেমদ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের একটী সাম ও পূর্ব ঋক্‌গত সাম, এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সামদ্বয় সোম সাম। দ্বিতীয় ঋকের পরের দুইটী সোম সাম। পবমনা অসৃক্ষত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দেবগণের পবিত্র। অথবা ইহা আদিত্যগণের পবিত্র।

ইতি আর্ষের ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের প্রথম খণ্ড

औशनं वृषस्य च जानस्याभीवर्त्तौ द्वा वौशने चैव सर्वानि वौशनानि वाजसनी द्वे वाजजितौ द्वे वाराहं वोत्तरम् सर्वाणि वैव वाराहाण्याङ्गिरसाम् संक्रोशास्त्रयः सामसुरसी द्वे सामसरसे वा वेणोर्विशाले द्वे गोतमस्य तन्त्रातन्त्रे द्वे अगस्त्यस्य यमिके द्वे इन्द्रस्य वारवन्तीये द्वे मरुतां वा कालकाक्रन्दौ ज्याह्रोडौ वा वासिष्ठान्यष्टौ वसिष्ठस्य जनित्रे द्वे अङ्गिरसां व्रतोपोहो वासिष्ठस्य वा सम्पा वैयश्वश्च सोमसामनी चैषश्च माधुच्छन्दसश्च ॥ २ ॥

প্র তু দ্রব এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী উশনা কর্তৃক দৃষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাম জনপুত্র বৃষের অভীবর্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম সাম উশনা কর্তৃক দৃষ্ট অথবা সকল সামই উশনা কর্তৃক দৃষ্ট।

প্র কাব্যম্ এই ঋকে চারিটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম দুইটী বাজসনীয়। দ্বিতীয় দুইটী বাজজিতী অথবা ইহাদের অন্তিমটী বারাহ। অথবা সমুদয় সামই বারাহ।

তিস্রো বাচঈরয়তি এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই অঙ্গিরসের সংক্রোশ।

অস্য প্রেষ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুটীই সামসুরসী অথবা সাম সুরস।

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাম্ এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম দুইটী বেণুর বিশাল সংজ্ঞক। পরের দুইটী গোতমের তন্ত্র ও অতন্ত্র।

অভি ত্রি পৃষ্ঠম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অক্রাংৎ সমুদ্রঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটি অগস্ত্যের যমিক। কনিক্রন্তি এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের বারবন্তীয়। এষ স্যতে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। পবস্ব সোম মধুমান্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী কালক্রন্দ সংজ্ঞক অথবা ইহাদের নাম জাহ্রোড়।

গেয়গানের ১৫।২।৮ এর হাউ জনৎ হইতে আরম্ভ করিয়া হাওহায়ি ইহা পবস্বসো পর্যন্ত সাম সকলের অন্য নাম কথিত হইতেছে। এই আটটী সাম বসিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট। এই আটটী সামের প্রথম দুইটী বসিষ্ঠের জনিত্র। তৃতীয়টী অঙ্গিরসের ব্রতোপহ। অথবা ইহা বসিষ্ঠের সম্পা। চতুর্থটী বৈয়শ্ব এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ষৈষ। এবং অষ্টমটি মধুচ্ছন্দা কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ড

কুৎসস্যাধিরথীয়ানি ত্রীণ্যাশুরথীয়ানি বা বৈশ্বজ্যোতিষাণি ত্রীণি বাচস্সামনো দ্বে দাশস্পত্যে দ্বে কশ্যপস্য চ শোভনং দাশস্পত্যানি চৈব চত্বারি শ্রৌষ্টানি ত্রীণি শ্রুষ্টের্বাঙ্গিরসস্যাগ্নের্বৈশ্বানরস্য সামান্যাত্রশ্চ বাসিষ্ঠশ্চাপাঞ্চ সাম ॥ ২ ॥

প্রসেনানী এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা কুৎসের অধিরথীয় নামে প্রসিদ্ধ। অথবা ইহাদের নাম আশুরথীয়।

প্রতেধারা মধুমতীরশৃগ্রন্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রগায়তাভ্যর্চম-দেবান্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রহিন্বানো জনিতারোদস্যোঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋক্‌ত্রয়াশ্রিত সাম তিনটী বিশ্বজ্যোতিঃ সম্বন্ধীয়।

তক্ষদ্যদী মনসো বেনতোবাক্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুইটী বাচঃ সাম যেহেতু ইহাতে বাক্‌শব্দ বর্তমান রহিয়াছে। সাকমুক্ষোমর্জয়ন্তস্বসার এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা দাশস্পত্যসংজ্ঞক।

অধিযদস্মিন্ বাজিনি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম কশ্যপের শোভন যেহেতু ইহাতে শুভশব্দ রহিয়াছে।

ইন্দুর্বাজীপবতে গোণ্যোঘা এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই চারিটীই দাশস্পত্য।

অয়া পবা পবস্বৈনা এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীর নাম শ্রৌষ্ঠ। অথবা ইহারা আঙ্গিরপুত্র শ্রুষ্ট কর্তৃক দৃষ্ট। এবং ইহার দেবতা বৈশ্বানর নামক অগ্নি।

মহত্তৎ সোমো মহিষশ্চকার এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অত্রি কর্তৃক দৃষ্ট। অসর্জিবক্কারথ্যে যথাজৌ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বাসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট। অপামাবেদুর্ময়স্তর্তুরাণা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অপেয় সাম।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ড

নকুলস্য বামদেবস্য মৈক্ষৌ দ্বৌ মহাকাৰ্ত্তযশশ্চ কার্ত্তবেশং বৌদ্ধসমনশ্চ শ্যাবাশ্বশ্চান্ধীগবং চ ক্রৌঞ্চানি ত্রীণি সোমসামানি বা ত্বাষ্ট্রীসামনী চ বাসিষ্ঠঞ্চ ত্বাষ্ট্রীসাম চ বাসিষ্ঠঞ্চ ত্বাষ্ট্রীসামনী চৈব বাসিষ্ঠঞ্চৈব ক্রৌঞ্চে দ্বে সোমসামানি ত্রীণি ক্রৌঞ্চং চৈব সোমসাম চৈবাঙ্গিরসানি ত্রীণি মৈধমেধানি বা

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ { ৪র্থ সংখ্যা

অনুমান*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষের প্রমাণত্বে অবিশ্বাস না করিলেও নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের যে-সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না, কারণ—আচার্য দিগ্নাগের কথায়—প্রকৃত প্রত্যক্ষ যে সম্পূর্ণ কল্পনাস্পর্শশূন্য তাহা নৈয়ায়িকদের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় না। নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষে যাঁহারা বিশ্বাস করেন না তাঁহারা যে নৈয়ায়িকদের অনুমানও স্বীকার করিবেন না তাহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ প্রত্যেক অনুমানের মূলে কোন না কোন প্রত্যক্ষ আছেই; ধূম ও অগ্নির সহভাব পূর্বে "প্রত্যক্ষ" করা থাকিলে তবেই ধূম হইতে অগ্নির "অনুমান" সম্ভব হয়, নতুবা নহে।—শান্তরক্ষিত এই এক কথাতেই নৈয়ায়িকদের অভিসম্মত অনুমান খণ্ডন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই; প্রত্যক্ষের সংজ্ঞার অন্যায্যতার সাহায্য না লইয়াই তিনি নৈয়ায়িকপ্রোক্ত অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন, এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বপক্ষীয় বিবিধ মতও সবিস্তারে উপস্থিত করিয়াছেন। শান্তরক্ষিতের মতামত উপস্থিত করিবার পূর্বে নৈয়ায়িকদিগের অনুমান সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা দরকার।

পরিণত নৈয়ায়িক মতে অনুমান হইল পঞ্চপদী (অপরকে বুঝানর জন্যই এই পঞ্চপদী অনুমানের ব্যবহার)। প্রথম পদ হইল প্রতিজ্ঞা, যেমন "পর্বতটি বহ্নিমান্"; দ্বিতীয় পদ হইল হেতু, যেমন "যেহেতু ইহাতে আগুন আছে"; তৃতীয় পদ উদাহরণ, যথা "যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি, যেমন রন্ধনাগার"; চতুর্থ পদ উপনয়, যেমন "যে-ধূম সর্বদাই অগ্নির সহিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পর্বতটিতে রহিয়াছে"; পঞ্চম পদ হইল নিগমন, যেমন "অতএব পর্বতটি বহ্নিমান্"। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তৃতীয় পদ (বা অবয়ব, বা অঙ্গ) "উদাহরণ" কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত নহে, প্রকৃত পক্ষে এই উদাহরণই হইল অনুমাণের প্রাণ। বোধ হয় দুইটি পদের সমন্বয়ে এই উদাহরণ পদের উদ্ভব হইয়াছে।—এইবার শান্তরক্ষিত কিভাবে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, second series, No. 12.

পূর্বপক্ষীয় মত উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্। একাবয়ব, দ্ব্যবয়ব, ত্র্যবয়ব, প্রভৃতি সকল প্রকারের অনুমান যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া শান্তরক্ষিত সেগুলি একে একে খণ্ডন করিয়াছেন।

স্বপরার্থবিভাগেন ত্বনুমানং দ্বিধেষ্যতে।
স্বার্থং ত্রিরূপতো লিঙ্গাদনুমেয়ার্থদর্শনম্॥ ১৩৬২ ॥
ত্রিরূপলিঙ্গবচনং পরার্থং পুনরুচ্যতে।
এবৈকদ্বিত্রিরূপোঽর্থো লিঙ্গাভাসস্ততো মতঃ॥ ১৩৬৩ ॥

অর্থাৎ, স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে (নিজের বা অপরের উপলব্ধি অনুযায়ী) অনুমান হইল দ্বিবিধ। স্বার্থ অনুমানের যে লিঙ্গ (=হেতু) তাহার লক্ষণ তিনটি (ত্রিরূপ); এই ত্রিরূপ হেতুর বলেই স্বার্থ অনুমানে অনুমেয়ার্থের উপলব্ধি সম্ভব হইয়া হইয়া থাকে। স্বার্থ অনুমানের হেতুর লক্ষণত্রয় কি কি তাহা কমলশীল বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই তিনটি হইল (১) পক্ষধর্মত্ব, (২) সপক্ষে অস্তিত্ব, ও (৩) বিপক্ষে অনস্তিত্ব। পরার্থ অনুমানের জন্য আরও প্রয়োজন এই যে ত্রিরূপ হেতুটি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইবে। যে হেতুর মধ্যে এই লক্ষণত্রয়ের একটি বা দুইটি মাত্র বর্তমান তাহা হেত্বাভাস, হেতু নহে; সুতরাং তাহার বলে কোন অনুমানও সম্ভব নয়।—শান্তরক্ষিত এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা বৌদ্ধ ন্যায়ের মূল সূত্র। গৌতম, বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির মতে প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটি অবয়ব নহিলে অনুমান সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধাচার্য দিগ্নাগ কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে একমাত্র হেতুপদ হইতেই অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে, যদি অবশ্য তাহাতে উপরোক্ত তিনটি লক্ষণ বর্তমান থাকে। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল অবশ্য এই মতই প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পূর্বে তাঁহারা আর এক সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। একমাত্র হেতুপদই যে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট ইহা স্বীকার করিয়াই এই নৈয়ায়িকরা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আরও বলিতেন যে ঐ হেতুপদ ত্রিলক্ষণ হওয়ারও প্রয়োজন নাই। হেতুর একটি লক্ষণই যথেষ্ট, এবং এই লক্ষণ হইল "অন্যথানুপপন্নত্ব"। পাত্রস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তিনি বলিয়াছেন :—

অন্যথানুপপন্নত্বে ননু দৃষ্টা সুহেতুতা
নাসতি ত্র্যংশকস্যাপি তস্মাৎ ক্লীবাস্ত্রিলক্ষণাঃ॥ ১৩৬৪ ॥

ইহা সম্পূর্ণ commonsenseএর কথা। এই মতে হেতুর অংশ বিচার করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কারণ যদ্ব্যতিরেকে অনুমান সম্ভব হয় না তাহাই অনুমানের সুষ্ঠু হেতু; এবং হেতুর তথাকথিত অংশত্রয় বর্তমান থাকিলেও যদি অনুমান সম্ভব না হয় তবে তাহাকে হেতু বলা যাইবে না।—অংশত্রয় থাকিতেও যে হেতু নিষ্ফল হইতে পারে তাহা পাত্রস্বামীর পক্ষ হইতে দেখাইবার জন্য কমলশীল দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই অনুমানটির উল্লেখ করিয়াছেন :—যেহেতু এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির পুত্র সেইজন্য এই ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ। ন্যায়শাস্ত্রে ইহা হেত্বাভাসের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত।

ইহা হইতে বুঝা গেল, পাত্রস্বামীর মতে অনুমানের হেতুর লক্ষণ মাত্র একটি

(অন্যথানুপপন্নত্ব)। কিন্তু পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে পাত্রস্বামীর এই একলক্ষণক হেতু হইল নেতিবাচক। সেইজন্য পাত্রস্বামী আরও বলিয়াছেন (কা ১৩৬৫) যে এই এক-লক্ষণক হেতুকে চতুর্লক্ষণকও বলা যাইতে পারে, কারণ পূর্বোক্ত লক্ষণত্রয়ও ইহার মধ্যে নিহিত আছে মনে করা যাইতে পারে। প্রধান লক্ষণ অন্যথানুপপন্নত্ব লক্ষ্য করিয়াই হেতুটিকে একলক্ষণক বলা হইয়াছে, এতদ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষণত্রয় অস্বীকার করা হয় নাই।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন, ত্রিলক্ষণ হেতুর সহিত অনুমানের যখন অবিনাভাব সম্বন্ধ রহিয়াছে তখন হেতুর ত্রিলক্ষণত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। পাত্রস্বামী এ-কথা অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে হেতুর ত্রিলক্ষণত্ব সত্ত্বেও যদি অনুমান ব্যর্থ হয় তবে একথা স্বীকার করারই আর কোন কারণ থাকিবে না যে হেতু বাস্তবিকই ত্রিলক্ষণ। কিন্তু ত্রিলক্ষণত্ব সত্ত্বেও হেতু ব্যর্থ হইতে দেখা যায় :—

স শ্যামস্তস্য পুত্রত্বাদ্দৃষ্টা শ্যামা যথেতরে।
ইতি ত্রিলক্ষণো হেতুর্ন নিশ্চিত্যৈ প্রবর্ততে ॥ ১৩৭০ ॥

ত্রিলক্ষণত্বের সহিত হেতুত্বের যে অবিনাভাব সম্বন্ধ নাই তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়। এখানে হেতুটি ত্রিলক্ষণ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনুমান সিদ্ধ হইতেছে না :—সেই ব্যক্তি শ্যামবর্ণ (প্রতিজ্ঞা), যে-হেতু সে এই ব্যক্তির পুত্র (হেতু), যেমন এই ব্যক্তির অপরাপর পুত্রেরাও শ্যামবর্ণ (উদাহরণ)।—অন্যথানুপপন্নত্বকে হেতুর একমাত্র লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে পাত্রস্বামীর মতে তদ্দ্বারা অনুমান সিদ্ধ হয়। পাত্রস্বামী এই একলক্ষণক হেতুর যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা এই :—"ভাব ও অভাব যখন কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হয় তখন ভাব ও অভাব সৎ।" এখানে ভাব ও অভাব বলিতে সমস্ত পদার্থই বুঝাইয়া যাইতেছে সুতরাং সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের কোন দৃষ্টান্ত দেওয়ার উপায়ই নাই ; পক্ষীকৃত বিষয় হইতে দৃষ্টান্তটি পৃথক্ হওয়া চাই, কিন্তু এখানে সে পার্থক্য অসম্ভব। পক্ষীকৃত বিষয়ে হেতুর অস্তিত্ব (presence of the probans in the indicative) ব্যতিরেকে অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না ; এই একলক্ষণক হেতুর বেলায় তাহাও দেখা যাইতেছে, কারণ উদ্ধৃত বাক্যে ("ভাব ও অভাব ইত্যাদি") অন্যথানুপপন্নত্ব পক্ষ ও হেতু উভয়ত্রই বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পঞ্চাবয়ব অনুমান এক্ষেত্রে একলক্ষণক হেতুর দ্বারাই সাধিত হইতেছে, অবশ্য অন্যথানুপপন্নত্বকে হেতুর সম্যক্ লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলে।—এইবার পাত্রস্বামী দ্বিলক্ষণ হেতুর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

"শশলাঞ্ছন অচন্দ্র নহে, কারণ তাহা চন্দ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে"—ইহা দ্বিলক্ষণ হেতুর উদাহরণ। এখানে পক্ষ (proposition) হইল "শশী অচন্দ্র নহে" অথবা "শশী চন্দ্র" ; হেতু হইল "জনসমাজে শশী অর্থে চন্দ্র শব্দের আছে ব্যবহার বলিয়া" ; এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ও হেতু এই দুইটি অবয়ব হইতেই অনুমান সিদ্ধ হইতেছে ; তৃতীয় অবয়বের অবকাশ নাই। দ্বিলক্ষণ হেতুর অপর একটি দৃষ্টান্ত "আত্মা, ঘট প্রভৃতি একপ্রকার অসৎ (কথঞ্চিদসদাত্মনঃ), কারণ শশশৃঙ্গের মত এই সকল পদার্থও কেমন যেন উপলব্ধ হয় না (কথঞ্চিদনুপলভ্যমানত্বাৎ খরবিষাণবৎ)"।

এখানে প্রতিজ্ঞা ও হেতু আছে, কিন্তু বৈধর্ম্যদৃষ্টান্তের অভাব; কারণ ঘটাদি যত ভাববস্তু আছে সমস্তই প্রতিজ্ঞার মধ্যেই অসৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর একটি দৃষ্টান্ত "খরবিষাণাদি এক প্রকার সৎ, কারণ ঘটাদির ন্যায় তাহা এক প্রকার উপলব্ধি করা যায়।" এক্ষেত্রে সমুদয় অভাববস্তুকে প্রতিজ্ঞাতেই ভাব বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং উপযুক্ত উদাহরণ দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইহাও একটি দ্বিলক্ষণ হেতু। ইহাই গেল পাত্রস্বামীর একলক্ষণক ও দ্বিলক্ষণক হেতু বিষয়ক পূর্বপক্ষ। ইহার খণ্ডনার্থে শান্তরক্ষিত এখন প্রশ্ন করিতেছেন :—

তদিদং লক্ষণং হেতোঃ কিং সামান্যেন গম্যতে।
জিজ্ঞাসিতবিশেষে বা ধর্মিণ্যথ নিদর্শনে ॥ ১৩৮০ ॥

অর্থাৎ, অন্যথানুপপন্নত্বই যদি হেতুর লক্ষণ হয় (অর্থাৎ হেতুত্ব ও অন্যথানুপপন্নত্বের মধ্যে যদি অবিনাভাব সম্বন্ধ বর্তমান থাকে) তবে জিজ্ঞাস্য এই অবিনাভাব সম্বন্ধ কি সর্বপ্রকার হেতু ও তল্লক্ষণের মধ্যে বর্তমান, না তাহা বিশেষ করিয়া ধর্মী সম্বন্ধেই সত্য, অথবা তাহা কেবলমাত্র দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লিখিত ধর্মটি সম্বন্ধেই সত্য; এক্ষেত্রে, এই তিনটি মাত্র পক্ষই সম্ভব। এখন প্রথম পক্ষটির বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে সেক্ষেত্রে কেবল বুঝাইবে সাধ্য ধর্মীতে হেতুর অস্তিত্ব; কিন্তু তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। হেতুর লক্ষণ যে হেতু হইতে পৃথক্ অবস্থিত নহে (অবিনাভাব)—ইহাই যথেষ্ট নহে; আরও দেখাইতে হইবে যে যেখানেই হেতুটি আছে তাহার লক্ষণটিও সেখানেই আছে (পক্ষধর্মত্ব), নতুবা সমস্তই ব্যর্থ। যাহাই চাক্ষুষ (visible) তাহাই অনিত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যাহাই অনিত্য তাহাই কি চাক্ষুষ হইবে? চাক্ষুষত্ব স্বয়ং কখনই অনিত্যত্বের হেতু হইতে পারে না; শব্দ অনিত্য, কিন্তু তাহা কি চাক্ষুষ?

দ্বিতীয় পক্ষটির বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে হেতুর তথাকথিত সম্যক্ লক্ষণ অন্যথানুপপন্নত্ব কেবল মাত্র ধর্মীতেই বর্তমান থাকিলে সেই লক্ষণের দ্বারা কেবল যে হেতুটিই নির্ধারিত হইবে তাহা নহে, উপরন্তু তদ্দ্বারা সাধ্য বস্তুও সাধিত হইয়া যাইবে, সুতরাং হেতুটি স্বয়ং হইয়া পড়িবে নিষ্ফল। অপর দিকে, সাধ্য বস্তু তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলে হেতুও তদ্দ্বারা নিশ্চিত হইবে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে হেতু হইতে পৃথক্ অপর কিছুর দ্বারা সাধ্য বস্তু নির্ণয় করিতে হইবে। উপরন্তু আরও বিবেচ্য এই যে অন্যোন্যাশ্রয় দোষও ইহাতে অপরিহার্য। কারণ সাধ্যের সিদ্ধি হেতুর সিদ্ধির উপরেই নির্ভর করে, যেহেতু হেতুর তাহাই হইল সার্থকতা; কিন্তু এখানে হেতুর সিদ্ধিও সাধ্যের সিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে বলিতে হইবে, যেহেতু সাধ্য ও হেতুর অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।—কমলশীল এইখানে মূলের উল্লেখ না করিয়া দুইটি মূল্যবান্ কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

বিনা সাধ্যাদদৃষ্টস্য দৃষ্টান্তে হেতুতেষ্যতে।
পরৈর্ময়া পুনর্ধর্মিণ্যসংভূষ্ণোর্বিনামুনা ॥
অর্থাপত্তেশ্চ শাবর্যা ভৈক্ষবাশ্চানুমানতঃ।
অন্যদেবানুমানং নো নরসিংহবদিষ্যতে ॥

অর্থাৎ "কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে দৃষ্টান্তেই হেতুত্ব অবস্থিত, এবং তাঁহারা আরও বলেন যে দৃষ্টান্তে হেতুত্ব সাধ্য হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থান করে না। আমাদের মতে কিন্তু হেতুর ধর্ম এই যে তাহা ধর্মীতে সাধ্যার্থ হইতে পৃথক্ রূপে অবস্থিত নহে। শবরের শিষ্যগণ অর্থাপত্তির (presumption) সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন; ভৈক্ষবগণ (=বৌদ্ধ ?) করেন অনুমান হইতে; আমরা কিন্তু মনে করি যে অনুমান নরসিংহবৎ, অর্থাৎ একই সঙ্গে তাহার দুইটি রূপ"।—কমলশীল কারিকাটির উপর বিশেষ কিছু টিপ্পনী করেন নাই, কাজেই ইহার সম্যক্ অর্থ বুঝা দুষ্কর।

অন্যথানুপপন্নত্ব সম্বন্ধে যে তিনটি পক্ষ স্বীকার করা হইয়াছিল (১৩৮০ সংখ্যক কারিকার উপর মন্তব্য দ্রষ্টব্য) তাহার দ্বিতীয়টি এতদ্দ্বারা নিরস্ত হইল। তৃতীয়টির বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

নিদর্শনেঽপি তৎসিদ্ধৌ ন স্যাদ্ধর্মিণি সাধ্যধীঃ।
ন হি সর্বোঽপসংহারাত্তস্য ব্যাপ্তির্বিনিশ্চিতা ॥ ১৩৮৯ ॥

এই দুরূহ কারিকাটির কমলশীল যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—হেতুর সহিত যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের (অবিনাভাব) আলোচনা হইতেছে তাহা যদি কেবল দৃষ্টান্তের ধর্মীতেই বর্তমান থাকে এবং সাধ্যধর্মীতে বর্তমান না থাকে তবে তদ্দ্বারা আদৌ প্রমাণিত হইবে না যে হেতুটি ধর্মীতে বর্তমান, কারণ সেক্ষেত্রে সাধ্যধর্মীতে হেতুর সহিত ঐ অবিনাভাবের ব্যাপ্তিই ঘটিবে না।

ইহার পরেই শান্তরক্ষিত পাত্রস্বামীর দ্বারা উপস্থাপিত একলক্ষণক ও দ্বিলক্ষণ হেতুর উদাহরণ গুলির ব্যর্থতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন,

ভাবস্য হি সদাত্মত্বং সর্বৈরেব বিনিশ্চিতম্।
কথঞ্চিত্তস্য সাধ্যত্বং কিমিত্থমিত্যভিধীয়তে ॥ ১৩৯১ ॥

পাত্রস্বামী একলক্ষণক হেতুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছিলেন "ভাব ও অভাব যখন কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হয় তখন ভাব ও অভাব সৎ।" শান্তরক্ষিত ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিতেছেন, ভাব-বস্তু যে সদাত্মক তাহা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু তাহা হইলে ভাববস্তুর জ্ঞান কথঞ্চিৎ সম্ভব—এরূপ বলার কারণ কি? একথাও বলা যায় না যে সর্বভাবের ঐক্যে বিশ্বাসবান্ সৎকার্যবাদী সাংখ্যগণের অনুরোধেই এখানে "কথঞ্চিৎ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে, কারণ সাংখ্যগণও স্বীকার করিয়া থাকেন যে বিকারভেদে বিবিধ ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকাশিত হয়। মাধ্যমিকগণ বলিয়া থাকেন যে সকল ভাবই নিঃস্বভাব, কিন্তু তাঁহাদিগকেও কার্যক্ষেত্রে প্রতি পদেই "তত্ত্বতঃ" ইত্যাদি বিশেষণের আশ্রয় লইতে হয়—যাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাও সকল ভাববস্তুর নিঃস্বভাবত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ নহেন (কা ১৩৯২-৩)।

পাত্রস্বামী দ্বিলক্ষণ হেতুর যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ('শশলাঞ্ছন অচন্দ্র নহে') তাহাও দূষণীয়। এখানে দ্বিতীয় অবয়ব হইল "কারণ তাহা চন্দ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে"; কিন্তু

চন্দ্র বলিয়া এই যে কথিত হওয়া তাহা পক্ষটি (অর্থাৎ চন্দ্র) যেখানেই বর্তমান সেখানেও আছে (চন্দ্রত্বেনাপদিষ্টত্বং সপক্ষেঽপ্যনুবর্ততে) ; উপরন্তু রূপকার্থে ইহা মনুষ্য, কর্পূর, রজতাদি সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (কা ১৩৯৫)।—পাত্রস্বামী দ্বিলক্ষণ হেতু প্রমাণ করিবার জন্য আরও যে সকল যুক্তি ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছিলেন সেগুলি অনুরূপ পন্থায় সবিস্তারে খণ্ডন করিয়া শান্তরক্ষিত এইবার দেখাইতেছেন পাত্রস্বামী যে বলিয়াছেন "যেহেতু এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির পুত্র সেই হেতু এই ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ" এইরূপ অনুমানে ত্র্যবয়বত্ব সত্ত্বেও হেতু নিস্ফল হয়, একথা যুক্তিযুক্ত হয় নাই :—

তৎপুত্রত্বাদিহেতূনাং সন্দিগ্ধব্যতিরেকতঃ।
ন ত্রৈলক্ষণ্যসদ্ভাবো বিজাতীয়াবিরোধতঃ॥ ১৪১৬॥

অর্থাৎ এরূপ অনুমান প্রকৃত প্রস্তাবে ত্র্যবয়বীই নহে, কারণ ইহার তৃতীয় অবয়ব উদাহরণ হইল অসিদ্ধ। রন্ধনাগারের উল্লেখ করিয়া "যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি" বলিলে যে উদাহরণ সিদ্ধ হয় তাহা নহে; সেজন্য ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তেরও প্রয়োজন, অর্থাৎ হ্রদাদির উল্লেখ করিয়া আরও বলা প্রয়োজন যে "যেখানে ধূম নাই সেখানে অগ্নিও নাই"। এখন এই আলোচ্যমান অনুমানটিতে এই ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত কোথায়? অর্থাৎ এ-কথা কি বলা যায় "যেহেতু এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির পুত্র নহে সেইহেতু এই ব্যক্তি শ্যামবর্ণ নহে"? কারিকাস্থ "বিজাতীয়াবিরোধতঃ" কথাটির ইহাই তাৎপর্য।—দ্বিলক্ষণ হেতুর প্রসঙ্গে শান্তরক্ষিত আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলির আলোচনা করা এখানে সম্ভব হইবে না।

শান্তরক্ষিত ত্র্যবয়বাদি অনুমানের আলোচনা আরম্ভ করিতেছেন এই বলিয়া :—

প্রতিজ্ঞাদিবচোঽপ্যন্যৈঃ পরার্থমিতি বর্ণ্যতে।
অসাধনাঙ্গভূতত্বাৎ প্রতিজ্ঞানুপযোগিনী॥ ১৪৩০॥

অর্থাৎ, বিরুদ্ধপক্ষীয় নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন যে পরার্থে অনুমান প্রতিজ্ঞাদি তিনটি অবয়ব বিশিষ্ট; কিন্তু এ-কথার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে প্রতিজ্ঞা যখন প্রমাণকার্যের অঙ্গীভূত নহে তখন তাহাকে অনুমানের অবয়ব রূপে স্বীকার করার কোন সার্থকতা নাই। প্রতিজ্ঞা যে কেন প্রমাণকার্যের অঙ্গীভূত নহে তাহা শান্তরক্ষিত অনুবর্তী কারিকাত্রয়ে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা যেহেতু প্রমাণকার্যের সহিত অসম্বদ্ধ সেই হেতু তাহা সাক্ষাৎ ভাবে প্রমাণকার্যের অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে না। বাস্তবিকই "পর্বতটি বহ্নিমান্" এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বারা যে "সাক্ষাৎভাবে" অনুমানের কোন সাহায্য হইতেছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু পারম্পর্যক্রমেও কি প্রতিজ্ঞার দ্বারা অনুমানে কোন সাহায্য হয় না? এখানে বিবেচ্য পরম্পরাক্রমে সাহায্য কাহাকে বলে। যখন কোন তথ্য সম্বন্ধে নির্ধারিত হয় যে সেইটি ভিন্ন আর কিছুই সম্ভব নহে তখন তাহাই হইল সাক্ষাৎ ভাবে প্রমাণ; কিন্তু কোন তথ্য সম্বন্ধে যখন নির্ধারিত হয় যে সেইটি অসম্ভব নহে তখন তাহাই হইল পারম্পর্যক্রমে

প্রমাণ (indirect proving)। শান্তরক্ষিত বলিতেছেন প্রতিজ্ঞার দ্বারা পারম্পর্যক্রমেও অনুমানে কোন সাহায্য হয় না, কারণ প্রতিজ্ঞার দ্বারা কেবল যে যাহা অসম্ভব নহে তাহাই সূচিত হয় একথা বলা যায় না (অসক্তসূচনান্নাপি পারম্পর্যেণ যুজ্যতে)। পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে প্রতিজ্ঞার দ্বারা যেহেতু সাধ্য ও হেতুর বিষয়টি প্রদর্শিত হইয়া থাকে সেইহেতু তাহাও সাধনের অঙ্গীভূত, দৃষ্টান্তেও এই ভাবেই বিষয়টি ইঙ্গিত হয়; কিন্তু একথা ঠিক হইবে না, কারণ সাধ্য বিষয়টিকে অনুমানের প্রথম অবয়বরূপে স্বীকার করার অর্থ হইল হেতু ও উদাহরণ সহযোগে কি প্রমাণ করিতে হইবে তাহা পূর্বাহ্নেই আদেশ করা; এরূপ স্থলে হেতুটি ব্যভিচারী না হইয়া পারে না, এবং প্রমেয় বিষয়টি প্রদর্শন করাও এস্থলে সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

অনুমানের চতুর্থ পদ উপনয় সম্বন্ধে ঋষি গৌতম বলিয়াছেন "উদাহরণাপেক্ষ-স্তথেত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়ঃ" (ন্যায়সূত্র ১।১।৩৮)। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় সূত্রটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—সাধ্যধর্মীর সম্বন্ধে অর্থাৎ যে ধর্মীতে ধর্মবিশেষের অনুমান করিতে হইবে, তাহাতে উদাহরণানুসারী "তথা" অর্থাৎ তদ্রূপ এই প্রকারে, অথবা "ন তথা" অর্থাৎ তদ্রূপ নহে এই প্রকারে উপসংহার অর্থাৎ হেতুর উপন্যাস (হেতুবোধক বাক্য) উপনয়।—আচার্য দিগ্নাগ উপনয় পদের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "তত্রোপনয়বচনং ন সাধনম্, উক্তহেত্বর্থপ্রকাশকত্বাৎ, দ্বিতীয়হেতুবচনবৎ"; অর্থাৎ উপনয় পদ অনুমানের সাধনে কোন সহায়তা করে না, যে হেতু উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার অর্থটি প্রকাশ করাই উপনয়ের একমাত্র কাজ, ইহা হেতুরই একপ্রকার পুনরুক্তি মাত্র। ভাবিবিক্তাদির মতে কিন্তু উপনয় ব্যতিরেকে হেতুই সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা বলেন, সাধ্যটি যাহাতে বর্তমান হেতুটিও যে তাহাতে রহিয়াছে (পক্ষধর্মতা) একথা প্রতিজ্ঞাটির অব্যবহিত পরে হেতুটির উল্লেখ মাত্র করিলেই (হেতুবচনেন) প্রকাশিত হয় না, কারণ হেতুপদটি প্রকৃতপক্ষে সাধক কারণের অভিধান ভিন্ন আর কিছুই নহে (ন খলু পক্ষধর্মত্বং প্রতিজ্ঞানন্তরভাবিনা হেতুবচনেন প্রকাশ্যতে, কারণমাত্রাভিধানাৎ)। যদি প্রতিজ্ঞা হয় "শব্দ অনিত্য", এবং হেতু হয় "কৃতকত্ব"—তাহা হইলে আপনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় না যে প্রতিজ্ঞান্তর্গত শব্দ কৃতকত্ববিশিষ্ট; এজন্য দরকার ঐ উপনয়, যাহা বৌদ্ধ স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। অথবা উপনয়পদের উদ্দেশ্য হইতে পারে প্রতিবিম্বন; হেতুটির উল্লেখের সময় সাধারণ ভাবে শব্দের যে কৃতকত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে, দৃষ্টান্তপদে দেখান হইয়াছে যে কৃতকত্বরূপ সেই হেতুটি সাধ্যের সহিত অবিনাভাবী; উপনয়পদে সাধ্যের সহিত অবিনাভাবী এই হেতুর উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা হেতুপদের পুনরুল্লেখ মাত্র নহে।—ইহাই গেল উপনয় সম্বন্ধে পূর্বপক্ষ। শান্তরক্ষিত ইহার খণ্ডনোদ্দেশ্যে বলিতেছেন:—

প্রতিজ্ঞানভিধানে চ কারণানভিধানতঃ।

কর্তব্যোপনয়স্যোক্তির্ন সদ্ভাবপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ১৪৩৮ ॥

প্রাগুক্তে ভাবমাত্রে চ পশ্চাদ্ব্যাপ্তেঃ প্রকাশনাৎ।
বিবক্ষিতার্থসংসিদ্ধের্বিফলং প্রতিবিম্বকম্॥ ১৪৩৯॥

অর্থাৎ অনুমানে প্রতিজ্ঞার প্রয়োগ যে অসিদ্ধ তাহাই যখন দেখান হইয়াছে তখন সেই প্রতিজ্ঞার পরে (তৎসমনন্তর—কমলশীল) যে হেতুর প্রয়োগ তাহাও সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং উপনয়পদের প্রয়োগও সম্ভব নহে, কারণ এই পদের পূর্বে হেতুপদের উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমে যদি কেবল বলা হয় যে হেতুটি পক্ষে বর্তমান (পক্ষধর্মত্ব), এবং তাহার পর যদি দেখান হয় যে সাধ্যের সহিত এই হেতুর ব্যাপ্তি (অবিনাভাব) রহিয়াছে, তাহা হইলেই যাহা দরকার তাহার সমস্তই বলা হইয়া যায় (বিবক্ষিতার্থসংসিদ্ধি); সুতরাং উপনয়পদে হেতুর প্রতিবিম্বন সম্পূর্ণ নিষ্ফল।—যদি বলা হয় যে হেতুর পক্ষধর্মত্ব জ্ঞাপন করিবার জন্যই উপনয়পদের ব্যবহার, তাহা হইলে হেতুপদে কারণের উল্লেখের অপর কোন সার্থকতা অন্বেষণ করিতে হইবে।

ন্যায়সূত্রে নিগমনের সংজ্ঞা হইল 'হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্বচনং নিগমনম্" (১।১।৩৯), অর্থাৎ "হেতু কথন পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথন নিগমন।" কমলশীল বলিয়াছেন "অতএব শব্দ অনিত্য" এইরূপ নিগমনবাক্যে "অতএব" এই শব্দটীর দ্বারা যে উদাহরণের দ্বারা সংসাধিত হেতুর সামর্থ্য প্রতিজ্ঞাটির অর্থে পুনঃ কথিত হয় তাহাই হইল নিগমন (তস্মাদনিত্য ইত্যাদৌ তস্মাদিত্যনেন হেতোঃ সামর্থ্যমুদাহরণপ্রসিদ্ধমপদিশ্য যৎ প্রতিজ্ঞার্থং পুনর্বচনং ক্রিয়তে তন্নিগমনম্)। একথার বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে, পূর্বে যখন দেখান হইয়াছে যে প্রতিজ্ঞাই অসিদ্ধ (প্রতিজ্ঞাপ্রয়োগঃ···নাস্তি) তখন যে-নিগমন এই প্রতিজ্ঞারই অনুবাদ মাত্র তাহা কখনই সাধনের অবয়ব হইতে পারে না। আচার্য দিগ্নাগ এইজন্য বলিয়াছেন "নিগমনং পুনরুক্তত্বাদেব ন সাধনম্"। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি এই আপত্তি নিরসনের জন্য বলিয়াছেন "নিগমন পুনরুক্তি মাত্র নহে, কারণ প্রতিজ্ঞা হইল সাধ্যের নির্দেশ কিন্তু নিগমন হইল সিদ্ধের নির্দেশ; আরও বিবেচ্য এই যে নিমগন ব্যতিরেকে সিদ্ধি সম্ভবই নহে, কারণ নিগমনবাক্য কথিত না হইলে অন্য অবয়বগুলি সত্ত্বেও শব্দ নিত্য কি অনিত্য এ-সম্বন্ধে শঙ্কা থাকিয়া যায়; সেইজন্যই এই শঙ্কা অপসরণ করিবার উদ্দেশ্যে সিদ্ধিনির্দেশক পৃথক নিগমনবাক্য প্রয়োজন"।—শান্তরক্ষিত এই সকল আপত্তি বিশেষ গ্রাহ্যই করেন নাই। তিনি উত্তরে কেবল বলিতেছেন :—

ত্রিরূপহেতুনির্দেশসামর্থ্যাদেব সিদ্ধিতঃ।
ন বিপর্যয়শঙ্কাস্তি ব্যর্থং নিগমনং ততঃ॥ ১৪৪০॥

অর্থাৎ, কেবলমাত্র হেতুর সাহায্যেই অনুমান সিদ্ধ হয়, যদি অবশ্য তাহা ত্রিলিঙ্গ হয়। আর অনুমান যদি সিদ্ধ হইয়াই যায় তবে বিপর্যয়েরই বা আশঙ্কা কি? সুতরাং নিগমন ব্যর্থ।

পূর্বপক্ষী অবিদ্ধকর্ণ বলিয়াছেন :—

বিপ্রকীর্ণৈশ্চ বচনৈর্নৈকার্থঃ প্রতিপাদ্যতে।
তেন সম্বন্ধসিদ্ধ্যর্থং বাচ্যং নিগমনং পৃথক্॥

অর্থাৎ, প্রতিপাদ্য বিষয়টি যখন এক তখন বিপ্রকীর্ণ বিভিন্ন বচনের দ্বারা কখনই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না; অনুমানের বিভিন্ন অবয়বের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য এই কারণে নিগমনপদ প্রয়োজন।—ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে তাঁহার রসজ্ঞানও ছিল যথেষ্ট :—

সম্বদ্ধৈরেব বচনৈরেকোঽর্থঃ প্রতিপাদ্যতে।
নাতঃ সম্বন্ধসিদ্ধ্যর্থং বাচ্যং নিগমনং পৃথক্ ॥ ১৪৪১ ॥

অর্থাৎ, প্রতিপাদ্য বিষয় যদি একটি হয় তবে পরস্পর সম্বদ্ধ বচনাবলীর দ্বারাই তাহা প্রকাশিত হইতে পারে; সুতরাং "পৃথক্' একটি নিগমনবাক্যের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।—এতদ্দ্বারা একমাত্র হেতুপদই যে অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট ইহাও ইঙ্গিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এইবার শান্তরক্ষিত কুমারিলের মতের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অনুমান সম্বন্ধে কুমারিলের মত এই কারিকায় ইঙ্গিত হইয়াছে :—

দ্বৈবিধ্যমনুমানস্য কেচিদেবং প্রচক্ষতে।
বিশেষদৃষ্টসামান্যপরিদৃষ্টত্বভেদতঃ ॥ ১৪৪২ ॥

অর্থাৎ, কুমারিলাদি বলিয়াছেন যে অনুমান দুই প্রকারের, বিশেষতোদৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট। কোন ব্যক্তি পূর্বে কোন স্থানে বহ্নিবিশেষ ও ধূমবিশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া পরে বা অন্য কোন স্থলে পুনঃ পুনঃ সেই ধূমবিশেষই দর্শন করিয়া যদি তাহা হইতে সেই পূর্বোপলব্ধ অগ্নিই অনুমান করিতে থাকে তবে তাহাই হইল বিশেষতোদৃষ্ট অনুমান, কারণ পূর্বপ্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত বিশেষই হইল সেই অনুমানের বিষয়! গৃহীত বিষয়েরই গ্রহণ হইতেছে বলিয়া এই অনুমান অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই, কারণ অনুমানের সময় অগ্নিটি আছে কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকায় তাহা প্রত্যক্ষের সময়কার অনুভূতির অনুরূপ নহে; এই সন্দেহনিবৃত্তি রূপ অতিরিক্ত কার্যটি অনুমানের দ্বারাই সাধিত হয়, প্রত্যক্ষে এইরূপ সন্দেহের অবকাশও নাই এবং তাহার নিবৃত্তিও তদ্দ্বারা ঘটে না। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল সূর্যের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তাহা হইতে সূর্যের গতির অনুমান। এ সম্বন্ধে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :— "যেখানে প্রকৃতসাধ্য ব্যক্তি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, কোন হেতুতেই তাহার ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সামান্যতঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ তাহার অনুমিতি হয়—সেই স্থলীয় অনুমানের নাম "সামান্যতো দৃষ্ট"। সূর্যের গতি লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং তাহার ব্যাপ্তিনিশ্চয় কোনও পদার্থেই সম্ভব নহে। কিন্তু সামান্যতঃ দেখা যায়, এক স্থানে দৃষ্ট পদার্থের অন্য স্থানে দর্শন তাহার গতি ব্যতীত হয় না। এক স্থানে দৃষ্ট সূর্যের অন্যস্থানে দর্শন হইতেছে, সুতরাং সূর্য গতিমান।" (ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।—কুমারিলোক্ত অনুমানের এই দ্বৈবিধ্য খণ্ডন করিবার জন্য শান্তরক্ষিত বিশেষ কষ্ট স্বীকার করেন নাই, বৌদ্ধদিগের

ব্রহ্মাস্ত্র সেই ক্ষণিকত্বের সাহায্যেই তিনি কাজ সারিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই যে অগ্নি, ধূম সবই যখন ক্ষণিক তখন প্রত্যক্ষের ধূমাগ্নি ও অনুমানের ধূমাগ্নি সম্পূর্ণ পৃথক্; সুতরাং প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া ধূম হইতে অগ্নির অনুমান অযৌক্তিক। যে-অনুমানে ক্ষণিক বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয় না সেই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই কেবল শান্তরক্ষিত স্বীকার করিয়াছেন। কমলশীল এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন, "তস্মাৎ সর্বত্রৈব সামান্যতো দৃষ্টমেব ক্ষণক্ষয়িষু ভাবেষনুমানং, ন বিশেষতো দৃষ্টং নাম"।

বার্হস্পত্যাদি দার্শনিকগণ অনুমানকে একটা প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন:—

ন প্রমাণমিতি প্রাহুরনুমানং তু কেচন।
বিবক্ষামর্পয়ন্তোঽপি বাগ্‌ভিরাভিঃ কুদৃষ্টয়ঃ ॥ ১৪৫৬ ॥

অর্থাৎ, কোন কোন কুদৃষ্টি ব্যক্তি বলিয়াছেন যে অনুমান একটা প্রমাণই নহে, যদিও তাঁহাদের এই কথা হইতেই বুঝা যায় যে তাঁহাদের তর্ক করিবার ইচ্ছা (বিবক্ষা) আছে।—অনুমান অস্বীকার করিলে যে কেন বিবক্ষাও বর্জন করিতে হয় তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন যে বাক্য হইতে অর্থ সর্বদাই "অনুমান" করিয়া লইতে হয়, সুতরাং যে অনুমানে বিশ্বাস করে না তাহার কথা বলাও উচিত নয়,—অবশ্য কেবলমাত্র শব্দ করাই যদি উদ্দেশ্য না হয়।

শান্তরক্ষিত ইহার পর চার্বাকাদি নানা সম্প্রদায় ও ব্যক্তির মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বিচারেব মধ্যে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই, যদিও ন্যায়দর্শনের ইতিহাসের দিক হইতে এই অংশটুকু অতিশয় মূল্যবান্। চার্বাকগণ নানা কারণে স্বার্থে অনুমান স্বীকার করিতেন না; তন্মধ্যে একটি কারণ এই যে তাঁহাদের মতে বিরুদ্ধ অনুমান সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব; যদি কেহ বলে "কৃতকত্ববশতঃ শব্দ ঘটবৎ অনিত্য" অমনি আর এক জন বলিয়া উঠিবে "শ্রাব্যত্ববশতঃ শব্দ শব্দত্ববৎ নিত্য" (কা ১৪৫৯)। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, সকল অনুমানই নিষ্ফল, কারণ বহু যত্নে যে-সিদ্ধান্ত অনুমান করা হইয়াছে তাহাও অধিকতর বুদ্ধিমান্ লোক খণ্ডন করিয়া দিতে পারে (কা ১৪৬২)। আবার কেহ কেহ বলেন যে পরার্থে অনুমান বক্তার পক্ষ হইতে কোন প্রমাণই নহে, কারণ বক্তার পক্ষে তাহা পূর্বলব্ধ এক প্রমাণের অনুবাদ মাত্র (কা ১৪৬৩)। অবিদ্ধকর্ণও তত্ত্বটীকা নামক গ্রন্থে অনুরূপ একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বচনাত্মক অনুমান (অর্থাৎ যে-অনুমান অপরকে বুঝাইবার জন্য বচনাকারে সাজান হইয়াছে) যে বক্তার পক্ষেও প্রমাণ তাহা নহে; তদ্দ্বারা বক্তা কেবল অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহার নিজের খাদ্য নহে।—শান্তরক্ষিত এই সকল যুক্তি পূর্বোক্ত পন্থায় খণ্ডন করিয়াছেন, এবং উপসংহারে কমলশীল বলিয়াছেন যে যে-অনুমান ন্যায্য পথ পরিত্যাগ করে নাই (ন্যায়াদনপেতম্) সেই অনুমানকে সকলেরই প্রত্যক্ষের (অবশ্য কল্পনাস্পর্শশূন্য প্রত্যক্ষ!) মত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য।

ভাষাতত্ত্ব

(২)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার দত্ত

জ্ঞানের বিশুদ্ধ স্বরূপে জ্ঞেয় বা দ্বিত্ববোধ নাই। তাহা জ্ঞেয়-পরিশূন্য অবস্থা। জ্ঞানে জ্ঞেয়ভ্রান্তি জন্মাতেই জ্ঞানের স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। এই জ্ঞেয়মূলেই ভাষার সৃষ্টি। জ্ঞেয় অভাবে সংজ্ঞা নাই এবং সংজ্ঞা অভাবে ভাষা নাই। বিষয় জ্ঞেয়াকারে জ্ঞানে সংলগ্ন হইলে পর বিষয়ে নাম বা সংজ্ঞা আরোপ করা হয় এবং ঐ সমূহ সংজ্ঞার সমবায়েই ভাষা গঠিত। ভাষা বস্তুতঃ কল্পিত সংজ্ঞা-শব্দের সমষ্টিমাত্র, উহা স্বরূপতঃ কোন বাস্তব আকারবিশিষ্ট পদার্থ নহে। জ্ঞেয়ই ভ্রান্তির কারণ এবং জ্ঞেয়মূলেই স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ আবৃত। এই আবরণ অপসৃত না হইলে জ্ঞানস্বরূপ (ব্রহ্ম) অর্গলাবদ্ধ। কল্পনাত্মক ভাষাই যত অনর্থের মূল। জ্ঞান হইতে কল্পিত ভাষা বাদ পড়িলে সমস্ত ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-কলহ নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হয়। সুতরাং জ্ঞেয়বিষয় (জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ) যে ভাষার জনক সেই বিষয়কে যদি জ্ঞান হইতে বিচ্ছেদ করিয়া দিতে পারা যায়, তবেই ভাষার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। স্বরূপজ্ঞানপক্ষে ভাষা ত্যাগ অপরিহার্য হইলেও, বহুকালের দৃঢ় অভ্যাসমূলে ভাষা-সংস্কার জ্ঞানকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, এখন তাহার মূলোৎপাটন করা অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভাষাতে ও তাহার জনক বিষয়ে, এমন প্রবল আস্থা জন্মিয়া রহিয়াছে যে, তাহাতে অনাস্থা আনয়নের স্পৃহা পর্যন্ত বিলোপ হইয়া গিয়াছে এবং বিষয় ও ভাষা অভাবে জীবনধারণই অসম্ভব—এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যে বিষয়মূলে ভাষার উৎপত্তি, ভাষাই সেই বিষয়কে জ্ঞানের বা আত্মার সঙ্গে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাষা বাদ পড়িলে, ভাষাবিহীন (নামশূন্য) বিষয় দ্বারা জ্ঞান বন্ধন-দশাপ্রাপ্ত হয় না ; কেননা বিষয়ের স্বকীয় বিষয়-স্বরূপ জ্ঞানের অন্তরাল হইলে, ভাষাগত সংস্কার বা স্মৃতির অভাবে, জ্ঞান অনাবৃত ও স্বচ্ছ থাকে।

বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই আত্মার অভিপ্রেত বা আকাঙ্ক্ষার বিষয়, এই ভ্রান্ত ধারণা হইতেই ভাষার উৎপত্তি। বাহ্যিক বিষয়যোগে 'অভাবের' অভাব হইবে বা আত্মার আকাঙ্ক্ষণীয় সুখ লাভ হইবে, এই সংস্কার যতকাল বদ্ধমূল থাকিবে, ততকালই ভাষাতে অনাস্থা আসা সম্ভব নহে; কেননা, ভাষা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারাই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের অন্তরাল বিষয়কে কোন উপায়ে জ্ঞানে নিবদ্ধ রাখিবার উপায় নাই; কাজেই যতকাল বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততকাল বিষয় অন্বেষণের নিবৃত্তি হইবে না এবং ভাষা ত্যাগও

সম্ভব হইবে না। ভাষা ত্যাগের উপায়, বিচার দ্বারা বিষয়ের বিষয়-স্বরূপ অবগত হওয়া অর্থাৎ বিষয়-স্বরূপ যে অস্থায়ী, অসার, অলীক, অনিত্য এবং তাহা আত্মার বাঞ্ছনীয় নহে তাহা বুঝিয়া তদ্রূপ চিন্তানুধ্যানে প্রতিষ্ঠ হওয়া। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই, ধন, জন, সম্পদ, আত্মীয়, কুটুম্ব, স্থাবর, অস্থাবর সর্ব পদার্থ, এমন কি, নিজ দেহও নিত্যসুখের নহে, ইহা সামান্য বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি এইগুলি নিরবচ্ছিন্ন সুখের বিষয়ই হইত, তবে তাহাতে কদাচ বিরতি আসিত না, কেননা, আত্মা নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্যই পাগল। বিষয়ে অনাসক্তি আসিলেই ভাষা ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী।

দেখা যায়, রূপ-জ্ঞান আসার পর নাম-কল্পনা। সুতরাং নাম-রূপ বর্জনের প্রণালী প্রথমে নাম-বর্জন, তৎপরে রূপ-বর্জন। এই প্রণালী ব্যতীত আজীবন বিষয়-বর্জনের চেষ্টা করিলেও বিষয়-বর্জন সম্ভব হইবে না; কেননা, বিষয় জ্ঞানের অন্তরাল হইলেও ভাষামূলক স্মৃতিমূলে বিষয়াসক্তি কোন না কোন আকারে থাকিয়া বিষয়ের জন্য আকুল করিয়া তুলিবে। যদি প্রশ্ন হয়, শাস্ত্রাদি, গুরূপদেশাদি, বাক্যাদি, এমন কি, এই প্রবন্ধ রচনা—ইহা কি ভাষা বাদ দিয়া? তবে উত্তর এই যে, বস্তুতঃ চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে রুদ্ধ করিয়া, হস্তপদাদি গুটাইয়া, সমুদয় বাক্যভাষা বন্ধ করতঃ পঙ্গু হইয়া বসিয়া থাকিবার কথা ইহা নহে। শাস্ত্রচর্চা বিচার-মীমাংসাদি ভাষাদ্বারাই নিষ্পন্ন করিতে হয়। একটু চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে এবং শাস্ত্রেও আছে—যাহা যাহার অভাব করে তাহা তাহা নহে অর্থাৎ যৎকর্তৃক যদ্‌বস্তুর অভাব হয় তাহা তদ্‌বস্তু নহে। জ্ঞান অজ্ঞানের অভাব করে, আলো অন্ধকারের অভাব করে, সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞান নহে এবং আলোও অন্ধকার নহে। সুতরাং যে ভাষা ভাষার অভাব করে তাহা ভাষা নহে, বরং তাহা ভাষা-বিধ্বংসী ভাষা। এই সৃষ্টির যেখানে বিক্ষেপণ, সেইখানেই বিক্ষেপণের অভ্যন্তরে আকর্ষণ বর্তমান। এই আকর্ষণই বিক্ষেপণকে সংযত ও সুরক্ষিত রাখিয়াছে, নতুবা সৃষ্টি-বিপর্যয় ঘটিত। বিক্ষেপণ নিবৃত্ত হইলেই আকর্ষণ সংঘটন হয়। বিক্ষেপণ একটা ক্রিয়া বা গতি কিন্তু আকর্ষণ ক্রিয়া নহে, ইহা বিক্ষেপণের অভাবকারী। বিক্ষেপণে বা গতিমূলে স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিলে পর, পুনঃ স্বরূপে প্রত্যাবর্তনকালে বিক্ষেপণের অভাবকারী আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। আকর্ষণটা সঙ্কোচাত্মক ক্রিয়াবিশেষ দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ তাহা ক্রিয়া নহে। বিক্ষেপণ সংঘটন না হইলে আকর্ষণের অস্তিত্ব কে জানিত? সেই প্রকার যে সমুদয় ভাষামূলক শাস্ত্র, উপদেশ ইত্যাদি, তাহা ভাষাকারে দৃষ্ট হইলেও, ভাষার অভাবকারী বলিয়া তৎসমূহ ভাষা নহে। গ্রাম্যআলাপ, অকেজো প্রয়োজনাতিরিক্ত কথার ঘটা বা বৃথা বাগাড়ম্বর ত্যাগ করিতে পারিলে ভাষার মূল শিথিল হইয়া পড়ে। তদবস্থায়ও আত্মচিন্তা অনেকটা ফলপ্রসূ হয়।

যে বিষয়মূলে ভাষা প্রতিষ্ঠিত সেই কারণরূপী বিষয়বোধ নির্মূল না হইলে ভাষা একেকালীন বাদ পড়িবে না। যে ভাষাযোগে বিষয়-আশয়কে সুখের কল্পনা করা গিয়াছে, সেই ভাষাযোগেই ঐগুলিকে দুঃখের কল্পনা করা কি অসাধ্য ব্যাপার? তাহা দুঃসাধ্য হইলেও

অসাধ্য নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়ই যে আত্মার বাঞ্ছনীয় নহে, তদ্দ্বারা যে তাহার অভীষ্ট পূরণ হইবার নয়, উহার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-বিরতির নিমিত্ত প্রত্যক্ষভাবে কর্মানুষ্ঠানও করিতে হয়। তদ্দ্বারা বাহির-ভিতর দুইদিকের কার্যই চলিতে থাকিলে অচিরকাল মধ্যে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এই কর্মানুষ্ঠানই যোগ-সাধনা। জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী মুমুক্ষু সাধকগণ মোক্ষলাভার্থ গুরুসন্নিধানে তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ ও যোগ-সাধনার কৌশল অবগত হইয়া শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন। মানবের চিন্তানুধ্যানাদি সকলই দেহের ক্রিয়ানুরূপ। দেহের ক্রিয়াধিক্যকালে স্থিরতা প্রাপ্তি বা ব্রহ্মচিন্তা সম্ভবই নহে। বিক্ষেপণের মৃদু অবস্থায়ই আধ্যাত্মিক চিন্তা সম্ভবপর। তবেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ব্রহ্ম-চিন্তা ধারণার উপযোগী হইবার জন্য, অথবা আর কিছু না হইলেও অন্ততঃ বিক্ষেপণের গত্যাধিক্যে অভিঘাতপ্রাপ্ত বিক্ষুব্ধ মনকে ক্ষণেকের জন্যও বিশ্রাম দিবার জন্য, বিক্ষেপণ-বিলয়কারী মন্ত্রাভ্যাসে লিপ্ত থাকার প্রয়োজন। বহির্গতি প্রভাবে যে মন বহির্মুখী হইয়া বিষয়-অন্বেষণে তৎপর, সেই মনের বহির্গতি বারিত হইয়া পড়িলে, আকর্ষণমূলে সে স্বীয় স্বভাবে আত্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিবেই। উপনিষদ্ বলেন :—

"মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসঙ্কল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥" (ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ্)।

অর্থাৎ 'মন দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামনাবর্জিত মন শুদ্ধ এবং কামনাসঙ্কুল মন অশুদ্ধ, বিষয়-বিমুক্ত মন মুক্তির কারণ এবং বিষয়াসক্ত মন বন্ধনের কারণ। বিবেক দ্বারা সংস্কৃত হইলেই মন তাহার সঙ্কল্প-বিকল্প স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে।" শাস্ত্রান্তরেও আছে "তস্মাদ্বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্বাসনং মনঃ" অর্থাৎ—বাসনা দ্বারাই মন সংসারে আবদ্ধ এবং বাসনা ত্যাগেই মুক্ত। বশিষ্ঠদেবও রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"মনঃ সর্বমিদং রাম ! তস্মিন্নন্তশ্চিকিৎসিতে।
চিকিৎসিতো বৈ সকলো জগজ্জালাময়ো ভবেৎ॥
সর্বার্থরিক্তমনসঃ সতঃ সর্বাত্মনস্তব।
সর্বথা সর্বদা সর্বং সর্বমাচরণং শিবম্॥"

অর্থাৎ 'হে রাম! জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সকলেরই নিদান মন, এজন্য একমাত্র মনোরূপ ব্যাধির চিকিৎসা করিলেই জগজ্জালরূপ অখিল রোগই চিকিৎসিত ও প্রশমিত হয়। তোমার মন যদি সর্বপ্রকার পদার্থ হইতে বিরত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তুমি সকলই আত্মময় দর্শন করিতে পার, তখন তুমি সর্বদা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমুদয়ই তোমার কল্যাণময় আত্মস্বরূপ হইবে।'—এই চিত্তযক্ষকে পরাভূত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

গুরূপদিষ্ট কর্মানুষ্ঠানের পুনঃ পুনঃ আচরণই অভ্যাস ("পৌনঃপুন্যেন করণমভ্যাস ইতি কথ্যতে")। এবং বিষয়ে অনাসক্তি আনয়নের জন্য যে অনুষ্ঠান বা সাধনা তাহাই বৈরাগ্য। মনকে বিষয়-বিরত করিবার নিমিত্ত গুরূপদিষ্ট উপায়ে প্রত্যাহার দ্বারা সাধনা করিতে হয়। বহু বাহ্যিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে প্রত্যাহরণ বা আকর্ষণ করিয়া নিজ লক্ষ্যে সংস্থাপনোপায়কে প্রত্যাহার কহে। প্রণবই প্রত্যাহারের লক্ষ্য। অকল্পিত প্রণবে তন্ময়তা দ্বারা "শব্দস্বারূপ্য" লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে পরিণামী হইবার জন্যই প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা বাহ্যবিষয়ে সংজ্ঞা (নাম) যোজনা দ্বারা ভাষার সৃষ্টি হেতু ভাষা দ্বারা ভাষা-প্রতিপাদ্য বাহ্যিক বিষয়ের রূপ-জ্ঞান জন্মিয়া বিক্ষেপণ উৎপন্ন করে। শব্দে রূপ বা রূপে শব্দ যোজনামূলেই ভাষার সৃষ্টি, সুতরাং ভাষা দ্বারা বহির্লক্ষ্য অবশ্যম্ভাবী এবং এই নিমিত্তই ভাষা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী। প্রত্যাহার অর্থবাচক ধ্বনি বা কাল্পনিক ভাষা নহে, তাহা ক্রিয়াবাচক ধ্বনি। সুতরাং তদ্দ্বারা রূপ-জ্ঞান জন্মিয়া মন বাহ্যিক বিষয়ে প্রধাবিত হওয়া তো দূরের কথা, তদ্দ্বারা বহির্লক্ষ্য নিবৃত্তই হয়। জ্ঞান মূলতঃ অদ্বয় বা এক বলিয়া যুগপৎ একাধিক জ্ঞেয়ের বোধ তাহার স্বধর্ম নহে, এই হিসাবে যখন প্রত্যাহারজনিত অভিঘাত-মূলে দেহের ঊর্ধ্বদেশে ক্রিয়া জন্মে, তখন চিত্ত বহির্জগৎ বা দেহের উদর উপস্থাদি নিম্নদেশ হইতে বিযুক্ত থাকে। প্রত্যাহারমূলে দেহের উদরোপস্থ ক্রিয়া বারিত হয় এবং বিষয়-সংশ্রব দমিত হয় বলিয়াই প্রত্যাহার-অবলম্বিত সাধনায় নাম-রূপ বর্জনের অবস্থা আসিয়া পড়ে। নাম-রূপ বিধৃত জগতের অতীত হওয়াই ব্রহ্মসাধনার উদ্দেশ্য এবং নাম-রূপ বর্জনের সহায়ক বলিয়াই প্রত্যাহারের শ্রেষ্ঠত্ব।

দত্তসংজ্ঞা দ্বারা সাধনাতে অপর একটী প্রত্যবায়ও আছে। বর্ণমালার অক্ষর সমূহের সংমিশ্রণ দ্বারা, বিষয়-বোধ জন্মিবার জন্য, দত্তসংজ্ঞা বা ভাষার সৃষ্টি। ভাষায় যেসমূহ অক্ষর, সেইগুলির সমষ্টির উচ্চারণও সমকালে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহা পর পর উচ্চারিত হয়। একটী উচ্চারণকালে জ্ঞানের যে স্বরূপ থাকে, অন্যটী উচ্চারণকালে সেই স্বরূপ থাকে না, তাহা পরিবর্তিত হইয়া পড়ে; সুতরাং সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞা-প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বা স্বরূপ জ্ঞানও জন্মিতে পারে না এবং জ্ঞানের স্বরূপও দত্তসংজ্ঞার শব্দানুরূপ থাকে না। যদি মনে করা হয় যে, দত্তসংজ্ঞা দ্বারা জ্ঞানের ভেদ জন্মাইলে তাহার যে আকার হয় তাহাই বিষয়-জ্ঞান, তবে তাহাও ভ্রান্ত ধারণা; কেননা, জ্ঞানে যুগপৎ একাধিক বিষয়-জ্ঞান জন্মে না, সুতরাং জ্ঞানের এক অবস্থায় অন্য অবস্থার ধারণা কল্পনা বই কিছু নহে; কিন্তু প্রত্যাহার-অবলম্বিত সাধনা এ দোষ হইতে মুক্ত। শব্দ-সাধনাতে অপর একটী অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা বর্ণ বা অক্ষরগুলিকে বিভেদ করিবার জন্য বর্ণগুলির চিত্রাঙ্কণ বা লিখিত আকার আবিষ্কার। কল্পনা-প্রসূত এই চিত্র (অক্ষর) দ্বারা তৎপ্রতিপাদ্য বর্ণ বুঝিবার অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান এমন এক অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সে এখন ঐ শব্দ ও ঐ আকারের পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছে; তজ্জন্য শব্দ উচ্চারণকালে সঙ্গে সঙ্গেই ঐ শব্দের চিত্রিত আকারের (অক্ষরের)

আকার-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া বহির্লক্ষ্য আসিয়া পড়ে। ইহাও ব্রহ্মসাধনার একপ্রকার অন্তরায়, তবে নিরক্ষরগণ এই বন্ধন হইতে মুক্ত। প্রত্যাহারই এই ব্যাধির মহৌষধ; কেননা, প্রত্যাহার যখন বাহ্য সম্পর্ক বিধ্বংসী, তখন প্রত্যাহারে দৃঢ় অভ্যাস দ্বারাই এই ব্যাধি দূর করিতে হইবে। এবম্বিধ বহু গবেষণা করিয়া ও বিষয়ের অবস্থাজনিত জ্ঞানার্জ্জন করিয়া তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সাধনার জন্য এমনসব প্রত্যাহার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যদ্দ্বারা সাধন-পথ নিষ্কণ্টক হয় এবং আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। কোন্ প্রত্যাহার পাত্রহিসাবে কাহার গ্রহণীয় এবং কি উপায়ে তদ্দ্বারা সাধনা করিতে হয় তাহা যোগকৌশলজ্ঞ তত্ত্বদর্শী গুরুই অবগত আছেন। তাহা গুহ্য। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥" (গীতা)
"গুরুসেবাং প্রকুর্বাণো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ! লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ॥" (শান্তি গীতা)

দাশরথীর রামায়ণ

অধ্যাপক **শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী** এম্. এ.

দাশরথী বোধ হয় সম্পূর্ণ রামায়ণ খানিই তাঁহার পাঁচালীতে গাহিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত রচনার কথা বাদ দিয়া কেবল প্রকাশিত খণ্ডগুলি হইতেই এই সত্যটী স্পষ্ট অনুমিত হয়। ইহাতে শ্রীরামের তাড়কা বধ প্রভৃতি বাল্য কীর্তি, বিবাহ, অভিষেক আয়োজন, বনগমন, সীতা হরণ, সুগ্রীব মিলন, সীতান্বেষণ, তরণী সেন বধ, মায়াসীতা বধ, লক্ষ্মণ শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ, রাবণ বধ, শ্রীরামের অযোধ্যা প্রত্যাগমন, সীতার বনবাস, লবকুশের যুদ্ধ, সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। রামচরিত্রের এক রামচন্দ্রের জন্ম ছাড়া সমস্ত প্রধান ঘটনাগুলিরই সাক্ষাৎ ইহাতে পাই, সুতরাং উপাখ্যান এবং রঘু বংশের অন্যান্য কীর্তি-কলাপ বর্ণনা বাদ দিলে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরাকাণ্ডের রামবিষয়ক সকল মুখ্য বিষয়গুলিই আলোচিত হইয়াছে।

দাশরথী পণ্ডিত লোক ছিলেন না, সুতরাং মুখ্যতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রমুখ তদানীন্তন প্রচলিত রামচরিত্র এবং গৌণতঃ লোক প্রবাদ হইতে উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং মোটামুটি তাঁহার বর্ণনার সঙ্গে কৃত্তিবাসের

একটা ধারাবাহিক মিল থাকিলেও কয়েকটি বিশেষ স্থানে তিনি উৎসান্তর হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাস বলিয়াছেন বিশ্বামিত্রকে দশরথ প্রথম রাম-লক্ষ্মণ অর্পণ করেন নাই। ভরত শত্রুঘ্নকে দেখাইয়া প্রতারণ. করিয়াছিলেন, দাশরথীও তাহাই বলিয়াছেন। এমন কি—

"তব বংশে ছিল যে হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী আমাকে দিয়া করিলেন পূজা"—কৃত্তিবাস পৃঃ ৮০

এবং—

"হরিশ্চন্দ্র নৃপবর সত্যে বান্ধি দ্বিজবর
নিকটে হয়ে সর্বস্ব করে দান"—দাশরথী ১০ পৃঃ ১৬

অথবা—

"অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক ধুক।
কখন মরিব আমি দেখে চাঁদ মুখ॥" কৃত্তিবাস পৃঃ ৭৯

এবং—

"সকলি জ্ঞাত আছেন মুনি, শাপ দিয়াছেন অন্ধ মুনি
পুত্রশোকে হারাব জীবন।" দাশরথী ১০ পৃঃ ৬৭

এই সব স্থলে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি পর্যন্ত এক। কিন্তু অমিলের মাত্রাও কম নয়। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন রাম অক্ষয় ধনুক তুণ পাইয়াছিলেন ভরদ্বাজ আশ্রমে—স্বপ্নে।

"যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনু শর"—কৃত্তিবাস পৃঃ ৭৮

কিন্তু দাশরথীর মতে ইহা অন্যত্র হইয়াছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন—"এখনো আমার রামের করে ধনুর্বাণ দিই নাই হে মুনি"। কিন্তু মুনি বলিলেন—"অবশ্য ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন রামলক্ষ্মণ গুণমণি।

তখন দশরথ স্বীকার করিলেন যে যদি রাম ধনুষ্পাণি হইয়া থাকেন তবে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। তখনি দৈবক্রমে অন্তঃপুরে কৌশল্যা ও সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণকে সাজাইতে কি মনে করিয়া যোদ্ধবেশ পরাইয়া দিলেন।

"শুনি হাসে মনে মনে ভগবান, সুমিত্রে আনি ধনুর্বাণ
রামলক্ষ্মণের করে আনি দিল।"—দাশরথী ১০।৩৬৮

প্রতি পালাতেই এমন মিল ও অমিল আছে। তাহার বিশদ বর্ণনা করিতে যাওয়া এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রবন্ধে অসম্ভব। সুতরাং কৃত্তিবাসের সঙ্গে মোটামুটি মিল রহিয়াছে ধরিয়া যেখানে শুধু অমিল হইয়াছে তাহাই উল্লেখ করা যাউক।

কৃত্তিবাস হরধনু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। ধনুর আকার, ওজন এবং সমাগত ব্যর্থমনোরথ নৃপতিদের সম্বন্ধে কয়েকটা ইঙ্গিতমাত্র দিয়াছেন।

"কত শত নৃপতি আসে আর যায়।
দেখিয়ে হরের ধনু হারিয়ে পালায়॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ৮৭

অথবা—

"কত শত বীরগণে না পারিল উত্তোলনে
দারুণ পিতার এই পণ॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ৭৯

কিন্তু দাশরথী এত সংক্ষেপে ছাড়েন নাই।

"অনুমতি পেয়ে রাজের, গিয়ে মল্ল দশহাজার,
ধনু আনি সকল রাজার, সম্মুখে রাখিল।"—দাশরথী ১০।৩৮২

এবং ইহা দেখিয়া ভাঙা তো দূরের কথা উত্তোলন অসম্ভব বলিয়া নৃপতিগণ কানাকানি করিতে লাগিলে পুরোহিত শতানন্দ বলিলেন—

"শুনহে সব ধনুর্ধারী, এই ধনু বাম হস্তে ধরি,
তুলিয়ে সীতা সুন্দরী, রাখিতেন বাল্যকালে।"—দাশরথী ১০।৩৮৩

তারপর রাবণ প্রভৃতির অকৃতকার্যতার কথাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাম-বনবাস প্রসঙ্গে কৈকেয়ীর বুদ্ধিভ্রংশ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস দুষ্টা সরস্বতীর অবতারণা করেন নাই।

"শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হল নাশ॥"—কৃত্তিবাস পৃঃ ১০৮

ইহাতে কৈকেয়ী চরিত্রে যে স্বাভাবিক দুষ্টতা আসে তাহা তিনি পরে স্খালন করিয়াছেন এই বলিয়া—

"ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে।
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ১০৯

কিন্তু দাশরথী দুষ্টা সরস্বতীকে দিয়া এই কাজ করিয়াছেন, উক্তরূপ কোন ব্রহ্ম শাপের অবতারণা করেন নাই।

"শুনে দেবের প্রাণী, দুষ্টাবাণী, বসেন রাণীর স্কন্ধে।
অমনি রাণীর উড়িল প্রাণী পড়িল বিষম ধন্ধে॥"—দাশরথী ১।৫২

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সীতান্বেষণে বাণরগণ কাহার নিকট রাবণের সন্ধান পাইয়াছিল সে বিষয়ে মতদ্বৈধ না থাকিলেও কৃত্তিবাসের মতে সম্পাতি নিজের চোখে সীতাহরণ দেখে নাই—তাহার পুত্র সুপার্শ্ব দেখিয়াছিল—

"আহার লইয়া পিতা প্রভাতে আসিতে।
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ২৩১

কিন্তু দাশরথী বলিয়াছেন—

"পক্ষী বলে জানি জানি, শুনেছি ক্রন্দনের ধ্বনি।
রাবণের রথে এক রমণী দেখেছি নয়নে॥"—দাশরথী ৮।১৯০

সুন্দরাকাণ্ডের একটি বিষয় সম্বন্ধে দাশরথী একাধিক স্থানে লিখিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। দাশরথীর মতে সীতা অশোক কাননে হনুমানকে পাঁচটি আম্রফল দিয়া বলিলেন—

"শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব বানরে॥
তিনজনে তিনটি দিবে আপনি একটি লবে।
আর একটি ফলবাটি সব বানরে দিবে॥"—দাশরথী ৮।২০৪

কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া হনুমান একে একে সব কয়টি ফলই খাইয়া ফেলে। রামচন্দ্রের ফলটি তাহার গলাতে আটকাইয়া যায় এবং রামনাম করিয়া কোন রকমে বিপন্মুক্ত হয়। অতঃপর রাবণের বাগানে প্রবেশ করিয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। কৃত্তিবাসের সীতা হনুমানকে ফল খাইতে দিয়াছিলেন কিন্তু কাহারো জন্য পাঠান নাই।

"সীতা বলিলেন বাছা হইল স্মরণ।
অমৃতের ফল কিছু করহ ভক্ষণ॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ২৫৮

লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতা বধ প্রসঙ্গে দাশরথীর রাবণ মায়াসীতা নির্মাণকল্পে স্মরণ লইয়া ছিলেন বিশ্বকর্মার।

"শুনহে লঙ্কার রায়, বিশ্বকর্মার ডাকস্থ রায়
সীতা মূর্তি করে দিক নির্মাণ।"—দাশরথী ১০।৪৫১

কিন্তু কৃত্তিবাসের রাবণ-বিদ্যুজ্জিহ্বকে দিয়া মায়াসীতা নির্মাণ করাইয়াছেন।

"শুন বলি বিদ্যুজ্জিহ্ব নানা মায়াধারী।
মন্ত্রেতে গড়িয়া দেহ রামের সুন্দরী॥"—কৃত্তিবাস পৃঃ ৪০৫

লক্ষ্মণ-শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ, রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি ঘটনা-গুলিতে দাশরথী কৃত্তিবাসের সহিত ঘটনার দিক দিয়া একমত। কিন্তু উত্তরাকাণ্ডে আবার কিছু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। লব-কুশের জন্ম সম্বন্ধে কৃত্তিবাস বাল্মিকীর অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন।
প্রসব করিল সীতা যমজ নন্দন॥"—কৃত্তিবাস, ৫৯৪

এবং নাম সম্বন্ধেও কৃত্তিবাস বলেন—

"লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে।
লবণ মেখে লব হৈল, কুশে কুশ রাখে॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ৫৯৪

কিন্তু দাশরথীর মতে সীতার—

"দশমাস গর্ভ যেদিন পূর্ণ হয়।
প্রসব হন পুত্র এক পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥
পূর্ণব্রহ্ম রামের সম্পূর্ণ অবয়ব।
মনের সুখে মুনি নাম রাখিলেন লব॥"—দাশরথী ৩।২৭১

একদিন লবকে বাল্মিকীর কাছে রাখিয়া সীতা জল আনিতে গিয়াছিলেন। দুরন্ত শিশু মায়ের পেছনে পেছনে চলিয়া গেল—মুনির অলক্ষ্যে। মুনি লবকে না পাইয়া প্রচুর খুঁজিলেন এবং শেষে—

"সঙ্কট গণিয়া মুনি করেন বিধান।
লবাকৃতি করেন এক কুশেতে নির্মাণ॥
* * *
কুশায় নির্মিত জন্য নাম রাখেন কুশি॥"—দাশরথী ৩।২৭২

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সঙ্গে দাশরথীর রামায়ণে মোটামুটি উক্ত বিষয়গুলিতে এবং আরো কিছু অপেক্ষাকৃত অগুরু বিষয়ে অমিল থাকিলেও এটা অনস্বীকার্য যে দাশরথী ঘটনার দিক দিয়া একান্তভাবে কৃত্তিবাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

ছন্দো বৈচিত্র দাশরথীতে বিশেষ নাই, পয়ার ত্রিপদী এবং মিশ্র-ত্রিপদী ছন্দেই প্রায় তাঁহার সমগ্র পাঁচালী রচিত। কিন্তু ছন্দের শুদ্ধতা সর্বত্র তিনি বোধ করেন নাই। করিতে পারেন না বলিয়া নয়, বোধ হয় করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাছাড়া পাঁচালী এক ধরণের গান। গানে কাব্যের ছন্দোশুদ্ধি না থাকিলেও ক্ষতি হয় না, যদি গায়কের সুরে তাহার সঙ্গতি ঠিক মত হয়। একদিকে কবির দলে থাকার গুণে যেমন দাশরথী এই সুর-সঙ্গতির শমতা লাভ করিয়াছিলেন—অপর দিকে এই কবির দলে থাকিবার দোষেই অকারণ বাহুল্য-জঞ্জালে তাঁহার কাব্যকানন দুরুপোভোগ্য ও অমার্জিত করিয়াছেন। অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ যেমন সৌন্দর্য বর্দ্ধন করে, তাহার বহুল প্রাচুর্য্যও তেমনি সৌন্দর্যঘ্ন হইয়া দেখা দেয়। দাশরথী এই সত্যটি বুঝিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার বর্ণনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য—সহজ মধুরিমা অলংকার প্রয়োগ-প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এই সংযমহীন প্রকাশ-প্রচেষ্টায় দাশরথীর রচনা বিসদৃশ প্রগল্ভ এবং কুরসদুষ্ট হইয়াছে। অনুপ্রাস ও যমকের উপর দাশরথীর কী যে অপরিসীম মোহ ছিল তাহা পাঁচালীর যে কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায়।

"বলেন ওযে চল পদ, তুচ্ছ পদ ব্রহ্মপদ
সে রাম পদ হেরিলে, জ্ঞান হয়।"

তাছাড়া উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, দীপক, ব্যতিরেক, নিদর্শন অতিশয়োক্তি, বিভাবনা প্রতিবস্তূপমা প্রভৃতি-অলংকার দাশরথী অকৃপণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। আর এই

উপমানগুলি তিনি অন্য কোন কবি বা কাব্য হইতে ধার করেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়াই যেন প্রয়োগ করিয়াছেন।

"শুনে বাক্য দশরথ, বাতাসে কদলী বত, থরথর কম্পে কলেবরে॥"

অথবা—"রঘুনাথের বনযাত্রা বার্ত্তা পেয়ে সীতে।
বরষার বৃক্ষ যেন শুকায় অতি শীতে॥"

এগুলি তাঁহার চোখের দেখা উপমান। আবার দুর্লভকে 'আকাশ কুসুম' প্রমুখর সঙ্গে তুলনা না করিয়া দাশরথী অতি প্রচলিত কথা কহিলেন—

"ইদানীং হয়েছ ডুমুরের ফুল, হয়েছ তাতে প্রতিকূল
তোমার প্রতি আমি হইতে নারি॥"

দার্শরথীর অলংকারে বিশদ বর্ণনা না করিয়াও ইহা অনায়াসে বলা যায় যে তিনি যে শুধু প্রচুর অলংকারই প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, সে অলংকারগুলি কোন ধণীর গৃহ হইতে অপহরণ বা ধার করা নয়, একেবারে নিজের দুর্লভ প্রতিভার মোহরাঙ্কিত।

রামায়ণ করুণ-রসাত্মক কাব্য। কৃত্তিবাসের রচনায় ভক্তি সংমিশ্রণে তাহা আরো মধুর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দাশরথীর হাতে ইহার মর্যাদা যথাযথ রক্ষিত হয় নাই। কারণ, দাশরথী করুণ রস সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাঁহার প্রতিভা ছিল স্বভাবতঃ হাস্য রসাভিমুখী। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে দাশরথী ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং ভক্তিবাদের প্রাধান্য প্রচার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাহার রচনা ও-বিষয়ে রস ঘন হইয়া উঠে নাই। কারণ একটি দুঃখের অবতারণা করিতে যাইয়া দাশরথী অশ্রুগর্ভ মেঘালিম্পনে মনের আকাশোপম উদার পরিসরটি স্তরে স্তরে সঘন করিয়া তুলিতেছেন, কিন্তু ঠিক বর্ষণের পূর্বক্ষণে দেখা গেল, একটা হাল্কা হাসির হাওয়ায় প্রচণ্ড ঝাপটায় তাহা একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। এতক্ষণের এত প্রচেষ্টা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। সীতা বনবাসান্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিরুপায় রাম আবার পরীক্ষা চাহিলেন। কিন্তু এ অমর্যাদা সীতা সহ্য করিলেন না, কাঁদিয়া মাটির মায়ের কাছে নিজের অবসান কামনা করিলেন। সহসা ধরণী দুই ভাগ হইয়া গেল। মূর্তিমতী হইয়া ধরিত্রী রামকে তিরস্কার করিয়া সীতাকে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এতদিনের মিলন প্রত্যাশা এমন করিয়া চোখের উপর দিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল। কৃত্তিবাসের রাম নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি ছুটিয়া সীতাকে ধরিতে গেলেন—

"পাতালে যাইতে রাম সীতার ধরেন চুলে।
হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ৩৬৩

তারপর—

"শ্রীরামের ক্রন্দন হৈল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥"—কৃত্তিবাস, পৃঃ ৩৬৩

কিন্তু দাশরথী লিখিয়াছেন—

"আমায় এত বিড়ম্বন করে গেল বুড়ী।
মানিব না করিব নষ্ট কিসের শাশুড়ী॥
নারদ কহেন শুন রাম দয়াময়।
জামাই হ'য়ে শাশুড়ীকে নষ্ট করা নয়॥
একে তো প্রাচীন মাগী হ'য়ে গেছে জরা।
তোমার উচিত নহে ধরাকে এখন ধরা॥"—দাশরথী ৩।২৯০

একটা হাল্‌কা কুরুচিপূর্ণ উত্তাপে সকল অশ্রু মুহূর্তে বাষ্প হইয়া গেল। অবশ্য এইজন্য কেবল দাশরথীকেই দোষ দিলে চলে না। পাঁচালীশ্রোতা জনসাধারণ হাস্যরসে এবং নিজেদের রুচিমত মনোবৃত্তির প্রকাশের মধ্য দিয়া যেরূপ আনন্দ পাইত—পাঁচালীকার হিসাবে দাশরথীকে সেই দিকেই নজর রাখিতে হইত বেশী। তাছাড়া আরো একটী বিষয় এই যে, সুরে, সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে দাশরথী যে চিত্র দর্শকের সম্মুখে আঁকিতেন, তাহা কেবল পাঁচালী পাঠে আমরা আন্দাজ করিতে পারি না যাহোক একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, দাশরথী হাস্যরসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। কোন অবসর পাইলেই তিনি অকৃপণভাবে হাস্যরস বিতরণ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র বাসর ঘরে গিয়াছেন। সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল নীলবরণ, বিবাহ কল্লে কার কন্যে?"

"শুনি স্বামী গোলকের বলেন জনকের
কন্যে বিবাহ করি।
সব নারী বলে রাম, রাম, রাম, রাম,
শুনে যে লাজে মরি॥
এমন কথা, শুনিলে কোথা, ভগ্নী বিবাহ করে।"—দাশরথী ১০।৩৯২

রাম তাড়াতাড়ি ভুল বুঝিয়া শোধরাইয়া লইলেন—

"শুনি শোন নাই গোল অনেকের, তোমাদের জনকের কন্যে বলেছি সাখী।"—দাশরথী ১০।৩৯২

এই প্রসঙ্গে দাশরথী নারীচরিত্রের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভ দিকটি বর্ণনার সুযোগ ছাড়েন নাই।

"ঠাকুরুণদের গুণের বাণী, আপনি বাণী, পারে না বর্ণিতে।
নারী পাঁচজনাতে, একত্রেতে, যদি পান বসিতে॥"—দাশরথী ১০।৩৯২

আবার, রাম লবকুশের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন। লব-কুশের প্রশ্নে তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করিলে তাঁহারা রাঘব, অযোধ্যা (=অযোদ্ধা), অজ লইয়া যে বক্রোক্তি করিয়া দিলেন, তাহা উপভোগ্য।

"শুনি ভিক্ষা করে রাঘবেতে, রাঘবের সঙ্গে যুদ্ধ দিতে
সেটা বড় লাঘবের কথা।

শুনে শুনে পরিচয়, মনে যে অশ্রদ্ধা হয়
হয় লইতে এসেছ করে জারি।
অযোধ্যা নাথ এ কি কহ, অজ তোমার পিতামহ
এটা যে অযশের কথা ভারি।"—দাশরথী ৩।২৮৩

আবার ভরদ্বাজাশ্রমে কপিগণ ঝাল খাইয়া কহিতেছে—

"তখন নল বলে নীল ভাই, লঙ্কা আমাদের ছাড়ে নাই,
মনে করেছ জিনেছি লঙ্কারে।
কই লঙ্কা জয় হলো, লঙ্কা যদি ফিরে এল,
নাগাদ সন্ধ্যা রাবণ আসিতে পারে॥"—দাশরথী ৬।৪৪

আবার পান খাইয়া—

"বলে এবার বিপদ শক্ত মুখে কেন উঠে রক্ত
এত বাদ কি মুনির বেটার মনে॥"—দাশরথী ৬।৪৪

ইহা ছাড়া মিথিলা আসিবার পথে পারের নাবিকটির সেই চিত্রটি অত্যন্ত হাস্যকর। সে কিছুতেই রামকে পার করিবে না—পাছে তাঁহার চরণস্পর্শে নৌকা মানুষ হইয়া যায়। কারণ সে শুনিয়াছে পাদস্পর্শে নাকি পাষাণ মানুষ হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজাশ্রমে এবং অযোধ্যায় বানরগণের ভোজ, প্রভৃতি বহুস্থানে হাস্যরসের টুক্‌রা মাণিক অজস্রভাবে ছড়ান। উদ্ধৃত করিতে গেলে গোটা পাঁচালীই করিতে হয়।

দাশরথীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান এই যে, তাঁহার পাঁচালী ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের একটি জীবন্ত ঐতিহাসিক অভিধান। রামায়ণ গানের মধ্য দিয়াও যখনি সুযোগ পাইয়াছেন, তখন স্থান, কাল, পাত্র ভুলিয়া তিনি তখনকার দিনের আদর্শচ্যুতি, আচারভ্রষ্টতা প্রভৃতির নিন্দা করিয়াছেন। তদানীন্তন পোষাক পরিচ্ছদের বর্ণনাও তিনি করিয়াছেন। পিতা-মাতার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অত্যন্ত পত্নীপ্রীতিকে দাশরথী নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। মাতৃপক্ষে বলিয়াছেন—

"একলা খেটে মরে ছুঁড়ী, চোখের মাথা খেয়েছিস বুড়ী
গুড়িয়ে মুড়ি খাচ্চ কাটা কাটা।
পরের মেয়ে সইবে কত অন্যের মত যদিও হতো
হাত ধরে বার করে দিত মেরে সাত ঝাঁটা।"—দাশরথী ১০।৪১৩

আবার—

"এখন পাননা কাচা দীক্ষা গুরু যা করিবেন শয্যাগুরু
মরণ বাঁচন তার কথায়।
আপনারা শোন দোতালায় মাকে ফেলে গাছতলায়।"—দাশরথী ১০।৪১৩

পিতৃপক্ষেও অনুরূপ রচনা আছে—

"আপনাদের শয়ন পালংখাটে　　　　বাপের শয়ন ছেঁড়া চটে
কপ্নি এইটুকু কটিতটে ঘটেনা সবদিন,"—দাশরথী ১০।৪১৪

তদানীন্তন পতিত পুরোহিত ব্রাহ্মণদের দুর্নিবার লোভ এবং তাহাদের জঘন্য কলহের চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছেন—রামচন্দ্রের বিবাহে বশিষ্ঠ শতানন্দের বচসার মধ্যে। সিধা দেখিয়া চটিয়া বশিষ্ঠ বলিতেছেন—

"বশিষ্ঠ বলে সে যা বেটা, কি হবে আর চালকটা
খেসারির ডাল গোটা গোটা, মালসাটাও যে ফুট।
দাঁড়া বেটা জনককে চিনি কণামাত্র দিয়েছেন চিনি
কোন বেটা সিধে বাচনী করে দিয়েছে ওঠ।" দাশরথী—১০।৩৮৭

এই প্রসঙ্গে দাশরথী সোজা ব্যঙ্গ আরম্ভ করিলেন—

"এখনকার যজমানের বামুনের রীত, পেলে খুলেই বড় প্রীত,
হ'য়ে বসেন এমন সুহৃদ এক মরণে মরেছে।
এ আমার বড় যজমান, এ হ'তে কি পান যজমান
সুপ্রেম কোর্টের জন মান পান্না এর কাছে॥" দাশরথী—১০।৩৮৮

নারীগণের প্রিয় শাড়ির একটা ফিরিস্তি দাশরথী দিয়াছেন, যেমন শান্তিপুরী, বানারসী, জামদানী, নীলাম্বরী, বুনৈদারী, কেরেপ, সুইসের ডালিম ফুলের রং, লাল কিনারী মলমল প্রভৃতি নাম দেখা যায়।

দাশরথীর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ বিশেষ 'টাইপ' চরিত্রগুলিই বেশী জীবন্ত হইয়াছে। কারণ প্রাচীন মর্যাদা-সম্পন্ন চরিত্রগুলিকে তিনি নিজের ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে পারেন নাই—আবার নিজের রচনার স্বাভাবিক লঘুত্ব-দোষের জন্য পূর্বরূপ ও অধিকৃত রাখিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় সূর্যবংশ গুরু বশিষ্ঠের যে চরিত্র পূর্বোক্ত পুরোহিতের আবরণে তিনি প্রকাশ করিয়াছে তাহা অত্যন্ত হীন। এইভাবে দাশরথীর রচনায় রাম, সীতা, দশরথ, বিশ্বামিত্র, রাবণ সকলেই প্রচলিত ধারণার এবং পূর্বাচার্যগণের সৃষ্টি হইতে অনেক নিম্নে নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নিজের ইচ্ছামত চরিত্র সৃষ্টিতে দাশরথী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন প্রচুর। বিশেষ করিয়া সে চরিত্র যদি হাস্যরস-প্রধান হয় তবে তো কথাই নাই। শুধু ব্যক্তি বিশেষের নয় তাহার সৃষ্টি একটি শ্রেণীকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ধরা যাউক।

মহীরাবণের পাতালে হনুমান রামান্বেষণে গিয়াছে। তাহার মনে হইল ঠিক সংবাদ স্ত্রীলোকের মুখ হইতে পাওয়া যাইবে এবং তাহাদের মিলনস্থান হইতেছে ঘাট। মারুতি ঘাটের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। ওদিকে রাজবাড়ীর পুরোহিত গোপন সংবাদ

তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যেন কাহাকে না বলা হয়। কিন্তু রাত্রে স্ত্রীর অবস্থা এইরূপ হইল।

"একি পোড়া ছিছি যোলো আজ রাত্রি কি দুটো হ'লো
কখন পোহাবে পেট ফেটে যে গেলাম।"—দাশরথী ২।২৪৭

এবং রাত্রি পোহাইতেই ব্রাহ্মণী আসিয়া রামমণিকে কহিল—

"রাজবাড়ীর এই গুপ্তবাণী কালি কহিলেন আমাদের তিনি
দেখো দিদি ব'লোনা কারো কাছে।"

রাম কি বলিতে পারে—অসম্ভব। কিন্তু ক্ষণকাল পরে দেখা গেল আর একজনকে রামমণি সাবধান করিয়া দিতেছে এই বলিয়া যে, তাহার পেটে কথা মজেনা।" নারী চরিত্রের এই শাশ্বত দুর্বলতা ও দুর্নামকে দাশরথী নক্সার মধ্য দিয়া জীবন্ত করিয়াছেন আরো বহুস্থানে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ত্রুটি থাকা সত্বেও দাশরথীর রামায়ণে প্রচুর আনন্দের উপাদান রহিয়াছে। সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয় তাঁহার তীব্র রসিকতা-বোধ—বর্ণনায় শব্দযোজনার আশ্চর্য কৌশল। মনে হয়, তাঁহার অপ্রকাশিত রচনা সহ প্রকাশিত রামায়ণাখ্যান একখণ্ডে প্রকাশ করিলে রসিক ও ভক্ত দুইদল কর্তৃকই আদৃত হইবে।*

---

* প্রবন্ধের সমস্ত দৃষ্টান্ত রায় বাহাদুর দীনেশ সেন ডি-লিট সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ (নবম সংস্করণ) এবং গৌরলাল দে প্রকাশিত দাশরথী রায়ের পাঁচালী (১৩৪২ সাল) হইতে গৃহীত

সংহিতা-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

৩০। সংহিতাগুলিতে দানধর্মের যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় এবং কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে ॥" মনু ১।৮৬

ব্যাস-সংহিতায় দেখি—"আত্মার্থে কো ন জীবতি"; অর্থাৎ নিজের জন্য ত জগতে প্রাণীমাত্রেই চেষ্টা করিতেছে; পরের মঙ্গলের জন্য দানই প্রশংসনীয়। শাস্ত্রগুলিতে বহুবিধ দানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অন্নদান ও গোদানকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। অন্ন হইতেই জীবের উৎপত্তি, অন্নেই স্থিতি ও পুষ্টি এবং অন্নদ্বারাই জীবন রক্ষা হয়; এই জন্য অন্নদান প্রাণদানেরই তুল্য—

(ক) "অন্নদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে ন হি কিঞ্চন।
অন্নাদ্ ভূতানি জায়ন্তে জীবন্তি চ ন সংশয়ঃ ॥" সম্বর্ত ১।৮৩

(খ) "অন্নেন সদৃশং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥" বৃদ্ধগৌতম ১৬।১১

(গ) "অন্নং প্রাণা বলং চান্নমন্নাজ্জীবিতমুচ্যতে।
অন্নং সর্বস্য চাধারঃ সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥" বৃহৎপরাশর ৩

৩১। অন্নদানের ন্যায় গোদানেরও প্রশংসা নানাপ্রকারে সংহিতায় বর্ণিত আছে। প্রসবকালে যখন বৎসের সম্মুখের দুই পদপ্রান্ত ও মুখ বাহির হইয়া পড়ে অথচ বৎসটি মৃত্তিকায় পতিত হয় না, সেই অবস্থায় ঐ দ্বিমুখী গাভীকে "পৃথিবী" বলা হয়। এই দ্বিমুখী গাভী দান করিলে পৃথিবীদানের ফল লাভ হয়—

(ক) "যাবদ্ বৎসস্য পাদৌ দ্বৌ মুখং যোনৌ চ দৃশ্যতে।
তাবদ্ গৌঃ পৃথিবী জ্ঞেয়া যাবদ্ গর্ভং ন মুঞ্চতি ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ১।২০৭

(খ) "যদা চ দ্বিমুখী গৌঃ স্যাদ্ দেয়া যাবন্ন সূয়তে।
ক্ষৌণীতুল্যা তদা সা গৌঃ সর্বৈরুক্তা মুনীশ্বরৈঃ ॥" বৃহৎপরাশর ৮

অন্নদান ও গোদান ব্যতিরেকেও অন্যান্য বহুপ্রকার দানের ব্যবস্থা সংহিতাগুলিতে আছে, যেমন ভূমিদান, সুবর্ণদান, তিলদান, জলদান, বৃক্ষদান, দীপদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি। বৃহস্পতির মতে সুবর্ণ, ভূমি ও গৌরীদানের (অষ্টবর্ষীয়া কন্যাকে গৌরী বলে) ফল সপ্তজন্ম পর্যন্ত উপভোগ করা যায়—

"সর্বেষামেব দানানাং একজন্মানুগং ফলম্।
হাটকক্ষিতিগৌরীণাং সপ্তজন্মানুগং ফলম্॥ বৃহস্পতি ১।৩৪

দান সম্বন্ধে নানাবিধ দ্রব্যের উল্লেখ থাকিলেও, একটি অতি সুন্দর সাধারণ বিধি দেখিতে পাই—যে দ্রব্য যাহার পক্ষে ইষ্টজনক তাহাকে সেই দ্রব্য দান করাই প্রশস্ত—

(ক) "কিঞ্চ বা বহুনোক্তেন দানস্য বিস্তরেণ চ।
যদ্ যদিষ্টতমং যস্য তত্তস্মৈ প্রতিবাদয়েৎ॥" বৃহৎপরাশর ৮

৩২। সর্বপ্রকার দানই কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া করা কর্তব্য। অকালে ও অপাত্রে দান ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায়ই নিস্ফল—

(ক) "উষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্।
হুতং ভস্মনি হব্যঞ্চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্॥" ব্যাস ৪।৬৩

(খ) "কালহীনঞ্চ যদ্দানং তদ্দানং রাক্ষসং বিদুঃ॥" বৃদ্ধগৌতম ১০।৭৩

দান করিয়া নাম, খ্যাতি ও যশোলাভের নিমিত্ত অপরের নিকট উহার কীর্তন করা উচিত নয়; কারণ কীর্তনদ্বারা দানফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অপর পক্ষে, প্রচ্ছন্ন দানের ফল অনন্ত—

(ক) "যজ্ঞোঽনৃতেন ক্ষরতি তপঃ ক্ষরতি বিস্ময়াৎ।
আয়ুর্বিপ্রাপবাদেন দানঞ্চ পরিকীর্তনাৎ॥" মনু ৪।২৩৭

(খ) "প্রচ্ছন্নানি চ দানানি জ্ঞানঞ্চ নিরহঙ্কৃতম্।
জপানি চ সুগুপ্তানি তেষাং ফলমনন্তকম্॥" বৃহৎপরাশর ৫।৬৮

৩৩। গুরুজনদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহার বিধি অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুজনবর্গের মধ্যে পিতা, মাতা ও আচার্য অর্থাৎ জ্ঞানদাতা গুরুই শ্রেষ্ঠ। ইঁহাদিগের মধ্যেও আবার, জ্ঞানদাতা গুরুই সর্বশ্রেষ্ঠ। পিতা জন্ম দান করেন বলিয়া গুরু; মাতা গর্ভে ধারণ ও লালন-পালন করেন বলিয়া গুরু। কিন্তু আচার্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন তাহা দ্বারা পুনর্জন্ম নিবারিত হয় ও শিষ্য ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে; এই জন্যই পিতামাতা অপেক্ষা আচার্যই শ্রেষ্ঠ। আবার কোনও কোনও সংহিতায় পিতা ও মাতাকে আচার্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—

(ক) "উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" বিষ্ণু ২৯

(খ) "উপাধ্যায়াদ্দশাচার্য আচার্যাণাং শতং পিতা।
পিতুর্দশগুণং মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে॥" বৃদ্ধগৌতম ৪।৬১

গুরুর প্রতি শিষ্যের কিপ্রকার ব্যবহার হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ সংহিতাগুলিতে আছে। গুরুনিন্দা শ্রবণ করা শিষ্যের কখনও কর্তব্য নয়। যে স্থানে গুরুনিন্দা হয়, সে স্থান শিষ্যের পরিত্যাগ করাই বিধেয়। প্রাতঃকালে গুরুর শয্যাত্যাগের

পূর্বেই শিষ্যের শয্যা ত্যাগ করা বিধেয় এবং রাত্রে গুরুর শয়নের পর শয়ন করা কর্তব্য। গুরুকে প্রণাম করিবার সময় কখনও এক হস্তদ্বারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করা উচিত নয়; বাম হস্ত দ্বারা তাঁহার বামপদ ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ পদ স্পর্শ করা বিধেয়। গুরুর নিকটে নিম্নতর শয্যায় ও নিম্নতর আসনে অবস্থান করা সঙ্গত। ইচ্ছানুরূপ চরণপ্রসারণাদি করা উচিত নয় এবং গুরুর সমক্ষে হাস্য, পরিহাস ও জৃম্ভনাদি করাও সঙ্গত নয়—

(ক) "গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥" মনু ২।২০০

(খ) "গুরোঃ পূর্বং সমুত্তিষ্ঠেচ্ছয়ীত চরমং তথা॥" শঙ্খ ৩।১০

(গ) "ন কুর্য্যাদেকহস্তেন গুরোঃ পাদাভিবন্দনম্।" বৃদ্ধগৌতম ১৪।৫৮

(ঘ) "ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ॥" মনু ২।৭২

(ঙ) "নীচং শয্যাসনং চাস্য সর্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥" মনু ২।১৯৮

এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত সংহিতাগুলির প্রত্যেক খানি অতি সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

৩৪। **মনু-সংহিতা** ... ... মনুসংহিতা সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই সংহিতায় ১২টি অধ্যায় আছে। সাধারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম, শৌচ, আচার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ভিন্নও ইহাতে আরও কতকগুলি বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যেমন সৃষ্টি, সংস্কার, রাজধর্ম ও তদন্তর্গত বিচারালয়ের কার্যাদি, দায়ভাগ, জন্মান্তর, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি। মনুস্মৃতির প্রাধান্য বিবক্ষায় শাস্ত্রে উক্ত হয়—"মন্বর্থবীপরীতা যা স্মৃতিঃ সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" পরবর্তী বহু স্মৃতিগ্রন্থে মনুর প্রতি সমাদর করিয়া মনুর মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাস্তবিক স্মৃতি-সাহিত্যের ইতিহাসে মনুর স্থান অতি উচ্চ সন্দেহ নাই। বৈদিক সাহিত্যেও উক্ত হয়—"যদ্বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ভেষজম্।"

৩৫। **অত্রি-সংহিতা** (১) ... ... উপদেশের সংক্ষিপ্ততা ও বিস্তার ভেদে এই সংহিতাখানি ত্রিবিধ আকারে দেখিতে পাওয়া যায়—লঘু অত্রি, অত্রি ও বৃদ্ধাত্রি। লঘু অত্রিতে ৫টি অধ্যায় আছে। পঞ্চম অধ্যায়ের পরেও আরও ছয়টি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু এই শ্লোকগুলি বৃহস্পতি সংহিতার অন্তর্গত। মনে হয় সঙ্কলন কর্তার ভ্রমবশতঃই এই শ্লোকগুলি লঘু অত্রি-সংহিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। অত্রি-সংহিতায় একটি ও বৃদ্ধাত্রি সংহিতায় ৫টি অধ্যায় আছে। ঋষিগণ মহর্ষি অত্রিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি প্রকার দান, জপ ও নিয়ম অবলম্বন করিলে পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে—

(১) অত্রিস্মৃতি সম্বন্ধে ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত শ্রীভারতী পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রীর প্রবন্ধটী তথ্যাপর্ণ দ্রষ্টব্য।

"ভগবন্ কেন দানেন জপেন নিয়মেন চ।
শুদ্ধ্যন্তে পাতকৈর্যুক্তাস্তং ব্রবীষি মহামুনে॥"

তদুত্তরে মহর্ষি যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত রহিয়াছে। এই সংহিতায় যোগের বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রাণায়াম ও ধ্যানকেই সর্বদোষশুদ্ধির উপায় বলিয়া নির্ণীত করা হইয়াছে।

(ক) "যোগাৎ সংপ্রাপ্যতে জ্ঞানং যোগো ধর্মস্য লক্ষণম্।
যোগঃ পরং তপো নিত্যং তস্মাদ্ যুক্তঃ সদা ভবেৎ॥

(খ) "ধ্যানমেব পরো ধর্মো ধ্যানমেব পরং তপঃ।
ধ্যানমেব পরং শৌচং তস্মাদ্ধ্যানপরো ভবেৎ॥

অঘমর্ষণ ও গায়ত্রী জপের বিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। শুদ্ধি, শৌচ, প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থাও আছে।

৩৬। **বিষ্ণু-সংহিতা** ... ... এই শাস্ত্রখানি বিষ্ণু-স্মৃতি নামে প্রচলিত। এই নামে দুইখানি গ্রন্থ আছে। প্রথম খানিতে মাত্র একটি অধ্যায়। ইহাতে প্রশ্নের একটি ক্রম বা পর্যায় আছে। দেবর্ষি নারদের প্রশ্নে ভগবান্ বিষ্ণু যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন এবং পরীক্ষিতের প্রশ্নে তাহাই শৌনক বর্ণনা করিতেছেন। আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কি জপ করা ও কি ধ্যান করা উচিত—

"মরণে যজ্জপং জপ্যং যঞ্চ ভাবমনুস্মরন্।
যচ্চ ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুরুষো মৃত্যুমাগতঃ।
পরং পদমবাপ্নোতি তন্মে বদ মহামুনে॥

প্রশ্নটি শ্রীমদ্ভাগবতের পরীক্ষিৎ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নেরই অনুরূপ। সেখানেও দেখি পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—

"পুরুষস্যেহ যৎ কার্যং ম্রিয়মাণস্য সর্বথা।
যচ্ছ্রোতব্যমথো জপ্যং যৎ কর্তব্যং নৃভিঃ প্রভো।
স্মর্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্যয়ম্॥ (ভা. ১. ১৯. ৩৭-৮)

যাহাই হউক, নারদের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন একমাত্র হরিই শরণ্য—
'হরিরেব সতাং নিত্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্॥'

ভগবানের বিভিন্ন নাম ও গুণাবলীর কীর্তন এই সংহিতায় আছে। সাধারণ সংহিতার ন্যায় ইহাতে শৌচ প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা নাই। এই সংহিতায় গীতার বহু শ্লোক দেখিতে পাই—

(ক) তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
[illegible] সর্ব পাবনানি মনীষিণাম্।

(গ) সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ॥

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্মৃতিতে একশত অধ্যায় আছে। স্বয়ং ভগবান্ উহাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম বর্ণনা করেন। গ্রন্থখানি গদ্য ও পদ্য সম্বলিত। ইহাতে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বর্ণনা আছে—ঔরস, ক্ষেত্রজ, পুত্রিকা-পুত্র, গৌনর্ভব, কানীন, গূঢ়োৎপন্ন, সহোঢ়, দত্তক, ক্রীত, স্বয়মুপাগত, অপবিদ্ধ ও উৎপাদিত। এই সংহিতাখানিকে বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রও বলা হয়। মহাভারতের বিশেষতঃ গীতাংশের অনেক শ্লোক আছে।

৩৭। **হারীত-সংহিতা** ... ... এই সংহিতাও দুই আকারের। একখানির নাম "লঘুহারীত" ও অপরখানির নাম "বৃদ্ধ হারীত।" লঘু হারীতে ৭টি অধ্যায় আছে। উহার আদি বক্তা মহর্ষি হারীত; পরবর্তী বক্তার নাম নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহাতে ভগবান্ নৃসিংহদেব সন্তুষ্ট হন, সেই ধর্ম কি—

"যেন সন্তুষ্যতে দেবো নারসিংহঃ সনাতনঃ।"

উত্তরে তিনি, মহর্ষি হারীত ঋষিদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। বৃদ্ধহারীত সংহিতায় ৮টি অধ্যায় আছে। রাজর্ষি অম্বরীষ মহর্ষি হারীতের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া, নারীগণের কর্তব্য, জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ ও মোক্ষলাভের উপায় সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে মহর্ষি হারীত, ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত বিষয়গুলি বর্ণনা করেন। সেই সমস্ত উপদেশই এই সংহিতায় নিবদ্ধ। ইহাও একখানি বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র। বৈষ্ণবদিগের পালনীয় সমুদয় আচারই ইহাতে বর্ণিত আছে। প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করা কর্তব্য ও সর্বপ্রথমেই কোনও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে আচার্যপদে বরণ করা উচিত—

"আচার্যং সংশ্রয়েৎ পূর্বমনঘং বৈষ্ণবং দ্বিজম্ ॥"

যিনি সমস্ত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া তদনুযায়ী আচার-পরায়ণ হইয়াছেন তিনিই আচার্য হইবার উপযুক্ত—

"আলোচ্য সর্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি চ বৈষ্ণবাঃ।
তদর্থমাচরেদ্ যস্তু আচার্যঃ স উদাহৃতঃ ॥"

বৈষ্ণবের পক্ষে ভগবানের আয়ুধাদিচিহ্ন ধারণের ব্যবস্থা আছে। দক্ষিণ ভুজে চক্র, বাম ভুজে শঙ্খ, ললাট মধ্যে গদা, হৃদয়ে সঙ্গ ও মস্তকে শার্ঙ্গ অঙ্কিত করিতে হয়।

"দক্ষিণে তু ভুজে চক্রং বামাংশে শঙ্খমেব চ।
গদাঙ্কং ভালমধ্যে তু হৃদয়ে নন্দকং তদা।
মস্তকে তু তথা শার্ঙ্গমঙ্কয়েৎ বিমলং তদা ॥" ২।১৮-১৯

প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করা বিধেয়; তির্যক-পুণ্ড্র ধারণ নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবের নামকরণের বিশেষ বিধি আছে। ভগবান্ বিষ্ণুর নামানুসারে নামকরণ করিতে হইবে ও অন্তে "দাস" শব্দ যোগ করিতে হইবে—

"নৃসিংহরামকৃষ্ণাখ্যং দাসনাম প্রকল্পয়েৎ ॥" ২

এই সংহিতায় অষ্টাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, প্রভৃতি বিবিধ বৈষ্ণব মন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং ঐ সমস্ত মন্ত্রে পূজা ও হোমাদির বিধিও আছে। দাস্যভাব অবলম্বন করিয়াই নারায়ণের সেবা করা উচিত। দাস্যভাবের বহু প্রশংসা এই সংহিতায় আছে—

(ক) দাস্যমেব ফলং বিষ্ণোর্দাস্যমেব পরং সুখম্।
দাস্যমেব হরের্মোক্ষং দাস্যমেব পরং তপঃ ॥ ৩।১১১

(খ) "দাস্যং বিনা কৃতং যত্তু তদেব কলুষং ভবেৎ।
বিশিষ্টং পরমং ধর্মং দাস্যং ভগবতো হরেঃ ॥" ৫।১১

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত বিষ্ণুর পূজাবিধি ইহাতে বর্ণিত আছে। জগতের সর্বত্র ও সর্ববিষয়ে তাঁহার বাস বলিয়াই তাঁহার নাম "বাসুদেব"—

"সর্বত্রাসৌ সমস্তং চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥" ৩।১৭৩

এই সংহিতায় উক্ত আছে—শালগ্রাম শিলায় সর্বপ্রকার ইষ্ট মূর্তির পূজা হইতে পারে। মূর্তিপূজা অপেক্ষা শালগ্রাম শিলার পূজার ফল অনেক অধিক—

"শালগ্রামশিলায়ান্তু পূজনং পরমাত্মনঃ।
কোটিকোটিগুণাধিক্যং ভবেদত্র ন সংশয়ঃ ॥" ৫।১৭৭

এই সংহিতায় দোল প্রভৃতি নানাবিধ উৎসবের ব্যবস্থাও আছে। প্রায়শ্চিত্তাদির বিধিও আছে। সংহিতার শেষভাগে হারীত অম্বরীষকে বলিতেছেন—মনু সংক্ষেপে যে ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণিত হইতেছে—

"মনুস্তু ধর্মশাস্ত্রন্তু সামান্যেনোক্তবান্ স্বয়ম।
তদেব হি ময়া রাজন্ বৈশিষ্ট্যেণ তবেরিতম ॥" ৮।৩৪৫

এই জন্য এই সংহিতাকে "বিশিষ্ট ধর্মশাস্ত্র" বলে, এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষভাগে উল্লেখ আছে "ইতি হারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে···"।

(ক্রমশঃ)

সন্ন্যাসাশ্রমের ক্রম ও কালনিরূপণ

অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী**, স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ, এম্. এ.

ধর্মনিয়ন্ত্রিত হিন্দুজীবনে সন্ন্যাসাশ্রম ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনের উপযোগী চতুর্থ আশ্রম[১]। এই আশ্রমে সর্বস্পৃহা-বর্জিত হইয়া একমাত্র ব্রহ্মধ্যানপর হইতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ব্যতীত সন্ন্যাসীর নিকটে আর কোনো কিছুর সমাদর নাই এবং সেই জন্যই তিনি ব্রহ্মাশ্রমী। পরমাত্মরূপ ব্রহ্মে অগ্ন্যাধান করিয়া সকল কর্ম উহাতে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মভাবে সমাহিত সন্ন্যাসী এই আশ্রমে ব্রহ্মতত্ত্বের অনুভব করেন। তাঁহার কাছে—

'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥'—গীতা ৪. ২৪

এক্ষণে প্রশ্ন এই—জীবনের কোন্ অবস্থায় সন্ন্যাস সম্ভব? আশ্রমক্রম অনুসারে ইহাকে সাধারণতঃ চতুর্থ আশ্রম বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ দিয়াছে। আবার শ্রুতি বলিতেছে—

'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।' (জাবাল উপনিষদ্—৪)

অর্থাৎ—'যেদিন নিরাসক্তি বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিন তৎক্ষণাৎ প্রব্রজ্যা করিবে।' শ্রুতি বচনটীর তাৎপর্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়—বেদান্ত-বিজ্ঞান-সিদ্ধ ব্রহ্মপদ লাভের জন্য যখন একান্ত নিষ্ঠা জাগিয়া ওঠে—আত্মীয় স্বজন বিষয় ও কর্ম প্রভৃতির আসক্তি যখন হৃদয় হইতে অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং সমস্ত চৈতন্য ছাপিয়া ব্রহ্ম-বিবিদিষা ব্যাকুল হইয়া পড়ে তখন কাল-প্রতীক্ষার প্রয়োজন নাই। সে হৃদয়বেগ শুভাশুভ দিনপঞ্জীর অপেক্ষা করে না—বা যোগ্যাযোগ্য অবস্থা বিচার করে না। স্থান ও কালের উপাধি তাহার কাছে অর্থহীন—মিথ্যার ছায়াবাজী।

প্রাচীন ধর্মসূত্রের আচার্যগণও এই তথ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পর যে-কোনো একটী আশ্রম গ্রহণীয়—ইহাও কোন কোন আচার্যের অভিপ্রেত। গৌতম প্রাচীন ধর্মমত উল্লেখে বলিয়াছেন—

'তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে'—গৌতম ধর্মসূত্র ৩, ১.

আপস্তম্ব চারি আশ্রমের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে—ব্রহ্মচর্য আশ্রমের পর স্ব-স্ব প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে বানপ্রস্থী (২. ২১. ১৯) অথবা ভিক্ষু হইতে পারা যায় (২.২১.৮)। এরূপ সিদ্ধান্তের মূলে আপস্তম্ব যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন—

'সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ স্যান্ন তু তজ্জ্যৈষ্ঠ্যমাশ্রমাণাম' (আপ° ২. ১৪. ১৪)

---

১ শ্রীভারতী (আশ্বিন) পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের 'চতুরাশ্রম ধর্ম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ আশ্রমধর্ম বিষয়ে যাহাতে নিজ নিজ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় সেইরূপ ভাবে চলা উচিত। কিন্তু (ব্রহ্মচর্যের পর) কোন্ আশ্রম যে ক্রমপর্যায়ে প্রথম স্থানীয় তাহার নির্ণয় সম্ভব নহে। কারণ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। ব্রহ্মচর্য আশ্রমের প্রাথম্য সম্বন্ধে অবশ্য কোনো শাস্ত্রেই মতবিভেদ নাই।

কিন্তু পরবর্তী মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে আশ্রমের পৌবাপর্য ক্রম বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। সন্ন্যাস আশ্রমকে এই ক্রম অনুসারে চতুর্থ আশ্রম বলা হইয়াছে। মনুর মতে জীবনের ঋণ পরিশোধ না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা অনুচিত।

'ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥'
(মনু. ৬. ৩৫-৩৭)

অর্থাৎ, 'ঋষিঋণ, দেবঋণ, পিতৃঋণ—এই তিন ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস আশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই সকল ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ-ধর্মের সেবা করিলে অধোগতি হয়। শাস্ত্রবিধি অনুসারে বেদাধ্যয়ন করিয়া, ধর্মানুসারে পুত্রোৎপাদন করিয়া এবং শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিজগণ যদি বেদ অধ্যয়ন, সন্তান উৎপাদন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করেন (অর্থাৎ সন্ন্যাস মার্গ অবলম্বন করেন) তাহা হইলে তাহাদের অধোগতি হয়।'

মনুর অনুশাসনের মূলে সম্ভবতঃ এই যুক্তি রহিয়াছে যে গৃহস্থ ধর্ম আশ্রম ধর্মের প্রাণ-স্বরূপ। ইহার বেদীমূলেই অন্যান্য আশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং এই আশ্রমেই বর্ণ ধর্ম পালনের সুযোগ আছে।[২] এ হেন সমাজস্থিতির কেন্দ্রভূমি গৃহস্থ-আশ্রম বর্জন করিয়া একেবারে মোক্ষমার্গে প্রবেশ সমাজ প্রয়োজনের দিক দিয়া ক্ষতিকর। ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়াও উহাতে পদস্খলনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। কারণ কর্মাভ্যাসে চিত্তশুদ্ধি আয়ত্ত না হইলে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্ন্যাস সাধনার ব্যাঘাত হয়। গীতার ভাষায়—

---

২ 'যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥
যথা ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্যন্তে তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্রমী গৃহী॥' (মনু ৩-৭৭—৭৮)
'গৌতম ধর্মসূত্রে' দৃষ্ট হয়—'তেষাং গৃহস্থো যোনিরপ্রজনত্বাদিতরেষাম্' (৩. ৩)।
বশিষ্ঠ বলেন—'সর্বেষাশ্রমেষু গৃহস্থ এব বিশিষ্যতে'—৮. ১১।

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥[৩] গীতা. ৩. ৪

অবশ্য এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের দিক দিয়া আর একটি বিষয়ের আলোচনা দরকার। ইহা স্বীকার্য যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাচীন ভারতে ভৈক্ষ্য বা সন্ন্যাস আশ্রমের প্রচলন বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রথম হইতে দলে দলে এই আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার ফলে দান যজ্ঞ প্রভৃতি গৃহস্থ আচরিত ধর্মের উপরে বেশ একটা প্রবল সংঘাত আসিয়া পড়ে। যাহাতে উহার দৃষ্টান্তে বর্ণাশ্রম ধর্মেও কেবল সন্ন্যাসের আধিক্য এবং প্রাধান্য স্থাপিত না হয় সম্ভবতঃ সে দিকেও মন্বাদি স্মৃত্যাচার্যের কথঞ্চিৎ দৃষ্টি ছিল। এবং গার্হস্থ্য অতিক্রম করিয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণে যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অধোগতি হয়—বোধ করি এই শাসনের ইহাও অন্যতম লক্ষণীয় বিষয় ছিল।

'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' সন্ন্যাস গ্রহণের কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; যথা—

'সোঽত এব ব্রহ্মচর্যবান্ প্রব্রজতীত্যেকেষাম্। অথ শালীন-যাযাবরাণামনপত্যানাম্। বিধুরো বা। প্রজাঃ স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাপ্য বা। সপ্তত্যা ঊর্ধ্বং সন্ন্যাসমুপদিশন্তি'—(বৌধায়ন ২ ১০. ১—৬) অর্থাৎ—কোন কোন আচার্যের মতে ব্রহ্মচর্য সমাপনান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা যাইতে পারে, আবার অপরের মতে যাহারা শালীন ও যাযাবর গৃহস্থ[৪] এবং পুত্রাদিরহিত তাহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। পত্নীর মৃত্যু হইলে অথবা পুত্রদিগকে স্ব-স্ব-ধর্মে নিযুক্ত করিবার পর বা সত্তর বৎসর বয়সে উপনীত হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়।'

সন্ন্যাস আশ্রম যে সর্বশেষে গ্রহণীয় তাহাও উল্লেখ করিয়া বৌধায়ন নির্দেশ দিয়াছেন—

'আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষা-বলি-পরিশ্রান্তঃ পশ্চাদ্ভবতি ভিক্ষুকঃ॥' (২. ১০. ৬)

অর্থাৎ 'আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া যথারীতি হোমাদি নিষ্পন্ন করিয়া অন্যান্য আশ্রমীকে ভিক্ষাদি প্রদানে (অর্থাৎ কর্তব্য পালনে) ক্লান্ত হইয়া অবশেষে সংযম অবলম্বনে ভিক্ষুক হইবে।' সম্ভবতঃ ইহার তাৎপর্য এই:—গার্হস্থ্য অবস্থায় বিষয় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাদিতে ত্যাগের অভ্যাস কিছু কিছু করিয়া আয়ত্ত করিবার পর যথার্থ শান্তির

---

৩ অর্থাৎ—'কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না এবং কেবল কর্ম সন্ন্যাস বশতঃ কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।'

৪ শালীন ও যাযাবর—দুই প্রকার গৃহস্থ বিশেষ। মিতাক্ষরা ধৃত (যাজ্ঞবল্ক্য ১. ২৮ শ্লোকের টীকা দ্রঃ) দেবলের বচন যথা—'দ্বিবিধো গৃহস্থো যাযাবরঃ শালীনশ্চ।' যাযাবর গৃহস্থ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি জীবনোপায় বর্জন করিয়া কেবল যজন, অধ্যয়ন ও দানব্রতে কাল যাপন করেন, সম্পৎ বা রিকৃথ সঞ্চয়ের দিকে তিনি লক্ষ্য করেন না। কিন্তু শালীন গৃহস্থ যাজনাদি এমন কি কোন কোন স্থলে বাণিজ্যাদি দ্বারা সঞ্চয়শীল ও ধন-ধান্যযুক্ত হইয়া লোক-ধর্মানুবর্তী হইয়া থাকেন।

জন্য যখন মনপ্রাণ উদগ্র হইয়া উঠে—শাস্ত্র বিহিত দান যজ্ঞাদি করিয়া অবশেষে যখন হৃদয় নির্বিঘ্ন হয় তখনই ভৈক্ষচর্যার বিধান। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—আশ্রম ক্রম ত্যাগ করিয়া হঠাৎ কোনো প্রেরণার বশে যদি কেহ সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরবর্তী কালে সে প্রেরণা শিথিল হওয়ায় আবার হয়তো সে বিষয়াসক্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। ইহা যে বিশেষ দোষাবহ সে সম্বন্ধে বৌধায়নের টীকায় গোবিন্দস্বামী শাস্ত্র বচন উল্লেখ করিয়াছেন—

'চণ্ডালাদিপ্রত্যবসিতাঃ পরিব্রাজকতাপসাঃ।
তেষাং জাতান্যপত্যানি চণ্ডালৈঃ সহ বাসয়েৎ॥'

সন্ন্যাসের পর পুনরায় গার্হস্থ অবলম্বন শাস্ত্রে সমর্থিত নহে। উক্ত রীতি আশ্রম ধর্মের বহির্ভূত বলিয়া সেরূপ গৃহস্থ হইত উৎপন্ন পুত্রাদি সর্বধর্ম বহির্ভূত চণ্ডালাদিপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে।[৫]

'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে' আমরা মনুর অনুরূপ বিধি দেখিতে পাই।

'অধীতবেদো জপকৃৎ পুত্রবানন্নদোঽগ্নিমান্।
শক্ত্যা চ যজ্ঞকৃন্মোক্ষে মনঃ কুর্যাত্তু নান্যথা॥' (৩. ৫৭)

'বিষ্ণু স্মৃতি' স্পষ্টভাবে বলিয়াছে—

'অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্ককষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা সর্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ'—৯৬. ১

যথারীতি বানপ্রস্থের পরই যে সন্ন্যাসরূপ চতুর্থ আশ্রম গ্রহণীয় তদ্বিষয়ে 'হারীত'[৬] ও 'সংবর্ত সংহিতায়'[৭] নিশ্চিত বিধান আছে। 'শঙ্খ সূত্র'[৮] ও 'শঙ্খ সংহিতা'[৯] উভয় ধর্মশাস্ত্রই অনুরূপ নির্দেশ দিয়াছে।

'পরাশর-মাধব' ধৃত দক্ষস্মৃতির বচনে আশ্রম ব্যবস্থার পৌর্বাপর্যক্রম বর্জনের বিপক্ষে

---

৫ এরূপ করিলে নরকগামী হইতে হয়। গোবিন্দস্বামী বৌধায়নের ২. ১০. ২ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংবত বচন উল্লেখে এরূপ স্থলে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছেন—

'সন্ন্যস্য দুর্মতিঃ কশ্চিৎ প্রত্যাপত্তিং ভজেত যঃ।
স কুর্যাৎ কৃচ্ছ্রমশ্রান্তং ষাণ্মাসাৎ প্রত্যনন্তরম্॥'

৬ 'এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্বিষম্।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥' —হারীত ৬. ১

৭ উষিত্বৈবং বনে সম্যগ্বিধিজ্ঞঃ সর্ববস্তুষু।
চতুর্থমাশ্রমং গচ্ছেদ্ধুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥—সংবর্ত ১০১

৮ 'বনবাসাদূর্ধ্বং শান্তস্য পরিণতবয়সঃ কামতঃ প্রব্রজনম্'—(পি. ভি. কাণে সম্পাদিত 'শঙ্খলিখিত ধ সূ.—১৬১ সূত্র)

৯ শঙ্খসংহিতা ৭. ১ দ্রঃ।

বিশেষ সতর্ক শাসন দেখিতে পাওয়া যায়।১০ তাঁহার মতে যে ব্যক্তি আশ্রম ব্যবস্থার ক্রম ভঙ্গ করিতে প্রয়াস করিবে সে নরাধম ও পাতকী এবং সে কখনই আশ্রম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

এই সকল শাস্ত্র বচন হইতে প্রতীত হয় গার্হস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য সম্পাদন করিবার পর বানপ্রস্থ আশ্রমে ত্যাগ ও তপোব্রতের সাধনা অর্জন করিতে হয় এবং ক্রমে তদনুশীলিত সংযম অভ্যাসের মধ্য দিয়া ব্রহ্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে হয়। ব্রহ্মসাধনা কথার কথা নহে—তদুপযোগী শম, দম ও তিতিক্ষাদি ব্রতচর্যার ক্রমসোপান বহিয়া পারমহংস্যপদের সৌধচূড়ায় আরোহণ করিতে হয়। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি আয়ত্ত না করিলে নৈষ্কর্ম্যসাধনার সেই উচ্চ ভূমি হইতে সহসা পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা থাকে। পূর্বেও আমরা দেখিইয়াছি যে গীতা এই তথ্যই প্রকাশ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন—

'ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥' গীতা. ৩. ৪

অর্থাৎ—'কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্য বা জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। কেবল কর্মসন্ন্যাস করিলেই যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা নহে।' গীতার এই উক্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী বলেন—

'অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্মাণি কর্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ কর্মণামিতি।'

'শাস্ত্রে বিহিত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপালনে যে সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হয় তাহা হইতেই ক্রমশঃ জ্ঞাননিষ্ঠা উদ্ভূত হয় এবং তখনই সন্ন্যাস অবলম্বনে যথার্থ সিদ্ধি বা মোক্ষপদ অধিগত হয়।'১১

কর্মাভ্যাসের ফলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রবৃত্তি জাগরিত হয় শ্রুতির নিম্নোক্ত বচনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—

'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' (বৃহদারণ্যক উ° ৪. ৪. ২২)

'বেদান্তসারে' ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারি-নির্ণয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—

'অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনে আপাততোঽধিগতাখিল-বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধ-বর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন ··· সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা'—(বেদান্তসার ৫ম অনুচ্ছেদ)

সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়েই স্মৃতিপ্রণেতা আচার্যগণ সন্ন্যাস আশ্রমকে জীবনের চতুর্থ পদবীতে স্থান দিয়াছেন। চারিটী আশ্রমের ক্রম ব্যবস্থায় একটা ধর্ম্যমুখ্য জীবনের ধারাপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সে ধারা কোথাও জটিল আবর্ত সৃষ্টি করে নাই বা কোথাও ক্ষীণ

---

১০ 'পরাশরমাধব'—পৃ° ৫৩৩৳°

১১ ম. ম. গঙ্গানাথ ঝা প্রণীত Philosophical Discipline (Kamala Lecture) গ্রন্থ দ্র°।

হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে প্রবাহের ক্রমছন্দঃ ত্যাগ করিয়া জীবনকে অন্যরূপে পরিচালিত করিতে গেলে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পক্ষে বহু অন্তরায় ও বিঘ্ন ঘটিতে পারে। বোধ করি এই আশঙ্কাতেই শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের নির্দিষ্ট ক্রমপদ্ধতি রক্ষা করিবার জন্য এত অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

অবশ্য ইহা সত্য যে পূর্ব জন্মার্জিত কর্মাভ্যাসের ফলে[১২] যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি পূর্ব হইতেই রহিয়াছে—সাধনার পথে যাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন—কেবল সামান্য কর্ম-শেষ ক্ষয়ের নিমিত্ত যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সন্ন্যাস ব্যবস্থার কোনো ধরাবাঁধা ক্রমপদ্ধতি নির্দিষ্ট হইতে পারে না। তাঁহারা যে পূর্ব হইতেই সন্ন্যাসের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কর্মবন্ধ মুক্তির নিমিত্ত তাঁহারা হয়তো আবাল্য ব্রহ্মসাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। ধ্রুব, নারদ, প্রহ্লাদ প্রভৃতির আশৈশব বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু কেবল সেরূপ পূর্বজন্মের সংস্কার-সংস্কৃত ভাগ্যবানের পক্ষেই কাল বা স্থানের সঙ্কোচ সীমায় সন্ন্যাস প্রেরণাকে রুদ্ধ করা যায় না। অতএব মনু প্রভৃতির ব্যবস্থার সহিত উপরিলিখিত সিদ্ধান্তের আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধ হইলেও মূলতঃ কোন ভেদ নাই। কারণ পূর্ব পূর্বজন্মের বর্ণাশ্রম কর্মাভ্যাসে সাধকবৃন্দের পরিমার্জিত চিত্তমুকুরে জ্ঞান নিষ্ঠার যে বিমল প্রভা পূর্ব হইতেই প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসের সে অদম্য প্রেরণায় রাজপুত্র রাজৈশ্বর্য তৃণজ্ঞান করিয়া সত্যের সন্ধানে ছুটিয়া যায়—গৃহী গৃহের বন্ধন পাশ ছিন্ন করিয়া সেই পরমানন্দময় মুক্তির পথে ধাবিত হয়। 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'[১৩] শ্রুতির এই অমূল্য নির্দেশ কেবল তাঁহাদের পক্ষেই উপযোগী। অন্যথায় মন্বাদি বিহিত ক্রমব্যবস্থাই আদরণীয়।

---

১২ 'অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা'—বেদান্তসারের ৫ম অনুচ্ছেদ দ্র°।

১৩ জাবাল উপনিষদ্ ৪ দ্র°।

প্রসেনজিৎ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

ভগবান বুদ্ধের সময় মজ্‌ঝিম দেশে (মধ্যদেশে) ও উত্তরাপথে যে ষোলটি মহাজনপদ ছিল, তন্মধ্যে মগধ ও কোশল অন্যতম। মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার, আর প্রসেনজিৎ ছিলেন কোশলের রাজা। ইঁহারা দুইজনেই বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই কারণে বৌদ্ধ-সাহিত্যে ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা কথা ও উপকথার অবতারণা আছে। প্রসেনজিৎ সম্বন্ধে সে সকলের কিছু কিছু সঙ্কলন করিতেছি।

প্রসেনজিতের পিতার নাম ছিল মহা-কোশল। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে এটুকু জানা যায় যে, কোশল-দেবী নাম্নী তাঁহার এক কন্যাকে তিনি মগধের রাজা বিম্বিসারের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে স্নানের পণ বা যৌতুক স্বরূপ জামাতাকে কাশী নামক একটি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

রীস্ ডেভিড্‌স্ সাহেবের মতে, প্রসেনজিতের আসল নাম ছিল অগ্নিদত্ত, এবং 'প্রসেনজিৎ' শব্দটি উপাধিমাত্র; কারণ 'দিব্যাবদানে' দেখা যায় যে, পোক্‌করসাদি নামক ব্রাহ্মণকে উক্কট্‌ঠা নামক গ্রাম যে রাজা দান করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অগ্নিদত্ত, অথচ 'দীঘ-নিকায়ে' তাঁহাকে 'প্রসেনজিৎ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমত কতদুর সত্য ও গ্রাহ্য তাহা বলা কঠিন।

যাহা হউক, সে সময় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তক্ষশিলা। তক্ষশিলায় পড়াশুনা করিতে নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির শিক্ষার্থীরা গমন করিত। ছোটজাতের ছেলেরা সেখানে আমল পাইত না। কেহ কেহ লুকাইয়া যাইত বটে, কিন্তু ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিতও হইত।

রাজার ছেলে প্রসেনজিৎও চলিলেন তক্ষশিলায় লেখাপড়া করিতে। আবার সেই সময়ে বৈশালীর লিচ্ছবী বংশীয় রাজকুমার মহালি এবং কুশীনগরের মল্লদের এক রাজকুমার বন্ধুল, ইঁহারাও গিয়াছিলেন তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিতে। তক্ষশিলা নগরীর বাহিরে একটি বিশ্রামাগারে এই তিন রাজকুমারের দেখা হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নাম, ধাম, বংশ পরিচয় প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া তখনই সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কেবল তাহাই নয়, তক্ষশিলায় প্রবেশ করিয়া তিনজনে আবার একই গুরুর শরণাগন্ন হইলেন। এই গুরু ছিলেন যেমন পণ্ডিত, তাঁহার খ্যাতিও ছিল তেমনই দিগন্ত প্রসারিত। তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তিনটি রাজকুমারই অল্পদিনের মধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

এবং যথাকালে তাঁহারা তিনজনে একত্র গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

প্রসেনজিৎ কোশলে ফিরিয়া আসিয়া নানা বিষয়ে এমন দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন যে, রাজা মহাকোশল দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে অচিরেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা হইয়া প্রসেনজিৎ শাসনকার্যে একান্তভাবে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। সৎ ও গুণী ব্যক্তিকে তিনি ভারী শ্রদ্ধা করিতেন। প্রয়োজন হইলে তিনি সেরূপ ব্যক্তিকে অর্থ-সাহায্য করিতেন, বিনা-করে ভূমি দান করিতেন। তাঁহার ভিক্ষাশালার দ্বার থাকিত সর্বদাই উন্মুক্ত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত আসিয়া খাদ্য ও পানীয় চাহিলেই যেন পায়।

মহা-কোশলের পুরোহিত ছিলেন অগ্নিদত্ত। প্রসেনজিৎ রাজা হইয়া অগ্নিদত্তকে নিজেরও পৌরহিত্য কর্মে নিয়োগ করিলেন, এবং তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ-অনুগ্রহ অগ্নিদত্ত আর বেশী বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহার ধনরত্ন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্য এক বিবরণে দেখা যায়, রাজা মহাকোশলের পুরোহিতের নাম ছিল বাবরী, তিনি প্রসেনজিৎকে বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। প্রসেনজিৎ সিংহাসনে আরোহণ করিলে, বাবরী সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রসেনজিৎ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তবে প্রসেনজিতের আগ্রহে বাবরী এইটুকু করিলেন যে, নগর ছাড়িয়া শ্রাবস্তীর রাজোদ্যানে বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে সেই সমস্ত স্থানও বাবরীর পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি শান্তিলাভের আশায় শ্রাবস্তী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং অবশেষে দক্ষিণাপথে গোদাবরী নদীর মধ্যে একটা দ্বীপে বসবাস করিতে লাগিলেন।

কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। বুদ্ধের সময় উত্তরাপথে ছয়টী বড় বড় নগরী ছিল,—শ্রাবস্তী, সাকেত, বারাণসী, কৌশাম্বী, রাজগৃহ ও চম্পা। তখন শ্রাবস্তীর গৌরবের সীমা ছিল না। শুনা যায়, সে সময়ে ঐ নগরীতে নাকি ৫৭ হাজার পরিবার এবং আঠার কোটি (?) মানুষ বাস করিত। সাকেত ও শ্রাবস্তীর দূরত্ব বেশী ছিল না, এবং সাকেতই ছিল কোশলের পুরাতন রাজধানী। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের রাপ্তী নদীর তীরে সাহেট-মাহেট নামক স্থানে প্রাচীন শ্রাবস্তীর অবস্থান ছিল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রাবস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ভারতীয় সাহিত্য হইতে সঙ্কলন করিয়া শ্রীযুক্ত ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় কিছুদিন পূর্বে একখানি সারবান পুস্তক লিখিয়াছেন।

বুদ্ধের একজন প্রধান ভক্ত হিসাবেই প্রসেনজিৎ ইতিহাসে সমধিক খ্যাত। তিনি কেবল বুদ্ধের সমসাময়িকই ছিলেন না, প্রায় সমবয়স্কও ছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের অল্পদিনের মধ্যেই (তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুসারে, দুই বৎসরের মধ্যেই) প্রসেনজিৎ তাঁহার

অনুরক্ত হইয়াছিলেন, এবং জীবনের শেষ অবধি বুদ্ধের প্রতি তাঁহার ভক্তি অক্ষুণ্ণ ও অচলা ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, রাজা তাঁহার চরণে অবনত হইয়া প্রণাম করিতেন এবং চরণদ্বয় চুম্বন করিতেন। সময়ে অসময়ে গিয়া তিনি বুদ্ধকে দর্শন করিতেন, এবং তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। গুরুতর রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকার দিনেও প্রসেনজিৎ অবসর পাইলেই বুদ্ধের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে, তাঁহার কোনও শিষ্যের সহিত ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ভরহুতের এক শিলাখণ্ডে বুদ্ধের সহিত প্রসেনজিতের শেষবার দর্শনের জন্য গমনের দৃশ্য অঙ্কিত আছে। কেহ বুদ্ধের প্রশংসাভাজন হইলে প্রসেনজিৎ তাঁহাকে প্রচুর সমাদর করিতেন। কেবল বুদ্ধ নয়, সঙ্ঘের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সঙ্ঘের প্রতি কেহ অবমাননাসূচক কথা কহিলে বা কর্ম করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতেন না। সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে তাঁহার দানও ছিল প্রভূত।

একদা তাঁহার রাজ্যে কতকগুলি বিধর্মী বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের নামে কলঙ্ক লেপন করিবার উদ্দেশ্যে সুন্দরী নাম্নী এক পরিব্রাজিকাকে নিযুক্ত করে। সেই নারী প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাল্য, গন্ধ প্রভৃতি হস্তে লইয়া শ্রাবস্তীর রাজপথ দিয়া জেতবন অভিমুখে গমন করিত, এবং কেহ প্রশ্ন করিলে বিধর্মীদিগের শিক্ষামত বলিত, বুদ্ধদেবের সহিত এক কক্ষে রাত্রিযাপন করিবার জন্য জেতবনে যাইতেছে। জেতবনের নিকটে কোথাও রাত্রিযাপন করিয়া প্রত্যূষে পুনরায় সেই নারী রাজপথ দিয়া ফিরিয়া যাইত। কিছুদিন এইভাবে গেলে পর, তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া, বিধর্মীগণ কয়েকজন দুর্বৃত্ত দ্বারা সুন্দরীকে হত্যা করাইয়া তাহার মৃতদেহ বুদ্ধের গন্ধকুটির নিকটে লুকাইয়া রাখিয়া আসিল, এবং রব তুলিয়া দিল যে, সুন্দরীকে পাওয়া যাইতেছে না। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাহার মৃতদেহ সেইস্থান হইতে উদ্ধার করা হইল, এবং শবটাকে একখানি খাটিয়ায় চাপাইয়া সেটাকে তাহারা রাজপথ দিয়া ঘুরাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাইয়া গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল, "দেখ, দেখ, শাক্যভিক্ষুদের কর্মটা দেখ।" ফলে ভিক্ষুগণ রাস্তায় নানাভাবে অপমানিত হইতে লাগিলেন। বুদ্ধ সাতদিন ধরিয়া গন্ধকুটিতেই রহিলেন, নগরে আর ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন না। এদিকে রাজা প্রসেনজিৎ ঘটনাটা সঠিক জানিবার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করিলেন। সুন্দরীর ঘাতকগণ যখন অত্যন্ত মাতাল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেছিল, রাজার গুপ্তচরগণ তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া রাজাকে খবর দিল। তাহাদের অবিলম্বে ধরিয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তাহারা তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিল। রাজা তখন সেই সকল বিধর্মীদিগকে ধরিয়া আনাইয়া, ভিক্ষুদিগের বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার করা হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন এবং সুন্দরীকে হত্যার জন্য কঠোর শাস্তি বিধান করিলেন।

রাজা প্রসেনজিৎ একবার বুদ্ধকে দর্শন করিতে গিয়া বিপদেও পড়িয়াছিলেন। সে সময় তিনি অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী লইয়া দৈনিক তিনবার করিয়া বুদ্ধদেবকে দর্শন ও সেবা করিতে যাইতেন। কতগুলি দস্যু ইহা জানিতে পারিয়া অন্ধবন নামক স্থানে লুকাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার মতলব করে। কিন্তু রাজা এই চক্রান্তের কথা কি করিয়া পূর্বাহ্ণেই জানিতে পারেন এবং তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন।

চীনদেশীয় বৃত্তান্ত অনুসারে দেখা যায়, মহারাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে বুদ্ধ যখন তাবতিংসে (স্বর্গে) কিছুকালের জন্য গমন করিয়াছিলেন, প্রসেনজিৎ তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা বুদ্ধের এক মূর্তি তৈয়ার করাইয়া তাহার পূজা করিতেন। শ্রাবস্তীর দক্ষিণ পূর্বদিকে জেতবনের নিকট বৌদ্ধভিক্ষুদের থাকিবার জন্য একটি বিহারও প্রসেনজিৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। কোনও গ্রন্থে দেখা যায়, অন্ধবনে উপ্পলবণ্ণা (উৎপলবর্ণা) নাম্নী পরিব্রাজিকার উপর তাঁহার পাণিপ্রার্থী একটি যুবক কর্তৃক বলাৎকারের পর, বুদ্ধদেবের নির্দেশে প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদের অবস্থানের নিমিত্ত এই বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্যত্র পাই, বিধর্মীগণ বুদ্ধের জনপ্রিয়তা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া জেতবনের অতি সন্নিকটে তাহাদের নিজেদের জন্য একটি বিহার স্থাপন করিতে উদ্যত হইল, এবং পাছে বুদ্ধ আপত্তি করিবার সুযোগ পান, এইজন্য তাহারা রাজা প্রসেনজিৎকে এক সহস্র মুদ্রাও দিয়া রাখিল। বুদ্ধদেব তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য রাজার নিকট আনন্দকে পাঠাইলেন। কিন্তু আনন্দ, অথবা সারিপুত্র, অথবা মোগ্‌গল্লান কাহারও সহিত রাজা দেখা করিলেন না (এই পাপেই নাকি প্রসেনজিৎ মৃত্যুর পূর্বেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন)। অবশেষে বুদ্ধ স্বয়ং রাজসকাশে আসিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে সমাদর ও অভ্যর্থনার কোনও ত্রুটিই করিলেন না। সমস্ত শুনিয়া রাজা পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং বিধর্মীদিগকে সেই স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া সেইস্থানে নিজব্যয়ে একটি বিহার করাইয়া দিলেন, তাহার নাম হইল 'রাজকারাম'। এই বিহারে অবস্থান করিয়া বুদ্ধ অনেকগুলি উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। হুয়েন সাং বলেন, প্রসেনজিৎ প্রজাপতি-গোতমীর জন্যও একটি বিহার তৈয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন।

ভক্ত বা শিষ্যের সম্বন্ধ ছাড়া, বুদ্ধের তিনি বন্ধুও ছিলেন। মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপও হইত। রাজা গুরুভোজনের জন্য মেদবৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি অত্যধিক খাওয়াও ছাড়েন না, রোগও তাঁহাকে ছাড়েনা। একদা রাজা বুদ্ধদেবের সন্নিধানে গমন করিলে, বুদ্ধ তাঁহাকে দেখিয়া গুরু ভোজনের জন্য তিরস্কার করিয়া, ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু রাজা শ্লোক দুইটি স্মরণ রাখিতে পারিলেন না। অগত্যা বুদ্ধ রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র সুদর্শন (অথবা উত্তর)-কে শ্লোক দুইটি কণ্ঠস্থ করাইলেন, এবং রাজার আহারের সময় উহা আবৃত্তি করিতে কহিয়া দিলেন। রাজা বুদ্ধের ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিলেন, এবং ক্রমশঃ আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করিতে

লাগিলেন। ঐ শ্লোক দুইটি প্রত্যহ আহারকালে আবৃত্তি করার জন্য রাজা সুদর্শনকে দৈনিক একশত কার্ষাপণ দান করিতেন। তৎপর যখন বুদ্ধের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার ঘটিল, রাজা তাঁহার দেহের ও মনের স্বাস্থ্য কিরূপ আশ্চর্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বুদ্ধ প্রীত হইলেন।

কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কিছুকাল পর পর্যন্তও প্রসেনজিতের রাজাভিমানটা অন্তর্হিত হয় নাই। এ বিষয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে। একদা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে দর্শন ও সেবার উদ্দেশ্যে গমন করিলে, তথায় চট্টপাণি নামক এক ব্যক্তি রাজাকে দেখিয়াও গাত্রোত্থান করিল না। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের মধ্যস্থতায় তিনি তখন আর তাহাকে কিছু বলিলেন না। কিছুদিন পরে রাজা দেখিলেন, কিয়দ্দূরে চট্টপাণি যাইতেছে। তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইল। চট্টপাণি আসিয়া জুতা খুলিয়া, ছাতা রাখিয়া, অতি বিনয় ও সম্ভ্রমের সহিত রাজার কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে চট্টপাণি! আমি যে রাজা সে জ্ঞানটা তোমার তা'হলে হয়েছে দেখ্‌ছি।" চট্টপাণি উত্তর দিল, "আজ্ঞে না, সে জ্ঞান ত বরাবরই আছে।" "আছে ত' সেদিন আমাকে সম্মান দেখাওনি কেন?" "আজ্ঞে, সেদিন ছিলাম রাজারও যিনি রাজা (বুদ্ধ) তাঁর কাছে, কাজেই সেখানে একজন রাজাকে দেখে গাত্রোত্থান করাটা সঙ্গত মনে করিনি।" প্রসেনজিৎ এই উত্তরে খুবই খুসী হইয়াছিলেন, এবং চট্টপাণিকে রাজান্তঃপুরে বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচার করার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চট্টপাণি ত আর ভিক্ষু ছিলনা, কাজেই সে ঐ কর্ম করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। পরে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অনুমোদন অনুসারে আনন্দকে এই কর্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আনন্দ প্রত্যহ গিয়া রাজার মহিষীদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিতেন।

কোশলদেবীর স্বামী ও প্রসেনজিতের ভগিনীপতি বিম্বিসারের সহিত প্রসেনজিতের রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনওরূপ বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিলনা, বরঞ্চ উভয়ের মধ্যে বরাবরই সদ্ভাব ও প্রীতির সম্বন্ধই ছিল। প্রসেনজিতও পরে বিম্বিসারের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের রাজ্যে জোতিয়, জটিল, মেণ্ডক, পুণ্যক ও কাকবল্লিয় নামে পাঁচজন কোটিপতি বাস করিতেন। অথচ প্রসেনজিতের রাজ্যে এরূপ ধনাঢ্য একজনও ছিলনা। অতএব প্রসেনজিৎ একবার বিম্বিসারের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার রাজ্যে একজন কোটিপতিকে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে বিম্বিসার মেণ্ডকের পুত্র ধনঞ্জয়কে কোশলে পাঠাইয়া দিলেন, এবং প্রসেনজিৎ সাকেতে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত করিলেন। এই ধনঞ্জয়ই ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠা বিশাখার পিতা, এবং পিতার সহিত বিশাখাও সাকেতে বাস করিতে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত **শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ**

পূর্বে বলা হইয়াছে—অন্যোন্যাভাব স্বীয় প্রতিযোগী পদার্থে থাকে না কিন্তু অত্যন্তাভাব স্বীয় প্রতিযোগী পদার্থেও থাকে। একটি দৃষ্টান্ত লইলে কথাটি পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। উপর্যুপরি কয়েকটি কুণ্ড (স্থালী=হাঁড়ি) স্থাপিত রহিয়াছে। উহার মধ্যে নিম্নস্থ কুণ্ডটি কুণ্ডবান্; কারণ, উহার উপরে আর একটি কুণ্ড আছে; কিন্তু উপরিস্থ কুণ্ডটি কুণ্ডাভাববান্; কারণ, সেইটির উপরে অন্য কোন কুণ্ড না থাকায় উহাতে কুণ্ডাভাব (অত্যন্তাভাব) প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং নির্বাধ, তথাপি উহাতে (উপরিস্থ কুণ্ডে) কুণ্ডের ভেদ প্রতীত হয় না। যদি অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব পরস্পর বিভিন্ন না হইয়া উহারা অভিন্ন হইত তবে উপরিস্থ কুণ্ডটি যেমন 'কুণ্ডাভাববান্' এইরূপে প্রতীত হয় তদ্রূপ 'কুণ্ডভিন্ন' এইরূপেও প্রতীত হইত। অতএব অন্যোন্যাভাব হইতে অত্যন্তাভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অত্যন্তাভাবের উদাহরণ বা লক্ষ্য বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়।

কেহ বলেন[১] —ত্রৈকালিক নিষেধই অত্যন্তাভাব—অর্থাৎ যে অধিকরণে যে-বস্তু কখনও ছিল না এবং কখনও থাকিবে না অথচ বর্তমান কালেও নাই সেই অধিকরণে উক্ত বস্তুর অভাবই **অত্যন্তাভাব**। যেমন—বায়ুতে রূপাভাব।

অন্য মতে[২] শশশৃঙ্গ, আকাশপুষ্প ইত্যাদি অলীক বস্তুর অভাবই **অত্যন্তাভাব**।

অত্যন্তাভাবের কোন বিভাগ শাস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি সামান্যধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বা সামান্যাভাব এবং বৈশিষ্ট্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব বা বিশিষ্টাভাব এই প্রকারে এবং ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব ও সমানাধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব এই প্রকারে অত্যন্তাভাবের বিভাগ করা যাইতে পারে।

———

প্রাগভাব

প্রাক্ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ববর্তী+অভাব=**প্রাগভাব**। প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রাগভাব'শব্দ হইতে বুঝা যায়—যে-অভাব প্রতিযোগী পদার্থের উৎপত্তির পূর্বকালে বিদ্যমান

---

১. বেদান্তপরিভাষা, অনুপলব্ধিপরিচ্ছেদ। 'নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্য সংসর্গপ্রতিষেধঃ' (৯।১।১০ বৈশেষিকসূত্র) "গেহে ঘটস্য যঃ সংসর্গঃ সংযোগস্তস্য প্রতিষেধঃ। স চ যদি কদাচিদপি ন ঘটস্তদা অত্যন্তাভাবএব, ভবিষ্যতঃ প্রাগভাবঃ, ভূতস্য প্রধ্বংসাভাবঃ' উপস্কার।"

২. 'অত্যন্তাভাবে তু সর্বথা অসদ্ভূতস্যৈব বুদ্ধাবারোপিতস্য দেশকালানবচ্ছিন্নঃ প্রতিষেধঃ, যথা ষট্পদার্থেভ্যো শাশ্বৎ প্রমেয়মস্তীতি' ন্যায়কন্দলী ২৩০ পৃঃ। "অতদদ্বয়ীজিত্বরসুন্দরান্তরে ন তন্মুখস্য প্রতিমা চরাচরে' নৈষধচরিত ১ম সর্গ। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। মাধ্বসম্প্রদায় ও নাস্তিকসম্প্রদায় এই মতাবলম্বী।

থাকে তাহাই **প্রাগভাব**। ফলতঃ, যে-পদার্থ উৎপত্তিযোগ্য তাহারই প্রাগভাব সম্ভবে এজন্য অনিত্য দ্রব্য, অনিত্য গুণ, সমুদায় কর্ম এবং ধ্বংস—ইহারাই প্রাগভাবের প্রতিযোগী হইয়া থাকে[১]। প্রাগভাব অনাদি—আদিশূন্য অর্থাৎ প্রাগভাবের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না এজন্য প্রাগভাবের আর প্রাগভাগ সম্ভবে না। সুতরাং প্রাগভাব স্বয়ং কোন প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না।

প্রাগভাব প্রত্যক্ষযোগ্য কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। উহা প্রত্যক্ষযোগ্য এইমতে 'ভবিষ্যতি'—অর্থাৎ 'হইবে' এই আকারে প্রাগভাব অনুভূত হয়। যেমন — ঘট হইবে (ইহা ঘটের প্রাগভাব) ; পুত্র জন্মিবে (ইহা পুত্রের প্রাগভাব) ইত্যাদি।

প্রাগভাব সামান্যাভাব নহে অর্থাৎ অত্যন্তাভাবেরপ্রতিযোগিতা যেমন ঘটত্ব দ্রব্যত্ব ইত্যাদি সামান্য ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্রূপ কোন সামান্য ধর্ম প্রাগভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না[২] সুতরাং প্রত্যেক প্রাগভাবের প্রতিযোগী[৩] এক একটিমাত্র।

প্রাগভাব প্রত্যক্ষযোগ্য নহে এই প্রকার মতও সামান্যলক্ষণাদীধিতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। যে-বস্তু একবার উৎপন্ন হইয়াছে, কারণসমূহ স্থির থাকিলে উহারই পুনর্বার উৎপত্তি কেন হয় না এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তির জন্য প্রাগভাব কারণরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ বস্তুর উৎপত্তি মাত্রই উহার (প্রাগভাবের) নাশ ঘটে এই প্রকারে কল্পিত প্রাগভাবের স্বরূপ নির্ধারিত হওয়ায় পূর্বোক্ত প্রশ্ন আর হইতে পারে না। কারণ, বস্তুর উৎপত্তি হইলে প্রাগভাবস্বরূপ অন্যতম কারণ না থাকায় "উহার সামগ্রী অর্থাৎ সমুদায় কারণ আছে" ইহা বলিতে পারা যায় না। ঐ প্রশ্নের অন্য প্রকার সমাধান সম্ভব বলিয়া সম্প্রদায় বিশেষের মতে[৪] প্রাগভাব স্বীকৃত হয় নাই।

প্রাগভাব ব্যাপ্যবৃত্তি। যে-প্রাগভাবের প্রতিযোগী কোন দ্রব্য, গুণ অথবা কর্ম সেই

---

১. যে-বস্তু কখনও উৎপন্ন হইবে না মতবিশেষে উহারও প্রাগভাব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—"অনুৎপত্তিং তথা চান্যে প্রত্যবায়স্য মন্বতে"। ঐপ্রকার প্রাগভাবের বিনাশ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং উক্তমতবাদীরা বলিতে বাধ্য যে, উহা নিত্য। এমত অবস্থায় উহার 'প্রাগভাব' সংজ্ঞা দেওয়া সঙ্গত কি না তাহা বিচার্য। বিশেষতঃ প্রতিযোগীরূপে অভিপ্রেত ঐ প্রকার বস্তু সর্বত্র ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগী অর্থাৎ অলীক। অতএব ঐ প্রকার প্রাগভাবও অলীকপ্রতিযোগিক হইয়া পড়ে, ইহাও চিন্তনীয়।

২. নব্যমতে প্রাগভাবের কোনও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম স্বীকৃত হয় না, ফলে তদ্‌ঘটের প্রাগভাবীয় প্রতিযোগিতা তদ্‌ঘটত্বাব-চ্ছিন্নও নহে। ইহারা প্রাগভাব এবং ধ্বংসের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও মানেন না। প্রাগভাব এবং ধ্বংস সামান্যাভাবও হইতে পারে এইরূপ মত সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৩. মতান্তরে প্রত্যেক প্রাগভাবের প্রতিযোগী তিনটি—যেমন ঘট, ঘটধ্বংস এবং ঘটাত্যন্তাভাব—ইহারা ঘটপ্রাগভাবের প্রতিযোগী। 'ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকং' ইহার প্রাচীনসম্মত ব্যাখ্যায় এই সিদ্ধান্ত-স্বীকৃত।

৪. কণাদসিদ্ধান্ত চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে—নব্য সম্প্রদায় এবং বেদান্তমতে প্রাগভাব স্বীকৃত হয় নাই। বেদান্ত পরিভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়—"অতএব বিবরণে অবিদ্যানুমানে প্রাগভাবব্যতিরিক্তত্ববিশেষণম্"।

প্রাগভাব প্রতিযোগী পদার্থটি জন্মিবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত উহার সমবায়ী বা উপাদান কারণে অবস্থান করে এবং প্রতিযোগী জন্মিলে পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়[১]। অন্য সময়ে অর্থাৎ প্রতিযোগীর সমবায়ী জন্মিবার পূর্বে এবং সমবায়ীর নাশ হইলে পরে উহা কালিক-বিশেষণতা সম্বন্ধে কালে থাকে[২]।

ধ্বংসের প্রাগভাব স্বীয় প্রতিযোগীর (ধ্বংসের) যাহা প্রতিযোগী সেই ভাবপদার্থের সমবায়ী কারণে থাকে। যেমন—ঘটধ্বংসের প্রাগভাব ঘটস্বরূপ ভাবের সমবায়ী মৃৎপিণ্ডে থাকে।

প্রাগভাব একবৃত্তি ও অনেকবৃত্তি উভয়প্রকারই হইতে পারে। শব্দের অধিকরণ একটিমাত্র দ্রব্য—আকাশ; এজন্য শব্দসমূহের প্রাগভাব সকল কেবল আকাশে থাকে অতএব উহা (শব্দপ্রাগভাব) একবৃত্তি। একখানি বস্ত্রনির্মাণে বহু সূত্র আবশ্যক। প্রত্যেক সূত্রই বস্ত্রের সমবায়ী কারণ। সুতরাং প্রত্যেক সূত্রে অবস্থিত হওয়ায় বস্ত্রপ্রাগভাব অনেকবৃত্তি। প্রাগভাব অনিত্য।

লক্ষণ। যে-অভাব বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা **প্রাগভাব** (নাশ্যাভাবঃ প্রাগভাবঃ)।

লক্ষ্য। ঘটপ্রাগভাব, পটপ্রাগভাব ইত্যাদি।

সমন্বয়। স্পষ্ট।

প্রাগভাবের কোন বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

ধ্বংস

ধ্বংস ধ্বংসাভাব (ধ্বংসাত্মক অভাব, ধ্বংসের অভাব নহে) প্রধ্বংস, নাশ, বিনাশ ইত্যাদি শব্দে একই অভাব বুঝায়।

উৎপত্তিযোগ্য দ্রব্য ও গুণসমূহ, যাবতীয় কর্ম এবং প্রাগভাব—ইহারা ধ্বংসের প্রতিযোগী।

ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকৃত হয় না[২] এজন্য ধ্বংস স্বয়ং কোন ধ্বংসের প্রতিযোগী নহে।

ধ্বংস (ইহা) 'নষ্ট' এই প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয়। ধ্বংস প্রায় সর্বতোভাবে প্রাগভাবের তুল্য। যেহেতু, ইহা অনিত্য, ব্যাপ্যবৃত্তি এবং একবৃত্তি ও অনেকবৃত্তি

---

১. প্রতিযোগীর উৎপত্তিক্ষণেই প্রাগভাব নষ্ট হয় এইরূপ মতান্তরও প্রসিদ্ধ।

২. ১৫ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। অদ্বৈত বেদান্তমতে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের বাধ অর্থাৎ জগতের নাশ হয়। ঐ নাশ ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে; কারণ, 'অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিত বস্তুনঃ'। সুতরাং অদ্বৈতবাদ ব্যাহত হয় না, বেদান্তপরিভাষা। গঙ্গাধর দীক্ষিত বলেন—বেদান্তমতে সমস্ত কার্যবস্তুর চরম ক্ষণের সহিত সম্বন্ধই ধ্বংস। কণাদ-সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা।

উভয়বিধ। ইহাও প্রাগভাববৎ স্বীয় প্রতিযোগীর সমবায়ী কারণে অবস্থিত হয় এবং ঐ সমবায়ী কারণ নষ্ট হইলে কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে[১] এবং সামান্যাভাব নহে[২]। বিশেষ এই যে—প্রাগভাব প্রতিযোগী পদার্থ উৎপন্ন হইবার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত থাকে কিন্তু ধ্বংস প্রতিযোগী বস্তুর উৎপত্তির পরে অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে[৩] আত্মলাভ করে। ফলে, কোন বস্তু জন্মিবার পরেই বিনষ্ট হয় আবার কোন বস্তু জন্মিয়া দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে এবং পরে উহার নাশ ঘটে।

লক্ষণ। যে অভাব উৎপন্ন হয় তাহা **ধ্বংস** (জন্যাভাবো ধ্বংসঃ) অথবা **ধ্বংসত্ব** অখণ্ডোপাধি, উহাই ধ্বংসের লক্ষণ[৪]।

লক্ষ্য। ঘটধ্বংস, পটধ্বংস ইত্যাদি।

সমন্বয়। স্পষ্ট।

শাস্ত্রে ধ্বংসের কোন বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

সংসর্গাভাব

অত্যন্তাভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংস এই তিনটীর সাধারণ নাম সংসর্গাভাব। প্রাচীনেরা মনে করিতেন—উক্ত অভাবত্রয়ের জ্ঞান প্রতিযোগী পদার্থের কোনও সম্বন্ধের আরোপ ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব প্রতিযোগীর সম্বন্ধারোপ অভাব প্রত্যক্ষে কারণ। 'ভূতলে যদি ঘট থাকিত তবে অবশ্যই ভূতল সংযোগসম্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হইত' এই জ্ঞানই অত্যন্তাভাবীয় প্রতিযোগীর সম্বন্ধারোপ। ইহার পরে ভূতল ঘটাভাববিশিষ্ট (ভূতলং ঘটাভাববৎ) এই প্রকারে ভূতলে ঘটাত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সংযোগের ন্যায় সমবায়, বিশেষণতা প্রভৃতি নানা সম্বন্ধে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী আরোপিত হইতে পারে[৫]।

প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসের স্থলেও যথাক্রমে পূর্বকাল ও উত্তরকাল এই দুই সম্বন্ধে তাঁহারা প্রতিযোগীর আরোপ স্বীকার করিতেন। যখন যে-সম্বন্ধে প্রতিযোগীর আরোপ হইত তখন সেই সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধরূপে গণ্য হইত। এই দৃষ্টিতে উহাদিগকে সংসর্গাভাব বলা হইত।

---

১. স্বরূপ সম্বন্ধেও উহা কালে থাকে এইরূপ মতও মিশ্রসম্মত বলিয়া জানা যায়

২. ১:০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. স্বীয় অবয়বদ্রব্যসমূহের পরস্পর বিভাগ বশতঃ উৎপন্ন দ্রব্য সমুদায়ের, আশ্রয় দ্রব্যের বিনাশ এবং বিরোধি-গুণের উৎপত্তি ইত্যাদি কারণে গুণ এবং কর্মের বিনাশ হয়।

৪. ১০৫ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। 'ধ্বংসত্বস্য অখণ্ডত্বমতে বৈয়র্থ্যশঙ্কানুদয়াচ্চ' পক্ষতা জাগদীশী।

নব্যগণ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসের স্থলে ঐরূপে সম্বন্ধারোপের আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই। সুতরাং নব্যমতে ধ্বংসও প্রাগভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না। এবং ইহাদের 'সংসর্গাভাব' সংজ্ঞার কারণও অনুসন্ধানযোগ্য।

জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ কি প্রকারে সাতটিমাত্র শ্রেণীতে পরিসমাপ্ত হয় এবং আরও সংক্ষেপে কিরূপে উহাদিগকে ভাব ও অভাব এই দুইটিমাত্র বিভাগের অন্তর্গত করা যায় তাহা বলা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হয়—উল্লিখিত দুই প্রকার ব্যতীত তৃতীয় প্রকারের কোন কিছু স্বীকার্য কিনা?

কোন কবি রাজসভায় নৈয়ায়িকগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাবাদভাবাদ্ যদি নাতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভিঃ স্বীক্রিয়তে পদার্থঃ।
জন্যাবিনাশি প্রতিযোগিশূন্যং শ্রীলক্ষ্মণক্ষৌণিপতে র্যশঃ কিং?॥"

অর্থাৎ সম্বন্ধীরা[১] ভাব ও অভাব ব্যতীত যদি অন্য পদার্থ স্বীকার না করেন তবে তাঁহারা মহারাজ শ্রীমান্ লক্ষ্মণ সেনের কীর্তিকে কি বলিবেন? কারণ, ঐ কীর্তি উৎপন্ন বটে কিন্তু অবিনশ্বর, এজন্য উহা ভাবপদার্থে অন্তর্ভূত করিবার অযোগ্য[২]; আবার উহা অভাব শ্রেণীতেও গণনার অযোগ্য; যেহেতু উহার প্রতিযোগী—বিরোধী অর্থাৎ সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীও নাই[৩]।

অবশ্য, দার্শনিকেরা কবির এই রাজস্তুতিকে নিজের অধিকারে আমল দিবেন না। তথাপি ভাব ও অভাব হইতে পৃথক্ অলীক নামেও একপ্রকার বিষয় স্বীকার করা উচিত।

আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, কূর্মলোম প্রভৃতি শব্দে যাহা বুঝায় তাহাই **অলীক**। আমরা ইহাকে অলীক-বিষয় নামে নির্দেশ করিব।

অলীক-বিষয় ভাব অথবা অভাব কোন শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্ভাবের অযোগ্য, ইহা ঐ সকলের বিবরণ হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। নৈয়ায়িকমতে উহা পদার্থসংজ্ঞার অনুপযুক্ত। কারণ, যে-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে তাহারই 'পদার্থ'সংজ্ঞা স্বীকার্য; কিন্তু উল্লিখিত শব্দ হইতে কোন যথার্থ জ্ঞান হয় না। যেমন—রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি হইলে সম্মুখস্থ রজ্জু ও দেশান্তরস্থিত সর্পের সম্বন্ধ (তাদাত্ম্য) অংশে ভ্রম হয় সেইরূপ পূর্বোক্ত স্থলসমূহে যথাক্রমে—পুষ্পে আকাশের, শৃঙ্গে শশের ও পুত্রে বন্ধ্যার সম্বন্ধাংশে ভ্রমই হইয়া থাকে কখনও যথার্থ জ্ঞান হয় না। ভ্রমজ্ঞান বস্তুর সাধক নহে। অতএব ঐ সকল ভ্রমের দ্বারা কোনও একটি অখণ্ড বস্তু সিদ্ধ হয় না। এজন্য পদার্থবিভাগে উহাদিগের অন্তর্ভাবের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

---

১. বহুবিধ সম্বন্ধ স্বীকার করায় নৈয়ায়িকগণকে সম্বন্ধী বা সম্বন্ধবাদী বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা 'শ্যালক' অর্থও ধ্বনিত হইতেছে, কারণ, বঙ্গদেশে ঐশব্দ শ্যালকেই প্রযুক্ত হয়। ১১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. উৎপন্ন ভাবপদার্থ সমস্তই বিনাশী।

৩. অভাবমাত্রই সপ্রতিযোগিক বা প্রত্যেক অভাবেরই প্রতিযোগী আছে। ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পদার্থের প্রথম লক্ষণে (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ত্ব) "যথার্থ"শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ইহা সূচিত হইয়াছে।

পদার্থের দ্বিতীয় লক্ষণ (পদশক্যত্ব) অনুসারেও উহারা কোন অখণ্ড পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি পদ নহে, উহারা এক একটি বাক্য। শক্তি পদেরই ধর্ম, উহা বাক্যে থাকে না। অতএব ঐ শব্দগুলির শক্তি না থাকায় উহাদের শক্য (শক্তির বিষয়)ও কিছু নাই সুতরাং ঐরূপ পদার্থও থাকিতে পারে না।

যদিও শাস্ত্রকারগণ 'রজ্জু-সর্প' এবং 'আকাশ-কুসুম' এই দুই স্থলেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়াছেন, তথাপি বিশেষ প্রণিধান করিলে বুঝা যায় যে, "ইহা সর্প' (অয়ং সর্পঃ) এই প্রকারে রজ্জুতে যে সর্প-বুদ্ধি হয় উহা হইতে 'আকাশ-কুসুম' প্রভৃতি বাক্য জনিত বুদ্ধির অনেক বৈলক্ষণ্য আছে এবং স্থলবিশেষে ঐ সকল শব্দ হইতে যথার্থ জ্ঞানও হইয়া থাকে।

কারণ, পূর্বোক্ত ভ্রমজ্ঞানটীর পরিচয় বিশ্লেষণ করিলে প্রথমতঃ দেখা যায় যে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম বুঝাইতে যে শব্দ দুইটীর প্রয়োগ হয় তাহারা বিশেষ্য অংশে একই অর্থ বুঝায় কিন্তু উহাদের বিশেষণ (ইদন্ত্ব ও সর্পত্ব) ভাগ পরস্পর বিভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ—ঐ প্রকার ভ্রম বুঝাইতে সাধারণতঃ যেরূপ শব্দ (অয়ং সর্পঃ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহার পর্যায় শব্দ (এষ অহিঃ ইত্যাদি)ও ঐ প্রকার ভ্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ কিন্তু উহার অপর্য্যায় শব্দ (নীলঃ ঘটঃ ইত্যাদি) প্রয়োগ করিলে কেহ ঐরূপ অর্থ বুঝে না।

তৃতীয়তঃ—রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধি প্রকাশ করিতে উক্ত দুইটীমাত্র শব্দ (অয়ং সর্পঃ) ব্যতীত অন্য কোন শব্দের নিয়ত অপেক্ষা থাকে না।

আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি স্থল যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত উদাহরণ দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।

যথা—"সন্তরণে সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম" ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্ব নির্দিষ্ট বস্তুর অসম্ভাবনীয়তা বুঝাইবার জন্য "আকাশকুসুম" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এখানে 'সমুদ্র-লঙ্ঘন' ও "আকাশ-কুসুম" এই শব্দ দুইটীর অর্থ এক নহে, বরঞ্চ ঐরূপে সমুদ্র-লঙ্ঘন যে একেবারেই কাল্পনিক, সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অলীক; উক্ত বাক্য হইতে তাহাই বুঝা যায়।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তে "আকাশকুসুম" কথাটীর পরিবর্তে 'শশশৃঙ্গ' অথবা 'বন্ধ্যাপুত্র' এইরূপ প্রয়োগ করিলে অর্থ একই থাকে কোনও ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু উহারা পর্যায়শব্দ ইহাও বলা যায় না। আকাশ-কুসুম প্রভৃতির পর্যায়রূপে খ-পুষ্প, ইত্যাদি শব্দই লোকপ্রসিদ্ধ, শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্র নহে।

আকাশকুসুম প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিতে হইলে আরও অন্ততঃ দুইটী শব্দের নিয়ত অপেক্ষা করিতে হয়, একটিমাত্র শব্দের প্রয়োগে ঐ আকাঙ্ক্ষার সমাধান

হয় না। উক্ত স্থলে—'সন্তরণে ও সমুদ্রলঙ্ঘন' এই দুইটী পদেরই অপেক্ষা আছে, উহার একটিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র 'সন্তরণ আকাশকুসুম' কিংবা 'সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম' এইরূপ বলিলে অর্থ সঙ্গত হয় না। অতএব সাধারণ ভ্রমের সহিত উক্তস্থলীয় জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অস্বীকার করা যায় না।

মহর্ষি পতঞ্জলিও ভ্রমের বিষয় হইতে অলীকের এই পার্থক্য অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বিপর্যয় ও বিকল্পের পৃথক্ ভাবে নির্দেশ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়[১]।

কল্পনাকুশল নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যদি আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি শব্দের 'অত্যন্তাভাব' অর্থ স্বীকার করেন তবে কোন অনুপপত্তি থাকে না। অন্যত্র অভাব যেমন প্রতিযোগী রূপে নিয়তই কোন ভাব পদার্থের অপেক্ষা রাখে তদ্রূপ আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি শব্দও ভাব পদার্থের সহযোগেই অর্থপ্রকাশ করিয়া থাকে। "সন্তরণের দ্বারা সমুদ্রলঙ্ঘন আকাশকুসুম" (সন্তরণেন সমুদ্রলঙ্ঘনং আকাশকুসুমং) কেহ এইরূপ বলিলে "সমুদ্রলঙ্ঘন সন্তরণসাধ্য নহে" (সমুদ্রলঙ্ঘনে সন্তরণ সাধ্যত্বাভাব) এইরূপে অত্যন্তাভাবই জ্ঞানের বিষয় হয়। অতএব আপাততঃ ভাবপদার্থরূপে প্রতীত হইলেও অপবর্গ, দারিদ্র্য প্রভৃতির ন্যায় আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতিও অভাব পদার্থের অন্তর্ভূত হইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

ষোড়শ পদার্থের অন্তর্ভাব

বৈশেষিক সম্মত সপ্ত পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। গৌতমোক্ত ষোড়শ পদার্থ কিরূপে উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থে অন্তর্ভূত হয় তাহা এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।[২]

মহর্ষি গৌতমের ষোড়শ পদার্থ—(১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতণ্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহস্থান।

---

১. পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ৭-৮ সূত্র দ্রষ্টব্য।

২. ১১ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। পদার্থসমূহের উক্ত ষোড়শ প্রকার নির্দেশকে পূর্বোক্ত (৬ পৃঃ) লক্ষণ অনুসারে বিভাগ বলা যায় না। কারণ, প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি অবান্তর ধর্মসকল পরস্পর বিরুদ্ধ নহে এবং এই স্থানে কোন সামান্য ধর্মও উক্ত হয় নাই।

(১) প্রমাণ

যাহা প্রমার[১] করণ[২] তাহা প্রমাণ।

প্রমাণ চতুর্বিধ[৩]—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ[৪]—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস এই ছয় প্রকার[৫] প্রত্যক্ষে যথাক্রমে করণ হওয়ায় নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্‌ কর্ণ ও মন এই ছয়টি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ইহারা সকলেই দ্রব্যের অন্তর্গত[৬]।

অনুমান—অনুমিতির করণ অনুমান। উহা ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বরূপ[৭]। অতএব অনুমান গুণে অন্তর্ভূত।

---

১. প্রমা ৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. করণ শব্দের অর্থ—কারণ বিশেষ বা ব্যাপারজনক কারণ। অতএব 'করণ' কার্য এবং ব্যাপার এই উভয় সাপেক্ষ। যে-বস্তু করণ হইতে উৎপন্ন অথচ কার্যের উৎপাদক তাহা ব্যাপার। যেমন—ছেদনকার্যে কুঠার (অস্ত্র) করণ এবং বৃক্ষ ও কুঠারের সংযোগ ব্যাপার।

প্রকৃত স্থলে "প্রমার করণ" এইরূপ বলিলে 'প্রমা' উহার (ঐ করণ বস্তুর) কার্য বা ফল ইহা স্বতই বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন এই ক্ষেত্রে ব্যাপারও আবশ্যক। উদ্দ্যোতকরাচার্য প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে ব্যাপারই করণ। তদনুসারে প্রাচীন ও নবীন মতে প্রমাণের স্বরূপনির্ণয়ে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে।

৩. 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি' ১।১।৩ ন্যায়সূত্র। চার্বাক মতে প্রমাণ একবিধ—প্রত্যক্ষ। বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক মতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাঙ্খ্য এবং পাতঞ্জলমতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। এইমত বৈশেষিক ব্যোমশিবাচার্য এবং নৈয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষের অনুমোদিত। মহর্ষি গৌতমের মতে প্রমাণ চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। শূন্যবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুনও "উপায়হৃদয়" গ্রন্থে উল্লিখিত চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। চরকসংহিতার মতেও প্রমাণ চতুর্বিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও শব্দ। প্রভাকর-মতে প্রমাণ পঞ্চবিধ—গৌতমসম্মত চারিটি এবং অর্থাপত্তি। মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মতেও অর্থাপত্তি পৃথক্‌ প্রমাণ। কুমারিল ভট্ট এবং বৈদান্তিক সম্প্রদায় মতে প্রমাণ ষড়্‌বিধ—প্রভাকরসম্মত পাঁচটি এবং অভাব। পৌরাণিক মতে প্রমাণ অষ্টবিধ—পূর্বোক্ত ছয়টি, সম্ভব ও ঐতিহ্য।

৪. 'প্রত্যক্ষ' শব্দটি নানা প্রকারে ব্যবহৃত হয়। ঘট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের (চাক্ষুষ অথবা ত্বাচ প্রত্যক্ষের) বিষয়। জ্ঞানের বিশেষণরূপে ব্যবহার—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ ইত্যাদি। "প্রত্যক্ষপ্রমাণ" অর্থে কেবল "প্রত্যক্ষ" শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রে সুলভ কিন্তু ঐরূপ লৌকিক প্রয়োগ স্বারসিক বা অনায়াসসিদ্ধ নহে।

৫. সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ—ঐ সপ্তম প্রকার ঈশ্বর প্রত্যক্ষ।

৬. ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৩ ও ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য। "ব্যাপারগুলিই করণ" এইরূপ প্রাচীন মতে প্রত্যক্ষপ্রমাণসমূহ সংযোগ, সমবায় এবং বিশেষণতায় অন্তর্ভূত। সবিকল্প প্রত্যক্ষ স্থলে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষই ব্যাপার এইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়।

৭. "অনুমান" শব্দ যদি ভাববাচ্যে "অনট্" প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হয় তবে উহার অর্থ—অনুমিতি। যদি অনু+মা+(করণে) অনট্ প্রত্যয়দ্বারা সাধিত হয়—তবে উহার অর্থ 'অনুমান প্রমাণ' হইতে পারে। সাধারণতঃ সর্বত্র অনুমিতি স্থলে "ব্যাপ্তিজ্ঞান" অনুমান নামে গণ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে "অভাবজ্ঞানই" সর্বত্র অনুমান। গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও উদ্দ্যোতকরাচার্য প্রভৃতির মতে ব্যাপ্তিজ্ঞানেরই অনুমান। ব্যাপার "পরামর্শ" মতান্তরে হেতুজ্ঞানই অনুমান। সকল মতেই উহা গুণ বিশেষ। উদয়নাচার্যের মতে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতু সকলই অনুমান। উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের প্রত্যেক বস্তুই অনুমিতি বিশেষে হেতু হইতে পারে সুতরাং এইমতে অনুমান যথাযথভাবে সপ্তপদার্থের অন্তর্গত। ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

অদ্বৈত শব্দার্থ

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সাংখ্যশ্রমী

দার্শনিকবাদে অদ্বৈত শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর জগতের কারণ, অন্য ঈশ্বর নাই; (২) বিশ্বের কারণ একই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম অথবা মনোবাক্যাতীত এক মৌলিক পদার্থ আছে, অন্য কিছু নাই; (৩) চিত্তনিরোধ করিয়া দৃশ্য জগৎ রোধ করিলে যে আত্মস্বরূপে থাকা যায় তাহাই অদ্বৈত বোধস্বরূপ। প্রথম মত এদেশীয় ও বিদেশীয় একেশ্বর-বাদীদের। এতদ্দেশীয় একেশ্বরবাদীরা শ্রুতি দেখান "শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্" ইত্যাদি (যদিও এই শ্রুতি আত্মাসম্বন্ধীয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় নহে)। দ্বিতীয় মত মায়াবাদীদের। মায়াবাদীদের দুই প্রকার ভেদ আছে—(ক) অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী বেদান্তী এবং (খ) শূন্যবাদী ম্যাধ্যমিক বৌদ্ধ। তৃতীয় মত সাংখ্যদের এবং তৎস্বজাতীয় অন্য দার্শনিকদের।

প্রথম মত সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। কারণ, উহা সম্যক্ দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে এবং অনেক অজ্ঞেয়তা ধরিয়া উহার সঙ্গতি করিতে হয়। যেমন—স্রষ্টা কিসের দ্বারা, কেন ও কবে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা অজ্ঞেয়; স্রষ্টা হইতে সৃষ্ট পৃথক্ কি না তাহা অজ্ঞেয়। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মতের মূলও শাস্ত্রপ্রমাণ। তন্মধ্যে বেদান্তীরা মনে করেন, শাস্ত্রে আছে—"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্", "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনম্ ঈষৎ" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে সৌম, এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তু অগ্রে ছিল ইত্যাদি। আর সেই সৎকে নির্বিকার বলা হয়—তাহা জগদ্রূপে বিকৃত হইতে পারে না বলিয়া এক ব্রহ্মই আছে, আর কিছু নাই। অন্য যাহা আছে (আছেও নয়, নাইও নয়) তাহা মায়ামাত্র। মায়াকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, সদসৎও বলা যায় না। সুতরাং সদসৎ হইতে অনির্বচনীয় বলা যায়। "ন সতী নাসতী মায়া ন চৈব সোভয়াত্মিকা। সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥" বেদান্তীদিগকে দুই পদার্থ স্বীকার করিতে হয়; এক ব্রহ্ম ও দ্বিতীয় মায়া। তথাপি তাঁহারা নিজেদেরকে যে কারণে অদ্বৈতবাদী বলেন তাহার যুক্তি এই—ব্রহ্ম সৎ, ইহা একান্তপক্ষে বলা যাইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্বচনীয় সৎ। আর মায়াকে একান্তপক্ষে সৎ ও অসৎ বলা যাইতে পারে না বলিয়া তাহা রাখিতেও হয়, ছাড়িতেও হয়। মায়া সনাতনী অর্থাৎ সদাকালই সদসৎ হইতে অনির্বচনীয় পদার্থ, বস্তু বা অবস্তু নহে। দ্বিতীয় প্রকার মায়াবাদের মূলও স্বকীয় আগম। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা মনে করেন, যখন তাঁহাদের

শাস্ত্রে জগতের চরম পদার্থ শূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে তখন সব মায়াময় বলিয়া শূন্যই একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। 'সর্বধর্মা অপি দেবপুত্রা মায়োপমাঃ স্বপ্নোপমাঃ ... ... যাবন্নির্বাণমপি মায়োপমং স্বপ্নোপমম্। স চেন্নির্বাণাদপি কশ্চিদ্ধর্মো বিশিষ্টতরঃ স্যাত্তমপ্যহং মায়োপমং স্বপ্নোপমং বদামি॥" (বোধিচর্যাবতার পঞ্জিকা)। 'অস্তুতত্ত্বং সদসদুভয়ানুভয়াত্মকচতুষ্কোটি-বিনির্মুক্তং শূন্যমেব'। 'কাত্যায়নাববাদে চাস্তীতি নাস্তীতি চোভয়ং প্রতিষিদ্ধং ভগবতা ভাবাভাববিভাবিনা।'—(মধ্যমক কারিকা)। ইঁহাদের মায়াও উপরের ন্যায় চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত 'চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যামিকা বিদুঃ' অর্থাৎ নাস্তিও নয়, অস্তিও নয়, নাস্ত্যস্তিও নয় এবং ন-নাস্ত্যাস্তিও নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়। তাঁহারা বলেন, 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্' (ন্যায়বিন্দু) অর্থাৎ যাহা সৎ বা বিজ্ঞেয় বা বিজ্ঞানের বিষয় তাহা ক্ষণিক (যেহেতু বিজ্ঞানই ক্ষণিক) সুতরাং সমস্ত সৎপদার্থই ক্ষণিক অর্থাৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়া শূন্যে নাশপ্রাপ্ত হয়। অতএব অসৎ পদার্থই বা শূন্যই অক্ষণিক বা একমাত্র অদ্বৈত নিত্য পদার্থ। সাংখ্যসূত্রে এই মতের বিবরণ যথা—'শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি' আর সৎ পদার্থসকল মায়া বা শূন্যমাত্র।

তৃতীয় মতে যে অদ্বৈত সত্তা আছে তাহা দ্রষ্টা আত্মা। দৃশ্য যখন রুদ্ধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন কেবল স্ববোধস্বরূপ পুরুষের নিকট দ্বৈত সত্তার জ্ঞান থাকে না বা নষ্ট হয়। 'কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।' এই কেবলতা বা কৈবল্য অবস্থার যে দ্রষ্টা পুরুষ তাহাই দ্বৈতভাণহীন অদ্বৈত সত্তা। এইরূপ সত্তা বাহ্যদৃষ্টিতে অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটী অদ্বৈত বোধস্বরূপ। এই বাদ স্থাপনের ভিত্তি শাস্ত্রমাত্র নহে, কিন্তু যুক্তি। ইহাতে যুক্তিযুক্তভাবে চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় বর্ণিত হয়। তদুপায়ে চলিলে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইবে তাহা যুক্তিসিদ্ধ। চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইলে অন্য জ্ঞেয় থাকিবে না, কেবল জ্ঞাতা আত্মা থাকিবেন।

অদ্বৈত ব্রহ্ম ও মায়াবাদীরা অন্যবাদীদের দ্বৈতবাদী বলেন। কারণ অন্যবাদীরা দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই দুই পদার্থকে সৎ বলেন; মায়াবাদীদের ন্যায় দৃশ্যকে অনির্বচনীয় সত্তা বলেন না। অনির্বচনীয় শব্দ বলিয়া অদ্বৈতস্থাপন সঙ্গতি করিতে যাওয়া শেষোক্ত দ্বৈতবাদীরা সমীচীন মনে করেন না এবং আবশ্যকও বোধ করেন না। কারণ, তাঁহাদের মতে—যখন নির্বচনীয় দুইটী সৎ পদার্থমূলক পরমার্থদর্শনের দ্বারা পরমার্থসিদ্ধি বা শাশ্বতী শান্তিরূপ কৈবল্য মোক্ষসিদ্ধি হয়, তখন বৈকল্পিক অনির্বচনীয় পদ গ্রহণ করার আবশ্যকতা কিছুই নাই।

(২)

মৌর্য সভ্যতায় পারস্য প্রভাব

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য বি. এ.

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্য সাম্রাজ্য সবিশেষ স্মরণীয়। প্রাচীন যুগে ইহার প্রভাব যেমনি অপ্রতিহত ছিল, তেমনি অপরিহার্যও ছিল। যে সময়ে ভারতবর্ষ খণ্ডরাজ্য সমূহে বিভক্ত হইয়া অনবরত কেবল আত্ম-কলহে ব্যাপৃত থাকিত, সেই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন ভাব ও চিন্তাধারার প্রসার করিতে আরম্ভ করিল। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও সম্রাট অশোক বিভিন্ন ধারায় ভারতের স্বীয় বৈশিষ্ট্যের বিস্তার করিলেন। শুধু স্ব স্ব প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদের একমাত্র ব্রত ছিল না, ভারতেতর জাতি সমূহের মধ্যেও তাঁহারা ইহা বিস্তার করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা বৈদেশিক প্রভাবের সম্মুখীন হইলেন এবং অল্প বিস্তর তাহা গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইলেন।

ইতিহাস পাঠে আমরা সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক্ সভ্যতার সংযোগে প্রায়শঃ আসিতে দেখিতে পাই ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি কি উক্ত সভ্যতার কোন প্রভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন ? ঐতিহাসিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, তিনি কোন ক্ষেত্রেই গ্রীক্ সভ্যতার অনুসরণ করেন নাই ; পরন্তু যে দেশের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, সেই ক্ষেত্রে তিনি পারস্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। ফলে দেখা যায় যে, তাঁহার প্রতিটি কার্য-প্রেরণায় ও প্রতিষ্ঠায় বহুল পরিমাণে পারস্য প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার পর হইতেই প্রাদেশিক শাসকবর্গকে "ক্ষহরত" (Satrap) বলা হইত, এবং ঐ নাম প্রায় চতুর্থ খ্রী° অ° পর্যন্ত ভারতে প্রচলিত ছিল।

তাঁহার পর সম্রাট্ বিন্দুসার এবং তৎপুত্র অশোকের সময়ও ঐ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু সম্রাট্ অশোকের যে সাধু প্রচেষ্টা ভারত ও ইহার সীমান্ত প্রদেশব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার সবিশেষ বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

প্রজারঞ্জন ও প্রজাপালনের জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি কখনো কখনো 'বাণী' বা উপদেশাদি প্রচার করিতেন ; ইহা যাহাতে সর্বসাধারণের গোচরীভূত হয়, সেইজন্য তিনি ইহাদিগকে কোথাও পর্বত গাত্রে, কোথাও পৃথক পিলার (Pillar) বসাইয়া ইহাদের গাত্রে লিখিয়া দিতেন। এই পিলারগুলি প্রস্তুত করিবার একটি নির্দিষ্ট প্রণালী ছিল। ইহাদের চূড়াগুলি গোলাকার (bell-shaped) ও গাত্রে বিভিন্ন পশুর মূর্তি অঙ্কিত থাকিত। এই প্রচেষ্টা সম্রাট্ অশোক পারস্য সভ্যতার অনুকরণে করিয়াছিলেন—ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যেহেতু প্রস্তরগাত্রে সুদীর্ঘ 'বাণী' লিপিবদ্ধ করা পারস্য সম্রাট দরায়ুসের (Darius ৫২১—৪৮৫ খ্রী° পূ°) সময়ই প্রচলিত ছিল।

সম্রাট্ অশোক কোন কোন স্থলে পারস্য ভাষাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহাবাজ ঘরিতে যে প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহাতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত লিপিতে 'লিপি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শব্দ পারস্যভাষাতেও একই অর্থে ব্যবহৃত হইত।

মৌর্য রাজকীয় উৎসবাদিতেও পারস্য প্রভাব অজ্ঞাত নহে। মৌর্য সম্রাটগণের মধ্যে 'চিকুর শোধন' (washing of hair) রীতির প্রচলন ছিল; এই রীতি প্রাচীন কাল হইতেই পারস্য সভ্যতায় লক্ষিত হয়।

মৌর্যদণ্ডনীতির মধ্যেও পারস্য প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। গুরুতর অপরাধের জন্য আসামীর 'মস্তক মুণ্ডন' নীতি পারস্য প্রভাবেরই পরিচায়ক।

ভাষার দিক্ দিয়া সম্রাট্ অশোক পারস্য প্রভাবের অধীন। যেহেতু তাঁহার কোন কোন 'বাণী' 'খারোষ্ঠি' ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; এই খারোষ্ঠি ভাষা মূলতঃ পারস্য সভ্যতার অবদান।

এইরূপে আমরা মৌর্য সভ্যতাকে বিশেষভাবেই পারস্য প্রভাবের নিকট ঋণী দেখিতে পাই। এই সভ্যতার অনেকাংশ যে বর্তমান ভারতও উপভোগ করিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।*

(৩)

ভারতীয় হস্তলিখিত পুঁথির গ্রন্থাগার

শ্রীযুগলকিশোর পাল, বি.এল্.

বাংলাদেশে ছাপাখানা হইবার পূর্বে এদেশে কি সংস্কৃত, কি বাংলা, কি পারসী, সকল গ্রন্থই হাতে লিখিয়া লওয়া হইত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র-ব্যবসায় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য গ্রন্থ লিখিয়া লইতেন, ছাত্রেরা নিজেদের পাঠ্যগ্রন্থ নিজে নিজে লিখিয়া লইত, চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশাস্ত্র হাতে লিখিয়া রাখিতেন। এইরূপ সকল প্রকার গ্রন্থেরই নকলের পর নকল হইয়া দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িত। শুধু বাংলায় কেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এইরূপ হস্তলিখিত পুঁথির প্রচলন ছিল। তখন সংস্কৃত শিক্ষাই ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া অসংখ্য সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথিই দেশের চারিদিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। সকল ভদ্রঘরে পুঁথি-সংগ্রহ থাকিত। বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত অনেক শিক্ষিত নারীও দেশীয় ভাষায় এই সমস্ত পুঁথি লেখার ব্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাহার পর দেশে যখন ছাপাখানা হইল, তখন ছাপার বহির আদর ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল, এবং হাতে লেখা

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ ডি. আর. ভাণ্ডারকার ও কুমারস্বামী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই মত অনেকাংশে খণ্ডন করিয়াছেন—সহঃ সম্পাদক।

পুথির আদর কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশে ছাপার বহির সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় ছাপার গ্রন্থ দেখিয়াই অধ্যাপনা চলিতে লাগিল এবং হাতে লেখা পুঁথির চলন ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া পড়িল। তখন হস্তলিখিত পুঁথিগুলির বেশীরভাগ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরেই জীর্ণ আলমারীতে বা বস্তাবন্দী থাকিয়া কীটদষ্ট হইয়া ভারতের অতীত জ্ঞানভাণ্ডাররাজি চিরতরে বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহ ভারতীয় সংস্কৃতি ও অতীত শিক্ষার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং দেশের স্থানে স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু দেশের জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ উক্ত পুঁথিগুলি রক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না। ফলে দাঁড়াইল, উক্ত জ্ঞানভাণ্ডাররাজি কীটদষ্ট অবস্থায় নষ্ট হইতে লাগিল এবং পরে অনেক বৈদেশিক পণ্ডিত এদেশে আসিয়া ভারতের বিজ্ঞানরাজির সন্ধানে উক্ত পুঁথি সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন এবং হাজার হাজার ভারতীয় পুঁথি স্ব স্ব দেশে চালান দিতে লাগিলেন। এদেশের পণ্ডিতকুলও সহজ দারিদ্র্যবশতঃ পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ অমূল্য গ্রন্থরাজি নামমাত্র অর্থের লোভে বৈদেশিকগণের হাতে তুলিয়া দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিলেন না। এইরূপে প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় গ্রন্থরাজির লুটতরাজ চলিতে লাগিল। বিশেষতঃ জার্মাণগণই অন্যান্য বৈদেশিকগণ অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা বেশী পুঁথি লইয়া গিয়াছেন। জার্মাণের বার্লিন সহরের যে গ্রন্থাগার আছে তাহাতে বর্তমানে সংস্কৃত সাহিত্যের পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০।

পরে ভারত সরকার পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের উপায় নির্ধারণের জন্য ১৯১১ খ্রী° অব্দে সরকার কর্তৃক সিমলা নগরীতে প্রাচ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর একটী সভা আহূত হয় এবং তদুদ্দেশ্যে ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিষদ্ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সময়মত কার্যে পরিণত না হইলেও ইতিপূর্বে যে সমস্ত শিক্ষায়তন উক্ত কার্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারা খুব উৎসাহের সহিত এই ভারতীয় পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৯।১০টী শিক্ষায়তন আছে, যেখানে সহস্র সহস্র ভারতীয় পুঁথি সংগৃহীত আছে। কলিকাতায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ও পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ এবিষয়ে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে কলিকাতার রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংগৃহীত পুঁথিসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অনুমিত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে সোসাইটির কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের দরুণ প্রায় ৫০,০০০ হাজার পুঁথি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ভারতীয় শিক্ষা জগতে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা শিক্ষাব্রতী মাত্রই অনুভব করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষতি ভবিষ্যতে যাহাতে আর না হয়, গবর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওরিয়েন্টাল কন্‌ফারেন্সের লাহোর অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে ভারতে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি-সংগ্রহ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা

প্রদান করেন। তিনি কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পান। তিনি তাঁহার অভিভাষণে কোন গ্রন্থাগারে কিরূপ পুঁথি বর্তমান আছে, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপীয়গণ এদেশ হইতে হাজার হাজার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এবিষয়ে জার্মাণগণ যে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন, তাহাও বলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুঁথিসংগ্রহও যথেষ্ট। ইহাতে সংস্কৃত, পারস্য ও আরবী পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৩৫০০০ হইবে এবং পুঁথির সংখ্যানুপাতের তুলনায় বার্লিন লাইব্রেরীর পরেই ইহার স্থান। এই গ্রন্থাগারে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে তাহার মধ্যে টিপুসুলতানের হস্তলিখিত 'কোরাণ' গ্রন্থ—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার গ্রন্থগুলির মধ্যে হস্তলিখিত একটী পালিগ্রন্থ আছে, ইহা সুবর্ণের পাতে ছুরিকা দ্বারা খোদিত। ইহার পাতার সংখ্যা—১০০।

নিম্নে বৈদেশিক গ্রন্থাগারে ভারতীয় পুঁথির একটী মোটামুটি সংখ্যা প্রদত্ত হইল :—

বার্লিন গ্রন্থাগার—৪০,০০০

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী—৩৫,০০০

অক্সফোর্ড লাইব্রেরী—১৬,০০০

প্যারিস লাইব্রেরী—১২,০০০

ভারতের যে সমস্ত লাইব্রেরীতে ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আছে এবং কোন্ লাইব্রেরীতে কত পুঁথি আছে তাহাদের মোটামুটি একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।*

(১) আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—২০,০০০

(২) এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী, কলিকাতা—২৫০০০০,—তাহার মধ্যে ১৪০,০০ সংস্কৃত ও ৬০০০ পারসীক ও আরবী, বাকী অন্যান্য ভাষায় লিখিত।

(৩) রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী লাইব্রেরী, বোম্বে—১,০০,০০০

(৪) ভাণ্ডারকার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্স্টিটিউট্ লাইব্রেরী, পুণা—২৫,০০০

(৫) কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—৫০,০০০

(৬) কাশী সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী—১০,০০০

(৭) বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়—৫০,০০০

(৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—৬০,০০০

(৯) ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, কলিকাতা—২,৫০,০০০

---

* এই তালিকাটী বোম্বে হইতে প্রকাশিত R. G. Kanade কৃত 'Library Hand Book and Index' (1931) হইতে সংগৃহীত।

(১১) মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—১৯,৬০০
(১২) ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ—২৫,০০০
(১৩) পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—৬০০০
(১৪) পাঞ্জাব লাইব্রেরী—৬০,০০০
(১৫) রেঙ্গুন বার্নার্ড সাধারণ লাইব্রেরী—৫০০০
(১৬) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী—৪০০০
(১৭) তাঞ্জোর সরস্বতী মহল লাইব্রেরী—২৫,০০০
(১৮) এড্যার থিওজফিক্যাল লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ—১৬,০০০
(১৯) বিশ্বভারতী লাইব্রেরী, শান্তিনিকেতন—১৩,০০০

উক্ত তালিকাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা দেওয়া নাই। ইহাতেও বাংলা ও সংস্কৃত অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং কোন কোন অপ্রকাশিত পুস্তক ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই পুঁথি সংগ্রহকার্যে ব্রতী হইয়া অনেক প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অনেক অপ্রকাশিত বাংলা পুঁথি প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। কলিকাতা সংস্কৃত পরিষদ্‌ও পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তক তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিরও অনেকে এই পুঁথি সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপারে বরোদারাজ্য যেমন বিশেষ অগ্রণী হইয়াছে, এই বিষয়েও উক্ত রাজ্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে প্রায় ১৩,০০০ পুঁথি সংগৃহীত আছে। ইহা ছাড়া মহীশূর, নেপাল, জয়পুর, যোধপুর, কাশ্মীর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সমূহেও বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। দেশে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণামন্দির বা শিক্ষায়তন আছে, তাহারা সকলে যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে উক্ত হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একটী একটী করিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ভারতের ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত বিষয় সাধারণে প্রকাশিত হইতে পারে।

আমাদের কথা

ভারতের বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া বিশ্বভারতীকে যথাসাধ্য অর্থদানের জন্য একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কার্যাবলী যাহাতে স্থায়ী ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্যই এই অর্থ-সংগ্রহ-প্রচেষ্টা। কিন্তু তদ্ব্যতীত এই কমিটি অন্যান্য উদ্দেশ্যেও এই অর্থ ব্যয় করিবেন। এই চেষ্টা ফলবতী হউক ইহাই আমাদের কামনা।

এ স্থলে একটি বিষয়ের আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। কেহ কেহ বিশ্বভারতীকে ভারতের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন; অনেকে আবার কবিগুরু যে আদর্শ লইয়া বিশ্বভারতী সূচনা করিয়াছিলেন সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। এই প্রকার মতদ্বৈধ থাকায় এই কমিটি বা বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ যদি ইহার ভবিষ্যৎ কার্যপন্থার একটি বিবৃতি প্রকাশিত করেন তাহা হইলে এই সমস্ত সন্দেহের নিরাকরণ হয় এবং উৎসাহশীল ব্যক্তিগণ এই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারেন। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছিলাম যে, বিশ্বভারতীকে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের মিলনভূমি করা উচিত; ইহাকে বর্তমানের একটি অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিলে বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করা হইবে। এই সঙ্গে কবিগুরুর যে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য-বিষয়ক একটী বিবৃতি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারও পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন।

*   *   *   *   *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়-বিষয়ক শিক্ষাকে আরও বিস্তারিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহার জন্য একটী পৃথক বিভাগের (Faculty) সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। আরও বহুপ্রকার শিক্ষা আছে, ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই যাহাদের পঠনাদির কোন ব্যবস্থা নাই—যেমন ধর্মতত্ত্ব-শিক্ষা, সামরিক-শিক্ষা, কৃষি-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, সমাজ-সেবা-শিক্ষা ইত্যাদি। দেশবাসীদের মধ্যে সর্বতোমুখী শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে এইসব বিষয়ের জন্যও পৃথক বিভাগের সৃষ্টি করা উচিত।

ভারতী মহাবিদ্যালয় নামক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছুকাল পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং যাহার কর্তৃপক্ষ ইহাকে প্রাচীন ভারতের গুরুকুলের আদর্শানুযায়ী বর্তমানের একটী আদর্শ মহাবিদ্যালয়রূপে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহার পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রকার সর্বাঙ্গীন শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা আছে এবং উহার কার্যও আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এই সব প্রচেষ্টার শুভ কামনা করি।

*   *   *   *   *

কলিকাতা কর্পোরেশন ইহার সীমানার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি শিল্পবিদ্যালয়কে সাহায্যদান করেন। বহুপ্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে, কিন্তু মাত্র কয়েকটি শিল্পই অল্পবিস্তররূপে সব বিদ্যালয়েই শিক্ষাদান করা হয়। এই সব শিক্ষারও কোন একটি সাধারণ প্রণালী (Standard) নাই বা পরীক্ষা নাই। বর্তমানে ভারতী মহাবিদ্যালয় ও বিড়লা-প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয় এই বিষয়ের জন্য সচেষ্ট আছেন ও শীঘ্রই একটি সভা আহূত হইবে। আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি।

পুস্তক সমালোচনা

কদলী রাজ্য—শ্রীরাজমোহন নাথ বি, ই প্রণীত। গৌহাটীর Trio Store, (Book Sellers & Publishers) কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৪৬। গ্রন্থকার বর্তমান প্রবন্ধটী ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটী সহরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনের সমাজ-বিজ্ঞান শাখায় পাঠ করেন। পরে উক্ত প্রবন্ধটী কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া লেখক বর্তমান পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশে প্রচলিত গীতিকাব্য গোপী চাঁদের সন্ন্যাস, মীনচেতন, ময়নামতীর গান, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতিতে বর্ণিত কদলীরাজ্যের ইতিহাস ও সেই সঙ্গে তখনকার বৌদ্ধধর্মের অবস্থা ও নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কদলী রাজ্যের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে যে বিভিন্ন মতামত আছে, তাহা তিনি পুস্তিকাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কদলীরাজ্য মানে স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ। ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কদলীরাজ্য বলিতে কামরূপ, মণিপুর ব্রহ্মদেশ বলিয়া মনে করেন। পুস্তিকখানিতে লেখকের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্যের পাঠকগণকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

'The Non-Hindu Indians and Indian Unity.'—পুস্তিকাখানি শ্রীসমহিলা শ্রীমতী সাবিত্রীদেবী প্রণীত ও হিন্দুমিশন ৩১বি, হরিশ চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে বিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত।

লেখিকা সেরিঙ্গাপটমের নিকট টিপু সুলতানের সমাধি-মূর্তি দর্শনে বর্তমান ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যার বিষয় যে ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন তাহাই ধারাবাহিকরূপে এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু বা মুসলমান নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও ধর্মের গোঁড়ামির বিষয় ভুলিয়া যদি প্রথমে নিজেদিগকে ভারতীয় বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচিত করিতে পারে তবেই ভারতে এক-জাতীয়তা সার্থক হইবে ও আমরা পরাধীনতার পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিব। মুসলমানদের 'পাকিস্থান' এবং হিন্দুদের 'অখণ্ড হিন্দুরাজত্ব' স্থাপনের কল্পনার মধ্যে ভারতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার আশা করা ভুল। পরাধীন অবস্থায় বিদেশীয়দের কাছ হইতে ঐ ঐক্যের পথে সহায়তা লাভের আশাও নিরর্থক। লেখিকা ভারতীয় সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বিদেশীয় বহু নজির দেখাইয়াছেন; ইহাতে লেখিকার ঐতিহাসিক গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তিকাখানির ভাষা ও ভঙ্গী চমৎকার। যেদিন ভারতবাসী ক্ষুদ্র ভেদ-নীতি ভুলিয়া দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় বদ্ধপরিকর হইবে, সেইদিনই লেখিকার লেখার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

Indian Ephemeris, 1942 A. D.—শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম-এ প্রণীত ও ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

এফিমেরিসে গ্রহদিগের প্রাত্যহিক স্ফুটাবস্থান ও একদিন পর পর শর, ক্রান্তি প্রভৃতি জ্যোতিষীদের আবশ্যকীয় উপকরণ সমূহ প্রদত্ত হয়। বিলাত হইতে র‍্যাফেল সাহেব যে এফিমেরিস প্রকাশিত করেন জ্যোতিষীদের নিকট তাহাই বিশেষভাবে পরিচিত। শ্রীযুত নির্মল বাবুর ইণ্ডিয়ান্ এফিমেরিসে যে গ্রহাবস্থান প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিরয়ণ মতে ভারতীয় সংজ্ঞানুসারে গণিত হইয়াছে, কিন্তু গণনাফল ও গ্রহাবস্থান সম্পূর্ণ দৃক্‌গণিতৈক্য হয়। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হওয়াতে ভারতীয় জ্যোতিষীদের বহুদিনের এক অভাব পূর্ণ হইল। বিলাতী এফিমেরিসে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা ব্যতীত ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, ভারতের বহু স্থানের সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, গ্রহদিগের রাশি সঞ্চার Aspects and Phenomena, স্থির তারকাদিগের অবস্থান, গ্রহদিগের যাম্যোত্তর বৃত্তলঙ্ঘনকাল, গ্রহদিগের বক্রী, মার্গী, প্রভৃতি বহুবিষয়ের সন্নিবেশ হওয়াতে শিক্ষিত জ্যোতির্বিদদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকার যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন ও সিদ্ধান্তজ্যোতিষশাস্ত্রে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এরূপ গ্রন্থের প্রচার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ

নূতন গ্রন্থসংবাদ

(১) Early Monastic Buddhism, Vol. I (Calcutta Oriental Series, no 30) By Dr. Nalinaksha Dutt, Calcutta 1941.

(২) Sikh Ceremonies : By Sirdar Sir Jogendra Singh. Published by International Book House, Bombay, 1941

(৩) Practice of Brahmacharya—By Swami Sivananda, Calcutta.

(৪) উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন অফিস। কলিকাতা।

(৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, কলিকাতা।

(৬) পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব (৩য় খণ্ড)—প্রাচীন ভারত, কলিকাতা।

(৭) মৃত্যুর পরে ও পুনর্জন্মবাদ—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত প্রণীত, কলিকাতা।

(৮) সচিত্র মাতৃমঙ্গল—জন্মবিজ্ঞান ও সুসন্তান লাভ—আবুল হাসানাৎ, প্রণীত কলিকাতা।

(৯) দানবীর কার্নেগী—শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত, কলিকাতা।

সাময়িক সাহিত্য—কার্তিক, ১৩৪৮

ধর্ম ও দর্শন

উদ্বোধন—শাক্ত-পথ-পরিচয়—অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র তর্কাচার্য।

" —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

ব্রহ্মবিদ্যা—ত্যাগধর্ম—শ্রীতুলসীদাস কর।

" —সাংখ্য পরিচয়—শ্রীবিজয়বসন্ত ভট্টাচার্য।

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

" —রচনা-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ।

ইতিহাস

বঙ্গশ্রী—জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস—ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

জীবনী

বঙ্গশ্রী—গুরু নানক সাহেব—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত এম. এ।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—বাঙ্গালার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—শ্রীকালীচরণ ঘোষ।

উদ্বোধন—ভারতে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির এক অধ্যায়—রেজাউল করীম।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৮শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ভোট-বীর কেসর-এর কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পুরাতন পত্রিকা

সাহিত্য (১৩২৭)

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ বি. এ. সংকলিত

বৈশাখ—উৎকলে বৌদ্ধধর্ম—শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়। অনেকেরই বিশ্বাস উড়িষ্যায় শ্রীক্ষেত্র এককালে বৌদ্ধগণের লীলাভূমি ছিল। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে উহা নষ্ট হইলেও উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই। লেখক সেই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে উড়িষ্যায় আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে এখনও শূন্যবাদ ও সহজবাদ প্রভুত পরিমাণে প্রচলিত আছে।

ভাদ্র—উৎকলে সূর্যপূজা—শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায়। উড়িষ্যায় অনেক প্রাচীন জাতি এখনও সূর্যোপাসক। এই প্রবন্ধ তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা।

সাময়িক সংবাদ

ভারতের লোকগণনার ফলাফল—সম্প্রতি ১৯৪১ সালে ভারতের লোকগণনার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৯ লক্ষ ৮০ হাজার। এবারেও প্রমাণিত হইয়াছে বাংলায় শিক্ষিত সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক।

নূতন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার—কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি মহারাষ্ট্র-ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—আগামী বড় দিনের ছুটিতে কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন হইবে। এবার সম্মেলনে একদিন রবীন্দ্র-স্মৃতি দিবস অনুষ্ঠান করিয়া রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে সভাপতি করিয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

गृत्समदस्य सूक्तानि चत्वारि वसिष्ठस्य वाकूपारश्च वैरूपश्च नृगस्य वा साम ॥ ४ ॥

পুরোজিতী বো অন্ধসঃ এই ঋকে সাম ষট্‌ক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বামদেবের পুত্র নকুলের প্রেঙ্খসংজ্ঞক। তৃতীয়টীর নাম মহাকার্ত্ত যশ। অথবা ইহা কার্ত্তবেশ। চতুর্থটীর নাম ঔর্দ্ধ, পঞ্চমটী শ্যাবাশ্ব ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। ৬টী অন্ধিগু নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

অয়ং পূষা এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ক্রৌঞ্চ নামে খ্যাত অথবা সোমসাম বলিয়া কথিত।

সুতাসো মধুমত্তমা এই ঋকে আটটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটীর দেবতা ত্বষ্টা। তৃতীয় সাম বসিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট। চতুর্থ সামের দেবতা ত্বষ্টা। পঞ্চম সাম বাসিষ্ঠ ষষ্ঠ ও সপ্তম সামের দেবতা ত্বষ্টা এবং অন্তিম সাম বাসিষ্ঠ।

সোমঃ পবস্ব ইন্দবঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ক্রৌঞ্চ সাম।

অভী নো বাজসা৹তম এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটী সোম সাম। চতুর্থ সাম ক্রৌঞ্চ। পঞ্চম সোম সাম।

অভী নবন্তে অদ্রুহঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আঙ্গিরস অথবা প্রৈয়মেধ।

আহর্যতায় ধৃষ্ণবে এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা গৃৎসমদ অথবা বসিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট।

পরিত্যং হর্য্যতং হবিম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অকূপার অর্থাৎ কশ্যপ কর্তৃক দৃষ্ট। প্রস্বন্বানায়ান্ধসঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বৈরূপ অথবা ইহা নৃগ কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ড

कावं वाजसनी द्वे कावं वैनयोः पूर्वं वाजजिती द्वे कावं चैवाङ्गिरसानि त्रीण्युद्वंशीयां भार्गवं प्रथमम् सामराज मुत्तमम् सामराजानि चैव त्रीणि सिमानां वेषां निषेध उत्तमं वासिष्ठं लोशे द्वे प्रवच्च भार्गवं विरूपस्य च तन्त्रं यामं पञ्चमं दासशिरसी द्वे दाससरसे वा यामानि त्रीणि मरुतान्धेन्विन्द्रस्यापामीवनी द्वे वायोर्वाभिक्रन्द उत्तरं यामानि चैव त्रीणि मरुतां चैव धेन्वञ्जतो व्यञ्जतः समञ्जत इति काक्षीवतां त्रीणि सामानि शार्गाणि वादित्यस्यार्कपुष्पे द्वे ॥ ५ ॥

অভিপ্রিয়াণি পবতে চনোহিতঃ এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার প্রথমটী কাব অর্থাৎ ইহার দেবতা প্রজাপতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাম বাজসনী অথবা ইহাদের প্রথমটি অর্থাৎ দ্বিতীয় সাম কাব। চতুর্থ ও পঞ্চম সাম বাজজিতী। অন্তিম সাম কাব।

অচোদসোনোধন্বন্তিন্দবঃ এই ঋকে সামষট্ক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটি আঙ্গিরস। অথবা ইহাদের প্রথমটী উদ্গ ভার্গব এবং অন্তিমটী সামরাজ। পরের তিনটী সামের নামও সামরাজ। অথবা এই তিনটীর প্রথমও শেষটী সিমানাং নিষেধ।

এষ প্রকোশে মধুমান্ অচিক্রদৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বাসিষ্ঠ অর্থাৎ বসিষ্ঠ কর্তৃক দৃষ্ট।

প্রোঅ্যাসীদিন্দুরিন্দ্রস্য নিষ্কৃতম্ এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটীর নাম লোশ। তৃতীয়টী প্রবদ্ভার্গব। চতুর্থ টী বিরূপের তন্ত্র এবং পঞ্চমটী যাম সাম।

ধর্ত্তাদিবঃ পব তে কৃত্ব্যোরসঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম দাস-শিরা বা দাসসরস।

বৃষা মতীনাং পবতে বিচক্ষণঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা যম অর্থাৎ পার্থিব অগ্নি। ত্রিরস্মৈ সপ্ত বেনবো দুদুহ্রিরে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মরুদ্গণের ধেনু। ইন্দ্রায় সোম সুযুতঃ পরিস্রব এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের অপামীবনী নামে খ্যাত। অথবা শেষ সামটী বায়ুর অভিক্রন্দ।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষা হরিঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা যম। প্রদেবমচ্ছা মধুমন্ত ইন্দবঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা মরুদ্গণের ধেনু।

অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা কক্ষীবান্ কর্তৃক দৃষ্ট। ইহাদের প্রথমটী অঞ্জতের, দ্বিতীয়টী ব্যঞ্জতের এবং তৃতীয়টী সমঞ্জতের সাম। অথবা ইহারা ভৃগ কর্তৃক দৃষ্ট।

পবিত্রন্তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আদিত্যের অর্ক পুষ্প নামে খ্যাত। ইহারা অন্নরসের সমৃদ্ধিকারক।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের পঞ্চম খণ্ড

वसिष्ठस्य पदे द्वे वसिष्ठस्यानुपदे द्वे अपिवा पदश्चानुपदश्च पदश्चैवानु-पदश्चैव पौष्कलं पञ्चम मैपिराणि पञ्च शौक्तानि पञ्च कार्णश्रवसानि त्रीणि वाचःसामनी द्वे इन्द्रसामनी द्वे मरुतां मंह्रौ वसिष्ठस्य वा प्राजापत्ये द्वे वैश्वदेवे

ऐन्द्रस्य सुज्ञाने द्वे द्योते द्वे ज्यौतिषे वा प्रजापते रातीषादीये द्वे सोमसामानि चत्वारि सोमस्य यशांसि त्रीणि भारद्वाजं च ॥ ६ ॥

ইন্দ্র মচ্ছা সুতা ইমে এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী বসিষ্ঠের পদ সংজ্ঞক। পরের দুইটী বসিষ্ঠের অনুবাদ। অথবা এই চারিটী সামের প্রথমটী পদসংজ্ঞ, দ্বিতীয়টী অনুপদ সংজ্ঞ, তৃতীয়টী পদসংজ্ঞ এবং চতুর্থ টী অনুপদ সংজ্ঞক। পঞ্চমটী পৌষ্কল অর্থাৎ সমৃদ্ধিসাধক।

প্রধন্বাসোম জাগৃবিঃ এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ঐষির। সখায় আ নিষীদত এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা শৌক্ত অর্থাৎ শুক্তি নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

তং বঃ সখায়ো মদায় এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা কর্ণশ্রবা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

প্রাণা শিশুর্মহীনাম্ এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় বাচঃ সাম এবং তৃতীয়ও চতুর্থ ইন্দ্র সাম এবং অন্তিমটী মরুদ্গণের অথবা বশিষ্ঠের প্রেজ্ঞ।

পবস্ব দেববীতয়ে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা প্রাজাপত্য অথবা বৈশ্বদেব।

সোমঃ পুনান ঊর্মিণা এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী ইন্দ্রের সুজ্ঞানসংজ্ঞক। পরের দুইটী দ্যোত অথবা জ্যোতিষ। শেষের দুইটী প্রজাপতির অতিষাদীয় অর্থাৎ আয়ুর্বৃদ্ধিকর।

প্রপুপানায় বেধসে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। গোমন্ন ইন্দো অশ্ব এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋক্ ত্রয়াশ্রিত চারিটী সাম সোম সাম।

পবতে হর্য্যতো হরিঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। এই তিনটীই সোমের যশোনামক যেহেতু ইহাতে যশশব্দ বর্তমান রহিয়াছে।

পরিকোশং মধুশ্চুতম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজ কর্তৃক দৃষ্ট।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ড

वासिष्ठश्च सफे च वासिष्ठं चैव सफं चैवैषिराणि चत्वारि कार्णश्रवसानि त्रीणि वाचः सामानि त्रीणि कौल्मलबर्हिषे द्वे शङ्कु तृतीयम् सीदन्तीयं वा कौल्मलबर्हिषाणि चैव त्रीणि भरद्वाजस्य लोभनी द्वे प्रजापतेर्वा दीर्घं सोमसामानि

त्रीणि शैतोष्ण्याणि चत्वारि शीतोष्णानि वा गायत्रपार्श्वश्च सन्तनि च सोमसामानि चैव त्रीणि ॥ ७ ॥

পবস্ব মধুমত্তম এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটী বাসিষ্ঠ এবং এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী সফসংজ্ঞক। চতুর্থ টী বাসিষ্ঠ এবং পঞ্চমটী সফ।

অভিদ্যুম্নং বৃহদ্যশঃ এই ঋকে সামচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ঐষির সংজ্ঞক।

আসোতো পরিষিঞ্চত এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম তিনটী কার্ণশ্রবা নামক। কর্ণশ্রবা অঙ্গিরসের ইই নামান্তর। পরের তিনটী বাচঃসাম।

এতমুত্যং মদশ্চ্যুতম এই ঋকে ছয়টী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী কৌল্মল বর্হিনামক। তৃতীয সামের নাম শঙ্কু। অথবা ইহার নাম সীদন্তীয়। শেষের তিনটীর নামও কৌল্মলবর্হিঃ।

সমুন্বেযো বসুনাম্ এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথম দুইটী ভরদ্বাজের লোমসংজ্ঞক। অথবা প্রজাপতির দীর্ঘ। শেষের তিনটি সোমসাম।

ত্বংহ্যঙ্গ দৈব্য এই ঋকে সাম চতুষ্টয় উৎপন্ন হইযাছে। ইহাবা শৈতোষ্ণ বা শীতোষ্ণ নামে খ্যাত।

ত্রয়স্থ ধাবযা স্থত এই ঋকে সাম পঞ্চক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটীর নাম গায়ত্র পার্শ্ব। দ্বিতীয়টীব নাম সন্তনি অর্থাৎ যজ্ঞের সংযোজক। পরেব তিনটী সোমসাম।

ইতি আর্ষেগ ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের সপ্তম খণ্ড

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের পঞ্চম অধ্যায

ইতি আর্ষেয ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের অর্ধ

দ্রষ্টব্য—এই পঞ্চাধ্যায়ে বেদসামগত সামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্ঠাধ্যায়ে ছন্দঃসামানুযায়ী সামের নাম কথিত হইবে।

अष्टौ वैरूपाण्यश्वश्च वैरूपम् हस्वा च बृहदोपशा पञ्चनिधनं च षण्निधनं च चाष्टानिधनं च द्वादशनिधनं पुष्पश्चान्तरिक्षे द्वे अरिष्टे द्वे अहरीते द्वे ॥ ८ ॥

যদ্দ্যাব ইন্দ্র তে শতম্ এই ঋকে সামাষ্টক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই বৈরূপ সংজ্ঞক। পদ ও নিধনভেদে ইহাদের বিশিষ্ট নাম বলা হইতেছে। ইহাদের প্রথমটীর নাম মঞ্জো বৈরূপ। দ্বিতীয়টী বৃহদ্ ওপসা নামক। তৃতীয়টী পঞ্চনিকা, চতুর্থ টী যন্নিকা এবং পঞ্চমটী পঞ্চ নিধন। ষষ্ঠটী অষ্ট নিধন এবং সপ্তমটী দ্বাদশ নিধন। অষ্টমটীর নাম পুষ্প।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | পৌষ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ৩য় সংখ্যা

শব্দাদিপ্রমাণ*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধগণ প্রমাণাবলীর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি স্বীকার করিতেন, যদিও এই দুইটি সম্বন্ধেও নৈয়ায়িকদের সহিত তাঁহাদের মতানৈক্য ছিল যথেষ্ট। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে বৌদ্ধগণ আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তাঁহারা বলিতেন প্রত্যক্ষ যে সম্পূর্ণ কল্পনাস্পর্শশূন্য হওয়া চাই তাহা নৈয়ায়িকদের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় না। নৈয়ায়িকদের অনুমান পঞ্চপদী, কিন্তু বৌদ্ধগণ বলিতেন যে এক হেতুপদই অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট (যদি অবশ্য সেই হেতুপদটি পূর্বালোচিত "ত্রিলক্ষণ" যুক্ত হয়)। কিন্তু শব্দাদি অপর প্রমাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মত কি? বৌদ্ধগণ সেগুলি অস্বীকার করিয়াছেন; শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি বৌদ্ধমতে গ্রাহ্য প্রমাণ নহে। শান্তরক্ষিতের পূর্বে কিন্তু এমন সময় ছিল যখন বৌদ্ধগণ আগমবাক্য প্রমাণরূপে স্বীকার করিতেন, প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সুতরাং প্রাচীন বৌদ্ধগণ যে শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বোধ হয় দিগ্নাগের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াই শান্তরক্ষিতের যুগে বৌদ্ধগণ শব্দপ্রমাণ অস্বীকার করিতে আরম্ভ করেন। শান্তরক্ষিতের যুগেও যে সকল বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধই শব্দপ্রমাণ অস্বীকার করিতেন তাহাও নহে; কারণ ত্রিংশিকাভাষ্যের আলোচনায় দেখান হইয়াছে যে শান্তরক্ষিতের আনুমানিক সমসাময়িক স্থিরমতি প্রমাণরূপে আগমবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্থিরমতি ছিলেন বসুবন্ধুর ভাষ্যকার, এবং শান্তরক্ষিত হইলেন একপক্ষে দিগ্নাগেরই বার্তিককার; সুতরাং ইহা আদৌ অসম্ভব নহে যে শান্তরক্ষিত দিগ্নাগের ব্যক্তিগত মতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন, যাহা স্থিরমতির পক্ষে সর্বতোভাবে গ্রহণ করার কোন কারণ ছিল না। এই সকল কারণে মনে হয় যে শব্দপ্রমাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধদিগের মধ্যেই এই যে মতভেদ তাহার হেতু দিগ্নাগের প্রবর্তিত নব্যন্যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্থিরমতির মতের সহিত প্রাচীন বৌদ্ধ মতের সংযোগ ও সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু শান্তরক্ষিতের মতের সহিত প্রাচীন মতের কোন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ শান্তরক্ষিত নিজে কোথাও নূতন মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই, ন্যায় সম্বন্ধে দিগ্নাগের মত প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।—শব্দাদির আলোচনায় শান্তরক্ষিত বিতণ্ডামূলক বহু কুটতর্কের আশ্রয় লইয়াছেন; অনুবর্তী আলোচনায় সেগুলি যথাসম্ভব পরিহার করা হইবে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পৃথক্ অপর যে-সমস্ত প্রমাণ বৌদ্ধমতে অগ্রাহ্য কমলশীল প্রথমেই সেগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন:—শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, যুক্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও প্রতিভা।

শাব্দজ্ঞান সম্বন্ধে শবরস্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা এই:—শব্দজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থজ্ঞানং শাব্দমিতি; অর্থাৎ, শব্দের স্বলক্ষণ গৃহীত হওয়ার ফলে পরোক্ষ বিষয়ে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয়

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 13.

তাহাই হইল শাব্দজ্ঞান। শব্দপ্রমাণ হইল দ্বিবিধ, অপৌরুষেয় শব্দজনিত এবং প্রত্যয়ী পুরুষের বাক্যজনিত। শব্দপ্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে পৃথক, কারণ শব্দপ্রমাণের বিষয় হইল পরোক্ষ; শব্দপ্রমাণ যে অনুমান তাহাও নহে, কারণ ইহা (পূর্বালোচিত) ত্রিলক্ষণ যুক্ত নহে।

এখন জিজ্ঞাস্য, ত্রিলক্ষণযুক্ত না হওয়ায় শব্দ না হয় অনুমান হইতে বিভিন্ন হইল, কিন্তু তাই বলিয়াই কি শব্দ একটি প্রমাণরূপে পরিগণিত হইবে? ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী (মীমাংসক) বলিতেছেন :—

অগ্নিহোত্রাদিবচনাদকম্পজ্ঞানজন্মতঃ।
তৎপ্রমাণমপ্যস্য নিরাকর্তুং ন পার্যতে ॥ ১৪৯৯ ॥

অর্থাৎ, অগ্নিহোত্রাদি বিষয়ক বচন হইতে যেহেতু অকম্প জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই হেতু এই সকল বচন যে প্রমাণস্বরূপ তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।—কারিকাটির বিশদার্থ কমলশীল কর্তৃক উদ্ধৃত শবরস্বামীর এই কথা হইতেই বুঝা যাইবে :—"স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যজন করিবে—এই প্রকার শ্রুতিবাক্য শ্রবণ করার পর স্বর্গ আছে কি নাই সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; এবং স্বর্গ যে আছে এই জ্ঞান একবার নিশ্চিত হইয়া যাইবার পর আবার কখনও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। যে-প্রত্যয় উৎপন্ন হওয়ার পর "নৈতদেবম্" এই প্রকারের বিপক্ষ প্রত্যয়ের দ্বারা পুনরায় বিধ্বস্ত হইয়া যায় তাহাই হইল মিথ্যা প্রত্যয়; কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতিবচনের কোন বিপর্যয় দেখিতে পাওয়া যায় না, দেশ কাল পাত্র বিভিন্ন হইলেও; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শ্রুতিবচন সত্য। লৌকিক বচনও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যদি তাহা প্রত্যয়ী পুরুষের বচন হয়, এবং বচনটির বিষয় হয় ইন্দ্রিয়লব্ধ। অপ্রত্যয়ী পুরুষের বচন অথবা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সম্বন্ধীয় বচন কিন্তু সত্য নহে, কারণ এ-ক্ষেত্রে জ্ঞানটি হইল কেবলমাত্র মানবীয় বুদ্ধি প্রসূত, অথচ পুরুষ মাত্রেই যে প্রমাজ্ঞানের অধিকারী তাহা নহে।"

শবরস্বামীর এই প্রকারের যুক্তি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদের পক্ষ হইতে খণ্ডন করা যে শান্তরক্ষিতের পক্ষে কঠিন হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য; খণ্ডনাংশে প্রধানতঃ আছে আমাদের পূর্বপরিচিত বিবিধ যুক্তিরই পুনরুল্লেখ, সুতরাং সে-অংশের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে বেদ অপেক্ষা বেদের ব্যাখ্যার প্রতিই বৌদ্ধদিগের বিদ্বেষ ছিল বেশী। মীমাংসক (১৫০৪ সংখ্যক কারিকায়) বলিতেছেন যে শ্রুতিবাক্য অনর্থক হইতে পারে না, তাহার কোন না কোন অর্থ আছেই; তদুত্তরে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন যে শ্রুতিবাক্য হইতে যে সহজ প্রতীতি জন্মে তাহা মীমাংসক গ্রহণ করেন না, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যথারুচি বেদের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন (স্বতন্ত্রো হি পুমান্ দৃষ্টো ব্যাচক্ষাণোঽর্থমিচ্ছয়া)। শ্রুতিবাক্যের যাহা প্রকৃতিগত অর্থ তাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়া উচিত, দীপ যেমন কোন সঙ্কেতের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে বেদের ব্যাখ্যা করিতে হইলে কতকগুলি সঙ্কেত মানিয়া লইতেই হয় তাহা হইলেও নিষ্কৃতি নাই, কারণ কোন্ সম্প্রদায়ের সঙ্কেত গ্রহণ-যোগ্য তাহা কে বলিয়া দিবে? মীমাংসক এক প্রকারের সঙ্কেত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিরাকার করিয়াছেন আর এক প্রকারের। সুতরাং :—

অতোঽর্থপ্রত্যয়াযোগাত্তস্য নিঃকম্পতা কুতঃ।
স তু সাময়িকো যুক্তঃ পুংবাগ্‌ভূতায় ভিদ্যতে ॥ ১৫০৮ ॥

ন্যায়জ্ঞৈর্ন তয়োঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রতিপদ্যতে।
শ্রোত্রিয়াণাং স্বকম্পোঽয়মজ্ঞাতন্যায়বর্ত্মনাম্॥ ১৫০৯॥

অর্থাৎ বেদের প্রকৃত অর্থ যে কি তাহাই যখন বুঝিবার উপায় নাই তখন সেই বেদের অর্থ যে নিষ্কম্প তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? বেদার্থও লোকে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী কল্পনা করিয়া লয় মাত্র (সাময়িক), সুতরাং মনুষ্যবাক্য হইতে বেদবাক্যের কোন প্রভেদ নাই; ন্যায়জ্ঞ ব্যক্তি এতদ্দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদই স্বীকার করেন না; শ্রোত্রিয়গণ যে যে বেদবাক্যকে অকম্প বলিয়া মনে করেন তাহার কারণ শ্রোত্রিয়গণ ন্যায় সম্বন্ধে অজ্ঞ।—প্রত্যয়ী ব্যক্তির কথাও প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় কি না তাহার বিচারে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন এরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না (আপ্তানঙ্গীকৃতেরেব ইত্যাদি)।

বৈদিক বা লৌকিক শব্দ যে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না তাহা এইরূপে নিশ্চিত হইল। পূর্বপক্ষী এখন আপত্তি করিতেছেন, সত্য নির্ধারণে শব্দ না হয় সম্যক্ প্রমাণ না হইল, কিন্তু বক্তার অভিপ্রায় নির্ণয়েও কি শব্দ প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না? শান্তরক্ষিত দেখাইয়াছেন যে শব্দের এই পরিমিত প্রামাণ্য স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

উপমানের (analogy) বিচারে শান্তরক্ষিত সবিস্তারে মীমাংসক ও নৈয়ায়িকদিগের মতের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যকার কমলশীল আলোচনার প্রারম্ভেই উপমান কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেই এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক মতের সাদৃশ্য ও বৈষম্য বুঝিতে পারা যায়:—"গবয় কিরূপ ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে যদি কেহ বলে যেরূপ গো সেইরূপ গবয় তবে তাহাই হইল বৃদ্ধনৈয়ায়িকদের* মধ্যে প্রসিদ্ধ "উপমান"। শবরস্বামী কিন্তু শাবরভাষ্যে বলিয়াছেন যে শাব্দপ্রমাণের মধ্যেই উপমান অন্তর্ভূত হওয়ায় উপমানকে একটি পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করার সার্থকতা নাই। এই জন্য শবরস্বামী অন্য এক প্রকারের উপমান বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার মতে উপমান হইল সাদৃশ্য যাহা অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ে বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে—গবয় দর্শনে যেমন গো-পশুর স্মরণ হয়।"

এখন শবরস্বামীর এই মতের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে গো ও গবয়ের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক এই যে উপমান ইহার ভিত্তি হইল স্মৃতি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিতেছেন যে সাদৃশ্যগ্রাহী জ্ঞানটি যে স্মৃতিপূর্বক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বটে, কিন্তু উপমানের সবটাই যে স্মৃতিমূলক একথা বলাও ঠিক হইবে না, কারণ সাদৃশ্যটি গবয়েও অবস্থিত হওয়ায় তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে। ইহাতে কিন্তু আপত্তি উঠিতে পারে যে সাদৃশ্য হইল স্বভাবতই দ্বিষ্ঠ (দুইটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, কারণ দুইটি বিভিন্ন বিষয়ের তুলনা ব্যতিরেকে সাদৃশ্যজ্ঞান সম্ভব হয় না), তাহা গোসন্নিধান ব্যতিরেকে কখনই গবয়ে সম্ভব হইতে পারে না। ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে সাদৃশ্য হইল সামান্যবৎ, অর্থাৎ সামান্যের ন্যায় তাহা প্রতি ব্যক্তিতেও পরিব্যাপ্ত,—সুতরাং প্রতিযোগী গো সন্নিহিত না থাকিলে যে গবয়ে সাদৃশ্যটি পরিলক্ষিত হইবে না তাহা নহে (কা ১৫৩২)।

বৌদ্ধ পক্ষ হইতে মীমাংসকের এই মতের খণ্ডনোদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল বলিতেছেন "প্রমেয়াভাবাৎ ষট্প্রমাণব্যতিরিক্তপ্রমাণবদতো নোপমানং প্রমাণম্", অর্থাৎ মীমাংসক (ও নৈয়ায়িকের) অভীপ্সিত এই উপমান-প্রমাণের কোন প্রমেয়ই নাই—সুতরাং তাহা ষট্-প্রমাণের অতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের মত। এখন এই ষট্প্রমাণ বলিতে কি কি প্রমাণ বুঝাইতেছে? চার্বাক দর্শনে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ-প্রমাণ স্বীকার করা হইত, বৈশেষিকগণ

* এখানে বাৎস্যায়নকেই বৃদ্ধনৈয়ায়িক বলা হইয়াছে। বাৎস্যায়নভাষ্য ১. ১. ৬ ও তর্কবাগীশ মহাশয়ের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(বৌদ্ধদিগের মত) প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিতেন, সাংখ্য স্বীকার করিতেন শব্দ অনুমান প্রত্যক্ষ এই তিনটি প্রমাণ, নৈয়ায়িক এই তিনটিরও উপর আরও স্বীকার করিতেন উপমান-প্রমাণ। নৈয়ায়িকের এই চারিটি প্রমাণের অতিরিক্ত আরও দুইটি প্রমাণ মীমাংসা ও বেদান্তে স্বীকার করা হইত, সেদুটি হইল অভাব ও অর্থাপত্তি। কমলশীল মীমাংসাব এই ছয়টি প্রমাণের কথা স্মরণ করিয়াই সম্ভবতঃ এখানে ষট্‌প্রমাণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু "ষট্‌প্রমাণের অতিরিক্ত"—এ-কথা বলার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে কোন কোন সম্প্রদায় এই ষট্‌প্রমাণেরও অতিরিক্ত ঐতিহ্য, প্রতিভা প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করিতেন। কমলশীল তাহা হইলে যাহা বলিতে চাহেন তাহা এই যে ষট্‌প্রমাণেব অতিরিক্ত ঐতিহ্যাদি প্রমাণ যেমন ধর্তব্যের মধ্যেই নহে, ষট্‌প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপমান-প্রমাণও কার্যতঃ হইল তদ্রূপ। তাহার কারণ কি? কারণ এই যে উপমানেব দ্বাবা প্রমিত হইবে এমন কোন বিষয়ই নাই। যদি বলা যায় যে সাদৃশ্যই হইল উপমান-প্রমাণেব প্রমেয তবে তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ সাদৃশ্যের ভিত্তি হইল সামান্য, অথচ সামান্যবাদ পূর্বেই খণ্ডন কবা হইযাছে।

নৈয়ায়িক উপমানের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা এই :—প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্ (ন্যায়সূত্র ১।১।৬)। বাৎস্যায়ন অনুযায়ী ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন "প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত পদার্থ বিশেষের সহিত অদৃষ্ট পদার্থেব সাদৃশ্য-বোধক আপ্তবাক্য হইতে যে সাধর্ম্য অর্থাৎ সাদৃশ্য জ্ঞান হয়, সেই সাদৃশ্য প্রযুক্ত (সেই সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ বশতঃ) সাধ্যের অর্থাৎ শব্দবিশেষের বাচ্যত্ব সম্বন্ধের (নিশ্চয) যাহা দ্বারা হয, তাহা উপমান প্রমাণ।" কমলশীল কিন্তু বলিয়াছেন যে সূত্রস্থ "প্রসিদ্ধসাধর্ম্য" কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে—"যে সাধর্ম্য প্রসিদ্ধ সেই সাধর্ম্য" অথবা "প্রসিদ্ধ বিষযেব সহিত সাধর্ম্য।" বাৎস্যায়ন দ্বিতীয় অর্থেই সূত্রটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তাহাই করা যুক্তিসঙ্গত। কমলশীলের মতে সূত্রটির বিশদার্থ হইল "প্রসিদ্ধসাধর্ম্যকে আশ্রয় করিয়া সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীব সম্বন্ধেব সাধনই হইল উপমান।" এই উপমানের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৌদ্ধ এখন বলিতেছেন :—

তত্রাপি সংজ্ঞাসম্বন্ধপ্রতিপত্তিবনাকুলা।
তস্যাতিদেশবাক্যস্য তদৈব শ্রবণে যদি ॥ ১৫৬৪ ॥
তথা পরিগৃহীতার্থগ্রহণান্ন প্রমাণতা।
স্মৃতেরিবোপমানস্য কারণার্থবিয়োগতঃ ॥ ১৫৬৫ ॥

অর্থাৎ "গবয় গরুর মত" এইরূপ বাক্য শ্রবণেব কালেই যদি সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীব পরস্পর সম্বন্ধেব পূর্ণ প্রতিপত্তি উৎপন্ন হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে উপমানেব দ্বারা গৃহীত বিষয়ের পুনর্গ্রহণ ঘটিয়াছে বলিতে হইবে, এবং তাহাই যদি হয় তবে স্বীকাব করিতে হইবে যে উপমান হইল স্মৃতির মত যাহার নূতন জ্ঞান উৎপন্ন কবিবার যোগ্যতাই নাই।—শান্তরক্ষিতের এই কথার তাৎপর্য এই যে "গবয়"-শব্দের বাচ্যবাচকতা সম্বন্ধ যদি শব্দটি শ্রবণমাত্রেই লোকে পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে তথাকথিত উপমানপ্রমাণের করিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে না। নৈয়ায়িক অবিদ্ধকর্ণ আপত্তি কবিয়া বলিয়াছেন "আগমাৎ সামান্যেন প্রতিপন্নেতে বিশেষপ্রতিপত্তিরুপমানাৎ," অর্থাৎ অপরের কথা হইতে গবয় সম্বন্ধে যে সাধারণ ধারণা জন্মিয়াছিল তাহাই উপমানযোগে বিশদীকৃত হয়, (সুতরাং উপমান ব্যর্থ নহে)। ইহাতে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল বলিয়াছেন সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সম্বন্ধ অপোহবাদের আলোচনার সম্পর্কে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাই ঠিক, সুতরাং অবিদ্ধকর্ণাদি নৈয়ায়িকের কথা খাটিবে না।—উপমান সম্বন্ধে তত্ত্বসংগ্রহে আরও অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু তাহার সবই বিতণ্ডামূলক এবং ন্যায়ের পরিভাষায় কণ্টাকাকীর্ণ।

অর্থাপত্তির আলোচনায় মীমাংসক হইলেন শান্তরক্ষিতের প্রধান পূর্বপক্ষী। শবরস্বামী অর্থাপত্তির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন:—দৃষ্টঃ শ্রুতো বার্থোঽন্যথা নোপপদ্যত ইত্যদৃষ্টকল্পনা, অর্থাৎ যে অদৃষ্টার্থ কল্পনা করিয়া না লইলে দৃষ্ট বা শ্রুত অর্থ সিদ্ধ হয় না তাহা স্বীকার করিয়া লওয়াই হইল অর্থাপত্তি। যেমন, দেবদত্ত বাঁচিয়া আছে অথচ বাড়ীতে নাই—ইহা হইতে অর্থাপত্তি হইল দেবদত্ত বাহিরে গিয়াছে। বিবিধ প্রমাণ অনুযায়ী আবার অর্থাপত্তি বিবধ প্রকারের। অগ্নি দহন করিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া অগ্নির দাহশক্তি কল্পনা করা হইল প্রত্যক্ষপূর্বিকা অর্থাপত্তি। সূর্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমন করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া সূর্যের গমনশক্তি কল্পনা করা হইল অনুমানপূর্বিকা অর্থাপত্তি। সমস্ত ভাববস্তু যে শক্তিসম্পন্ন—ইহাও মীমাংসকের মতে কল্পনা, এবং এই অপরিহার্য কল্পনার নাম হইল কার্যার্থাপত্তি (শক্তয়ঃ সর্বভাবানাং কার্যার্থাপত্তিসাধনাঃ—কা ১৫৮৯)। "পীন ব্যক্তি দিনে আহার করে না"—এই কথা শ্রবণ করিয়া যখন কল্পনা করা হয় যে পীন ব্যক্তি রাত্রিতে আহার করে তখন তাহাই হইল শব্দপ্রমাণপূর্বিকা অর্থাপত্তি (কা ১৫৯২)। শান্তরক্ষিত কুমারিলের বচন হইতে এখানে বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন এই প্রকারের কল্পনাকে কেন অনুমান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। গবয়ের সহিত উপমিত গোপিণ্ডের যে উপমানজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হইবার শক্তি (গ্রাহ্যশক্ততা) কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়া থাকে তাহাই হইল উপমানপূর্বিকা অর্থাপত্তি (কা ১৫৯৯)। অর্থাপত্তিপূর্বিকা অর্থাপত্তিও সম্ভব। কোন বস্তু বা ব্যক্তির অভিধান অন্য কোন উপায়ে সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং অভিধান স্বয়ং হইল একটি অর্থাপত্তি, কারণ বস্তু বা ব্যক্তির অভিধান স্বীকার করার অর্থ শব্দের বাচকশক্তি কল্পনা করিয়া লওয়া; কিন্তু শব্দের এই শক্তি স্বীকার করার অর্থ হইল শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করা, কারণ যাহা অনিত্য তাহার ভিত্তিতে কখনও সংকেত-ব্যবহার সম্ভব হয় না; সুতরাং এইখানেই আরও একটি অর্থাপত্তির সাহায্যে শব্দের নিত্যত্ব নিশ্চয় করা হইতেছে (কা ১৬০০—১৬০১)।* সর্বশেষে শান্তরক্ষিত অভাবপূর্বিকা অর্থাপত্তির কথা বলিয়াছেন; অন্যান্য অর্থাপত্তির উপলক্ষণার্থে এই অভাবপূর্বিকা অর্থাপত্তির উল্লেখ প্রথমেই করা হইয়াছে ("দেবদত্ত যখন জীবিত অথচ বাড়ীতে নাই তখন সে বাহিরে আছে")। নৈয়ায়িকগণ সাধারণতঃ অভাবপূর্বিকা অর্থাপত্তিকে অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কুমারিল সে-মতের পক্ষপাতী নহেন।

সবিস্তারে এই সপ্ত প্রকারের অর্থাপত্তির উল্লেখ করিয়া কমলশীল বলিতেছেন "এবং ষট্‌প্রকারার্থাপত্তিঃ!" ইহার কারণ এই যে নৈয়ায়িকদের ন্যায় বৌদ্ধগণও অভাবকে অর্থাপত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। বৌদ্ধগণ অভাবকে একটি পৃথক্ প্রমাণ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু অভাবের প্রমাণত্বে তাঁহারা বাস্তবিক বিশ্বাস করিতেন না।

অর্থাপত্তি খণ্ডনোদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন:—

দাহাদীনাং তু যো হেতুঃ পাবকাদিঃ সমীক্ষ্যতে।
অসংশয়াবিপর্যাসং শক্তিঃ কান্যা ভবেত্ততঃ॥ ১৬০৮॥

অর্থাৎ, দাহের হেতু যে অগ্নি তাহা যখন প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, এবং এই প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন কোন সংশয় বা বিপর্যাসের অবকাশ নাই, তখন দাহ ভিন্ন পাবকের আবার কোন্ শক্তি থাকিতে পারে (যাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রত্যক্ষপূর্বিকা অর্থাপত্তির সাহায্য গ্রহণ করার প্রয়োজন হইতে পারে)?—অনুমানপূর্বিকা অর্থাপত্তি সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন:—

* অনিত্যকে আশ্রয় করিয়া কেন সংকেতব্যবহার সম্ভব হয় না তাহা বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন "সংকেতকালে দৃষ্টস্য যদি ব্যবহারকালেঽনুবৃত্তির্ন ভবেত্তদা সংকেতকরণমনর্থকমেব স্যাৎ।"

উপাদানাসমানে চ দেশে জাতির্নিরন্তরম্।
রবের্দেশান্তরব্যাপ্ত্যা জ্বালাদেরিব গম্যতে ॥ ১৬১৮ ॥

অর্থাৎ, সূর্য যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ সূর্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপাদান সহকারে জন্ম লাভ করিয়া থাকে,—শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি প্রদীপ ক্রমানুযায়ী জ্বালাইয়া পুনরায় নির্বাপিত করিয়া গেলে যেমন মনে হয় একটি অগ্নিশিখাই সচল হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ইহাও তদ্রূপ।—শব্দপ্রমাণ পূর্বিকা অর্থাপত্তি সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত আপত্তি করিতেছেন :—

পীনো দিবা ন ভুংক্তে চেত্যস্মিন্নর্থে ন নিশ্চয়ঃ।
দ্বেষমোহাদিভির্যোগাদন্যথাপি বদেৎ পুমান্ ॥ ১৬২০ ॥

এখানে শান্তরক্ষিত যেন ইচ্ছা করিয়াই পূর্বপক্ষীর উদাহরণবাক্যের কুব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাক্যটি হইল "পীনো দিবা ন ভুংক্তে"; পূর্বপক্ষী এই বাক্যদ্বারা যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা অবশ্যই এই যে "লোকটি দিনের বেলা খায় না অথচ মোটা হয়"; শান্তরক্ষিত কিন্তু ধরিয়া লইতেছেন যে বাক্যটির অর্থ হইল "মোটা লোকটি দিনের বেলা খায় না" এবং তাহার পর মন্তব্য করিতেছেন যে এরূপ কথা লোকে দ্বেষাদির বশবর্তী হইয়াই বলিয়া থাকে—সুতরাং এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অর্থাপত্তি রূপ একটি প্রমাণ স্বীকার করা যায় না। আর যদি স্বীকার করাও হয় তাহা হইলেও এই অর্থাপত্তিকে অনুমান হইতে পৃথক্ একটা কিছু বলিয়া স্বীকার করার কোন কারণ নাই, কারণ :—

ক্ষপাভোজনসম্বন্ধী পুমানিষ্টঃ প্রতীয়তে।
দিবাভোজনবৈকল্যপীনত্বেন তদন্যবৎ ॥ ১৬২৩ ॥

এই কারিকায় আলোচ্যমান বাক্যটিকে অনুমানের আকারে সাজান হইয়াছে মাত্র। প্রতিজ্ঞা—রাত্রিকালে ভোজনকারী পুরুষ; হেতু—দিবাভোজন ব্যতিরেকেও পুরুষটির পীনত্ব; দৃষ্টান্ত—অন্য পুরুষের ন্যায় (তদন্যবৎ)। সুতরাং "পীনো দিবা ন ভুংক্তে" এই বাক্যটির অভিপ্রেত অর্থ স্বীকার করিলেও তাহাতে অর্থাপত্তির কোন স্থান নাই যেহেতু সেটিকে অনুমানবাক্য রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উপমানপূর্বিকা অর্থাপত্তি সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন উপমানের প্রমাণত্বই যখন খণ্ডিত হইয়াছে তখন তৎসঙ্গেই সেই অর্থাপত্তিরও নিরাকরণ হইয়া গিয়াছে যাহার ভিত্তি হইল উপমান (কা ১৬৩২)। অর্থাপত্তিপূর্বিকা অর্থাপত্তি হইল অনৈকান্তিক, কারণ কেবল যে শব্দেরই বাচকশক্তি আছে তাহা নহে, হস্তসঞ্চালন প্রভৃতির সাহায্যেও বাচ্যার্থ প্রকাশ করা যাইতে পারে (কা ১৬৩:)।—অভাবপূর্বিকা অর্থাপত্তি সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

গেহাভাবাত্তু চৈত্রস্য বহির্ভাবো ন যুজ্যতে।
মরণাশঙ্কয়া যস্মাদন্যথাপ্যুপপদ্যতে ॥ ১৬৪১ ॥

অর্থাৎ, চৈত্র নামক ব্যক্তিটি বাড়ীতে নাই বলিয়াই এ-কথা ধরিয়া লওয়া ঠিক হইবে না যে সে বাহিরে আছে। হইতে পারে যে সে মরিয়া গিয়াছে। আর যদি জানা থাকে যে চৈত্র বাঁচিয়া আছে তাহা হইলেও বক্তব্য :—

বেশ্মন্যপশ্যতশ্চৈত্রং ন হ্যর্বাগ্দর্শিনঃ প্রমা।
তস্য জীবনসম্বন্ধে কথংচিদপি বর্ততে ॥ ১৬৪৩ ॥

অর্থাৎ, সাধারণ বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন দেখে যে চৈত্র বাড়ীতে নাই তখন চৈত্র বাঁচিয়া আছে কি না এরূপ কথা কখনই তাহার মনে উদিত হয় না; কিন্তু এ-কথা যদি একবার মনে উদিত হয় তবে সে আর নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবে না যে চৈত্র বাঁচিয়া আছে।

সুতরাং কোন দিক্ হইতেই অভাবপূর্বিকা অর্থাপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না।—ইহাই হইল সংক্ষেপে সর্বপ্রকারের অর্থাপত্তি খণ্ডন।

মীমাংসা মতে অভাবও (negation) একটি প্রমাণ। শবরস্বামী বলিয়াছেন "অভাবোঽপি প্রমাণাভাবো নাস্তীত্যর্থস্যাসন্নিকৃষ্টস্যেতি", অর্থাৎ "প্রমাণের অভাবই হইল অভাব,—ইহা হইতে অসন্নিকৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে তাহা নাই এই প্রকারের জ্ঞান উদ্ভূত হয়।" প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রধান কার্য হইল বস্তুর অস্তিত্ব নির্ণয় করা। কিন্তু কোন বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন প্রমাণই না থাকে তবে তদ্দ্বারাও বস্তুটির অনস্তিত্ব "প্রমাণিত" হইবে! এই কথা স্মরণ করিয়াই মীমাংসক অভাবকে একটি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই অভাব আবার চতুর্বিধ; দুগ্ধে দধির অভাব হইল প্রাগভাব, দধিতে দুগ্ধের অভাব হইল প্রধ্বংসাভাব, গরুতে অশ্বাদির অভাব হইল অন্যোন্যাভাব, এবং শশকের মস্তকে যে শৃঙ্গের অভাব তাহা হইল অত্যন্তাভাব। কুমারিল বলিয়াছেন যে অভাবকে একটি প্রমাণরূপে স্বীকার না করিলে দুগ্ধে দধির অস্তিত্ব প্রভৃতি স্বীকার করা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে অভাবকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করা কিরূপে সম্ভব, তখন মীমাংসক বলিবেন অভাব যদি বস্তু না হইত তবে অভাবের এই চতুর্বিধত্ব সম্ভব হইত না; অভাব বলিতে বুঝায় কার্যের অভাব, এবং কার্যের অভাব বলিতে বুঝায় কারণের সদ্ভাব; সুতরাং অভাবও এক প্রকারের বস্তু। যদি কেহ আপত্তি করেন যে অভাবের যখন প্রমেয়ই কিছু নাই তখন অভাব প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে মীমাংসক বলিবেন অভাবই অভাবরূপ প্রমাণের প্রমেয় (কা ১৬৫৭)। মীমাংসককে কিন্তু এখনও প্রশ্ন করা যাইতে পারে অভাবই না হয় অভাবের প্রমেয় হইল, কিন্তু তাই বলিয়া অভাবকে প্রত্যক্ষাদি হইতে পৃথক্ একটি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করার কারণ আছে কি? ইহাতে মীমাংসক বলিতেছেন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাবই যখন অভাব-প্রমাণ তখন প্রত্যক্ষাদি হইতে ইহা পৃথক্ না করিয়া উপায় কি (কা ১৬৫৮)? মীমাংসকের মুখ হইতে এই কথাটা বাহির করিবার জন্যই যেন শান্তরক্ষিত তাঁহাকে এতক্ষণ ধরিয়া প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনি এখন মীমাংসকের নিজের কথা হইতেই প্রমাণ করিয়া দিতেছেন যে তথাকথিত অভাবপ্রমাণ প্রত্যক্ষাদিরই অন্তর্গত। মীমাংসকই বলিয়াছেন যে কার্যের অভাব বলিতে বুঝায় কারণের সদ্ভাব (কা ১৬৫৫); সুতরাং অভাবরূপ প্রমাণ—যাহা মীমাংসকের মতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহাও যে প্রত্যক্ষাদির অন্তর্নিহিত এ-কথা মীমাংসক অস্বীকার করিতে পারেন না (কা ১৬৭১)। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি হইতে পৃথক্ একটি অভাব-প্রমাণ স্বীকার করার সার্থকতা নাই।—অভাব সম্বন্ধে তত্ত্বসংগ্রহে আরও অনেক সূক্ষ্ম বিচার রহিয়াছে কিন্তু তাহার সবই বিতণ্ডামূলক।

প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অভাব পর্যন্ত যে-সমস্ত প্রমাণের আলোচনা করা হইল সেগুলির সবই ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ। শান্তরক্ষিত কিন্তু প্রমাণাধ্যায়ে যুক্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভাবনা, ঐতিহ্য ও প্রতিভারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা (ও খণ্ডন) করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রদায় বিশেষে এই গুলিরও এক বা ততোধিক প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। বৈদ্যরাজ চরক যুক্তি ও অনুপলব্ধিকেও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যুক্তি কাহাকে বলে তাহা শান্তরক্ষিতের এই এই কারিকাটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়:—

অস্মিন্ সতি ভবত্যেব ন ভবত্যসতীতি চ।
তস্মাদতো ভবত্যেব যুক্তিরেষাভিধীয়তে ॥ ১৬৯২ ॥

অর্থাৎ, "ঐটি হইলে এইটি হয় এবং ঐটি না হইলে এইটি হয় না, সুতরাং ঐটি হইতে এইটির উদ্ভব"— এই প্রকারের কল্পনা হইল যুক্তি। ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কারণ ইহা

সবিকল্প, এবং ইহা অনুমানও হইতে পারে না, কারণ ইহাতে দৃষ্টান্তের কোন স্থান নাই।—অনুপলব্ধি সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিয়াছেন ঃ—

উপলব্ধ্যা যয়া যোঽর্থো জ্ঞায়তে তদভাবতঃ।
নাস্তিত্বং গম্যতে তস্যানুপলব্ধিরিয়ং মতা ॥ ১৬৯৪ ॥

অর্থাৎ যে-উপলব্ধির দ্বারা যে-বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই উপলব্ধিটি যদি বর্তমান না থাকে তবে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সেই বিষয়টিও নাই; সুতরাং অনুপলব্ধি একটি প্রমাণ। এই প্রমাণও যুক্তির ন্যায় দৃষ্টান্তনিরপেক্ষ; ইহাতে দৃষ্টান্ত দিবার উপায়ই নাই, কারণ দৃষ্টান্তেও নাস্তিত্ব এই অনুপলব্ধির দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হইবে। যুক্তির ন্যায় অনুপলব্ধিও প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে পারে না।

শান্তরক্ষিতের তীক্ষ্ণ বিচারের সম্মুখে যে পূর্বপক্ষী যুক্তি ও অনুপলব্ধির প্রমাণত্ব প্রমাণ করিতে পারেন নাই তাহা বলাই বাহুল্য। যুক্তি সমর্থনের জন্য পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন যে ইহাতে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে ভেদ রক্ষিত হয় নাই। পূর্বপক্ষীর হেতু (=সাধন) হইল "ঐটি হইলে এইটি হয়" (তদ্ভাবভাবিতা), এবং তাঁহার সাধ্য হইল কার্যকারণ সম্বন্ধ। কিন্তু তদ্ভাবভাবিতা ও কার্যকারণ সম্বন্ধ একই কথা। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্বপক্ষী যুক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে পার্থক্যই নাই। সুতরাং তাঁহার কথা অগ্রাহ্য (কা ১৬৯৬)।—অনুপলব্ধি সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য :—

দৃশ্যাদৃষ্টিং বিহায়ান্যা নাস্তিতা ন প্রতীয়তে ॥ ১৬৯৭ ॥

অর্থাৎ, দৃশ্য বস্তুকে দেখিতে না পাওয়া ছাড়া অনুপলব্ধির আর কোন অর্থ নাই।—এই অনুপলব্ধিকে যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে জগতে কিছুই আর অপ্রমাণিত থাকিবে না।

শান্তরক্ষিত দুইটি কারিকায় সম্ভব, ঐতিহ্য ও প্রতিভা নামক তিনটি তথাকথিত প্রমাণের আলোচনা করিয়াই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। এখানে "সম্ভব" কথাটি "উৎপত্তি" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, probability অর্থে নহে। সহস্রের অস্তিত্ব যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহা হইতে শতেরও অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে—ইহাই হইল কমলশীলের মতে সম্ভব-প্রমাণের দৃষ্টান্ত। শান্তরক্ষিত এই সম্ভব-প্রমাণ অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে সমুদায়ীই হইল সমুদায়ের হেতু; সমুদায় সহস্র যদি হয় কার্য তবে সমুদায়ী শত হইবে তাহার হেতু; সুতরাং সহস্র হইতে যে শতের প্রতীতি জন্মে তাহা কার্য হইতে কারণের অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতে অনুমান ভিন্ন অপর কোন প্রমাণ স্বীকার করিবার কারণই নাই।

অবশিষ্ট প্রমাণাবলী সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

ঐতিহ্যপ্রতিভাদীনাং ভূয়সা ব্যভিচারিতা।
নৈবাদৃশাং প্রমাণত্বং ঘটতেঽতিপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১৭০০ ॥

কমলশীলের মতে ঐতিহ্য হইল "অনির্দিষ্টবক্তৃকং প্রবাদপারম্পর্যম্"; অর্থাৎ যে-সমস্ত প্রবাদ পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে অথচ জানা নাই কে সেগুলির প্রচলন করিয়াছিল—সেই সকল প্রবাদই হইল ঐতিহ্য। যদি কোন বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রবাদ থাকে যে তাহাতে একটি যক্ষ বাস করে তবে তাহা হইল ঐতিহ্য। প্রতিভার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কমলশীল বলিয়াছেন, কোন যোগ্য কারণ ব্যতিরেকেও একটি কুমারী যদি হঠাৎ একদিন বলে যে সেই দিন তাহার ভ্রাতা আসিবে—এবং ভ্রাতা যদি বাস্তবিকই সেইদিন আসিয়া উপস্থিত হয়—তবে তাহাই হইল প্রতিভা।—ঐতিহ্য ও প্রতিভার প্রমাণত্ব খণ্ডনের জন্য শান্তরক্ষিতকে অবশ্যই বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন ঐতিহ্যাদির ব্যভিচারিতা বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়; সুতরাং এগুলিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলে স্বপ্নেরও প্রমাণত্ব অস্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে না।

উপনিষদে কর্মের প্রসার

(পূর্বানুবৃত্ত)

অধ্যাপক **শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র**, এম. এ.

এইবার আমরা কর্মের বিধানমূলক উপনিষদংশ লইয়া আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে উপনিষদেরও একটী বৃহৎ অংশকে কর্মকাণ্ড বলিলে দোষ হয় না। শ্রৌত এবং গৃহ্য—দুই প্রকার কর্মই নিম্নলিখিত উপনিষৎ-খণ্ডে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে প্রাণসংবাদ বা প্রাণবিদ্যা আখ্যায়িকাচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান আমরা বৃহদারণ্যক (৬. ১. ১—১৪), ঐতরেয় আরণ্যক (২. ১. ১. ৯), কৌষীতকি উপনিষদ (২. ১৪; ৩. ৩) এবং প্রশ্ন উপনিষদে (২.৩—৪) পাই। মন্থ-কর্ম প্রাণবিদ্যা-বর্ণনার ঠিক পরে পরেই ছান্দোগ্যে বিহিত। বৃহদারণ্যকে পরে হইলেও অব্যবহিত পরে নহে। প্রাণশক্তি সকল শক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কাজেই মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইবার অর্থ স্পষ্টতই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য লাভ করা। এইজন্যই বোধ হয় কৌষীতকিতে (২. ৩) মন্থকর্মের অনুরূপ কর্মকে 'একধনাবরোধন' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। প্রাণই একমাত্র ধন। তাহাকেই আয়ত্তে আনা মন্থের প্রধানতম উদ্দেশ্য, অন্যান্য লাভ অবান্তর। প্রাণতত্ত্বজ্ঞেরই এই কাম্যকর্মে অধিকার আছে। ইহা স্মার্ত অর্থাৎ গৃহ্য বিধান। অতএব আবসথ্য অগ্নিতে এই যাগ নিষ্পাদন করিতে হইবে।

উপনিষদের আভ্যন্তর প্রমাণ দ্বারা মন্থের উপাদান জানিতে পারা যায়। ব্রীহি, যব, তিল, মাষ প্রভৃতি দশটি গ্রাম্য ওষধি পেষণ করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা মিশ্রিত করিয়া মন্থ প্রস্তুত হয়। সর্বৌষধ (সমস্ত ওষধি অথবা মুরামাংসী, বচ প্রভৃতির সমষ্টিরূপ পারিভাষিক সর্বৌষধ) একত্র পেষণ করিয়া দধি ও মধুর সহিত মিশাইয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে ছান্দোগ্যমতে মন্থ বলে। বৃহদারণ্যকে পিষ্ট সর্বৌষধের সহিত তাহাদের ফলও মিশাইয়া লইতে বলা হইয়াছে। অথর্ববেদ এবং শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে এই মিশ্রিত

---

১১ শাঙ্খায়ন গৃহ্য, ৬. ৪. ৮; কৌষীতকি আরণ্যক, ৯; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪. ৯. ২; ছা. উ. ৫. ২. ৪.

১২ দশ গ্রাম্যাণি ধান্যানি ভবন্তি ব্রীহিযবাস্তিলমাষা অণুপ্রিয়ঙ্গবো গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্বাশ্চ খলকুলাশ্চ, তান্ পিষ্টান্ দধনি মধুনি ঘৃত উপসিঞ্চতি।—বৃ. উ., ৬. ৩. ১৩.

দ্রব্যের নাম 'মন্থ'। ভট্টোজি-দীক্ষিত "ক্ষুব্ধ-স্বান্ত........" এই পাণিনিসূত্রের (৭.২.১৮) বৃত্তিতে মন্থ-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দ্রবদ্রব্য-সম্পৃক্তাঃ সক্তবো মন্থঃ।" ইহা জৈমিনীয়-ন্যায়-মালা-বিস্তরের (পৃ' ৪০৬) "দ্রবদ্রব্যে প্রক্ষিপ্তা মথিতাঃ শক্তবঃ," এই বাক্যানুযায়ী। মোটের উপর মন্থ বলিতে অনেকগুলি উদ্ভিজ্জ এবং দধ্যাদির সংমিশ্রণে ঈষৎ তরল পানীয় দ্রব্য বুঝিব।

বৃহদারণ্যকে মন্থকর্ম আরম্ভ করিবার কালনির্দেশ এইরূপ—"উদগয়ন আপূর্যমাণ-পক্ষস্য পুণ্যাহে দ্বাদশাহমুপসদ্‌ব্রতী[১৩] ভূত্বা পুংসা নক্ষত্রেণ", অর্থাৎ দ্বাদশ দিন যাবৎ উপসদ্ ব্রত আচরণ করিয়া অব্যবহিত পরে সূর্যের উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে শুভ পুংনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে ইহা করিতে হইবে। ছান্দোগ্যে কাল নির্ণয় এইরূপ:—"অমাবস্যায়াং দীক্ষিত্বা[১৪]

১৩ জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গীভূত প্রবর্গ্যকর্মের পর আতিথ্যা-নামক ইষ্টির ঠিক পরে পরেই উপসদ্ ইষ্টি করিতে হয়। "একা দীক্ষা তিস্র উপসদঃ পঞ্চমেঽহনি যজতি,"—একদিন দীক্ষা, তিনদিন উপসদ্ এবং পঞ্চমদিনে যাগ, এইরূপে একাহ যাগ নিষ্পন্ন হয়। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রমতে জ্যোতিষ্টোমে তিনদিন বা ছয়দিন ধরিয়া উপসদ্ ইষ্টি বিধেয়। যথা,—"একাহানাং তিস্রঃ ষড়্ বা, অহীনানাং দ্বাদশ, চতুর্বিংশতিঃ সংবৎসর ইতি সত্রাণাম্", অর্থাৎ একাহ যাগে তিন বা ছয়দিন, অহীন (১২ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্যন্ত ব্যাপী যজ্ঞ)-যাগে বারো দিন এবং গবাময়ন-নামক সংবৎসর-ব্যাপী যজ্ঞে (সত্রে) চব্বিশ দিন যাবৎ কালদ্বয় ক্রমে (প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে) দিনে দুইবার করিয়া উপসদ্ আচরণ করিবে। উপসদের দেবতা চারিজন—অগ্নি, সোম, বিষ্ণু, বরুণ; একটি মতে প্রথমোক্ত তিনজন। হবির্দ্রব্য হইল আজ্য। এই ইষ্টির প্রয়োজনে কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিয়া থাকিতে হয়। তাহাতে আবার কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। প্রথমদিনে গাভীর চারিটী স্তন হইতে যে পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তাহা ব্রতী ব্যক্তি পান করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃকালীন ও সায়ংকালীন উপসদে এবং তৃতীয় দিনে প্রাতঃকালীন উপসদে ক্রমান্বয়ে এক একটী করিয়া স্তনসংখ্যা হ্রাস করিবে, অর্থাৎ প্রত্যেক বেলাতেই দুগ্ধের মাত্রা উক্ত বিধি অনুসারে কমাইয়া দিতে হইবে। তিনদিন ধরিয়া ক্রমশ স্তনসংখ্যা হ্রাস করিবে, আবার চতুর্থ দিন হইতে চারিটী স্তন হইতে পুনরায় আরম্ভ করিয়া হ্রাস করিবে। উল্লিখিত ক্রমে স্তনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বিধেয়। এই ইষ্টির অন্যান্য বিধি নিষেধের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪.৬—৯) দ্রষ্টব্য।

১৪ মন্থে দীক্ষার কথা কেবল ছান্দোগ্যেই রহিয়াছে। দীক্ষিতের কতকগুলি নিয়ম পালন করা উচিত; যথা,—জলদ্বারা অভিষেক, নবনীত দ্বারা অভ্যঞ্জন, নেত্রে অঞ্জন, কুশদ্বারা পবিত্রীকরণ, প্রাচীনবংশ-নামক বিশেষরূপে নির্মিত বাসভবনে অবস্থান, ইত্যাদি [ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১.৩) দীক্ষণীয়েষ্টি দ্রষ্টব্য]। মনে রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মণ-কথিত দীক্ষণীয়া ইষ্টি শ্রৌতকর্ম। মন্থ শ্রৌত নহে। সেইজন্য সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিতের কর্তব্য পালন করিবার প্রয়োজন নাই। আচার্য শঙ্কর তাই ব্রহ্মচর্যাদিধর্মের উপরেই জোর দিয়াছেন।

পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ,[১৫]"—অমাবস্যা তিথিতে দীক্ষিত হইয়া পরের পূর্ণিমা তিথিতে। কৌষী-তকিতে একধনাববোধনের কালনির্দেশ এইরূপ—'পৌর্ণমাস্যাং বামাবাস্যায়াং বা শুক্লপক্ষে বা পুণ্যে নক্ষত্রে,"—পূর্ণিমায়, বা অমাবস্যায়, বা শুক্লপক্ষে, বা পুণ্য নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে।

কালবিধানের পর গৃহ্যোক্ত রীতি অনুযায়ী হোমের পূর্বে কয়েকটি কার্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে আছে—"পরিসমুহ্য[১৬] পরিলিপ্য অগ্নিমুপসমাধায়[১৭] পরিস্তীর্য আবৃতা[১৮] আজ্যং সংস্কৃত্য[১৯] মন্থং সন্নীয় জুহোতি,"—পরিসমূহন বা ভূমি ঝাঁট দিয়া, গোময় দ্বারা

---

১৫ গোভিল গৃহ্যসূত্রে (১. ১. ৩—৪) গৃহ্যকর্মারম্ভের কাল সম্বন্ধে এই সূত্র দুইটি দেখা যায়,—"উদগয়নে পূর্বপক্ষে পুণ্যেঽহনি প্রাগবর্তনাদহ্নঃ কালং বিদ্যাৎ'—(উত্তরায়ণে, শুক্লপক্ষে, পুণ্যতিথিতে এবং পূর্বাহ্নে); এবং "যথাদেশঞ্চ (অথবা যেমন যেমন নির্দেশ দেওয়া হইবে তদনুযায়ী কালে)। প্রথম সূত্র দ্বারা, এবং "নিষিদ্ধং নিশি চ ব্রতম্" এই নিয়ম দ্বারা রাত্রিতে মন্থকর্ম করা নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও দ্বিতীয়সূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে কালসম্বন্ধে আছে—"দর্শপূর্ণমাসাভ্যাম্ ইষ্টেষ্টি-পশু-চাতুর্মাস্যৈরথ সোমেন।" আচার্য "ন ঋতুন্ সূর্যের নক্ষত্রম,' এই সূত্র করিয়া সোমযাগে বসন্তাদি ঋতু এবং নক্ষত্রবিশেষের প্রতীক্ষাকে অনাদর করিয়াছেন। সুতরাং শ্রৌত ও গৃহ্য-কর্মের কাল-নিয়মন একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মন্থকর্ম যে গৃহ্যানুযায়ী, তাহা এই কালনির্দেশ হইতেই বুঝা যায়।

১৬ পরিসমূহন—কৃত্বাগ্ন্যভিমুখৌ পাণী স্বস্থানস্থৌ সুসংযতৌ।
প্রদক্ষিণন্তথাসীনঃ কুর্যাৎ পরিসমূহনম্॥
—কর্মপ্রদীপ, ২।

১৭ 'অগ্নির উপসমাধান করিয়া' বলিতে 'আবসথ্য অগ্নি নিকটে আনিয়া'—ইহাই বুঝাইবে। অন্বাহার্যপচন বা দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়,—এই তিনটি অগ্নিকে ত্রেতাগ্নি বা সংক্ষেপে ত্রেতা বলে। আবসথ্য অগ্নি তদতিরিক্ত। ত্রেতা, আবসথ্য ও সভ্য—এই পাঁচটি অগ্নিকে পঞ্চাগ্নি বলে।

১৮ আবৃৎ বলিলে স্থালীপাকের রীতি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দুইটি আজ্যভাগ-দ্বারা আবাপস্থান বা আহুতি-প্রক্ষেপ স্থানে আহুতি দিতে হইবে।

১৯ আজ্য সংস্কার—অগ্নিনা চৈব মন্ত্রেণ পবিত্রেণ চ চক্ষুষা।
চতুর্ভিরেব যৎ পূতং তদাজ্যমিতবদ্ ঘৃতম্॥
—গৃহ্যাসংগ্রহ, ১. ১০৬।

—অগ্নি, মন্ত্র, কুশ-সজ্জাত এবং চক্ষু,—এই চারিটি দ্বারা পূত বা সংস্কৃত হইলে তবে আজ্য বলিব, অন্যথায় ঘৃত বলিব।

লেপন করিয়া, অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, পরিস্তরণ করিয়া বা কুশ বিছাইয়া স্থালীপাক রীতিতে আজ্য সংস্কার করিয়া, মন্থপাত্র নিজের ও অগ্নির মধ্যস্থলে রাখিয়া আজ্যহোম করিবে। কৌষীতকিতে এইরূপ রীতি,—"অগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূহ্য পরিস্তীর্য পর্যুক্ষ্য[২০] পূর্বদক্ষিণং জান্বাচ্য[২০] স্রুবেণ[২১] বা চমসেন বা কংসেন বৈতা আজ্যাহুতীর্জুহোতি,"—অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, পরিসমূহন করিয়া, কুশ বিছাইয়া, অল্প জলধারা সেচন করিয়া, দক্ষিণজানু অবনত করিয়া বসিয়া, চমস বা কংস-নামক পাত্রের আকৃতিবিশিষ্ট স্রুব (এক প্রকার হাতা) দ্বারা দুইবার আজ্যাহুতি দিবে। লক্ষ্য করিতে হইবে, এই বাক্যাংশগুলির অনেক কথাই গৃহ্যসূত্রলব্ধ পরিভাষা। ছান্দোগ্যে এই সকল কার্যের উপদেশ না থাকিলেও একবাক্যতা করিয়া ধরিয়া হইতে হইবে।

বৃহদারণ্যকের আজ্যহোম মন্ত্র,—"যাবন্তো দেবাস্ত্বয়ি জাতবেদস্তির্যঞ্চো ঘ্নন্তি পুরুষস্য কামান্ তেভ্যোঽহং ভাগধেয়ং জুহোমি তে মা তৃপ্তাঃ সর্বৈঃ কামৈস্তর্পয়ন্তু স্বাহা।"—হে জাতবেদস্ (অগ্নি), যত কুটিলবুদ্ধি দেবতা তোমাতে আশ্রয় লইয়া লোকের কাম্যবিষয় নষ্ট করিয়া দেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমি এই আজ্যভাগ আহুতি দিতেছি, তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া সমস্ত কাম্য বস্তু দিয়া আমাকে তৃপ্ত করুন।

---

২০ কৌষীতকির পর্যুক্ষণ ব্যবহৃত হইয়াছে অভ্যুক্ষণ অর্থে। গোভিলগৃহ্যসূত্রের নিয়ম দেখিলে উপরে কথিত উপনিষদংশের গৃহ্যরীতির কথা স্পষ্টই বুঝা যায়:—"অগ্নিমুপসমাধায় পরিসমূহ্য দক্ষিণজান্বক্তো...উদকাঞ্জলিং প্রসিঞ্চেৎ (১. ৩. ১.);" "অগ্নিং পর্যুক্ষেৎ সকৃদ্ বা ত্রির্বা (১. ৩. ৪)।"

বৃহদারণ্যকের উপদেশমত হোম আরম্ভ করিবার পূর্বে কৌষীতক্যুক্ত পর্যুক্ষণ এবং দক্ষিণজানুর অবনমন—এই দুইটীও ধরিয়া লইতে হইবে। যাজ্ঞিকেরা বলেন, "সর্বশাখা-প্রত্যয়মেকং কর্ম।" যজ্ঞ সম্বন্ধে বিধান কোনও একটী শাখাতে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। অন্যান্য শাখা হইতেও বিধানাবলি সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্রমকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং বৃহদারণ্যকের বিধির সহিত কৌষীতকির বিধির মিলন প্রয়োজন।

২১ "দ্রব-দ্রব্যে স্রুবঃ স্মৃতঃ"—তরল পদার্থদ্বারা হোম করিতে হইলে স্রুবের প্রয়োজন হয়। খদির বা পলাশ কাষ্ঠ দ্বারা স্রুব নির্মাণ করিতে হয়। ইহা ২৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইবে; প্রমাণ যথা:—"খাদিরো বাথ পার্ণো বা দ্বিবিতস্তিঃ স্রুবঃ স্মৃতঃ।" কিন্তু মন্থকর্মের স্রুব উদুম্বর-কাষ্ঠ-নির্মিত হইবে, বাজসনেয়ি শাখার (বৃহদারণ্যকের) ইহাই বিশেষ বিধান। এইমতে এই কর্মে ঔদুম্বর পদার্থেরই প্রয়োজন,—ঔদুম্বর স্রুব, ঔদুম্বর চমস, ঔদুম্বর কাষ্ঠ ও ঔদুম্বর মন্থনদণ্ড-দ্বয়।

দ্বিতীয় মন্ত্র,—"যা তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণীতি তাং ত্বা ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং স্বাহা ২২।"—যে দেবতা কুটিল বুদ্ধিবশত "আমি সকল কিছুরই অধীশ্বরী," ইহা মনে করিয়া তোমাতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই সর্বার্থদায়িনী দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতের দ্বারা হোম করিতেছি।

কৌষীতকিতে বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রজ্ঞা—এই দেবতাদিগের উদ্দেশে যথাক্রমে ছয়টী আজ্যাহুতি বিহিত হইয়াছে। এই দেবতারা এখানে 'অবরোধিনী' সংজ্ঞায় অভিহিত। বৃহদারণ্যকের 'অহং বিধরণী' (উপরের অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) বলিতে যাহা বুঝায়, কৌষীতকির 'অবরোধিনী' ও কার্যত সেই ভাবেরই কথা। বৃহদারণ্যকের 'জ্যেষ্ঠায় স্বাহা শ্রেষ্ঠায় স্বাহা……আয়তনায় স্বাহেত্যগ্নৌ হুত্বা মন্থে সংস্রবমবনয়তি,"২৩—এই অংশে দেখা যায়, পরপর দুইবার আজ্যাহুতি দিয়া স্রুবলগ্ন আজ্যাংশ মন্থপাত্রে নিক্ষেপের বিধান রহিয়াছে। তারপর হইতে একবার আহুতি দিয়াই পরক্ষণে আজ্যাংশ মন্থপাত্রে নিক্ষেপের বিধি। এই উপনিষদে সর্বসাকল্যে ২৮টী আহুতির কথা আছে। ছান্দোগ্যে পাঁচটী আহুতি দিতে বলা হইয়াছে। তারপর বৃহদারণ্যকের উপদেশ অনুসারে মন্থপাত্র স্পর্শ করিয়া "ভ্রমদসি…… সংবর্গোঽসি" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্থকর্মের সম্পাদক যাহাতে সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই এই মন্ত্রের শেষে 'সংবর্গ' অর্থাৎ 'সমূহ' বলা হইল।

অনন্তর অগ্নি হইতে কিছু দূরে সরিয়া গিয়া ছান্দোগ্যমতে করতলে মন্থাধার গ্রহণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে—"অমো নামাস্যমা হি তে সর্বমিদং স হি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো রাজাধিপতিঃ স মা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্বমসানীতি,"—(মন্থের উদ্দেশ্যে) "তুমিই **অম,** যেহেতু দৃশ্যমান সকল বস্তুই তোমার **সহিত** ('অম' শব্দ সহার্থক 'অমা' শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট) অবস্থিত। সেই প্রাণই (মন্থ ও প্রাণের এখানে ভাবনাত্মক একীকরণ হইয়াছে) জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, রাজা ও অধিপতিস্বরূপ। তিনি আমাতে তাঁহার উপরি-কথিত ধর্মসমূহ আরোপিত করুন। প্রাণের মত আমিও যেন সর্বাত্মক হইতে পারি।

---

২২ এই মন্ত্রটী সোষ্যন্তীহোম-সংস্কার বর্ণন প্রসঙ্গে গোভিল গৃহ্যে (২. ৭. ১৫) মন্ত্র-ব্রাহ্মণ (১. ৫. ৬) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২৩ বৃহদারণ্যকের—'সংস্রব' অর্থাৎ স্রুব-সংস্রব ছান্দোগ্যের "জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনয়েৎ,"—এই শ্রুতি-কথিত 'সম্পাত' একই। স্রুত-সম্পাতের সংজ্ঞা এইরূপ।—

হুত্বাজ্যং পরিশেষেণ যদ্ দ্রব্যমুপকল্পিতম্।
স্রুবেণৈব তু তৎ স্পৃষ্টং সম্পাতং চৈব তং বিদুঃ॥

—গৃহ্যাসংগ্রহ, ১. ১১৪

ছান্দোগ্যে পাত্রগ্রহণের পরে জপের নির্দেশ, বৃহদারণ্যকে জপের পরে পাত্রগ্রহণের নির্দেশ পাই। শেষোক্তস্থানেও ছান্দোগ্যের অনুরূপ প্রার্থনা, তবে মন্ত্রের কিছু পার্থক্য আছে। মন্থকে এখানে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে ২৪।

সাবিত্রী ("তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি) মধুমতী ("মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি) এবং ব্যাহৃতির অংশ বিশেষ উচ্চারণ করিতে করিতে তিন বারে মন্থাবশেষ ভক্ষণ করিবে। তারপর বিনামন্ত্রে অবশিষ্ট মন্থদ্রব পাত্র প্রক্ষালন করিয়া (নির্ণিজ্য) ভক্ষণ করিবে। ছান্দোগ্য পাদক্রমে ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চারিবারে ভক্ষণ করিতে বলিয়াছেন। চতুর্থবারে নিঃশেষে পাত্র প্রক্ষালনের বিধি উভয়ত্রই সমান।

অতঃপর করতলদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে পূর্বদিকে মাথা রাখিয়া সংযতবাক্য ও সংযতান্তঃকরণ হইয়া কৃষ্ণাজিনে বা সংস্কৃত ভূমিতলে শয়ন করিবে। নিদ্রাকালে যদি স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখা যায়, তবে মন্থ-কর্মের অনুষ্ঠান সফল হইল, বুঝিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও শুভাদিসূচক। ইহা বেদান্তসূত্রের উক্তি। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত ছান্দোগ্যে আছে, বৃহদারণ্যকে নাই। পূর্বোক্ত স্থানে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—

যদা কর্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্‌ স্বপ্ননিদর্শনে ॥

অর্থাৎ যে সকল কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া (যজমান) স্বপ্নে স্ত্রীলোক দর্শন করে, সেই সকল কর্মের ফলনিষ্পত্তি হইল, জানিতে হইবে। ছান্দোগ্যে এখানেই এই কর্মের শেষ।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সমন্থক আদিত্যের উপাসনার কথা বৃহদারণ্যকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মন্ত্রটী এইরূপ:—"দিশামেকপুণ্ডরীকমস্যহং মনুষ্যাণামেকপুণ্ডরীকং ভূয়াসম্",—তুমি সমস্ত দিকের মধ্যে একমাত্র পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম); আমিও যেন মনুষ্যগণের মধ্যে একমাত্র পুণ্ডরীক হইতে পারি, অর্থাৎ অখণ্ড শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারি।

---

২৪ লক্ষ্য করিবার বিষয়, মন্থপাত্রকেই দেবতা বলিয়া এখানে কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞের রহস্যবেত্তাদিগের নিকট ইহা আশ্চর্য বলিয়া মনে হইবে না। ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্যদিগের যজ্ঞপ্রথায় ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার। যজ্ঞের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া দেবতাপদবাচ্য হইয়াছে, এমন বহু দ্রব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আচার্য যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (৯. ৪.) উলূখল, মুষল, হবির্ধান ইত্যাদিকে দেবতা বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণে বহুস্থলেই অনুরূপ বিধি পাওয়া যায়। সংহিতা ভাগেও যজ্ঞীয়দ্রব্য দেবতা বলিয়া স্তুতি লাভ করিয়াছে। অবেস্তা-গ্রন্থেও জওথ্র, বরেস্মন প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজার বিধান দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞপাত্র-হিসাবে বৃহদারণ্যকে মহিমন্ (১. ১.), চমস (২. ২.) এবং ছান্দোগ্যে (৩. ১৫.) জুহূ ও সহমানার উল্লেখ আছে।

তারপর আদিত্যোপাসনার জন্য যেরূপে গমন করা হইয়াছিল, সেইরূপেই ফিরিয়া আসিয়া অগ্নির পশ্চাতে বসিয়া বংশব্রাহ্মণ জপ করিবে, অর্থাৎ এই মন্থবিদ্যার গুরুশিষ্য-পরম্পরার নাম কীর্তন করিবে। আরুণি উদ্দালক তাঁহার শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যকে মন্থক্রিয়ার উপদেশ দিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য আবার তদীয় শিষ্য পৈঙ্গ্য মধুককে ইহার উপদেশ দেন। পরে শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভাগবিত্তি চুল, জানকি আয়স্থূণ, সত্যকাম জাবাল এবং তদীয় শিষ্যগণ এই মহাবিদ্যার অধিকারী হইয়াছেন। বংশব্রাহ্মণোক্ত বংশ অর্থে বিদ্যাবংশ বুঝিতে হইবে—

"বংশো দ্বিধা, বিদ্যয়া জন্মনা চ।"

মন্থকর্মের প্রশংসা করিয়া বলা হইযাছে,—"য এনং শুষ্কে স্থাণৌ নিষিঞ্চেজ্জায়েরঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি, তমেতন্নাপুত্রায় বান্তেবাসিনে বা ব্রূযাৎ[২৫]।—যদি কোন ব্যক্তি নীরস বৃক্ষকাণ্ডেও মন্থপ্রক্ষেপ করে, তবে তাহাতে শাখা এবং পল্লবের উদ্‌গম হইবে। এই প্রাণবিদ্যা-সহকৃত মন্থকর্ম পুত্র এবং শিষ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও বলিবে না। উপনিষদ্ বা রহস্যবিদ্যা বলিয়াই বিদ্যাদান সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর নিয়ম। ব্রাহ্মণেও কর্মের বিধান শেষ হইলে তাহার প্রশংসামূলক বাক্যাবলীও প্রচুর পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

২৫ অন্যত্রও এইরূপ নিয়ম আছে। "নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।"—শ্বে. উ., ৬. ২২ ; মৈত্রায়ণীব্রাহ্মণোপনিষদের ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রপাঠককে ভাষ্যকার 'খিল' বলিয়াছেন। এই খিলাংশেও বিদ্যাসম্প্রদান সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি আছে—"এতদ্ গুহ্যতমং নাপুত্রায় নাশিষ্যায় নাশান্তায় কীর্তয়েদিত্যনন্যভক্তায় সর্বগুণসম্পন্নায় দদ্যাৎ (৬. ২৯)।" নিরুক্তের উপোদ্‌ঘাত অংশে আছে,—"নাবৈয়াকরণায় নানুপসন্নায় নানিদংবিদে বা ॥ নিত্যং হ্যবিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞানেঽসূয়া ॥ উপসন্নায় তু নির্ব্রূয়াদ্ যো বালং বিজ্ঞাতুং স্যান্মেধাবিনে তপস্বিনে বা (২. ১)॥"

মহানির্বাণ তন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

তন্ত্র প্রধানতঃ মন্ত্রশাস্ত্র। বাগাত্মস্থিত অব্যক্ত শব্দের ব্যক্তাবস্থা বা শব্দের আক্ষরিক স্থূল রূপই মন্ত্র। অথর্ববেদোক্ত বীজমন্ত্রাদিই তন্ত্রে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এইজন্য তন্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দনে একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। এই জন্য পরব্রহ্মকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। এই যে ধ্বনি ইহাই প্রণবমন্ত্র ওঁ। জীব ব্রহ্মের ব্যক্ত স্বরূপ বলিয়া জীবেও সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। জীবদেহে এই ধ্বনি প্রথমতঃ মূলাধারচক্রে উত্থিত হয়, তথায় কুণ্ডলিনী শক্তি মধুকরের ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি উৎপাদন করে। মূলাধারে অতি সূক্ষ্মভাবে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাকে 'পর' এবং তৎপর হৃদয়ে তদপেক্ষা স্থূল যে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাকে 'পশ্যন্তী' বলা হয়। এই ধ্বনি যখন বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হয়, তখন ইহা আরোও স্থূল হয়—তখন তাহাকে মধ্যমা বলা হয়। পরে তদপেক্ষা আরোও স্থূল আকারে যখন মুখ হইতে সেই ধ্বনি বাহির হয়, তখন তাহাকে 'বৈকরী' বলা হয়।

মন্ত্র অসংখ্য, তন্মধ্যে একাক্ষরী মন্ত্রকে 'পিণ্ড', তিন অক্ষরী মন্ত্রকে 'কর্তরী', চারি হইতে নয় অক্ষরী মন্ত্রকে বীজ, দশ হইতে বিংশ অক্ষরী মন্ত্রকে 'মন্ত্র' এবং ততোধিক অক্ষরী মন্ত্রকে 'মালা' বলা হয়। তান্ত্রিক সব মন্ত্রই অতি সংক্ষিপ্ত বিধায় ঐগুলি বীজমন্ত্রের অন্তর্গত। দীক্ষিত হওয়া কালে গুরু এই সব সংক্ষিপ্ত মন্ত্রই প্রদান করেন। এই সংক্ষিপ্ত বীজমন্ত্রই শাখাপ্রশাখা-যুক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। সন্ধ্যা, ন্যাস, পূজা ইত্যাদি এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা এবং কবচ ইহার ফল। মন্ত্র ঠিকভাবে উচ্চারিত না হইলে, তাহা কার্যকরী হয় না। এই জন্য মন্ত্রোচ্চারণের পূর্বে আচমন, মুখশোধন, মন্ত্রচৈতন্য ও মন্ত্রার্থভাবনা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাথমিক ক্রিয়া করিতে হয়। মন্ত্রার্থ ভাবনা এবং মন্ত্রচৈতন্য না করিলে জপসিদ্ধি হয় না।

যাহা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র এবং তাদৃশ অর্থমূলক অনুভূতি চৈতন্য বা ইষ্টদেবতা এবং মন্ত্র-প্রতিপাদক সদর্থগুরু। কোন মন্ত্র জপ করা কালে ইহার অর্থ কি তাহা জানিয়া সেই অর্থ মতে নিজেকে সম্বোধিত করিতে পারিলে মন্ত্র চৈতন্যময় ও ফলদায়ক হয়, নতুবা মন্ত্র মৃত থাকে এবং কোটি জপেও কোনরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যথা তন্ত্রসারে—

'চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষ কোটি শতৈরপি ॥'

মন্ত্রের প্রত্যেকটি অক্ষরের অর্থ জানাই মন্ত্রার্থ ভাবনা। যেমন 'ক্রীং' একটা মন্ত্র। ক+র+ঈ

+√+• এই কয়টী অক্ষর মিলিয়া 'ক্রীং' হইয়াছে। এইস্থলে 'ক' অর্থ কালী, 'র' অর্থ ব্রহ্মা, 'ঈ' অর্থ মহামায়া, √ অর্থ সর্বদুঃখহরা এবং • জগন্মাতা। ইহাই হইল 'ক্রীং' মন্ত্রের অর্থ। এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ জানিয়া সেই সেই মন্ত্রাধিষ্ঠিত দেবতার ভাবনা করাই মন্ত্রার্থ-ভাবনা। মন্ত্রের অনুভূতি কিরূপে হয়, 'সাধনসমর' গ্রন্থে 'তেতুল' শব্দটী মন্ত্র স্থানীয় ধরিয়া নিয়া তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝান হইয়াছে। মনে কর, 'তেতুল' শব্দটী একটা মন্ত্র। যতক্ষণ 'তেতুল' শব্দটীর অর্থবোধ না হয়, অর্থাৎ তেতুল কি তাহা তুমি জানিতে না পার, ততক্ষণ ইহা মৃত শব্দমাত্র। বারবার লক্ষবার তেতুল তেতুল বল বা তাহা জপ কর, কিন্তু তাহাতে তোমার তেতুলবিষয়ক জ্ঞান হইবে না। তারপর কেহ তোমাকে তেতুলের আকার, ইহার আস্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝাইয়া দিল, তখন তেতুলের অর্থজ্ঞান তোমার হইল এবং তেতুল উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অম্লতা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান তোমার ফুটিতে লাগিল। তারপর যখন তেতুল শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই তাহার অম্লতা ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান তোমার অনুভূতি পর্যন্ত ফুটাইয়া তুলে অর্থাৎ যখন দেখিবে, তেতুল বলিলেই তোমার জিহ্বা রসাদ্র হইয়া উঠিয়াছে তখনই বুঝিবে যে, ইহা চৈতন্যময় হইয়াছে।

মন্ত্রচৈতন্য করার বহুবিধ পন্থা তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে। গৌতমীয় তন্ত্রমতে মন্ত্র জপ করা কালে মন্ত্রাক্ষর সমুদয় কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত করিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রবার পদ্মস্থিত পরম শিবের সহিত ঐক্যত্ব সম্পাদন করিলে মন্ত্র চৈতন্যময় হয়। সাধারণ ভাষায় এই জন্য পুরশ্চরণকে মন্ত্র জাগান বলা হয়। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্র জপের নামই পুরশ্চরণ (... পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মন্ত্রের মধ্যেও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গ আছে। পৌরাণিক মন্ত্র সব নপুংসক লিঙ্গ, এইগুলি নমঃ সংযুক্ত। হুংফট সংযুক্ত মন্ত্র পুংমন্ত্র এবং খংস্বাহা সংযুক্ত মন্ত্র স্ত্রীমন্ত্র। কোন্ দেবতার মন্ত্র উচ্চারণে কোন্ লিঙ্গ ব্যবহার করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে।

উপরে মন্ত্র সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হইল, তাহা কেবল বীজমন্ত্রেই প্রযোজ্য। বীজমন্ত্র দেবতাদের ব্যক্ত সূক্ষ্ম বীজ; যেমন 'ক্লীং' কৃষ্ণের সূক্ষ্ম বীজ। কিন্তু ছন্দোবদ্ধও অনেক মন্ত্র আছে এবং সেইগুলি দেবতা বিশেষের ধ্যান, স্তব ও কবচ ইত্যাদি। এই সব মন্ত্রের পূর্বে 'ঋষি' 'দেবতা' ও 'ছন্দ' প্রভৃতির উল্লেখ থাকে। মন্ত্র প্রয়োগ করা গেলে সেই মন্ত্রের ঋষিকে, ছন্দ কি; দেবতা কে এবং কোন্ কার্যে সেই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই সকল শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে, কোন ছন্দে মন্ত্রের সুর ধরিতে হইবে, মন্ত্রের গতি কিরূপ হইবে এবং কোন দেবতার উদ্দেশে ইচ্ছাশক্তি পরিচালনা করিতে হইবে তৎসমস্ত জানিয়া লইতে হয়; যেমন কোন গানের সুর, তাল ইত্যাদি না জানিয়া গান গাহিলে গান ঠিক হয় না, তদ্রূপ মন্ত্রের ও

ছন্দ ইত্যাদি না জানিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে সেই মন্ত্র ফলদায়ক হয় না। 'ঋষি' (১) শব্দ থাকিলে বুঝিতে হইবে মন্ত্রের তাল কি; 'ছন্দ' থাকিলে বুঝিতে হইবে কোন্ সুরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হবে; দেবতা থাকিলে বুঝিতে হইবে কোন্ দেবতার নিকট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে এবং 'বিনিয়োগ' থাকিলে বুঝিতে হইবে কোন কার্যে সেই মন্ত্র নিয়োগ করিতে হবে।

মন্ত্রে অনেকস্থলে ছিন্নাদি দোষ থাকে অর্থাৎ মন্ত্রের কোন অংশ ছাড় হইয়া পড়ে এবং এইভাবে ছাড় পড়িলেই তাহাতে ছিন্নাদি দোষ ঘটে। ছিন্নাদি দোষ থাকিলে মন্ত্র সংশোধিত করিতে হয়, অন্যথা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ হয় না। তন্ত্রে ছিন্নাদি দোষ শান্তিরও উপায় বলা হইয়াছে। মাতৃকা বর্ণদ্বারা মন্ত্রকে পুটিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের পূর্বে ও পরে 'অ' হইতে 'ক্ষ' অবধি বর্ণের এক-একটী বর্ণ যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে হয়। এইরূপে ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিতে হয়। কিন্তু কলি যুগে ইহার চতুর্গুণ অর্থাৎ ৪৩২ বার জপ করার বিধি রহিয়াছে। এইরূপ করিলে ছিন্নাদি দোষের শান্তি হয়।

তন্ত্রমতে কেবল পুরশ্চরণেই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। যদি একবারে মন্ত্র সিদ্ধি না হয় তবে আবার করিতে হয়, যদি তাহাতেও না হয় তবে তৃতীয়বার করিতে হয়। ইহাতেও যদি মন্ত্রসিদ্ধি না হয় তবে মন্ত্রের সংস্কার সাধন করিতে হয়। অর্থাৎ ভ্রামন, বোধন, বশীকরণ, পীড়ন, শোষণ, পোষণ ও দাহন এই সাত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যথা গৌতমীয় তন্ত্রে—

'পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতমন্ত্রো যদি সিদ্ধির্নজায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ॥
ভ্রামণং বোধনং বশ্যং পীড়নং শোষপোষণে।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্যাৎ ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মনুঃ॥'

উপরের লিখিত সাত উপায় ক্রমান্বয়ে অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমটী দ্বারা না হইলে দ্বিতীয়টী, দ্বিতীয়টী দ্বারা না হইলে তৃতীয়টী এইভাবে ক্রমে একটীর পর একটী উপায় অবলম্বন করিতে হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে এইগুলির প্রয়োগবিধি বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কোন মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তি ক্রিয়া না করাইলে সব পণ্ড হয়।

---

(১) ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন ও গতি দুই-ই হয়। গতি অর্থে তাল বুঝায়; বেদে এক এক ঋষির এক এক গতি বা তাল ঠিক করা আছে, সুতরাং 'ঋষি' বলিলেই মন্ত্রের তাল কি তাহা বুঝিয়া লওয়া যায়। 'ঋষি' আবার মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যাস্ক বলিয়াছেন—'ঋষয়োঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, ঋষি দর্শনাৎ—অর্থাৎ ঋষিগণ ঈশ্বর-প্রণীত মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা ঋষি। ঋজু বক্র ও সরলভেদে সুর কম্পন যাঁহার নিকট যে ভাবে প্রথমেই উপস্থিত হয় তিনিই সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি।

তান্ত্রিক মন্ত্র ব্যতীত বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্রও অনেক আছে। বৈদিক মন্ত্রমধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। গায়ত্রীমন্ত্র যথা— "ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।" এই মন্ত্র গান করিয়া ত্রাণ পাওয়া যায় বলিয়া, এই মন্ত্রের নাম গায়ত্রী, ইহার অর্থ—সূর্যদেবস্থিত বরেণ্য ভর্গ বা ব্রহ্ম জ্যোতির আমরা ধ্যান করি, তিনি আমাদিগকে ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভে প্ররোচিত করুন। এই স্থলে বরণীয় ভর্গের উপাসনা করিতে সূর্যকেই প্রতিনিধিস্বরূপ ধরা হইয়াছে। কারণ যে ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছে তাহার বিকাশক্ষেত্র সূর্য। এই গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারাই দ্বিজাতিগণ তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। যাঁহারা তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত তাহার গায়ত্রীমন্ত্র জপের পর আবার তান্ত্রিকী সন্ধ্যাও করেন। প্রদোষে গায়ত্রীদেবীকে ব্রাহ্মীরূপে, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীরূপে, সায়াহ্নে রুদ্রাণীরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই সকল ধ্যেয় মূর্তির রূপ মহানির্বাণ তন্ত্রের ৫ম উল্লাসের ৫৬ হইতে ৬২ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রজপের পূর্বে আচমন, মার্জন, স্নান, মহাসেতু, সেতু, কুল্লুকা, প্রাণায়াম্, অঘমর্ষণ, ঋষিন্যাস ও ষড়াঙ্গন্যাস করিতে হয়। এইরূপ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার নাম সন্ধ্যাহ্নিক। গায়ত্রীমন্ত্র সাধারণত ১০৮ বার জপ করা হয়। বৈদিক মন্ত্র শূদ্র বা স্ত্রীজাতিব পক্ষে উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তান্ত্রিক গায়ত্রীমন্ত্র সর্ব বর্ণের লোকের পক্ষেই উচ্চারণ করার বিধি রহিয়াছে। এই স্থলে তন্ত্র বেদ হইতে অনেক উদার দেখা যায় এবং শাস্ত্রের নিষেধও অপসিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। তান্ত্রিক ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র মহানির্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসের ১০৯ হইতে ১১১ শ্লোকে এবং কালিকাদেবীর গায়ত্রীমন্ত্র ৫ম উল্লাসের ৬২।৬৩ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রীমন্ত্র আছে এবং সকল বর্ণের পক্ষেই ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার বিধি রহিয়াছে। কোন কোন তন্ত্রমতে শূদ্রের প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, আবার কোন কোন তন্ত্রে তাহা নিষিদ্ধ হয় নাই। কালিকাপুরাণ মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া বলেন যে, শূদ্রেরা মন্ত্রের পূর্বে বা পরে একবার মাত্র প্রণব উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় পূর্বে ও পরে উভয়ত্র পারে না।

প্রসেনজিৎ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

বিম্বিসারকে যখন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু নাকি বন্দী করিয়া অনশনে হত্যা করিলেন, তখন প্রসেনজিৎ ভাগিনেয়ের উপর নিদারুণ রুষ্ট হইয়াছিলেন। কোশলদেবী স্বামীর দুঃখে কিছু দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। কোশলদেবীর বিবাহের সময় কাশী নামক যে স্থানটি তাঁহাদের যৌতুক দেওয়া হইয়াছিল, কোনও পিতৃ হন্তার সে স্থানের উপর কিছুমাত্র দাবী থাকিতে পারে না, এই বলিয়া প্রসেনজিৎ কাশী পুনরায় নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু অজাতশত্রু ছাড়িবেন কেন? তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন মাতুলের বিরুদ্ধে। প্রথমটা বিজয়লক্ষ্মী যেন অজাতশত্রুর পক্ষই অবলম্বন করিতেছিলেন, কিন্তু অবশেষে জয়লাভ করিলেন প্রসেনজিৎ। অজাতশত্রু বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কিছুদিন পরে প্রসেনজিতের মনে বুঝি করুণার সঞ্চার হইল, কাজেই তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, মগধের সিংহাসনের উপর দাবী পরিত্যাগ করিলে অজাতশত্রুকে বন্দীদশা হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। উপায়ান্তর না দেখিয়া অজাতশত্রু তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। প্রসেনজিতও প্রসন্ন হইলেন। অজাতশত্রুকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাকে কাশী ত প্রত্যর্পণ করিলেনই, উপরন্তু ভাগিনেয়ের সহিত স্বীয় কন্যা বজিরা র বিবাহও দিলেন।

কোশলদেবী ব্যতীত সুমনা নাম্নী প্রসেনজিতের আর একটী ভগিনী ছিলেন। বুদ্ধের সহিত প্রসেনজিতের প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় সুমনাও সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়েই সুমনা সঙ্ঘে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠে নাই; কারণ তাঁহাদের বৃদ্ধা পিতামহী তখনও জীবিতা, এবং সুমনাই তাঁহার পরিচর্যা করিতেন। একশত কুড়ি বৎসর বয়সে সে বৃদ্ধা ইহলোক ত্যাগ করিলে, সুমনা ভিক্ষুণী হইলেন, এবং পরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। বৃদ্ধার দ্রব্যাদি ভিক্ষুদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহা গ্রহণ করিতে ভিক্ষুগণকে বুদ্ধদেব বিশেষ অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বিনয়পিটকের 'সুত্ত বিভঙ্গে'র একস্থানে প্রসেনজিতের একটী 'চিত্তাগার' ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এই 'চিত্তাগার' সম্ভবতঃ 'চিত্রাগার' বা আর্ট-গ্যালারী। এস্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, মহাকবি ভাসের 'প্রতিমা-নাটকে' যে 'দেবকুলে'র উল্লেখ আছে, তাহা 'মন্দির' নয়, পরন্তু যে কক্ষে বা ভবনে পরলোকগত নৃপতিগণের মূর্ত্তি বা প্রতিমা সংরক্ষিত হইত, তাহা, অর্থাৎ Statue-House। ভাসের যুগে এইরূপ দেবকুল থাকিতে পারিলে, প্রসেনজিতের সময়ে চিত্তাগার বা চিত্রাগার থাকা বিচিত্র কি?

প্রসেনজিতের কতগুলি মূল্যবান হস্তী ছিল, তন্মধ্যে 'সেত' নাম হস্তীটি ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। আর ছিল তাঁহার একটি অষ্টকোণ মণি, যেটিকে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ও অমূল্য জ্ঞান করিতেন, এবং সর্বদা তাঁহার শিরস্ত্রাণে ব্যবহার করিতেন। কথিত আছে, মণিটি নাকি প্রথমে শক্র (ইন্দ্র) কুশকে দিয়াছিলেন, এবং কালক্রমে উহা প্রসেনজিতের হস্তগত হয়। একবার মণিটি কি করিয়া হারাইয়া গিয়াছিল, তখন প্রসেনজিৎ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আনন্দের সাহায্যে মণিটি ফিরিয়া পাওয়া যায়।

'কথাসরিৎসাগরে' (৬।৩১) শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিতের প্রখর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে এক কাহিনী আছে। জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রাবস্তীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে ধার্মিক মনে করিয়া এক বণিক তাঁহাকে শ্রাবস্তীতে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং দিনে দিনে নানা সামগ্রী তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ঐ বণিকের দেখাদেখি অন্যান্য বণিকেরাও খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার ব্রাহ্মণের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের যে ধনসঞ্চয় হইল, তাহা তিনি দূরে বনের মধ্যে এক বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিলেন, এবং ঘন ঘন গিয়া মাটি খুঁড়িয়া দেখিয়া আসিতে লাগিলেন ঐ ধন ঠিক আছে কিনা। একদিন অকস্মাৎ দেখা গেল, ধন অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অনেক কান্নাকাটি করিয়া পরে প্রচার করিলেন, তিনি আত্মহত্যা করিবেন। সকলেই তাঁহাকে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাকি আত্মহত্যা না করিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না! কথাটা শেষ পর্যন্ত গিয়া প্রসেনজিতের কাণে উঠিল। কি বিষম, তাঁহার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হইবে! প্রসেনজিৎ যথাশীঘ্র আসিয়া ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের অপহৃত ধন উদ্ধার করিয়া দিবেনই, না পারিলে তিনি রাজকোষ হইতে ঐ পরিমাণ ধন তাঁহাকে প্রদান করিবেন। অতএব ব্রাহ্মণ ঠাণ্ডা হইলেন। এদিকে রাজা প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া রাজ্যের সমস্ত বৈদ্যদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং একে একে সকলকে একই প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাদের রোগীদের জন্য তাঁহারা কি কি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশেষে একজন বৈদ্য কহিলেন যে, অমুক বণিকের জন্য দুই দিন ধরিয়া 'নাগবলা' নামক ওষধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বণিককে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠান হইল, এবং রাজার প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল তাহার ভৃত্য বন হইতে তাহার জন্য নাগবলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। তখন ভৃত্যটিকে তলব করিয়া পাঠান হইল। ভৃত্য আসিতেই রাজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণের ধন এখনই ফিরাইয়া দাও।" রাজার কথায় ভয় পাইয়া ভৃত্য সকল কথা স্বীকার করিল, এবং ব্রাহ্মণও তাঁহার ধন ফিরিয়া পাইলেন।

প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষীর নাম ছিল মল্লিকা। মল্লিকা ছিলেন কোশলেরই একজন মালাকরের মেয়ে, কিন্তু মালাকারের সন্তান হইলে কি হইবে, তিনি ছিলেন যেমন রূপলাবণ্যময়ী তেমনই প্রভূত গুণশালিনী। মল্লিকার বয়স যখন ষোল, তখন একদিন একটি ভাণ্ডে খানিকটা ঘোল লইয়া কয়েকজন সঙ্গিনী সহ তিনি যাইতেছিলেন পিতার পুষ্পোদ্যান

অভিমুখে। পথে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়া অতি আনন্দে মল্লিকা তাঁহাকে সেই ঘোল অর্পণ করিলেন, এবং পূজা করিলেন। লোকনাথ তাঁহার আনন্দ দেখিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, এবং শিষ্য আনন্দের প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "আনন্দ, এই বালিকা অদ্যই কোশলের পাটরাণী হইবেন।"

ঘটনাক্রমে সেই দিনই রাজা প্রসেনজিৎ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, এবং মল্লিকার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মল্লিকা দেখিলেন, কে একজন আসিতেছেন, এবং তিনি অতিশয় ক্লান্ত। দেখিয়া তিনি রাজার অশ্বের বল্গা ধরিলেন। রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন বালিকা অবিবাহিতা। তারপর রাজা বালিকার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে বালিকা সহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং বালিকাকে তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি বালিকার জন্য একখানি সুসজ্জিত রথ প্রেরণ করিয়া দিলেন, এবং মহাসমারোহে বালিকাকে মালাকারের গৃহ হইতে নিজের প্রাসাদে আনাইয়া তাঁহাকে এক মণি-মুক্তার স্তূপের উপর বসাইয়া দিলেন এবং সেই রাত্রিতেই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এইরূপে মালাকারের দুহিতা হইলেন কোশলের মহারাণী। নূতন মহারাণী কেবল সুন্দরীই নন, তিনি যেমন চতুর, তেমনই তীক্ষ্ণ ছিল তাঁহার বুদ্ধি। রাজাও রাণীর ভারী অনুগত হইয়া উঠিলেন। সমস্যায় বা বিপদে পড়িলেই রাজা গিয়া রাণীর শরণাগত হন বুদ্ধি পরামর্শের জন্য। একবার মল্লিকার বুদ্ধিবলে রাজা কিরূপে অনেকগুলি প্রাণী হত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে একটা আখ্যায়িকা আছে।

শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র ব্যক্তির অতি রূপসী এক পত্নী ছিল। রাজা প্রসেনজিৎ একদিন নগরীর মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে সহসা সেই রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই কামাতুর হইয়া উঠিলেন। অনুসন্ধানে রাজা জানিতে পারিলেন, রমণী বিবাহিতা এবং তাহার স্বামী জীবিত। অতএব রমণীকে লাভ করিতে হইলে স্বামীটিকে বধ করিতে হয়। রাজা ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ঐ নিঃস্ব লোকটিকে তাঁহার প্রাসাদে আনাইয়া তাহাকে ভৃত্যের কর্মে নিয়োজিত করিলেন। যখনই তাহার কর্তব্যে ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তখনই সেই অপরাধে তাহাকে হত্যা করা হইবে, ইহাই ছিল রাজার মনে মনে অভিসন্ধি। কিন্তু দিন যায়—অথচ কোনও কাজেই তাহার কোনও ত্রুটি হয় না। এরূপ কর্তব্যপরায়ণ ও সাবধানী লোক লইয়া রাজা বিপদেই পড়িলেন। অতঃপর রাজাকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায় স্থির করিতে হইল। তাহাকে ডাকিয়া রাজা আদেশ করিলেন, সন্ধ্যাকালে তাঁহার স্নানক্রিয়া সমাপ্তির পূর্বে শতযোজন দূরে দৈত্যদের দেশের এক পুষ্করিণী হইতে কমল ও রক্তমৃত্তিকা আনিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। লোকটা দ্বিরুক্তি না করিয়া যথাসত্বর দৈত্যদের দেশে চলিয়া গেল, এবং তাহাদিগকে কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে ঐ দুই দ্রব্য দিতে বলিল। দৈত্যরাজ এক বৃদ্ধ মনুষ্যের ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার

প্রার্থনা পূর্ণ করিল। এদিকে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁহার সন্ধ্যা-স্নানের বহুপূর্বেই রাজপ্রাসাদের ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। রক্তমৃত্তিকা ও কমল লইয়া ঐ দরিদ্র লোকটি যখন পবনবেগে আসিয়া রাজপ্রাসাদের নিকট পৌঁছিল, তখন সে দেখিল রাজপ্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ, অথচ সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। অগত্যা সে মৃত্তিকা দরজায় ঝুলাইয়া দিয়া সকলকে ডাকিয়া কহিতে লাগিল যে, রাজাজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছে। তারপর সে জেতবন অভিমুখে চলিয়া গেল, রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য। শয়নকালে প্রসেনজিৎ সেই রমণীকে চিন্তা করিতে করিতে কামানলে দগ্ধ হইয়া সেই রাত্রিতে ভাল ঘুমাইতে পারিলেন না। তন্দ্রাঘোরে তিনি নানা দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, এবং চারিবার কেমন একটা ভীষণ বিকট শব্দ শুনিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পরদিন প্রভাতে রাজা ব্রাহ্মণদের সহিত ইহা লইয়া আলোচনা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে বহু প্রাণী বলি দিয়া এক বিরাট যজ্ঞ করিতে বিধান দিলেন। তাহা শুনিয়া রাণী মল্লিকা রাজাকে এইরূপ উদ্ভট বিধানে বিশ্বাস করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিলেন, এবং শেষে তাঁহাকে বুদ্ধের নিকট গিয়া উপদেশ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ করিলেন। অতএব রাজা বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ রাজাকে বুঝাইয়া কহিলেন, ঐ শব্দগুলি আর কিছুই নয়, উহা কেবল কতকগুলি পাপীর যন্ত্রণাভোগ-জনিত চীৎকার। তারপর বুদ্ধ কয়েকটি গল্প বলিলেন। ভয়ার্ত রাজা শান্ত হইলেন, এবং মল্লিকার বুদ্ধিতে অনেকগুলি প্রাণী হত্যার পাপ সঞ্চয় আর তাঁহাকে করিতে হইল না।

বুদ্ধের প্রতি রাণী মল্লিকার অতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। একদা বুদ্ধকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "দেব, ইহ সংসারে কোনও স্ত্রীলোক কুৎসিৎ, কোনও স্ত্রীলোক সুন্দরী, কেহ বা দরিদ্র, কেহ ধনবতী কেন হয়?" বুদ্ধ উত্তর করিয়াছিলেন, "মল্লিকা! যদি কোনও নারী রুক্ষ-প্রকৃতি ও কোপনস্বভাবা হয় ও ভিক্ষাদানে কৃপণতা করে, তবে সে পরজন্মে যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, দরিদ্র ও অসৌভাগ্যশালিনী হইবেই। আর যদি কোনও নারীর স্বভাব কোমল হয়, ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রুদ্ধ না হয়, এবং দানশীলা হয়, তবে সে পরজন্মে সুন্দরী ও ধনবতী হইবেই।"

মল্লিকার একটি কন্যা হইয়াছিল। পুত্রের পরিবর্তে কন্যা জন্মিয়াছে এই বার্তা শুনিয়া মহারাজ প্রসেনজিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধ যখন রাজাকে কহিলেন, অনেকক্ষেত্রে পুত্রাপেক্ষা কন্যাই হয় অধিকতর বুদ্ধিমতী ও বাঞ্ছনীয়া, রাজা তখন আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। মল্লিকা রাজার অত্যন্ত আদরিণী হইলেও, মধ্যে মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনান্তর ও কলহও হইত। একদা দাম্পত্য অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন লইয়া উভয়ের মধ্যে এরূপ কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল যে উহার অবসানের জন্য অবশেষে স্বয়ং বুদ্ধদেবের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইয়াছিল। 'ধম্মপদে'র টীকায় রাণী মল্লিকার একটি কুকুরের সহিত ব্যভিচারের একটি কুৎসিৎ গল্প আছে। মরণের সময় এই দুষ্কর্মের কথা রাণীর স্মৃতিপথে বারবার উদয়

হইয়াছিল। কেবল তাহাই নয়, এই পাপের জন্য মৃত্যুর পর তাঁহাকে সাতদিন নরক ভোগও করিতে হইয়াছিল। মহারাজ প্রসেনজিৎ মল্লিকাব মৃত্যুতে নিবতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পডিয়াছিলেন। মল্লিকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর তিনি সরাসরি বুদ্ধদেবেব নিকটে গিয়া মল্লিকা কোথায় পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন প্রশ্ন করিলেন। রাণী যে নরকভোগ করিতেছেন একথা রাজাকে বলিতে বুদ্ধ ইচ্ছা করেন নাই, অতএব সে প্রশ্ন তাঁহার মন হইতে বিস্মৃত করাইয়া দিলেন। অষ্টম দিবসে, মল্লিকাব নরকভোগের অবসান ঘটিলে, বুদ্ধদেব রাজার প্রশ্নেব উত্তর দিয়াছিলেন, তুষিত-স্বর্গে মল্লিকার পুনর্জন্ম হইয়াছে।

মল্লিকা ব্যতীত প্রসেনজিতের আবও কয়েকটী রাণী ছিলেন, তন্মধ্যে বাসবক্ষত্রিয়াব নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যে বংশে বুদ্ধ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শাক্যবংশীয়দিগেব সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে বদ্ধ হইবার বাসনায় প্রসেনজিৎ সেই বংশেব রাজন্যদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাদের কাহারও একটি কন্যা তাঁহাব হস্তে সম্প্রদান করিতে। কিন্তু সেই সকল রাজন্যবৃন্দ পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত কবিলেন যে ইহাতে তাঁহাদেব বংশেব ঘোবতব অমর্যাদা হইবে। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন আবার প্রসেনজিতেবই অধীনস্থ, সুতরাং সহসা প্রভুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে বাগান্বিত কবিতেও তাঁহাদেব সাহস হইল না। শেষকালে তাঁহারা স্থির কবিলেন যে, কপিলবস্তু হইতে বাসবক্ষত্রিয়া নামে এক বালিকাকে প্রসেনজিতের নিকট পাঠান হউক। বাসবক্ষত্রিয়ার পিতা মহানাম ক্ষত্রিয় হইলেও, বালিকার মাতা এক হীনজাতীয়া ক্রীতদাসী। অতএব বাসবক্ষত্রিযাকে পাঠাইলে শাক্যবংশেব অমর্যাদা হইবার কোনও কারণ নাই, অজ্ঞ রাজাও সন্তুষ্ট হইবেন। বাসবক্ষত্রিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়া প্রসেনজিতের এক রাণী হইলেন। ক্রীতদাসী কন্যার বুদ্ধিটা যে কিরূপ স্থূল ছিল, সে বিষয়ে একাধিক আখ্যান বৌদ্ধসাহিত্যে আছে। বাসবক্ষত্রিযার গর্ভে রাজার এক পুত্র জন্মিল। মল্লিকার পুত্রসন্তান জন্মে নাই, অতএব এই পুত্রের জন্ম সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। রাজার বৃদ্ধা পিতামহী তখনও জীবিতা ছিলেন, এবং রাজা ছিলেন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। বৃদ্ধার নিকট রাজা অবিলম্বে এই আনন্দ বার্তা প্রেরণ করিয়া, শিশুর নামকরণের জন্য একটি নাম স্থির করিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যে মন্ত্রী এই সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেলেন, দুর্দৈববশতঃ তিনি কাণে শুনিতেন কম। বৃদ্ধা নাম কহিলেন "বল্লভ", মন্ত্রী শুনিয়া আসিলেন, "বিড়ূড়ভ" (বা "বিরূঢ়ক")। মন্ত্রীর কথায় কুমারের নাম হইল "বিড়ূড়ভ"।

এই বালকের যখন বয়স হইল সাত বৎসর, তখন সে মাতুলালয়ে গিয়া মাতামহ ও মাতামহীকে দর্শনেচ্ছু হইল। কিন্তু পাছে বাসবক্ষত্রিয়ার আসল পরিচয়টা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি পুত্রকে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিলেন। ক্রমে বালকের বয়স যখন ষোল বৎসর হইল, তখন সে মাতুলালয়ে যাইবার জন্য পুনরায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। অগত্যা বাসবক্ষত্রিয়াকে স্বীকৃতা হইতে হইল। অনেক সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া

বিড়ূডভ কপিলবস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়াই কপিলবস্তুর শাক্যগণ তাড়াতাড়ি বিড়ূডভের বয়োকনিষ্ঠ সকল বালক-বালিকাগণকে স্থানান্তরিত করিয়া দিলেন। যাঁহারা রহিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং কপিলবস্তুতে কেহ বিড়ূডভকে প্রণাম করিল না। বিড়ূডভ ত অবাক! ব্যাপার কি? তিনি একে একে অনেককে এবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, এবং সকলেই ঐ এক উত্তর দিলেন, কপিলবস্তুতে তাঁহাতে প্রণাম করিবার মত কেহ নাই। তবে এটুকু ব্যতীত শাক্যগণ তাঁহার প্রতি অন্য কোনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই, বরং সকল প্রকার আতিথেয়তা তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিড়ূডভ দিন কয়েক কপিলবস্তুতে বাস করিবার পর, তাঁহার সৈন্যদলের এক ব্যক্তি হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইল যে, যে দাসী বিড়ূডভের আসন জল দ্বারা ধৌত করিতেছিল, সে অবজ্ঞাভরে বলিতেছে, "বাসবক্ষত্রিয়া একটা ক্রীতদাসী, আবার তাহারই ছেলের আসন!" সৈনিক কথাটা শুনিয়া তাহা রাষ্ট্র করিয়া দিতে মোটেই দেরী করিল না। ক্রমে ক্রমে কথাটা বিড়ূডভের কাণেও গেল। বিড়ূডভ তখন অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন, এবং শীঘ্রই সমস্ত রহস্যটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রোধে ও দুঃখে বিড়ূডভ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে, "এই শাক্যগণ আমার যে আসন জল দিয়া ধুইতেছে, আমি রাজা হইয়া সে আসন উহাদের রক্ত দিয়া ধুইব।" বিড়ূডভ শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং রাজা প্রসেনজিৎ যখন তাঁহার নিকট হইতে শুনিলেন যে বাসবক্ষত্রিয়া জনৈকা ক্রীতদাসীর কন্যা, তখন ক্রোধে তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, এবং বাসবক্ষত্রিয়া ও বিড়ূডভ উভয়কেই সকল রাজকীয় সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু পরে রাজাকে যখন বুদ্ধ বুঝাইয়া দিলেন যে, পিতার দিক দিয়াই সন্তানের কুল-মর্যাদা গণনীয়, তখন ক্ষত্রিয় মহানামের আত্মজা বাসভক্ষত্রিয়াকে এবং নিজের নন্দন বিড়ূডভকে তিনি পুনরায় তাঁহাদের পুরাতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তক্ষশিলায় বন্ধুল নামে প্রসেনজিতের যে সহপাঠী ছিলেন, তিনি তক্ষশিলা হইতে কুশীনগরে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার দ্বেষ-পরায়ণ জ্ঞাতিগণের উপর বিরক্ত হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে আসিয়া প্রসেনজিতের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। প্রসেনজিৎ বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু! আজ হইতে তুমি কোশলের সেনাপতি।" কর্তব্যনিষ্ঠ বন্ধুলের ঐকান্তিক যত্নে কোশল-রাজ্যের সেনাবলের প্রভূত উন্নতি হইল। বন্ধুলের পত্নীর নামও ছিল মল্লিকা। প্রসেনজিতের রাণী মল্লিকা হইতে তাঁহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে 'বন্ধুল-মল্লিকা' বলা হইয়া থাকে, আর মল্লবংশে জন্ম বলিয়া তিনি 'মল্লরাজপুত্রা' নামেও খ্যাতা। তিনি ছিলেন বন্ধ্যা, কিন্তু বুদ্ধদেবের আশীর্বাদে তাঁহার বন্ধ্যাত্ব মোচন হয়, এবং পরে তিনি ষোলবার পুত্র সন্তান প্রসব করেন, এবং প্রতিবারেই যমজ পুত্র। বত্রিশ পুত্রের জননী মল্লিকা স্বামীর সহিত কোশলে শান্তিতেই দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু একদা জনকয়েক রাজকর্মচারীর চক্রান্তে পড়িয়া প্রসেনজিৎ বন্ধুলের উপর বিষম বিরূপ হইয়া উঠিলেন, এবং

বন্ধুলের বত্রিশ পুত্রসহ রাজ্যের সীমান্তে এক বিদ্রোহ দমন করিতে পাঠাইয়া তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে যেন তাঁহাদের সকলকে হত্যা করা হয়, এই আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞায় বন্ধুল ও তাঁহার পুত্রগণ সকলেই পথিমধ্যে নিহত হইলেন। এই বার্তা যে পূর্বাহ্নে মল্লিকার নিকট আসিয়া পৌঁছিল, সাধ্বী সেই সময় সারিপুত্র ও পাঁচশত ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে ভোজ্য পরিবেশন করিতেছিলেন। বার্তা পড়িয়া লিপিখানি ধীরে ধীরে নিজের বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিয়া বন্ধুল মল্লিকা পুনরায় কর্তব্যে মন দিলেন। নারীর এই অপরিসীম ধৈর্য দেখিয়া সারিপুত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অতিথি সেবা শেষ হইলে, মল্লিকা পুত্রবধূদিগকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়া নিজেই তাহাদিগকে সংবাদটা জ্ঞাপন করিলেন, এবং কহিলেন রাজার বিরুদ্ধে তাহাদের মনে যেন একটুও ক্ষোভ না থাকে, এতটুকু ঘৃণা বা রাগ না হয়। কিন্তু বেশীদিন নয়, অল্পকালের মধ্যেই প্রসেনজিৎ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, বন্ধুলের কিছুমাত্র দোষ ছিল না। অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইতে অবিমৃষ্যকারী রাজা মল্লিকার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে উপকৃত করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। পাষাণী তখন রাজার দিকে চাহিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ! আমাকে আর এই হতভাগিনীগুলিকে দয়া করিয়া কুশীনগরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিন, এই উপকার প্রার্থনা করিতেছি।" শুনিয়া প্রসেনজিতের হৃদপিণ্ডটা কেমন করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল কে জানে, তবে বিধবার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে তিনি বিলম্ব করেন নাই।

কিন্তু বন্ধুলের ভ্রাতুষ্পুত্র দীঘকারায়ণ ঐ সঙ্গে গেলেন না, শ্রাবস্তীতেই তিনি রহিয়া গেলেন। অনুতপ্ত রাজা তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্যের স্থলাভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু দীঘ-কারায়ণ রাজার অপরাধ বিস্মৃত হইলেন না, মনে মনে রাজাকে একটুও ক্ষমা করিলেন না। তিনি অতিশয় রাজনীতিজ্ঞ এবং চতুর ব্যক্তি ছিলেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' (৫।৫) এক 'দীঘচারায়ণ' নামক এক রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির, এবং বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' 'চারায়ণ' নামক কামশাস্ত্র-প্রণেতা এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, এই চারায়ণ ও দীর্ঘচারায়ণ এবং দীঘকারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। এই অনুমান অসঙ্গত নয়। দীঘকারায়ণ প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

একদা বুদ্ধদেব যখন মেদতলুম্প বা উলুম্প নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, রাজা প্রসেনজিৎ সেইস্থানে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। বুদ্ধদেবের কক্ষে প্রবেশের পূর্বে রাজা নিজ মুকুট, তরবারি প্রভৃতি খুলিয়া সেনাপতি দীঘকারায়ণের হস্তে দিয়া গেলেন। দীঘকারায়ণ এইবার সুযোগ বুঝিয়া রাজার দেহরক্ষিদের সহ ত্বরিত পদে শ্রাবস্তীতে গিয়া বিড়ূড়ভকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। প্রসেনজিতের জন্য ছিল শুধু দ্বারের বাহিরে একটি অশ্ব ও একজন দাসী। বাহিরে আসিয়া সেই দাসীর মুখে সমস্ত শুনিয়া প্রসেনজিৎ উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজগৃহের অভিমুখে চলিলেন, অজাতশত্রুর সাহায্য

লাভের আশায়। কিন্তু তখন যে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। নগরীর দ্বারগুলি তখন রুদ্ধ, খুলিবারও উপায় নাই। নগরীর বহির্ভাগে ছিল এক কুটির, পথশ্রান্ত রাজা উদ্বেগে ও শঙ্কায় অগত্যা সেইখানেই আশ্রয় লইলেন, এবং নিশাবসানের পূর্বেই সেই তমসাচ্ছন্ন কুটিরে তাঁহার জীবন-প্রদীপটি নিভিয়া গেল। পরদিন এই সংবাদ গেল অজাতশত্রুর কাণে, তিনি যথাযোগ্য সমারোহের সহিত তাঁহার মাতুল ও শ্বশুরের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বিড়ূড়ভের বিরুদ্ধে তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু মন্ত্রিগণের পরামর্শে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন, পিতৃহন্তা অজাতশত্রুই বিড়ূড়ভকেও পিতৃ-বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অনুমান ভ্রমাত্মক। প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যদি কেহ ষড়যন্ত্র করিয়া থাকে, তবে সে দীঘকারায়ণ।

রাজা হইয়া বিড়ূডভ তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কপিলবস্তুর অনেকানেক শাক্যদিগকে স্ত্রী-শিশু নির্বিশেষে হত্যা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে, পেপিস্ সাহেবের জমিদারী পিপ্‌রাবায় প্রাপ্ত লিপিসংযুক্ত কৌটায় যে ছাই ছিল, উহা বিড়ূড়ভের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্যবহন করিতেছে, অর্থাৎ সেই ছাই ঐ সকল শাক্যদিগের ছাই, বুদ্ধের চিতাভস্ম নয়। জানিনা একথা কতখানি সত্য, কিন্তু পরে একদা ঘটনাচক্রে অচিরাবতী নদীর তীরে শয়ন কালে, বন্যার জল আসিয়া বিড়ূডভকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাঁহার আর কোনও সন্ধানই মিলিল না।

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কাল নিরূপণ*

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি, এ

দ্বৈতাদ্বৈত (ভেদাভেদ) সিদ্ধান্ত নামে যে বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন শ্রীনিম্বার্কাচার্য—যিনি ছিলেন শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদ্যাচার্য। এই সম্প্রদায় "সনৎ" সম্প্রদায়, বা "হংস" সম্প্রদায়, বা "ঋষি" সম্প্রদায় অথবা "সনকাদি" সম্প্রদায় নামেও পরিচিত। শ্রুতির উপদেশসমূহ সংগ্রহ করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস যে বেদান্তদর্শন প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা "ব্রহ্মসূত্র" নামে পরিচিত। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব সর্বশ্রুতিসিদ্ধ। বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের যে দ্বিরূপতাই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রীনিম্বার্কাচার্য "বেদান্ত পারিজাতসৌরভ" নামক বেদান্তভাষ্যে বিবৃত করিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক বা শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আরও কয়েকটী নাম দৃষ্ট হয়; যথা—নিম্বাদিত্য, সুদর্শন, আরুণি, নিয়মানন্দ এবং হরিপ্রিয় (হরিপ্রিয়াচার্য)। নিম্বভাস্কর নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আচার্য সর্বপ্রথমে নিয়মানন্দ নামেই পরিচিত ছিলেন.—তাঁহার জন্মভূমি তৈলঙ্গদেশে (দাক্ষিণাত্যে)। তিনি নিয়মানন্দচার্য নামেই সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে, নিম্নলিখিত অলৌকিক ঘটনা হইতে তাঁহার নাম "নিম্বার্ক" বলিয়া বিখ্যাত হয়। তিনি ছিলেন শ্রীভগবানের সুদর্শন অবতার; পিতার নাম অরুণ ঋষি, মাতার নাম শ্রীজয়ন্তীদেবী, জন্মস্থান তৈলঙ্গদেশের গোদাবরী নদীর তটে বেদূর্যপত্তন নামক গ্রামে। অরুণ ঋষির পুত্র বলিয়া নিয়মানন্দ আরুণি ঋষি নামেও পরিচিত ছিলেন। নিয়মানন্দের বাল্যকালে এক দিন বেলাবসানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এক সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়া, অরুণ ঋষির অনুপস্থিতি সময়ে, তাঁহার আশ্রমে আসিয়া শ্রীজয়ন্তী দেবীর নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন। সেই সময় গৃহে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য না থাকায় শ্রীজয়ন্তী দেবী লজ্জায় মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন সন্ন্যাসীরূপী

---

* মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা "গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড "বেদান্তদর্শনের" (শ্রীনিম্বার্কাচার্য-কৃত ভাষ্যসহ) সর্বপ্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি পাদ টীকায় লিখিয়াছেন, "নিম্বার্ক-ভাষ্যের কাল নিরূপণ করা হয় নাই।" কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত সারদা প্রসন্ন দাস রায় বাহাদুর মহাশয়ের লিখিত "দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ" নামক পুস্তকের এক স্থলে আছে, "দুঃখের বিষয় এযাবৎ কেহই নিম্বার্কভাষ্যের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। স্বনাম-খ্যাত স্যর আর, জি, ভাণ্ডারকার একটিমাত্র নিম্বার্কস্থান হইতে সংগৃহীত গুরুপরম্পরা অবলম্বনে বোধ হয় যথোচিত গবেষণা না করিয়াই তৎপ্রণীত একটি পুস্তকের পাদটীকায় কয়েক পংক্তির মধ্যে একটা স্বকপোলকল্পিত মত প্রচার করিয়াছেন, কেহ কেহ বিনা বিচারে তাহাই সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।" আমার ন্যায় অখ্যাত ও অপণ্ডিত ব্যক্তির এই প্রকার প্রবন্ধ লেখা ধৃষ্টতা মাত্র; কেবল সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করার উদ্দেশে এই চেষ্টা—যাহাতে নিম্বার্কের কাল সম্বন্ধে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

ব্রহ্মা, গৃহে খাদ্যাভাব বুঝিতে পারিয়া গমনোদ্যত হইলে, বালক নিয়মানন্দ মাতৃসমীপে গিয়া বলিলেন, "মা, অতিথিসৎকার না করিয়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দিলে আশ্রমধর্মের প্রত্যবায় হইবে।" মাতা বলিলেন, "বৎস, তুমি সত্যই বলিয়াছ, গৃহে ফলমূল কিছুই নাই; যদিও তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাও সূর্যাস্তের পূর্বে অসম্ভব। সন্ন্যাসীরা সন্ধ্যার পর আহার করেন না।" এই কথা শুনিয়া নিয়মানন্দ সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া বিনীত-ভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আমি অবিলম্বে আপনার আহারের জন্য অরণ্য হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি, এবং আমি নিশ্চয়রূপে বলিতেছি যে, আপনার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সূর্যাস্ত হইবে না।" এই কথায় প্রীত হইয়া সন্ন্যাসী তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খাদ্যসংগ্রহের জন্য অরণ্যে যাইবার পূর্বে নিয়মানন্দ স্বীয় সুদর্শন তেজ আশ্রমস্থ একটী নিম্ববৃক্ষে স্থাপন করিলেন। এই তেজ সূর্যের প্রভা বিস্তার করিতে লাগিল। যত সত্বর সম্ভব বালক নিয়মানন্দ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং স্বীয় জননীকে প্রদান করিলেন। জয়ন্তীদেবী সেই ফলমূল আহার্যরূপে প্রস্তুত করিয়া বিনয়ের সহিত সন্ন্যাসীকে নিবেদন করিলেন। সন্ন্যাসীর আহার শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই নিয়মানন্দ নিম্ব বৃক্ষ হইতে স্বীয় সুদর্শন তেজ অপসারিত করিলেন। তখন দেখা গেল যে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া সন্ন্যাসী অতিথি ও মাতা জয়ন্তী দেবী বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা নিয়মানন্দকে "নিম্বার্ক" (নিম্ব+অর্ক, অর্থাৎ নিম্ববৃক্ষের সূর্য) নাম প্রদান করিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

এই নিম্বার্ক নাম হইতেই নিম্বাদিত্য বা নিম্বভাস্কর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবানের সুদর্শন অবতার বলিয়া তাঁহাকে "সুদর্শন" নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে ভবিষ্য পুরাণে প্রমাণ যথা—

"সুদর্শনোদ্বাপরান্তে কৃষ্ণাজ্ঞপ্তোজনিষ্যতি।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্মগ্লানিং হরিষ্যতি॥

ভবিষ্যপুরাণে "নিম্বার্ক" এবং "নিম্বাদিত্য" এই উভয় নামই দৃষ্ট হয়। উপরে যে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যপুরাণে সামান্য পরিবর্তিত আকর দৃষ্ট হয়।

"কার্ত্তিকস্য সিতে পক্ষে পূর্ণিমায়াং বৃষে বুধৌ।
কৃত্তিকাভে মহারম্যে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে॥
সূর্যাবসানসময়ে মেষলগ্নে নিশামুখে।
জয়ন্ত্যাং জয়রূপিণ্যাং জজান জগদীশ্বরঃ॥"

ভবিষ্যপুরাণের এই উক্তি হইতে দেখা যায় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জন্ম কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমাতে গোধূলি সময়ে হইয়াছিল।

আচার্যের "হরিপ্রিয়" নাম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এবং পরবর্তী গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

"কপালবেধ" প্রথা মতে একাদশী পালন শ্রীনিম্বার্কাচার্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পক্ষে বাধ্যতামূলক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীশৌনক ঋষি বলিতেছেন,—

"কপাল-বেধমিত্যাহুরাচার্যা যে হরিপ্রিয়াঃ।" দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীকেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন ভারত-বিখ্যাত আচার্য ছিলেন। তিনি গীতার "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। টীকার শেষে তিনি সাতটী শ্লোক লিখিয়া গ্রন্থের উপসংহার করেন। তন্মধ্যে ষষ্ঠ শ্লোকটী যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অপর নাম "হরিপ্রিয়" ছিল। শ্লোকটী যথা—

"ব্যাখ্যাতমাদৌ তদদভ্রবোধাদাচার্যবর্যেণ হরিপ্রিয়েণ।
নিম্বার্কনাম্নাঽতিগভীর বোধং শ্রীনারদানুগ্রহ ভাজনেন॥"

শ্রীভগবানের প্রিয় আয়ুধ সুদর্শনের অবতার বলিয়া আচার্যের অন্যতম নাম "হরিপ্রিয়।" একাদশীব্রত পালনে কপালবেধবিধি নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবশ্যপালনীয়,—এই প্রসঙ্গে ভবিষ্য পুরাণে ও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

"নিম্বার্কো ভগবান্যেষাং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ।
উদয়ব্যাপিনীগ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে॥"

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবনের কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্যক্তিগত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বিষয়ে মহাপুরুষেরা চিরদিনই উদাসীন। তাঁহাদিগের অমর কীর্ত্তিই তাঁহাদিগকে যুগে যুগে স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি যে প্রাচীন ঋষি ছিলেন সন্দেহ নাই।

শ্রীনিম্বার্কার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন,—

১। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ (বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য)।
২। মন্ত্ররহস্যষোড়শী।
৩। প্রপন্নকল্পবল্লী।
৪। বেদান্তদশশ্লোকী।
৫। প্রপত্তিচিন্তামণি।
৬। সদাচারপ্রকাশ।
৭। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাবাক্যার্থ।
৮। প্রাতঃস্মরণাদি স্তোত্র।
৯। শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ।
১০। শ্রীসুদর্শনকল্প।
১১। শ্রীরজদেবীপঞ্চাঙ্গ।
১২। বংশীতন্ত্র।

গোবর্দ্ধন হইতে অনতিদূরে নিম্বগ্রামে নিম্বার্কাচার্যের তপোভূমি অদ্য পর্যন্ত বিরাজিত। তথায় রীতিমত সেবাপূজার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য—প্রণীত গ্রন্থাবলীর সবিশেষ পরিচয় দেওয়া বা তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর রচিত গ্রন্থাদির আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই সকল বিষয়ে অনেকেই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং ইহাতে মতবিরোধ দৃষ্ট হয় না। বর্তমান প্রবন্ধ লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য,—নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবের সময় নিরূপণ, অথবা নিম্বার্কভাষ্যরচনার কাল নিরূপণ। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব কাল লইয়া যত মতবিরোধ দৃষ্ট হয়, সম্প্রদায়-প্রবর্তক অন্য কোন মহাপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সেইরূপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক এবং পক্ষপাতশূন্য হইয়া কেবল সত্যানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া এই বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইবে।

এক দিকে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্বে,—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালে শ্রীনিম্বার্কাচার্য শ্রীকৃষ্ণকে নন্দগৃহে দর্শন করিয়া তাঁহার সুবিখ্যাত "শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ" রচনা করিয়াছিলেন,—পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐতিহাসিক শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বর্তমানে কেহ কেহ তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক বি, এল্, মহাশয়ের "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। এই স্থলে একটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা স্বামী ধনঞ্জয় দাসজী মহারাজ প্রণীত মদীয় গুরুদেব ১০৮ শ্রী স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের জীবন চরিতের এক স্থলে লিপিবদ্ধ আছে·—
"এই (নিম্বার্ক) সম্প্রদায়ের এক ধারার পরম্পরাক্রমে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহংসভগবান্ হইতে পঞ্চপঞ্চাশত্তম (৫৫) পুরুষ।" (৩৮৮ পৃষ্ঠা)

উপরিলিখিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পরে শিলং হইতে আমার অপর গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন শর্মাচৌধুরী মহাশয় ৬।১১।৪০ ইং তারিখের পত্রে আমাকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে মাত্র দুইটী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

(১) "বাবাজী মহারাজের জীবনচরিতের এক জায়গায় পড়িয়াছি যে, আমাদের বাবাজী মহারাজ শ্রীশ্রীহংস ভগবান্ হইতে ৫৫ পুরুষ, ইহার বৎসর সংখ্যার গণনা দেওয়া হয় নাই। ৫৫ পুরুষে কত বৎসর হইল, অবশ্যই জানিবার বিষয়।"

(২) "শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় "পুরাণ প্রবেশ" গ্রন্থে প্রত্যেক পুরুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল নির্ণয় করিবার যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেইমতে এই "সন্" (হংস) সম্প্রদায়ের আয়ুষ্কাল জন্মেজয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।"

যাঁহারা এই "সন্" বা "হংস" বা "ঋষি" সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্বের প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক শ্রীমদ্ভাগবতে (১) দ্বিতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায় (২) দশম স্কন্ধে ৮৭তম অধ্যায়, এবং (৩) একাদশ স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বহুপূর্ব হইতে এই প্রাচীন ঋষি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্য এই সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক নহেন, তিনি মানব সমাজে এই সম্প্রদায়ের প্রচারকমাত্র বা আদ্যাচার্য। শ্রীযুক্তপ্রমোদ বাবুর পত্রে ইহাও তিনি লিখিয়াছিলেন যে, শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ তিনি বাবাজী মহারাজের কোন গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রমোদবাবু যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কর্তৃক লিখিত "দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত" নামক একটী প্রবন্ধ। ইহা "শিবপুরে শ্রীশ্রীনিম্বার্ক আশ্রম স্থাপন উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধ।" এই মুদ্রিত প্রবন্ধের ৩২ পৃষ্ঠায় এইরূপ উক্তি আছে,—"আমাদের সম্প্রদায়ে এইরূপ কিম্বদন্তীও পরম্পরারূপে চলিয়া আসিয়াছে যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হইয়াছিলেন।"

শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রচলিত ইহাই একমাত্র কিম্বদন্তী নহে। সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত-দিগের সঙ্কলিত হিন্দী এবং সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হইতে আরও কতকগুলি কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) দ্বারভাঙ্গা হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কিশোর দাস বিরচিত "বেদান্ততত্ত্ব-সুধা" নামে "সবিশেষ নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের" একখানি ব্যাখ্যা পুস্তক হিন্দীভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে দেখিতে পাই যে, শ্রীনিয়মানন্দের (নিম্বার্কাচার্যের) দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দেবর্ষিপ্রবর নারদ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রীনিম্বার্কাচার্য ব্রজভূমিতে আসিয়াছিলেন এবং নন্দগৃহে সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পঞ্চবিংশ শ্লোকাত্মক এই শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ রচনা করিয়াছিলেন।

(২) কাশী সংস্কৃত (সীরিজ) পুস্তকমালার ৯৯ সংখ্যক গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য কৃত ভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকাদাস কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমদ্ ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে চিত্রকেতুর উপাখ্যানে "আরুণি" ঋষির নামের উল্লেখ আছে, এবং শ্রীনারদ ভগবান্ কৃত 'ভক্তিসূত্রেও" আরুণি ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত বেদবিষয়ক বিচার প্রসঙ্গে বেদব্যাসের উক্তিতে নিম্বার্কাচার্যের নামের উল্লেখ থাকায় উভয়ের সমকালিকত্ব প্রমাণিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে (কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর) শরশয্যায় পতিত মহাত্মা ভীষ্মকে দর্শন করিবার মানসে যাঁহারা সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুদর্শনও ছিলেন। "সুদর্শন" শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অন্যতম নাম।

(৩) পূর্বোক্ত সংস্কৃতে লিখিত ভূমিকার শেষভাগে শ্রীনিবাসাচার্যের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের পট্টশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য যুধিষ্ঠির সম্বৎ ৮৮৪ বর্ষে পৃথিবীতে বিরাজ করিয়াছিলেন।

(৪) বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত দানবিহারী লাল শর্মা কর্তৃক লিখিত "শ্রীনিম্বার্কাবতরণ" নাটকে তৃতীয় অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্যে রাজা ব্রজনাভ ও শ্রীনিম্বার্ক মুনির কথোপকথন দেখা যায়, রাজা বজ্রনাভ ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র।

(৫) শ্রীনিম্বার্ক মহাসভা হইতে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত "শ্রীসুদর্শন" নামক ত্রৈমাসিক পত্রের ১৯৯২ সম্বৎ মাঘ সংখ্যার ৮৯ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত শ্রীবালকৃষ্ণজী শর্মাজ্যোতিষমহোপাধ্যায় লিখিত "শ্রীনিম্বার্ক জন্মলগ্ন" নামক একটী অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির ৬ শকে শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক সময় হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ প্রচলিত। উপরিলিখিত কিম্বদন্তী গুলির মধ্যে মোটেই সত্য নাই। যদিও আধুনিক পণ্ডিতগণ মহাভারত যুদ্ধের কাল, জন্মেজয়ের রাজত্বকাল প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন, সুতরাং বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেই সকলের বিস্তৃত আলোচনা করা এই স্থলে অনাবশ্যক মনে করি। কারণ, স্বয়ং শ্রীনিম্বার্কাচার্য এবং তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য তাঁহাদের রচিত ভাষ্য মধ্যে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় শ্রীনিম্বার্কাচার্য বুদ্ধদেবের পরে আবির্ভূত হইযাছিলেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ কর্তৃক বেদান্ত দর্শনের নিম্বার্কভাষ্য ও তাহার ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য বলিতেছেন,— "সুগতমতং নিরাকরোতি"। বাবাজী মহারাজের ব্যাখ্যায় আছে, "(সুগত = বৌদ্ধ)। বৌদ্ধমত সূত্রকার খণ্ডন করিতেছেন।" এই দ্বিতীয় পাদের ৩৩ হইতে ৩৭ সূত্রের ভাষ্যে আমরা দেখিতে পাই যে ভাষ্যকার শ্রীনিম্বার্কাচার্য জৈনমত এবং পাশুপত মত খণ্ডন করিতেছেন। জৈন ধর্মের প্রচারক ছিলেন মহাবীর। তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে প্রাণত্যাগ করেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে। জন্ম ৫৬৩ খ্রী° পূর্ব অব্দ, এবং মৃত্যু ৪৮৩ খ্রী° পূর্ব অব্দ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে মহাভারতের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। মহাভারত-আশ্রিত গণনায় গণিত-লব্ধ ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ খ্রী' পূ° অব্দ অর্থাৎ ঠিক ২৫২৬ শক-পূর্বকাল।

১৯৮৯ বিক্রমসংবতে বৃন্দাবন হইতে পূর্বোক্ত "শ্রীনিম্বার্কাবতরণ" নামক নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তৃতীয়দৃশ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সহিত বুদ্ধশিষ্য যোগাচারের কথোপকথন দেখিতে পাই।

বেদান্তদর্শণের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য "ইতি বুদ্ধবচনাৎ" বলিয়া কয়েকটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—পরবর্তী ২৮ সংখ্যক সূত্রভাষ্যে "উক্তঞ্চ বিপ্রভিক্ষুণা" বলিয়া একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যতদূর অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাতে বোধহয় যে উপরিলিখিত কিম্বদন্তী-সমূহের মূল কারণ,—বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ৮ম সূত্রের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কোক্তি,—"পরমাচার্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্‌গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টঃ" ইত্যাদি।—ব্যাখ্যা, "পরমাচার্য শ্রীসনৎ কুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।"

তবে উপরি উদ্ধৃত অংশ মধ্যে দুইটী পদের ("পরমাচার্যৈঃ" এবং "অস্মদ্‌গুরবে") অর্থ আমার নিকট যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—পরমার্যৈঃ—মোক্ষমার্গ প্রদর্শকৈঃ (অর্থাৎ মোক্ষমার্গ প্রদর্শক)

অস্মদ্‌গুরবে,—অস্মাকং গুরবে (নারদায়) আমাদিগের সম্প্রদায়ের গুরুকে; নারদ হইলেন মোক্ষমার্গাবলম্বিগণের গুরুস্থানীয়।) এই প্রকার ব্যাখ্যাও সম্ভবপর।

এই স্থলে একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, শ্রীনিবাসাচার্য স্বীয়ভাষ্যে লিখিতেছেন,—"শ্রীমন্নারদেন পৃষ্টো নিজগুরুর্মোক্ষশাস্ত্রাচার্যঃ শ্রীসনৎকুমারঃ"—অর্থাৎ নারদ স্বীয়গুরু মোক্ষশাস্ত্রাচার্য শ্রীসনৎকুমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এইস্থলে একটী কথা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। নারদের শিষ্য হইতে হইলেই যে নিম্বার্কাচার্যকে মহাভারতের যুগে যাইতে হইবে, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ নারদ চিরজীবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইকথা বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরাও অস্বীকার করিতে পারেন না। নারদ চিরজীবী না হইলেও নিম্বার্কাচার্যকে দীক্ষা দান করা অসম্ভব নহে। বেদান্ত দর্শনের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ২২ সংখ্যক সূত্রের টীকার ব্যাখ্যায় বাবাজী মহারাজ বলিয়াছেন যে, "সর্বতোভাবে মুক্ত সনকাদি আচার্য এবং নারদ প্রভৃতিও ভক্তসাধকগণকে দর্শন দিয়া থাকেন, ইহা সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে।"—সুতরাং যদি কেহ বলেন যে, নিম্বার্কের সাক্ষাৎ নারদশিষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে, তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে আমাদের বলিবার এই কথাই আছে। এই সম্বন্ধে আর একটী উত্তর পাওয়া যাইবে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের "আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ" গ্রন্থের ১ম সংস্করণের ৩৮০—৮৩ পৃষ্ঠায় গৌড়পাদাচার্যের সহিত শঙ্করাচার্যের সহিত শঙ্করাচার্যের যে প্রকার সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা হইয়াছিল ইহাও সেই প্রকার। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের গুরুপরম্পরা এইরূপ;—যথা, বিষ্ণুযামলে,—

"নারায়ণ-মুখাম্ভোজান্মন্ত্রস্ত্বষ্টাদশাক্ষরঃ।
আবির্ভূতঃ কুমারৈস্তু গৃহীত্বা নারদায় চ॥
উপদিষ্টঃ স্বশিষ্যায় নিম্বার্কায় তেন তু।"

১। নারায়ণ (হংস ভগবান্)
|
২। কুমার বা চতুঃসন্ (সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার)
|
৩। নারদ
|
৪। নিম্বার্ক

আদিগুরু ভগবান্ নারায়ণ (হংসভগবান) যে কেবল নিম্বার্ক সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব এবং তাঁহাদের গুরু পরম্পরাতেই দেখা যায় তাহা নহে। শঙ্কর সম্প্রদায়ে এবং রামানুজ সম্প্রদায়েও দেখা যায় যে, আদিগুরু ভগবান্ নারায়ণ। তবে শঙ্কর সম্প্রদায়ের কোন মতে নারায়ণ প্রথম এবং কোন মতে দ্বিতীয়। শঙ্কর সম্প্রদায়ে অন্ততঃ চারিটী ভিন্ন ভিন্ন গুরুপরম্পরা প্রচলিত।

(ক) **সন্ন্যাস পদ্ধতিমতে**

১। ব্রহ্ম ২। বিষ্ণু
৩। রুদ্র ৪। বশিষ্ঠ
৫। শক্ত্রি ৬। পরাশর
৭। ব্যাস ৮। শুক
৯। গৌড়পাদ ১০। গোবিন্দপাদ
১১। শঙ্করাচার্য

(খ) **কাশীর সন্ন্যাসীগণ মতে**

১। নারায়ণ ২। ব্রহ্মা
৩। বশিষ্ঠ ৪। শক্ত্রি
৫। পরাশর ৬। ব্যাস
৭। শুক ৮। গৌড়পাদ
৯। গোবিন্দপাদ
১০। শঙ্করাচার্য

(গ) **দাক্ষিণাত্য মতে**

১। মহেশ্বর
২। নারায়ণ
৩। ব্রহ্মা
৪। বশিষ্ঠ
৫। শক্তি
৬। পরাশর
৭। ব্যাস
৮। শুক
৯। গৌড়পাদ
১০। শঙ্করাচার্য

(ঘ) **দক্ষিণমার্গতন্ত্র মতে**

১। কপিল ২। অত্রি
৩। বশিষ্ঠ ৪। সনক
৫। সনন্দন ৬। ভৃগু
৭। সনৎসুজাত ৮। বামদেব
৯। নারদ ১০। গৌতম
১১। শৌনক ১২। শক্তি
১৩। মার্কণ্ডেয়
১৪। কৌশিক
১৫। পরাশর
১৬। শুক
... ...
... ...
৭০। গোবিন্দ
৭১। শঙ্করাচার্য

(ক্রমশঃ)

সংহিতা-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

৩৮। **যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা**—এই সংহিতায় তিনটিমাত্র অধ্যায় আছে। জিজ্ঞাসু মুনিগণ মিথিলায় গমন করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে তিনি যাহা বর্ণনা করেন, তাহাই এই ধর্মশাস্ত্রে নিবদ্ধ। আলোচিত ২০ খানি সংহিতারই উল্লেখ ইহাতে আছে। সাধারণ আচার, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির বিধি ইহাতেও আছে। এই সংহিতায় দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা দেখিতে পাই—

"দৈবে পুরুষকারে চ কর্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং পৌরুষং পৌর্বদেহিকম্॥
কেচিদ্দৈবাৎ স্বভাবাচ্চ কালাৎ পুরুষকারতঃ
সংযোগে কেচিদিচ্ছন্তি ফলং কুশলবুদ্ধয়ঃ॥
যথা হ্যেকেন চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিদ্ধ্যতি॥" ১।২৪৮-৫১

এই সংহিতায় গণেশজননী অম্বিকা দেবীর পূজার ব্যবস্থা আছে। পূজান্তে "চণ্ডীর" অনুরূপ প্রার্থনা-বাক্যও দেখিতে পাই—

"রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥" ১।২৯১

ইহাতে যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশও আছে—

(ক) "অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ম্
ধ্যেয় আত্মা স্থিতো যোঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ॥" ৩।

(খ) "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথক্ ভবেৎ
তথাত্মৈকোঽপ্যনেকস্তু জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥" ৩।১৪৪

সাধন বিষয়ে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তির সুবিধা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা আছে—

"বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ
তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিগচ্ছতি॥ •
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥" ৩।১১৫-১৬

৩৯। **উশনঃ-সংহিতা**—উশনা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট দুইখানি ধর্মশাস্ত্র আছে, একখানির নাম "ঔশনস ধর্মশাস্ত্র", অপর খানির নাম "ঔশনস স্মৃতি"। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যেরই অপর নাম উশনা। এইজন্য এই শাস্ত্র "শুক্র-সংহিতা" নামেও প্রসিদ্ধ। প্রথমখানির প্রারম্ভে কোনও প্রশ্ন নাই। গ্রন্থখানি একটিমাত্র অধ্যায়ে সমাপ্ত। গ্রন্থারম্ভেই আছে—

"অত পরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তিবিধানকম্
অনুলোমবিধানঞ্চ প্রতিলোমবিধিং তথা ॥"

এই শাস্ত্রখানিতে অনুলোম বিলোমক্রমে জাত বিবিধ জাতির উৎপত্তিমাত্র বর্ণিত আছে। অন্যান্য সংহিতার ন্যায় ইহাতে কোনও প্রকার বিধিই নাই। দ্বিতীয় খানিতে দেখিতে পাই, শৌনকাদি মুনিগণ, শুক্রাচার্যের নিকট উপস্থিত হইয়া যাবতীয় ধর্মশাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—

"শৌনকাদ্যশ্চ মুনয়ঃ ঔশনং ভার্গবং মুনিম্
নত্বা প্রপচ্ছুরখিলং ধর্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ॥"

উত্তরে শুক্রাচার্য যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেন, তাহারই নাম "ঔশনসস্মৃতি"। ইহাতে নয়টি অধ্যায় আছে। গুরুজনদিগের কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহা বিশেষ-ভাবে ইহাতে উপদিষ্ট আছে। পিতা ও মাতাকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

"নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসমং গুরুঃ
তয়োঃ প্রত্যুপকারোঽপি ন হি কশ্চন বিদ্যতে ॥" ১।৩৬

ভিক্ষা, শৌচ, আচমন, অধ্যয়ন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির ব্যবস্থা ইহাতে আছে। বেদাধ্যয়নের প্রকর্ষণ সর্বশাস্ত্র বর্ণিত থাকিলেও, শুক্রাচার্যের মতে বেদান্তের বিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, সে অধ্যয়ন নিষ্ফল শ্রমমাত্র—

"ন বেদপাঠমাত্রেস্তু সন্তুষ্টো বৈ দ্বিজোত্তমঃ
পাঠমাত্রাবসানস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥
যোঽধীত্য বিধিবদ্ বেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ
স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাত্রং ন প্রপদ্যতে ॥" ৩।৮১-৮২

শ্রাদ্ধাদি বিষয়ের বিধির মধ্যে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য এই সংহিতায় বর্ণিত আছে—

"গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ যদি শ্রাদ্ধং সমাচারৎ
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিম্ ॥" ৩।১৩৬

৪০। **অঙ্গিরঃ-সংহিতা**—এই ধর্মখানি সাধারণতঃ "আঙ্গিরস-স্মৃতি" নামে পরিচিত। ইহাতে একটিমাত্র অধ্যায় আছে। গ্রন্থারম্ভে কোনও প্রশ্নকর্তার নাম নাই। মহর্ষি অঙ্গিরা স্বয়ংই প্রায়শ্চিত্ত বিধি বর্ণনা করিতেছেন—

"গৃহাশ্রমেষু ধর্মেষু বর্ণানামনুপূর্বশঃ
প্রায়শ্চিত্তং বিধিং দৃষ্ট্বা অঙ্গিরামুনিরব্রবীৎ ॥"

এই সংহিতায় নীলিবৃক্ষ নীলিদারু ও নীলিবস্ত্রের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভারতবর্ষে সে সময়ও নীলের চাস হইত।

৪১। **যম-সংহিতা**—গ্রন্থখানি সাধারণতঃ যমস্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে একটি মাত্র অধ্যায় আছে। কোনও প্রকার প্রশ্নকর্তা বা বক্তার নাম নাই। সংহিতাখানির শেষ ভাগে কেবলমাত্র দেখিতে পাই—

"অজ্ঞানাত্তু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং হিতকাম্যয়া
ময়া প্রোক্তমিদং শাস্ত্রং সাবধানোঽবধারয়॥"

এবং গ্রন্থশেষবাক্যে দেখি—"ইতি যমপ্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রং সমাপ্তং"। এই গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্তবিধিই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভেও দেখি চতুর্বর্ণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি বর্ণনা করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—

"অথাতো হ্যস্য ধর্মস্য প্রায়শ্চিত্তাভিধায়কম্
চতুর্ণামপি বর্ণানাং ধর্মশাস্ত্রং প্রবর্ততে॥"

৪২। **আপস্তম্ব সংহিতা**—এই ধর্মশাস্ত্রের আদি বক্তা মহর্ষি আপস্তম্ব। মুনিগণের প্রশ্নে তিনি যে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, তাহাই এই সংহিতায় সন্নিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানির আদিতে দেখিতে পাই, অপর কেহ পুনরায় সেই উপদেশ বর্ণনা করিতেছেন—

"আপস্তম্বং প্রবক্ষ্যামিঃ"...

কিন্তু পরবর্তী বক্তার নাম নাই। সংহিতাখানিতে দশটি অধ্যায় আছে। ইহাতে শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধিই প্রধানভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শুচি-অশুচি সম্বন্ধে একটি সুন্দর উক্তি দেখিলাম—

"আত্মশয্যা চ বস্ত্রঞ্চ জায়াপত্যং কমণ্ডলুঃ
আত্মনঃ শুচিবেতানি পরেষামশুচীনি তু॥" ২।৪

ক্রোধের দোষ প্রদর্শন করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন যে, অসি ও সর্প দূরে অবস্থান করে, কিন্তু ক্রোধ দেহে অবস্থান করিয়াই সেই দেহ বিনাশ করে, অতএব ক্রোধ, সর্প ও অসি অপেক্ষাও তীক্ষ্ণ—

"ন তথাসিস্তথা তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা দুরেঽধষ্ঠিত
যথা ক্রোধো হি জন্তুনাং শরীরস্থঃ বিনাশকঃ॥" ১০।৪

ক্ষমা গুণের প্রশংসা করিয়া মহর্ষি তাঁহার একটিমাত্র দোষ দেখাইয়াছেন যে, ক্ষমাবান্ লোককে সাধারণে অশক্ত ও দুর্বল মনে করে—

"একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ॥" ১০।৫

যম সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক এই সংহিতায় আছে—

"ন যমং যমমিত্যাহুরাত্মা বৈ যম উচ্যতে
আত্মা সংযমিতো যেন তং যমঃ কিং করিষ্যতি ॥" ১০।৩

৪৩। **সম্বর্ত্ত-সংহিতা**—ঋষিগণ মহর্ষি সম্বর্ত্তকে বলিয়াছিলেন—

"যথাবদ্ধর্মমাচক্ষ শুভাশুভাশুভবিবেচনম্"

তদুত্তরে মহর্ষির উক্তিগুলিই এই সংহিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে একটি মাত্র অধ্যায় আছে। সন্ধ্যোপাসনা ও গায়ত্রী-জপের বিশেষত্ব ইহাতে বর্ণিত আছে। শুদ্ধি প্রায়শ্চিত্তাদির বিভিন্ন বিধি নির্দেশ করিয়া মহর্ষি বলিয়াছেন যে একমাত্র গায়ত্রী জপ ও সব্যাহৃতি প্রাণায়াম দ্বারাই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—

'মহাব্যাহৃতিসংযুক্তাং প্রাণায়ামেন সংযুতাম্
গায়ত্রীং প্রজপন্ বিপ্রঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" ১।২১৫

এই সংহিতারও শেষভাগে দেখিতে পাই—

"ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যং সম্বর্ত্তেন ভাষিতম্"

কাজেই অনুমিত হয়, মহর্ষি সম্বর্ত্তের উপদেশ অপর কোনও বক্তা বর্ণনা করিয়াছেন। এই পরবর্তী বক্তার নাম এই গ্রন্থে নাই।

৪৪। **কাত্যায়ন-সংহিতা**—শাস্ত্রখানি "কাত্যায়ন স্মৃতি" নামে প্রচলিত। গ্রন্থারম্ভে কোনও প্রশ্নকর্তা বা প্রশ্নের উল্লেখ নাই। মহর্ষি কাত্যায়ন স্বয়ংই গোভিল গৃহ্যসূত্রাদি সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য স্পষ্টতা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্মণাম্
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্ দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ ॥"

সংহিতাখানি তিন ভাগে বিভক্ত; এক এক ভাগকে এক এক "প্রপাঠক" বলা হইয়াছে। ইহার অধ্যাগুলির নাম খণ্ড। প্রথম প্রপাঠকে ১০খণ্ড (১-১০), দ্বিতীয় প্রপাঠকে ৯ খণ্ড (১১-১৯) এবং তৃতীয় প্রপাঠকে ১০ খণ্ড (২০-২৯) আছে। এই সংহিতায় আচমন তর্পণ, সন্ধ্যোপাশণ, শ্রাদ্ধ, অগ্নি-উৎপাদন ও অগ্নি-সংস্কার বিধি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায়শ্চিত্ত, শৌচশুদ্ধি প্রভৃতির বিধি নাই। ইহাতে গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা প্রভৃতি মাতৃকাবর্গের শেষে—"ইতি কর্মপ্রদীপপরিশিষ্টে কাত্যায়ন বিরচিতে…" পাঠ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রপাঠকের শেষে—"ইতি কাত্যায়ন বিরচিতে কর্মপ্রদীপে" পাঠ আছে। গ্রন্থ সমাপ্তি পাঠ—"সমাপ্তা চেয়ং কাত্যায়নসংহিতা"।

(ক্রমশঃ)

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত **অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ**

উপমান—উপমিতির করণ—উপমান। উহা সাদৃশ্যজ্ঞান, সুতরাং গুণবিভাগে অন্তর্ভূত[১]।

শব্দ প্রমাণ—যাহা যথার্থ শাব্দবোধের করণ তাহা শব্দপ্রমাণ। উহা পদজ্ঞান, গুণের অন্তর্গত[২]।

সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্তমতে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই প্রমাণ পদার্থ। ঐ বৃত্তি জ্ঞানবিশেষ[৩]। জৈন এবং বৌদ্ধমতেও প্রমাণ জ্ঞানস্বরূপ। ন্যায়মতে অনুমান উপমান এবং শব্দপ্রমাণ জ্ঞানস্বরূপ। কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের স্বরূপ বিষয়ে অন্যসম্প্রদায়ের সহিত নৈয়ায়িকের মত বিরোধ ঘটিয়াছে।

সাধারণতঃ কোন বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে কেহ উহা গ্রহণযোগ্য মনে করে, কেহ বা উহা ত্যাজ্য বলিয়া স্থির করে, যাহারা উহা হইতে অভীষ্ট অথবা অনিষ্ট কিছুরই সম্ভাবনা করে না তাহারা ঐ প্রকার প্রত্যক্ষবস্তুবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে। ত্রিবিধ লোকের জ্ঞাত বিষয়ে উৎপন্ন উক্তপ্রকার জ্ঞানসমূহ উপাদান অর্থাৎ গ্রহণ বুদ্ধি, হান অর্থাৎ ত্যাগবুদ্ধি, এবং উপেক্ষাবুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। প্রমাণের ফল বস্তুজ্ঞান ইহাই প্রসিদ্ধ। কিন্তু "এই সকল

---

১. সাদৃশ্যজ্ঞানের ব্যাপার অতিদেশবাক্যার্থস্মরণ। প্রাচীনমতে উহাই উপমান প্রমাণ।

২. 'শব্দ রূপ প্রমাণ এই অর্থেই সাধারণতঃ "শব্দপ্রমাণ" কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নব্যসম্প্রদায় শব্দের সাক্ষাৎ করণত্বপক্ষে দোষ প্রদর্শন করিয়া "পদ"রূপ শব্দবিশেষের জ্ঞানকেই শাব্দবোধে করণ বলিয়াছেন। এই শব্দ প্রধানতঃ বেদ, কিন্তু ঋষি বা অন্য কোনও যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির উক্তিও হইতে পারে। পদজ্ঞানের প্রতি কারণ হওয়ায় পদগুলি শব্দবোধ-প্রমার পরম্পরায় কারণ (অর্থাৎ শাব্দবোধের কারণ পদ জ্ঞান তাহার কারণ) হওয়ায় নব্যেরা কথঞ্চিৎ প্রচলিত ব্যবহার সমর্থন করিতে পারেন। তবে এই মতে "শাব্দপ্রমাণ" কথাটী ব্যবহার করাই ভাল। যাহারা জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদকেই শাব্দবোধে করণ বলেন তাহাদিগের মতে শব্দপ্রমাণ ও প্রমাণশব্দ এই দুইটী কথার কোনও কষ্টকল্পনা করিতে হয় না। পদজ্ঞানের ব্যাপার পদার্থজ্ঞান, উহা পদের বৃত্তি অর্থাৎ শক্তি অথবা লক্ষণা জ্ঞান বশতঃ উৎপন্ন প্রত্যেক পদের অর্থবিষয়ক জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং সকল মতেই শব্দপ্রমাণ গুণবিভাগে অন্তর্ভূত। ভাট্টসম্প্রদায়মতে শব্দবোধে পদজ্ঞান অথবা জ্ঞানীয় বিষয়তাপন্ন পদ করণ নহে কিন্তু ঐ সকল পদার্থই করণ। সুতরাং ভাট্টমতে শাব্দপ্রমাণ স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত। ৯৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. ২১ পৃঃ টিপ্পনী এবং ৯০-৯১ পৃঃ জ্ঞান নিরূপণ দ্রষ্টব্য। 'প্রমাণ বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ' পাতঞ্জলসূত্র, সমাধিপাদ।

বুদ্ধি অর্থাৎ উপাদানবুদ্ধি, হানবুদ্ধি বা উপেক্ষাবুদ্ধিই প্রমাণের ফল" এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ঐ সকল বুদ্ধি নিয়মিতরূপে বস্তুজ্ঞানের পরে উৎপন্ন হওয়ায় সর্বত্র বস্তুজ্ঞানই প্রমাণ হইয়া দাঁড়ায়[১]। এই প্রকারে প্রমাণ বিষয়ে বহুমতের সামঞ্জস্য সম্ভব হইলেও তাহা সকলের রুচিকর হয় নাই। কারণ, তাহাতে ফলবৈচিত্র্য মনোরম হয় না। বিশেষতঃ ঐ সকল হানোপাদনাদি বুদ্ধি নির্দিষ্ট প্রমাণ উৎপত্তির বহুক্ষণ বিলম্বে উৎপন্ন হওয়ায় উহাকে প্রমাণের ফলরূপে নির্দেশ করা কতদূর সঙ্গত তাহাও বিচার্য[২]। জরন্নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের মতে জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ সমুদায়ই প্রমাণ। ভট্টমতে ভাববস্তুর জ্ঞানে জ্ঞানই প্রমাণের স্বরূপ, অভাবজ্ঞানে জ্ঞানোৎপাদক কারণের অভাবই প্রমাণ।

(২) প্রমেয়

(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) মনঃ (৬) বুদ্ধি, (৭) প্রবৃত্তি (৮) দোষ, (৯) ফল, (১০) দুঃখ, (১১) প্রেত্যভাব, এবং (১২) অপবর্গ এই দ্বাদশটী পদার্থ ন্যায়সূত্রের প্রমেয়[৩]।

(১) আত্মা—যাহা চেতন, অর্থাৎ সাক্ষাৎজ্ঞানের আশ্রয় তাহাই আত্মা। আত্মা দ্রব্যের অন্তর্গত[৪]।

(২) শরীর—যাহা ভোগের আয়তন অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপী হইয়াও যে বস্তুটি অবলম্বন করিয়া সুখ দুঃখের অনুভব করে তাহা শরীর। ইহাই চেষ্টা (ক্রিয়াবিশেষ) ইন্দ্রিয় এবং অর্থের (সুখ ও দুঃখের) আশ্রয়[৫]। শরীর দ্রব্যের অন্তর্গত।

---

১. প্রমাণতায়াং সামগ্র্যাস্তজ্‌জ্ঞানং ফলমিষ্যতে। তস্য প্রমাণভাবে তু ফলং হানাদিবুদ্ধয়ঃ॥ ৬৬পৃঃ ন্যায়মঞ্জরী। 'বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা। যদা সন্নিকর্ষস্তদাজ্ঞানং প্রমিতিঃ যদজ্ঞানং তদাহনোপাদনোপেক্ষা বুদ্ধয়ঃ ফলং' ১।১।১ ন্যায়সূত্র ভাষ্য।

২. ন্যায়মঞ্জরী।

৩. আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-মনো-বুদ্ধিপ্রবৃত্তি-দোষ-ফল-দুঃখ-প্রেত্যভাবাপ বর্গাস্তু প্রমেয়ং ১।১।৯ ন্যায়সূত্রে প্রমেয় শব্দটী "পরিভাষাস্ত অর্থাৎ এই শাস্ত্রেই ব্যবহারযোগ্য বিশেষ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা উল্লিখিত দ্বাদশটী বস্তুরই সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে। যাহা প্রমার বিষয় তাহাই প্রমেয় (প্র + মা (কর্মণি) য) এই যোগার্থ গ্রহণ করিলে যাবতীয় পদার্থকেই প্রমেয় বলা যায়। শাস্ত্রেও অনেক স্থলে ঐরূপ বলা হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যে অন্য অনেক প্রমেয়ের অস্তিত্বের কথাও পাওয়া যায়।

৪. ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গং ১।১।১০ ন্যায়সূত্র। আত্মা কি এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ বিষয়ে বিভিন্ন মতসকল যুক্তি সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩৯-৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্" ১।১।১১ ন্যায়সূত্র। ২২, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৩) ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়গুলি দ্রব্যের অন্তর্গত। ইহাদের লক্ষণ এবং অন্তর্ভাব প্রকার পূর্বে বলা হইয়াছে[১]।

(৪) অর্থ—যাহা পঞ্চবিধ বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় উহাদিগকেই "অর্থ" বলা হইয়াছে[২]। উহাদিগের নাম—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ। এই বস্তুগুলি গুণের অন্তর্গত।

(৫) বুদ্ধি—ইহা জ্ঞানের নামান্তর অতএব গুণে অন্তর্ভূত[৩]।

(৬) মন—ইহা দ্রব্যের অন্তর্গত[৪]।

(৭) প্রবৃত্তি—বাক্, বুদ্ধি (অর্থাৎ মন) ও শরীরের কার্যকে প্রবৃত্তি বলে।[৫]

বাক্‌প্রবৃত্তি—বাগিন্দ্রিয়ের কার্য, উহা শব্দ বিশেষ, অতএব গুণের অন্তর্গত।

বুদ্ধিপ্রবৃত্তি—পরের অপকারেচ্ছা, লোভ, দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি বুদ্ধিপ্রবৃত্তি। উহারা গুণের অন্তর্গত।

শরীরপ্রবৃত্তি—হিংসা, চৌর্য, সেবা, আর্ত্তত্রাণ প্রভৃতি শরীরপ্রবৃত্তি। ইহারা কর্মের অন্তর্গত।

(৮) দোষ—প্রবৃত্তির হেতু[৬]। উহা রাগ, দ্বেষ এবং মোহ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

রাগশ্রেণী—কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ। ইহারা ইচ্ছাবিশেষ[৭] সুতরাং গুণের অন্তর্গত।

দ্বেষশ্রেণী—ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ইত্যাদি। ইহারা দ্বেষবিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত।

মোহশ্রেণী—মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা (সংশয়) মান (অভিমান) প্রমাদ ইত্যাদি। ইহারা জ্ঞানবিশেষ এজন্য গুণে অন্তর্ভূত।

---

১. "ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রানীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ" ১।১।১২, ন্যায়সূত্র। মনের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় ১২শ সূত্রস্থ "ইন্দ্রিয়" শব্দটী কেবল "বহিরিন্দ্রিয়" বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

২ "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দাঃ পৃথিব্যাদিগুণাস্তদর্থাঃ" ১।১।১৪ ন্যায়সূত্র।

৩, বুদ্ধিরুপলব্ধিজ্ঞানমিত্যনর্থান্তরম্" ১।১।১৫ ন্যায়সূত্র। ৪০, ৯০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪ যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গম্" ১।১।১৬ ন্যায়সূত্র। ৩৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. "প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" ১।১।১৭ ন্যায়সূত্র। "প্রবৃত্তি" শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ যত্ন (২১তম গুণ)। বিশ্বনাথের মতে শব্দপ্রয়োগের অনুকূল যত্ন বাক্‌প্রবৃত্তি। হত্যা সেবা ইত্যাদি চেষ্টার জনক যত্ন শরীরপ্রবৃত্তি। এতদ্ভিন্ন যে যত্ন দয়া লোভ প্রভৃতির হেতু উহা বুদ্ধিপ্রবৃত্তি। এই মতে সমস্ত প্রবৃত্তিই গুণে অন্তর্ভূত।

৬. "প্রবর্ত্তনা লক্ষণদোষাঃ" ১।১।১৮ ন্যায়সূত্র।

৭. ৮৩ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। মৎসর—যে বস্তু দান অথবা উপভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অন্যকে সেইরূপ বস্তু গ্রহণে বাধাদানেচ্ছা। রাজকীয় জলাশয় হইতে জলপান কালে পিপাসার্ত ব্যক্তির প্রতি নিকটস্থ কর্মচারীর এবং উত্তম বুদ্ধিমেধাসম্পন্ন ছাত্রের প্রতি উহার সহপাঠী ছাত্রদিগের মৎসরের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিশেষ পরিচয় ব. সা. প. প্রকাশিত ন্যায়দর্শনে ৪র্থ অধ্যায় ১ম আহ্নিকের ৩য় সূত্রে দ্রষ্টব্য।

(৯) প্রেত্যভাব—পুনর্জন্ম। আত্মা সর্বব্যাপী তথাপি একের আত্মা অন্য দেহে উৎপন্ন সুখ দুঃখাদি অনুভব করিতে পারে না কিন্তু একটী আত্মা কোন এক দেহেই সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এজন্য প্রত্যেক জীবাত্মার নির্দিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক। উহা সংযোগবিশেষ। অন্য দেহ অথবা ঘট পটাদির সহিত ঐ আত্মার যে সংযোগ হয় তাহা হইতে ঐ সংযোগ বিজাতীয়। উহাকে "অবচ্ছেদকতা" বলে। এই অবচ্ছেদকতা-সংযোগের নাশই মৃত্যু এবং উহারই উৎপত্তিকে আত্মার জন্ম বলা হয়। এই জন্ম-মৃত্যু প্রবাহের প্রথম আবম্ভ নাই অর্থাৎ কখন সর্বপ্রথম জন্ম হইল তাহা নিরূপণ করা যায় না এজন্য ইহা অনাদি—যুগ যুগান্তর পর্যন্ত চলিতেছে। কিন্তু মুক্তি হইলে আর জন্ম মৃত্যু সম্ভব হয় না বলিয়া উহা অপবর্গান্ত। অতএব প্রেত্যভাব সংযোগ-বিশেষ সুতরাং গুণের অন্তর্গত[৪]।

(১০) ফল—সুখ ও দুঃখের সংবেদন অর্থাৎ সাক্ষাৎকারই ফল। সাক্ষাৎকার জ্ঞান বিশেষ সুতরাং ইহা গুণে অন্তর্ভূত[১]।

(১১) দুঃখ—গুণের অন্তর্গত[২]।

(১২) অপবর্গ—দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি অপবর্গ বা মুক্তি। দুঃখের কারণ শরীরাদিও গৌণ দুঃখ। গৌণ ও মুখ্য সর্ববিধ দুঃখের মূলোচ্ছেদ হইলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভব হয়। এই অপবর্গ দুঃখপ্রাগভাবের অসমকালীন অর্থাৎ যে কালে ভাবি কোনও দুঃখ জন্মিবে না তৎকালীন দুঃখধ্বংস স্বরূপ[৩] হওয়ায় অভাবের অন্তর্গত।

(৩) সংশয়

সংশয়—ইহা জ্ঞানবিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত[৩]।

---

১. "প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলম্" ১।১।২০ ন্যায়সূত্র। মুখ্য ও গৌণ ভেদে ফল দ্বিবিধ। সুখ ও দুঃখের সংবেদন মুখ্যফল। তদ্ভিন্ন শরীরাদি বস্তু গৌণফল। সকল প্রকার কার্য বস্তু বুঝাইতে "ফল"শব্দ শাস্ত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

২. "বাধনালক্ষণং দুঃখং" ১।১।২১ ন্যায়সূত্র। ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" ১।১।২২ ন্যায়সূত্র। শ্রীমদ্‌গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে অনুমান খণ্ডের শেষভাগে অপবর্গ দুঃখের অত্যান্তভাব অথবা দুঃখের প্রাগভাব কিংবা দুঃখের ধ্বংস স্বরূপ এই তিন মতেরই উপন্যাস করিয়াছেন। সকল মতেই উহা অভাবস্বরূপ অতএব সপ্তম পদার্থের অন্তর্গত। মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ন্যায় ও বৈশেষিকের এই একই সিদ্ধান্ত। সংক্ষেপশারীরিকগ্রন্থে দেখা যায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য বলিতেছেন "অক্ষপাদমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির সহিত আনন্দ সংবেদনই মুক্তি। ঐ উক্তির মূল অনুসন্ধেয়।

৪ "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" ১।১।১৯ ন্যায়সূত্র। আত্মনিরূপণ ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) প্রয়োজন

প্রয়োজন—যে উদ্দেশ্যে লোক কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা প্রয়োজন। উক্ত উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—সুখ ও দুঃখাভাব।

সুখ গুণের অন্তর্গত। দুঃখাভাব অভাবে অন্তর্ভূত[১]।

(৫) দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত—বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে যে ক্ষেত্রবিশেষে একমত উহা দৃষ্টান্ত[২]।

বিচারস্থলে দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা দেখা যায়। মনে করা যাউক্ পর্বতে অগ্নি আছে কি না এই প্রকার সন্দেহ হইল। তখন বাদী এক পক্ষ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—পর্বতঃ বহ্নিমান্ (পর্বতে অগ্নি আছে) প্রতিবাদী আশঙ্কা করিয়া বলিল—কুতঃ অর্থাৎ কিসে বুঝিতেছ পর্বতে অগ্নি আছে? বাদী উত্তর করিলেন—ধূমাৎ (ধূম দেখিয়া উহা বুঝা যায়)।

প্রতিবাদী পুনরায় প্রশ্ন করিল—সতি ধূমে বহ্নিরবশ্যম্ভাবী ইত্যপি কুতঃ অর্থাৎ ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই ইহাই বা কেন?

বাদী তদুত্তরে বলিলেন—যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্ অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম আছে সেই সকল স্থানেই অগ্নি আছে, যেমন রন্ধনশালা।

'ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই' ইহা সমর্থনের জন্য বাদী 'যো যো ধূমবান্' ইত্যাদি বাক্যের শেষে রন্ধনশালাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, রন্ধনশালায় ধূম ও অগ্নি উভয়েরই অস্তিত্ব বিষয়ে বাদীর সহিত প্রতিবাদী একমত। অতএব এইস্থলে মহানস দৃষ্টান্ত হইতে পারিল। মহানস গৃহবিশেষ পার্থিববস্তু সুতরাং দ্রব্যের অন্তর্গত। এই প্রকারে যদি মহানসে বহ্নির সন্দেহ পর্বতে এবং বহ্নি ও ধূমের অস্তিত্ব উভয়ের স্বীকৃত হয় তবে পর্বত দৃষ্টান্ত হইবে। এ স্থলেও উহা দ্রব্যের অন্তর্গত।

বিচারের বিষয় নানাবিধ। সুতরাং উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের প্রত্যেকটীই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। অতএব দৃষ্টান্ত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভূত।

---

১. "যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎ প্রয়োজনং" ১।১।২৪ ন্যায়সূত্র। এস্থানে কেবল মুখ্য প্রয়োজনেরই অন্তর্ভাব প্রদর্শিত হইল। ঐ দ্বিবিধ মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় গৌণ প্রয়োজন। উহা অর্থোপার্জ্জন, যাগপ্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান ইত্যাদি প্রকারে অসংখ্য, কিন্তু প্রত্যেকটীই উল্লিখিত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত।

২. "লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং সদৃষ্টান্তঃ" ১।১।২৫ ন্যায়সূত্র। নব্যন্যায়শাস্ত্রে অন্বয়ীদৃষ্টান্ত ও ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত এইরূপে দ্বিবিধ দৃষ্টান্তের কথা পাওয়া যায়। উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগের বৈচিত্র্য বশতই ঐরূপ ভেদ স্বীকৃত হয়, উহাতে বস্তুগত কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না বলিয়া উহার বিভাগ করা হয় নাই।

৩. 'সমানানেকধর্মোপপত্তের্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ ১।১।২৩ ন্যায়সূত্র। ১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৬) সিদ্ধান্ত

'এই বস্তু এই প্রকারই হইবে' এইরূপে স্বীকৃত ধর্মবিশেষবিশিষ্ট ধর্মীকে সিদ্ধান্ত বলে। যথা—ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়, আত্মা জ্ঞানাদিগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয় নানা ও নির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রাহক, মন ইন্দ্রিয় ইত্যাদি[১]।

উল্লিখিত উদাহরণে ইন্দ্রিয়ত্ব-ধর্ম বিশিষ্ট ঘ্রাণাদি, জ্ঞানাদি ধর্ম বিশিষ্ট আত্মা, বহুত্ব ও নির্দিষ্ট বিষয়ক জ্ঞানজনকত্বধর্ম বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্ম বিশিষ্ট মন দ্রব্যে অন্তর্ভূ্ত।

দৃষ্টান্ত পদার্থের ন্যায় সিদ্ধান্ত ও যথা সম্ভব উক্ত সপ্ত পদার্থে অন্তর্ভূ্ত[২]।

(৭) অবয়ব

প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পাঁচটী বাক্য অবয়ব[৩]। বাক্য শব্দ বিশেষ। অতএব অবয়বগুলি সমস্তই গুণে অন্তর্ভূ্ত।

---

১. সিদ্ধান্তের এই অন্তর্ভাব ভাষ্যানুসারে বর্ণিত হইল। উদ্দ্যোতকর উদয়ন প্রভৃতি আচার্যগণ "উক্ত প্রকারে বস্তুর স্বীকারই সিদ্ধান্ত" এইরূপে সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বীকার জ্ঞানবিশেষ। সুতরাং এই মতে সিদ্ধান্ত গুণে অন্তর্ভূ্ত

২. ন্যায়সূত্রে সিদ্ধান্তের কোন স্পষ্ট সামান্যসংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। তদনুসারে চারিটী উদাহরণ দেওয়া হইল। সিদ্ধান্তের উদাহরণ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। বিশেষজিজ্ঞাসুগণ ১।১।২৬-২৭ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে উহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত ন্যায়দর্শন ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড ২৩২—২৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

৩. 'অবয়ব' বলিলে সাধারণতঃ অংশই বুঝায়। যেমন হস্ত পদ প্রভৃতি, উহারা শরীরের অবয়ব। প্রকৃত স্থলে (১) পর্বতো বহ্নিমান্ (২) ধূমাৎ (৩) যো যো ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্ (৪) বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ (৫) তস্মাৎ বহ্নিমান্' এই পাঁচটী সম্পূর্ণ বাক্যকে ন্যায় বলে। উহার অন্তর্গত প্রত্যেক বাক্য ন্যায়ের অংশ বলিয়াই উহাদিগকে ন্যায়াবয়ব বা সংক্ষেপে অবয়ব বলে। অন্য সকল বাক্য হইতে এই ন্যায়াবয়বের বৈলক্ষণ্য আছে। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী বাক্য উক্তরূপে যথাক্রমেই প্রয়োগ করিতে হইবে, ক্রম বৈপরিত্যে (অর্থাৎ প্রথমে হেতু বা উদাহরণ পরে প্রতিজ্ঞা এই প্রকারে) প্রয়োগ করা চলিবে না। প্রতিজ্ঞাদি পাঁচটী বাক্য একই ব্যক্তির অবিরলক্রমে প্রয়োগ করিতে হইবে। একজন প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিল তৎপরে অন্য একজন হেতুবাক্য বলিলে কিংবা একজন দীর্ঘ প্রতিজ্ঞার পরে দীর্ঘকাল বিলম্বে হেতু বাক্য বলিলে উহা 'ন্যায়' হইবে না। এমন কি প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিবার পরে নিগমন সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত অন্য কথা বলাও ন্যায় সম্মত নহে। পরন্তু মত বিশেষে প্রতিজ্ঞা বাক্যের দুইবার উচ্চারণ চলিতে পারে কিন্তু অন্য কোন অবয়বের একাধিক উচ্চারণও দোষাবিচার স্থলে উক্ত পাঁচটী বাক্যই প্রয়োগ করা উচিত। তবে যে সকল স্থানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য বলিয়া বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই স্বীকৃত সেখানে উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক। ঐ সকল স্থানে চারিটী অবয়বেই ন্যায় সম্পূর্ণ হইবে।

অতি প্রাচীনগণ কেবল উপনয়রূপ একাবয়ব বাদ, বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষ উদাহরণ এবং উপনয় এই দ্বি-অবয়ব-বাদ মীমাংসকেরা কেহ প্রতিবাদি ত্রি-অবয়ববাদ কেহ বা উদাহরণাদি ত্রি-অবয়ববাদ মানিতেন। ন্যায়ভাষ্যে প্রতিজ্ঞাদি

প্রতিজ্ঞা—ইহা সাধ্য-ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর নির্দেশক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলে। যথা—পর্বতো বহ্নিমান্ (এস্থলে বহ্নি সাধ্য-ধর্ম পর্বত ধর্মী) এই বাক্য প্রতিজ্ঞা[১]।

হেতু—পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হেতুবোধক পদকে হেতু বলে। যথা—ধূমাৎ (বহ্নির অনুমানে ধূম হেতু, "ধূম" শব্দে ৫মীর একবচন যোগ করিলে "ধূমাৎ" হয়)।

উদাহরণ—যে বাক্য হইতে পর্যবসানে 'হেতুঃ সাধ্যব্যাপ্যঃ' হেতু সাধ্যে ব্যাপ্য এই প্রকারে প্রকৃত হেতু বস্তুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে তাহাকে উদাহরণ বলে। যথা—"যো যো ধূমবান্, স বহ্নিমান্, যথা মহানসম্" এই বাক্য।[২]

উক্ত বাক্য হইতে প্রথমে 'মহানসে ধূম আছে বহ্নিও আছে এবং মহানস ব্যতীত অন্যত্রও ধূম আছে বহ্নিও আছে" এই প্রকারে বুদ্ধি জন্মে তার পরে "ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি অনুভূত হয়।

উপনয়—যে বাক্য হইতে পক্ষে সাধ্যব্যাপ্য হেতুর অস্তিত্ব বুঝা যায় তাহাকে উপনয় বলে। যথা "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বতঃ" এই বাক্য।

নিগমন—যে বাক্য হইতে সাধ্যে ব্যাপ্তি ও পক্ষবৃত্তিত্ব বিশিষ্ট হেতুর জ্ঞাপ্যতা-বিষয়ক বুদ্ধি জন্মে তাহাকে নিগমন বলে। যথা—"তস্মাৎ বহ্নিমান্' এই বাক্য।

উপনয় বাক্য হইতে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি এবং পর্বতে (পক্ষে) অস্তিত্ব অবগত হওয়া গিয়াছে। তাহার পরেই নিগমন বাক্য। উহার অন্তর্গত 'তদ্' শব্দের অর্থ বহ্নিব্যাপ্য (অথচ) পর্বতবৃত্ত ধূমঃ। ৫মী বিভক্তির অর্থ জ্ঞাপ্যত্ব অর্থাৎ "পক্ষ বহ্নিব্যাপ্যহেও বিশিষ্ট' এই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন কোন জ্ঞানের বিষয়ত্ব। "পর্বত সাধ্যব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট" এইরূপ জ্ঞান হইবার পরেই

পাঁচটী (৬) জিজ্ঞাসা (৭) সংশয় (৮) শক্যপ্রাপ্তি (৯) প্রয়োজন (১০) ও সংশয় ব্যুদাস প্রাচীন নৈয়ায়িক সম্মত এই দশাবয়ববাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিবাদির স্বরূপ সহজে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে বৃত্তের অনুস্মরণ করা হয় নাই এবং নির্দোষ লক্ষণের জন্যও চেষ্টা করা হয় নাই।

১ প্রতিজ্ঞা বাক্যে ধর্মিবোধক পদ প্রথমেই প্রয়োগ করিতে হইবে তৎপরে সাধ্যবোধক পদ প্রযুক্ত হইবে এইরূপ নিয়ম নব্যমতে স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে, ঐরূপ স্থলে 'বহ্নিমান পর্বতঃ' এইভাবে প্রয়োগ করিলে উহাকে প্রতিজ্ঞা বলা যায় না। কিন্তু ভাষ্যাদি প্রাচীনগ্রন্থে সাধ্যবোধক পদেরই প্রথম নির্দেশ অনেক স্থলে দেখা যায়।

'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ' ১ ১ ২২ ন্যায়সূত্র।

২. উদাহরণ বাক্যে সঃ' এইরূপে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ একবারই কর্তব্য, "স সঃ" এইরূপে দুইবার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ন্যায়সূত্রের উদাহরণের লক্ষণে 'দৃষ্টান্তঃ' শব্দ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় উদাহরণ বাক্যে সর্বত্র দৃষ্টান্ত ('যথা মহানসম্' ইত্যাদি) থাকা আবশ্যক। কিন্তু নব্যন্যায়ের গ্রন্থে দৃষ্টান্ত শূন্য উদাহরণ বাক্যেও পাওয়া যায়।

৩ নিগমন বাক্যস্থ 'তদ্' শব্দের অর্থ সাধ্যব্যাপ্য পক্ষবৃত্তি হেতু কিন্তু সর্বত্র "তস্মাৎ" এই প্রকারেই নিগমনে প্রয়োগ দেখা যায়। অর্থ সমান হইলেও "তস্মাৎ" অংশের পরিবর্তে "বহ্নিব্যাপ্য-পর্বতবৃত্তিধূমাৎ বহ্নিমান্" এই প্রকার প্রয়োগ দুষ্ট হয় না।

"পর্বতো বহ্নিমান্" এই প্রকার অনুমিতি হওয়ায় উক্তপ্রকার জ্ঞাপ্যত্ব বহ্নিতে থাকে। সুতরাং "তস্মাৎ বহ্নিমান্" ইহা নিগমন বাক্য হইতে পারিল। উপসংহার বাক্য বলিতেও উক্ত প্রকার নিগমন বাক্যই বুঝায়।

(৮) তর্ক

তর্ক, উহ, আপত্তি ইহারা একার্থবোধক বা পর্যায়শব্দ। উহা মানসপ্রত্যক্ষ বিশেষ অতএব গুণে অন্তর্ভূত[১]। তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে কিন্তু বিচার্য বিষয়ে প্রমাণের সাহায্য করে।

অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই অনুভূত হয় কিন্তু উহার স্পর্শ নাই ইহা নিশ্চিত। এমত অবস্থায় অনুভূত ঐ কৃষ্ণরূপ অন্ধকারের নিজস্ব গুণ অথবা জবাপুষ্পের সন্নিহিত স্ফটিকে প্রতীয়মান রক্তবর্ণের ন্যায় অন্য কোন বস্তুর কৃষ্ণরূপ উহাতে আরোপিত হইতেছে মাত্র যথার্থতঃ অন্ধকারের কোন রূপই নাই এইরূপ আশঙ্কায় তর্কের অবতারণা হয়—অন্ধকারে যদিই যথার্থ কৃষ্ণবর্ণ থাকিত তবে উহাতে স্পর্শও অবশ্যই থাকিত; কারণ, রূপ স্পর্শের ব্যাপ্য অর্থাৎ স্পর্শশূন্য কোনও দ্রব্যে রূপ থাকে না। এই প্রকার ব্যাপ্য আরোপের ফলে "অন্ধকার স্পর্শবান্" এইরূপ মানস জ্ঞান জন্মে। ইহাই তর্কের স্বরূপ। পূর্বে "অন্ধকার স্পর্শবান্ নহে" এই বিপরীত নিশ্চয় স্থির থাকায় ইহাকে আহার্য বা 'আরোপ' বলে। সকল আহার্য জ্ঞানেই পূর্বে বিপরীত নিশ্চয় আবশ্যক। তর্ক আহার্যই হইয়া থাকে কখনও অনাহার্য হয় না। অতএব স্থূলভাবে ইহাকে জ্ঞাতসারে বিপরীত চিন্তা বলা যাইতে পারে।

এইরূপ তর্কের উদয়ের পরে যেহেতু অন্ধকার স্পর্শ বিশিষ্ট নহে অতএব উহাতে কোন রূপই থাকিতে পারে না সুতরাং যথার্থতঃ উহাতে কৃষ্ণরূপ নাই' এই প্রকারে তত্ত্ব নির্ণয় হয়। এই খানেই তর্কের সাফল্য[২]।

---

১ অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ ১।১ ন্যায়সূত্র। মন্ত্রে পদবিশেষের লিঙ্গ বচনাদি পরিবর্তন করিয়া প্রকৃত কর্মানুসারে পাঠের নামও উহ। উহ পাঠে ন্যায়সম্মত এই তর্কের উপযোগিতা চিন্তনীয়। তর্ক বুঝাইতে 'প্রসঙ্গ' এবং প্রসক্তি' শব্দেরও প্রয়োগ দেখা যায়। ৯৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২ অন্ধকার বিষয়ে মীমাংসকের সহিত নৈয়ায়িকের বিবাদ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে কোনও কবি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন—

তমো দ্রব্যং নৈল্যাদ্ ঘটবদিতি মানে সমুদিতে
যদীদং রূপি স্যাৎ কথমিব নহি স্পর্শগুণবৎ।
ইতীবাসত্তর্কং শিথিলয়িতুমপর্যবসিতা
তমোবৃন্দং ধত্তে কচভরমিষেণেন্দুবদনা॥

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

শক্তি ও শক্ত এবং ধর্ম ও ধর্মী

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সাংখ্যশ্রমী

শক্তি শব্দের সাধারণ লক্ষণ—যাহা হইতে ক্রিয়া বা অবস্থান্তরতা হয়। অতএব শক্তি অনভিব্যক্ত অবস্থা ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত অবস্থা। ক্রিয়া হইলেই যাহার ক্রিয়া এরূপ দ্রব্য আসিয়া পড়ে। যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহাকে ব্যক্ত দ্রব্য বলা যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, ক্রিয়া=দ্রব্যের অভিব্যক্তির কারণ। আর শক্তি হইবে ক্রিয়াব মূল কারণ। কারণকার্য-দৃষ্টিতে দেখিলে, শক্তি=কার্য-দ্রব্যেব অভিব্যক্তির অনুমেয় কারণ; এইরূপে শক্তির লক্ষণ করিতে হইবে। কোনও কার্য-দ্রব্য দেখিলে আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয়, ইহা কোথা হইতে হইল? অসৎ হইতে কখনও সৎ হইতে পারে না। অতএব এই কার্যের এক সৎ মূল আছে। এইরূপ অনুমানেব দ্বারাই শক্তির সত্তা অনুমিত হয়। "শক্তস্য শক্যকরণাৎ" (সাঙ্খ্যকারিকা) "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ (গীতা, ২য় অধ্যায়) ইত্যাদি যুক্তি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ আছে।

কার্য পদার্থ মূলতঃ ত্রিজাতীয়। যথা—প্রকাশ, ক্রিযা ও স্থিতি। প্রকাশ অর্থে যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়; যেমন ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়। ক্রিযা অর্থে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া। স্থিতি অর্থে জড়তা বা ক্রিয়ার ও প্রকাশেব রোধক ভাব। শক্তি হইতে এই তিন প্রকারের কার্য উৎপন্ন হয়।

শক্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ। যথা—সচেতন ও অচেতন। প্রাণী যে সমস্ত ক্রিয়া করে,তাহা সচেতন শক্তির ক্রিয়া। যথা—মনের কার্য চিন্তা এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের কার্য। এই সবের মূলে একটা বোধ বা সচেতনতা থাকে বলিয়া ইহারা সচেতন শক্তির ক্রিয়া। আর যাহাকে অচেতন বলা যায় তাদৃশ দ্রব্যের ক্রিয়া অচেতন শক্তির ক্রিয়া; যেমন—অগ্নির দহন, বায়ুর গতি ইত্যাদি।

এখন বিচার্য, শক্ত কে বা কি? সচেতন শক্তির মূল বা শক্ত আমিত্ব পদার্থ। কারণ, ইহা অনুভবসিদ্ধ যে আমি ইচ্ছা করি, আমি দেখি, আমি প্রাণ ধারণ করি ইত্যাদি। অর্থাৎ উহারা আমারই ক্রিয়া। আর ইহা প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত যে, অচেতন শক্তির মূলের বা শক্তের অন্বেষণ করিলে পরমাণুতে যাইয়া উপনীত হইতে হয়। কারণ, পরমাণুবাদে চলনযুক্ত পরমাণুতে যাইয়া উপনীত হইতে হয়। কারণ, পরমাণুবাদে চলনযুক্ত পরমাণুই বাহ্য জগতের মূল। অচেতন শক্তির মূল পরমাণু বলিলে সেই পরমাণু কি হইবে বা সেই পরমাণু কোন্ গুণের দ্বারা লক্ষিত হইবার যোগ্য হইবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, তাহার ক্রিয়া আছে ইহা নিশ্চয়। ক্রিয়া থাকিলে যে জড়তা আছে তাহাও নিশ্চয়। এবং তাহা

ক্রিয়ার দ্বারা শব্দ স্পর্শাদিরূপে প্রকাশিত হয় ইহাও নিশ্চয়। অতএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যে বাহ্যের মূল শক্ত হইবে, তাহা ছাড়া বাহ্যদৃষ্টিতে যে তন্মূলে কিছু লভ্য হইবে না তাহা নিশ্চয়।

চেতন শক্ত বা আমিত্ব অনুভবসিদ্ধ বস্তু। সেই আমি কি? ইহা বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে যে, আমি একটী কেন্দ্র যাহাতে জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার নিবদ্ধ আছে; আর জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার ইহারা সব "আমির" শক্তি। অতএব সেই কেন্দ্র যাহাতে এই সব শক্তি নিবদ্ধ তাহাকে কিরূপে লক্ষিত করিতে হইবে তাহা বিচার্য হইয়া পড়ে। যাহার জ্ঞানাদি শক্তি আছে তাহা আমি এরূপ বলিলে সেই "যাহা" কি, তাহার স্বরূপ লক্ষিত হয় না বা অজ্ঞাত থাকে। জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার এই ত্রিবিধ শক্তি যদি তাহা হয় না (কারণ তাহা শক্তির শক্ত) তবে তাহা কি হইবে? আর তাহা যদি ঐ সমস্ত শক্তির সমাহার হয় তবে শক্ত বলিয়া কেহ বা কিছু থাকিবে না—ইহাই বলিতে হইবে।

আমিত্বের মধ্যে দুই প্রকার ভাব লক্ষিত হয়—এক জ্ঞাতা, আর এক জ্ঞেয়। কারণ, আমি জ্ঞাতা এরূপ বোধ হয় এবং আমি শরীর মন আদি জ্ঞেয় এরূপও বোধ হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা বিষয়ী ও বিষয় অত্যন্ত পৃথক্ বা বিরুদ্ধ বলিয়া স্বভাবতই আমাদের অনুভূত হয়। জ্ঞেয় সব জ্ঞাতার দ্বারা প্রকাশ্য। সুতরাং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের প্রকাশক। প্রকাশকের আর প্রকাশক কল্পনীয় নহে বলিয়া তাহা স্বপ্রকাশ। আর অন্য সব প্রকাশ প্রকাশক-প্রকাশ্যযোগে প্রকাশ। এইরূপে আমিত্বকে বিশ্লেষ করিয়া দেখা যায় যে, আমিত্বের মধ্যে এক পূর্ণ স্বপ্রকাশ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা আছে এবং তৎপ্রকাশ্য জ্ঞেয় বা দৃশ্য পদার্থ আছে যাহা জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার এই স্বভূত শক্তিত্রয়রূপে অভিব্যক্ত হয়। পূর্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, কার্যবস্তুর অনুমেয় কারণের নাম শক্তি। নিমিত্ত ও উপাদানভেদে কারণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে উপাদান-কারণ বিকৃত হইয়া কার্য হয় এবং নিমিত্ত-কারণ তদ্রূপ নাও হইতে পারে। বিশুদ্ধ জ্ঞাতা সর্বদাই জ্ঞাতা বলিয়া —জ্ঞাতা ছাড়া অন্য কিছু নয় বলিয়া উহা কার্য-বস্তুর নির্বিকার কারণ বা হেতু। আর জ্ঞান' চেষ্টা ও সংস্কার অন্তঃকরণের এই মৌলিক তিন ভাব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের তারতম্যজাত বলিয়া ত্রিগুণ উহাদের মৌলিক উপাদান বা উহারা ত্রিগুণেরই বিকারভূত। এখন জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কাররূপ অন্তঃকরণ শক্তির শক্ত কি তাহা বলিতে গেলে বলিতে হইবে প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ যাহাদের তারতম্যে অশেষ প্রকার জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কার হয় সেই ত্রৈগুণ্যই উহাদের মূল উপাদানরূপ শক্ত। ("ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥"—গীতা)। আর জ্ঞানাদিরূপ কার্যের মূল কারণ বলিয়া উহারা শক্তি-লক্ষণেও পড়িবে। সুতরাং সেই স্থানে যাইয়া শক্তি ও শক্ত এক হইয়া যায়।

কার্য-বস্তুর অনুমেয় কারণ শক্তি, এই লক্ষণে নির্বিকার জ্ঞাতাও বা চিতিও শক্তি। কারণ, তাহা জ্ঞান-চেষ্টাদি ব্যক্ত দ্রব্যের নিমিত্ত কারণ। এইজন্য নিমিত্ত ও উপাদানরূপ দুই মূল কারণকে চিতিশক্তি বা দৃক্‌শক্তি এবং ত্রিগুণরূপ প্রকৃতিশক্তি বলা যায়। এখানে দ্রষ্টব্য,

যোগদর্শনের পরিভাষায় চৈতন্য, চিতি, দৃক্‌শক্তি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। নির্বিকার জ্ঞমাত্র বা দৃশিমাত্র যাহা সর্বজ্ঞানের মূল—যাহার প্রকাশের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৃশ্য প্রকাশিত হয়, তাহাই ঐ সকল পদের অর্থ।

অতঃপর ধর্ম ও ধর্মী বা গুণ ও গুণী (গুণ শব্দের অন্য অর্থও আছে। রজ্জু অর্থে উহা ব্যবহৃত হয়। সত্ত্ব রজ তমকে যে গুণ বলা যায় তাহা শেষোক্ত অর্থে, ধর্ম অর্থে নহে।) বিবৃত হইতেছে ধর্ম। এক প্রকার শক্তি। যথা—"যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ" (যোগভাষ্য)। ধর্ম-ধর্মিদৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিজন্য ক্রিয়ার ভেদ করার আবশ্যক হয় না। কারণ ক্রিয়া, ক্রিয়ার মূল ও যে দ্রব্যের ক্রিয়া, তাহা সব ধর্ম। বস্তুর বুদ্ধভাব (Aspect) অর্থাৎ যে যে রূপে বস্তুকে আমরা জানিতে পারি বা পারিব তাহা সবই ধর্ম। ধর্ম ত্রিবিধ—শান্ত বা অতীত ধর্ম, উদিত বা বর্তমান ধর্ম এবং অব্যপদেশ্য বা অনাগত ধর্ম। বর্তমান ধর্মই আমাদের গোচর হয় এবং যাহা গোচর হয় না তাহাই অতীত ও অনাগত ধর্ম। অতীত ও অনাগত ধর্ম বর্তমান নহে বটে, কিন্তু আবার বর্তমানও বটে। তাহারা গোচর নহে বলিয়া অতীত, অনাগত বলি। আবার নাইও বলিতে পারি না বলিয়া সে-দৃষ্টিতে বর্তমানও বলিতে হয়। তজ্জন্য ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন "অতীতানাগতং স্বরূপতোহস্তি।" অধ্বভেদে বা কালভেদে আমরা ঐরূপ ব্যবহার করি।

শক্তিকে ধর্ম বলিলে অনাগত ধর্মকেই শক্তি বলা যায়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন প্রকার ধর্মকে অস্তি বা আছে এইরূপ ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া ত্রৈকালিক ধর্মের পদবোধ্য সমাহারকে বা ঐরূপ অভিকল্পনাকে (Conception) যাহা অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন পদার্থের অনুপাতী মনোভাব বা বিজ্ঞান তাহাকে ধর্মী বলা যায়। পতঞ্জলি বলেন "শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্মানুপাতী ধর্মী।" কার্যও ধর্মের দ্বারা লক্ষিত হয় কারণকেও ধর্মের দ্বারা লক্ষিত করিতে হয়। সুতরাং কারণ-ধর্ম কার্য-ধর্মের ধর্মী। এই প্রকারে কার্য-কারণরূপে বা বিকৃতি-প্রকৃতিরূপে যাইতে যাইতে শেষে যখন মূল উপাদান কারণ ত্রিগুণে যাওয়া যায়, তখন তথায় ধর্ম ও ধর্মীর অভেদ উপচার হয়।

ধর্মসকল দুই প্রকারের—বাস্তব ও বৈকল্পিক। ব্যাকরণের প্রত্যয় বিশেষ যোগ করিয়া ভাষায় আমরা ধর্মবাচি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ উদ্ভাবিত করিতে পারি। 'ত্ব', 'তা,' 'শত্রু' আদি প্রত্যয় সকলের যোগে আমরা যে কোনও যথার্থ অথবা অবাস্তব গুণবাচি পদ করিয়া থাকি। তন্মধ্যে যে সমস্ত গুণবাচি পদ সাক্ষাৎ অনুভূত হয় না বা হইবার যোগ্য নহে তাহারা বৈকল্পিক ধর্ম। অনন্তত্ব, অসংখ্যত্ব, সত্তা (সতের বা ভাবের ভাব) প্রভৃতি বৈকল্পিক ধর্মবাচি পদ। ত্রৈগুণ্যের ন্যায়, নির্বিকার চৈতন্য ধর্ম-ধর্মিদৃষ্টির অতীত। (পুরুষঃ) "নির্গুণত্বান্ন চিদ্ধর্মা।" তবে আমরা ব্যবহারে বৈকল্পিক ধর্ম তাহাতে আরোপ করিয়া কথঞ্চিৎ তদ্বিষয়ে বুঝিয়া থাকি।

সমস্ত ধর্মীরই ধর্ম অসংখ্য হইতে পারে; তাই তাহা বিকারী। কারণ বিকার

অর্থে এক ধর্মের লয় ও অন্য ধর্মের উদয়। চিতিশক্তি ধর্মধর্মীর অতীত বলিয়া কূটস্থ বা নির্বিকার এবং নিত্য বা অবিনাশী। যাহা একতত্ত্বস্বরূপ অসংযোগজ পদার্থ তাহা কারণহীন হইবে এবং তাহার নাশ কল্পনীয় হইবে না। এই হেতু চিতিশক্তি নিত্য বা অবিনাশী।

আর মূল দৃশ্য পদার্থ বা ত্রিগুণও নিত্য পদার্থ ("প্রকৃতিম্পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি"—গীতা)। প্রকাশশীলতা, ক্রিয়াশীলতা ও স্থিতিশীলতা কতদিন আছে ও থাকিবে? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে, তাহারা বরাবরই আছে এবং বরাবরই থাকিবে। উহারা প্রত্যেকে অসংযোগজ একভাবস্বরূপ বলিয়া অবিনাশী বা নিত্য; কিন্তু নিত্যই বিকারশীল। সংযোগজ পদার্থেরই নাশ হয়। চিত্তাদিরা দ্রষ্টৃ-দৃশ্যের সংযোগজ পদার্থ বলিয়া নাশ বা স্বকারণে লীন হয়। কিন্তু তাহাদের মূল কারণ অবিনাশী হইবে। প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতি জাতিবাচন বা Generalisation মাত্র নহে, কিন্তু সাধারণ উপাদানবাচক পদ। যেমন ঘটাদি সমস্তই মৃত্তিকা ইহা ব্যাপক সত্যভাষণ (মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্) সেইরূপ।'

---

(২)

গীতায় "চাতুর্বর্ণ্য" বিচার (ক)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

বর্তমান কালের পণ্ডিতগণ গীতোক্ত "চাতুর্বর্ণ্য" বুঝাইতে গিয়া মানবের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটী জাতি নির্দেশ করিয়া থাকেন। গীতার ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোকটী এই :—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপিমাং বিদ্ধ্য কর্তারমব্যয়ম্॥"

অর্থাৎ "গুণকর্মের বিভাগানুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা বলিয়া জানিবে।"—ইহা অর্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। এই পদটীর ভিতরে যে "চাতুর্বর্ণ্যং" রহিয়াছে, ইহাই তাৎপর্যমূলক। চতুঃ (অথবা চতুর) + বর্ণ = "চতুর্বর্ণ," স্বার্থে ষঞ্ প্রত্যয়মূলে "চাতুর্বর্ণ্য" হইয়াছে। তদ্দ্বারা অর্থ-বিপর্যয় ঘটে নাই। চতুঃ বা চতুর অর্থ চারি। বর্ণ শব্দের বিভিন্ন অর্থ, যথা রং, জাতি, অক্ষর (বর্ণমালা alphabet) এই তিনের কোন অর্থ এইখানে প্রযুক্ত, তাহাই আলোচনার বিষয়। রং অর্থ এস্থলে সামঞ্জস্যহীন। জাতি ও অক্ষর লইয়াই তর্ক। "জাতি" অর্থ গ্রহণের প্রতিকূলে, কারণসমূহ মধ্যে প্রধানতঃ দৃষ্ট হয় এইগুলি, যথা—

(১) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী জাতি যদি ভগবান্ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে মানব-কল্পনায় তাহা রূপান্তরিত হয় কিরূপে? জাতি পরিবর্তনশীল বলিয়াইতো জাত্যন্তর সম্ভব হয়।

(২) এই শ্লোকের পূর্বে গীতার কোন স্থানে ব্রাহ্মণাদি চারিটী জাতি, কি জাতি-বিভাগের কোন উল্লেখ নাই। পূর্বের উল্লেখ ব্যতীত ঐ চারিটী নির্দিষ্ট জাতি বুঝার অনুকূলে কি হেতু আছে?

(৩) গীতার ৩য় অঃ শেষাংশে আত্মজ্ঞান প্রসঙ্গের বিচার উত্থাপিত হইলে পর ভগবান্ নিষ্কাম কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের বর্ণনা করেন যে স্থলে তাহাই গীতার ৪র্থ অধ্যায় এবং এই ৪র্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের ও সাধনার চর্চা ব্যতীত জাতি, কুল আদি অন্য বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। ১২শ শ্লোক পর্যন্ত সকাম কর্মের চর্চা হইয়াছে এবং তৎপরই নিষ্কাম-কর্মের সূত্রপাত হয়। ১২শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৬শ শ্লোকগুলিতে কেবলই সাধনার কথা, আর তন্মধ্যস্থ ১৩শ শ্লোকটীতে অষ্টপাশের অন্তর্গত সাধন-প্রতিকূল অপ্রাসঙ্গিক "জাতি" বিষয়ক বিচারপ্রসঙ্গ সহসা উল্লেখ করার তাৎপর্য কি হইতে পারে? যদি বলা হয় যে, ক্ষত্রিয় অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই ইহার উল্লেখের প্রয়োজন হইয়াছিল, তবে উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের অসম্পর্কিত একটা প্রসঙ্গ এই জ্ঞান আলোচনার মধ্যবর্তী স্থলে হঠাৎ উত্থাপন করাটা সামঞ্জস্যবিহীন নহে কি? ৪র্থ অধ্যায়ে মানবের জাতি, কি যুদ্ধঘটিত কোন ব্যাপারের উল্লেখ ঘুণাক্ষরেও বর্তমান নাই। ইহার বহুপূর্বে ২য় অধ্যায়ে ৩১।৩২ শ্লোকদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই "ক্ষত্রিয়" শব্দ ব্যতীত অপর তিন জাতির কোন উল্লেখ নাই, অথচ সেইখানেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয় জাতির তিনিই সৃষ্টিকর্তা এমন কোন ইঙ্গিতমাত্র করেন নাই। জাতি বিষয়ক প্রসঙ্গের আদি পত্তনই হয় গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪০শ হইতে ৪৫শ শ্লোকগুলির ভিতর দিয়া। তখন ইহার সঙ্গত কারণও উপজাত হইয়াছিল যে, যেমন সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের তারতম্যে সৃষ্টপদার্থমাত্রেরই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা (অর্থাৎ স্পন্দন-পার্থক্যে পদার্থসমূহের পার্থক্য), তদ্রূপ গুণ-কর্ম-পার্থক্যে মানবের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলে পর, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভাগ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই যে বর্ণ বিভাগ (বা নামকরণ) ইহা স্বভাবজ নহে। ইহা মানব-কল্পিত। উপনিষদ বলেন:—"চর্ম্মরক্তবসামাংসমজ্জাস্থি ধাতুশীত্যুক্তানি জাতিরাত্মানো ব্যবহারোপকল্পিতা"—অর্থাৎ চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, অস্থি, শুক্র, এই সপ্তধাতু-নির্মিত দেহে লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি কল্পনামাত্র। আর শ্রীকৃষ্ণ যদি জাতি-বিভাগ বা সৃষ্টি করিয়াই থাকিবেন, তবে কোন না কোন পুরাণে ইহার উল্লেখও থাকিত; পরন্তু ১৮শ অধ্যায়েই তিনি "ময়া সৃষ্টং" বলিতেন। পক্ষান্তরে, পুরাণ-সংহিতাদি শাস্ত্রসমূহ, এমন কি, বেদও প্রমাণ করে, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইবার বহু পূর্ব হইতেই জাতি বিভাগ ছিল। গুহক, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ঋষ্যশৃঙ্গ, কাক্ষীবান, মতঙ্গ, দ্রুপদ, মাৎস্য, জনশ্রুতি, সমাধি প্রভৃতির জাতিগঠন কে করিয়াছিলেন? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কি ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব ও গোপ-পালিত ছিলেন না? শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইবার বহুকাল পূর্বে শৌনক ঋষি জাতি

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এমন কি বৈদিক যুগেও জাতি বিভাগ ছিল। বায়ুপুরাণ উত্তরখণ্ড ৩০ অধ্যায় ও ৫৭ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি শুনকো, যস্য শৌনকঃ
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈব চ
এতস্য বংশে সম্ভূতাঃ বিচিত্রৈঃ কর্মাভি দ্বিজ।" (৩০।৫৭-৪)
"বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সম্প্রকীর্তিতঃ
সংহিতাশ্চ ততোমন্ত্রা ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈস্তুতে॥" (৫৭।৬০)

বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থ অংশ, ৮ অধ্যায়, ১ শ্লোক যথা :—

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তয়িতাহভু ৎ।"

এই বাক্যগুলি প্রতিপাদন করে এবং "হরিবংশেও উক্ত হইয়াছে যে শৌনক ঋষি "চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত—১২শ শ্লোক এই :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রোঽজায়ত॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (উত্তমাঙ্গ) মুখ সদৃশ, ক্ষত্রিয় বাহু সদৃশ, বৈশ্য উরু সদৃশ এবং শূদ্র পদ সদৃশ। ইহাও প্রতিপাদন করে যে, বেদের সময় হইতেই চারিটা জাতি ছিল। এই সমূহ শাস্ত্র বাক্যাদি লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ মানবের বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন? বর্ণটা এস্থলে জাত্যর্থে গ্রহণ করিলে ঐ সমূহ শাস্ত্রোক্তি ও ভগবৎ বাক্য পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়ে না কি? তদবস্থায় এক পক্ষ ঠিক এবং অন্য বেঠিক, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি শ্রীকৃষ্ণ জাতিগঠন করিয়াই থাকিবেন, তবে আবার একটী অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত উক্তিই বা করিলেন কেন যে, "তস্যকর্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্?" তিনিই জাতি গঠনেয় কর্তা, অকর্তা নহেন, এরূপ সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে কি প্রত্যবায় ঘটিত? তবেই ইহা সুস্পষ্ট যে, এই "চাতুর্বর্ণ্যের" ভিতরে অপর কোন গুঢ়তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং উহা ঐ চারিটা জাতি নির্দেশ করে না। শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী, আনন্দগিরি, রামানুজ, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ যে ইহা দ্বারা মানবের চারিটা জাতি বুঝিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এরূপ প্রসিদ্ধি যে, মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে হিন্দু-ধর্ম সংক্রান্ত শাস্ত্রাদি বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সমূহ পণ্ডিতগণের গীতা ভাষ্যাদি যে তখন আংশিকও নিশ্চিহ্ন হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? পরবর্তীকালে পণ্ডিতগণ ঐ সমূহ বিনষ্ট অংশগুলি সম্যক উদ্ধার করিতে না পারিয়া স্মৃতি শাস্ত্রাদির আশ্রয় লইয়া ঐ সমূহ জ্ঞানী ভাষ্যকারদের নামে একটা গোঁজামিল দিয়া রাখিয়াছেন, এইরূপ অনুমিত হইতে পারে। ইহা স্বীকার্য যে, স্মৃত্যোক্ত "চাতুর্বর্ণ্য চারিটী জাতিই নির্দেশ করে; কিন্তু উহা গীতার "চাতুর্বর্ণ্য হইতে পৃথক। গীতার চাতুর্বর্ণ্য যে মানবের জাতি-জ্ঞাপক নহে, পরন্তু উহা যে নিষ্কাম কর্মযোগ-প্রতিপাদক অক্ষরবাচক, পরবর্তী প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করিবার বাসনা রহিল।

(৩)

মৌর্য সাম্রাজ্যে রাজকীয় আয় ব্যয়

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি. এ.

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণেই বিশেষ স্মরণীয়। এই স্থানে আমরা মৌর্যসাম্রাড্‌গণের রাজস্ব ও ইহার ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করিব।

(ক) ভূমিকর—সাধারণ ভূমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজকর স্বরূপ নির্ধারিত হয়, কোন কোন আত্যায়িক (emergency) কার্যের জন্য ঐ কর তৃতীয়াংশও হইতে পারে। সাধারণভাবে ভূমির উৎপাদন শক্তির উপরই ভিত্তি করিয়া কর স্থির করা হয়। তাহা ছাড়া যে সমস্ত প্রজা রাজার খাস দখলের সম্পত্তি ভোগ করে, তাহারা ঐ ভূমির কর এবং খাজনা উভয়ই দিয়া থাকে। রাজকীয় কৃষি বিভাগও প্রচুর ফসল উৎপাদন করে। খাস সম্পত্তির প্রজাগণ ইচ্ছামত টাকা বা ফসল দিয়া খাজনা পরিশোধ করিতে পারে। এইরূপে রাজভাণ্ডারে প্রচুর শস্যাগম হয়, এবং এই সমুদয় শস্যের অর্ধেক দুর্ভিক্ষাদি বিবিধ বিপদের সময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। এই সমস্ত আয় ছাড়াও আরো ছোটখাট নানা প্রকারের ভূমি কর পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে নিম্ননির্দিষ্টগুলি প্রসিদ্ধ।

(১) বলি—ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ইহার স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অজ্ঞাত। সম্রাট অশোকের লুম্বিনী ফলকে (Lumbini Inscription) ইহার নাম উল্লেখ আছে।

(২) উৎসঙ্গ—কোন প্রজার উত্তরাধিকারী স্বরূপ কোন পুত্রের জন্ম হইলে পর রাজাকে 'নজর' স্বরূপ এই কর দেওয়া হয়।

(৩) সেনাভক্ত্য—রাজার কোন সৈন্যদল কোথাও যাওয়ার সময় পথে প্রজাদের নিকট হইতে তাহাদের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সমস্ত ছাড়া আরও অনেক রকমের ভূমিকরের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এগুলি ঠিকভাবে নির্ধারিত করা বড় কঠিন।

(খ) নাগরিক কর—সহরের বাসিন্দাগণ নির্দিষ্ট কর দিয়া থাকে। তাহা ছাড়া শ্রমিক সমিতি, মৎস্যজীবী সমিতি ইহারাও নির্দিষ্ট কর প্রদান করে।

(গ) খাস দখলের কর (Taxes from royal monopoly)—খনির আয়, এবং লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয় হইতে আয়। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত ব্যবসায়ী বিদেশের সঙ্গে জিনিষ 'আনা নেওয়া'র ব্যবসায় করে, তাহাদিগকে আমদানী ও রপ্তানী কর দিতে হয়।

(ঘ) বাজারের হাসিল (কর), খেয়াঘাটের কর, পশু বা মানুষে লইয়া চলার জিনিষের কর—এইগুলিও রাজস্বের মধ্যে গণ্য। ইহা ছাড়া পথকর, স্থানান্তরের যাইবার অনুমতি পত্রের (passport) কর, বনকর, মাম্‌লা মোকদ্দমার আসামী প্রদত্ত জরিমানা।

কোন কোন স্থলে আসামীর শাস্তি স্বরূপ অঙ্গচ্ছেদ হইয়া থাকে, আসামী এই অবস্থায় প্রচুর অর্থ দিয়াও অনেক সময় মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ইহাতে রাজভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত ছাড়া বিশেষ বিশেষ সময় প্রজাগণ হইতে 'প্রণয়' ও "বদান্ত" নামক কর আদায় করা হয়। এইগুলি সাধারণতঃ দুর্ভিক্ষাদির সময়ই লওয়া হয়। অনেক সময় শ্রমিকেরা বিনা পয়সায়, কখনো বা মাত্র আহার সংস্থানের পরিবর্তে রাজকীয় ভূমিতে কার্য করিয়া থাকে।

এইরূপ বিভিন্ন প্রকারে আদায়ীকৃত রাজস্ব নিম্ন লিখিত উপায়ে ব্যয়িত হয়।

(ক) রাজ সংসার সংরক্ষণে—রাজপরিবারে অগণিত অতিথি অভ্যাগত, স্ত্রীলোক এবং দাসদাসী থাকে। ইহাদের সমুদয় সংরক্ষণের কার্য রাজা স্বয়ং করিয়া থাকেন।

(খ) ধর্ম প্রতিষ্ঠান—পুরোহিত, যাজ্ঞিক, জ্যোতিষী, যাদুকর এবং (ধর্মগ্রন্থাদির) পাঠিকা প্রভৃতি সকলের ব্যয়ভার রাজাকেই বহন করিতে হয়।

(গ) রাজকর্মচারীর মাহিয়ানা—নির্দিষ্টভাবে কর্মচারীগণ তাহাদের মহিনা রাজকর হইতেই পাইয়া থাকে।

(ঘ) সৈন্য সংরক্ষণ—যুদ্ধোপযোগী সমুদয় ব্যবস্থাই রাজাকে করিতে হয় এবং এইজন্য প্রচুর সৈন্য সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে "রসদ পরিবেশক" (Commissariat) এবং যুদ্ধোপকরণ অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই বিভাগে রাজস্বের অধিকাংশ খরচ হয়; যেহেতু মৌর্য সম্রাট্‌দের সৈন্য সংখ্যা কয়েক লক্ষের মত আছে। ইহাদের উপর প্রচুর হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র, ষাঁড়, নৌবিভাগ ও রথাদি যথেষ্ট খরচের কারণ।

(ঙ) চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শক বিভাগের প্রচুব ব্যয়।

(চ) জল সেচন বিভাগ, সাধারণ কার্য বিভাগ (P. W. D.) ইত্যাদিও যথেষ্ট ব্যয়ের কারণ। গ্রীক্ বিবরণ হইতে আমরা এই সংবাদ বিশদভাবে জ্ঞাত হইতে পারি।

(ছ) শিক্ষাবিভাগ—সমুদয় বিদ্যা নিকেতন রাজার সাহায্য পায়; শ্রোত্রীয়গণ (বেদ শাস্ত্রে নিপুণ) ভাতা পাইয়া থাকেন; যাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতির সাধনে সচেষ্ট তাঁহারাও বৃত্তিলাভ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা ব্যবসায়, বাণিজ্য, নৌবিভাগ, কৃষি প্রভৃতির উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন, তাঁহারা রাজভাণ্ডার হইতে সাহায্য লাভ করেন।

(জ) কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমশীল ব্যক্তি, ও বৈদেশিক বাণিজ্যে রত ব্যক্তিগণ প্রচুর রাজ সাহায্য পাইয়া থাকে।

(ঝ) বিধবা, নিঃসহায় শিশু, অসহায় নরনারী, এবং অন্যান্য অনেক লোক রাজ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যহ ভিক্ষা বা আহার পাইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীতে সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া "সাহায্য সমিতি" (relief Committee) খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে খাদ্য বিতরণ করা হয়। কখনো বা স্থানান্তর হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সুবিধা পাওয়ায় অনেক বিদেশী আসিয়া এখানে আশ্রয় পায় এবং ইহাতে রাজার প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উপরে বর্ণিত বিষয় হইতে মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও ইহার ব্যয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় রাজস্ব নীতি বিংশ শতাব্দীর বিধি ব্যবস্থা হইতে কোন কারণেই ন্যূন ছিল না; পরন্তু সেই সময় যে সম্রাট্‌গণের চিন্তাধারা এত তীক্ষ্ণ এবং দৃঢ় ছিল—ইহা আধুনিক সভ্যজাতির বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া তোলে।

আমাদের কথা

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মর্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, যে ইহা কয়েকটী স্কুল কলেজের কার্য নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত নিজস্বভাবে কয়েকটী শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে। এমন বহু শিক্ষনীয় বিষয় আছে, ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যাহাদের জন্য কোন শিক্ষার বা পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই, যেমন শিল্পবিদ্যা, ব্যবসায়বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ববিদ্যা, সমাজসেবাশিক্ষা, সামরিক শিক্ষা ইত্যাদি। ইহাদের জন্য যে Facultyর সৃষ্টি করা প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন আছে, তাহা আমরা পূর্বে অনেকবার বলিয়াছি। আশা করা যায়, বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা এই সমস্যার আশু সমাধানের চেষ্টা করিবেন।

*　　*　　*　　*

বর্তমানে মহাযুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে। এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সকলেরই সুবিদিত। ইহাদ্বারা অন্যান্য দেশে শিক্ষা, কৃষ্টি ও শিল্পের কত অমূল্য সম্পদের ধ্বংস হইতেছে, কত নাগরিক জীবন বিপন্ন হইতেছে এবং এখানেও তাহা হইতে পারে। যাহাতে বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলি কোন নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহার জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগের একান্ত প্রয়োজন এবং ইহার জন্য শীঘ্রই একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করা একান্ত আবশ্যক।

*　　*　　*　　*

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্ চান্সেলার মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার দর্শনশাস্ত্রে ও ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সকলেরই সুবিদিত। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি ও দুরূহ শাস্ত্রের ইংরেজী অনুবাদ-সমূহ কৃষ্টিজগতের অমূল্য সম্পদ। ইনি ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ ও ভারতী মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম মাননীয় সভ্য (Hony. fellow) ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিতেছি ও তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

*　　*　　*　　*

গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ৪দিন যাবৎ কাশীধামে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কার্যাবলীর সারাংশ প্রাপ্ত হইলে পরবর্তী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

*　　*　　*　　*

যুদ্ধ নিবন্ধন ভারতে অন্যান্য সঙ্কটের মধ্যে কাগজের ও মোটর তৈলের দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন অনেক কার্যের ক্ষতি হইতেছে। এই সময়ে হাতে তৈয়ারী কাগজ, দেশীবস্ত্র ও মোটর তৈল যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ব্যাপকরূপে তৈয়ারী করিতে পারা যায় তাহা হইলে এই সব কাজেরও সুবিধা হয় এবং বহু শ্রম-শিল্পীও নিযুক্ত হয়।

পুস্তক সমালোচনা

রবি সভাজন পূর্ব বিন্যাস। শ্রীশিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ভুবনভবন, খড়দহ হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৩১।

শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের রচনা ভঙ্গিমা প্রশংসনীয়। ভাষার ব্যঞ্জনা-ভাবের গাঢ়তা এই দুইয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণে 'রবি সভাজন একটি উপাদেয় বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের গাঢ়তায় sentimentএর আধিক্য থাকিলেও উহা পীড়াদায়ক হয় নাই। যে প্রকারে রবীন্দ্র বন্দনা এবং তাঁহার স্তুতিগীতি হইয়াছে তাঁহাকে emotional approach বলা যাইতে পারে। যদিও এই প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে criticism বলিতে যাহা বুঝায় তাহা পাওয়া সম্ভব নয়, তথাপি ভাষার মাধুর্যের মধ্য দিয়া ইহার দেহের ছটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া আমাদের 'রবি-স্বপ্নকে রঙীন্ হইতে রঙীন্তর করিয়াছে। ইহাই ইহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়।

প্রবন্ধটী বেশ শিক্ষাপ্রদ—তাহাও আবার অপূর্ব সৃজনী শক্তিবিশিষ্ট ভাষার মধ্য দিয়া, সুতরাং আমরাও ইহা পড়িয়া 'নিরন্তকুহক'।

শ্রীকালীদাস মুখোপাধ্যায়

শ্রীভগবদ্‌গীতা।—রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী। রসশালা ঔষধাশ্রম, গোণ্ডাল, কাথিয়াবাড় হইতে প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই। পৃষ্ঠা ৯১ + ৯৮

গ্রন্থকার কয়েক বৎসর পূর্বে গীতার একখানি অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাহার মুখবন্ধে তিনি বলেন যে তিনি মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৪৩ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক অনুসারে গীতার সমগ্র ৭৪৫ শ্লোক আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ গীতায় শ্লোকসংখ্যা—৭০০ শ্রীকৃষ্ণের উক্ত শ্লোক ৫৭৫, অর্জুনের উক্ত—৮৪ সঞ্জয়ের উক্ত – ৪০ ও ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত ১। তিনি সম্প্রতি কাশী হইতে প্রাপ্ত ভূর্জপত্রে লিখিত একখানি গীতার পাণ্ডুলিপি হইতে ৭৪৫ শ্লোক সংযুক্ত বর্তমান গীতাখানি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহাতে দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণোক্ত শ্লোকের সংখ্যা—৬২১, অর্জুনোক্ত ৬৫, সঞ্জয়োক্ত ৬৮ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত ১টী। ইহাতে মহাভারতে কথিত গীতার শ্লোকসংখ্যা অপেক্ষা ১০টী শ্লোক অধিক আছে। এই দশটী শ্লোক অধিক হইবার কারণ গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে মূলগীতায় কতকগুলি শ্লোক ত্রিপদী ছিল, সেইগুলি ভূর্জপত্র লিখিত গীতায় দ্বিপদী ধরায় শ্লোক সংখ্যা অধিক হইয়াছে। এই হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষে লিখিত আছে "ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমাপ্ত। বিক্রম সংবত ১৬৬৫ মাঘ কৃষ্ণ ১ প্রতিপাদী মন্দবাসরে"।

বর্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি অনেকগুলি গীতার সংস্করণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার ঐ সমস্ত সংস্করণের মধ্যে কাশ্মীরে মুদ্রিত অভিনব গুপ্তের টীকা সম্বলিত গীতার কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে তিনি শুক্ল ধর্মমণ্ডলের গীতা ও পুনা আনন্দাশ্রম প্রকাশিত

গীতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি কেবলমাত্র শ্লোকগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। তবে বর্তমান গ্রন্থের মুখবন্ধে গীতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহার পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে স্বকৃত 'চন্দ্র ঘট' ও 'সিদ্ধিদাত্রী' নামক দুইটী টীকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গীতা বিষয়ে গ্রন্থকারের গবেষণা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

প্রবাহ—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য প্রণীত। মূল্য ১৲। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত।

'প্রবাহ' একখানি ছোটগল্পের বই। ইহাতে মোট সাতটী গল্প আছে। ইহার ভাষা ঝরঝরে। গল্পগুলির মধ্যে মানুষের শাশ্বত কামনার ছবি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। প্রবাহ নিজের শক্তিবলে সাহিত্যের দরবারে যথাযোগ্য আসন লাভ করবে ব'লে আশা করি।

শ্রীসঞ্জয়

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—প্রথম ভাগ—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।

২। শ্রীচৈতন্যদেব—মহামহোপদেশক—শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত। ঢাকা।

৩। গীতা—ডাক্তার এ. গুপ্ত, এম-বি, বি-এস প্রণীত, কলিকাতা।

৪। শ্রীভগবদ্গীতা—রাজবৈদ্য জীবরাম কালীদাস শাস্ত্রী গোণ্ডাল, কাথিয়াবাড়

৫। শ্রীশ্রীনাথ রসায়ন—শ্রীযুক্ত সুবোধ দেবশর্মা, হুগলী।

৬। স্ত্রী-স্বাধীনতা—শ্রীযদুনাথ দে তত্ত্বনিধি।

৭। সুত্ত নিপাত—ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, কলিকাতা।

৮। Clash of Three Empires—V. V. Joshi, এলাহাবাদ

সাময়িক সাহিত্য—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮

সাহিত্য

ভারতবর্ষ—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়।

„ —তিনখানি পুস্তক—অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী, এম্. এ., পি. আর. এস., শাস্ত্রী

„ —রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম্. এ।

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—আগম ও শ্রীঅরবিন্দ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ।

„ —রাসলীলা—শ্রীবসন্তকুমার পাল, এম. এ., বি. এল.

বঙ্গশ্রী—ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও দর্শন—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য।

„ —ভারতীয় রূপাধারে মানব ও প্রকৃতি—শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

উদ্বোধন—ভারতে বেদপ্রতিষ্ঠা—অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ।

ব্রহ্মবিদ্যা—প্রকৃত 'যোগ' কি ?—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

„ —আত্মানুভূতি—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

„ —মরণের পর—শ্রীতুলসীদাস কর।

ইতিহাস

বঙ্গশ্রী—বাঙ্গালার কথা—৺নিখিলনাথ রায়।

„ —রাজসিংহের ভূমিকা—ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

বিজ্ঞান

উদ্বোধন—ফ্লোজিষ্টন মতবাদ ও তাহার কর্ণধারগণ—অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়, এম. এস্. সি.

বিবিধ

ভারতবর্ষ—ভারতের পুণ্যতীর্থ—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্. এ., বি. এল্., পি. এইচ্. ডি.

„ —কুম্ভমেলায় সাধুদর্শন—স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ।

„ —প্যাপ্ ও আর্ত—শ্রীঅমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়।

„ —চারুবালার রূপ ও অভিব্যক্তি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বঙ্গশ্রী—সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষিকর্ম—শ্রীজীতেন্দ্রকুমার নাগ।

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪৭শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

বাংলা সাময়িক-পত্র—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্. এ।

শব্দ ও অর্থ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য, এম্. এ., বি. এল।

প্রাচীন বাঙলার ধন-সম্বল—শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, এম. এ., ডি. লিট্।

পুরাতন পত্রিকা

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ বি. এ. সংকলিত

সাহিত্য (১৩২৭)

আশ্বিন—প্রাচীন পল্লী সঙ্গীত ও কবিতা—শ্রীজীবেন্দুকুমার দত্ত। কয়েকটী প্রাচীন কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি অধিকাংশই গ্রাম্য সরল জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া রচিত। প্রায় সবগুলিই সুখপাঠ্য।

কার্ত্তিক—উড়িষ্যার আদিম অধিবাসী—শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—উড়িষ্যার মধ্যে দুরধিগম্য বনের মধ্যে এখনও অনেক আদিমজাতি দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ভুঞা, খন্দ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত। লেখক বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভুঞা জাতির একটী নাতিদীর্ঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ফাগুণ ও চৈত্র—চৈতন্য ও নিত্যানন্দ—শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মহাপ্রভুর লীলা ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দের শ্রীপাট খড়দহে আগমন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। প্রবন্ধকার নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর খড়দহ আগমন কারণ বিবৃতি করিতে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন।

সাময়িক সংবাদ

কমলা লেকচার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১৯৪৩ সালের কমলা লেকচারার পদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নির্বাচন করিয়া যোগ্যতার সমাদরই করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়—'ভারতের আবিষ্কার।'

জগত্তারিণী পদক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদিগকে গুণের মর্য্যাদা স্বরূপ 'জগত্তারিণী পদক' প্রদান করিয়া থাকেন। এ বৎসর প্রসিদ্ধ মহিলা কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু মহাশয়াকে এই পদক দেওয়া হইবে।

স্যর আজিজুল হকের পদোন্নতি—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর স্যর আজিজুল হক সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরলোকে শিক্ষাবিদ্—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস চান্সেলর শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝা মহাশয়ের পিতা ডক্টর স্যার গঙ্গানাথ ঝা মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পরলোকগত ঝা মহাশয়ের মত পণ্ডিত বর্ত্তমানে খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনিও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর ছিলেন। গঙ্গানাথ শুধু জ্ঞানার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নানা জনকল্যানকর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞানকে দেশবাসীর গোচরীভূত করিয়া গিয়াছেন।

পিবা সুতস্য রসিনো এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা অন্তরিক্ষ। পবিত্রন্তে বিততং ব্রহ্মণস্পতে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা অরিষ্ট অর্থাৎ অবিনাশকর। অভিত্বা পূর্বপীতয়ে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম অহরীত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের অষ্টম খণ্ড

वरुणस्य देवस्थानं बृहद्देवस्थानमैरयैरिणे द्वे आङ्गिरसे द्वे बार्हस्पत्यं च भारद्वाजं चाथर्वणं च नारद्वसवश्च बृहतीवामदेव्ये द्वे भरद्वाजस्य बृहत् ॥ ९ ॥

পিবা সুতস্য রসিনঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বরুণের দেবস্থান। বৃহদিন্দ্রায় গায়ত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহৎশব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম বৃহৎ দেবস্থান।

পুনান সোম ধারয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অভিত্বা বৃষভা সুতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঐরয় শব্দযুক্ত বলিয়া এই ঋক্ দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী ঐরয়ৈরিণ নামে প্রসিদ্ধ। পুনানঃ সোমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। তবেদিন্দ্রাবমং বসুঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋক্দ্বয়াশ্রিত সাম অঙ্গিরা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

তবেদিন্দ্র এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বার্হস্পত্য। আত্বা সহস্রমাশতম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভারদ্বাজ। শন্নোদেবীরভিষ্টয়ে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অর্থবা ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট। ইন্দ্র জ্যেষ্ঠং ন আভর এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা নারদ্বসব।

কয়ানশ্চিত্রমাভুবৎ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বৃহৎশব্দযুক্ত বামদেব্য। ত্বামিদ্ধিহবামহে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজের বৃহৎ নামে প্রসিদ্ধ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের নবম খণ্ড

वसिष्ठजमदग्न्यो रर्कौ द्वा वगस्त्यजमदग्न्योर्वा स्वाशिरा मर्कौ दीर्घतमसोऽर्क्को मरुता मर्कौ द्वौ समूस्तोभो वोत्तरोऽग्नेरर्कः प्रजापतेश्चार्क इन्द्रस्यार्कौ द्वौ त्रिष्टुभां वार्कशिरश्चार्कग्रीवाश्च वरुणगोतमयोरर्कोऽर्कपुष्पे द्वे ॥ १० ॥

ইন্দ্রন্নরোনেমধিতাহবন্তে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বসিষ্ঠ ও জমদগ্নির অর্কসংজ্ঞক অথবা অগস্ত্য ও জমদগ্নির অর্কসংজ্ঞক।

স্বাদিষ্ঠয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম স্বাশির অর্থাৎ প্রাণের

অর্ক অর্থাৎ সাম। ধর্ত্তাদিবঃ পবতে কৃত্ব্যোরসঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দীর্ঘতমার অর্ক অর্থাৎ সাম।

প্রব ইন্দ্রায় বৃহতে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা মরুদ্‌গণের অর্ক। অথবা দ্বিতীয়টী সংস্তোভযুক্ত।

অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অগ্নির অর্ক। অয়ং পূষারয়ির্ভগঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা প্রজাপতির অর্ক।

ইন্দ্রোরাজা জগতশ্চর্ষণীনাম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ইন্দ্রের অর্ক-সংজ্ঞক অথবা ত্রিষ্টুভের অর্ক সংজ্ঞক।

যদ্বেদ মারজোযুজ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম অর্কশির। পাতীদিব আ ইত্যাদি স্তোভমাত্র সাম। ইহার নাম অর্কগ্রীবা। উদুত্তমং বরুণ পাশ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বরুণ ও গোতমের অর্ক। বরুণ দেবতা ও গোতম ঋষি।

ইন্দ্রন্নরো নেমধিতা হবন্তে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম অর্ক পুষ্প।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের দশম খণ্ড

अग्नेर्वैश्वानरस्य त्रीण्याज्यदोहान्याचिदोहान्याच्यादोहानि वा प्रजापतेर्वा विष्णोर्वा विश्वामित्रस्य वा, रुद्रस्य त्रय ऋषभा रैवतो वैराजः शाक्कर इतीन्द्रस्य त्रयोऽतीषङ्गा अथापरम् रौद्रो वासवः पार्जन्यो वैश्वदेवो वा प्राजापत्याश्चत्वारः पदस्तोभा गौतमा वा वैश्वामित्रा वैन्द्राग्ना वा ॥ ११ ॥

মূর্দ্ধানন্দিবো অরতিং পৃথিব্যাঃ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা বৈশ্বানর নামক অগ্নি। এখানে পদ ও ঋষিভেদে বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাদের দেবতা প্রজাপতি বা বিষ্ণু এবং ঋষি বিশ্বামিত্র। সমস্ত সামই আজ্যদোহশব্দযুক্ত বলিয়া আজ্যদোহসংজ্ঞক। অথবা আচিদোহপদযুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম আচিদোহ। অথবা পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদের দেবতা প্রজাপতি এবং বিষ্ণু এবং ঋষি বিশ্বামিত্র।

সুরূপ কৃত্নুমুতয়ে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। পিবা সোমমিন্দ্রমন্দতুত্বা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাদোরিত্যা বিষুবত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋক্ ত্রয়াশ্রিত সাম তিনটী রুদ্রের ঋষভসংজ্ঞক। ইহারা ক্রমে রৈবত, বৈরাজ ও শাক্বর নামে খ্যাত।

পুরোজিতী এবং উচ্চাতেজা এই মিলিত ঋগ্‌দ্বয়ের একটী সাম। অসর্জি এবং অসাব্যংশুঃ এই মিলিত ঋগ্‌দ্বয়ের একটী সাম এবং অভীনবন্তে এবং ওরংসমন্দী এই মিলিত ঋগ্‌দ্বয়ের একটী সাম। এইরূপে এই ঋক্ ষট্‌কাশ্রিত সাম তিনটী ইন্দ্রের অভিষঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। অথবা ইহারা ক্রমে রৌদ্র, বাসব ও পার্জন্য নামে খ্যাত অথবা তৃতীয়টী বৈশ্বদেব নামে বিখ্যাত।

ধর্ত্তাদিবঃ পবতে কৃত্ব্যোরসঃ এই ঋকে পদস্তোভ চারিটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের দেবতা প্রজাপতি। প্রতিপাদে স্তোভ রহিয়াছে বলিয়া ইহারা পাদস্তোভ নামে কথিত। এখানে ঋষ্যাদিভেদে বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। অথবা ইহারা গোতম কর্তৃক দৃষ্ট, বিশ্বামিত্র কর্তৃক দৃষ্ট কিংবা ইহাদের দেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের একাদশ খণ্ড

दश संसर्पाणि महासर्पाणि सर्पसामानि वाथापर मग्नेश्च पृथिव्याश्च वायोश्चान्तरिक्षस्य चादित्यस्य च दिवश्चापां च समुद्रस्य च माण्डवे द्वे अथापरं वाम्रवाणि चत्वारि पावमानानि चत्वारि दिशाम् संसर्पे द्वे ॥ १२ ॥

চর্ষণী ধৃতম্ ইত্যাদি পাঁচটী ঋকে দশটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সংসর্প পদযুক্ত এবং মহাসর্প বা সর্প সাম নামে খ্যাত। চর্ষণীধৃতং মাঘবানম্—এই ঋকে তিনটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নিধনে সর্পস্থবা, প্রসর্পস্থবা ও উৎসর্পস্থবা এই পদ গুলি আছে। তবেদিন্দ্রাবমং বসুঃ—এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের সংসর্প এই শব্দ আছে। অভিপ্রিয়াণি—এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে স্বপায় এই শব্দ রহিয়াছে। ত্বয়া বয়ং পবতেন সোম—এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে স্বপ শব্দ রহিয়াছে। স্বাদোরিত্থা—এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। যদিও অন্তিম দুটীতে সংসর্প শব্দ নাই তথাপি সংসর্পযুক্ত সামের সংযোগ হেতু ইহারাও সংসর্প নামে পরিচিত।

অথবা ইহাদের সম্বন্ধে মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাদের প্রথম আটটীর দেবতাক্রমে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, আপ এবং সমুদ্র। অন্তিম দুটী মাণ্ডব।

পুনরপি মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাদের প্রথম চারিটী বভ্রু ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট, তৎপরের চারিটী পাবমান এবং অন্তিম দুটী দিকের সংসর্প।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের দ্বাদশখণ্ড

त्रिषन्धि च यज्ञसारथि च वृषा चैकवृषश्च विद्रथश्चाभ्रातृव्यं च रैवते द्वे

रैवत्यो वा शाक्करवर्णं च नित्यवत्साश्च वसिष्ठस्य च रथन्तरं जमदग्नेश्च सप्तहं पञ्चपविमन्ति महासामानि सर्वस्य प्रथमोत्तमे रुद्रस्य त्रीण्यथापर मग्नेर्हरसी द्वेक्षुरस्य हरसी द्वेमृत्योर्हरः पञ्चमम् सामनी वा त्रिकाग्र्ये लोकानाम् शान्ति रुत्तमं पञ्चनिधनं वामदेव्य मिन्द्रस्य महावैराजं वसिष्ठस्य वाग्नेश्च मिथम् सर्पसाम कल्माषं वा स्वम्यं म् सेतुषाम पुरुषगतिर्वा विशोकं वा॥ १३ ॥

ত্বমিন্দ্র প্রতূর্ত্তিষু এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ত্রিবন্ধি অর্থাৎ সন্ধিত্রয়যুক্ত। বন্ মহামসি সূর্য এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম যজ্ঞসারথি। ইমং বৃষণং কৃণবতৈক মিন্নাম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। বৃষ শব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম বৃষা। যএক ইদ্বিদয়তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এক বৃষ শব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম এক বৃষ। যোগ ইদমিদংপুরঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বিদ্রথ। অভ্রাতৃব্যোঅনাত্বম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অভ্রাতৃশব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম অভ্রাতৃব্য।

রেবতী র্ন সধমাদ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। রেবতী শব্দযুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম রৈবত অথবা ইহাদের নাম রেবত্য।

উচ্চা তে জাতমন্ধসঃ ; সন ইন্দ্রায় যজ্যবে ; এণাবিশ্বানর্ষ্য আ এই ঋকত্রয়ে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম শাক্করবর্ণ। অয়ারুচাহরিণ্যাপুনানঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম নিত্যবৎসা। অভিত্বাশূর নোনুমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বসিষ্ঠের রথন্তর। ত্বামীদ্ধিহবামহে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম জমদগ্নির সপ্তহ।

আক্রন্দয় কুরু ঘোষং মহান্তম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্র যচ্চক্রমরাবৃণে এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। অভিত্বা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋক্‌ত্রয়াশ্রিত সাম পঞ্চক পবিমন্তি নামে খ্যাত। পবি শব্দের অর্থ আয়ুধ। সাম গুলির মধ্যে শল্য, চক্র, ক্ষুর প্রভৃতি আয়ুধ বাচক শব্দ রহিয়াছে। সুতরাং ইহারা পবিমন্তি মহাসাম। ইহাদের প্রথম ও শেষ সাম সর্বের এবং মধ্যের তিনটী রুদ্রের সাম। এখানে বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। ইহাদের প্রথম দুইটী অগ্নির হরনামক, পরের দুইটী ক্ষুরের হর সংজ্ঞক এবং অন্তিমটী মৃত্যুর হর নামধেয়। বিকল্পান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। অথবা ইহাদের প্রথম দুটী এবং অন্তিমটী লোকসমূহের শক্তি নামক।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | মাঘ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সন্ন্যাসব্রতচর্যা

অধ্যাপক **শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী**, এম্. এ. স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ

আচার্য গৌতমের মতে ভিক্ষু সাধারণতঃ সঞ্চয়শূন্য, ঊর্দ্ধরেতাঃ ও স্থিরস্বভাব। ভৈক্ষচর্যার বিধান আছে বলিয়াই বোধ হয় চতুর্থাশ্রমীকে ভিক্ষু বলা হয়। কিন্তু ভিক্ষার্থ কোন গ্রামে একাধিক রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা নাই। আপস্তম্ব বলেন—

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদশর্মাশরণো মুনিঃস্বধ্যায় এবোৎসৃজমানো বাচং গ্রামে প্রাণবৃত্তিং প্রতিলভ্যানিহোঽনমুত্রশ্চরেৎ'—আপ. ধ. সূ ২. ২১. ১০।

—অর্থাৎ 'নিরগ্নিক অবস্থায় গৃহহীন হইয়া সুখ ও আশ্রয় বর্জন করিয়া ভিক্ষু বাস করিবে। তাহাকে মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, কেবল দৈনিক বেদপাঠের সময় বাগ্ব্যবহার করিবে। কেবল প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত গ্রামাঞ্চলে গমন করিবে। ইহলোক ও পরলোক—কোন বিষয়ে চিন্তা না করিয়া বিচরণ করিবে।' বশিষ্ঠ বিধান দিয়াছেন—'অনিত্যাং বসতিং বসেৎ' (১০. ১২)। পরিব্রাজক সর্বভূতে অভয় প্রদান করিবে—'পরিব্রাজকঃ সর্বভূতাভয়দক্ষিণাং দত্বা প্রতিষ্ঠেৎ' (বশিষ্ঠ ধ. সূ ১০. ১)। সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেও বেদপাঠ বর্জন বিষয়ে শাস্ত্রকারগণের ঐকমত্য নাই। বশিষ্ঠ স্পষ্ট বলিয়াছেন—

'সন্ন্যসেৎ সর্বকর্মাণি বেদমেকং ন সন্ন্যসে।
বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সন্ন্যসেৎ ॥' (১০. ৪)

তবে কুটীরে সন্ন্যাসীর পক্ষেই এইরূপ বেদসন্ন্যাসের ব্যবস্থাও আছে।[১] সর্বস্পৃহা বর্জন করিয়া[২]

---

১ মনু ৬. ৯৪—৯৫ দ্রষ্টব্য।

২ গৌতম ধ. সূ. ৩. ১৬.

ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী একাকী বিচরণ করিবে[৩]—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও ইহার বিবরণ দৃষ্ট হয়[৪]।

সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের পূর্বে প্রাজাপত্য ইষ্টি ও সর্বস্ব দক্ষিণার ব্যবস্থা শাস্ত্রে উক্ত আছে। মনুস্মৃতির বিধান :—

"প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥"—৬. ৩৮

যাজ্ঞবল্ক্য[৫] ও বিষ্ণুস্মৃতি[৬] ও শঙ্খসংহিতায়ও[৭] অনুরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। হারীত সংহিতার মতে বৈশ্বানরী ইষ্টি সম্পন্ন করিয়াই প্রব্রজ্যা গ্রহণ চলিতে পারে।

সন্ন্যাসাশ্রমে অগ্নিহীন, বাসহীন, স্থিরমতি এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে কাল যাপন করিতে হয়। কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামে আশ্রয় লইবার নির্দেশ আছে। মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষের মূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, বেণুনির্মিত ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু—এই সকল সাধারণতঃ সন্ন্যাসীর চিহ্ন বা উপকরণ।

সায়াহ্নে অর্থাৎ অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চম ভাগে ভিক্ষাচরণ করিবার বিধি দৃষ্ট হয়,[৮] শঙ্খসংহিতার মতে যে সময়ে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় গৃহ ধূমশূন্য হইবে, গ্রামমধ্যে অগ্নি কি অঙ্গার পর্যন্ত থাকিবে না এবং ভোজনাদি ক্রিয়াসকল সমাপ্ত হইবে, সেই সময় ভিক্ষার্থ গ্রামে গমন করিতে হইবে (শঙ্খসংহিতা ৭. ২)। কোন্ গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ সে বিষয়ে মনু বলেন—যে গৃহস্থের ভবন বানপ্রস্থ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষার্থীর দ্বারা ব্যাপ্ত—এ প্রকার গৃহে ভিক্ষাকামনায় যতির গমন করিতে নাই।[৯] গণনা, হস্তবিচার ইত্যাদি করিয়া অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি দেখাইয়া ভিক্ষালাভ করা উচিত নহে।[১০] অপর ভিক্ষুর নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ। বিষ্ণু বলেন—'ন ভিক্ষুকং ভিক্ষেত' (৯৬. ৫)। তাঁহার মতে 'সপ্তাগারিকং ভৈক্ষ্যমাদদ্যাৎ'—অর্থাৎ সাত বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যাইবে। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইতে নাই-'অলাভে ন ব্যথেত' (বিষ্ণুস্মৃতি ৯৬. ৪)। আবার কেহ যদি পূজা পূর্বক ভিক্ষাদান করে তাহা গ্রহণ করিবে না (মনু ৬. ৫৭. ৮; মহাভারত ১২. ২৭৯. ১১)।

---

৩ বৌধায়ন ধ. সূ. ২. ১১. ১৬.
৪ অর্থশাস্ত্র, পৃ. ৩০.
৫ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩. ৫৬.
৬ বিষ্ণু° ৯৬. ১-২.
৭ শঙ্খ সং° ৭. ১.
৮ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩. ৫৯.
৯ মনু, ৬. ৫১।
১০ মনু, ৫০; বশিষ্ঠ সংহিতা, ১০. ২১.

কারণ সন্ন্যাসী—'নিরাশীঃ স্যাৎ, নির্নমস্কারঃ' (বিষ্ণুস্মৃতি ৯৬. ২১—২২)। যে পরিমাণ অন্নে তৃপ্তির সম্ভাবনা, কেবল সেই পরিমাণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিবে। সূর্যাদি ভূত দেবগণকে গ্রাসমাত্র অন্ন প্রদান করিবার উপদেশ হারীত সংহিতায় দেখা যায়।[১১] আহারের নিয়ম সম্বন্ধে বলা হয়—যতি এক পাত্রেই ভোজনারম্ভ করিবে না, বোধায়নের মতে আটগ্রাস ভোজন বিধেয় (২. ১৮. ১৩ দ্র°)। বট কিংবা অশ্বত্থপত্রে অথবা কাংস্যপাত্রে যতিগণের ভোজন নিষেধ (অপরার্ক পৃ° ৯৬৪ ধৃত নৃসিংহপুরাণের বচন দ্র°)। কেবল বারিধৌত করিলেই সেই পাত্রের শুদ্ধি হয় উক্ত হয়—

"ভুক্ত্বা পাত্রে যতির্নিত্যং ক্ষালয়েন্মন্ত্রপূর্বকম্।
ন দুষ্যতে চ তৎপাত্রং যজ্ঞেষু চমসা ইব ॥"—(হারীত ৬. ১৯)

মনু[১২], যাজ্ঞবল্ক্য[১৩], হারীত[১৪] ও শঙ্খ[১৫] প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রাচার্য সকলেই যতিকে সর্বভূতেহিতে রত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও প্রতি অপমানকর বাক্যপ্রয়োগ বা কটূক্তি করা উচিত নহে। এমন কি অপরে শত্রুতা বা ক্রোধোদ্দীপ্ত আচরণ করিলেও তাহার কল্যাণ ও প্রীতি সাধন করিতে হইবে। মনু বলেন—

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥
ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাঞ্চ[১৬] ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥" (মনু. ৬. ৪৭-৮)

বাস্তবিক ব্রহ্মভাবের অনুশীলন করিতে হইলে কাহাকেও ভেদবুদ্ধিতে দেখিলে চলে না। নির্বিকার ও স্থিরচিত্তে সকলকেই এক ব্রহ্ম মনে করিতে হইবে এবং ব্রহ্মবাণী ব্যতীত অন্য বাক্য উচ্চারণও শাস্ত্রবহির্ভূত। কারণ 'সমতা চৈব সর্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্'[১৭]। যাহাতে কোন ভূত বা প্রাণিবৃন্দের প্রতি হিংসা না হয় তন্নিমিত্ত প্রতি পাদক্ষেপের সময় বিশেষ অবহিত হইতে হইবে এবং জল পান কালে বস্ত্রখণ্ডে জল ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। তাই বিধি রহিয়াছে—

"দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদম্ বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥" (মনু ৬. ৪৬)

---

১১ হারীত সং° ৬. ১৫ 'সূর্যাদিভূতদেবেভ্যো দত্বা সম্প্রোক্ষ্য বারিণা'।

১২ ৬. ৩৯-৪০, ৪৭ দ্র°।

১৩ 'সর্বভূতহিতঃ শান্তঃ'—যাজ্ঞ° ৩. ৫৮.

১৪ ৬. ২২ দ্র°।　　　১৫ 'সর্বভূতহিতো মৈত্রঃ'—শঙ্খ° ৭. ৮.

১৬ চক্ষুরাদি পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি—এই অন্তঃকরণদ্বয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থে বাক্যের ব্যবহার হয় বলিয়া উহাকে সপ্তদ্বার বিষয়ক বলা হইল।

১৭ মনু ৬. ৪৪.

সন্ন্যাসীর বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে গৌতম বলেন—'কৌপীনাচ্ছাদনার্থং বাসো বিভূয়াৎ' (৩. ১৮)। কেহ বলেন—ঐ বস্ত্র অতি নিকৃষ্ট হইবে এবং কখনও উহার মলশোধন হইবে না।[১৮] বোধায়নের মতে উক্ত কৌপীনবাস কুশস্তু বা কষায়রঞ্জিত হইবে (২. ১১. ১৯. ২১)। আপস্তম্বের মতে অপরের পরিত্যক্ত বসন ব্যবহার্য (২. ২১. ১১)। মনু[১৯] ও মহাভারতে[২০] নিকৃষ্ট বস্ত্রের ব্যবস্থা আছে। বশিষ্ঠ এক বস্ত্র, চর্মবাস বা তৃণাচ্ছাদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অরণ্যে সর্বস্পৃহাবর্জিত হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে সন্ন্যাসীর পক্ষে শরীরসুখার্থ পরিচ্ছদ ব্যবহারের যে কোন প্রয়োজন নাই সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? কেবল নগ্নতামাত্র আচ্ছাদনের জন্য জীর্ণ, মলিন, অপরের ত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড বা যাহা আরণ্য জীবনে অনায়াসলভ্য—চর্মবাস বা তৃণাচ্ছাদন ইত্যাদি—তাহাই ব্যবহারের উপদেশ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

পরিব্রাজকের মহাব্রত সম্বন্ধে বৌধায়ন নিম্নোক্ত কয়েকটীর নির্দেশ দিয়াছেন—'অথেমানি ব্রতানি ভবন্তি। অহিংসা সত্যমস্তৈন্যং মৈথুনস্য বর্জনং ত্যাগ' ইতি (২. ১০. ৪১)। আধান প্রভৃতি অগ্নিসাধ্য ক্রিয়া আত্মস্থ করিবার ব্যবস্থাও বৌধায়ন দিয়াছেন। তাহার মতে—'পঞ্চ বা এতেঽগ্নয় আত্মস্থাঃ' (২. ১০ ৪৭)। ইহারই নাম আত্মযজ্ঞ এবং আত্মযজ্ঞনিষ্ঠ হইলে আত্মার মঙ্গল সাধিত হয়। কারণ উক্ত হয়—

'স এব আত্মযজ্ঞ আত্মনিষ্ঠ আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মানং ক্ষেমাং নয়তীতি বিজ্ঞায়তে'

(বৌধায়ণ ধ. সূ. ২. ১০. ৪৯)।

মনুও অনুরূপ বিধান দিয়াছেন—'আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ' (মনু ৬. ৩৮)। সর্বসঙ্গবর্জিত হইয়া আত্মসিদ্ধির জন্য নিত্য একাকী বিচরণ করিতে হইবে।[২১]

যতিধর্ম প্রসঙ্গে মনু[২২] ও যাজ্ঞবল্ক্য[২৩] দশ প্রকার সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। মনুর বচন, যথা—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥" (মনু ৬. ৯২)

এই কয়টী সাধারণ ধর্ম, অর্থাৎ সকল আশ্রমেই এই ব্রতচর্যার অনুষ্ঠান দরকার। তদ্ব্যতীত যতির পক্ষে আরও বিশিষ্ট ব্রতচর্যার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

---

১৮ গৌতম ধ. সূ, ৩. ১৯ দ্র°।

১৯ মনু, ৬. ৪৪......'কুচেলমসহায়তা'।

২০ মহাভারত, ১২. ২৪৫. ৭.

২১ মনু, ৬. ৪২.

২২ মনু, ৬. ৯২.

২৩ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩, ৬৬,

যতি সর্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবে ; কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবে না—সর্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবে ; কেবল আত্ম সহায়েই একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ-সংসারে বিচরণ করিবে [২৪] যতি কেবল প্রাণ ধারণের জন্য একবারমাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন—অধিক ভিক্ষা করিবেন না ;—মনু এই নিয়মের কারণ দেখাইয়া বলিয়াছেন—অন্যথায় ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে বিষয়াশক্তি জন্মিতে পারে—'ভৈক্ষে প্রসক্তো হি যতির্বিষয়েষ্বপি সজ্জতে' (৬. ৫৫)। যাহাকে সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে দূরে থাকিতে হইবে তাহাকে তদনুকূল কঠোর ব্রতচর্যা পালন করা দরকার। এই জন্যই ভিক্ষাদ্রব্য ও অপরাপর ব্যবহার্য দ্রব্যের আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সুখ ও দুঃখে সমতা জ্ঞান ব্যতীত ইন্দ্রিয় সংযম সম্ভব নয়। তাই মনুস্মৃতিতে বিধি রহিয়াছে—ভিক্ষাদির অলাভে বিষণ্ণ হইবে না বা লাভেও আহ্লাদিত হইবে না।

"অলাভে ন বিষাদী স্যাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥" (৬. ৫৭)

বিশেষতঃ 'ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয় এবং সর্বভূতে অহিংসা—এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভের অধিকারী হন'।[২৫]

সন্ন্যাসী মুক্তিলাভের নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন। হারীত বলেন—

"যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানি তু।
তস্মাদ্ যোগপরো ভূত্বা ধ্যায়েন্নিত্যং ক্রিয়াপরঃ॥" (হারীত সং° ৭. ৩)

যোগাভ্যাস সম্বন্ধে হারীত যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রকার :—অগ্রে দুর্ধর্ষ মনকে ধারণা দ্বারা বশ করিয়া প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার দ্বারা যথাক্রমে বাক্য ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশ করিতে হইবে। এইরূপে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করিয়া জ্ঞানস্বরূপ জগদাধার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হইবে।

"যৎ সর্বপ্রাণিহৃদয়ং সর্বেষাঞ্চ হৃদি স্থিতম্।
যচ্চ সর্বজনৈর্জ্ঞেয়ং সোঽহমস্মীতি চিন্তয়েৎ॥" (হারীত সং ৭. ৭)

অর্থাৎ—'যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়, যিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, যিনি সকলের জ্ঞেয় সেই পরমাত্মাই "আমি"—এই প্রকার চিন্তা করিবে।' এবং এই প্রকার চিন্তার অনুকূল বিদ্যা ও তপস্যার একত্র সম্মেলন করিতে হইবে। এইরূপে যোগী ব্রহ্মধ্যানে আসীন হইয়া দেহান্তে অনন্ত সত্য সুখস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২৬] শঙ্খসংহিতার ব্যবস্থাতেও দেখা যায়—'ধ্যানযোগরতো নিত্যং ভিক্ষুর্যায়াৎ পরাং গতিম্' (৭. ৮)।

---

২৪ মনু, ৬. ৪৯ দ্র°।

২৫ মনু, ৬. ৬০

২৬ হারীত সং° ৭ম অধ্যায় দ্র°।

ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম প্রত্যাহার দ্বারা যোগ অভ্যাসে যতি মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। তাহার আর পুনর্জন্মরূপ সংসারবন্ধন হয় না বশিষ্ঠ স্মৃতিতে উক্ত হয়—

"অরণ্যনিত্যস্য জিতেন্দ্রিয়স্য সর্বেন্দ্রিয়প্রীতিনিবর্তকস্য।
অধ্যাত্মচিন্তাগতমানসস্য ধ্রুবা হ্যনাবৃত্তিরুপেক্ষকস্য॥" (১০ অধ্যায়)।

অর্থাৎ—'নিয়ত অরণ্যবাসী জিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়সুখে বিতৃষ্ণ, অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ, উপেক্ষাশীল সন্ন্যাসীর পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।' কিন্তু তত্বচিন্তন ব্যতীত বিষয়বৈরাগ্য আয়ত্ত করা যায় না। অতএব মনু বলেন—

"অবেক্ষেত গতির্নৃণাং কর্মদোষসমুদ্ভবাঃ।
নিরয়ে চৈব পতনং যাতনাশ্চ যমক্ষয়ে॥
বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাপ্রিয়ৈঃ।
জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নম্॥" (৬. ৬১-২)

অর্থাৎ—'কর্মদোষ হেতু জীবের নানাপ্রকার গতিপ্রাপ্তি, নরকে পতন এবং যমালয়ের যাতনা—এই সকল সর্বদা পর্যালোচনা করিবে। প্রিয়জনের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরা কর্তৃক অভিভব, ব্যাধির উৎপীড়ন ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিবে।' যাজ্ঞবল্ক্য[২৭] ও বিষ্ণুস্মৃতিও[২৮] অনুরূপ ব্যবস্থা দিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—'বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু, নিষিদ্ধ আচরণ-জনিত নরকগমনাদি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা অস্মিতা, রাগদ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চবিধ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বাদি জনিত রূপবিকার—এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া যাহাতে আর সংসারে আসিতে না হয়, তজ্জন্য নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে সূক্ষ্ম আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে' (যাজ্ঞবল্ক্য ৩. ৬৩—৬৪ দ্রঃ)। বিষ্ণু বলেন—'এই সততযায়ী সংসারে কিছুই সুখ নাই। দুঃখাপেক্ষা যাহা কিছু সুখ নামে এই জগতে পরিচিত, তাহাও অনিত্য; সেই অনিত্য সুখভোগে আসক্তি বা সুখের অলাভে মহাদুঃখ—এসকলও আলোচনা করিবে (বিষ্ণুস্মৃতি ৯৬. ৪০—৪২)।

যতি কোন প্রাণীর প্রতি হিংসাচরণ করিবে না। যদি অজ্ঞানবশতঃ দিবারাত্রির মধ্যে কোন প্রাণিবিনাশ হয়, তাহা হইলে সেই পাপশুদ্ধির নিমিত্ত ছয়বার প্রাণায়াম করা বিধেয়—ইহাই মনুর নির্দেশ।[২৯] কারণ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায় (মনু ৬.৭১)। বশিষ্ঠও বলেন—'একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরন্তপঃ' (১০. ৫)। মনুর উপদেশ এই—প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ দগ্ধ করিবে, চিত্তবন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপসকল নষ্ট করিবে এবং স্ব-স্ব বিষয় হইতে

---

২৭ যাজ্ঞবল্ক্য, ৩. ৬৩—৪ দ্রঃ

২৮ বিষ্ণুস্মৃতি, ৯৬. ২৭. ২৯. ৩৬—৩৮ দ্রঃ

২৯ মনু, ৬. ৬৯,

ইন্দ্রিয়-আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপসকল দূর করিতে চেষ্টা করিবে এবং এইরূপে পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদি অনীশ্বর গুণসকলকে জয় করিবে।৩০

জীবের দেবপশ্বাদি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট যোনিতে কি কারণে পুনঃপুনঃ জন্ম পরিগ্রহ হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয়। অতএব ধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত এবং এই ধ্যানযোগেই আত্মদর্শন লাভ হয়। যাহার আত্মদর্শন লাভ হইয়াছে তাহাকে আর সংসারবন্ধনে পতিত হইতে হয় না। সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এই জীবদেহ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। মনু বলেন—

"নদীকূলং যথা বৃক্ষো বৃক্ষং বা শকুনির্যথা।
তথা ত্যজন্নিমং দেহং কৃচ্ছ্রাদ্ গ্রাহাদ্বিমুচ্যতে॥" (৬. ৭৮)

যতির পক্ষে বেদসন্ন্যাস সাধারণতঃ বিহিত না হইলেও কুটীচর নামক যতিবিশেষকে বেদসন্ন্যাসী বলা হয়। কুটীচর, বহূদক, হংস ও পরমহংস ভেদে সংযতাত্মা যতিদিগের চারিপ্রকার শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে উক্ত হয়—

"চতুর্ধা ভিক্ষবস্তু স্যুঃ কুটীচরবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥"

কুটীচর ব্যতীত অন্য যতিগণের বেদত্যাগ উচিত নহে। বশিষ্ঠের মতে সর্বকর্ম ত্যাগ বিহিত হইলেও বেদত্যাগ সন্ন্যাসীর উচিত নয়। কারণ বেদসন্ন্যাস বশতঃ শূদ্রত্ব পাইতে হয়—'বেদসন্ন্যাসতঃ শূদ্রস্তস্মাদ্বেদং ন সন্ন্যসেৎ' (১০.৪)। আপস্তম্বও বলেন—'সর্বেষামনুৎসর্গো বিদ্যায়াঃ' (২. ২১. ৪) মনুর ব্যবস্থায় দৃষ্ট হয়—

"অধিযজ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকমেব চ।
আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ॥" (৬, ৮৩)

অর্থাৎ—'যজ্ঞ সম্বন্ধীয় যে সকল বেদমন্ত্র আছে,—দেবতাসম্বন্ধীয় বেদমন্ত্র পরমাত্মা বিষয়ে বেদমন্ত্র অথবা বেদান্তাদিতে যে সমুদয় শ্রুতি উক্ত হয়—সর্বদা সে সকল জপ করা কর্তব্য।' ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে তাহার অঙ্গকর্মরূপে বেদজপের উপদেশ শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। 'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি' (বৃহদারণ্যক উ° ৪. ৪. ২২)। উপনিষৎপ্রমাণ বেদান্তাদি শাস্ত্রে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি যে সকল ব্রহ্ম-প্রতিপাদক 'শ্রুতি আছে তাহাও সর্বদা জপ করা উচিত। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং শ্রুতিবাক্য হইতেই শ্রবণ করা দরকার। কারণ, উক্ত হয়—

'শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ'

বেদসন্ন্যাসী কুটীচর অগ্নিহোত্রাদি গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সমুদয় কর্মত্যাগ করিয়া যমনিয়মাদি

---

৩০ মনু, ৬. ৭২ দ্র°

অবলম্বন পূর্বক বেদাভ্যাস করিবার পর ক্রমশঃ বেদসন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এবং পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছদনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিত করিবেন।৩১ কুটীচর সন্ন্যাসী নিজ ইচ্ছায় গ্রামেও বাস করিতে পারে কিন্তু তাহাকে স্থিরমতি ও অসঞ্চয়ী হইয়া বাস করিতে হইবে।৩২

সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে বিষযসঙ্গ পরিত্যাগ বিধেয়। কুটীর, জল, বস্ত্র, আসন ও গৃহাদি প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যের অনাশক্তি হইতে ক্রমশঃ বিষয়সঙ্গ ত্যাগের অভ্যাস আরম্ভ করিতে হইবে। এই অভিসন্ধি লইযাই বশিষ্ঠের নিম্নোক্ত স্তুতিবাদ—

"ন কুট্যাং নোদকে সঙ্গে ন চৈলে ন ত্রিপুষ্করে।
নাগাবে নাসনে নান্তে যস্ত বৈ মোক্ষবিত্তমঃ॥" (বশিষ্ঠ ১০. ২০)।

এইরূপে বিষয়াসক্তি দূর কবিযা সংসাববন্ধকব সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইতে হইবে। তখন জীবন বা মরণ কোন কিছুই তাহার কাম্য থাকিবে না। মনুব বচন, যথা—

"নাভিনন্দেত মবণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥" (মনু ৬. ৪৫)

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাণাযাম, ধারণা ও প্রত্যাহার ইত্যাদি বিভিন্ন যোগপদ্ধতি যতিগণের পক্ষে নিয়ত অভ্যাস কবা দরকার। পাতঞ্জলকৃত যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গযোগেব বিস্তৃত আলোচনা আছে। শঙ্খসংহিতায এ বিষয়ে প্রাণায়াম, ধারণা ও প্রত্যাহার—এই কয়েকটার নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গাযত্রীং শিবসা সহ।
ত্রিঃ পঠেযায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥৩৩
মনসঃ সংযমস্তজ্জ্ঞৈর্ধারণেতি নিগদ্যতে।
সংহারশ্চেন্দ্রিযাণাঞ্চ প্রত্যাহারঃ প্রকীর্তিতঃ॥
হৃদয়স্থস্য যোগেন দেবদেবস্য দর্শনম্।
ধ্যানং প্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি সর্বস্মাদ্ যোগতঃ শুভম্॥৩৪ (শঙ্খসং° ১৩-১৫)

ইন্দ্রিয় নিরোধের পক্ষে এ সকল যোগাভ্যাসের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। যোগেব সাধারণ সংজ্ঞাতেই উক্ত হয়—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'। যতাত্মা বলিয়াই সন্ন্যাসীকে যতি বলা হয় এবং যোগের দ্বারাই আত্মদর্শন সম্ভব। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

'অয়ন্তু পরমো ধর্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম' (১. ৮)।

---

৩১ মনু, ৬. ৯৪—৯৫ দ্র°।

৩২ বশিষ্ঠ, ১০. ২৬—২৭ দ্র°।

৩৩ মনু, ২. ৮১ ও ৮৩ দ্র°।

৩৪ মনু, ৬. ৭৩. শ্লোকে উল্লেখ আছে—ধ্যানের দ্বারা জীবের উচ্চনীচ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহের কারণ জানিতে পারা যায়।

এবং যোগের দ্বারাই পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব, নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি হয়। মনুও তাই নির্দেশ দিয়াছেন—

"সূক্ষ্মতাঞ্চাম্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষধমেষু চ ॥" (মনু ৬. ৬৫)

আত্মজ্ঞানে পরমনিঃশ্রেয়স মুক্তিপদ লাভ হয়। ধ্যানযোগে সম্যক্ আত্মদর্শন লাভ হইলে পাপপুণ্য কর্মসকলের দ্বারা আর সংসার বন্ধন হয় না।৩৫ মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হয়—'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' (২. ২. ৮) গীতায়ও এই বাণী ঘোষিত হয়—

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥" (গীতা. ৪. ৩৭)

অবশ্য অনাসক্তভাবে জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রারব্ধ কর্ম অর্থাৎ শরীরারম্ভক কর্মাদৃষ্ট ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হয়। বেদান্তসূত্রেও বাদরায়ণ সেইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন—'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে' (৪. ১. ১৯)। শঙ্করাচার্য এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—'ইতরে তু আরব্ধকার্যে পুণ্যপাপে উপভোগেন ক্ষপয়িত্বা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে'। কিন্তু যে সকল পুণ্য ও পাপের অদৃষ্ট পরিপক্ক হইয়া ফলারম্ভ সম্পন্ন করে নাই, সেই সকল পাপপুণ্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয়। তাই বাদরায়ণ বলেন—'অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ' (৪. ১. ১৮)। মনুও বলেন—

"অনেন বিধিনা সর্বাংস্ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্বদ্বন্দ্ববিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ (মনু ৬. ৮১)
এবং সন্ন্যস্য কর্মাণি স্বকার্যপরমোঽস্পৃহঃ।
সন্ন্যাসেনাপহত্যৈনঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥" (মনু ৬. ৯৬)

---

৩৫ সম্যগ্ দর্শনসম্পন্নঃ কর্মভির্ন নিবধ্যতে—মনু ৬. ৭৪.

স্যাদ্বাদ*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

জৈন দর্শনের সুবিখ্যাত স্যাদ্বাদ বা অনেকান্তবাদ পূর্বেই একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্যাদ্বাদ কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টার এখানে প্রয়োজন নাই। স্যাদ্বাদের সমর্থন ও খণ্ডন তত্ত্বসংগ্রহে যেরূপ আছে তাহাই নিম্নে দেওয়া হইল; ইহা হইতেই স্যাদ্বাদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের অনতিকাল পূর্বে ভারতবর্ষে কি প্রকারের মতামত প্রচলিত ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

স্যাদ্বাদ সমর্থনের জন্য পূর্বপক্ষী প্রথমেই বলিতেছেন :—

নম্বনেকাত্মকং বস্তু যথা মেচকরত্নবৎ।
প্রকৃত্যৈব সদাদীনাং কো বিরোধস্তথা সতি ॥ ১৭০৯ ॥

কমলশীলের মতে ইহা হইল আহ্রীকাদি জৈনাচার্যের কথা। আহ্রীক এখানে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা এই যে প্রত্যেক বস্তুই যখন একাধারে সামান্য এবং বিশেষ তখন স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুমাত্রেই অনেকাত্মক; হীরকের যেমন বহুবিধ বর্ণচ্ছটা (শবলাভাসং রত্নম্) বস্তুর স্বভাবও তদ্রূপ বহুবিধ। বৌদ্ধগণ যে বলেন একের বহুবিধত্ব সম্ভব হয় না সে কথা ভুল। বহুবিধত্বই হইল বস্তুর স্ব-ভাব।

বস্তু যে একাধারে সামান্য ও বিশেষ—এবং সেইজন্য বহুবিধ—তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আহ্রীক বলিতেছেন :—

ভাবো ভাবান্তরাতুল্যঃ খপুষ্পান্ন বিশিষ্যতে।
অতুল্যত্ববিহীনশ্চেত্তেভ্যো ভিন্নো ন সিধ্যতি ॥ ১৭১০ ॥

অর্থাৎ, যে-ভাববস্তু অপর সমস্ত ভাববস্তুর অতুল্য (unsimilar) তাহা হইতে আকাশকুসুমের কোন পার্থক্য নাই; অপর দিকে কোন বস্তু যদি এরূপ হয় যে তাহা অপর কোন বস্তুরই অতুল্য নহে তবে তাহা যে সেই অপর বস্তুগুলি হইতে পৃথক্ একটি সত্তা এ-কথা স্বীকার করা যায় না।—এই কথাটি ভাল করিয়া বোঝা দরকার, কারণ ইহাই ছিল স্যাদ্বাদী জৈনদিগের প্রধান যুক্তি। বৌদ্ধগণ বলিতেন অর্থক্রিয়া (effective action) উৎপাদনের শক্তি যে-বস্তুর নাই সে-বস্তু অসৎ; জৈনদিগের কিন্তু মত ছিল এই যে জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা জগতের অপর কোন বস্তুর সম্পূর্ণ অতুল্য। বৌদ্ধদিগের মত জৈনগণও স্বীকার করিতেন যে অপরাপর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে যে-জ্ঞান জন্মে তদতিরিক্ত সেই

---

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 14.

বস্তু সম্বন্ধে জানিবার কোন উপায় নাই। ইহা হইতে বিজ্ঞানবাদে ও বেদান্তে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে বস্তুর প্রকৃত সত্তাই নাই; জৈনগণ কিন্তু বলিতেন যে বস্তু সৎ, তবে তাহা প্রকৃত যে কিরূপ তাহা জানা অসম্ভব। অপরাপর বস্তুর সহিত একটি বিশেষ বস্তুর যে-পরিমাণ সাদৃশ্য বা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, মাত্র সেই পরিমাণেই আমরা সেই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তুল্যত্বাই হইল জৈন মতে বস্তুর লক্ষণ। আকাশকুসুম যে অবস্তু তাহার কারণ জৈন মতে এই যে আকাশকুসুমের সহিত অপর কোন বস্তুর তুল্যতা নাই। কমলশীল জৈন মত সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "নচ বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবৃত্তস্যান্যা গতিঃ সম্ভবতি খপুষ্পতাং মুক্ত্বা।" বস্তুমাত্রেই তাহা হইলে অপর বস্তুর সহিত তুল্যতা বিশিষ্ট। এই তুল্যতা কিন্তু অনন্যত্ব নহে, কারণ তাহা হইলে কোন বস্তুকেই আর "ভিন্ন" বস্তু বলিয়া মনে করিবার কারণ থাকিবে না। বস্তুত্ব সিদ্ধির জন্য তুল্যত্ব ও অতুল্যত্ব উভয়ই প্রয়োজন।—ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে বৈশেষিক দর্শনে যাহা সামান্য ও বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ তাহাই ছিল জৈনাচার্যগণের মতে তুল্যত্ব ও অতুল্যত্ব। বস্তুর এই তুল্যত্ব ও অতুল্যত্ব প্রতিপাদনের জন্য পূর্বপক্ষী আরও বলিতেছেন :—

সর্বথাপি হ্যতুল্যত্বে হ্যভিপ্রেতেঽস্য বস্তুনঃ।
বস্ত্বন্তরেণ নিয়তং বস্তুত্বমবহীয়তে ॥ ১৭১১ ॥
বস্তুনো হি নিবৃত্তস্য কান্যা সম্ভবিনী গতিঃ।
লক্ষ্যতে নাস্তিতাং মুক্ত্বা তারাপথসরোজবৎ ॥ ১৭১২ ॥
তস্মাৎ খপুষ্পাতুল্যত্বমিচ্ছতা তস্য বস্তুনঃ।
বস্তুত্বং নাম সামান্যমেষ্টব্যং তৎসমানতা ॥ ১৭১৩ ॥

অর্থাৎ, অভিপ্রেত বস্তুটি যদি এমন হয় যে কিছুরই সহিত তাহার তুল্যত্ব নাই তবে বস্তুটির বস্তুত্বেরই হানি হয়। কারণ বস্তুত্ব যদি বস্তুতে বর্তমান না থাকে তবে অবশ্যই আকাশকুসুমাদি অবস্তুর মধ্যে বস্তুত্বের সন্ধান করিতে হইবে! সুতরাং যাঁহারা বস্তুকে খপুষ্পের ন্যায় অলীক বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহাদিগকে বস্তুত্ব রূপ সামান্য স্বীকার করিতে হইবে।—আরও বক্তব্য এই যে :—

অন্যথা হি ন সা বুদ্ধির্বলিভুগ্দশনাদিষু।
বর্ততে নিয়তা ত্বেষা ভাবেষ্বেবেতি কিং কৃতম্ ॥ ১৭১৪ ॥
সারূপ্যান্নিয়মোঽয়ং চেৎ সামান্যং চ তদেব নঃ।
স্বভাবানুগতা শক্তিরনেনৈবোপবর্ণিতা ॥ ১৭১৫ ॥
অত্যন্তভিন্নতা তস্মাদ্ঘটতে নৈব কস্যচিৎ।
সর্বং হি বস্তুরূপেণ ভিদ্যতে ন পরস্পরম্ ॥ ১৭১৬ ॥

অর্থাৎ, কোন বস্তু যদি বাস্তবিক কোন বিষয়ে অপর কোন বস্তুর তুল্য না হয় তবে বস্তুত্ববিষয়ক বুদ্ধি কাকদন্তাদি অলীক পদার্থ সম্বন্ধে উৎপন্ন না হইয়া কেবল মাত্র ভাববস্তুতেই নিবদ্ধ থাকে কেন? যদি বলা যায় যে সারূপ্যই এই নিয়মের ভিত্তি তবে এই কথার দ্বারা আমরা যাহাকে

সামান্য বলি তাহাই ভিন্ন নামে স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। একথা বলিলেও কোন লাভ হইবে না যে স্বাভাবিক শক্তি অনুযায়ীই ঘটাদিকে বস্তু ও কাকদন্তাদিকে অবস্তু বলিয়া মনে হয়, কারণ এতদ্দ্বারাও প্রকারান্তরে সেই সামান্যই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল ("দুইটি বস্তুর শক্তি বিভিন্ন" বলিতে যাহা বুঝায় তাহা একপক্ষে বাস্তবিকই এই যে বস্তুদ্বয় একই সামান্যের অন্তর্গত নহে)। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কোন বস্তু সর্ব বিষয় হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন হইতে পারে না। সকল বস্তুই বস্তুত্ববিশিষ্ট, সুতরাং সেই দিক্ দিয়া সকল বস্তুর মধ্যেই যে একটা তুল্যতা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।—এই সঙ্গেই কিন্তু আরও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রত্যেক বস্তুরই আবার ভেদ ও বৈশিষ্ট্যও আছে :—

অবধীকৃতবস্তুভ্যো বৈরূপ্যরহিতং যদি।
তদ্বস্তু ন ভবেদ্ভিন্নং তেভ্যো ভেদস্তদাত্মবৎ॥ ১৭১৭॥
তেভ্যঃ স্বরূপং ভিন্নং হি বৈরূপ্যমভিধীয়তে।
বৈরূপ্যং ন চ ভিন্নং চেত্যেতদন্যোন্যবাধিতম্॥ ১৭১৮॥
তস্মাদ্ভিন্নত্বমর্থানাং কথঞ্চিদুপগচ্ছতা।
বৈরূপ্যমুপগন্তব্যং বিশেষাত্মকতাপ্যতঃ॥ ১৭১৯॥

অর্থাৎ, কোন বিশেষ বস্তুর যদি অপরাপর বস্তু হইতে কোন বৈরূপ্যই না থাকে তবে আর সেটি অপর বস্তু হইতে পৃথক্ হইবে কিরূপে? অপর বস্তু হইতে বিভিন্ন স্বরূপই হইল বৈরূপ্য; সুতরাং বৈরূপ্য আছে অথচ ভিন্নত্ব নাই—এরূপ কথা পরস্পরের বাধক। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কিছু মাত্র ভিন্নত্বও যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদিগকে এই বৈরূপ্য ও বিশেষাত্মকত্বও স্বীকার করিতে হইবে।—বস্তুর এই দ্বৈরূপ্য প্রতিপাদনের জন্য জৈন আরও বলিতেছেন :—

বস্ত্বেকাত্মকমেবেদমনেকাকারমিষ্যতে।
তে চানুবৃত্তিব্যাবৃত্তিবুদ্ধিগ্রাহ্যতয়া স্থিতাঃ॥ ১৭২০॥
আদ্যা এতেঽনুবৃত্তত্বাৎ সামান্যমিতি কীর্তিতাঃ।
বিশেষাস্ত্বভিধীয়ন্তে ব্যাবৃত্তত্বাত্ততোঽপরে॥ ১৭২১॥

অর্থাৎ, বস্তু নিশ্চয়ই একাত্মক, কিন্তু বস্তুর আকার অনেক; বস্তুর এই একত্ব অনুবৃত্তিবুদ্ধির দ্বারা এবং অনেকত্ব ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। বস্তুবিষয়ক যে-সকল বুদ্ধি অনুবৃত্ত হইতে থাকে সেইগুলিই সামান্য নামে পরিচিত, এবং যে-সকল বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তু অপরাপর বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত হয় সেইগুলিই হইল বিশেষ।

বৌদ্ধ এইবার উত্তর দিতেছেন :—

পরস্পরস্বভাবত্বে স্যাৎ সামান্যবিশেষয়োঃ।
সাংকর্যং তত্ত্বতো নেদং দ্বৈরূপ্যমুপপদ্যতে॥ ১৭২২॥
পরস্পরাস্বভাবত্বেঽপ্যনয়োরনুষজ্যতে।
নানাত্মমেবম্ভাবেঽপি দ্বৈরূপ্যং নোপপদ্যতে॥ ১৭২৩॥

অর্থাৎ সামান্য ও বিশেষ যদি এরূপ হয় যে একের স্বভাব অপরে বর্তমান তবে সাংকর্য বশতঃ কোন ক্ষেত্রেই বলা যাইবে না কোন্‌টি সামান্য এবং কোন্‌টি বিশেষ; সুতরাং স্বীকার করা যায় না যে সামান্যে বিশেষ ও বিশেষে সামান্য বর্তমান অথবা প্রত্যেক বস্তুরই দুইটি বিভিন্ন রূপ আছে। অপরদিকে, সামান্য ও বিশেষের পরস্পরস্বভাবত্ব যদি অস্বীকার করা হয় তবে তদ্দ্বারা এতদ্দুয়ের নানাত্বই স্বীকার করা হইবে; সুতরাং এই পক্ষেও বস্তুর দ্বৈরূপ্য সিদ্ধ হইতেছে না।—এই যুক্তির বিরুদ্ধে জৈনাচার্য সুমতি বলিয়াছেন :—

সত্যপ্যেকস্বভাবত্বে ধর্মভেদোঽত্র সিধ্যতি।
ভেদসংস্থাবিরোধশ্চ যথা কারকশক্তিষু॥ ১৭২৪॥
ন দৃষ্টেঽনুপপন্নং চ যৎ সামান্যবিশেষয়োঃ।
একাত্ম্যেঽপীক্ষ্যতে ভেদলোকযাত্রানুবর্তনম্॥ ১৭২৫॥

অর্থাৎ, বস্তু একস্বভাব হইলেও তাহার ধর্ম বিবিধ হইতে পারে, একই বস্তুতে বিবিধ ভেদ স্বীকার করিলে যুক্তিবিরোধী কিছুই করা হইবে না—একই বস্তুব যেমন বিবিধ কারক শক্তি থাকে ইহাও তদ্রূপ। তাহার উপর আরও বিবেচ্য এই যে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা অনুপপন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; এখন সামান্য ও বিশেষ একাত্মক হইলেও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে যে তাহাদের ভেদও উপলব্ধ হয় এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শান্তরক্ষিত সুমতির বিরুদ্ধে বলিতেছেন :—

নন্বু সত্যেকরূপত্বে ধর্মভেদো ন সিধ্যতি।
অকল্পিতো বিভেদো হি নানাত্বমভিধীয়তে॥ ১৭২৬॥

অর্থাৎ, বস্তু যদি বাস্তবিকই একরূপ হয় তবে তাহার ধর্মভেদ সম্ভব হইতে পারে না; যে-ভেদ কল্পনামাত্র নহে তাহা নানাত্বেরই নামান্তর।—দৃষ্টান্তস্বরূপ শক্তির বৈবিধ্য সম্বন্ধে পূর্বপক্ষী (১৭২৪ সংখ্যক কারিকায়) যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে তাহা যে কেবল সাধ্য-শূন্য তাহাই নহে, বিপরীত সাধ্যেও পূর্বপক্ষীর হেতুর ব্যাপ্তি রহিয়াছে :—

নানাত্মত্বং চ শক্তীনাং বিবক্ষামাত্রনির্মিতম্।
একতত্ত্বাত্মকত্বে হি ন ভেদোঽত্রাপি যুক্তিমান্॥ ১৭২৭॥

অর্থাৎ, শক্তির তথাকথিত নানাত্বের কারণ বক্তার ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে; শক্তি সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে ইহা একাত্মক এবং ইহাতেও ভেদের কোন অবকাশ নাই।—জৈন যদি এখন বলেন যে ভেদ বলিতে নানাত্ব বুঝাইলেও সেই নানাত্ব একই বস্তুর পক্ষে সম্ভব হইবে না কেন, তবে বক্তব্য :—

একমিত্যুচ্যতে তদ্ধি যত্তদেবেতি গীয়তে।
নানাত্মকং তু তন্নাম ন তত্ত্বতি যৎ পুনঃ॥ ১৭২৮॥

তদ্ভাবশ্চাপ্যতদ্ভাবঃ পরস্পরবিরোধতঃ।
একবস্তুনি নৈবায়ং কথঞ্চিদবকল্প্যতে ॥ ১৭২৯ ॥

অর্থাৎ, যে-বস্তু সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় "ইহাই তাহা" সেই বস্তুই হইল একাত্মক, এবং যৎ-সম্বন্ধে বলা হয় "ইহা তাহা নহে" তাহাই হইল নানাত্মক; সুতরাং তদ্ভাব ও অতদ্ভাব যখন পরস্পরের বিরোধী তখন এতদ্দ্বয় কখনই একই বস্তুতে কল্পনা করা যায় না।

জৈন এখন বলিতেছেন, একই বস্তুতে পরস্পর বিরোধী রূপ যে সমন্বিত হয় না তাহা নহে, নরসিংহাদির অনেকান্তত্ব সুপ্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরে বৌদ্ধের বক্তব্য :—

নরসিংহাদয়ো যে হি দ্বৈরূপ্যেণোপবর্ণিতাঃ।
তেষামপি দ্বিরূপত্বং ভাবিকং নৈব বিদ্যতে ॥ ১৭৩৩ ॥
স হ্যনেকাণুসন্দোহস্বভাবো নৈকরূপবান্।
যচ্চিত্রং ন তদেকং হি নানাজাতীয়রত্নবৎ ॥ ১৭৩৪ ॥
ঐক্যে স্যান্ন দ্বিরূপত্বান্নানাকারাবভাসনম্।
মক্ষিকাপদমাত্রেঽপি পিহিতেঽনাবৃতিশ্চ ন ॥ ১৭৩৫ ॥

অর্থাৎ, নরসিংহ প্রভৃতি যে-সকল বস্তুকে দ্বিরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হয় সেগুলিতেও দ্বৈরূপ্য প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান। নরসিংহও বহু পরমাণুর সমূহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহাকেও একরূপ বলা যায় না। যাহা বৈচিত্র্যপূর্ণ তাহা নানাজাতীয় রত্নের সমূহের ন্যায়—তাহা "এক" নহে। বস্তুর ঐক্য যদি যথার্থ হইত তাহা হইলে তাহাতে সামান্যত্ব ও বিশেষত্ব এই দ্বিরূপত্ব বশতঃ নানাকারত্ব সম্ভব হইত না। যে-বস্তু মাত্র একটি মক্ষিকার পাদদ্বারা আবৃত সেই বস্তুকেও যেমন আর অনাবৃত বলা যায় না, সেইরূপ বস্তু কোন এক দিক হইতে একাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইলে আর তাহার দ্বৈরূপ্য স্বীকার করা যাইবে না।

বস্তুর অনৈকান্তিকতা সম্বন্ধে কুমারিল বলিয়াছেন :—

যথা কল্মাষবর্ণস্য যথেষ্টং বর্ণনিগ্রহঃ।
চিত্রত্বাদ্বস্তুনোঽপ্যেবং ভেদাভেদাবধারণে ॥ ১৭৪৫ ॥
যদা তু শবলং বস্তু যুগপৎ প্রতিপদ্যতে।
তদান্যানন্যভেদাদি সর্বমেব প্রলীয়তে ॥ ১৭৪৬ ॥

অর্থাৎ, বিবিধ বর্ণের বস্তুর যেমন যে-কোন একটি বর্ণ গ্রহণ করা যায়, বস্তুকেও সেইরূপ ইচ্ছানুযায়ী অভেদী বা বিভেদী বলা যাইতে পারে। বিচিত্র বর্ণের কোন বস্তু যখন যুগপৎ গৃহীত হয় তখন বস্তুটি অন্য কি অনন্য—এই প্রকারের ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া থাকে। যদি কেহ আপত্তি করেন যে তাহা হইলে সর্বত্র শবলত্বের প্রতীতি উৎপন্ন হইবে, ক্রম বা যৌগপদ্য কোথাও দেখা যাইবে না, তবে কুমারিল বলিবেন :—

বস্তুনোঽনেকরূপস্য রূপমিষ্টং বিবক্ষয়া।
যুগপৎক্রমবৃত্তিত্বাং নাস্ত্যোক্তি বচসাং বিধিঃ ॥ ১৭৪৭ ॥

অর্থাৎ, যদি কোন বস্তুর একাধিক রূপ থাকে তবে যুগপৎ বা ক্রমানুযায়ী বস্তুটির যে কোন রূপের উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইহাই হইল শব্দপ্রয়োগের রীতি।—শান্তরক্ষিত ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে চিত্রত্বকে একত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বৈচিত্র্যের রূপ এক নহে, অনেক ; একত্বের সহিত বৈচিত্র্যের সহভাব সম্ভব নয়। বস্তুর যতগুলি আকার ততগুলি পৃথক্ বস্তু স্বীকার করিতে হইবে (কা ১৭৪৮-৯)।

সুমতি নামে এক জৈনাচার্য বলিয়াছেন :—যে-প্রকৃতি (যেনৈবাত্মনা) বশতঃ বস্তু সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকৃতি বশতই যদি সেই বস্তু সজাতীয়ের সদৃশ হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তুটি বিজাতীয়েরও তুল্য, কারণ বস্তুটির অপর কোন বিশিষ্ট রূপ নাই (যেনাত্মনা সজাতীয়বিজাতীয়াভ্যাং ব্যাবৃত্তং বস্তু তেনৈবাত্মনা তদ্বস্তু যদি সজাতীয়ৈঃ সদৃশং ভবেৎ তদা বিজাতীয়ৈরপি তুল্যতয়া বিজ্ঞায়েত, তস্যাত্মনোঽবিশিষ্টত্বাৎ)। কোন বস্তু কিন্তু বিজাতীয়ের তুল্য বলিয়া প্রতীত হয় না। সুতরাং যে-স্বভাব বশতঃ বস্তু সজাতীয়ের অসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যে-স্বভাব বশতঃ বস্তু আবার তৎসদৃশও হইয়া থাকে—বস্তুর এই দুইটি বিভিন্ন স্বভাব স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বস্তু যদি সজাতীয়ই হয় তঁবে সজাতীয়ের সহিত বস্তুটি অসমান কেন ? আর যদি অসমান হয় তবে আর সজাতীয়ত্ব সম্ভব হয় কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে, অপর সম্প্রদায়ের (পরেণ) দার্শনিকগণও (নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক) যে সর্ব বস্তুর সামান্যাত্মকত্ব ও বিশেষাত্মকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা হইতেই বস্তুত্বাদি সামান্যের দ্বারা সর্ব সজাতীয়ের এবং বিশেষের দ্বারা বিজাতীয়ের গ্রহণ হইয়া যাইতেছে ; এবং এই বিজাতীয়ের গ্রহণের ফলেই বস্তুসকল অসমান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং বস্তুর অনেকান্তত্ব স্বীকার করার মধ্যে দোষাবহ কিছুই নাই (কা ১৭৫৫-৭)। —স্যাদ্বাদ সম্বন্ধে তত্ত্বসংগ্রহে যত বচন আছে তন্মধ্যে এইটিই হইল সর্বপ্রধান। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রত্যেক বস্তুই যে একাধারে সামান্য এবং বিশেষ—ইহাই ছিল জৈনগণের অনেকান্তবাদের ভিত্তি। বস্তুর প্রকৃতিগত এই দ্বৈবিধ্য হইতে ক্রমে জৈনাচার্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারা অসম্ভব। বস্তু সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা হইল কেবল বস্তুর বিকাশভঙ্গী। এই বিকাশভঙ্গীও ছিল তাঁহাদের মতে সপ্তবিধ। স্যাদ্বাদের খণ্ডনাংশে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা হইল প্রধানতঃ সামান্যবাদ ও বিশেষ-বাদের বিরুদ্ধে বহুধাচর্চিত যুক্তিগুলিরই পুনরুল্লেখ, সুতরাং তাহার বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর দ্বৈরূপ্যের আলোচনা করা হইয়াছে। কুমারিল কিন্তু বলিয়াছেন যে বস্তুর ত্রৈরূপ্যও স্বীকার করিতে হইবে :—

বর্ধমানকভঙ্গেন রুচকঃ ক্রিয়তে যদা।
তদা পূর্বার্থিনঃ শোকঃ প্রীতিশ্চাপ্যুত্তরার্থিনঃ ॥ ১৭৭৭ ॥

হেমার্থিনস্তু মাধ্যস্থ্যং তস্মাদ্বস্তু ত্রয়াত্মকম্।
নোৎপাদস্থিতিভঙ্গানামভাবে স্যান্মতিত্রয়ম্ ॥ ১৭৭৮ ॥

অর্থাৎ, যখন বর্ধমানক নামক স্বর্ণপাত্র ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে রুচক নামক আর এক প্রকারের স্বর্ণপাত্র প্রস্তুত করা হয়, তখন যাহারা বর্ধমানকের পক্ষপাতী তাহাদের হয় শোক এবং যাহারা রুচকের পক্ষপাতী তাহাদের হয় হর্ষ; যাহারা কেবল স্বর্ণের পক্ষপাতী তাহারা কিন্তু কোন দিকেই বিচলিত না হইয়া মধ্যস্থ থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে বস্তু ত্রয়াত্মক। বস্তুস্বভাব একই সঙ্গে উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গ এই তিন প্রকারের না হইলে উপরোক্ত তিন প্রকারের বুদ্ধির সহোৎপত্তি সম্ভব হইত না।—ইহা হইতে কুমারিলের মতে আরও প্রমাণিত হয় যে সামান্যের অস্তিত্ব ও নিত্যতা স্বীকার করিতেই হইবে :—

ন নাশেন বিনা শোকো নোৎপাদেন বিনা সুখম্।
স্থিত্যা বিনা ন মাধ্যস্থ্যং তেন সামান্যনিত্যতা ॥ ১৭৭৯ ॥

অর্থাৎ, (একটি পাত্র ভাঙ্গিয়া যখন আর একটি পাত্র প্রস্তুত করা হইতেছে তখন) যদি নাশ বাস্তবিকই সংঘটিত না হয়, তবে শোক সম্ভব হইতে পারে না, এবং যদি কিছু উৎপন্ন না হয় তবে আনন্দেরও কোন কারণ ঘটিবে না ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভাঙ্গা ও গড়া সত্ত্বেও একটা কিছু অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইতেছে, কারণ তাহা নহিলে অনেক লোক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ (indifferent) থাকিবে কেন ? অলক্ষিত যে পদার্থ এই ভাঙ্গাগড়া সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থাকিয়া যায় তাহাই হইল নিত্যসামান্য।

কুমারিলের এই মনোজ্ঞ যুক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার জন্য শান্তরক্ষিতকে পুনরায় সেই ক্ষণিকবাদের শরণ লইতে হইয়াছে :—

ইত্যেদপি নো যুক্তমসামান্যাশ্রয়ত্বতঃ।
উৎপাদস্থিতিভঙ্গানামেকার্থাশ্রয়তা ন হি ॥ ১৭৮০ ॥
সমানকালতাপ্রাপ্তেঃ পরস্পরবিরোধিনাম্।
ইদং তু ক্ষণভঙ্গিত্বে সতি সর্বমনাকুলম্ ॥ ১৭৮১ ॥
বর্ধমানকভাবস্য কলধৌতাত্মনঃ কথম্।
অনন্বয়ে বিনাশে হি কস্যচিচ্ছোকসম্ভবঃ ॥ ১৭৮২ ॥
সর্বথাপূর্বরূপস্য রুচকস্য তদাত্মনঃ।
জন্মন্যুৎপদ্যতে প্রীতির্নাবস্থানং তু কস্যচিৎ ॥ ১৭৮৩ ॥

অর্থাৎ, কুমারিল যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এতত্রয়ের সাধারণ কোন আশ্রয়ই নাই ; উৎপত্তি, স্থিতি ও ভঙ্গের যে আশ্রয় একই—একথা ঠিক নহে, কারণ তাহা হইলে পরস্পর বিরোধী বিষয়াবলীর একই ক্ষণে প্রাপ্তি ঘটিত। কিন্তু ক্ষণভঙ্গিত্ব স্বীকার করিলে এরূপ কোন বাধা আর থাকিবে না। বর্ধমানক রূপ পাত্রাকারে অবস্থিত সুবর্ণের নিরন্বয় বিনাশে কেন লোকে শোকগ্রস্ত হইবে, আর কেনই বা লোকে অপূর্ব রুচকাখ্য পাত্রের উৎপত্তিতে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে ? উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই যখন নিরন্বয়, তখন পূর্ববস্তুর কোন অংশ যে অপরিবর্তিত থাকিয়া যাইতেছে এ-কথা স্বীকার করা যায় না।—শান্তরক্ষিতের এই সকল কথা যে dogmatic তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

মুসলমান রাজত্বে বৈদেশিক চিকিৎসকগণ

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

ওলন্দাজ-(Dutch) সার্জেনদিগের নামের তালিকা পাওয়া না গেলেও ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাঙলাদেশ হইতে মুগলেরা যখনই যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতেন, তখনই তাহাদের সঙ্গে 'ডচ্'-কোম্পানীর সার্জেনদিগকে পাঠান হইত। মুগলেরা ডচ্-কোম্পানীর নিকট চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিত এবং তাহারাও সাহায্য দান করিত। Schonten এই কথার সাক্ষ্য দিতেছেন।—'Voyage de wonter Schonten on Indies Orientales' Vol. II. p. 298.

পিত্রে দে লান (Pitre de Lan)

১৬৫২ খ্রী° প্রসিদ্ধ পর্যটক টেভারনিয়ার গোলকুণ্ডায় উপস্থিত হন এবং জনৈক ওলন্দাজ যুবক সার্জেনের বাটীতে বাস করেন। ইহার নাম ছিল পিত্রে দে লান। ইনি গোলকুণ্ডারাজের সার্জেন ছিলেন। জাভাদেশের রাজধানী Batavia হইতে যখন M. Cheteur রাজপ্রতিনিধিস্বরূপে গোলকুণ্ডায় আসেন, তখন তিনি ইঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় ইঁহাকে গোলকুণ্ডায় রাখিয়া যান। এই সময় গোলকুণ্ডারাজের বড়ই মাথা ধরিত। রোগ-প্রশমের জন্য জিহ্বার নিম্নবর্তী শিরা হইতে রক্ত ক্ষরণ করিবার উপদেশ দেওয়া হয়; কিন্তু দেশীয় চিকিৎসককগণ নির্বুদ্ধিতার জন্য এই সামান্য অস্ত্রোপচার করিতে পারে নাই। দে লান সহজেই অস্ত্রোপচার করিয়া রাজাকে সুস্থ করেন। ইহাতে রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেন। ইহা ব্যতীত অন্য কয়েকটী অস্ত্রোপচারে কৃতকার্য হওয়ায় রাজ-সরকারে ইঁহার যশঃ অত্যন্ত বর্ধিত হয় এবং ইনি রাজ-চিকিৎসক নিযুক্ত হন। Valentyn এর মতে ইনি ১৬৫৮ খ্রী° পর্যন্ত গোলকুণ্ডায় ছিলেন।—Tavernier's Travels, Tran. by V. Ball, Vol. I. p. 301.

ফ্রেয়ার, জন (John Freyer)

ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সার্জন ছিলেন। ১৬৭৫ খ্রী° ইনি জেনিয়ার (Jeneah) মুগলসেনাধ্যক্ষের পরিবারে চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য হন। ইনি ১৬৭২-১৬৮১ খ্রী° পর্যন্ত পারস্য ও ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৬৯৮ খ্রী° ইঁহার "New Account of the East Indies & Persia" ভ্রমণকাহিনী বাহির হয়। ইহাতে ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা, অধিবাসী-দিগের আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন ও ধর্ম-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।—Cyclopaedia of India, p. 1154.

ডাক্তার ফোর্থ (Dr. Forth)

১৭৪২ খ্রী° ইনি কাশিমবাজারের ইংরেজ-কুঠির সার্জেন ছিলেন। পরে অলিবর্দি খাঁ যখন শেষবারে পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন ইনি বাঙলার নবাবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার ফুলারটন

১৭৬৩ খ্রী° রাজমহলের মুসলমানেরা যখন উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগকে হত্যা করে, তখন তাহারা ইঁহার গাত্রে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করে নাই। কারণ ইঁহার সুচিকিৎসায় বহু মুসলমান অমীর ওমরাহ্ আরোগ্যলাভ করিয়া ছিলেন।

বারনার্ড (M. Bernard)

মুসলমান সম্রাটেরা বৈদেশিক চিকিৎসকদিগকে কঠিন পীড়ার সময় ডাকিতেন ও তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ফরাসী দেশীয় বারনার্ড দিল্লীর প্রথম ইউরোপী-বাসিন্দা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ছিলেন তাহা নয়, তিনি একজন কুশলী শল্য-বিদ্যা-বিশারদ সার্জেন (Surgeon) ছিলেন। সম্রাটের তাঁহার উপর অত্যধিক আসক্তি ছিল এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। ইনি সম্রাটের সহিত টেবিলে বসিয়া এক সঙ্গে আহারাদি করিতেন। বার্ণিয়ার বলেন তাঁহার প্রাত্যহিক দর্শনী (fee) ছিল ১০ ক্রাউন বা ৫০ শিলিং (=৩৭॥০ টাকা)। সম্রাটের বা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের পর্দানশীন স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে ইনি আরও অধিক দর্শনী লইতেন। ওমরাহ্দিগকেও ইনি দেখিতেন। ইঁহারা ইঁহাকে বেশ বড় রকমের উপহার দিতেন, কেবলমাত্র যে ইনি রোগ আরোগ্য করিবার জন্য এইরূপ উপহার পাইতেন তাহা নহে, সম্রাটের দরবারে ইঁহার প্রভুত্ব অসীম ছিল বলিয়াও অনেক সময়ে প্রচুর উপহার পাইতেন। ক্রমশঃ পদমর্যাদায় ইনি উন্নতিলাভ করেন।—Bernier, Vol. I. p. 309.

বর্নিয়ার ফ্রাঙ্কোইস্ (Francois Bernier)

ইনি একজন ফরাসী দেশীয় প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী ছিলেন। খ্রী° ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্দশ লুইএর রাজত্বকালে উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। ইঁহার ভ্রমণ কাহিনী হইতে মুগলসম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়।

সম্রাটের প্রিয়পাত্র দৈনিচাঁদ (Daini Chand) ইঁহাকে একবার কাশ্মীরে লইয়া যান। জীবনের কিয়দংশ ইনি সিরিয়া ও ইজিপ্টে (মিশরে) অতিবাহিত করেন। চিকিৎসা বিদ্যায় গুণপণার জন্য ইনি ভৈষজ্যশাস্ত্রে 'Mont fellier'র উপাধি পান (১৬:৪ খ্রী°)। প্যারীর পণ্ডিতেরা ইঁহাকে 'মুগল' এই উপনামে অভিহিত করিতেন। ভারতবর্ষে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের চিকিৎসকরূপে ১৬৫৯ খ্রী° হইতে ১৬৬৭ খ্রী° পর্যন্ত ৮ আট বৎসর কার্য করেন।

সর্বসমেত ইনি ১২ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। ১৬৮৮ খ্রী° প্যারী সহরে ইনি মৃত্যু-মুখে পতিত হ'ন।—The Imperial Dictionary of Universal Biography, Vol. I. p. 539

বুরজের ক্লড. মেইল্লিএ (Claude Maille of Bourges)

১৬৬৫ খ্রী° যখন টেভারনিয়ার এলাহাবাদে পৌছান, তখন ইনি তদধিষ্ঠিত রাজপ্রতি-নিধিকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেন, তাঁহার চিকিৎসার ভার কয়েকজন পারস্যদেশের চিকিৎসক ও ক্লড. মেইল্লিএ'এর উপর অর্পিত ছিল। ক্লড মেইল্লিএ অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসাকার্য দুই-ই করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

[Tavernier's Travels—Tran. by V. Ball, Vol. I. p, 116]

বাউটন, গেব্রিএল (Grabriel Boughton)

ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'হোপওয়েল' (Hope well) জাহাজের সার্জেন ছিলেন। ১৬৩৯ খ্রী° সম্রাট্ শাহ্জহানের দ্বিতীয় কন্যা জাহানারা বেগম যখন ভয়ানক রকম পুড়িয়া যান, তখন তিনি সুরাটে ইংরেজ কুঠীতে এক জন উপযুক্ত চিকিৎসক চাহিয়া পাঠান। সুরাট্ হইতে সম্রাট্‌কন্যার চিকিৎসার জন্য ইঁহাকে পাঠান হয়। ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সম্রাট্‌নন্দিনী পুনরায় নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান। সম্রাট্ ইঁহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলে এই মহামতি চিকিৎসক আপনার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সরকার বাহাদুরকে শুল্ক না দিয়া বাঙলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার পায় তাহাই যাচ্ঞা করেন। সম্রাট্ বাউটনের অভীপ্সিত প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া 'ফর্‌মান' প্রদান করেন ও অন্যান্য পুরস্কার দেন। বাউটন দিল্লী হইতে বাঙলাদেশে আগমন করেন। এখানে নবাবের জনৈক প্রিয়তমা স্ত্রীলোকের রোগ ইনি আরোগ্য করেন। নবাব ইঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ইঁহাকে আপনার চিকিৎসক নিযুক্ত করেন এবং ইংরেজদিগকে বিনা পারমিট্ মাশুলে (Custom duty) ব্যবসায় করিতে আদেশ দেন। এই অনুমতি পাইয়া বাউটন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ১৬৪০ খ্রী° দুইখানি জাহাজ পাঠাইতে বলেন।—Cyclopaedia of India, p. 424

মানুসী (Manouchi)

বার্ণাডের কিছুদিন পরে ইনি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি ভিনিসের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লীতে ইনি ১৬৪৯ খ্রী° হইতে ১৬৯৬ খ্রী° পর্যন্ত ৪৮ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ শাহ্জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স দারাশেকোর শরীর-চিকিৎসক (body physician) ছিলেন। এইভাবে দারার মৃত্যু পর্যন্ত (১৬৫৯ খ্রী°) ইনি কার্য চালাইয়া ছিলেন।

হ্যামিলটন উইলিয়ম (Willium Hamilton)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইনি অস্ত্রোপচার কার্যে (Surgeon) নিযুক্ত ছিলেন। ইনি কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকের নিম্নতম কর্মচারী ছিলেন। ইনি দ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা হইতে জন সারম্যান (John Surman) ও এড্ওয়ার্ড স্টিফেন্সনের অধিনায়কত্বে যে সকল রাজদূত সম্রাট্ ফরাকসিয়ারের (Farrakh Siyar) নিকট গমন করেন ইনি তাঁহাদের চিকিৎসক হইয়া গমন করেন। এই সময় সম্রাটের পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle) হয় এবং তাঁহার রাজ-চিকিৎসকেরা কেহই তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি তাঁহার চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে ৫০০০৲ টাকা, বহু মূল্যের প্রস্তর, হীরক অঙ্গুরী, একটী হস্তী ও ঘোটক উপহার প্রদান করেন। আরোগ্য লাভ করিয়া সম্রাট্ জয়সিংহ (অজিত সিং) Jye Singh (Ajit Singh)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। হ্যামিল্টনের প্রভাবেই ইংরেজ রাজদূতেরা 'ফরমান' লইয়া কলিকাতায় আসিতে পারিয়া ছিলেন ও কলিকাতায় বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার পরে সম্রাট্ ইঁহাকে আপনার অধীনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেন। বহুদিন এদেশে থাকিবার পর সম্রাট্ ইঁহাকে ইঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিবার জন্য দেশে যাইবার অনুমতি দেন; কিন্তু এই সর্তে অনুমতি দেন যে, তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন এবং আসিবার সময় যে সকল ঔষধ এদেশে দুষ্প্রাপ তাহা ইংলণ্ড হইতে সম্রাটের জন্য লইয়া আসিবেন। দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ইনি ১৭১৭ খ্রী° দূষিত জ্বরে (futrid fever) মারা যান। ইহার সমাধি-লিপি ঐতিহাসিকদিগের আদরের বস্তু।

[Cyclopaedia of India, p. 10, Cal. past & present, pp. 17-20]

উপনিষদে কর্মের প্রসার

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক **শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র**, এম. এ, কাব্যতীর্থ

কৌষীতকিতে উল্লিখিত ছয়টী আহুতি দিবার পরে ধূমগন্ধ আঘ্রাণ, সর্বাঙ্গে আজ্য-বিলেপন, সংযতবাক্য হইয়া পাদচারণ (প্রব্রজন) করিতে করিতে নিজের কাম্যবিষয়ের উল্লেখ-করণ বা দূতপ্রেরণ,—এই সকল করণীয়ের উপদেশ আছে। ফলশ্রুতিতে সংক্ষেপে আছে, "লভতে হৈব",—নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকে। যাহা কিছু মনুষ্য-জীবনের কাম্য হইতে পারে, তৎসমুদায় লাভ করা এবং মহত্বপ্রাপ্তি বস্তুত একই কথা। এই জন্যই মন্থকর্মের সহিত একধনাবরোধন আলোচিত হইল।

পূর্বলিখিত মন্থ বা শ্রীমন্থ-কর্ম সম্পাদনান্তে বৃহদারণ্যকে (৬. ৪) পুত্রমন্থের বিধান রহিয়াছে। শ্রীমন্থকারীই পুত্রমন্থে অধিকারী। শঙ্করাচার্যও এই কথা বলেন—"প্রাণদর্শিনঃ শ্রীমন্থং কর্ম কৃতবতঃ পুত্রমন্থেঽধিকারঃ।" এই মন্থ অবশ্য পূর্বোক্ত মন্থ হইতে বিভিন্ন। পুত্রমন্থের অর্থ সকলের মধ্যে স্বীয় পুত্রই যাহাতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে পরম্পরাক্রমে কতকগুলি ক্রিয়া। এই প্রসঙ্গে 'আধোপহাস' কথাটী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তি-নির্ণয় পূর্বক পুনঃ পুনঃ এই শব্দের প্রয়োগ অনুমিত হয়, ইহা পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যাপারই 'অধোপহাস'। তবে বাজপেয় যজ্ঞের[২৬] সহিত ইহার সাদৃশ্য অনুধাবন করিয়া এতৎকর্ম-সম্পাদনে বাজপেয়ের ফললাভ হয়। কিন্তু এই বাজপেয়ের জ্ঞানসংবলিত না হইলে আধোপহাস-কার্যে পুণ্যক্ষয়ই হইয়া থাকে। ইহাতে পত্নীর কর্তব্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—পত্নী তিন দিন পর্যন্ত কাংস্য পাত্রে জলপান ও

---

২৬ জ্যোতিষ্টোমের সাতটী সংস্থা বা প্রকারভেদ: যথা, অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শিন্, অতিরাত্র, বাজপেয় ও অপ্তোর্যাম। রাজা বা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতাভিলাষী হইলে বাজপেয় যজ্ঞ করিবেন। প্রকৃত রাজসূয় এবং বৃহস্পতি-সব নামক যজ্ঞদ্বয় আরম্ভ করিবার পূর্বে ইহার অনুষ্ঠান বিধেয়। কাণ্বশতপথব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায় বাজপেয়-সংজ্ঞক। বাজসনেয়-সংহিতার নবম অধ্যায়ে বাজপেয়ের মন্ত্রাবলী পাওয়া যায়। ঘৃতাদি আহুতির পরে রথ-চালন,

অচ্ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিবে। শূদ্র শূদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিবে না। তিন রাত্রির পর স্নান করিয়া পত্নী ব্রীহি অবঘাত করিবে, অর্থাৎ উদূখলে তুষ হইতে তণ্ডুল ভিন্ন করিবে।

তারপর বিভিন্ন কামনার বিভিন্ন আহারের বিধান। যদি দম্পতীর ইচ্ছা হয়, তাহাদের পুত্র শুক্লবর্ণ হইবে, একটী বেদ অধ্যয়ন করিবে এবং পূর্ণ আয়ুর অধিকারী হইবে, তবে ক্ষীরৌদন (পায়সান্ন) পাক করিয়া ঘৃত সহযোগে ভোজন করিবে। দুইটী বেদ-অধ্যয়নকারী, পূর্ণায়ুর অধিকারী পিঙ্গলবর্ণ পুত্রলাভেচ্ছু দম্পতী দধ্যোদন পাক করিয়া ঘৃত-যোগে ভোজন করিবে। তিনটী বেদ অধ্যয়নকারী, পূর্ণায়ুর অধিকারী, শ্যামবর্ণ, লোহিত-নেত্রযুক্ত পুত্র ইচ্ছা করিলে জলৌদন পাক করিয়া সঘৃত ভক্ষণ বিহিত। দম্পতী যদি ইচ্ছা করে, সম্পূর্ণ আয়ুর অধিকারিণী, পণ্ডিতা একটী কন্যা হইবে, তবে সঘৃত তিলৌদন ভোজন বিধেয়। চারিটী বেদের অধ্যেতা, পূর্ণায়ুর অধিকারী, বিদ্বৎসমিতিতে বিখ্যাত, প্রিয়ভাষী পুত্র ইচ্ছা করিলে ষণ্ডমাংসের সহিত অন্ন (মাংসৌদন) পাক করিয়া ঘৃতসংযোগে দম্পতী ভোজন করিবে; তাহা হইলেই যথোক্ত গুণসম্পন্ন পুত্রকন্যা উৎপাদনে সমর্থ হইবে২৭।

উপরি-উক্ত ব্রীহি অবঘাতের পর প্রাতঃকালে স্থালীপাকের রীতিতে (১৮শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) আজ্যসংস্কার এবং যথাযোগ্য অন্ন পাক করিয়া বারবার আঘাত করিয়া তিনটী ("অগ্নয়ে স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা, দেবায় সবিত্রে সত্যপ্রসবায় স্বাহা") স্থালীপাকের হোম করিবে। শঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন,—"গার্হ্যঃ সর্বো বিধির্দ্রষ্টব্যোঽত্র,"—গৃহ্যোক্ত সমস্ত বিধিই এখানে পালন করিতে হইবে। তারপর হুতাবশেষ হইতে নিজে ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ পত্নীকে দিবে। ভোজনান্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলদ্বারা পাত্র পূর্ণ করিয়া

এই যজ্ঞের একটী প্রধান অঙ্গ। রথ হইতে অবরোহণ করিয়া দ্বাদশটী আহুতি দিতে হয়। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যজমানকে উপরে উঠিয়া যূপের শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতে হয়। তারপর দুগ্ধ, তণ্ডুলাদি একত্র পাক করিয়া বাজ-প্রসবনীয় (শক্তিবর্ধক)-নামক সাতটী আহুতি দিতে হয়। অনন্তর আনুষঙ্গিক কতকগুলি ক্রিয়ার পর বাজপেয়-শেষ হয়।

বৃহদারণ্যকের কথিত অংশে বাজপেয়ে উদ্দিষ্ট কতকগুলি যজ্ঞসামগ্রীর নাম আছে, যথা,—গ্রাবন্ (সোমাভিষবের পাষাণ) বেদি, বর্হিঃ (কুশ), চর্ম (বৃষচর্ম), সমিদ্ধ অগ্নি, অধিষবণ বা সোমপেষণের প্রস্তরখণ্ডদ্বয়।

২৭। বৃ. উ., ৬. ৪. ১৪—১৮; শেষের অনুচ্ছেদের সহিত শতপথ ব্রাহ্মণাংশ (১৪, ৯, ৪.১৭) তুলনীয়।

"উত্তিষ্ঠাতো বিশ্বাবসোঽন্যামিচ্ছ প্রপূর্ব্যাং সং জায়াং পত্যা সহ,"২৮—অর্থাৎ হে বিশ্বাবসু আমার ভার্যাকে পরিত্যাগ করিয়া পতির সহিত ক্রীড়ারতা অন্য কোন তরুণী ভার্যাকে কামনা কর,—এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পত্নীকে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে। স্পষ্টতই এইগুলি গৃহ্যসূত্রের বিধান।

অনন্তর অনায়ত্তা স্ত্রীর বশীকরণের জন্য স্বামী কর্তৃক সমন্ত্রক ক্রিয়া সমূহের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আবার গর্ভধারণ করা বা না করা উভয় উদ্দেশ্যেই কিছু কিছু বিধি-নির্দেশ এখানে পাই।

তারপর অথর্ববেদীয় অভিচার-কল্পনাদিতে বিহিত অভিচার বা মারণ-ক্রিয়ার অনুরূপ ব্যবস্থা বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়। যদি স্ত্রীর কোন উপপতি থাকে, তবে তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কার্য করিবে।

কাঁচা মৃণ্ময় পাত্রে অগ্নি-সংস্থাপন করিযা, শর-কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া সেই অগ্নিতে (আবসথ্য) ঐ শরগুচ্ছ ঘৃতাক্ত করিয়া বিপরীতভাবে মন্ত্রপাঠপূর্বক চারিটী হোম করিবে। মন্ত্র এইরূপ:—"মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ প্রাণাপানৌ ত আদদেঽসাবিতি; মম সমিদ্ধেঽহৌষীঃ পুত্রপশূংস্ত আদদেঽসাবিতি; মম সমিদ্ধেঽহৌষীরিষ্টাসুকৃতে ত আদদেঽসাবিতি; মম সমিদ্ধেঽহৌষীরাশাপরাকাশৌ২৯ ত আদদেঽসাবিতি৩০।"—(বৃ. উ. ৬. ৪. ১২) অর্থাৎ আমার এই সমিদ্ধ অগ্নিতে শত্রুর প্রাণ ও অপান আহুতি দিতেছি; আমি……শত্রুর শ্রৌত এবং স্মার্ত কর্ম আহুতি দিতেছি; আমি……শত্রুর পুত্র ও পশুসমূহ আহুতি দিতেছি; আমি……শত্রুর আশা ও প্রতীক্ষা আহুতি দিতেছি।৩১ এই বিপরীতক্রমে কার্য করার উদ্দেশ্য হইতেছে, বিপরীত ফললাভ, অর্থাৎ ইষ্টের স্থানে অনিষ্টের (শত্রু-পক্ষে) প্রাপ্তি।

২৮। সূর্যাসূক্তে অনুরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়,—

উদীর্ষ্বাতো বিশ্বাবসো নমসেলামহে ত্বা।
অন্যামিচ্ছ প্রফর্ব্যং সং জায়াং পত্যা সৃজ॥—ঋগ্বেদ, ১০. ৮৫. ২২.

বিশ্বাবসু একজন গন্ধর্ব, প্রেমের দেবতারূপে ইহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

২৯ "আশা প্রার্থনা, বাচা যৎপ্রতিজ্ঞাতং, কর্মণা নোপপাদিতং, তস্য প্রতীক্ষা পরাকাশঃ।"—আনন্দগিরি।

৩০ 'অসাবিতি' স্থলে মাধ্যন্দিন শাখার বৃহদারণ্যকে পাঠান্তর 'অসাবিতি নাম গৃহ্ণাতি।' কাহার নাম গ্রহণ করিবে, এই সমস্যার সমাধানে আনন্দগিরি এবং দ্বিবেদগঙ্গ বলেন, নিজের বা শত্রুর নাম।

৩১ এই চারিটী আহুতি দিবার অর্থই হইল চারিটী শাপ দেওয়া। কাণ্বশাখায় এই চারিটী অভিশাপের কথা আছে। কিন্তু মাধ্যন্দিনে তিনটী শাপের উল্লেখ আছে, যথা—শত্রুর আশা ও প্রতীক্ষা নির্মূল করা, পুত্র ও পশুগণ বিনষ্ট করা, এবং প্রাণ ও অপান নিঃশেষ করা।

এই অভিচারের ফলশ্রুতিবর্ণনায় উপনিষদ্ বলেন, এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাহার প্রতি অভিশাপ দিবেন (অর্থাৎ অভিচার করিবেন), সে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যশূন্য হইয়া এবং 'বিসুকৃৎ' বা শ্রৌত ও স্মার্ত কর্মের ফলভূত পুণ্যরহিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব এইরূপ শ্রোত্রিয়ের পত্নীর সহিত উপহাস পর্যন্ত করিবে না, করিলে এই প্রকার প্রবল শত্রুই সৃষ্টি করা হইবে।[৩২]

পুত্রমন্থের অঙ্গীভূত গর্ভাধান-কর্মে দুইটী মন্ত্র দেখা যায়। মন্ত্র দুইটী সম্পূর্ণরূপেই এখানে লিখিত আছে।[৩৩]

তারপর সোষ্যন্তীকর্ম[৩৪]। "সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষতি। যথা বায়ুঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু সহাবৈতু জরায়ুণা ॥[৩৫]—"যথা বায়ুঃ" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্ত্রীকে অভ্যুক্ষিত করিবে, অর্থাৎ তাহার শরীরে জলের ছিটা দিবে। গোভিল ও খাদির গৃহ্যে আজ্যহোম এবং পারস্করগৃহ্যে সমন্ত্রক অভ্যুক্ষণ এই উপলক্ষ্যে বিহিত হইয়াছে।

তারপর জাতকর্ম[৩৬]। "জাতেঽগ্নিমুপসমাধায়াঙ্ক আধায় কংসে পৃষদাজ্যং সন্নীয় পৃষদাজ্যস্যোপঘাতং জুহোতি......", অর্থাৎ শিশু জন্মিলে নিকটে অগ্নিস্থাপন করিবে।

---

৩২ পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও (১. ১১.) পত্নীর উপপতি-মারণের জন্য অভিচারবিধি রহিয়াছে। এবংবিধ শ্রোত্রিয়ের পত্নীকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবার কথা উক্ত গৃহ্যসূত্রে (১, ১১. ৬) এবং শতপথব্রাহ্মণে (১. ৬. ১. ১৮) দেখা যায়।

৩৩ গোভিলগৃহ্যসূত্রে সাধারণভাবে গর্ভাধানের প্রয়োজনীভূত মন্ত্র হিসাবে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের প্রতীক ধরা হইয়াছে। এইগুলি মন্ত্র ব্রাহ্মণের মন্ত্র (১. ৪. ৬. ; ১. ৪. ৭)। বৃহদারণ্যকের 'পৃথুষ্টুকে' পদের স্থানে মন্ত্রব্রাহ্মণে 'সরস্বতি' পদের প্রয়োগ আছে। উক্ত গ্রন্থ দুইটীর মন্ত্রে এইমাত্র প্রভেদ।

৩৪ গোষ্যন্তীহোম সংস্কার আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর জন্য উদ্দিষ্ট। গোভিল গৃহ্য (২.৭ ১৩—১৭) এবং খাদির গৃহ্য (২. ২) দ্রষ্টব্য।

৩৫ মাধ্যন্দিনের মন্ত্রের পাঠ 'বায়ুঃ' স্থানে 'বাতঃ'। ঋগ্বেদের তিনটী ঋক্ (৫. ৭৮. ৭-৯) ["যথা বাতঃ পুষ্করিণীং সমিঙ্গয়তি সর্বতঃ। এবা তে গর্ভ এজতু নিরৈতু দশমাস্যঃ ॥" ইত্যাদি] সায়ণাচার্যমতে জাতকর্মে প্রয়োগার্হ। পারস্করগৃহ্য (১. ১৬. ১), সোষ্যন্তীমদ্ভিরভ্যুক্ষ-ত্যেজতু দশমাস্য ইতি (বাজসনেয়ি সংহিতা, ৮. ২৮), প্রাগ্‌যস্যৈ ত ইতি (ঐ, ৮. ২৯), এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪. ৯. ৪. ২২) এই প্রসঙ্গে তুলনীয়।

৩৬ শাঙ্খায়নগৃহ্য (১. ২৪. ১-৩), আশ্বলায়নগৃহ্য (১. ১৫. ১) পারস্করগৃহ্য (১. ১৬. ৩), আপস্তম্বগৃহ্য (৬. ১৫. ৪) ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য। বিষ্ণু এবং মনুসংহিতাতেও জাতকর্মের উল্লেখ আছে।

প্রসঙ্গত বলা যায়, ভারতীয় ও ইরাণীয় আর্যগণ বিশ্বাস করিতেন, শিশুর নিকট অগ্নি রক্ষা করিলে অপদেবতারা দূরে সরিয়া যায়। অনন্তর শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্থালীতে দধি ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে সামান্য সামান্য লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক আচাপস্থানে তিনটী আহুতি দিবে। তারপর পিতা পুত্রের দক্ষিণকর্ণে মুখ রাখিয়া 'বাক্' এই শব্দটী তিনবার উচ্চারণ করিবে।[৩৭] তদনন্তর "ভূস্তে দধামি…" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বর্ণপাত্রে মিশ্রিত দধি, মধু ও ঘৃত আহার করাইবে[৩৮]। ৩৬ণ পাদটীকায় উল্লিখিত গৃহ্যসূত্রগুলিতেও সুবর্ণপাত্রে করিয়া সদ্যোজাত শিশুকে ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিয়া মধু প্রভৃতি আহার করাইবার বিধি আছে। জাতকর্মাদি দ্বারা জাতকের দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়, ইহাই ঐতরেয় উপনিষদের মত ("তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম", ২. ৩)।

অনন্তর নামকরণ। "অথাস্য নাম করোতি বেদোঽসীতি, তদস্য তদ্‌গুহ্যমেব নাম ভবতি।" অর্থাৎ ঘৃতাদি ভোজনের পর পিতা জাতকের নাম রাখিবেন 'বেদ'। ইহাই উহার গোপনীয় নাম হইবে।[৩৯] প্রকাশ্য নামকরণ বিষয়ে উপনিষদে স্বভাবতই কিছু নাই।

তারপর শিশুকে উহার মাতার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া "যস্তে স্তনঃ—"[৪০] এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তন প্রদান করিবে। বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রেও শিশুকে মাতৃস্তন প্রদানের বিবরণ আছে[৪১]।

---

৩৭ ইহা মেধাজনন কর্ম। শাঙ্খায়নগৃহ্যে (১.২৪.৯) একই কথা রহিয়াছে। ইহাতে মেধাজনন হয়, এইভাবে সেখানে ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। আশ্বলায়নেও (১. ১৫. ২) মেধাজনন অভিহিত হইয়াছে কিন্তু সেখানে 'বাক্' শব্দের কথা নাই।

৩৮ মাধ্যন্দিনে আরও একটী মন্ত্র দেখা যায়। আশ্বলায়নেও (১. ১৫. ৩) উক্ত মন্ত্রটী রহিয়াছে। কাণ্ব বৃহদারণ্যকে আয়ুষ্য ও মেধাজনন-বিধান ক্রমরহিত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে।

৩৯ শাঙ্খায়ন (১. ২৪. ৫), হিরণ্যকেশি (২. ১. ৪. ১৪) আপস্তম্ব (৬. ১৫. ২—৩) গোভিল (২. ৭. ১৭) ও খাদিরগৃহ্য (২. ২. ৩১) অনুসারেও গুহ্যনামের বিধান পাই। তুলনীয়:—"অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে। বেদো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥" —মন্ত্র ব্রাহ্মণ, ১. ৫. ১৭।

৪০ ঋগ্বেদ, ১. ১৬৪. ৪৯.। এই ঋক্‌টীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণ বৃহদারণ্যকে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় চরণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।

৪১. পারস্করমতে (১. ১৬. ২০) স্তনপ্রদান অভিমন্ত্রণের পরে করিতে হয়। সেখানকার মন্ত্রটী বাজসনেয়িসংহিতা (১৭. ৮৭) হইতে উদ্ধৃত।

ইহার পর পতি পত্নীকে (সদ্যোজাত শিশুর জননীকে) অভিমন্ত্রণ (সম্বোধন) করিয়া বলিবে, "ইলাসি মৈত্রাবরুণী বীরে বীরমজীজনৎ, সা ত্বং বীরবতী ভব। যাস্মান্ বীরবতোঽকরৎ"।[৪২]

পুত্রমন্থ কর্মের ফলে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে পিতা এবং পিতামহকেও শ্রী, যশ এবং ব্রহ্মতেজ দ্বারা অতিক্রম করিয়া থাকে। ("অতিপিতা", "অতিপিতামহ")। এইরূপ পুত্রের পিতাও যে প্রশংসাভাজন হইয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ এখানেই পরিসমাপ্ত। এই ব্রাহ্মণ পড়িতে আরম্ভ করিলে স্বতই মনে হয়, যেন উপনিষদ্ না পড়িয়া একখানি গৃহ্যসূত্র পড়িতেছি।[৪৩]

যজ্ঞে ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ঋত্বিকের সংজ্ঞা এইরূপ :—

অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে ॥ (মনু, ২. ১৪৩)

অর্থাৎ বিহিতভাবে বৃত হইয়া যে অগ্ন্যাধান, পাকযজ্ঞসমূহ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করে, সেই ঋত্বিক্। ঋত্বিকের সংখ্যা বিভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন-রূপ। বড় বড় সোমযজ্ঞে ষোলজন ঋত্বিকের প্রয়োজন। ঋগ্বেদীয় প্রধান ঋত্বিক্ হোতা, যজুর্বেদের অধ্বর্যু, সামবেদের উদ্গাতা, ও অথর্ববেদের ব্রহ্মা। শেষোক্তের তিনবেদেই অধিকার আছে[৪৪]। এই চারিজনের কর্মে সাহায্যের জন্য আবার কয়েকজন ঋত্বিক থাকে ; ইহাদের প্রত্যেকের তিনজন করিয়া সর্বসাকল্যে উল্লিখিত ষোলজন। যজ্ঞের দুইটী পথ (বর্তনী)—মন এবং বাক্য। ব্রহ্মা পথদ্বয়ের একটীকে মন দ্বারা, আর অবশিষ্ট তিনজন বাক্যদ্বারা অপরটীকে শুদ্ধ করেন[৪৫]। বৃহদারণ্যকের কথায় বলিতে গেলে, যজ্ঞের ব্রহ্মাই হইল মন (৩. ১)। এখানে ব্রহ্মার মনন দ্বারা যজ্ঞ-সংস্কারই বুঝাইতেছে। উপনিষদে ঋত্বিক্গণের অনেকের নাম পাওয়া যায় ; যথা,—হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা (বৃ. উ., ৩. ১) ; প্রতিহর্তা (ছা. উ., ১. ১০, ১১) ; ব্রহ্মণস্পতি (বৃ. উ.

---

৪২ পারস্কর গৃহ্যসূত্রেও (১. ১৬. ১৯) এই মন্ত্রটী দৃষ্ট হয়। নানাভাবে ব্যাখ্যাতগণ ইহার ব্যাখ্যান করিয়াছেন।

৪৩ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১. ১৩. ১) "উপনিষদের" উল্লেখ আছে। ম্যাক্সমুলারের মতানুযায়ি তাহাকে বৃহদারণ্যক বলিয়াই অনুমান করিলে ভুল হইবে না। কারণ এখানেও এই সকল সংস্কারের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কাম্য কর্ম হিসাবে এই উপনিষদখানি এই সকল আলোচনা করিয়াছেন। Sacred Books of the East ৩০শ খণ্ড, পৃষ্ঠা xxi, ২য় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৪৪ আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষা সূত্র, ১৬—১৯

৪৫ ছা. উ., ৪. ১৬। তুলনীয়—"তস্য (যজ্ঞস্য) বাক্ চ মনশ্চ বর্তন্যৌ বাচা চ হি মনসা চ যজ্ঞো বর্তত ইয়ং বৈ বাগদো মনস্তদ বাচা ত্রয্যা বিদ্যয়ৈকং পক্ষং সংস্কুর্বন্তি মনসৈব ব্রহ্মা সংস্করোতি।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২৫. ৮।

১. ৩) ; প্রস্তোতা (ছা. উ., ১. ১০. ৯ ; বৃ. উ., ১. ৩)। হোতা শংসন বা ঋক্‌পাঠ করেন, অধ্বর্যু আশ্রাবণাদি ও উদ্‌গাতা স্তোত্র (সাম)-গান করেন। ব্রহ্মা মৌন অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের তাবৎ ব্যাপার নিবিষ্টমনে দর্শন করেন, এবং অন্যান্য ঋত্বিককে স্ব স্ব কর্মে অনুজ্ঞা দেন। কাহারও কার্যে ভুল হইলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সংশোধন করিয়া লন। প্রত্যেক ঋত্বিকেরই কার্যারম্ভে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে হয়,—"ওমিতি শংসতি ওমিতি আশ্রাবয়তি", (তৈ. উ., ১. ৮)। ব্যাহৃতিহোমের কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাবিহীন যজ্ঞ কখনই পরিপূর্তিলাভ করিতে পারে না। এবিষয়ে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ একমত। একটীমাত্র চরণযুক্ত ব্যক্তি, অথবা একটীমাত্র চক্রযুক্ত রথ যেমন চলিতে অক্ষম, তেমনি ব্রহ্মা না থাকিলে যজ্ঞ বিনষ্ট হয় এবং যজমানেরও ক্ষতি হয়।[৪৬]

ছান্দোগ্যে তারপর কর্মকাণ্ডের বিধান অনুসারে ব্রহ্মার মৌনাবলম্বন সম্বন্ধে আছে,—"অথ-যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে[৪৭] ন পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্তনী সংস্কুর্বন্তি ন হীয়তেঽন্যতরা"[৪৮]।—প্রাতরনুবাকের আরম্ভ হইতে পরিধানীয়া (সমাপনীয়া) ঋক্ শংসনের পূর্ব পর্যন্ত যে যজ্ঞে ব্রহ্মা নির্বাক্ থাকেন, সেই যজ্ঞে দুইটী বর্তনীই সংস্কৃত হয়, কোনটী অঙ্গহীন হয় না।

ছান্দোগ্যে (২. ২৪) যজমানের ভূলোক, অন্তরিক্ষলোক ও স্বর্লোক জয়ের উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে সামগানাদি বিহিত হইয়াছে। প্রাতঃসবন (প্রাতঃকালীন সোমাভিষব বা কণ্ডন-পূর্বক নিষ্কাষিত সোমরসের আহুতিদান) বসুগণের, মাধ্যন্দিন সবন রুদ্রগণের, এবং তৃতীয় সবন আদিত্যগণের ও বিশ্বদেবগণের অধিকৃত। অতএব প্রাতরনুবাক-শংসনের পূর্বে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট হইয়া উত্তরাস্য হইয়া বসুদেবতার উদ্দেশ্যে বাসব-সাম গান করিবে—"লোকদ্বারমপাবৃণু" ইত্যাদি। তারপর অগ্নিদেবতার প্রণামাত্মক মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্থান বিহিত। ইহাতে বসুগণ প্রাতঃসবন ও তৎসম্পৃক্ত লোক (ভূলোক) যজ-মানকে দান করেন। মাধ্যন্দিন-সবনকালে যথাবৎ দক্ষিণাগ্নির পশ্চাতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া রৌদ্র-সামগান, সমন্ত্রক হোম ও উত্থান করিবে। ইহাতে মধ্যম বা অন্তরীক্ষ লোক বিজিত

---

৪৬ ছা. উ., ৪. ১৬ ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২৫. ৮।

৪৭ প্রাতরনুবাক সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭. ৫—৮) বিস্তৃত উপদেশ আছে। পক্ষিরবের পূর্বে মধ্যরাত্রির পরে হোতা বহুসংখ্যক ঋক্ আবৃত্তি করিবে। বিভিন্ন কামনায় ঋক্‌সংখ্যার পার্থক্য হয়। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী—এই সাতটী ছন্দে রচিত ঋকসমূহ পাঠ করিবার বিধান দেওয়া আছে। দেবতা যথাক্রমে অগ্নি, উষস্ ও অশ্বিদ্বয়। এই সকল দেবতা-প্রতিপাদক উল্লিখিত ছন্দোযুক্ত ঋক্‌সংঘাতের আবৃত্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই শেষ করিতে হয়।

৪৮ তুলনীয়—"তস্মাদ্ ব্রহ্মোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে বাচং যমঃ স্যাৎ।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২৫. ৮ ;

হইবে। তৃতীয় সবনে আদিত্যসাম ও বৈশ্বদেব-সামগান, আহুতিদান ও উত্থান করিবে। ফলে যজমান তৃতীয় লোক (স্বর্গ) জয় করিবে, অর্থাৎ যথাক্রমে কথিত লোকত্রয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

কৌষীতকি উপনিষদে (১. ১.) ঋত্বিগ্‌বরণের কথা আছে। ঋত্বিকের সংজ্ঞায় আমারা 'বৃত' শব্দটী দেখিয়াছি। বরণ একটী অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এখানে রাজা চিত্র গাঙ্গ্যায়নি (পাঠান্তর, গার্গ্যায়ণি) আরুণিকে বরণ করিয়াছেন, দেখা যায়। আবার ছান্দোগ্যেও (১. ১১) উষস্তি চাক্রায়ণ যজমানের সমগ্র আর্ত্বিজ্যকর্মে বৃত হইয়াছেন। এইরূপ বর্ণনা পাই।[৪৯]

এই আর্ত্বিজ্যে বরণের পর ছান্দোগ্যে (১. ১২. ৪) একটী কৌতুকপ্রদ উপাখ্যান আছে। বক বা গ্লাব নামে একজন ঋষি স্বাধ্যায়ের (নিয়মক্রমে বেদ অধ্যয়ন) জন্য নির্জন স্থানে গমন করিলেন। একটী শ্বেতবর্ণ কুকুর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। অপর ক্ষুদ্র কুকুরেরা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমরা ক্ষুধার্ত, আপনি সামগান দ্বারা আমাদের জন্য অন্ন নিষ্পাদন করুন।" শ্বেত কুকুরটী বলিল, "তোমরা এখানেই প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিও।" বক এইকথা শুনিয়া যথানির্দিষ্ট সময়ে সেখানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক যজ্ঞে উদ্‌গাতারা যেমন বহিষ্পবমান স্তোত্র গানের অভিপ্রায়ে সন্নিহিত ভাবে পরস্পরের পশ্চাদ্‌ভাগের বস্ত্রাংশ মুখে ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে পরিক্রমণ করে, সেইরূপ ইহারাও পরস্পরের পুচ্ছ মুখে করিয়া পরিক্রমা করিল। অনন্তর উপবেশন করিয়া "ওম্ অদাম ওম্ পিবাম"—ইত্যাদিরূপ হিঙ্কার করিল। হিঙ্কারের প্রার্থনা হইল—"হে অন্নপতি, আমাদের জন্য অন্ন আহরণ কর।" অন্নলাভার্থক সামের স্তুতির জন্য এই প্রকরণের আরম্ভ। এখানে গল্পচ্ছলে ঔদ্‌গাত্র কর্মের কিছু বিশেষত্ব বর্ণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

---

৪৯ আশ্বলায়ন গৃহ্য, ১. ২৩; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ৯. ৩. ২০.

সংহিতা-পরিচয়

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বামী ভূমানন্দ (কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা)

৪৫। **বৃহস্পতি সংহিতা**—এই সংহিতায় একটিমাত্র অধ্যায় আছে। দেবরাজ ইন্দ্র, শতাশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া, সুরগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ দ্রব্য দান করিলে সর্বত্র সুখ লাভ হয়—

"ভগবন্ কেন দানেন সর্বতঃ সুখমেধতে"

উত্তরে বৃহস্পতি, সুবর্ণ, রজত, গো, ভূমি, অন্ন, তিল, বস্ত্র, মণিরত্ন প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ দানবস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভূমিদান প্রসঙ্গে বৃহস্পতি বলেন, লোকে যে কোনও পাপ করুক না কেন, গোচর্ম-প্রমাণ ভূমি দান করিলে, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়—

"যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্ষিতঃ
অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিদানেন শুধ্যতি ॥"

"গোচর্ম" কাহাকে বলে, তাহার সংজ্ঞাও এই শাস্ত্রে আছে। দশ হস্তে এক দণ্ড, এবংবিধ ৩০ দণ্ড দীর্ঘ ও দশ দণ্ড প্রস্থ ভূমির নাম গোচর্ম। এই শাস্ত্রে নীলবৃষোৎসর্গের প্রশংসা আছে। যে বৃষের বর্ণ রক্ত, পুচ্ছাগ্র পাণ্ডুর, খুর ও শৃঙ্গ শ্বেত, তাহার নাম "নীলবৃষ"—

"লোহিতো যস্তু বর্ণেন পুচ্ছাগ্রে যস্তু পাণ্ডুরঃ
শ্বেতঃ খুরবিশালাভ্যাং স নীলবৃষ উচ্যতে ॥"

ব্রহ্মস্বাপহরণের ভূয়সী নিন্দা ও ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ভয় করিয়া চলিবার উপদেশ এই শাস্ত্রে আছে—

(ক) "ন বিষং বিষমিত্যাহুঃ ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে
বিষমেকাকিনং হন্তি ব্রহ্মস্বং পুত্রপৌত্রকম্ ॥"

(খ) "মন্যুপ্রহরণা বিপ্রা রাজানঃ শস্ত্রপাণয়ঃ
শস্ত্রমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্যুঃ কুলক্ষয়ম্ ॥
মন্যুপ্রহরণা বিপ্রাশ্চক্রপ্রহরণো হরিঃ
চক্রাতিতীব্রতরো মন্যুস্তস্মাদ্বিপ্রং ন কোপয়েৎ ॥"

৪৬। **পরাশর-সংহিতা**—এই শাস্ত্রখানি দ্বিবিধ আকারে দেখিতে পাওয়া যায়—"পরাশর-সংহিতা" ও "বৃদ্ধপরাশর-সংহিতা।" উভয় সংহিতারই ১২টি করিয়া অধ্যায় আছে। ব্যাসদেব মহর্ষি পরাশরকে বলিয়াছিলেন—"কলিযুগে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর-যুগের ধর্মাচার

প্রচলিত হওয়া সম্ভব নয়; অতএব আপনি কলিযুগোচিত সাধারণ বর্ণাশ্রমধর্ম উপদেশ করুন—

"ধর্মন্তু ত্রিযুগাচারং ন শক্যতে কলৌ যুগে
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥"

মহর্ষি পরাশর ইহার উত্তরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই "পরাশর-সংহিতা" নামে প্রচলিত। পরাশরের মতে কলিযুগের পক্ষে এই সংহিতাই উপযুক্ত ধর্মশাস্ত্র—

"কৃতে তু মানবাঃ ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমস্য চ
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥"

কারণ কলিযুগের মানবগণ অন্নগতপ্রাণ; সেই জন্য পূর্ব যুগাচার প্রতিপালন করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব নয়—

"কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কালৌ ত্বন্নাত্মমেব চ ॥"

এই সংহিতায় অষ্টপ্রকার বিবাহের বিষয় বর্ণিত আছে—বেধস্, দেবক, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈবত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, ও পৈশাচ। জাতি ও গুণবিশিষ্ট পুরুষে সালঙ্কারা কন্যাদানের নাম "বেধস" বিবাহ। যিনি যজ্ঞে ঋত্বিকের কার্য করেন, তাঁহাকে সালঙ্কারা কন্যাদানের নাম "দেবক" বিবাহ। গুণবিশিষ্ট বিদ্বান্ পাত্রে গোদ্বয় গ্রহণ করিয়া কন্যাদানের নাম আর্ষ বিবাহ। বর ও কন্যা উভয়ে ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে পরস্পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক হইলে, কন্যার পিতা যদি ঐ পাত্রকে কন্যা দান করেন, তাহা হইলে ঐ বিবাহের নাম হয় "প্রাজাপত্য" বিবাহ। কন্যার পিতা বা অভিভাবক, পাত্রপক্ষ হইতে পণ গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদান করিলে, সেই বিবাহের নাম "দৈবত্য।" বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলে, উহার নাম হয় "গান্ধর্ব" বিবাহ। বলপূর্বক কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বিবাহের নাম "রাক্ষস" বিবাহ। নিদ্রিত বা উন্মত্ত কন্যাকে গ্রহণ অথবা ছলপূর্বক কোনও কন্যাকে গ্রহণ করার নাম "পৈশাচ" বিবাহ। মনুসংহিতায়ও এই অষ্ট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে; কিন্তু পরাশর-সংহিতার নামের সহিত তাহার একটু পার্থক্য লক্ষিত হয়—

"ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥" মনু ৩।২১

পরাশরের মতে যে যে বিবাহের নাম "বেধস্" "দেবক" ও "দৈবত্য," মনুর মতে তাহাদিগেরই নাম যথাক্রমে "ব্রাহ্ম," "দৈব" ও "আসুর"। বর ও কন্যার গুণ ও দোষের বিষয়ও এই শাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে—

(ক) "জাতিবিদ্যাবয়ঃশক্তিরারোগ্যং বহুপক্ষতা।
অর্থিত্বং বিত্তসম্পত্তিরষ্টাবেব বরে গুণাঃ ॥"

(খ) "বর্জ্জয়েদতিরিক্তাঙ্গীং কন্যাং হীনাঙ্গরোগিণীম্
অতিলোম্নীং হীনলোম্নীমবাচামতিবাগ্‌বৃতাম্ ॥"

এই সংহিতায় বিধবাবিবাহের ও অবস্থাবিশেষে পত্যন্তরগ্রহণের ব্যবস্থা আছে—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

অন্যান্য সংহিতার ন্যায় ইহাতেও শৌচ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, শ্রাদ্ধ, দান প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। গ্রহ-শান্তি বিধিও বিশেষভাবে ইহাতে বর্ণিত আছে। সন্ধ্যোপাসনা ও প্রাণায়ামাদির উপদেশও ইহাতে দেখিতে পাই। দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণেই সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য—

"দিবসস্য চ রাত্রেশ্চ সন্ধ্যঃ সন্ধ্যেতি কীর্ত্তিতা।"

প্রাতঃসন্ধ্যা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়েব পর সন্ধ্যোপাসনা করা বালকের ক্রীড়া মাত্র—

"উদিতে সতি যা সন্ধ্যা বালক্রীড়োপমা চ সা।"

সায়ং সন্ধ্যা সূর্য্যাস্তগমন সময়ে করা বিধেয়। সংহিতাখানির প্রত্যেক অধ্যায় শেষে—"সুব্রত-প্রণীতায়াং ধর্ম্মসংহিতায়াং" দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, এই সংহিতার শেষ বক্তা বা প্রণয়ন-কর্ত্তা সুব্রত মুনি। গ্রন্থশেষেও দেখি—

"পরাশরোদিতং শাস্ত্রং সুব্রতঃ প্রোক্তবান্ মুনিঃ।"

৪৭। **ব্যাস-সংহিতা**—এই ধর্ম্মশাস্ত্রখানি দুই আকারে দেখিতে পাওয়া যায়—"লঘুব্যাস-সংহিতা" ও "ব্যাস-সংহিতা"। প্রথমখানিতে শ্রোতা ও বক্তার উল্লেখ নাই। ইহাতে দুইটিমাত্র অধ্যায় আছে। অপর খানিতে চারিটি অধ্যায় আছে। মুনিগণ ব্যাসদেবকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; উত্তরে তিনি যে সমস্ত ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন, তাহাই এই শাস্ত্রে সন্নিবদ্ধ আছে। ইহাতে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের বিধি, স্নান, আচমন, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, দান প্রভৃতি বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তাদির বিধি ইহাতে নাই। সতীদাহ-বিধি এই শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"মৃতং ভর্ত্তারমাদায় ব্রাহ্মণী বহ্নিমাবিশেৎ ॥" ব্যাস ২।৫২

৪৮। **শঙ্খ-সংহিতা**—এই ধর্ম্মশাস্ত্রে কোনও প্রশ্নকর্ত্তার উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভেই দেখি, মহর্ষি শঙ্খ স্বয়ংই চতুর্ব্বর্ণের হিতের নিমিত্ত এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যহিতার্থায় শঙ্খঃ শাস্ত্রমথাকরোৎ ॥"

ইহাতে ১৮টি অধ্যায় আছে। অন্যান্য সংহিতার ন্যায় ইহাতেও স্নান, আচমন, গায়ত্রী, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির বিধি আছে। চতুর্ব্বর্ণের পুত্রের নামকরণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ব্যবস্থা ইহাতে দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণের নাম মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলান্বিত, বৈশ্যের নাম ধনসংযুক্ত

ও শূদ্রের নাম লজ্জান্বিত (শব্দ) হওয়া বিধেয়। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা বৈশ্যের ধনবাক, ও শূদ্রের দাস শব্দ ব্যবহার করা উচিত ; যথা—

ব্রাহ্মণের নাম ... ... শিব শর্ম্মা, কল্যাণ শর্ম্মা, সোম শর্ম্মা, দিবাকর শর্ম্মা প্রভৃতি।
ক্ষত্রিয়ের „ ... ... প্রতাপ বর্ম্মা, বীরেন্দ্র বর্ম্মা প্রভৃতি।
বৈশ্যের „ ... ... ধনপতি বসু, বসুভূতি প্রভৃতি।
শূদ্রের „ ... ... দীন দাস, চরণ দাস প্রভৃতি।

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু
ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ ॥"

শঙ্খের মতে দীর্ঘ সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—

"শরীরং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং রক্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ
শরীরাচ্চ্যবতে ধর্ম্মঃ পর্ব্বতাৎ সলিলং যথা ॥"

উপনিষৎ ও মহাভারতের অনেকগুলি শ্লোক এই সংহিতায় আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

৪৯। **লিখিত-সংহিতা**—এই ধর্ম্মশাস্ত্রখানির প্রারম্ভে কোনও প্রশ্ন নাই। ইহাতে একটিমাত্র অধ্যায় আছে। প্রথমেই ইষ্টাপূর্ত্ত সম্বন্ধে উপদেশ আরম্ভ—

"ইষ্টাপূর্ত্তে তু কর্ত্তব্যে ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥"

অগ্নিহোত্র, বেদবিধি-পালন, আতিথ্য, বৈশ্বদেববলি প্রভৃতির নাম ইষ্ট ও সাধারণের জন্য দেবমন্দির জলাশয়, উদ্যান, অন্নছত্রাদি প্রতিষ্ঠার নাম পূর্ত্ত—

"অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥
বাপীকূপতড়াগাদিদেবতায়তনানি চ
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে ॥"

এই সংহিতায় বৃক্ষরোপণ-প্রশংসা ও সামান্যভাবে তর্পণ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত ও দান প্রভৃতির বিধিও আছে।

৫০। **দক্ষ-সংহিতা**—এই গ্রন্থে প্রশ্নকর্ত্তা ও বক্তার নাম নাই। এই শাস্ত্র প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে, এই উক্তিমাত্র ইহাতে আছে—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা
এতেষান্তু হিতার্থায় দক্ষঃ শাস্ত্রমকল্পয়ৎ ॥"

ইহাতে সাতটী অধ্যায় আছে। অন্যান্য সংহিতার ন্যায় ইহাতেও শৌচ, আচার প্রভৃতির ব্যবস্থা

আছে। শুদ্ধি সম্বন্ধে প্রজাপতি দক্ষ বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র মৃত্তিকা ও জল দ্বারাই যখন শুদ্ধিকার্য নিষ্পন্ন হয়, তখন তাহা উপেক্ষা করা কাহারও উচিত নয় ; বিশেষতঃ ইহাতেও কায়ক্লেশ বা ধনব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না—

"মৃদা জলেন শুদ্ধি স্যান্ন ক্লেশো ন ধনব্যয়ঃ॥"

যোগ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ এই সংহিতায় দেখিতে পাই—

(ক) "অভিযোগাত্তথাস্মিন্নেব তু নিশ্চয়াৎ
পুনঃ পুনশ্চ নির্বেদাৎ যোগঃ সিদ্ধ্যতি নান্যথা॥"

(খ) "বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে॥"

(গ) "সর্বভাববিনির্ম্মুক্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ
এতদ্ধ্যানঞ্চ যোগশ্চ শেষাঃ স্যুগ্রন্থবিস্তরাঃ॥"

৫১। **গৌতম সংহিতা**—এই সংহিতাখানি দুই আকারে প্রচলিত আছে—"গৌতম সংহিতা" ও "বৃদ্ধগৌতম-সংহিতা"। প্রথমখানি গদ্যে লিখিত। ইহাতে বক্তা বা প্রশ্নকর্তার উল্লেখ নাই। ইহাতে ২৯টি অধ্যায় আছে। অন্যান্য সংহিতার ন্যায় ইহাতেও চতুরাশ্রমবিধি, শৌচাশৌচ-নির্ণয়, গুরুর প্রতি ব্যবহার, শ্রাদ্ধ প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাধা করিয়া যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

"ভগবন্ বৈষ্ণবা ধর্মাঃ কিংফলাঃ কিং পরায়ণাঃ
কিং ধর্মমধিকৃত্যাসীঃ ভবতোৎপাদিতা পুরা॥"

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ যাহা বলেন তাহাই এই সংহিতাকারে প্রচলিত। পরবর্তী বক্তা গৌতম ও তৎপরবর্তী বক্তা বৈশম্পায়ন। এই সংহিতায় অন্যান্য বহু ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। কাজেই মনে হয়, ইহাই শেষ ধর্মশাস্ত্র। ইহাতে সাধারণভাবে স্নান, আচমন, ভোজন, পঞ্চযজ্ঞ ও দানাদির ব্যবস্থা আছে ও বিশেষভাবে বিষ্ণুপূজা, হোম প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে বিষ্ণুর প্রিয় পুষ্পগুলিরও উল্লেখ আছে—

"কুমুদং করবীরঞ্চ গণবঞ্চম্পকস্তথা
মল্লিকা জাতিপুষ্পঞ্চ নন্দ্যাবর্তঞ্চ মে প্রিয়ম্॥"

"সর্বেষামপি পুষ্পানাং সহস্রগণমুৎপলম্
তস্মাৎ পদ্মং তথা রাজন পদ্মাত্তু শতপত্রকম॥"

বিষ্ণুপূজায় বর্জিত পুষ্পগুলিরও উল্লেখ আছে—

(ক) "কিঙ্কিণীং মুনিপুষ্পঞ্চ ধুস্তুরংপাটলস্তথা।"

(খ) "অর্কপুষ্পানি বর্জ্যানি।" ইত্যাদি

সাধারণতঃ সুগন্ধী শুক্লপুষ্পই বিষ্ণুপূজার উপযুক্ত—

"অর্চ্চৈস্তু শুক্লপুষ্পৈস্তু গন্ধবদ্ভির্নরাধিপ"—ইত্যাদি

ভূমিদান বিধির মধ্যে দেখি গোকর্ণ পরিমান ভূমি দান করিলেই মহাপুণ্য লাভ হয়। যেখানে একশত গো সচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে তাহার নাম "গোকর্ণ"—

"সর্বেষাং গোশতং যত্র সুখং তিষ্ঠতি যন্ত্রতঃ
সবৎস নরশার্দ্দুল বৈ তৎ গোকর্ণমুচ্যতে ॥" ৬।১১৪

গোদান বিধির মধ্যে কপিলা-দানের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। সহস্র গোদানে যে ফল হয় একটিমাত্র কপিলা গাভী দান করিলে সেই ফলই লাভ করা যায়—

"গোসহস্রঞ্চ যো দদ্যাদেকাঞ্চ কপিলাং নরঃ
সমং তস্য ফলং প্রাহ ব্রহ্মলোকে পিতামহঃ।"

বর্ণভেদে কপিলা দশ প্রকারের—

"প্রথমা সুবর্ণা কপিলা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা
তৃতীয়া রক্তপিঙ্গাক্ষী চতুর্থী বহ্নিপিঙ্গলা ॥
পঞ্চমী ব্রহ্মবর্ণা স্যাৎ ষষ্ঠী স্যাৎ শ্বেতপিঙ্গলা
সপ্তমী কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষী অষ্টমী সুরপিঙ্গলা
নবমী পাটলা জ্ঞেয়া দশমী পুচ্ছপিঙ্গলা ॥"

অর্থহীন ব্যক্তিও যাহাতে অনায়াসে পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য বৈষ্ণবের প্রতিমাসে আচরিতব্য ব্রতাদির নির্দেশ এই সংহিতায় আছে। তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ বলিয়াছেন, আত্মাই নদী এবং উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। যিনি আত্মজ্ঞানরূপ সলিলে স্নান করেন, তাঁহার আর অন্য সলিলে প্রয়োজন নাই—

"জ্ঞানাম্বুনা স্নাতি চ যো হি নিত্যং
কিন্তস্য ভূয়ঃ সলিলেন কৃত্যম্ ॥"

৫২। **শাতাতপ-সংহিতা**—এই সংহিতায় কোনও প্রশ্নকর্তা নাই। ইহাতে ছয়টি অধ্যায়। প্রায়শ্চিত্তবিহীন মহাপাতকিদিগের জন্মান্তরে বিবিধ রোগভোগের বর্ণনা দিয়াই এই শাস্ত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধিও নির্দেশ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির অধ্যায়শেষে একটু নূতন ধরণের বাক্য দেখিলাম—

"ইতি শাতাতপীয়ে কর্মবিপাকে……"

৫৩। **বশিষ্ঠ-সংহিতা**—এই শাস্ত্রেও বক্তা ও প্রশ্নকর্তার উল্লেখ নাই। ইহাতে ২১টি অধ্যায় আছে। আরম্ভবাক্য—"অথাতঃ পুরুষনিঃশ্রেয়সার্থং ধর্মজিজ্ঞাসা"। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম, শুদ্ধি, শৌচ, আচার, ভোজ্যাভোজ্যবিধি, অতিথিসৎকার প্রভৃতি বিষয় সাধারণভাবে আছে। এই শাস্ত্রমতে আততায়ীবধে কোনও পাপ নাই। আততায়ী ছয় প্রকারের—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥"

বিষ্ণু-সংহিতার ন্যায় ইহাতেও দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বর্ণনা আছে।

৫৪। **'সংহিতা'** শব্দটির তাৎপর্য লইয়া একটু বিচার আছে, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখ আমরা পাই পাণিনিতে। ১।৪।১০৯ সূত্রে পাণিনি বলিতেছেন—"পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা"; অর্থাৎ বর্ণের অত্যন্ত সান্নিধ্যই সংহিতা। "অত্যন্ত সান্নিধ্য" বলিতে শাব্দিকেরা বুঝিয়া থাকেন—
"স্বারসিকার্ধমাত্রাকালব্যবায়েনৈব উচ্চারণম্"; অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্ধমাত্রাকাল ব্যবধান রাখিয়া বর্ণের যে উচ্চারণ তাহাই "পরঃ সন্নিকর্ষঃ" বা অত্যন্ত সান্নিধ্য, এবং ইহাই সংহিতা। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, সন্নিবদ্ধ শব্দদ্বয়ের যে উচ্চারণ তাহাই সংহিতা। সংহিতার বিধান, তাঁহাদিগের মতে, উচ্চারণের বিধান, অথবা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অনুযায়ী শিক্ষা বা Phonetics এর বিধান। সংহিতা শব্দের এই অর্থ তৈত্তিরীয় উপনিষদের "শিক্ষোপনিষদ্বল্লীতেও" আমরা দেখিতে পাই। সেখানে পাঁচটি অধিকরণে সংহিতার যে রহস্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহার আসল কাঠামোটি কিন্তু Phonetics এরই, (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।৯১)। তৈত্তিরীয়, শ্রুতি; পাণিনি, বেদাঙ্গ; সুতরাং সংহিতার Phonetic ব্যাখ্যা, পাণিনি হইতেও প্রাচীন।

৫৫। এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝিতে পারা যায়, কেন বেদভাগকেও সংহিতা বলা হইত। আচার্যপরম্পরায় শ্রুতিমূলে বেদকে রক্ষা করিয়া আসা হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। এই উপলক্ষ্যেই বৈদিক শিক্ষাবিজ্ঞান বা Phonetics এর উদ্ভব। তাহাতে বেদের শব্দরাশিকে অবিকৃত রাখিবার জন্য নানাবিধ পাঠের প্রণালীও উদ্ভাবিত হইয়াছিল—যথা সংহিতা-পাঠ, পদ-পাঠ, জটা-পাঠ, ঘন-পাঠ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে সংহিতা-পাঠ বলিতে পূর্বোক্ত অর্ধমাত্রা ব্যবধানে উচ্চারণকে বুঝাইত। যজ্ঞাদিতে মন্ত্রাদির বিনিয়োগও এই সংহিতা-পাঠ অনুযায়ীই হইত। এইজন্য সংহিতা-পাঠের মর্যাদা ও গুরুত্ব অধিক ছিল। সমগ্র বেদ চারিটি ভাগে বিভক্ত—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কেবলমাত্র মন্ত্র-ভাগকেই "সংহিতা" বলা হয়, যেমন "সামবেদ-সংহিতা", "ঋগ্বেদ-সংহিতা", ইত্যাদি। কালে, 'সংহিতা' শব্দটি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট উচ্চারণ পদ্ধতিকে না বুঝাইয়া, উহাদ্বারা যে কোনও বিদ্যার মূল উৎসকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলে, অধিকাংশ শাস্ত্রই ক্রমে সংহিতা নামে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে; যেমন—

(ক) ভৃগু-সংহিতা, বৃদ্ধবশিষ্ঠ-সংহিতা
বৃহৎ-সংহিতা প্রভৃতি ... ... জ্যোতিষ-শাস্ত্র।

(খ) ঘেরণ্ড-সংহিতা, গোরক্ষ-সংহিতা
শিব-সংহিতা প্রভৃতি ... ... যোগ-শাস্ত্র।

(গ) চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি ... ... চিকিৎসা-শাস্ত্র।
(ঘ) শতসাহস্রী সংহিতা (মহাভারত) ... ... ইতিহাস শাস্ত্র।

অষ্টাবক্র-সংহিতা জ্ঞানযোগের উপদেশে পরিপূর্ণ। যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে কেবলমাত্র কর্মযোগের বিচার থাকিলেও, উহা "সংহিতা" নামে অভিহিত হইয়াছে দেখিতে পাই—

(ক) ইহামুত্র চ সিদ্ধ্যর্থং পুরুষার্থফলপ্রদাম্
মোক্ষোপায়ময়ীং বক্ষ্যে সংহিতাং সারনির্মিতাম্॥ যোগবাশিষ্ঠ ২।১০।৪
(খ) মোক্ষোপায়াভিধানেয়ং সংহিতা সারনির্মিতা॥ " ২।১৭।৬

কোনও কোনও শাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ বা অধ্যায়গুলিকেও সংহিতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে দেখিতে পাই। যেমন, স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত সূতসংহিতা, শিবপুরাণান্তর্গত জ্ঞান-সংহিতা বিশ্বেশ্বর-সংহিতা, সনৎকুমার-সংহিতা, বায়বীয়-সংহিতা, ধর্ম-সংহিতা, কৈলাস-সংহিতা প্রভৃতি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখিতে পাই সমগ্র পুরাণও 'সংহিতা' নামে আখ্যাত হইয়াছে। যেমন বিষ্ণু-পুরাণকে 'সংহিতা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে—

"সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্॥ বিষ্ণু-পুরাণ ১।১।৩৪

এবং এই জন্যই বিষ্ণু-পুরাণের গ্রন্থসমাপ্তিবাক্যেও 'সংহিতা' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই—

"ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডবিস্তারে পরাশর-সংহিতায়াং......"

বিষ্ণু-পুরাণে আরও দেখিতে পাই, বেদার্থ সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, মহর্ষি বেদব্যাস আখ্যায়িকাদি সম্বলিত সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়া তাঁহার শিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পুরাণও সংহিতা নামে আখ্যাত—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ
পুরাণ-সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥" ৩।৬।১৬-১৭

৫৬। হিন্দুধর্মশাস্ত্রের অন্ত নাই। বর্তমানকালে অনেকগুলি শাস্ত্র নামেমাত্র পরিচিত, তাহাদিগের অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেকগুলি নানা কারণে ধ্বংশ-প্রাপ্ত। কোনও কোনও হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাচীন পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সযত্নে সুরক্ষিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণের অজ্ঞাত ও দুষ্প্রাপ্য। কতকগুলি এরূপভাবে কীটদষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার উদ্ধার একপ্রকার অসম্ভবই বলিয়াই বোধ হয়। সুখের বিষয় এক্ষণে উচ্চশিক্ষিত বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুন্নত, অধ্যাপকদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের চেষ্টায় কয়েকটি প্রাচ্য অনুসন্ধান-সমিতি হইতে প্রাচীন গ্রন্থাদির উদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে। মনে হয়, যদি কেহ সংহিতা সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তিনি কালে আরও অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশিত করিতে পারিবেন।

ওঁ তৎ সৎ

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি, এ

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা ভিন্ন ভিন্ন দুইটী দেখা যায়।

(ক) "গুরুপরম্পরা প্রভাব" মতে

১। বিষ্ণু
২। পোইহে
৩। পে আলোয়ার
... ...
... ...
১৩। শ্রীনাথ মুনি
১৪। ঈশ্বর মুনি
১৫। যামুন মুনি
১৬। মহাপূর্ণ
১৭। রামানুজাচার্য

(খ) শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারের পুস্তক মতে

১। বিষ্ণু
২। লক্ষ্মী
৩। সেনেশ
... ...
... ...
৮। যামুনাচার্য্য
৯। মহাপূর্ণ
১০। রামানুজাচার্য

মধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা এই রূপ—

১। শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু
২। চতুর্মুখ ব্রহ্মা
৩। সনকমুনি, সনন্দন, সনৎসুজাত, সনৎকুমার
৪। দুর্ব্বাসা
৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, গরুড়বাহনতীর্থ, কৈবল্যতীর্থ, জ্ঞানেশতীর্থ, পরতীর্থ
৬। সত্যপ্রজ্ঞ
৭। প্রাজ্ঞতীর্থ
৮। অচ্যুতপ্রেক্ষ
৯। শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ আনন্দতীর্থাবিধ শ্রীমন্মধ্বাচার্যচরণ।

শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত "বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্ব" নামক গ্রন্থ হইতে মধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা গৃহীত হইল। শঙ্কর সম্প্রদায়ের এবং রামানুজ সম্প্রদায়ের

গুরুপরম্পরাসকল সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় প্রণীত "আচার্যশঙ্কর ও রামানুজ" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

মাধ্বীসম্প্রদায়ের আর একটী গুরুপরম্পরায় দেখা যায় এইরূপ,—

১। ব্রহ্মা
|
২। নারদ
|
৩। বেদব্যাস
|
৪। মধ্বাচার্য

মধ্বাচার্যের জন্ম ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে, এবং দেহত্যাগ ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।

যে মহান্, যে বলবান্ তাঁহার গৌরবচ্ছটায় সকলেই আলোকিত হইতে চায়। নিম্বার্কসম্প্রদায়ে, মাধ্বীসম্প্রদায়ে এবং শঙ্করসম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরায় নারদ ঋষির নাম দৃষ্ট হয়। একই গুরু নিম্বার্ককে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্যকে দ্বৈত-বাদ, এবং শঙ্করকে অদ্বৈতবাদ উপদেশ দিবেন, ইহা কল্পনায়ও আসে না। অথচ, এই সব ক্ষেত্রে শিষ্যের যোগ্যতানুসারে উপদেশের তারতম্য হয়, এই কথাও বলা যায় না; কারণ, ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ মনীষী। তবে অনুমান হয়, সময়ের পরিবর্তনে শাস্ত্রের ব্যাখ্যারও পরিবর্তন ঋষিদের অভিপ্রেত, কারণ লোকের ধীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ী গুরুপরম্পরা নিম্নে লিখিত হইল।—

নারায়ণ
|
ব্রহ্মা
|
নারদ
|
ব্যাসদেব
|
শুকদেব — মাধবাচার্য (মধ্বাচার্য)
|
পদ্মনাভ আচার্য
|
নরহরি
|
অক্ষোভ
|
জয়তীর্থ
|
জ্ঞানসিন্ধু
|
মহানিধি

মহানিধি
|
বিদ্যানিধি
|
রাজেন্দ্র
|
জয়ধর্ম
├── শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী
└── পুরুষোত্তম
    |
    ব্রহ্মন্
    |
    ব্যাসতীর্থ
    |
    লক্ষ্মীপতী
    |
    মাধবেন্দ্রপুরী
    ├── শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য
    ├── শ্রীমৎনিত্যানন্দ
    └── শ্রীমৎঈশ্বরপুরী
        |
        শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
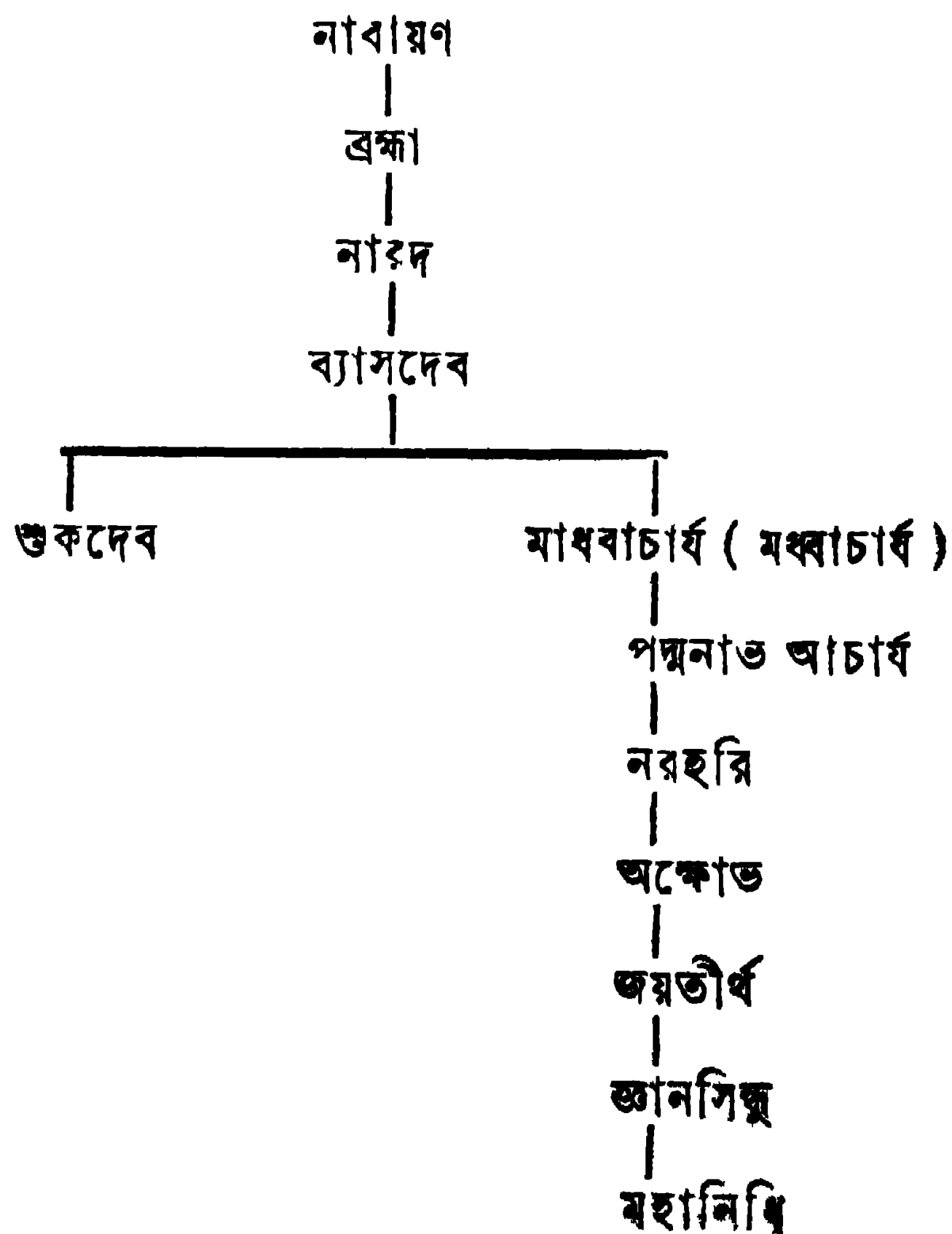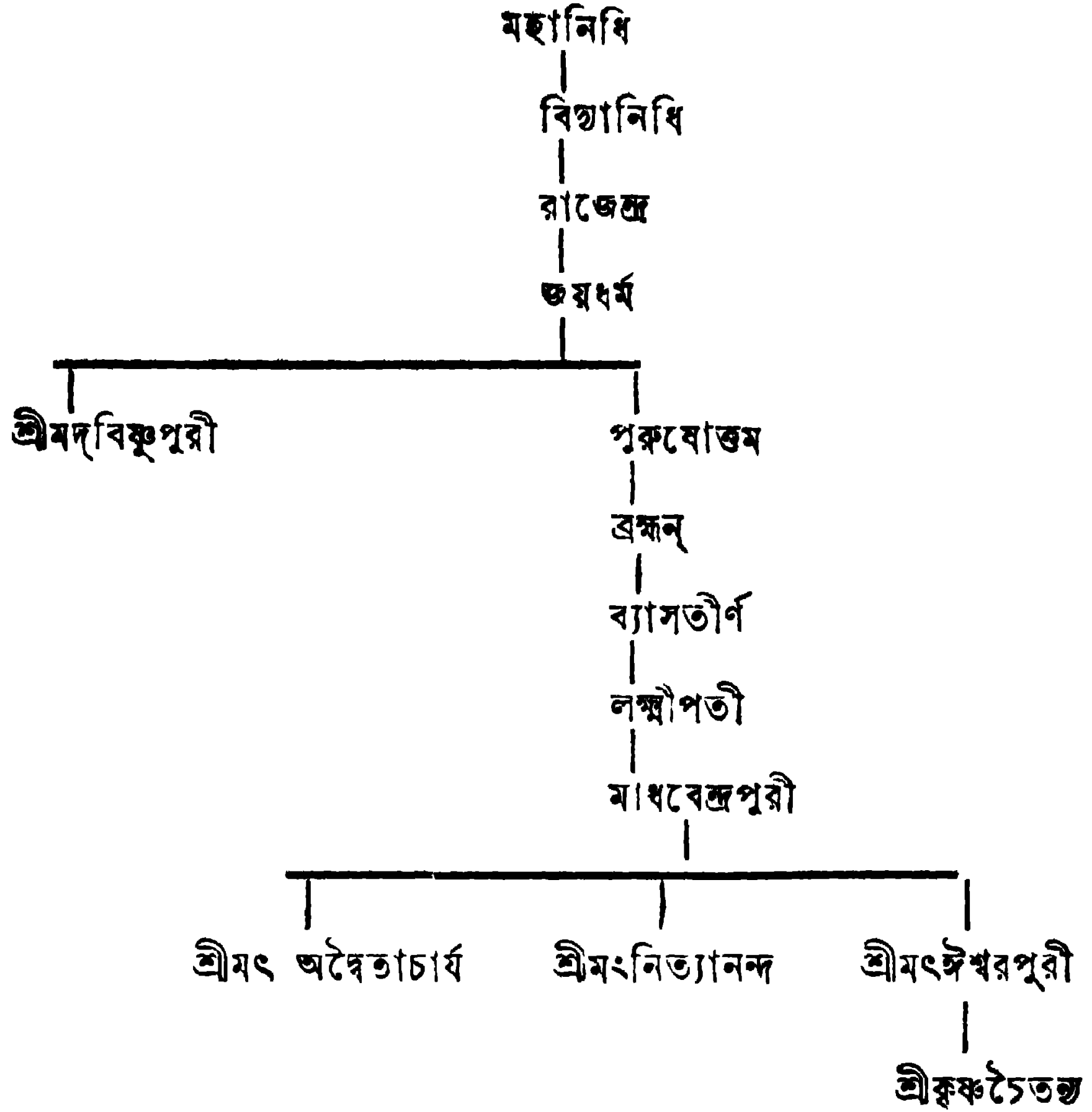
শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায-কৃত "বৈষ্ণব ইতিহাস" (১৩৩১, তৃতীয় সংস্করণ) হইতে উপরিলিখিত গুরু-প্রণালীটী গৃহীত হইযাছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সম্প্রদায়েও আদিগুরু ভগবান্ নাবায়ণ।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য জনমেজযের রাজত্বকালে প্রকটিত হইযাছিলেন,—পূর্বে এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে ; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যেহেতু (১) অন্যান্য কিম্বদন্তীদ্বাবা ইহা সমর্থিত হয় না, এবং (২) স্বয়ং নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাসাচার্য বিরুদ্ধভাবেব কথা লিখিযাছেন।

সুতরাং ব্রজভূমিতে নন্দগৃহে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিযা শ্রীনিম্বার্কাচার্য যে শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজ বচনা করিয়াছিলেন,—তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কাবণ নিম্বার্কের "জন্মলগ্ন' হইতে ইহা দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির ৬ শাকে শ্রীনিম্বার্ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচলিত কোনও পুবাণে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নন্দগৃহে গমনের উল্লেখ নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে চিত্রকেতুর উপাখ্যানে যে "আরুণি" ঋষির নামেব উল্লেখ আছে, এবং শ্রীনারদভগবান্-কৃত "ভক্তিসূত্রে" যে "আরুণি" নাম দৃষ্ট হয়, তাহা যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যকেই কেবল বুঝায়, তাহা বলা যাইতে পারে না। নিম্বার্কের নাম "আরুণি" বলিয়া কল্পনা করাও নিরাপদ নহে। কারণ, অরুণতনয় হইলেও আরুণি নাম রূঢ়ি হয় না। আর একজন আরুণি ঋষির নাম পাওয়া যায়। তিনিও নগণ্য নহেন। এই ঋষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য হইলেন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি,—যিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্যতম

উপদেষ্টা। বিদেহরাজ জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন। কৌষীতকি উপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা একজন আরুণি ঋষির নাম পাওয়া যায়।

উপরে কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে—"সুদর্শন" ঋষির নাম পাওয়া যায় এবং অন্যান্য ঋষিগণের সহিত তিনিও ভীষ্মকে শরশয্যায় দেখিতে গিয়াছিলেন। নিম্বার্কাচার্যই যে "সুদর্শন" ঋষি ছিলেন, ইহা কেবল অনুমান মাত্র। নামসাদৃশ্যে সময় নিরূপণ করা যায় না। পুরাকালের বৈদিক সাহিত্যে অন্ততঃ তিনজন কাত্যায়নের নাম পাওয়া যায়। অন্য একজন কাত্যায়ন পাণিনির বার্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের ঋষিগণের নাম (যথা,–বিশ্বামিত্র, মেধাতিথি, অঙ্গিরা, কণ্ব, অগস্ত্য ইত্যাদি) রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং নামসাদৃশ্যে সময় নিরূপণ করা সুকঠিন। একনামে বহু ঋষি থাকিতে পারেন. অথবা এই সব নাম পারিবারিক উপাধি (family title) হইতে পারে ;—যথা, জনক, চরক, বৈশম্পায়ন। "চরক ইতি বৈশম্পায়নস্যাখ্যা তৎ-সম্বন্ধেন সর্বে তদন্তেবাসিনঃ চরকা ইত্যুচ্যন্তে" ইতি কাশিকা। কপিলনামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন। ইতিপূর্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, উপরিলিখিত অন্যান্য কিম্বদন্তীগুলিও ভিত্তিহীন, যথা, (১) শ্রীনিবাসাচার্য যুধিষ্ঠির সম্বৎ ৮৮৪ বর্ষে ধরাধামে বিরাজ করিয়াছিলেন, (২) রাজা বজ্রনাভের সহিত শ্রীনিম্বার্কাচার্যের কথোপকথন, (৩) যুধিষ্ঠির ৬ শাকে শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুরাণের আলোচনায় দেখা যায় যে, পরীক্ষিৎ নামে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয়েরই পুত্রগণের একই নাম ছিল,—যথা, জন্মেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ভীমসেন।

ইতঃপূর্বে এই প্রবন্ধে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের "হরিপ্রিয়" নাম সম্বন্ধে আলোচনা করা গিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শৌনক ঋষির উক্তি বলিয়া লিখিত আছে—"কপালবেধমিত্যাহুরা-চার্যা যে হরিপ্রিয়াঃ।" এই "হরিপ্রিয়" শব্দদ্বারা যে কেবল শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে বুঝায়,—এইরূপ মনে করা নিতান্ত কষ্টকল্পনা। হরিপ্রিয় ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে—গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়,—১৩ হইতে ২০ শ্লোকে। এই সকল লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিরাই ভগবানের প্রিয়। উপরিলিখিত শ্লোকার্ধের অর্থ হইবে এই, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভগবৎপরায়ণ বৈষ্ণবভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা আচার্যশ্রেণীর ব্যক্তি তাঁহারা এই কপালবেধপ্রথা অনুমোদন করেন। এই ব্যাখ্যাই সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ যাহা প্রচলিত আছে, তাহা বিশেষ প্রাচীন নহে। শ্রীকেশবকাশ্মীরিভট্ট প্রণীত গীতার "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকার শেষভাগে "আচার্যবর্যেণ হরিপ্রিয়েণ"—এই পদগুলি শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বিশেষক বা বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক মাত্র। ভগবদ্ভক্তও শ্রদ্ধাসম্পন্ন বৈষ্ণবমাত্রেই "হরিপ্রিয়" অর্থাৎ হরির প্রিয়। এই 'হরিপ্রিয়' শব্দদ্বারা শ্রীনিম্বার্কের অন্য নাম হরিপ্রিয় ছিল ইহা বুঝায় না। অপ্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অতিপ্রাচীন শৌনক ঋষির নামের উল্লেখ থাকা কেবল বিস্ময়ের কথা

বৃদ্ধির জন্য। নতুবা, যে নিম্বার্কাচার্যের নিজের কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি বুদ্ধদেবের পরের লোক, সেই নিম্বার্কাচার্য সম্বন্ধে শৌনক ঋষির পক্ষে কোনও প্রকার মন্তব্য করা নিতান্ত অসম্ভব। এই শৌণক ঋষিরই আশ্রমে নৈমিষারণ্যে শৌণকের যজ্ঞে বৈশম্পায়নের পুত্র সৌতির দ্বারা (দ্বিতীয়বার) মহাভারত কথিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে সর্ব প্রথমে জন্মেজয়ের নিকট বৈশম্পায়ন দ্বারা মহাভারত কথিত হইয়াছিল।

এক্ষণে ভবিষ্যপুরাণ এবং বেদব্যাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইং ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে কাশী "চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ-এ" প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীনিবাসাচার্য ভাষ্যসমেত একখানি গ্রন্থ কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ন্যায়াচার্য-কাব্যতীর্থ শ্রীঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন,—(পানীয়ঘাট) বৃন্দাবন বাস্তব্য শ্রী ১০৮ পণ্ডিত কল্যাণদাস পাদপদ্মাশ্রিত শ্রীরাধিকাদাস। ভূমিকাটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। লেখক প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে মহাভারতের যুদ্ধ, মহাভারত, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের রচনা প্রায় সমসাময়িক। নিম্বার্কাচার্যের সময় নিরূপণ করিতে গিয়া তিনি ভবিষ্য পুরাণের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকটী এই—

"সুদর্শনো দ্বাপরান্তে কৃষ্ণাজ্ঞপ্তো জনিষ্যতি।
নিম্বাদিত্য ইতি খ্যাতো ধর্মগ্লানিং হরিষ্যতি ॥

এই শ্লোকের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিম্বার্কাচার্য দ্বাপরযুগের অন্তে (অর্থাৎ কলিযুগের প্রারম্ভে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্বশেষ শ্লোকটী এই—

"নিম্বার্কো ভগবান্যেষাং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কঃ।
উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপষণে॥"

ভূমিকালেখক বলিতেছেন যে, এই বচন হইতে নিম্বার্ক এবং বেদব্যাসের সমকালিকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বিচক্ষণ স্মার্ত পণ্ডিত কমলাকর ভট্ট "নির্ণয়সিন্ধু" নামক গ্রন্থে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইস্থলে আমার বক্তব্য এই যে, এই শ্লোকটী "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়াই যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়, এরূপ বলা সঙ্গত হয় না। "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থখানি পশ্চিম ভারতের স্মৃতিগ্রন্থ, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে হেমাদ্রি রচিত দক্ষিণ ভারতীয় স্মৃতিগ্রন্থ "চতুর্বর্গ চিন্তামণি" নামক পুস্তকেও ভবিষ্যপুরাণের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য অন্ততঃ খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের লোক।

ভবিষ্য পুরাণের যে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি যে "প্রক্ষিপ্ত" তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক, বি. এল্. মহাশয় একজন অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থকার; তিনি ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার রচিত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে "ভবিষ্যপুরাণ" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ভবিষ্যপুরাণে ১৪,৫০০ শ্লোক

থাকা অবগত হওয়া যায়। মুদ্রিত গ্রন্থে ২৫,০০০ শ্লোক। মৎস্যপুরাণে ভবিষ্যের যে বিবরণ আছে তাহার সহিত ঐক্য নাই। সম্ভবতঃ ইহার অধিকাংশই ভেজাল।”—মৎস্যপুরাণ একখানি অতি প্রামাণ্য পুরাণ। একই গ্রন্থের রচয়িতা একই বিষয়ে যে বিভিন্ন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহা ধারণার অতীত। পণ্ডিতবর ভৌমিক মহাশয় বলেন, “সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষবশতঃ ও স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গৌরব কীর্তনের জন্য বহু আধুনিক বিষয় ঐ সকল পুরাণের অঙ্গবৃদ্ধি করিয়াছে।” তিনি আরও বলেন যে, “যথাপ্রাপ্ত পুরাণগুলির প্রাচীন অংশে যে অনুক্রমণিকা ও অন্যান্য পুরাণের যে বিষয়সূচী আছে তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন পুরাণগুলির বহু অংশ বিকৃত, স্থানচ্যুত ও অন্তর্হিত হইযাছে।” প্রচলিত প্রত্যেক পুরাণের প্রত্যেক শ্লোকই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস প্রণীত ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পূর্বে এই বিষয়ের আলোচনা করা গিযাছে। লিপিকারগণ কর্তৃক পুরাণগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীনিম্বার্ক ভগবানের উল্লেখযুক্ত শ্লোকটী যে পশ্চাৎযোজনা করা যাইতে পারে না, তাহার কোন কারণ নাই। সময় সময় পুরাণগুলির যে পরিবর্ধন হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুপুরাণ (চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশ অধ্যায়) হইতে দেখা যায় যে, পুরাণগুলি অন্ততঃ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত পরিবর্ধিত হইয়াছে। পুরাণের সংরক্ষণ ছিল “সূত”দিগের ধর্ম। সুতরাং সময়ে সময়ে পুরাণগুলির পরিবর্ধন হওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাসপাঠে ইহা অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধযুগেও বৈষ্ণব এবং শৈবধর্মের প্রভাব নিতান্ত অল্প ছিল না। তাহার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে, মায়ামোহোৎপত্তি এবং বৌদ্ধধর্মোৎপত্তি প্রসঙ্গে। এই পুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে জৈন ধর্মের দিগম্বর শাখার উল্লেখ আছে, “দিগ্‌বাসসামরং ধর্মঃ”। ইহা হইতে আমরা দুইটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি—এই পুরাণ-রচয়িতার সময় জৈনধর্মমত প্রচলিত ছিল, অথবা সম্পূর্ণ অষ্টাদশ অধ্যায়টীই পশ্চাৎ যোজনা করা।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে পশ্চাৎযোজনা বহু পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সর্বপ্রধান দৃষ্টান্ত মহাভারত। মহাভারতের মূল শ্লোকসংখ্যা ৮,৮০০ (যাহা আদিপর্বে উল্লিখিত হইয়াছে) ক্রমেক্রমে ২৪,০০০ (চব্বিশহাজার) হইয়াছিল,—এবং পরে খ্রী° পূ° দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহা লক্ষ শ্লোকাত্মক হইয়াছে। প্রচলিত মহাভারতে প্রত্যেকটী শ্লোক বেদব্যাস রচিত নহে, ইহা সহজেই অনুমেয়, ভবিষ্যপুরাণ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের ঐতিহাসিক মূল্য যাহাই হউক, সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই এই গ্রন্থকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যে সকল ভবিষ্যৎ উক্তি শুকদেব কর্তৃক কথিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে, তাহা দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় শুকদেবের পক্ষে বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং ইহা পশ্চাৎ যোজনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতীতের ঘটনাবলী ভবিষ্যৎ উক্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে মাত্র, এবং তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য বক্তাস্থলে মহাপুরুষের

নাম নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রচলিত ভবিষ্যপুরাণে নিম্বার্ক ভগবান্ সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ যোজনা বলিয়া ধারণা করা স্বাভাবিক। এই সকল উক্তি যে বেদ ব্যাসের নহে তাহার প্রমাণ স্বয়ং শ্রীনিম্বার্কাচার্য, যাঁহার ভাষ্য হইতে দেখা যায় তিনি বুদ্ধদেবের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, শ্রীনিম্বার্কচার্য্য কোন প্রকারেই বেদব্যাসের সমসাময়িক হইতে পারেন না। ইত্যাদি কারণে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী কেবল সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য লিখিত হইয়াছিল ;—

"শ্রীনিম্বার্কো ভগবানৈবমৌদুম্বরাভিধম্।
অনুগৃহ্যঋষেরাদৌ জগামবদরীশ্রমম্॥
নিবসন্ তত্র ব্যাসেন সাকং চ কতিচিৎসমাঃ।
চকার ব্রহ্মসূত্রেস্য ব্যাখ্যানং প্রথমং প্রভুঃ॥"

অর্থাৎ, শ্রীনিম্বার্কাচার্য বদরিকাশ্রমে মহর্ষি বেদব্যাসের সহিত কিছুকাল বাস করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ভাষ্যকার হইলেন।

নিম্নে যে পাঁচটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে প্রচলিত শাস্ত্রাদিগ্রন্থে পশ্চাৎ সঙ্কলনকারীদিগের হস্তচিহ্ন লক্ষিত হয় ;—

(১) শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪টী কাণ্ড আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত এই যে ইহার প্রথম ৯টী কাণ্ড অতি প্রাচীন। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশকাণ্ডে পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয়, ধৃতরাষ্ট্র, কাশীরাজ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নরপতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণ রচনার কাল প্রায় খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর। (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত "উপনিষদ্—ব্রহ্মতত্ত্ব")

(২) বসিষ্ঠকৃত ধর্মসূত্রে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন মনুস্মৃতি হইতে কয়েক পংক্তি গদ্য এবং অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন মনুসূত্র গদ্য পদ্যে বিরচিত ছিল, এবং বর্তমান মনু-সংহিতার সংস্কার করা হইয়াছে।

(৩) বর্ত্তমান প্রচলিত মনু-সংহিতায় (১০।৪৪) চীন, শক, যবন প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। এমন কি প্রকারান্তরে বৌদ্ধদিগেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় বৌদ্ধদিগের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থের ভিতরেই ইহার আধুনিকত্বের প্রমাণ বিদ্যমান। [(১—৪) রমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "হিন্দুশাস্ত্র" হইতে গৃহীত]।

(৫) মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত "হিন্দুশাস্ত্র" প্রথম খণ্ডের চতুর্থ ভাগের নাম "ধর্মশাস্ত্র"। ইহা পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংকলিত। প্রাচীন ধর্ম-সংহিতার বিবরণের মধ্যে "বিষ্ণু সংহিতার" সম্বন্ধে তাঁহারা লিখিতেছেন, —"প্রাচীন কাঠকদিগের যে কল্পসূত্র ছিল তাহাই রূপান্তর করিয়া বিষ্ণু-সংহিতা সংকলিত

হইয়াছে। সুতরাং বিষ্ণু-সংহিতার কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন, এবং কোন কোন অংশ অপেক্ষা কৃত আধুনিক। ৬৫ অধ্যায়ে প্রাচীন কাঠক মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত আছে। আবার ২০ ও ২৫ অধ্যায়ে সতীদাহের কথা আছে, ৮৪ ও ৮৫ অধ্যায়ে ম্লেচ্ছদিগের এবং আধুনিক তীর্থস্থানগুলির উল্লেখ আছে, এবং ৯৭ অধ্যায়ে যোগশাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব ধর্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা হইয়াছে। বিস্তর স্থানে গ্রন্থের আধুনিক বৈষ্ণব সংকলনকারীর হস্তচিহ্ন লক্ষিত হয়। * * * মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা এবং বিষ্ণুসংহিতা ভিন্ন আর আর যে সংহিতা দৃষ্ট হয় সেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; তাহার মধ্যে কোন কোনটী বোধ হয় মুসলমান কর্তৃক ভারত-বিজয়ের পর পুনঃসংকলিত হইয়াছে।"

মহাভারত হইতেও এইরূপ একটী পশ্চাৎ যোজনার উল্লেখ করিতেছি। বিষ্ণুর অবতার সকলের নামের মধ্যে বুদ্ধের নাম মহাভারতে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, মহাভারতের বনপর্বে আমরা দেখিতে পাই—

"এড়ূক চিহ্ন পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা।"

ভবিষ্যৎকালে কলিযুগের বর্ণনায় ইহা উক্ত হইয়াছে। "এড়ূক" শব্দ দ্বারা বুঝায় যে সকল বৌদ্ধ চৈত্য বুদ্ধদেবের দন্তাদি প্রোথিত স্থানে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, এই কথাগুলি মহাভারতে পশ্চাৎ লিখিত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য,—শ্রীযুক্ত জাহ্নবী চরণ ভৌমিক কৃত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস")।

"হরিবংশ" মহাভারতের পরিশিষ্ট ("খিল") রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। মহাভারতের আদিপর্বে দেখা যায় যে, ১২,০০০ শ্লোক হরিবংশে আছে। কিন্তু প্রচলিত হরিবংশে ১৬,০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। সুতরাং ৪,০০০ শ্লোক যে হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

যখন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়, তখন সমুদয় পুরাণে মোট চারিলক্ষ শ্লোক থাকা দৃষ্ট হয়,—এবং কোন্ কোন্ পুরাণে কি পরিমাণ শ্লোক ছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভবিষ্য-পুরাণে ১৪,৫০০ শ্লোক ছিল। কিন্তু প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে ২৫,০০০ শ্লোক দেখা যায়। সুতরাং ভবিষ্য পুরাণে যে, ১০,৫০০ শ্লোক পশ্চাৎ সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি যে সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্বের গৌরববৃদ্ধির জন্য সন্নিবিষ্ট হয় নাই, তাহা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না, এবং যথাপ্রাপ্ত ভবিষ্য পুরাণের শ্লোকগুলি যে সত্যবতীনন্দন পরাশরপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস মহর্ষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কাচার্যের এবং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের সমকালিকত্বের কোনও প্রমাণ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগণেশ

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্.এ., বি.এল্.

আর্যদিগের যে সব প্রধান দেবগণ ভারতে ও বহির্ভারতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, গণেশ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

নামকরণ—গণানাম্ ঈশঃ=গণেশঃ, অর্থাৎ ইনি গণদিগের অধীশ্বর। 'গণ' শব্দের অর্থ প্রমথ বা শিবের সেবক। শিবের এই সব সেবকেরা যক্ষজাতীয়। গণেশের বহু নাম আছে। ইহার মধ্যে অনেক নামের ভিত্তি বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে। নামভেদে মূর্তিরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তন্ত্রে ৫০টী নাম দৃষ্ট হয়। এই ৫০টীর আবার ৫০টী শক্তির নামও আছে। 'শারদা তিলক' তন্ত্রের রাঘবভট্টে টীকায় (১।১১৬) গণেশের এই ৫০টী নাম ও ৫০টী শক্তির যে উল্লেখ আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	গণেশ	ও তাঁহার শক্তি
(১)	বিঘ্নেশ	হ্রী
(২)	বিঘ্নরাজ	শ্রী
(৩)	বিনায়ক	পুষ্টি
(৪)	শিবোত্তম	শান্তি
(৫)	বিঘ্নকৃৎ	স্বস্তি
(৬)	বিঘ্নহর্তা	সরস্বতী
(৭)	গণ	স্বাহা
(৮)	একদন্তক	মেধা
(৯)	দ্বিদন্তক	কান্তি
(১০)	গজবক্ত্র	কামিনী
(১১)	নিরঞ্জন	মোহিনী
(১২)	কপর্দী	নটী
(১৩)	দীর্ঘজীহ্বক	পার্বতী
(১৪)	শঙ্কুকর্ণ	জ্বালিনী
(১৫)	বৃষভধ্বজ	নন্দা
(১৬)	গণনায়ক	সুপাশা
(১৭)	গজেন্দ্র	কামরূপিণী
(১৮)	সূর্পকর্ণ	উমা
(১৯)	ত্রিলোচন	তেজোবতী
(২০)	লম্বোদর	সত্যা
(২১)	মহানন্দ	বিঘ্নেশানী
(২২)	চতুর্মূর্তি	স্বরূপিণী
(২৩)	সদাশিব	কামদা
(২৪)	আমোদ	মদজিহ্বা
(২৫)	দুর্মুখ	ভূতি
(২৬)	সুমুখ	ভৌতিকা
(২৭)	প্রমোদক	অসিতা
(২৮)	একরদ	রমা
(২৯)	দ্বিজিহ্ব	মহিষী
(৩০)	শূর	ভঞ্জিনী
(৩১)	বীর	বিকর্ণপা
(৩২)	ষণ্মুখ	ভ্রুকুটী
(৩৩)	বরদ	লজ্জা
(৩৪)	বামদেব	দীর্ঘঘোণা
(৩৫)	বক্রতুণ্ড	ধনুর্ধরা
(৩৬)	দ্বিরন্তক	যামিনী

	গণেশ ও	তাঁহার শক্তি		গণেশ ও	তাঁহার শক্তি
(৩৭)	সেনানীরমণ	রাত্রি	(৪৪)	বরেণ্য	সুভগা
(৩৮)	মত্ত	কামাক্ষা	(৪৫)	বৃষকেতন	শিবা
(৩৯)	বিমত্ত	শশিপ্রভা	(৪৬)	ভক্ষপ্রিয়	ভর্গা
(৪০)	মত্তবাহন	লোলাক্ষী	(৪৭)	গণেশ	ভগিনী
(৪১)	জটী	চঞ্চলা	(৪৮)	মেঘনাদক	ভোগিনী
(৪২)	মুণ্ডী	দীপ্তি	(৪৯)	ব্যাপী	কালরাত্রি
(৪৩)	খড়্গী	দুর্ভগা	(৫০)	গণেশ্বর	কালিকা

পুরাণাদিতে কিন্তু গণেশ বা তাঁহার শক্তির এত নাম পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এই ১২টী নাম প্রসিদ্ধ যথা (১) বক্রতুণ্ড (২) একদন্ত (৩) বিনায়ক (৪) গণপতি (৫) বিঘ্নেশ্বর (৬) অথু-রথ (৭) সিদ্ধিদাতা (৮) হেরম্ব (৯) বি-দেহক (১০) লম্বোদর (১১) গজানন ও (১২) বালগণপতি। অগ্নিপুরাণে গণেশের শক্তির এই কয়টি নাম পাওয়া যায় যথা—জ্বালিনী, সুর্যেশা, কামরূপা, উদয়া, কামবর্তিনী, সত্যা, বিঘ্ননাশা ও গন্ধ মৃত্তিকা। তামিল ভাষায় আবার গণেশের নাম 'পিল্লেয়র'। ভারতেতর দেশে গণেশের বহুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ঐ সব দেশেও গণেশ-পূজা প্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন দেশে গণেশের বিভিন্ন নাম যথা—

তিব্বতে—ৎসা'গ স্-ব্দগ, ও ব্গেগস্মেদ্প'ই ব্দগ্ পো

বর্মাদেশে—মহা-পিত্রনে

মঙ্গলদেশে—তোৎখর্-ও উন্খঘন্

কম্বোজদেশে—প্রাহ্ কেনেস্

চীনদেশে—কু অন্-শি তি'এন্

জাপানে—শো-তেন্, বিনায়ক্শ, ক্ বন্গ্জন্-শো ও কঙ্গি-তেন্ ।

ইতিহাস—ঋগ্বেদের ২।২৩।১এ 'গণপতি' শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহা ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতির অন্যতম নাম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২১) যে গণপতি'র উল্লেখ দেখা যায় তাহাও ব্রহ্মা, বনস্পতি বা বৃহস্পতির নামান্তর। তারপর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ১০।১।৫ এ 'দন্তী' নামক এক দেবতার মন্ত্র হইতে দেখা যায়, এই দেবতা পরবর্তী যুগের হস্তী মুণ্ড বিশিষ্ট গণেশ। এই মন্ত্রটী যথা—'তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্ নো দন্তীঃ প্রচোদয়াৎ'। ইহা হইতে দেখা যায় যে বৈদিক যুগেও গণেশ পূজিত হইয়াছেন।

তারপর পৌরাণিকযুগে রামায়ণ ও মহাভারতে যদিও হস্তিমুণ্ডবিশিষ্ট গণেশের উল্লেখ নাই তাহা হইলেও শিব হইতে পৃথক একজন দেবতার উল্লেখ আছে। ইহার নাম 'গণেশান'। পরবর্তী পুরাণ সমূহে যেমন শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতিতে গণেশের বহু উল্লেখ আছে এবং উপাখ্যানও আছে। অগ্নিপুরাণে (৭১।৬) গণেশের গায়ত্রী আছে; (৭১।১-৩)

গণেশের পূজাপদ্ধতি আছে। গণেশের নামে একটি উপনিষৎ আছে। ইহার নাম 'গণেশাথর্ব শীর্ষোপনিষৎ'; এবং একটি উপপুরাণ 'গণেশোপপুরাণ' আছে।

পৌরাণিক আখ্যান—মহাভারতের ১। ১ অঃ এ—দেখা যায় যে একদিন হিরণ্য-গর্ভ (ব্রহ্মা) ব্যাসদেবের নিকট আসিলে ব্যাসদেব তাঁহাকে একজন লিপিকারের অভাবের বিষয় জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মা গণেশকে এই কার্যে নিযুক্ত করিতে বলেন এবং পরে গণেশ স্বীকৃত হ'ন। ব্যাসদেব যোগবলে মহাভারতের শ্লোক রচনা করিতেন ও গণেশ তাহা লিখিয়া যাইতেন। তদবধি তিনি প্রসিদ্ধ লিপিকার ও সিদ্ধিদাতা নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীনকালে ভারতীয় অক্ষরকে 'সিদ্ধম্' বলা হইত। সেজন্য লিখিবার প্রথমেই 'সিদ্ধি' শব্দ লিখিবার রীতি প্রচলিত। সুতরাং গণেশের সিদ্ধিদাতা নাম কার্যে সাফল্যদানকারী এবং প্রাচীন লিপির 'সিদ্ধম্' হইতে গৃহীত এই উভয়ই বুঝাইতে পারে।

দক্ষ কন্যা সতী দেহ ত্যাগের পর হিমালয় কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও পরে মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরে কোন পুত্রাদি না হওয়ায় পার্বতী বিষ্ণুর আরাধনা করেন ও তাঁহার বরে তিনি এক সুন্দর পুত্রলাভ করেন। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালে খুব উৎসব হইতে লাগিল। অনেক দেবতা কৈলাসে এই নবজাত পুত্র দর্শনে আসিল। শনি দেবতাকে তাঁহার স্ত্রী এই অভিসম্পাত দিয়াছিলেন যে যাহার দিকে তিনি তাকাইবেন তাহারই মাথা উড়িয়া যাইবে। শনি এই ভয়ে প্রথমে কৈলাসে আসিতে চাহেন না। শিবের কথায় তিনি পরে আসিলেন। কিন্তু চোখ তুলিলেন না। পার্বতী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শনি সব কথা বলিলেন। পার্বতী ইহা হাস্যাস্পদ বলেন ও শনিকে নির্ভয়ে তাকাইতে বলেন। কিন্তু যেইমাত্র শনি চাহিলেন অমনি মাথা উড়িয়া গেল। পার্বতী কাঁদিয়া আকুল। বিষ্ণুকে ডাকিতে পাঠান হ'ল। বিষ্ণু আসিবার সময় রাস্তায় একটী হাতী শুইয়া থাকিতে দেখেন। ঐ হাতীর মাথাটী তিনি আনিয়া বালকের মাথায় দিয়া দিলেন। হস্তিমুণ্ড বলিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এই বালক দেবতাকে অনাদর না করে সেজন্য সকল দেবতা মিলিয়া এই বিধান করিলেন যে সর্বাগ্রে এই দেবতার পূজা না করিলে অন্যকোন দেবতার পূজাই সিদ্ধ হইবে না। স্কন্দ পুরাণে গণেশ খণ্ডে কিন্তু আবার এই আখ্যানটী অন্য রকমের। তাহাতে আছে যে সিন্দুর নামক একটী দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক কাটিয়া ফেলে। পরে মস্তকহীন সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে নারদের অনুরোধে সেই সন্তানই গজাসুরের মাথা কাটিয়া মস্তকযুক্ত হইলেন। তদবধি ইঁহার নাম গজানন।

গজের দুইটী দন্ত। কিন্তু গণেশ কেন একদন্ত হইলেন তাহারও একটী পৌরাণিক আখ্যান আছে। যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে নিধন করিয়া কৈলাসে হরপার্বতীকে প্রণাম করিতে আসেন তখন তাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন। গণেশ পরশুরামকে অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু পরশুরাম তাহা না শুনায় গণেশ দুই হাতে তাঁহাকে ত্রিভুবন ঘুরাইয়া দেন। পরশুরাম

ইহাতে লজ্জিত হইয়া তাঁহার অমোঘ অস্ত্র পরশু নিক্ষেপ করেন। গণেশের তাহাতে একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ গণেশ-খণ্ড দেখুন)।

বৃহৎদন্তে গণেশ শত্রুকুলকে ধ্বংস করিলে তাহাদের রক্তে তিনি সিন্দুর বর্ণ হইয়াছিলেন। এই প্রকার অনেক আখ্যান আছে।

ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ কিন্তু এই প্রকার আখ্যানে সন্তুষ্ট বা বিশ্বাসবান নহেন। তাঁহারা গণেশের এবম্প্রকার মূর্তির কারণানুসন্ধানে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ফুশে, গেটি প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে গণেশ প্রথমে দ্রবিড়জাতির দেবতা ছিলেন। ভারতের সূর্যোপাসক আদিম অধিবাসী-কর্তৃক তিনি পূজিত হইতেন। বাহন মূষিকের উপর উপবিষ্ট গণেশ সূর্যদেবতারই প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। আদিম জাতির দেবমূর্তিসমূহ অনেকস্থলে পশুমুণ্ড বিশিষ্ট। আর হস্তী ভারতের সর্ববৃহৎ জন্তু; সেজন্য প্রধান দেবতারূপে গণেশের হস্তিমুণ্ড কল্পিত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও আছে যে ব্রাহ্মণদিগের দেবতা শিব ও শূদ্রদিগের দেবতা 'গণেশ'। এখানে শূদ্র শব্দের অর্থ ভারতের আদিম অধিবাসী। এবিষয়ে মনিয়র উইলিয়ম্‌স্ (M. Williams) কৃত Brahmanism and Hinduism গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। যাহা হউক এইসব তথ্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পূজা পদ্ধতি—স্কন্দপুরাণমতে ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশ পার্বতীনন্দনরূপে কৈলাসে জন্মপরিগ্রহ করেন। কিন্তু অন্যমতে তিনি মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিতে আবির্ভূত হন। সেজন্য গণেশ-পূজা ও ব্রতাদি সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য ও বোম্বাই প্রদেশে ভাদ্রমাসের ঐ তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় আবার বাঙ্গলাদেশে মাঘমাসের এই চতুর্থী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে এই পূজায় বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়, গৃহাদি আলোক মালায় সজ্জিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশে বিশেষ আড়ম্বর লক্ষিত হয় না এবং অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই মূর্তি আনয়ন করিয়া পূজা করে। গণেশের দুই প্রকার ধ্যানমন্ত্র আছে—একটি পৌরাণিক যথা খর্বং স্থূলতনুং…কর্মহং। আর একটি তান্ত্রিক মন্ত্র যথা—সিন্দুরাভং……রাগম্ (তন্ত্রসার)। গণেশের বীজমন্ত্র গৌঁ। গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শীরসে স্বাহা এই প্রকারে অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি করিতে হয়। আর গণেশের পৌরাণিক মন্ত্র 'ওঁ নমো গণেশায়'। গণেশের গায়ত্রী যথা—

'একদংষ্ট্রায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি
তন্নো বিঘ্ন প্রচোদয়াৎ' (প্রাণতোষিণী দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে—'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় সর্বসিদ্ধি প্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমোনমঃ' মন্ত্রে গণেশ পূজা করিতে হয়। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র প্রদান নিষিদ্ধ। প্রত্যেক পূজার প্রথমেই গণেশ পূজা বিধেয়।

গণেশের পত্নী—বুদ্ধি ও সিদ্ধি, এবং তাঁহার শক্তি লক্ষ্মী (এই লক্ষ্মী নারায়ণ পত্নী নহে)। গণেশ মুদ্রা—বিতর্ক, তর্জনী। প্রতীক—ভগ্ন হস্তিদন্ত, মোদক, বর্তসের সম্পুটক, জলপাত্র, আকাশবল্লী, বিগোর ফল, খড়্গ, অক্ষমালা, হস্তিতাড়নের অঙ্কুশ, ডালিম ফল, লোহিতাভা,

জম্বুফল ইত্যাদি। গণেশের বর্ণ—লোহিত, পীতলোহিত, পীত, শ্বেত। ইঁহার বাহন মুষিক, অনেক স্থলে সিংহ।

মূর্ত্তি পরিচয়—গণেশের বহুপ্রকার মূর্তি বিভিন্ন নামে ভারতে ও অন্যান্য দেশে আছে। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে চুণ্টিরাজ ও বক্রতুণ্ড এই নামে গণেশের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী প্রধান গণেশমূর্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে—

(ক) মহাগণপতি—মুদ্গলপুরাণে মহাগণপতির যে ধ্যান আছে তাহাতে দেখা যায়—ইঁহার ত্রিনেত্র, ললাটে চন্দ্রকলা, দশহাত ও তাহাতে বিভিন্ন প্রহরণ, অঙ্কে ইঁহার পত্নী আসীনা। মাদুরায় ও তিনেভেলি জেলায় বিশ্বনাথ মন্দিরে মহাগণপতির মূর্তি আছে। (খ) লক্ষ্মীগণপতি—যে মূর্তিতে মহাগণপতির সঙ্গে তাঁহার দুই দেবী থাকেন তাহার নাম লক্ষ্মীগণপতি। (গ) বালগণপতি—ইঁহার মূর্তি বালকবৎ, চারহাতে আম্র, কলা, কাঁঠাল, ও ইক্ষু এই ফলগুলি আছে। এই প্রকারে (ঘ) ভক্তি বিঘ্নেশ্বর (ঙ) বীর বিঘ্নেশ (চ) শক্তি গণেশ (ছ) উচ্ছিষ্ট গণপতি (জ) উর্ধগণপতি (ঝ) পিঙ্গলগণপতি (ঞ) হেরম্ব (ট) প্রসন্নগণপতি (ঠ) ধ্বজগণপতি (ড) উন্মত্ত উচ্ছিষ্ট গণপতি (ঢ) বিঘ্নরাজ গণপতি (ণ) ভুবনেশ গণপতি (ত) নৃত্ত-গণপতি (থ) হরিদ্রাগণপতি বা রাত্রি-গণপতি (দ) ভালচন্দ্র (ধ) সুরপকর্ণ (ন) একদন্ত, ইত্যাদি আছে। ইঁহাদের মূর্তিতে কাহারও দশহাত, কাহারও আটহাত. কাহারও চারহাত এবং অন্যান্য বৈষম্যও আছে। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ও মূর্তি পরিচয় গোপীনাথরাও-কৃত Elements of Hindu Iconography Vol. I. pt. I. গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মন্দিরাদি—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত পুণানগবের নিকটে একটি পাহাড় আছে ইহার মধ্যে প্রায় ২৪টী গুহা মন্দির আছে, এই সব মন্দিরে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম গুহার ভিতরে (তাহার নাম গণেশলেনা) গণেশের মন্দির আছে। উড়িষ্যার উদয়গিরি পাহাড়েও একটী গণেশ গুহা আছে। নর্মদা নদীর তীরে একটী কুণ্ড আছে উহার নাম গণেশ কুণ্ড। রাজগীরের মধ্যেও একটী পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণ গণেশকুণ্ড নামে খ্যাত।

ভারতে বহুস্থানে গণেশ মন্দির আছে ও পূর্বোল্লিখিত বিভিন্ন প্রকারের গণেশ বিভিন্ন মন্দিরে আছে। বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতেই এই সব মন্দিরের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়। এই সব মন্দিরের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

তত্ত্ব—'গণপতি তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে গণেশকেই পরব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রমাণ স্বরূপ ইহাতে একটি শ্রুতির বচন ও অন্যান্য বহুপ্রমাণ উদ্ধৃত আছে। এই প্রকার মতবাদীদিগকে গাণপত্য সম্প্রদায় বলা হয়। ইঁহারা আবার ৬টী দলে বিভক্ত। এক একদল এক প্রকার গণপতির পূজা করেন—যথা, মহাগণপতি, হরিদ্রাগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, হেরম্বগণপতি, স্বর্ণগণপতি ও সন্তানগণপতি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের গণেশ-অধ্যায়ে দেখা যায় যে বিষ্ণু গণেশের ৮টী নামকরণ করিয়াছেন এবং এই আটটী নামের আট প্রকার আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—(১) গণেশ ; গ=জ্ঞান, ণ=মুক্তি। 'গণেশ' অর্থ

যিনি জ্ঞান ও মুক্তিদান করেন। (২) একদন্ত, এক=প্রধান; দন্ত=বল অর্থাৎ যিনি প্রধান বলসম্পন্ন। (৩) হেরম্ব; হে=দীন, রম্ব=পালক অর্থাৎ যিনি দীনপালক (৪) লম্বোদর অর্থাৎ পূর্বে বিষ্ণু প্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান ইত্যাদি। গণেশকে এইরূপে পরব্রহ্ম কল্পনা করিয়া তাঁহার অনেক অবতারের কথাও—যেমন বক্রতুণ্ড, কপিল, চিন্তামণি, বিনায়ক ইত্যাদি স্কন্দপুরাণের গণেশখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

উপসংহার—ইহাই সংক্ষেপে সর্বসিদ্ধি প্রদাতা, সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক, বিঘ্নবিনাশক গণদেবের সংক্ষিপ্ত কথা। গণেশ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও কি প্রকারে ও পদ্ধতিতে গণেশের পূজা তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশে প্রচারিত হইল তৎসম্বন্ধে স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটী পুস্তক রচনা করিতেছিলেন। উহার কতকাংশ শ্রীভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার অবশিষ্টাংশ আমরা সংগ্রহ করিতেছি এবং শীঘ্রই পুনরায় উহা শ্রীভারতীতে ও শ্রীভারতী গ্রন্থমালায় পৃথকভাবে প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

১)

বাংলার তাঁতশিল্প

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি.এল.

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন আদিম মানুষ তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্তন করিতে থাকে, তখন লজ্জা নিবারণের জন্য বৃক্ষের বন্ধলের পরিবর্তে বস্ত্র পরিধান করতে আরম্ভ করে। কাজেই সভ্যতার প্রথম অরুণালোককালে যে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, একথা অবিসম্বাদী।

মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত শিলা ও মৃণ্ময় লেখা হইতে জানা যায় যে, বেদের পূর্বেও আর্যেরা বস্ত্রবয়ন, পশুপালন ও হর্ম্ম্যনির্মাণাদি জানিতেন। সিন্ধু তীরবর্তী আর্যেরাই হিন্দু আখ্যা পাইলেন এবং তাঁহারই দক্ষিণপথগামী বৃহত্তম শাখা এই বাঙ্গালী জাতি। কাজেই উপরি-উক্ত চারুকারুশিল্পসহ বয়নবিদ্যা এদেশে সংক্রামিত হওয়া স্বাভাবিক।

অতি পুরাতন কাল হইতে এদেশে তুলার চাষ হইত। তখন দিদিমারা সন্ধ্যাবেলায় নাতিনাতনীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চরকার সুতা কাটিতেন। প্রত্যেক বাড়িতে এইরূপ সুতাকাটা হইত এবং প্রত্যেক মেয়েই প্রায় বস্ত্রবয়ন জানিতেন। সাংসারিক সর্ববিধ কাজের মধ্যে বস্ত্রবয়নশিক্ষা মেয়েদেব পক্ষে অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের যাবতীয় বস্ত্র তাঁহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতেন, পরমুখাপেক্ষী হইতেন না।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগ হইতে আরম্ভ ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে আগমনের সময় পর্যন্ত তাঁতশিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। ঢাকার মসলীন্ বস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত ছিল। ঢাকার মসলীন্, জামদানী, বুটাদার, প্রভৃতি বস্ত্র জাপান, চীন, গ্রীস, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত। মিঃ টেলারের টপোগ্রাফিতে দেখা যায় যে, ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার লোকেরা মসলীন্ বস্ত্রের দ্বারা বিদেশ হ'তে ২৮৫০০০৲ টাকা আমদানী করিয়াছিলেন। ঢাকার মসলীন্ কমন্সসভায় সূক্ষ্মতায় ও পাড়ের পারিপাট্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐতিহাসিক টেভেনিয়ার লিখিয়াছেন যে ৬০ হাত একখানা মসলীন্ বস্ত্র নারিকেলের খোলের ভিতর ভ'রে তদানীন্তন পারস্যসম্রাটকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল এবং সম্রাট্‌নন্দিনী উপর্য্যুপরি সাতখানা মসলীন্ বস্ত্র দ্বারা দেহাবরণ ক'রে পিতার সামনে উপস্থিত হইলে, পিতা উলঙ্গ ভাবিয়া কন্যাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে।

আজ বাংলার তাঁতশিল্প যে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা সুধী পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করেন কিনা জানি না। কিন্তু স্থানীয় তাঁতিগণ যে আজ জীবনমরণ সমস্যায় উপনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই খবর রাখেন। বিদেশী কল-ওয়ালাদের প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও তাঁতশিল্প অদ্যাপি টিকিয়া থাকিলেও, আজ ইহা এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, এরূপ অবস্থা আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বাংলার তাঁতিকুলের অধিকাংশই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে; এবং যাহাদের বৃত্ত্যন্তর গ্রহণের সুবিধা আছে, তাহারা কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বাংলা হইতে তাঁতশিল্প যে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এখনও এই শিল্পের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছে, বাংলার ন্যূনাধিক দশ লক্ষ ব্যক্তি। তাঁতের সহিত তাহাদের জীবন ঘনিষ্ঠরূপে বিজড়িত। বর্তমানে তাহাদের অবস্থা যে কি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের লেখনীর নাই। পূর্বে যে তাঁতি একজোড়া কাপড়ে ছয় টাকা পারিশ্রমিক পাইয়াছে, আজ সেই কাপড়ের মজুরী এক টাকার অধিক নহে।

আবার ৪০ বা ৫০ নম্বরের সুতায় প্রস্তুত কাপড়ের পারিশ্রমিক জোড়া প্রতি ছয় আনা মাত্র। সুতরাং যে তাঁতী এক জোড়া কাপড় বয়ন করিয়া ছয় টাকা উপার্জন করিয়াছে, আজ সে তদনুরূপ পরিশ্রম করিয়া মাত্র ছয় আনার অধিকারী। এখন পশ্চিমবঙ্গে যে তাঁত ব্যবহৃত হয় তদ্দ্বারা স্ত্রীপুরুষে পরিশ্রম করিয়াও তাঁতীর দৈনিক চারি আনা উপার্জন করা অতীব আয়াসসাধ্য। এই চারি আনার দ্বারা কয়েক বৎসর যাবৎ তাহারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া, স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করিয়া, কুটুম্বিকতা রক্ষা করিয়া, রোগের চিকিৎসা করিয়া কোন রকমে জীবন্মৃতরূপে কালযাপন করিয়াছে, কিন্তু আজ আবার সেই দৈনিক চারি আনা উপার্জনের আশাও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ভারতের দুয়ারে আজ সমরানল প্রজ্বলিত। বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা মহানগরী আজ যুদ্ধ ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত। বড় বড় মহাজনেরা কলিকাতা নগরী ত্যাগ করিতেছে, দোকান পাট বন্ধ হইতেছে। কাজেই কয়েক মাস যাবৎ দেশী কাপড় আর বিক্রয় হইতেছে না। তাহাতে দেশীয় মহাজনগণ যাঁহাদের উপর দেশীয় তাঁতিকুল আজীবন নির্ভর করিয়া থাকে এবং যাঁহারা তাঁতিদের লভ্যাংশের শতকরা ৮০ ভাগ বঞ্চনা করিয়া এতদিন বেশ উদরপূর্তি করিয়া আসিয়াছেন এবং দেশ মধ্যে 'ধনী' আখ্যা পাইয়াছেন তাঁহারাও দুই এক মাসের এই বিপর্যয়ে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের বাজারের সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া দুর্গত তাঁতিকুলের বিরুদ্ধে দুয়ার একেবারে অর্গলবদ্ধ করিতেছেন। দুই একজন সহৃদয় 'পাইকার' কিছু কিছু দান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁতিদের অভাবের অনুপাতে সে দান কিছুই নয়—সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মত। যে দুর্গত তাঁতিকুলের বলেই আজ দেশীয় মহাজনগণ সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা এইদুর্ভাগাগণকে এদুঃসময়ে না দেখিলে আর কে দেখিবে? লিখিতে বড়ই কষ্ট হয় যে, কোন কোন তাঁতিগৃহস্থ উপায়ান্তর না দেখিয়া স্ত্রীপুত্র এবং নিজের উদরান্নের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। এখন এই তাঁতশিল্পের এরূপ দুর্দশার কারণ কি এবং ইহার প্রতিকারই বা কি?

তাঁতশিল্পের অবনতির মোটামুটি কারণ এইগুলি—

(১) মিলের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(২) বিদেশাগত সুতার মূল্যবৃদ্ধি।

(৩) তাঁতের কাপড় বাজারে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিবার অভাব।

(৪) তন্তুবায়গণের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সহযোগিতার অভাব।

ইহার প্রতিকার :—(১) ক্রেতাগণের স্বজাতি ও স্বদেশ-প্রীতির উন্নয়ন। বস্ত্র ভাল হউক, কি মন্দ হউক উহা আমরা কিনিবই এইরূপ দৃঢ় মনোবৃত্তি।

(২) তাঁতিদের যথেষ্ট মূলধন পাইবার ব্যবস্থা।

(৩) তাঁতের ক্রমোন্নয়ন।

(৪) অল্প সময়ে অধিক বস্ত্র বয়ণের ব্যবস্থা।

(৫) মিল হইতে যাহাতে তাঁত বুনিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সুতা সুবিধাদরে পাওয় যায়, তাহার ব্যবস্থা।

৬) তাঁতিদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা।

(৭) কম সুদে তাঁতিদের টাকা দাদনের ব্যবস্থা।

(৮) গ্রামে গ্রামে কাপড়ের সুতার উপযোগী উৎকৃষ্ট তুলা জন্মাইবার ব্যবস্থা। এইরূপে অনেক পতিত জমির সদ্ব্যবহার হবে। তুলার চাষ পাট চাষ অপেক্ষা লাভজনক। একবার গাছ পুঁতিলে ৪।৫ বৎসর ফল দিবে।

(৯) জাতীয় যৌথ কারবার সংঘটনে তাঁতিদের মূলধন ও বস্ত্রবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ।

তাঁতিদের বর্তমান দুর্গতির প্রতিকারের জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের যে অনেকখানি দায়িত্ব আছে, সেকথা কেহ অস্বীকার করিবে না, কিন্তু দেশের লোকেরও যে এবিষয়ে বিশেষ কর্তব্য আছে, তাহাও সকলেই বলিবে। ইহার একমাত্র স্থিতিশীল প্রতিকার, সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন। একটী জাতীয় বা প্রতিষ্ঠানমূলক মূলধন থাকিবে। ইহার সু-নিয়ন্তাগণ থাকিবেন। কম খরচে সুতা আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং নামমাত্র (অথবা কিছু না রাখিয়াও) লভ্যাংশ রাখিয়া তাঁতিদের মধ্যে সুতা বণ্টন করিতে হইবে। প্রস্তুত বস্ত্র যাহাতে যথার্থ বা অধিকমূল্যে বিক্রয় হয় তার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের ত্যাগী, উন্নতমনা যুবক ব্যবসায়ীগণের দ্বারাই ইহার প্রতিকার সম্ভব। স্বদেশ মাতৃকার জন্য উৎসর্গীকৃত মহানুভব ভ্রাতৃবৃন্দের আমি এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

(২)

স্বর্গের ধারণা

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্.এ., বি.এল্.

প্রাচীন যবদ্বীপবাসীদের মতে ভভোনঙ্গো নামক এক মনোরম পর্বতে মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা গমন করেন; ইহাই স্বর্গ। বোর্ণিওবাসিদের মতে স্বর্গের এক দেবতা প্রতিদিন এক লৌহ নির্মিত জাহাজে আরোহণ করিয়া মৃতব্যক্তিদিগকে শোকের পরপারে লেভাম্-লিয়াউ নামক রমণীয় স্থানে লইয়া যান; ইহাই তাঁহাদের স্বর্গ। প্রাচীন জার্মান জাতির ধারণা ছিল, মৃত সৈন্যেরা 'অস্‌গর্দ' নামে দেবতাদের এক সুরম্য উপবনে গমন করে। পারশ্যজাতিদের স্বর্গ তাহাদের প্রাচীন বাসস্থানের উত্তরে—ইহা কোন্ স্থানে তাহার স্থিরতা নাই। ইহুদীদিগের স্বর্গ ইডেন্ গার্ডেন, ইহা দামাস্কসের উত্তরে এব্‌রুহেবে মরূদ্যানের মধ্যে।

সনাতন ধর্মাবলম্বী ঋষিরা দিব্যদৃষ্টিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যে স্বরূপ দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দশটী ভুবনে ভাগ করিয়াছেন—তন্মধ্যে ভূঃ (পৃথিবী) ও ভুবঃ (সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-মণ্ডল) দেখিতে পাওয়া যায়; বাকী স্বর্গ, তপঃ, জন, মহ, সত্য প্রভৃতি উর্দ্ধলোক-গুলি—যাহা জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবতা বা সিদ্ধপুরুষদের বাসস্থান—স্থূল চক্ষু গম্য নহে। ইহারই মধ্যে একটী লোক আছে, যাহা আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবলোকে বিভক্ত। এইসব দেবতাদের মুক্ত ভক্তেরা ভগবানের সহিত তথায় চিরকাল বিরাজ করেন। এবিষয় ভবিষ্যতে আলোচিত হইবে।

(৩)

পারসীক জাতি

পূর্বে শ্রীভারতীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পারসীক জাতির আদিম বাসস্থান তদানীন্তন ভারতেরই উত্তরে এবং ইহাদের ধর্ম-গ্রন্থ আবেস্তা ও বেদ একই—উচ্চারণের তারতম্যে সামান্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই পারসীক জাতির ক্রিয়াকলাপ, যেমন উপনয়ন প্রভৃতি অনেকাংশে বৈদিক ক্রিয়াকলাপেরই মত। ভবিষ্যতে এ বিষয়ের কয়েকটি তথ্য আলোচিত হইবে।

আমাদের কথা

আবার বৎসর পরে ভারতে ভারতী দেবীর পূজা-আয়োজন হইতেছে। দেবী জ্ঞান-বিদ্যাদায়িনী। ভারতের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাঁহার অর্চনায় আনন্দিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিদ্যা-দেবীর এত পূজার প্রাচুর্য সত্ত্বেও ভারতেই অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। ইহার কারণ দেবীর আশীর্বাদের অভাব নহে, তাঁহার ভক্তদের আশীর্বাদ গ্রহণের অনুপযুক্ততা। ভারতের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ও প্রকৃত জ্ঞানীব্যক্তি বিরল নহে, কিন্তু জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারব্রতী জনসংখ্যার তুলনায় খুবই অল্প। আর বর্তমানে শিক্ষা অর্থোপার্জনের একটি উপায় মাত্র হইয়াছে। ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়।

প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ তিনজন করিয়া সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তি বা যুবক আছেন। তাঁহারা যদি তাঁহাদের দৈনন্দিন অন্য কাজের সঙ্গে সেই গ্রামস্থ নরনারীকে শিক্ষা দানের জন্য মাত্র কিছুক্ষণ সময়ক্ষেপ করেন তাহা হইলে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে ভারতে শতকরা ৭৫ জন সামান্য শিক্ষিত হইতে পারে। আশা করি, ভারতী দেবীর পূজাতিথি দিবসে তাঁহার পূজা বেদীর সম্মুখে গ্রামস্থ শিক্ষিত ব্যক্তি দলবদ্ধ ভাবে এই শুভ সংকল্প করিবেন যে, দ্বাদশ মাসে প্রত্যেক গ্রামবাসী বিদ্যার শুভ্র আলোকে আলোকিত হইবে। এই শুভ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে অবশ্যই দেবী তাঁহার আশীর্বাণী ও কৃপা বিতরণ করিবেন।

*　*　*　*

দেবীর এই পূজা-তিথি বাসরে আমরাও প্রার্থনা করি যেন সাধনার মহাপুণ্যতীর্থ এই ভারতভূমিতে যাহা একসময়ে ধর্মে, কর্মে, প্রতিভায় বিশ্বের গুণীদের মুগ্ধ করিয়া জগৎ সভায় মণিরূপে অবস্থিতা ছিল, আবার দেবীর কৃপায় নবীন ভারতের নব-রচিত শান্ত তপোবনে স্নিগ্ধ অরুণালোকে অজ্ঞানজনিত হিংসাদ্বেষাদির অন্ধকার অপসারিত হইয়া জ্ঞানের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, দেবীর শুভ্র আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

*　*　*　*

ভারতের ৪টী প্রধান তীর্থস্থানে—হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, ও উজ্জয়িনী তিন বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা নামক সাধুদের এক মহা সমাগম হয়। সুতরাং প্রতি স্থানে ১২ বৎসর অন্তর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসরে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে। ধর্মপিপাসু বহু নরনারী এই মেলায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ-নিবন্ধন প্রয়াগের জন্য রেলের টিকিট বিক্রী বন্ধ হইয়াছে। অথচ গভর্ণমেণ্ট মক্কাতীর্থ যাত্রীদের জন্য সুবিধা করে দিতেছেন এবং তার জন্য যাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণিত। গভর্ণমেণ্টের এই প্রকার বিভিন্ন ব্যবস্থার কারণ বুঝিতেছি না। হিন্দুরা যাহাতে ঐক্য বদ্ধ না হয় তাহাই কি? তার জন্যই কি ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হইল? যাই হোক আমাদের বক্তব্য ১২ বৎসর অন্তর যে ধর্ম মেলা হয়, যেখানে রাজনীতি চর্চার কোন সম্বন্ধই নাই, সেই প্রকার স্থানে সম্যক্‌রূপে টিকিট বন্ধ করায় হিন্দু মাত্রেই ক্ষুব্ধ।

পুস্তক সমালোচনা

Ancient Races and Myths—শ্রীযুক্ত চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাদার্স কর্তৃক ৮১, বিবেকানন্দ রোড হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৩২। মূল্য—১৲ টাকা।

চন্দ্রবাবু একজন পুরাতন লেখক। ইতিপূর্বে আমরা তাঁহার দুই একখানি পুস্তকের আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থসকলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও লেখক প্রাচীন ঐতিহাসিক সাহিত্যে ও ethnology বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

Villages and Towns as Social Patterns—অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার এম. এ., বিদ্যাবৈভব-কৃত। চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক ১৫, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১৬+৬৮৫, মূল্য ১৫৲

অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার-কৃত ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, ও কৃষ্টি-মূলক বহু গ্রন্থ বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার অন্যতম সমাজ বিজ্ঞান-মূলক গবেষণালব্ধ অবদান। ইহা ৫টী ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক ভাগ কয়েকটী অধ্যায়যুক্ত। এই গ্রন্থের বিষয়-বস্তু অনেক স্থলেই সংখ্যার (Statistics) দ্বারা দেখান হইয়াছে। গ্রন্থখানি অর্থনীতি ও সমাজনীতির গবেষকদিগের জন্য বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহা সাধারণ ছাত্রদের বোধগম্য নহে। যাঁহারা সমাজ-সেবা-শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা করিতে চান তাঁহাদের এই প্রকার গ্রন্থ অত্যাবশ্যকীয়। ইহাতে তাঁহারা তুলনামূলক বহু বিষয় জানিতে পারিবেন। এই গ্রন্থ ডক্টর সরকারের গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচায়ক। এই প্রকার গ্রন্থ যাহাতে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় তাহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশিষ্ট পুস্তকাগার ও চিন্তাশীল পাঠকবর্গের মধ্যে এই পুস্তকের প্রচার কামনা করি। ইহার কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। কাব্য জিজ্ঞাসা—দ্বিতীয় সংস্করণ—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। বিশ্বভারতী, মূল্য ১॥০

২। কৃষিভারতের নগ্নরূপ—সুধীর প্রধান। সমবায় পাবলিশিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা মূল্য ১৲

৩। জ্ঞানবিজ্ঞানের মধুভাণ্ড। দ্বিতীয় খণ্ড—মধুচক্র কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা মূল্য ৸৴০

৪। কবিপ্রণাম—বাণীচক্রভবন কর্তৃক প্রকাশিত। সীলেট, মূল্য ১॥০

৫। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, মূল্য ১৲।

৬। ভারতের দেব-দেউল—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

৭। প্রাণতত্ত্ব—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার' পঞ্চম পুস্তিকা—

সাময়িক সাহিত্য—পৌষ, ১৩৪৮

সাহিত্য

বঙ্গশ্রী—সপার্ষদ গৌরাঙ্গদেব ও নাট্যকলা—ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

,, —দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে "মা"—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়।

,, —দীনবন্ধু ও নীলদর্পণ—অধ্যাপক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

,, —কৃত্তিবাস—শ্রীকালিদাস রায়।

ধর্ম ও দর্শন

ভারতবর্ষ—দুঃখ-জয় ও অমৃতত্ব—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

,, —আগম ও শ্রীঅরবিন্দ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ।

উদ্বোধন—খ্রীষ্টধর্মের সহিত খ্রীষ্টপূর্বধর্মের সাদৃশ্য—স্বামী সুন্দরানন্দ।

,, —ডারুইন ও লামার্ক সম্বন্ধে ইতঃস্তত:—স্বামী বাসুদেবানন্দ।

ব্রহ্মবিদ্যা—আত্মানুভূতি—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

,, —সাধন পথের অন্তরায়—শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়।

প্রত্নতত্ত্ব

ভারতবর্ষ—গান্ধারশিল্পে বুদ্ধের জীবনী—শ্রীগুরুদাস সরকার।

,, —ভারতীয় শিল্পে অদ্বৈত, দ্বৈত ও ত্রিত্ববাদীদের রূপবার্তা—শ্রীযামিনীকান্ত সেন তত্ত্ববারিধি।

ইতিহাস

ভারতবর্ষ—দরবেশ শাহজালাল—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাশালী এম. এ., পি. এইচ. ডি।

বঙ্গশ্রী—বাঙ্গালীর ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য-স্থাপন—শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী।

বিবিধ

ভারতবর্ষ—ভারতের পুণ্যতীর্থ—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম. এ., বি. এল., পি. এইচ-ডি., ডি. লিট্।

,, —ভারতীয় নৃত্যের ক্রমপরিণতি—নৃত্যবিদ শ্রীমণিবর্ধন।

বঙ্গশ্রী—রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত এম. আর., এ. এস্।

সাময়িক সংবাদ

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রজত-জয়ন্তী—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসবের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। রজত-জয়ন্তী কমিটির পাঁচ দিবসব্যাপী কার্যসূচী অনুসারে ১৮ই জানুয়ারী বৈদিক পদ্ধতিতে প্রাথমিক উৎসব সম্পন্ন করা হইয়াছে।

'হরিজন' পত্রিকার পুনরায় আত্মপ্রকাশ—শ্রীমহাদেব দেশাইএর সম্পাদনায় মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন পত্রিকা' পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে।

'সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে ধর্মানুষ্ঠান'—বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নির্দেশ অনুসারে এখন হইতে সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজে ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ থাকিবে বলিয়া হুকুমজারী হইয়াছে।

কয়া ন শ্চিত্র আভুবৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পাঁচটী নিধনযুক্ত এবং বামদেব কর্তৃক দৃষ্ট।

পিবাসোমমিন্দ্রমন্দতুত্বা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রের বা বসিষ্ঠের মহাবৈরাজ।

অগ্ন আয়াহিবীতয়ে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম অগ্নির প্রিয়।

কয়ানশ্চিত্র আভুবৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। নিধনে সর্প শব্দ রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম সর্প সাম অথবা ইহার নাম কল্মাষ।

অহমস্মি প্রথমজা ঋতস্য এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা স্বর্গের সাধক সেতু সাম অথবা ইহার নাম পুরুষগতি। অথবা ইহার নাম বিশোক।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের ত্রয়োদশ খণ্ড

वसिष्ठस्य प्राणापानौ द्वा विन्द्रस्यैन्यौ द्वौ प्रजापतेर्व्रतपक्षौ द्वा वहोरात्रयोर्वन्द्राण्या उल्वजरायुणी द्वे बृहस्पतेर्बलभिदी द्वे इन्द्रस्य वोद्भिद्व वैनयोः पूर्वम् ॥ १४ ॥

ইন্দ্রন্নরো এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম বসিষ্ঠের প্রাণ ও অপান।

ইন্দ্রন্নরো এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এন্যপদ যুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম ইন্দ্রের এন্য।

ইন্দ্রন্নরো এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম প্রজাপতির ব্রতপক্ষ অথবা অহোরাত্রের ব্রতপক্ষ।

ইন্দ্রন্নরো এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম ইন্দ্রাণীর উল্ব ও জরায়ু।

উপত্বাজা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম বৃহস্পতির বলভিৎ। অথবা ইহাদের নাম ইন্দ্রের বলভিৎ। অথবা ইহাদের প্রথমটীর নাম উদ্ভিদ্।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ড

भर्गयशसी द्वे यामे द्वे घर्मतनू द्वे प्रजापतेस्त्रीणि चक्षूंषि त्रीणि वार्षाहराणि ॥ १५ ॥

বৃহদিন্দ্রায় এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। তবেদিন্দ্রাবমং বসুঃ এই ঋকে

একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগদ্বয়াশ্রিত সামদ্বয়ীর নাম ভর্গযশঃ। প্রথমটীর নাম ভর্গ এবং দ্বিতীয়টীর নাম যশঃ।

কায়মানোবনাত্বম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এ দুইটীর দেবতা যম।

প্র সোমদেববীতয়ে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। এদুইটীর নাম ধর্মতন্নু যেহেতু ইহাদের নিধমে ক্রমে ধর্ম ও তন্নু শব্দ বর্তমান রহিয়াছে।

অয়ং পূষারয়ির্ভগ এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। চক্ষু শব্দযুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম প্রজাপতির চক্ষু। ত্বমেতদধারয় এই ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বার্ষাহর।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের পঞ্চদশ খণ্ড

द्यौते द्वे द्वैगते वा तास्यन्द्रे द्वे तास्विन्द्रे वा तौरश्रवसे द्वे धेनुपयसी द्वे स्वर्ज्योतिषी द्वे ॥ १६ ॥

যচ্ছক্রাসি পরাপতি এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম দ্যৌত অথবা দ্বৈগত। দ্বিগৎ ভৃগু গোত্রোৎপন্ন একজন ঋষিব নাম।

অভীনবন্ত অদ্রুহঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম তাস্যন্দ্র অথবা তাস্বিন্দ্র।

যদিন্দ্রশাসো অব্রতম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা তুরশ্রবা নামক ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট।

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নেযুঙ্ক্ষা হি যেতবা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইযাছে। ধেনু ও পয় শব্দযুক্ত বলিষা এই ঋগদ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী ধেনু ও পয়ঃ নামে প্রসিদ্ধ। অরুরুচদুষসঃ পৃশ্নিরগ্রিয়ঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা স্বঃ ও জ্যোতিঃ সংজ্ঞক।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের ষোড়শ খণ্ড

यण्वापत्ये द्वे आयुर्नवस्तोभे द्वे रायोवाजीयवार्हद्गिरे द्वे संकृतिपार्थरश्मे द्वे श्येनवृषके द्वे ॥ १७ ॥

ইন্দ্রমিদ্গাথিনোবৃহৎ ইত্যাদি তৃচে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। উচ্চা তে জাতমন্ধসঃ ইত্যাদি তৃচে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ ষট্কাশ্রিত সাম দুইটী যণ্ব ও অপত্য নামে খ্যাত।

বিশ্বতোদাবন্ বিশ্বতো ন আভর এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম আয়ুর্নবস্তোভ। ইহাদের প্রথমটীর নাম আয়ু এবং নয়টী স্তোভ যুক্ত বলিয়া দ্বিতীয়টীর নাম নবস্তোভ।

স্বাদোরিত্থাবিষুবতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রোমদায় বাবৃধে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটীর নাম ক্রমে রায়োবাজীয় ও বার্হিদ্‌গির। স্বাদোরিত্থা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের প্রথমটীর নাম সংকৃতি এবং দ্বিতীয়টীর নাম পাথুরশ্ম অর্থাৎ পৃথুরশ্মি কর্তৃক দৃষ্ট।

উভে যদিন্দ্ররোদস এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাদোরিত্থা বিষুবতঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম শ্যেনবৃষক। প্রথমটীর নাম শ্যেন এবং দ্বিতীয়টীর নাম বৃষক।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের সপ্তদশ খণ্ড

भद्रश्रेयसी द्वे तन्त्वोतुनी द्वे सहोमहसी द्वे वार्कजम्भे द्वे इषिविश्वज्योतिषी द्वे ॥ १८ ॥

ইমামুকং ভুবনাসীষধেম এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম ভদ্রশ্রেয়ঃ অচিক্রদৎবৃষাহরিঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা তন্ত্ব ও ওতু নামক।

পিবাসোমমিন্দ্র মন্দতুত্বা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম সহা ও মহা।

প্রব ইন্দ্রায় এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম বার্কজম্ভ। অসাবিদেবং গোঋজীকমন্ধ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম ইষি ও বিশ্বজ্যোতিঃ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের অষ্টাদশ খণ্ড

द्रविणविष्पर्द्धसी द्वे याममाधुच्छसे द्वे वसिष्ठसफौ द्वौ शुक्रचन्द्रे द्वे वायोः षट् स्वराणि पराणि वा स्पराणि वा पारणानि वानन्त्यानि वादित्यानि वा स्वर्ग्याणि वा स्वर्गस्य लोकस्य गमनानि वा विष्णोस्त्रीणि स्वरीयांसि पश्चानुगानं द्व्यनुगानश्चतुरनुगानम् ॥ १९ ॥

মহিত্রীণামবরস্তু এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম দ্রবিণ ও বিস্পর্দ্ধঃ। নাকে সুপর্ণমুপযৎ পতন্তম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। সুরূপ কৃৎনুমূতয়ে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটীর নাম ক্রমে যাম ও মাধুচ্ছন্দঃ। প্রত্নশ্চয়স্তু সপ্রথ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম বশিষ্ঠশফ। নিযুত্বান্বায়বাগহি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অত্রাহগোরমন্বত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম শুক্রচন্দ্র।

যজ্জায়থা অপূর্ব্য এই ঋকে পাঁচটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। যোরয়িং যোরয়িত্তম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম ছয়টী বায়ুর স্বরসংজ্ঞক। অথবা ইহাদের নাম স্বর অর্থাৎ স্বর্গলোকের ধারণ সাধক। পুনরায় ইহাদের সূর্য্যসম্বন্ধিত্ব ও স্বর্গলোক সাধনত্ব দেখাইবার জন্য বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। অথবা ইহারা স্পর অর্থাৎ ওজোযুক্ত, অথবা ধারণ অর্থাৎ লোকধারণ সাধন, অথবা সূর্য্যসম্বন্ধী অথবা অগস্ত্য অর্থাৎ বহুফলপ্রদ, অথবা আদিত্য অথবা স্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গলোকের হিতকারক বা প্রাপক।

যজ্জায়থা অপূর্ব্য এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। হাউহোবা হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যোতি ধেনুঃ এই পর্য্যন্ত একটী সাম। যজ্জযথা অপূর্ব্যা এই ঋকে আর একটী সাম। এই তিনটী সাম বিষ্ণুর স্বরীয় নামে প্রসিদ্ধ।

হাউ বাক্ প্রভৃতি পাঁচটী সাম অনুগানের সহিত যুক্ত। পুনশ্চ ঐরূপ দুইটী সাম অনুগানের সহিত যুক্ত। পুনরপি একটী সাম চারিটী অনুগানের সহিত যুক্ত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের উনবিংশ খণ্ড

वाचोव्रते द्वे शशस्य कर्षूशयस्य व्रतम् सत्रस्यर्द्धिः प्रजापतेः प्रतिष्ठा व्याहृतीश्च परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्य व्रतं कृष्णस्य चाङ्गिरसस्य व्रतं सोमव्रते द्वे ॥ २० ॥

হুবে বাচং বাক্ শৃণোতু এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম বাচোব্রত।

আতূন ইন্দ্র বৃত্রহন্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম শশকর্ষূশযের ব্রত।

অগন্ম জ্যোতিরমৃতা অভুম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সত্রের ঋদ্ধি নামে খ্যাত। ইম মূষুত্ব স্মাকম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম প্রজাপতির প্রতিষ্ঠা। হাউ এবাহি ইত্যাদি সাম প্রজাপতির ব্যাহৃতি নামক।

মযির্বর্চো অথোযশঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম প্রাজাপত্য পরমেষ্ঠীর ব্রত। সোমাসোমা যত্র চক্ষুঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অঙ্গিরা-পুত্র অঙ্গিরস কৃষ্ণের ব্রত। সন্তেপয়াংসি সমুয়ন্তু বাজাঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ত্বমিমা ওষধীঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটীর নাম সোমব্রত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের বিংশ খণ্ড

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ৭ম সংখ্যা

ত্রৈকাল্য*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

ব্যাবহারিক জীবনে আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ কালের পার্থক্য করিতে এতই অভ্যস্ত যে এ-কথা সাধারণতঃ আমাদের মনেই আসে না যে আমাদের এই কাল আদৌ স্ব-তন্ত্র নহে। বস্তু-জগৎ পূর্বে যে-রূপ ছিল এখন আর সেরূপ নাই, এই জ্ঞান হইতেই আমরা অতীত ও বর্তমানের ভেদ করিয়া থাকি, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভেদের ভিত্তি হইল এই বিশ্বাস যে, বস্তুজগৎ এখন যেরূপ আছে পরে আর সেরূপ থাকিবে না। বস্তুজগতে কোথাও যদি কোন পরিবর্তন সংঘটিত না হইত তাহা হইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের মধ্যে পার্থক্য করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইত না। বাহ্য পরিবর্তনের উপর যাহা নির্ভর করিতেছে তাহাকে স্বস্থ ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না—ইহাই ছিল বৌদ্ধদিগের কথা। ত্রৈকাল্য অস্বীকার করিলে কিন্তু আর একথা বলা চলে না যে বস্তুজগতে কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে; ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ সেইজন্য আরও বলিতেন যে, জগতে পরিবর্তন বলিয়া কিছু নাই; সাধারণ্যে যাহা change বলিয়া পরিচিত, বিজ্ঞানবাদীর মতে তাহা replacement—ইহা ক্ষণিকবাদের আলোচনায় দেখান হইয়াছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায় কিন্তু ক্ষণিকবাদ অপেক্ষা সাংখ্য সৎকার্যবাদের প্রতিই অধিক আস্থাসম্পন্ন ছিলেন; কাশ্মীরদেশীয় বৈভাষিকগণ বস্তুর ক্ষণবিধ্বংসিতায় বিশ্বাস করিতেন না। শান্তরক্ষিতের পূর্বপক্ষী এইজন্য বলিতেছেন, "নমু কথমিদমুচ্যতে নাবস্থানং তু কস্যচিদিতি, যাবতা কৈশ্চদ্ধর্মত্রাতপ্রভৃতিভির্বৌদ্ধৈরপি কালত্রয়াবস্থিতো ভাব ইষ্টোঽবস্থাভেদাৎ, হেমানুগমসাধর্ম্যেণ?" অর্থাৎ, ধর্মত্রাত প্রভৃতি কোন কোন বৌদ্ধও যখন স্বীকার করেন যে, একই স্বর্ণ যেমন বিবিধ অলংকারের মধ্য দিয়াও অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়, ভাববস্তুও

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 15.

সেইরূপ অবস্থাভেদে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়া অনুবৃত্ত হইতে থাকে—তখন বৌদ্ধ কিরূপে বলেন যে কোন বস্তুই স্থিতিশীল নহে?—পূর্বপক্ষীর এই উক্তির ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলশীল কতকগুলি মতের আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল মত যাঁহারা পোষণ করিতেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন খুব সম্ভব সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, সম্পূর্ণ বিধ্বংস ব্যতিরেকেও বস্তুর অন্যথাভাব সম্ভব :—

ভাবন্যথাবাদী ভদন্ত ধর্মত্রাত বলিয়াছেন, "ধর্মস্যাধ্বসু বর্তমানস্য ভাবান্যথাত্বমেব কেবলং নতু দ্রব্যস্যেতি"; অর্থাৎ, অস্তিত্বাপন্ন বস্তুর ধর্মাবলীই কেবল অন্যথাত্ব প্রাপ্ত হয়, দ্রব্যটি স্বয়ং অপরিবর্তিত থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে এই বৌদ্ধাচার্য static existence এ বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু ক্ষণিকবাদিদের মতে status-কে সম্পূর্ণ অস্বীকারও তিনি করেন নাই। ধর্মত্রাতের মত তাহা হইলে সাংখ্যমতেরই অনুরূপ ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন, সুবর্ণদ্রব্য য কটক, কেয়ূর, কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে পরিবর্তিত হয় তাহা হইতে সুবর্ণের গুণের পরিবর্তনই প্রমাণিত হয়, দ্রব্যটি সর্বত্রই অব্যভিচারী থাকে। এখন কাল সম্বন্ধে ধর্মত্রাতের বক্তব্য এই যে, কটকাদি যেমন সুবর্ণের বিকার, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানও সেইরূপ কালের বিকার; অতীত, অনাগত প্রভৃতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা কাল নহে, কালের ধর্ম। কালের ধর্মটি অনাগতভাব পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানভাব, এবং বর্তমানভাব পরিত্যাগ করিয়া অতীতভাব লাভ করিয়া থাকে; কালরূপ দ্রব্যটি কিন্তু অন্যথাত্ববিহীন।

লক্ষণান্যথাবাদী ভদন্ত ঘোষকের মত এই যে, পুরুষ যেমন একটি স্ত্রীতে অনুরক্ত হইয়াও অন্যান্য স্ত্রীতে অবিরক্ত থাকিতে পারে, বস্তুর পক্ষেও সেইরূপ অস্তিত্বমার্গ অবলম্বন করতঃ অতীতের লক্ষণদ্বারা আক্রান্ত হইলেও অনাগত ও প্রত্যুৎপন্ন লক্ষণাবলী হইতে অবিযুক্ত থাকা সম্ভব। এই মতে স্বীকার করা হয় যে কাল স্বয়ং অতীতাদির লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত হয়, এবং এইখানেই ধর্মত্রাতের মত হইতে এই মতের প্রভেদ।

ভদন্ত বসুমিত্র হইলেন অবস্থান্যথাবাদী। তিনি বলেন যে অস্তিত্বাপন্ন দ্রব্য নানা অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই অবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নামে নির্দিষ্ট হয়; দ্রব্যটি কিন্তু একই থাকে, "দ্রব্যস্য ত্রিষু কালেষ্বভিন্নত্বাৎ"। একই মাটির ঘুঁটি (মৃদ্গুডিকা) যেমন একের ঘরে রাখিলে "এক" বুঝায়, শতের ঘরে "শত" বুঝায়, সহস্রের ঘরে "সহস্র" বুঝায়,—সেইরূপ একই বস্তু কার্যাবস্থায় (কারিত্রেঽবস্থিতঃ) "বর্তমান", প্রচ্যুতাবস্থায় "অতীত", এবং অপ্রাপ্তাবস্থায় "অনাগত" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মৃদ্গুডিকার ন্যায় এই কালেরও নিজের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না; কিন্তু অবস্থাভেদে এই একই কালের বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্ভব।

আচার্য বুদ্ধদেব (ইনি অবশ্যই গৌতম বুদ্ধ নহেন) হইলেন অন্যথান্যথিক। তাঁহার মত এই যে, যাহা পূর্বে গিয়াছে অথবা পরে আসিবে কেবল তদনুযায়ীই বস্তু বিবিধ নামে কথিত হইয়া থাকে (পূর্বাপরমপেক্ষ্যান্যোন্য উচ্যতে)। একই নারী যেমন কখনও মাতা কখনও

দুহিতা নামে পরিচিত, বস্তুও তদ্রূপ। যে-বস্তুর পূর্বে কিছু ছিল কিন্তু পরে কিছু নাই, সেই বস্তু হইল অনাগত; যে-বস্তুর পূর্ব এবং পর দুইই আছে সেই বস্তু হইল বর্তমান; এবং যে-বস্তুর পরই কেবল আছে, পূর্ব নাই,—তাহাই হইল অতীত।

ধর্মত্রাত প্রভৃতি যে চারিজন বৌদ্ধাচার্যের মতের উল্লেখ করা হইল, তাঁহারা হইলেন কমলশীলের মতে অস্তিবাদী। প্রথম মতটির বিরুদ্ধে কমলশীল বলিতেছেন যে ইহা পরিণামবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে,—সুতরাং সাংখ্যমত হইতে অভিন্ন। সাংখ্য সৎকার্যবাদের খণ্ডন যখন পূর্বেই করা হইয়াছে তখন তদ্দ্বারা ধর্মত্রাতের মতেরও খণ্ডন হইয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। সৎকার্যবাদী ধর্মত্রাতকে এই একটি প্রশ্ন করাই যথেষ্ট:—বস্তু পূর্বস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া পরিবর্তিত হয় অথবা পূর্বস্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া পরিবর্তিত হয়? ধর্মত্রাত যদি বলেন যে, বস্তু পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই পরিবর্তিত হয় তবে তাঁহার স্বীকার করা হইবে যে অস্তিত্বাপন্ন বস্তু একই সঙ্গে দুই প্রকারের অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়াছে (অধ্বসঙ্করপ্রসঙ্গঃ)—যাহা অবশ্যই অসম্ভব; আর যদি তিনি বলেন যে পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়াই বস্তু পরিবর্তিত হইতেছে তবে তদ্দ্বারা বস্তুটির সদাস্তিত্ব (continued eternal existence) অস্বীকার করা হইবে।

দ্বিতীয় বাদী ঘোষকের বিরুদ্ধে কমলশীল বলিতেছেন যে, তাঁহার মতেও অধ্বসঙ্কর দোষ অপরিহার্য, কারণ সর্ব বস্তুরই সব লক্ষণ সম্ভব (সর্বস্য সর্বলক্ষণযোগাৎ)। একই বস্তুর যে বিবিধ লক্ষণ হইতে পারে এ কথা বিজ্ঞানবাদী স্বীকার করেন না। ঘোষক যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন (এক স্ত্রীতে অনুরক্ত এবং অপরাপর স্ত্রীতে অবিরক্ত) তাহার বিরুদ্ধে কমলশীল বলিতেছেন যে, অনুরাগ রূপ পৃথগর্থের দ্বারা আক্রান্ত হয় বলিয়াই মানুষকে অনুরক্ত বলা হইয়া থাকে (অর্থান্তরভূতরাগ-সমুদাচারাদ্রক্ত উচ্যতে), এবং পৃথগর্থের সহিত মানুষের যেখানে সমাগমের অতিরিক্ত আর কিছু ঘটে না সেইখানে বলা হয় যে মানুষটি অবিরক্ত (অবিরক্তশ্চ সমন্বাগমমাত্রেণ); সুতরাং অনুরক্তি বা অবিরক্তির স্থলে যে বস্তু (পুরুষ) বিভিন্ন "লক্ষণের" দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে এ-কথা বলা যায় না।

চতুর্থ বাদী বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে কমলশীল বলিয়াছেন যে তাঁহার মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্বাপন্ন বস্তুতে একসঙ্গে তিন প্রকারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় (একস্মিন্নেবাধ্বনি ত্রয়োঽধ্বনঃ প্রাপ্নুবন্তি), সুতরাং তাহা অগ্রাহ্য।

তৃতীয় বাদী বসুমিত্রের মতের আলোচনাতেই কমলশীল সর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। শান্তরক্ষিত নিজে এখানে কেবল বসুমিত্রের মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মতের খণ্ডন করিয়াছেন পরে (কা ১৮৪৭ দ্রষ্টব্য)। বসুমিত্র বলিয়াছেন, অতীত ও অনাগত যদি না থাকে তাহা হইলে "অভূন্মহাসম্মতঃ" "ভবিষ্যতি শঙ্খশ্চক্রবর্তী" প্রভৃতি বাক্য হইতে যে অতীত ও অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহার কোন আলম্বন (basis) থাকিবে না, এবং আলম্বন না থাকিলে বিজ্ঞানও সম্ভব হইবে না (বিজ্ঞানমেব ন স্যাদালম্বনাভাবাৎ)। যে যে বস্তু গৃহীত হইবে সেই সেই বস্তু অনুযায়ী বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (প্রতিবস্তু

বিজ্ঞপ্ত্যাত্মকং বিজ্ঞানম্), সুতরাং জ্ঞেয় বস্তু কিছু না থাকিলে বিজ্ঞানও কিছু সম্ভব হইবে না। ভগবান্ বুদ্ধদেবই বলিয়াছেন "দ্বয়ং প্রতীত্য বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে; কতমদ্দ্বয়ং? চক্ষুরূপাণি যাবন্মনোধর্মা ইতি"। অর্থাৎ "দুইটি বস্তু থাকিলে তবে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় (প্রতীত্যসমুৎপাদ); কোন্ দুইটি বস্তু? চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত রূপ এবং অন্যান্য মনোধর্ম (nonsensuous elements of existence)"।—কমলশীলের ভাষা এখানে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও বুঝা যায় যে বসুমিত্র ছিলেন পূর্ণ সর্বাস্তিবাদী। সর্ব বস্তুই অস্তিত্বশীল-ইহাই ছিল সর্বাস্তিবাদিগণের মূলমন্ত্র। তাঁহাদের মতে বস্তুজগৎ ছয়টি অধ্যাত্মায়তন ও ছয়টি বাহ্যায়তনে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যাত্মায়তনের প্রতিযোগী একটি বাহ্যায়তন। দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগের ফলে যে-সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইগুলির কারণ (প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী কারণ; "তস্মিন্ সতি ইদং ভবতি" এই সূত্রানুযায়ী যাহা "তৎ" তাহাই বৌদ্ধমতে কারণ এবং যাহা "ইদম্" তাহাই কার্য) হইল অধ্যাত্ম চক্ষুরায়তন এবং কার্য হইল বাহ্য রূপায়তন। শ্রবণ সম্বন্ধেও সেইরূপ অধ্যাত্ম শ্রোত্রায়তন ও বাহ্য শব্দায়তন, ইত্যাদি। সর্বশুদ্ধ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয়টি হইল অধ্যাত্মায়তন এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য ও ধর্মাবলী তাহাদের প্রতিযোগী বাহ্যায়তন। ইহাই হইল সর্বাস্তিবাদিগণের দ্বাদশায়তন (see Stcherbatsky, the Central Conception of Buddhism, pp. 7-9)। বিজ্ঞানবাদ ও সর্বাস্তিবাদের পার্থক্য ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। বিজ্ঞানবাদ অনুযায়ী গ্রাহ্যও নাই গ্রাহকও নাই, আছে কেবল গ্রহণ (cognition); সর্বাস্তিবাদে কিন্তু গ্রাহ্যও আছে গ্রাহকও আছে, নাই কেবল গ্রহণ। সর্বাস্তিবাদী বলেন দৃষ্টিও অস্তি এবং রূপও অস্তি, দৃষ্টি ও রূপের কোনটি অপরটির উপর নির্ভর করিতেছে না, এবং দৃষ্টির দ্বারা রূপের অথবা রূপের দ্বারা যে দৃষ্টির গ্রহণ হইতেছে তাহাও নহে; প্রতীত্যসমুৎপাদানুযায়ী দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তির একমাত্র কারণ চক্ষুরায়তন ও রূপায়তনের পরস্পর সংযোগ।—দৃষ্টি এবং রূপ উভয়ই হইল আয়তন, প্রথমটি অধ্যাত্ম এবং দ্বিতীয়টি বাহ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, নামে সর্বাস্তিবাদী হইলেও সর্বাস্তিবাদিগণ নৈয়ায়িকদের মত realist ছিলেন না। ন্যায়দর্শনে যাহা দ্রব্যাদি পদার্থ বলিয়া পরিচিত তাহার সহিত সর্বাস্তিবাদীর "আয়তনের" কোন সাদৃশ্যই নাই। "আয়তন" কথাটির অর্থ হইল basis of cognition, কিন্তু এই basis আদৌ material basis নহে। ভগবান্ বুদ্ধদেবের যে-বচনটি কমলশীল উদ্ধৃত করিয়াছেন তন্মধ্যস্থ "মনোধর্ম" কথাটির দ্বারা বোধ হয় ষষ্ঠ অধ্যাত্মায়তন মন ও তাহার প্রতিযোগী বাহ্যায়তন ধর্মাবলী বুঝাইতেছে।

বসুমিত্র এখন এই বুদ্ধবচনটি ("দ্বয়ং প্রতীত্য বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে") আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন যে, অতীত ও অনাগত যদি না থাকে তবে "তদালম্বন"* বিজ্ঞানটি আর দ্ব্যাশ্রয়ী হইবে না (অসতি চাতীতানাগতে তদালম্বনং বিজ্ঞানং দ্বয়ং প্রতীত্য ন স্যাদিত্যাগমবিরোধঃ),

* "তদালম্বন" কথাটি খুব সম্ভব বহুব্রীহি, কিন্তু কথাটির প্রকৃত অর্থ বুঝা গেল না।

এবং তাহাতে আগমবচনের সহিত বিরোধ ঘটিবে। আরও বিবেচ্য এই যে, পূর্ব কর্ম যদি সম্পূর্ণ সত্তাশূন্য হয় তবে পূর্ব কর্মের ফলোৎপত্তিও সম্ভব হইবে না, কারণ যাহা অসৎ তাহার ফলোৎপাদন করিবার শক্তি থাকিতে পারে না। ত্রৈকাল্য অস্বীকার করিলে আরও বলিতে হয় যে যোগিগণের বচনও ব্যর্থ, কারণ যোগিগণ বলিয়াছেন "আসীন্মান্ধাতো ব্রহ্মদত্তঃ" (অতীত কাল), "ভবিষ্যতি শঙ্খশ্চক্রবর্তী" (ভবিষ্যৎ কাল) ইত্যাদি ; ত্রৈকাল্য যদি অসৎ হইত তাহা হইলে কাল সম্বন্ধে এই প্রকারের ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান সম্ভব হইত না, কারণ যাহা অসৎ তাহার কোন বিভাগ থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ঐশ্বর্য, আনন্দ প্রভৃতি অতীত ও অনাগত ভাবাবলী যে দ্রব্যের প্রতিষেধাত্মক তাহা নহে ; বর্তমানের রূপাদির ন্যায় অতীত ও অনাগতেরও রূপাদি হইল অধ্বসংগৃহীত (অর্থাৎ, অতীত ও অনাগত রূপাদিও অস্তিত্বাপন্ন)— ইহাই হইল ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ*। ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, "হে ভিক্ষুগণ অতীত রূপ যদি না থাকিত তাহা হইলে আর্যশ্রাবক অতীত রূপের কথা শ্রবণ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইতে পারিত না (অতীতং চেদ্ভিক্ষবো রূপং নাভবিষ্যন্ন শ্রুতবানার্যশ্রাবকোঽতীতরূপেঽনপেক্ষোঽভবিষ্যৎ)। সুতরাং যেহেতু অতীত রূপ আছে (অস্ত্যতীতং রূপম্) সেই হেতুই আর্য শ্রাবক তৎসম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়া তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ হইতে পারে। অতীত, অনাগত প্রভৃতি যাহা কিছু রূপ আছে তাহার সমস্ত সংক্ষেপে "রূপস্কন্ধ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।"—সর্বাস্তিবাদী বসুমিত্র এইরূপে বুদ্ধবচন হইতেই প্রমাণ করিয়া দিলেন যে ত্রৈকাল্য স্বীকার না করিলে বুদ্ধবচনই অগ্রাহ্য করা হইবে। বসুমিত্রের মত খণ্ডনের জন্য শান্তরক্ষিত ও কমলশীলকে বুদ্ধবচনের কিরূপ ক্লিষ্টার্থ করিতে হইয়াছিল তাহা পরে (কা ১৮৪৭) দেখা যাইবে।

সর্বাস্তিবাদীর বিরুদ্ধে আপত্তি করা যাইতে পারে যে, বস্তুসকল আকাশের ন্যায় সদাবস্থিত, সুতরাং বস্তুসম্বন্ধে অতীতাদি ব্যবস্থা সম্ভব নহে। (এই আপত্তি অবশ্যই বিজ্ঞানবাদীর নহে, কারণ বিজ্ঞানবাদীর মতে আকাশ অসৎ)। ইহার উত্তরে সর্বাস্তিবাদী বলিতেছেন :—

> ন চৈবমিহ মন্তব্যমধ্বভেদঃ কুতো স্বয়ম্।
> কারিত্রেণ বিভাগোঽয়মধ্বনাং যৎ প্রকল্প্যতে ॥ ১৭৯১ ॥
> কারিত্রে বর্ততে যো হি বর্তমানঃ স উচ্যতে।
> কারিত্রাৎ প্রচ্যুতোঽতীতস্তদপ্রাপ্তস্ত্বনাগতঃ ॥ ১৭৯২ ॥
> ফলাক্ষেপশ্চ কারিত্রং ধর্মাণাং জনকং ন তু।
> ন বাক্ষেপোঽস্ত্যতীতানাং নাতঃ কারিত্রসম্ভবঃ ॥ ১৭৯৩ ॥

অর্থাৎ, অস্তিত্বাপন্ন বস্তুর এই অবস্থাবৈচিত্র্য (অধ্বভেদঃ) কিরূপে সম্ভব হইল এরূপ প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর, কারণ অর্থক্রিয়া উৎপাদনের শক্তি অনুযায়ীই (কারিত্রেণ) অস্তিত্বাপন্ন বস্তুর বিভাগ কল্পনা করা হইয়া থাকে। যাহা কারিত্রে বর্তনশীল (অর্থাৎ যাহা অর্থক্রিয়া উৎপাদন

* এখানেও কমলশীলের কথার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা দুষ্কর :—তস্মাদতীতানাগতা ভাবাঃ শ্রীহর্ষাদয়ো ন দ্রব্যপ্রতিষেধরূপাঃ, অধ্বসংগৃহীতরূপাদিত্বেনোপদিষ্টত্বাদ্বর্তমানবৎ।

করিতেছে) তাহাই বর্ত্তমান ; যাহা কারিত্র হইতে প্রচ্যুত তাহা অতীত, এবং যাহা কারিত্রাবস্থা এখনও প্রাপ্ত হয় নাই তাহাই অনাগত। ধর্মাবলীর জনন কারিত্র নহে, ধর্মাবলীরূপ যে ফল তাহার আক্ষেপই (উৎপাদন নহে ; projection, not production) হইল কারিত্র। কিন্তু অতীত ধর্মাবলীর আক্ষেপ সম্ভব নহে, সুতরাং অতীত ধর্মাবলীর কারিত্রও অসম্ভব।—আচার্য সহস্রভদ্রও এই সম্বন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ধর্মাবলীর কারিত্র বলিতে বুঝায় ফলাক্ষেপের শক্তি, ফল জননের শক্তি নহে ; কিন্তু অতীতাদি হইল আংশিক হেতু মাত্র (সভাগহেতু)—তাহাদের ফলাক্ষেপের শক্তি নাই, যেহেতু আক্ষেপ কেবল বর্তমানেই ঘটিয়া থাকে ; যাহা আক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার পুনরাক্ষেপও সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়িবে ; সুতরাং যাহা অতীত তাহার যখন কারিত্র সম্ভব নয় তখন অতীত ও বর্তমানের সঙ্কর ঘটিবে এই আশঙ্কাও অমূলক।

এই দুই সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধাচার্যের মত খণ্ডনের জন্য শান্তরক্ষিত ক্ষণিকবাদের সম্পর্কে আলোচিত কতকগুলি যুক্তিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং সেগুলি পুনর্বার আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। তাঁহার উত্তরের সারমর্ম এই যে, কারিত্র বলিয়া কিছু সম্ভবই নয়, কারণ তাহা বস্তু (= ধর্ম) হইতে পৃথকও হইতে পারে না এবং অপৃথকও হইতে পারে না (কা ১৮০২)। বিজ্ঞানবাদীর নিকট কারিত্রই অস্তিত্ব। সর্বাস্তিবাদী কিন্তু বলেন যে, সর্বক্ষণেই ক্রিয়াশীল না হইলেও বস্তুর বস্তুত্বের হানি হয় না। শান্তরক্ষিত একথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন ; কারণ একই বস্তুর যে ভেদ সম্ভব নহে তাহা তিনি পূর্বেও একাধিক বার দেখাইয়াছেন এবং এখানেও পুনরায় দেখাইয়াছেন। ত্রৈকাল্যই তাঁহার মুখ্য আলোচ্য বিষয় হইলেও শান্তরক্ষিত এখানে কেবল ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বস্তুর ভেদ বা পরিবর্তন সম্ভব নহে, কারণ একই বস্তু কালভেদে বিভিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে ইহা মনে করিয়াই যখন লোকে ত্রৈকাল্য স্বীকার করিয়া থাকে তখন কোন বস্তুরই যে অবস্থান্তর সম্ভব নহে তাহা প্রমাণ করিয়া দেওয়া নিশ্চয়ই ত্রৈকাল্য খণ্ডনের উৎকৃষ্ট পন্থা। জিজ্ঞাসু পাঠক ইহাতে নিরাশ হইবেন, কিন্তু শান্তরক্ষিত যথারীতি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন। অতীত ও অনাগতের অলীকত্ব প্রতিপাদনের জন্য শান্তরক্ষিত যে-সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন তন্মধ্যে এইটিই সর্বপ্রধান :—

> অর্থক্রিয়াসমর্থাঃ স্যুরতীতানাগতা ইমে।
> ন বা সামর্থ্যসদ্ভাবে বর্তমানাস্তদন্যবৎ ॥ ১৮৩৫ ॥
> অবর্তমানতায়াং তু সর্বশক্তিবিয়োগিনঃ।
> নষ্টাজাতাঃ প্রসজ্যন্তে ব্যোমতামরসাদিবৎ ॥ ১৮৩৬ ॥

অর্থাৎ, এই অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ কি না ! অতীত ও অনাগতেরও যদি অর্থক্রিয়া উৎপাদনের সামর্থ্য থাকে তবে এতদ্দ্বয়ও বর্তমানের মতই বর্তমান রূপে পরিগণিত হইবে ! অতীত ও অনাগত যদি বর্তমান বলিয়া পরিগণিত না হয়

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে এতদ্দ্বয়ের কোনই শক্তি নাই—নষ্ট ও অজাত বস্তুর ন্যায় এই অতীত এবং অনাগতও আকাশকুসুমের মতই অলীক।— অতীত ও ভবিষ্যৎ স্বীকার করিলে অন্য দিক হইতেও বিপত্তির সম্ভাবনা :—

স্বর্গাপবর্গসংসর্গযত্নোঽয়মফলস্ততঃ।
ঈহাসাধ্যং ন কিঞ্চিদ্ধি ফলমত্রোপলক্ষ্যতে ॥ ১৮৪১ ॥

অর্থাৎ, ভবিষ্যৎ যদি বর্তমান হইতে বাস্তবিকই পৃথক্ হয় তবে স্বর্গ ও মুক্তির জন্য যত শ্রমই করা হউক সমস্তই ব্যর্থ হইবে; কারণ ফল যদি বাস্তবিকই "ভবিষ্যৎ" হয় তবে "বর্তমানের" সাধনার দ্বারা কখনই তাহা লাভ করা যাইবে না।—পূর্বপক্ষী যদি এখন বলেন যে অতীত ও অনাগত অর্থক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ নহে তবে তদ্দ্বারা স্বীকার করা হইবে যে এতদ্দ্বয়ের অস্তিত্বই নাই।

এইরূপে ভূত ও ভবিষ্যতের অসত্ত্ব প্রমাণিত হইল। শান্তরক্ষিত এখন এতদ্দ্বয়ের সত্তাসাধক প্রমাণগুলি খণ্ডনের মানসে বলিতেছেন :—

হেতবো ভাবধর্মাস্তু নাসিদ্ধে সিদ্ধিভাগিনঃ।
বর্তমানত্বসিদ্ধের্বা বিরুদ্ধা ধর্মিবাধনাৎ ॥ ১৮৪৩ ॥

অর্থাৎ, ত্রৈকাল্য সাধনের জন্য যে-সমস্ত হেতু উপস্থিত করা হইয়াছে সেগুলির আশ্রয় হইল ভাববস্তু। পূর্বপক্ষী ধরিয়া লইয়াছেন যে ভাববস্তু অক্ষণিক; কিন্তু তাহা যখন ঠিক নয় তখন তাঁহার যুক্তিও যে সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। উপরন্তু বলা যাইতে পারে যে অতীত ও অনাগতেরও বর্তমানত্ব যখন প্রমাণিত হইয়াছে তখন তদ্দ্বারা পূর্বপক্ষীর মতের যাহা বিরুদ্ধ তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পূর্বপক্ষী এখন প্রশ্ন করিতেছেন, অতীত ও অনাগত যদি বাস্তবিকই না থাকে তবে ভগবান্ বুদ্ধদেব কেন বলিয়াছেন যে অতীত ও অনাগত রূপাদিও অস্তিত্বাপন্ন রূপাবলীর মধ্যে পরিগণিত হইবে (অধ্বসংগৃহীতত্বমতীতানাগতানাং রূপাদীনাং নির্দিষ্টম)? আরও বিবেচ্য এই যে, শশশৃঙ্গাদি অলীক পদার্থের অতীত বা অনাগত রূপ নির্ধারণের কোন চেষ্টাই কেহ করে না। ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

ভূত্বা যদ্বিগতং রূপং তদতীতং প্রকাশিতম্।
সতি প্রত্যয়সাকল্যে ভাবি যত্তদনাগতম্ ॥ ১৮৪৪ ॥
সত্ত্বে তু বর্তমানত্বমাসজ্যেতেতি সাধিতম্ ॥
বিদ্যমানত্বমাত্রং হি বর্তমানস্য লক্ষণম্ ॥ ১৮৪৫ ॥

অর্থাৎ, যে-রূপ অস্তিত্ব লাভ করিয়া পুনরায় বিগত হইয়াছে তাহাই অতীত বলিয়া কথিত হইয়াছে; যাহা এখনও অস্তিত্ব লাভ করে নাই (ভাবি) অথচ প্রতীত্যসমুৎপাদ অনুযায়ী যে-সমস্ত কারণ প্রয়োজন সেগুলি যাহার আছে (সতি প্রত্যয়সাকল্যে)—তাহাই হইল অনাগত। এই অনাগতের সত্তা যদি স্বীকার করা হয় তবে তদ্দ্বারা অনাগতের বর্তমানত্বই

স্বীকার করা হইবে, কারণ একমাত্র বিদ্যমানত্বই হইল বর্তমানের লক্ষণ।—তত্ত্বসংগ্রহে বৌদ্ধ পক্ষ হইতে ত্রৈকাল্য সম্বন্ধে যত কারিকা আছে তন্মধ্যে এই দুইটিই বোধ হয় সর্বপ্রধান, কিন্তু কমলশীল এ-দুটির উপর কোন মন্তব্যই করেন নাই, "সুবোধম" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কমলশীল কেবল তর্কই ভালবাসিতেন, প্রকৃত যাহাকে দর্শন বলে তৎপ্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল না।

পূর্বপক্ষী এখন প্রশ্ন করিতেছেন, রূপ, বেদনা প্রভৃতি ভাববস্তু তাহা হইলে ভগবান্ বুদ্ধদেবের দ্বারা অতীত ও অনাগতেও স্বীকৃত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

রূপাদিত্বমতীতাদের্ভূতাং তাং ভাবিনীং তথা।
অধ্যারোপ্য দশামস্য কথ্যতে ন তু ভাবতঃ॥ ১৮৪৬॥

এখানেও কমলশীল কোন মন্তব্য না করায় কারিকাটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া দুষ্কর। তবে সাধারণ অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, রূপাদিকে ভ্রান্তি বশতঃ অতীত বা অনাগত বস্তুর উপর আরোপ করিয়াই লোকে ভূত বা ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা বলিতে থাকে; প্রকৃত ভূত বা ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

সর্বাস্তিবাদী বসুমিত্র বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে বিজ্ঞান দ্ব্যাশ্রয়ী। তাঁহার বিরুদ্ধে এখন শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

দ্বয়ং প্রতীত্য বিজ্ঞানং যদুক্তং তত্ত্বদর্শিনা।
সেষ্টা সবিষয়ং চিত্তমভিসন্ধায় দেশনা॥ ১৮৪৭॥

তর্কের দ্বারা যে রাত্রিকে দিনে ও দিনকে রাত্রিতে পরিণত করা সম্ভব তাহা শান্তরক্ষিতের এই কারিকা হইতে বুঝা যায়। বসুমিত্র যে-বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে যে কেবল ব্যাবহারিক জ্ঞানের কথাই আছে ইহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই; কিন্তু "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্ন হি সন্দেহাদলক্ষণম্"—এই নীতি অবলম্বন করিয়া শান্তরক্ষিত এখন বলিতেছেন, ভগবান্ বুদ্ধদেব যে দ্ব্যাশ্রয়ী বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন তাহা সবিষয় ব্যাবহারিক জ্ঞান, নির্বিষয় তাত্ত্বিক জ্ঞান (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান) সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ঐ কথা বলেন নাই।—পূর্বপক্ষী এখানে প্রশ্ন করিতেছেন, যে-বিজ্ঞান নির্বিষয় তাহা জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করার সার্থকতা নাই, কারণ যাহা জানিতে সমর্থ তাহাই কেবল বিজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ—বিজ্ঞেয়ই যখন নাই তখন বিজ্ঞান সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর :—

বোধানুগতিমাত্রেণ বিজ্ঞানমিতি চোচ্যতে।
সা চাস্যাজড়রূপত্বং প্রাকাশ্যাৎ পরিকল্পিতম্॥ ১৮৪৯॥

অর্থাৎ, নির্বিষয় জ্ঞানও বোধশূন্য নহে—সেইজন্যই ইহা বিজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। নির্বিষয় জ্ঞানও যে বোধযুক্ত তাহার প্রমাণ এই যে ইহা জড়প্রকৃতি নহে, এবং ইহা যে জড়প্রকৃতি নহে তাহা আবার এই জ্ঞানের স্বপ্রকাশতা হইতে প্রমাণিত হয়।

পূর্বপক্ষী এখন প্রশ্ন করিতেছেন, অতীত যদি না থাকে তবে অতীত কর্মের ফল কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর :—

বিপাকহেতুঃ ফলদো নাতীতোঽভ্যুপগম্যতে।
সম্বাসিতাত্তু * বিজ্ঞানপ্রবন্ধাৎ ফলমিষ্যতে ॥ ১৮৫০ ॥

অর্থাৎ, কর্মের বিপাকের (maturation) যাহা হেতু তাহাই হইল প্রকৃত পক্ষে ফলদাতা, অতীতের সহিত ফলের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; সম্বন্ধ বিজ্ঞানধারায় যে বাসনা (impression) রাখিয়া যায় তাহাই ফলোৎপত্তির কারণ।

পূর্বপক্ষীর শেষ প্রশ্ন, যোগিগণ যে অতীত ও অনাগত পৃথক্ রূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহাও কি মিথ্যা? ইহার উত্তর :—

পারম্পর্যেণ সাক্ষাদ্বা কার্যকারণতাং গতম্।
যদ্রূপং বর্তমানস্য তদ্বিজ্ঞানন্তি যোগিনঃ ॥ ১৮৫৩ ॥
অনুগচ্ছন্তি পশ্চাচ্চ বিকল্পানুগতাত্মভিঃ।
শুদ্ধলৌকিকবিজ্ঞানৈস্তত্বতোঽবিষয়ৈরপি ॥ ১৮৫৪ ॥
তদ্ধেতুফলয়োর্ভূতাং ভাবিনীং চৈব সন্ততিম্।
তামাশ্রিত্য প্রবর্তন্তেঽতীতানাগতদেশনাঃ ॥ ১৮৫৫ ॥
সমস্তকল্পনাজালরহিতজ্ঞানসন্ততেঃ।
তথাগতস্য বর্তন্তেঽনাভোগেনৈব দেশনাঃ ॥ ১৮৫৬ ॥

অর্থাৎ, বর্তমানের যে রূপ পারম্পর্যক্রমে অথবা সাক্ষাৎ ভাবে কার্যে বা কারণে পরিণত হইয়াছে কেবল তাহাই যোগিগণ জানিতে পারেন; তাহার পর তাঁহারা শুদ্ধ অথবা লৌকিক অথচ বিকল্পানুগ বিজ্ঞানের সাহায্যে (যে-বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে নির্বিষয়) ঐ কার্য বা কারণ অনুধাবন করিবার চেষ্টা করেন; এইরূপেই ভূত হেতু ও ভাবী ফলের বিজ্ঞানসন্ততি আশ্রয় করিয়া অতীত ও অনাগত সম্বন্ধে যোগিগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তথাগতের বিজ্ঞানসন্ততি হইল সম্পূর্ণরূপে কল্পনামুক্ত; তাঁহার উপদেশও সেইজন্য আভোগশূন্য, অর্থাৎ ভ্রংশরহিত।—এই কারিকাগুলির উপরেও কমলশীল প্রায় কোন মন্তব্য করেন নাই, সেইজন্য এ-গুলির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ অর্থ যাহা উপরে দেওয়া হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে যোগিগণের জ্ঞান সম্বন্ধে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা অতীব কৃত্রিম, এবং তথাগতের জ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহার উক্তি পূর্ণমাত্রায় dogmatic।

---

* বাসিতং পরম্পরয়া ফলোৎপাদনসমর্থমুৎপাদিতম্—কমলশীল।

উপনিষদে কর্মের প্রসার

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র, এম. এ, কাব্যতীর্থ

ছান্দোগ্যে (২.১২.২) গৃহ্যবিধানের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া একটী বিধান দেওয়া হইয়াছে। "ন প্রত্যঙঙগ্নিমাচামেন্ন নিষ্ঠীবেৎ, তদ্ ব্রতম্"। অর্থাৎ "অগ্নির অভিমুখে ভক্ষণ বা নিষ্ঠীবন করিবে না", ইহাই তাহার (যথোপদিষ্ট সামোপাসকের) ব্রত বা অবশ্য পালনীয় নিয়ম। অন্যত্র (ছা. উ., ২.২১.৪.) আছে,—"সর্বা দিশো বলিমস্মৈ হরন্তি,"—উপাসক সর্বাত্মক ভাব প্রাপ্ত হইলে চতুর্দিকের লোকে তাহাব জন্য বলি বা উপহাব আনয়ন করে। প্রশ্নোপনিষদেও (২. ৭) "বলিং হরন্তি", এই বাক্য পাই। 'বলি' অর্থ 'ভূত-বলি'। এই কথায় গৃহ্যোক্ত 'বলিহরণ' বুঝাইতেছে।৫০ ইন্দ্রাদি দেবতা, গৃহদেবতাগণ, নানা প্রকার তির্যক্ প্রাণী, উদ্ভিদ্, রাক্ষস, পিতৃগণ—সকলের উদ্দেশ্যেই অন্ন নিবেদন করাকে বৈশ্বদেব-বলি (পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম ভূতযজ্ঞ) বলা হয়। ইহা নিত্যকর্ম, গৃহস্থেব অবশ্য কবণীয়।৫১ অন্ন যদি না থাকে, তবে গৃহস্থ এমনকি কাষ্ঠখণ্ডও সকলের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে। ভাবই মুখ্য। আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, হিন্দুধর্মেব সর্বজনীন ভাব কত উন্নত। এই বলিকর্ম নৈমিত্তিক না হইয়া নিত্য কর্মে কত সহজে পর্যবসিত হইয়াছে। ইহা জাতিগত উদারতার একটী বিশিষ্ট পরিচয়। গৃহস্থ সকলকে দিবার পর অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিবে, ইহা ঋগ্বেদেও (১০.১১৭.৬) পাওয়া যায়,—"কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী,"—অপরকে না দিয়া কেবল নিজে ভক্ষণ করিলে শুধু পাপই হয়। গীতাতেও অনুরূপ উক্তি আছে। মুণ্ডক উপনিষদে (১.২.৩) বৈশ্বদেবের উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকে (১.৪) পঞ্চ মহাযজ্ঞ৫২ নামত উল্লিখিত না থাকিলেও ইহাদের বর্ণনা আছে :—

---

৫০. আশ্বলায়ন ১. ২ ; গোভিল গৃহ্য, ১. ৫ ; খাদির গৃহ্য, ২. ১ ; শাঙ্খায়ন গৃহ্য, ২. ১৪ ; পারস্কর গৃহ্য, ২. ৯ ; ইত্যাদি।

৫১. সায়ং প্রাতর্বৈশ্বদেবঃ কর্তব্যো বলিকর্ম চ।
অনশ্নতাপি সততমন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ॥ —আহ্নিকতত্ত্ব।

৫২. অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥ —মনু, ৩. ৭০।

মতান্তরে—অহুতঞ্চ হুতঞ্চৈব তথা প্রহুতমেব চ।
ব্রাহ্ম্যং হুতং প্রাশিতঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচক্ষতে॥—ঐ, ৩. ৭৩।

আশ্বলায়ন গৃহ্য, ৩. ১ ; পারস্কর গৃহ্য, ২. ৯ দ্রষ্টব্য।

"অথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যাপিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ ...তদ্বা এতদ্ বিদিতং মীমাংসিতম্।"—সে যে (আগন্তুক) মনুষ্যগণকে বাস করায় এবং অন্নদান করে, তদ্দ্বারা মনুষ্যগণের লোক লাভ করে; পশুগণকে যে তৃণজল দান করে; তদ্দ্বারা পশুগণের; এবং গৃহে যে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্বাপদ ও পক্ষিগণ উপজীবিকা লাভ করে, তাহা দ্বারা তাহাদের লোক লাভ হয়, অর্থাৎ এইরূপে সর্বত্র তাহার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিষয়টী পঞ্চযজ্ঞপ্রকরণ হইতে জানিবে, এবং ইহা (অবদান প্রকরণে) বিচারিতও হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ে (১. ১১) "দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—দেবকার্য (দেবযজ্ঞ) এবং পিতৃকার্য (পিতৃযজ্ঞ) হইতে বিচ্যুত হইবে না, এই বলিয়া সমাবর্তনকালে ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে পঞ্চমহাযজ্ঞের দুইটীর উল্লেখ পাওয়া গেল। মুণ্ডকের উক্তি—

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্মাস্যমনাগ্রয়ণমতিথিবর্জিতং চ।
অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ (১. ২. ৩)

ইহা হইতে অনেকগুলি কর্মের নাম পাওয়া যায়। 'অতিথিবর্জিত' বলিতে মনু-প্রোক্ত নৃ-যজ্ঞের অভাব বুঝায়। ব্রহ্মযজ্ঞ হইল অধ্যয়ন বা স্বাধ্যায়। ইহার উল্লেখ ছান্দোগ্যে (১. ১২. ১) আছে। বৃহদারণ্যকের (১. ৪.) কথা,—"স যজ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষিণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৄণাম্।"—সে যে হোম এবং যজ্ঞ করে, তাহা দ্বারা দেবলোক; যে স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে, তাহা দ্বারা ঋষিলোক; এবং যে পিণ্ডোদকাদি দান এবং বংশ তন্তু-সংরক্ষণ চেষ্টা, তাহা দ্বারা পিতৃলোক লাভ করে। "জায়মানো বৈ নরস্ত্রিভির্ঋণবাঁ জায়তে, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ"—জন্ম মুহূর্তে মানুষ ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হয়, (দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ)। যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, সন্তানোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ এবং অধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করা হয়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের এই উক্তির সহিত বৃহদারণ্যকাংশের সাদৃশ্য রহিয়াছে। উপরিকথিত 'অনুব্রূতে' কথার অর্থ 'স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করে'। ইহাই ব্রহ্মযজ্ঞ।

উদ্ধৃত মুণ্ডক-খণ্ডে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, আগ্রয়ণ ও বৈশ্বদেবের কথা আছে। বৈশ্বদেব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র (মু. উ., ১. ২. ৩; বৃ. উ., ৪. ৩; ছা, উ., ৫. ২৪) প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দুগ্ধাদির আহুতি। ইহা আমরণ সম্পাদ্য। দর্শ ও পূর্ণমাস যথাক্রমে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বিহিত শ্রৌত ও গৃহ্য কর্ম।[৫৩] বাজসনেয়ি-শাখালব্ধ

৫৩. কৌষীতকি ব্রাহ্মণ, ৩. ১; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭. ১১; শাঙ্খায়ন গৃহ্য, ১. ৩ গোভিল গৃহ্য, ১. ৫; হিরণ্যকেশি গৃহ্য, ১. ২৩. ৭; ইত্যাদি।

চাতুর্মাস্য[54] ঋতুতে বিহিত চারিটী শ্রৌত যজ্ঞ, যথা বৈশ্বদেব, শাকমেধ, বরুণপ্রঘাস, শুনাসীর্য। শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত আগ্রয়ণ-ইষ্টিতে[55] প্রতি ঋতুতে বৃক্ষের প্রথম ফল পাক করিয়া ইন্দ্র, অগ্নিস্বিষ্টকৃৎ, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতির উদ্দেশে আহুতি দিতে হয়। ইহা শ্রৌত ও গৃহ্যকর্ম। 'অগ্র' শব্দ হইতে 'আগ্রয়ণ।' নূতন ফলের অগ্রভাগ দেবতাদিগকে দিবার পর ভোজন করিতে হইবে, ইহাই নিয়ম ছিল।

ছান্দোগ্য (৩. ১৭) উপাসনার কথা বলিতে গিয়া যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যথা—দীক্ষা, উপসদ্ ইষ্টি, স্তোত্র, শস্ত্র, দক্ষিণা (ক. উ., ১. ২), অবভৃথ বা যজ্ঞান্তস্নান (ছা. উ., ২. ২২. ২)। এইভাবে স্বাহা, বষট্, হন্ত, স্বধা (প্র. উ., ২. ৮),—এই সকল পারিভাষিক কথাও পাওয়া যায়।

শ্বেতাশ্বতর (১. ১২—৩) আত্মার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া রূপকচ্ছলে যজ্ঞ-ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। এখানে অরণি, উত্তরারণি ও অগ্নিমন্থনের (শ্বে. উ., ২. ৬) উল্লেখ রহিয়াছে। দুইখানি কাষ্ঠখণ্ডে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি-মন্থন বা অগ্নি উৎপাদন করিতে হয়। সেই অগ্নিতে যজ্ঞকার্য সমাধা হয়। উপরের কাষ্ঠখণ্ডকে উত্তরারণি, এবং নীচেরটীকে অরণি বলে। এই উপনিষদে (২. ১) অগ্নিচয়নও উল্লিখিত হইয়াছে। কঠ উপনিষদেও (১. ১৫) অগ্নিচয়ন-কর্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "যা ইষ্টকা যাবতীর্বা যথা বা।"—এই স্থলে যজ্ঞবেদীর ইষ্টকসংখ্যা (১০৮০০) এবং সে সকল স্থাপনের বিধিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা অগ্নি-চিতি বা অগ্নি-চিত্যা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বাজসনেয়ি সংহিতায় (১৩), এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রৌত সূত্রাদিতে অগ্নিচয়নের কথা ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ইহাই সোম-যাগের প্রারম্ভ-কর্ম। নানাপ্রকার পশ্বাদি এই উপলক্ষ্যে হত্যা করা হয় এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন উপায়ে ইষ্টক স্থাপন করা হইয়া থাকে।

ঈশোপনিষদ্ (১. ২) ও কেনোপনিষদ্ (৪. ৮) কর্ম বা যজ্ঞাদির কথা তুলিয়াছেন। মানুষ যতদিন পর্যন্ত নির্মলান্তঃকরণ হইতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত উচ্চতত্ত্বের ধারণা করিতে পারেনা। সুতরাং তাহাকে ইষ্ট (শ্রৌতকর্ম) ও পূর্ত (স্মার্তকর্ম)[56]—এই উভয়বিধ কর্মে নিষ্ঠার সহিত ব্যাপৃত থাকিতে হইবে (ক. উ., ১. ৮; মু. উ., ১. ২. ১০; ছা. উ., ৫. ১০)। ইষ্টকর্মের আরম্ভ-কাল সম্বন্ধে প্রশ্নোপনিষদ (১. ১২) বলেন, "শুক্ল ইষ্টং কুর্বন্তি,"—শুক্লপক্ষে ইষ্টকর্ম করিতে হয়।

---

৫৪. বাসিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র (বোম্বাই সংস্কৃত-প্রাকৃত গ্রন্থমালা ১. ৩৭; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১. ৬. ৩. ৩৬.; ২. ৫, ৬; ৫.২. ৪; ১. ৩৭)। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ১. ৩. ১০. ১; মনু, ৪. ২. ৬।

৫৫. গোভিলগৃহ্য, ৩. ৮. ৯—২৪; আপস্তম্ব গৃহ্য, ৭. ১৯; আশ্বলায়ন গৃহ্য, ২. ২. ৪—৫; পারস্কর গৃহ্য, ৩. ১; খাদির গৃহ্য, ৩. ৩; ৪. ২; শতপথব্রাহ্মণ ৫. ২. ৩. ৯; মনু, ৪. ২৬-৭।

৫৬ "স্মার্তং পূর্তং শ্রৌতমিষ্টমিতি কেচিদিহোচিরে।"—সায়ণ-ভাষ্য, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৪, ৩।

সোমযজ্ঞে আহুতি দিবার পরও যদি সোমরস অতিরিক্ত থাকে, তবে পুনরায় মন্ত্র শংসন করিয়া তাহা দ্বারা আহুতি দিতে হয়। এইরূপ শ্রৌতসূত্রোক্ত "সোমাতিরেকের" কথা দেখিতে পাই শ্বেতাশ্বতরে—"সোমো যত্রাতিরিচ্যতে" (২. ৬)।

মুণ্ডকে (৩. ২. ১০) একর্ষি-অগ্নিতে হোম করার কথা আছে,—"স্বয়ং জুহ্বত একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ।" প্রশ্নোপনিষদেও (২. ১১) একর্ষি-অগ্নি উল্লিখিত হইয়াছে।

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানটী তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হইতে লওয়া হইয়াছে। উপাখ্যানের অবতারণা নাচিকেত যজ্ঞ আলোচনার মুখবন্ধরূপে। ইহা যজমানের স্বর্গ-প্রাপক। নাচিকেত অগ্নিচয়নের ফলশ্রুতিতে সংক্ষেপে যাহা কিছু কামনার বস্তু হইতে পারে, তৎসমুদয় লাভ হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। বাজশ্রবস যে সর্বস্ব দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিলেন, ইহাতে শতপথোক্ত সর্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ 'সর্বমেধ' যজ্ঞের ইঙ্গিত পাই।

ফলকামনায় অভ্যারোহ-নামক একটী জপকর্মের বিধান পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকে (১. ৩)। ইহারই অন্যত্র (৩. ৯) আছে—"যাবন্তো বৈশ্বদেবস্য নিবিদ্",—অর্থাৎ বৈশ্বদেব শস্ত্রের নিবিৎ-সংখ্যা যত। সোমযাগের তৃতীয় সবনে পঠিত ঋক্‌সমূহ-বিশেষের নাম বৈশ্বদেব শস্ত্র। নিবিৎ বলিতে যজ্ঞে প্রযুক্ত গদ্যাত্মক সংক্ষিপ্ত বাক্য। ইহা যজুর্বেদে বিহিত। আর একটী স্থলে (৩. ১.) যাজ্যা, পুরোঽনুবাক্যা ও শস্যা—এই তিনটী শব্দ দেখা যায়। প্রথম দুইটীর সংজ্ঞানির্দেশে বলা হয়—"যাজ্যয়া জুহোতি, পুরোঽনুবাক্যয়া গৃহ্ণাতি।" আহুতির অংশ তুলিয়া লইবার সময় যে সকল ঋক শংসন (পাঠ) করা হয়, তাহাদিগকে পুরোঽনুবাক্যা (পূর্বে অনুবচনীয়) বলে ; এবং হোমকালে যে ঋক-সমুদয় পাঠ করা হয়, তাহাদিগকে যাজ্যা (<√যজ্) বলে। অর্থাৎ আহুতির পূর্বে (পুরস্) এবং সমকালে বিহিত পঠনীয় ঋকসমূহ যথাক্রমে পুরোঽনুবাক্যা ও যাজ্যা সংজ্ঞায় অভিহিত। শস্ত্রার্থ যে সমস্ত ঋক প্রযুক্ত হয় তাহাদের নাম শস্যা।

প্রশ্নোপনিষদে (২. ১১) ও চূলিকোপনিষদে (১১) 'ব্রাত্য' শব্দটী আছে। ব্রাহ্মণ কুমারের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর, এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে উপনয়ন না হইলে তাহাদিগকে পতিত-সাবিত্রীক বা ব্রাত্য[৫৭] বলে। ইহাদিগকে সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া থাকিতে হইবে, ইহাই বিধি ছিল। এইরূপ অসংস্কৃত ব্যক্তির পুত্রাদিও ব্রাত্য আখ্যা পাইবে। ধর্মসূত্রের মতে বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপত্তি হইলেও ব্রাত্য হইতে হইবে। ইহাদিগকে পুনরায় সমাজের একজন করিয়া লইতে হইলে ব্রাত্যস্তোম[৫৮] নামক কর্ম করিতে হইত।

---

৫৭ গোভিল গৃহ্য, ২. ১০. ৫—৬ ; মনু, ২. ৩৯—৪০।

৫৮ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১৭. ১ ; লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ৮. ৬ ; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ৯. ৮, ২৫ ; কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ২২. ৪. ২৮ ; ১২. ১. ২ ; পারস্কর গৃহ্য, ২. ৫. ৪৩ ; বাসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, ১১. ৭৯ ; যাজ্ঞবল্ক্য, ১. ৩৪।

বৃহদারণ্যকে (১. ৪) আছে,—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদ্ উপাস্তে রাজসূয়ে,"—সেইজন্ত রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা নিম্ন আসনে উপবেশন করেন। রাজাদের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে রাজসূয় নামক বহু ইষ্টি, পশু এবং সোমসংযুক্ত ক্রতু সম্পাদন করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণের রাজসূয়ে অধিকার নাই। রাজসূয়-নিষ্পাদন রাজগণের শক্তির উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।৫৯ রাজা যজ্ঞে সোমপান না করিয়া ফলচমস (ন্যগ্রোধ, প্লক্ষ, অশ্বত্থাদির ফল একত্র করিয়া প্রস্তুত ভক্ষ্য বিশেষ) ভক্ষণ করিবেন।৬০ অভিষেকের দিন বিধিপূর্বক অভিষিক্ত রাজা আসন্দীতে বসিয়া হোতার মুখ হইতে শুনঃশেপের উপাখ্যান শ্রবণ করিবেন। পুত্র-কামনাতেও এই উপাখ্যান-শ্রবণ বিহিত।৬১ রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতাধিক্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া শঙ্করাচার্য বলেন,—"যস্মাদ্ ব্রহ্মণা অতিশয়েন সৃষ্টং ক্ষত্রম্, তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি, ব্রাহ্মণজাতেরপি নিয়ন্তৃ।"—অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণকে ব্রহ্মা অতিশয়িত গুণদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কাজেই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণজাতিরও নিয়ন্তা; এই অর্থে ক্ষত্রিয়ের উপরে আর কেহ নাই।

বৃহদারণ্যকের প্রথমেই উপাসনাচ্ছলে ক্ষত্রিয়নিষ্পাদ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অবতারণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শতপথ-অনুযায়ি মেধ্য অশ্বের অগ্রে ও পশ্চাতে যথাক্রমে 'মহিমা' নামক সুবর্ণ ও রজতময় 'গ্রহ' (সোমপানের পাত্র-বিশেষ) স্থাপনের কথা পাই (১. ১)। তারপর—"তস্মাৎ সর্বদেবত্যং প্রোক্ষিতং প্রাজাপত্যমালভন্তে (১. ২)." অর্থাৎ সর্বদেবতাত্মক মন্ত্রপূত জল দ্বারা প্রোক্ষিত পশুকে প্রজাপতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়, এই উক্তি রহিয়াছে। অশ্বমেধ-যাজীর গতি সম্বন্ধে আলোচনা পাই বৃহদারণ্যকে (৩. ৪)। ছান্দোগ্যে (৩. ৪. ১) "ইতিহাস-পুরাণং" কথাটী আছে। ইহা অশ্বমেধের একটী প্রয়োজনীয় ব্যাপার। বহুদিনস্থায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞে 'পারিপ্লব'-সংজ্ঞক রাত্রিসমূহে ইতিহাস ও পুরাণ-লব্ধ উপাখ্যানাবলী (পরিপ্লব) শ্রবণ করিবার সুস্পষ্ট বিধি রহিয়াছে।৬২

---

৫৯ যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলস্যেশ্বরশ্চ যঃ।
শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্ ··· ···॥—অমরকোষ।

দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধীশ্বর ও রাজগণের শাসনকারী যে রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, তিনিই 'সম্রাট্' আখ্যা পাইয়া থাকেন।

৬০ "তে সর্ব এব মহজ্জগ্মুরেতং ভক্ষং ভক্ষয়িত্বা," (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৫. ৮)—এই ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজনের ফলে তাঁহারা সকলেই মহত্ব লাভ করিয়াছেন। মন্থ (ভক্ষ্য-বিশেষ) ভক্ষণের ফলেও মহত্ব প্রাপ্তি হয়, ইহা আমরা পূর্বেই পাইয়াছি।

৬১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; অধ্যায় ৩৩· -৩৬।

৬২ শতপথ-ব্রাহ্মণ. ১৩. ৪. ৩. ২-১৫; আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, ১০. ৬. ১০—; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র, ১৬. ১. ২২—; লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, ৯. ৯, ১০—।

ছান্দোগ্যে (৩. ১৩. ৬) আছে, প্রাণাদি পাঁচটী ব্রহ্মপুরুষকে স্বর্গের (হৃদয়ের) দ্বারপাল বলিয়া উপাসনাকারীর বংশে বীর পুত্র জন্মিয়া থাকে। এখন এইরূপ পুত্রের দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ উক্ত উপনিষদ্ ভুবনকোশ-বিজ্ঞানের অবতারণা করিয়াছেন (৩. ১৫)। ব্রহ্মাণ্ডকে একটী কোশ বা ধনাগার রূপে কল্পনা করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য। পুত্রের নাম তিনবার গ্রহণ করিয়া এই উপাসনার অঙ্গীভূত জপ বিহিত হইয়াছে। জপের মন্ত্র—"অরিষ্টং কোশং প্রপদ্যে" ইত্যাদি। এই উপাসনা-সংবলিত জপের ফলে পুত্রের আয়ু বাড়ে।৬৩ ইহার পরের খণ্ডে ছান্দোগ্যে নিজের আয়ুর্বৃদ্ধি এবং রোগমুক্তির জন্য উপাসনা ও জপের বিধান দেওয়া হইয়াছে। জীবনকে তিনভাগে ভাগ করিয়া যথাক্রমে প্রাতঃসবন (গায়ত্রী-ছন্দস্ক), মাধ্যন্দিন-সবন (ত্রিষ্টুপ্-ছন্দস্ক) ও তৃতীয় সবন (জগতী-ছন্দস্ক)-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। জীবনের প্রথমাংশে রোগ হইলে বসুগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়াংশে হইলে রুদ্রগণের ও তৃতীয়াংশে আদিত্যগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রজপ ও প্রার্থনা করিলে "অগদো হ ভবতি"—নিশ্চয়ই রোগমুক্ত হইয়া পূর্ণ ১১৬ বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১. ৪.) মেধা-কামনায় এবং শ্রী-কামনায় যথাক্রমে জপ ও হোমের নির্দেশ আছে। জপ্য-মন্ত্রের অর্থ :—"বেদরূপ অমৃত হইতে সম্ভূত, ছন্দোবৃষভ (বেদ-প্রধান), বিশ্বরূপ ইন্দ্র মেধা বা প্রজ্ঞাদ্বারা আমাকে প্রীত করুন। ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ অমৃতের যেন আধার হইতে পারি। শরীর যেন সমর্থ থাকে। জিহ্বা যেন মধুরভাষিণী হয়। কর্ণ দ্বারা যেন বহু বিষয় শুনিতে পাই। আপনি ব্রহ্মের প্রতীক ও লৌকিক প্রজ্ঞা দ্বারা অজ্ঞাতব্য। আমার আত্মজ্ঞানাদি রক্ষা করুন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করিবার পর যেন বিস্মৃত না হই।" শ্রী কামনা করিলে সমন্ত্রক দ্বাদশটী আহুতি দিতে হইবে। বস্ত্র, অন্নপান, শ্রী, পশু, যশ, ধন—এই সকল প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কৌষীতকি উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি ক্রিয়ার কথা পাওয়া যায়। বৃহদা-রণ্যক ও ছান্দোগ্যের মন্থ আলোচনায় কৌষীতকির একধনাবরোধনের উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে অত্রত্য অন্যান্য কর্মের বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

যে কোনও স্ত্রীলোক এবং পুরুষ পরস্পরের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করিলে দৈবস্মর কর্ম (২. ৪) করিবে। একধনাবরোধনের জন্য নির্দিষ্ট কালসমূহের মধ্যে যে কোনও কালে পূর্ব-কথিত রূপে এই সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া ছয়টী আজ্যাহুতি দিবে—"বাচং তে ময়ি জুহোম্যসৌ স্বাহা," ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি (প্রণয়-ভাজনকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার বাক্ (এবং যথাক্রমে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও প্রজ্ঞান) আমাতে আহুতি দিতেছি। একধনাবরোধনেও এই মন্ত্রগুলি

---

৬৩ ইহা পড়িলে গৃহ্যোক্ত আয়ুষ্য কর্মের কথা মনে পড়ে। বৃহদারণ্যকে (৬. ৪) পুত্রমন্থ-কর্মে আয়ুষ্য-বিধান মেধাজননের সঙ্গেই পাওয়া যায় ; উপরে ৩৮শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

আছে ; কেবল 'প্রজ্ঞান' স্থলে 'প্রজ্ঞ' বলা হইয়াছে। আহুতি সমাপ্ত হইলে ধূমগন্ধ-আঘ্রাণাদি পূর্বক অভিলষিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে অথবা (অনুকূল) বাতাসে দাঁড়াইয়া সম্ভাষণ করিবে। ফলে "প্রিয়ো হৈব ভবতি স্মরতি হৈবাস্য,"—তাহার প্রিয়পাত্র হইবে এবং তাহাকে স্মরণ করিবে। দেবতাদের কৃপায় এইরূপে স্মৃত হইবে বলিয়াই ইহার নাম দৈবস্মর।

সর্বজিৎ কৌষীতকি ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট বিভিন্ন ফললাভের জন্য তিনটী উপাসনা আছে (২. ৭৯)। প্রথম উপাসনা যজ্ঞোপবীত[৬৪] পরিধান করিয়া আচমন এবং জলপাত্রকে তিনবার অভ্যুক্ষিত করিয়া উদীয়মান, আকাশ-মধ্যগত এবং অস্তায়মান সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া "আমার পাপ সংবৃত কর" এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহা হইলে দিবা এবং রাত্রিতে অনুষ্ঠিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয় ; পিতৃবধ, মাতৃবধ, চৌর্য, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদির পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় উপাসনার বিধান :—প্রতিমাসে অমাবস্যায় চন্দ্রের নিকট পূর্বোক্ত রূপে প্রার্থনা করিবে বা দুইখণ্ড হরিদ্বর্ণ তৃণ উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা করিবে, যেন পুত্রগণ-সংক্রান্ত কোনও বিপৎপাতের জন্য আমাকে ক্রন্দন করিতে না হয়—"মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।" এইরূপ করিলে জাত-পুত্র ব্যক্তির পুত্রগণ তাহার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না। অজাতপুত্র ব্যক্তি তিনটী ঋক্ (১. ৯১. ১৬ ; ৯. ৩১. ৪ ; ১. ৯১. ১৮) জপ করিয়া প্রার্থনা করিবে, "আমাদের প্রাণ, প্রজা (পুত্রাদি), এবং পশু দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইও না" ।[৬৫] তারপর চন্দ্রের দিকে দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিতে হইবে। তৃতীয় উপাসনায় পূর্ণিমা তিথিতে উল্লিখিতক্রমে চন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিবে,—"হে রাজন্ সোম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শ্যেন, অগ্নি এবং সর্বভূত—ইহারাই তোমার পঞ্চমুখ। এই সকল মুখ দ্বারা তুমি আমাকে অন্নভোজী কর। আমাদের প্রাণ, প্রজা, পশুদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইও না। আমরা যাহাকে ঘৃণা করি, তাহার প্রাণ, প্রজা, পশুদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হও।" অনন্তর চন্দ্রের দিকে দক্ষিণ বাহু বাড়াইয়া দিবে। প্রার্থনার পর (২. ১০) রাত্রিতে স্ত্রীর হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, "যত্তে…মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।" ফলশ্রুতি পূর্ববৎ।

তারপর বহু গৃহ্যসূত্রে আলোচিত প্রোষিতাগত কার্যটী কৌষীতকিতে (২. ১১) পাওয়া যায়।[৬৬] বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পিতা পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—

---

৬৪ যজ্ঞোপবীতের প্রাচীনতম উল্লেখ পাই তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩. ১০. ১৯ ১২)। ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অজিন-ধারণই পূর্বে প্রচলিত ছিল।

৬৫ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১. ১৩. ৭) অনুরূপ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

৬৬ আপস্তম্ব, ৬. ১৫. ১২ ; গোভিল, ২. ৮. ২১ ; খাদির, ২. ৩. ১৩ ; আশ্বলায়ন, ১. ১৫. ৯ ; পারস্কর, ১. ১৮। শেষোক্তসূত্রের সহিত কৌষীতকির বর্ণনার বহুল সাদৃশ্য আছে।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥
অশ্মা ভব পরশুর্ভব হিরণ্যমস্তৃতং ভব।
তেজো বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

দ্বিতীয় শ্লোকের সহিত পূর্বশ্লোকের (মন্ত্রব্রাহ্মণোক্ত) কিছু পার্থক্য দেখা যাইতেছে। পুত্রের নাম উচ্চারণ করিবে; তারপর "যেমন প্রজাপতি তৎসৃষ্ট প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্ম তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি," এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবে। দুইটী ঋঙ্মন্ত্র[৬৭] পাঠ করিয়া ক্রমশ তাহার উভয় কর্ণে জপ করিবে। তারপর সমন্ত্রক বারত্রয় পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ এবং মূর্ধা-হিঙ্কার (মস্তকের উপরিভাগে মুখ রাখিয়া 'হিং' এই শব্দ উচ্চারণ করা) করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তর (২. ১২-৩) দৈব পরিমর।[৬৮] এখানে অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমস্ এবং বিদ্যুৎ, এই চারিটীর কথা বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য 'বৃষ্টির' অধ্যাহার করিয়াছেন। এই পাঁচটী দেবতার ব্রহ্মন্, প্রাণ বা বায়ুতে নিলয়নই ইঁহাদের পরিমর ('পরিতো মরণম্' অর্থাৎ বায়ুর চারিদিকে মরণ)। "তা বা এতাঃ সর্বা দেবতাঃ বায়ুমেব প্রবিশ্য বায়ৌ সৃপ্তা ন মূর্চ্ছন্তে তস্মাদেব পুনরুদীরত।"—এই সকল দেবতা বায়ুতেই প্রবেশ করে এবং ইহাতেই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু বিধ্বস্ত হয় না, তাহা হইতে পুনরায় সমুত্থিত হয়। এই পর্যন্ত উপনিষদ্ অধিদৈবতরূপে

---

৬৭ ঋগ্বেদ, ৩. ৩৬. ১০; ২. ২১. ৬। প্রথম ঋকের সহিত এখানকার মন্ত্রের কিছু পার্থক্য আছে।

৬৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৪০. ৫.) এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের (৩. ১০. ৪) 'ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ' বলিতে যাহা বুঝায় 'দৈব পরিমরের' ধারণাও প্রায় তদ্রূপ। উক্ত ব্রাহ্মণাংশের সংক্ষিপ্তার্থ এই:—রাজা শত্রুক্ষয়ের জন্য পুরোহিতের সহিত ধ্যান এবং জপ করিবেন। ব্রহ্মন্ বা বায়ুর চতুর্দিকে বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, চন্দ্রমস্, আদিত্য ও অগ্নি—এই পাঁচটী দেবতা মরিয়া যাইতেছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। দ্যোতনের পরে বিদ্যুৎ বৃষ্টিতে প্রবেশ করে; বৃষ্টি বর্ষণের পর চন্দ্রে প্রবেশ করে; চন্দ্র অমাবস্যায় আদিত্যে প্রবেশ করে; আদিত্য অস্তগমনের পরে অগ্নিতে প্রবেশ করে; এবং অগ্নি নির্বাপিত হইলে বায়ুতে প্রবেশ করে। এই প্রবেশ করা বা অন্তর্হিত হওয়াই ইহাদের মৃত্যু। এই সকল সময়ে জপ করিতে হইবে, "বিদ্যুৎ, বৃষ্টি প্রভৃতির মরণে আমার শত্রু মরিয়া যাউক।" জপের ফলে শীঘ্রই শত্রুনাশ হয়। আবার বায়ু হইতেই অগ্নির পুনরুত্থান হয়; অগ্নি হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে বিদ্যুৎ—এইরূপে প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন হয়। এই সকল সময়ে জপ করিতে হয়, "ইহাদিগের জন্ম হউক, কিন্তু শত্রুর উৎপত্তি যেন না হয়। শত্রু যেন আমার সম্মুখ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করে।" জপের ফলে শত্রুর অনুৎপত্তি এবং বিমুখতা—

'পরিমরের' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তারপর অধ্যাত্ম বা ইন্দ্রিয় পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে উপনিষদের ব্রাহ্মণাতিরিক্ত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। * উল্লিখিত চারিটী দেবতার অনুরূপ বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র এবং মন এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের প্রাণেই বিলয় হয়, এইরূপে অধ্যাত্ম-পক্ষে 'পরিমর' বুঝানো হইয়াছে।

তদনন্তর (২. ১৫) 'পিতাপুত্রীয় সম্প্রদান,৬৯ নামক কর্মবিশেষ উক্ত হইয়াছে। গৃহে নূতন তৃণ বিছাইয়া, নিকটে অগ্নি, জলপূর্ণ কুম্ভ এবং (শস্যপূর্ণ) পাত্র রাখিয়া, নববস্ত্র এবং শুভ্র পরিচ্ছদে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পুত্রাপেক্ষা উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট পিতা (অরিষ্ট লক্ষণাদি দ্বারা মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলে) নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা পুত্রের ইন্দ্রিয়সকল স্পর্শ করিয়া, অথবা পরস্পর মুখামুখি বসিয়া এইরূপে সম্প্রদান করিবে :— (পিতার উক্তি)—"বাচং মে ত্বয়ি দধানি"—আমার বাক্য তোমাতে আহিত করিতেছি। (লব্ধানুশাসন পুত্রের উক্তি)—"বাচং তে ময়ি দধে"—আপনার বাক্য আমাতে ধারণ করিতেছি। ক্রমে ক্রমে পিতা—প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, অন্নরস, কর্ম, সুখ দুঃখ, আনন্দ, রতি

উভয়ই সিদ্ধ হয়। ইহাই ব্রহ্মন্ বা বায়ু সম্বন্ধীয় পরিমর নামক কর্ম। ইহার অনুষ্ঠানে 'অশ্মমূর্ধা' (পাষাণের মত কঠিন মস্তকযুক্ত, অর্থাৎ অতি প্রবল) শত্রুও বিনষ্ট হয়,—"পর্যেনং দ্বিষন্তো ভ্রাতৃব্যাঃ পরি সপত্না ম্রিয়ন্তে।"

এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—"তদ্ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেনং ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ।"—আকাশকে ব্রহ্মের পরিমর বলিয়া উপাসনা করিবে, শ্রুতির এইরূপ নির্দেশ। শঙ্করাচার্য ভাষ্যে বলিতেছেন, "স এব এবায়ং বায়ুরাকাশেন অনন্য ইত্যাকাশো ব্রহ্মণঃ পরিমরঃ, তস্মাৎ আকাশং বায়্বাত্মানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত।" বায়ু এবং আকাশ একই। এইজন্য ঐতরেয়-বিহিত বায়ুকে আকাশ বলিয়া ধরা যায়। সুতরাং 'ব্রহ্মন্' বলিতে এখানে 'আকাশ' বুঝাইতেছে।

ব্রাহ্মণোক্ত ক্রিয়াটী অথর্ববেদীয় শত্রুজয়কর্মের কথা মনে করাইয়া দেয়। অথর্ববেদ, ৩. ১৯ ; ঋগ্বেদ, ৪. ৫০. ৭-৯ ; এই সংহিতাভাগদ্বয় উক্ত ভাবমূলক। কৌশিকসূত্র, ১৪. ২২-২৩ দ্রষ্টব্য। পৌরোহিত্য এবং অথর্ববেদের সম্বন্ধনির্ণায়ক Bloomfield-এর প্রবন্ধ (Atharva Veda and Gopatha Brahmana, page 32) দেখুন।

৬৯ বৃহদারণ্যকে (১. ৫. ১৭) ইহা 'সম্প্রত্তিকর্ম' বলিয়া অভিহিত। পিতা বলিবে, "ত্বং ব্রহ্ম ত্বং যজ্ঞ ত্বং লোকঃ।" পুত্রও স্বীকার করিয়া লইবে। এখানে কৌষীতকির মত কোনও কর্মের আড়ম্বর-বাহুল্য নাই। ঐতরেয় উপনিষদেও (২. ৪) সম্প্রত্তি-কর্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রজাতি (পুত্র), ধাং, ধী, বিজ্ঞাতব্য ও কাম (জ্ঞানের বিষয় এবং কামনার বিষয়)—এই সকল তোমাতে অর্পণ করিতেছি, এইরূপ বলিবে। পুত্রও স্বীকার করিবে। পীড়িত অবস্থায় থাকিলে পিতা কেবল অল্প কথায় বলিবে, "আমার প্রাণ তোমাকে সম্প্রদান করিতেছি।" অনন্তর পুত্র পিতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিবে। তখন পিতা বলিবে, "যশ, ব্রহ্মতেজ, অন্নাদি ও কীর্তি[৭০] তোমার সহিত যুক্ত থাকুক।" ইহা শুনিয়া পুত্র করতল বা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা আবরণ সৃষ্টি করিয়া, বামদিকে মস্তক ঘুরাইয়া, পিতার দিকে চোখ রাখিয়া বলিবে, "স্বর্গাল্লোঁকান্ কামানবাপ্নুহি,"—আপনি স্বর্গলোক এবং সমস্ত কাম্য পদার্থ প্রাপ্ত হউন।" আরোগ্য লাভ করিলে পুত্রের অধীন হইয়া বাস করা, অথবা প্রব্রজ্যাগ্রহণ, এই দুই প্রকার আচরণের মধ্যে পিতাকে একটী বাছিয়া লইতে হইবে।

সংক্ষেপে উপনিষদাবলীর (১৩ খানি) অন্তর্নিহিত আনুষ্ঠানিক বিধানসমূহের এই পর্যন্তই বর্ণনা পাওয়া যায়। কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত তাবৎ ব্যাপারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উল্লেখ বা ইঙ্গিত প্রধানতম উপনিষৎসমূহে এইরূপ পাইতেছি। এই বিষয়ে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

৭০ কীর্তি ও যশের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে,—"যুদ্ধাদি-প্রভবা কীর্তির্দানাদি-প্রভবং যশঃ"—সায়ণ বলেন, যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা যে খ্যাতি, তাহা কীর্তি, এবং দানাদি জনহিতকর কার্য দ্বারা যশ হয়। প্রথমটী ঐহিক, দ্বিতীয়টী আমুষ্মিক। প্রথমটী প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টী পরোক্ষ।

শিবরাত্রি

স্বামী ভূমানন্দ, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা

ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পর্ব, ব্রত ও উৎসবাদি প্রচলিত আছে, "শিবরাত্রি" তাহাদিগের অন্যতম। প্রতিবৎসরই মাঘ মাসের শেষভাগে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম "শিবচতুর্দশী ব্রত"—

"মাঘমাসস্য শেষে যা প্রথমে ফাল্গুনস্য চ।
কৃষ্ণা চতুর্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্তিতা॥"

এই পর্বদিবসে প্রধান প্রধান শিবক্ষেত্রে, যথা কাশী, বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বর, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে, বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয় ও সমস্ত রাত্রি উৎসব, গীত, বাদ্য প্রভৃতি চলিতে থাকে। বহুদূর হইতে যাত্রিগণ এই উপলক্ষ্যে ঐ সমস্ত তীর্থে আগমন করে। এই সময় পশুপতিনাথ দর্শন কামনায় অনেক সাধু সন্ন্যাসী নেপালে গমন করেন। পল্লীগ্রামে ও সহর অঞ্চলেও এই পর্বের প্রচার যথেষ্ট আছে; এমন কি, বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণও সমবেত হইয়া অনেক ক্ষেত্রে এই ব্রত উদ্‌যাপন করে।

২। এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ উপবাস। মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, ধূপ ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজিত হইয়া তিনি যেরূপ প্রীত হন, এই তিথিতে উপবাসপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি তিনি তাহা অপেক্ষা সন্তুষ্ট হন—

"ন স্নানেন ন বস্ত্রেণ ন ধূপেন ন চার্চয়া।
তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ॥"

রাত্রিজাগরণ ও শিবপূজাও এই ব্রতের অন্য দুইটি মুখ্য কর্তব্য। এক বৎসর যাবৎ নিত্য শিবপূজা করিলে যে ফললাভ হয়, একদিনমাত্র শিবরাত্রিতে শিবপূজায় সেই ফললাভ হয়—

শিবরাত্রাবহোরাত্রং নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অর্চয়েদ্বা যথান্যায়ং যথাবলমবঞ্চকঃ॥
যৎ ফলং মম পূজায়াং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।
তৎ ফলং লভতে সদ্যঃ শিবরাত্রৌ মদর্চনাৎ॥ শিবপুরাণ-বিশ্বেশ্বর,
সংহিতা ৭।১২-১৩

শাস্ত্রানুসারে রাত্রির প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করিতে হয়। কিন্তু বর্তমানকালে দেখিতে পাই, কেহ কেহ দিবারাত্র উপবাস করেন, কিন্তু রাত্রি জাগরণ করেন না, কেহ

বা রাত্রিজাগরণ করেন কিন্তু উপবাস করেন না, কেহ বা দিবসে উপবাসী থাকিয়া রাত্রে প্রথম প্রহরের শিবপূজার পর দুগ্ধ, ফল, মূল, জল প্রভৃতি আহার করেন। শিবপূজা সকলে করেন না, কেহ একবারমাত্র সন্ধ্যার সময় পূজা করেন, কেহ শিবমন্দিরে দীপদান করেন, কেহ পূজাস্থানে নৈবেদ্যাদি পাঠাইয়া দেন, কেহ বা পুরোহিত দ্বারা পূজা করান। যাঁহারা উপবাস করেন, তাঁহারা পরদিন সকালে "কথা" শুনিয়া, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া আহার (পারণ) করেন।

৩। এক ব্যাধ কিভাবে শিবানুগ্রহ লাভ করিয়াছিল তাহারই বর্ণনা শিবরাত্রি-ব্রতকথার মধ্যে সংক্ষেপে ও আংশিক ভাবে আছে। বিভিন্ন পুরাণে এই ব্যাধ-বৃত্তান্তের প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্বের উৎপত্তি কি ভাবে হইয়াছিল ও কি জন্য এই দিবসটি বিশিষ্ট পুণ্যতিথিতে পরিণত হয়, তাহার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ব্রতকথার মধ্যে নাই। শিবরাত্রির আনুপূর্বিক বৃত্তান্তটী নিম্নে বিবৃত করিলাম।

৪। ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান আছেন, এমন সময় ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিষ্ণু তাঁহার কোনও প্রকার অভ্যর্থনা না করায় ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি কে হে? আমাকে সম্মুখে দেখিয়াও শয়ন করিয়া রহিয়াছ? বৎস, তুমি গাত্রোত্থান পূর্বক আমাকে অবলোকন কর; আমি তোমার গুরু। যে ব্যক্তি পূজনীয় গুরুকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা না করিয়া উদ্ধতের ন্যায় আচরণ করে, সেই গুরুদ্রোহী মূঢ়চেতার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।" ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার বাক্যে অন্তরে ক্রুদ্ধ হইলেও, বাহিরে শান্তভাব প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—"বৎস, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি নির্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ ত? এক্ষণে এই আসনে উপবেশন কর। তোমাকে এত উদ্বিগ্ন দেখিতেছি কেন? তোমার নেত্রনিচয়েরই বা এবম্বিধ অস্থির অবস্থা কেন?" বিষ্ণুর এবম্বিধ উপেক্ষাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস বিষ্ণো, আমি কালবেগেই অদ্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; আমি এই ত্রিজগতের পিতামহ, তোমার প্রভু"। উত্তরে বিষ্ণু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"এই সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থিত; তুমি কেবল তস্করের ন্যায় অপরের সম্পত্তিকে নিজের বলিয়া মনে করিতেছ। দেখ, তুমি আমার নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি আমার পুত্র। বৎস! তুমি এ পর্যন্ত যে সমস্ত কথা বলিলে সমস্তই মিথ্যা"।

৫। উভয়ের মধ্যে এইরূপে প্রভুত্ব লইয়া বাদ প্রতিবাদ চলিতে লাগিল, এবং ক্রমে উভয়েই পরস্পরকে হত্যা করিবার নিমিত্ত সমরে উদ্যত হইলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবতাগণ এই অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শন করিবার নিমিত্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অম্বরতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয়েই জিঘাংসা-পরায়ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কাহাকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। অনন্তর বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মার প্রতি অমোঘ মাহেশ্বরাস্ত্র সন্ধান করিলেন এবং ব্রহ্মাও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া দুর্জয় পাশুপতাস্ত্র ত্যাগ করিলেন।

অযুত সূর্যসন্নিভ উজ্জ্বল অত্যুগ্র সেই অস্ত্রদ্বয় আকাশমার্গে উত্থিত হইল এবং তাহা হইতে প্রচণ্ড বায়ু নির্গত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। দেবগণ এই অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া কৈলাস পর্বতে গমন করিলেন এবং মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বকীয় অনুচরবর্গকে সমরাঙ্গনে যাইবার জন্য আদেশ দিয়া স্বয়ং রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

৬। ভগবান মহেশ্বর স্বয়ং গুপ্তভাবে আকাশমার্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে অকালপ্রলয় দর্শন করিয়া তিনি ভীষণাকার অনলস্তম্ভরূপে উভয় যোদ্ধার মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উভয় শৈব অস্ত্রই সেই অনলস্তম্ভে পতিত হইয়া প্রশান্ত হইয়া গেল। সকলেই এই অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া বলিলেন—এই অদ্ভুত অগ্নিস্তম্ভ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? তখন ভগবান্ বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ঐ স্তম্ভের মূল অন্বেষণ করিবার জন্য পাতাল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বহুদূর গমন করিয়াও অগ্নিস্তম্ভের মূলদেশ না পাওয়ায় ক্লান্ত হইয়া পুনরায় সমরাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৭। ইতিমধ্যে ব্রহ্মাও হংসরূপ ধারণ করিয়া স্তম্ভের শীর্ষদেশ অনুসন্ধান করিবার জন্য আকাশমার্গে উড্ডীন হইলেন। ব্রহ্মা এইভাবে আকাশমার্গে গমন করিতে করিতে একটি পতনশীল সুগন্ধি কেতকপুষ্প দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা কেতককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পুষ্পরাজ, তুমি কোন স্থান হইতে পতিত হইতেছ ও কোন ব্যক্তিই বা তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন"। কেতক বলিলেন "ব্রাহ্মণ, আমি এই স্তম্ভ হইতে বহুকাল হইল পতিত হইয়াছি, কিন্তু এপর্যন্ত ইহার মূলদেশে উপস্থিত হইতে পারি নাই। তুমিও এই স্তম্ভের অন্ত দর্শন করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাগমন কর"। তখন ব্রহ্মা কেতককে বলিলেন—"সখে, আমি তোমার মতানুসারেই প্রত্যাগমন করিব, কিন্তু তোমাকে আমার একটি উপকার করিতে হইবে। তোমাকে বিষ্ণুর সমক্ষে বলিতে হইবে যে, আমি এই অনলস্তম্ভের অন্ত দর্শন করিয়াছি, তুমিই তাহার সাক্ষী। কেতক ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করিলে, ব্রহ্মা কেতককে সঙ্গে লইয়া সমরাঙ্গনে প্রত্যাবর্তন করিলেন ও তথায় নিরানন্দ ও ক্লান্ত বিষ্ণুকে দেখিয়া বলিলেন—"আমি এই স্তম্ভের অন্ত দর্শন করিয়াছি, এই কেতকই তাহার সাক্ষী"। কেতকও তদনুরূপ সাক্ষ্য দিলেন। তখন বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই উক্তিকে সত্য মনে করিয়া, ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। ভগবান শঙ্কর, ব্রহ্মার এই মিথ্যা আচরণ দর্শন করিয়া, তাঁহাকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে, স্বমূর্তি ধারণ করতঃ সেই অগ্নিস্তম্ভ হইতে নির্গত হইলেন। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া মহাদেবের চরণযুগল ধারণ করিলেন এবং স্বকীয় দোষ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ মহাদেব তখন বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বিষ্ণো, এই ব্যাপারে যখন তুমি

সত্যকে অতিক্রম কর নাই, তখন অদ্য হইতে পবিত্র প্রদেশে তোমারও পৃথক মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি হইবে।

৭। অনন্তর ব্রহ্মার দর্পনাশের নিমিত্ত, মহাদেব স্বকীয় ভ্রূমধ্য হইতে ভৈরব নামে এক অদ্ভুত প্রচণ্ড পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে আদেশ দিলেন—"শাণিত খড়্গদ্বারা এই ব্রহ্মাকে স্বকর্মোচিত ফল প্রদান কর"। তখন ভৈরব মহাদেবের আদেশক্রমে ব্রহ্মার মিথ্যাভাষী পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়া পাতিত করিল এবং অপর শিরশ্চতুষ্টয়ের ছেদনার্থ অসি ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বিনয়নম্র বাক্যে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে প্রভো, আপনিই এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বরচিহ্ন পঞ্চবদন প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে অনুগ্রহ পূর্বক তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তাহাকে এই ভৈরবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন"। মহাদেব বিষ্ণুর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভৈরবকে নিবারণ করিলেন এবং ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিলেন—যখন তুমি পূজাকাঙ্ক্ষী হইয়া শঠতা অবলম্বন করিয়াছ, তখন অতঃপর বিশ্বমধ্যে তোমার কোনও পূজা বা উৎসব হইবে না।" এই সময় হইতে ব্রহ্মা চতুরানন হইয়া রহিলেন। শঙ্করের কঠোর অভিশাপ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বহু প্রকারে শিবের স্তুতি করিলেন, তাহাতে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিলেন—"অতঃপর তুমি অগ্নিহোত্রাদি কার্য ও সমুদয় যজ্ঞের গুরু হইবে"। পরে কেতককে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে, কেতকপুষ্পে কখনও শিবপূজা হইবে না।

৮। যুদ্ধ নিবৃত্ত হওয়ায় সমগ্র জগৎ পুনরায় শান্ত ও স্থির হইল এবং দেবগণও আনন্দিত হইলেন। তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই নানাবিধ দিব্য উপহার দ্বারা মহাদেবের পূজা করিলেন এবং ভগবান্ সেই সমস্ত উপহৃত বস্তু সমবেত দেবগণ ও অন্যান্য সভ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাদেব সেই স্থানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"অদ্য এই মহৎ দিনে, তোমাদিগের পূজায় আমি পরিতুষ্ট হইলাম, অতএব অদ্য হইতে চিরকালই এই পবিত্র দিবস শ্রেষ্ঠ ও পুণ্যতম বলিয়া সমাদৃত হইবে এবং মৎপ্রিয় এই তিথি "**শিবরাত্রি**" নামে জগতে খ্যাতি লাভ করিবে—

> "তুষ্টোঽহং অদ্য বাং বৎসৌ পূজয়াস্মিন্ মহাদিনে।
> দিনমেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্।
> শিবরাত্রিরিতি খ্যাতা তিথিরেষা মম প্রিয়া॥" শিবপুরাণ-বিশ্বেশ্বর সংহিতা ৭।১০

এইভাবে "শিবরাত্রি" একটি বিশেষ পর্বে পরিণত হয়। এক্ষণে, যে ভাবে ইহার মাহাত্ম্য মর্ত্যলোকে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

৯। পুরাকালে এক বনে রুরুদ্রুহ নামে এক ক্রূরকর্মনিরত ভীল বাস করিত এবং ব্যাধ-বৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি দ্বারাই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিত। একদিন তাহার গৃহে কোন খাদ্যদ্রব্য

ছিল না; ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হইয়া তাহার পিতা, মাতা ও স্ত্রী তাহাকে বলিল—"তুমি যে কোনও উপায়ে পার, আমাদিগকে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দাও।" ব্যাধ তাহাদিগের কথায় ধনুর্বাণ গ্রহণ করিয়া মৃগশিকারের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইল, কিন্তু সূর্যাস্ত পর্যন্ত বনে বনে মৃগের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিয়াও একটিও মৃগ দেখিতে পাইল না। এদিকে সূর্যাস্ত দেখিয়া দুঃখিত মনে চিন্তা করিতে লাগিল—"আমার পিতা, মাতা ও পুত্রাদি এতক্ষণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অথচ আমি এখন পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য মাংস সংগ্রহ করিতে পারিলাম না; আমি এখন কি করি।" এইভাবে নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধ এক জলাশয়ের নিকট আগমন করিল ও সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই কোনও মৃগ জলপানের নিমিত্ত এখানে আগমন করিবে ও তখন আমি তাহাকে বধ করিব, এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সে তীরবর্তী একটি বিল্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া শিকারের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। পাছে বৃক্ষে অবস্থানকালে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সে কিছু জলও পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। দৈবযোগে সেই রাত্রি পরম পবিত্র শিবরাত্রি ছিল।

১০। রাত্রির প্রথম প্রহরে একটি মৃগী জলপান করিবার নিমিত্ত ঐ জলাশয়ের নিকট আগমন করিল। ব্যাধও তাহাকে হনন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিল। তাহার অঙ্গসঞ্চালনায় বিল্ববৃক্ষের পত্র পতিত হইল ও তাহার সংগৃহীত জলেরও কিয়দংশ নিম্নে পতিত হইল। বৃক্ষমূলে একটি শিবলিঙ্গ ছিলেন। বৃক্ষচ্যুত ঐ বিল্বপত্র ও জল তাঁহারই মস্তকে পতিত হইল। ব্যাধের অজ্ঞাতসারে শিবরাত্রির প্রথম প্রহরের পূজা সমাধা হইল। বিল্বপত্রদ্বারা পূজিত হইয়া মহাদেব ব্যাধের উপর পরম সন্তুষ্ট হইলেন; কারণ বিল্বপত্রে পূজিত হইলে শঙ্কর যেরূপ তুষ্টিলাভ করেন অন্য কোনও পূজোপকরণদ্বারা সেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন না—

"বিল্বপত্রাৎ পরং নাস্তি যেন তুষ্যতি শঙ্করঃ"। শিবপুরাণ—সনৎকুমার সংহিতা ১৯।২৩

এদিকে মৃগী ব্যাধকে দর্শন করিয়া ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"হে ব্যাধ, তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর"? ব্যাধ উত্তরে বলিল—তোমাকে হত্যা করিয়া তোমার মাংসদ্বারা আমার ক্ষুধার্ত পরিবারবর্গকে ভোজন করাইব"। মৃগী তখন অনন্যোপায় হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কপটতাপূর্বক বলিল—"হে ব্যাধ, আমার এই বৃথা দেহের মাংসদ্বারা যদি কাহারও তৃপ্তি হয়, আমি ধন্য হইব। ইহলোকে পরোপকারদ্বারা যে পুণ্য জন্মে, তাহা শত বর্ষেও বর্ণনা করা যায় না—

"মন্মাংসেন সুখং স্যাদ্বৈ দেহস্যানর্থকারিণঃ।
উপকারকরস্যৈব যৎ পুণ্যং জায়তে ত্বিহ॥
তৎ পুণ্যং শক্যতে নৈব বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
অসারস্য শরীরস্য সাফল্যং মে ভবিষ্যতি॥" শিবপুরাণ—জ্ঞানসংহিতা ৭৪।২৬-২৭

আহা, আজ আমার এই অসার জীবন সফল হইবে। কিন্তু আমার কতকগুলি শিশুসন্তান

রহিয়াছে, আমি তাহাদিগের ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিব, তখন তুমি আমার মাংসদ্বারা স্বয়ং পরিতৃপ্তি লাভ করিও ও তোমার পরিবারবর্গেরও আহারের ব্যবস্থা করিও।” কিন্তু ব্যাধ তাহার কথা বিশ্বাস করিল না এবং উত্তরে বলিল—“তুমি নিশ্চয়ই স্বকীয় প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কথা বলিতেছ, কারণ বিপদে পড়িলে সকলেই মিথ্যা-বাক্য প্রয়োগ করে—

“সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।”

মৃগী নানাবিধ শপথ করিয়া বলিল সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করিবে। তখন ব্যাধ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে গৃহে গমন করিতে অনুমতি দিল। মৃগী জলপান করিয়া আনন্দে প্রস্থান করিল। ব্যাধ মৃগীর অপেক্ষায় রাত্রি জাগরণ করিয়া ঐ বৃক্ষেই অবস্থান করিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গেল।

১১। এদিকে মৃগীর কনিষ্ঠা ভগিনী মৃগীকে যথাকালে গৃহে প্রত্যাগত না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার সন্ধানে বহির্গত হইল এবং জ্যেষ্ঠার অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ জলাশয়ের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাধ তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অঙ্গসঞ্চালনায় পুনরায় পূর্ববৎ বৃক্ষ হইতে পত্র স্খলিত হইল এবং কিয়ৎপরিমাণ জলও ঐ পত্রের সহিত নিম্নস্থ শিবলিঙ্গের উপরে পতিত হইল। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় প্রহরের পূজা নিষ্পন্ন হইল। এই মৃগীও প্রাণভয়ে পূর্ববৎ বাক্য বলিয়া ও শপথদ্বারা ব্যাধের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। ব্যাধ তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া জাগরিত অবস্থায় তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইভাবে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল।

১২। এই দুই মৃগীর স্বামি-মৃগও পত্নীদ্বয়কে অপ্রত্যাগত দেখিয়া, তাহাদিগের অন্বেষণে বহির্গত হইল এবং জলপানার্থ সেই জলাশয়ের নিকট আগমন করিল। ব্যাধ তাহাকে হত্যা কবিবার উপক্রম করিতেই পুনবায় বিল্বপত্র ও জল শিবলিঙ্গের উপর পড়িল এবং ইহাতে তৃতীয় প্রহরের পূজা সমাধা হইল। মৃগটিও মৃগীদ্বয়ের ন্যায় ব্যাধকে বঞ্চনা করিয়া প্রস্থান করিল। ব্যাধ জাগ্রত থাকিয়াই তাহাদিগের প্রত্যাগমন আশায় বিল্ববৃক্ষেই অবস্থান করিতে লাগিল।

১৩। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মৃগ ও তাহার পত্নীদ্বয় পরস্পরে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল এবং তাহারা স্থির করিল যে, যখন তাহারা ব্যাধের নিকট প্রতিজ্ঞাদ্বারা সত্যবদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে পুনরায় ব্যাধের নিকট যাইতেই হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা গমনে উদ্যত হইলে, জ্যেষ্ঠা মৃগী বলিল—আমরা তিনজনেই গমন করিলে বালক বালিকাগণ পিতৃমাতৃহীন হইয়া এই বনে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আমি যখন প্রথমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তখন আমি একাকীই গমন করি, তোমরা উভয়ে সন্তানগণকে লইয়া এখানে থাক”। তখন কনিষ্ঠা মৃগী বলিল—“আমি তোমাদিগের দাসী; অতএব তোমরা থাক, আমিই যাই”। মৃগ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—“তোমরা থাক, আমিই যাই”। মৃগ এই বলিয়া গমনে উদ্যত হইলে মৃগীদ্বয় বলিল—

"তোমার অভাবে আমরা বিধবা হইব; বিধবার জীবনে ধিক্। অতএব আমরাও যাইব"। তখন তাহারা সন্তানদিগকে আশ্বাস দিয়া তিনজনে ব্যাধের নিকটে যাইবার জন্য যাত্রা করিল। মৃগশাবকেরাও, "পিতামাতার যে গতি হইবে, আমাদেরও সেই গতি হইবে" বলিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

১৪। ব্যাধ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া প্রচুর মাংসপ্রাপ্তি-সম্ভাবনায় আনন্দিত হইয়া সহর্ষে ধনুকে বাণ যোজনা করিল ও তাহার শরীরচালনায় পুনরায় চতুর্থবার শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র ও জল পতিত হইল। প্রকারান্তরে ব্যাধের অজ্ঞাতসারে চতুর্থপ্রহরের শিবপূজাও সমাধা হইল। তৎকালে, শিবপূজার ফলে ব্যাধের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া গেল ও তাহার জ্ঞান নির্মলভাব ধারণ করিয়া হিংসাবৃত্তিরহিত হইল। এই অবস্থায় মৃগীদ্বয় ও মৃগ বিল্ববৃক্ষের নিকটবর্তী হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"হে ব্যাধ, তুমি শীঘ্র আমাদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া আমাদিগের দেহের সার্থকতা সম্পাদন কর"।

১৫। তাহাদিগের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া ব্যাধ বিস্ময়াপন্ন হইল এবং শিবানুগ্রহে তাহার জ্ঞানে বিবেকের উদয় হওয়ায় সে চিন্তা করিতে লাগিল—"এই জ্ঞানহীন মৃগগণই ধন্য; কারণ তাহারা স্বকীয় শরীরদ্বারা পরের উপকার করিতে প্রস্তুত! হায়, হায়, আমি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কি করিলাম? আমি আজীবন পরের পীড়ন করিয়া ও নানাবিধ জীব হত্যা করিয়া কেবল নিজের ও কুটুম্ববর্গেরই শরীর পোষণ করিয়াছি! হায়, আমার কি গতি হইবে? আমার এই পাপময় জীবনে ধিক্—

"ধন্যা এতে মৃগাশ্চৈব জ্ঞানহীনাঃ সুসম্মতাঃ।
স্বীয়েনৈব শরীরেণ পরোপকরণে রতাঃ॥
মানুষ্যং জন্ম সংপ্রাপ্য সাধিতং কিং ময়াধুনা।
পরকায়ঞ্চ সংপীড্য শরীরং পোষিতং ময়া॥
কুটুম্বং পোষিতং মেঽন্য পূর্বঞ্চ বহুপীড়িতম্।
কৃত্বা চ পোষিতং সর্বং কা গতিশ্চ ভবিষ্যতি॥
কাং কাং গতিং গমিষ্যামি পাতকং জন্মনঃ কৃতম্।
ইদানীং চিন্তয়াম্যেব ধিক্কারো জীবনে মম॥" শিবপুরাণ-জ্ঞানসংহিতা
৭৪।৮৩-৮৫

এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যাধ বাণসম্বরণ করিল ও মধুর বচনে মৃগগণকে বলিল—"তোমরাই ধন্য; এক্ষণে তোমরা নির্ভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন কর"।

১৬। ব্যাধের এই অভাবনীয় উদার ব্যবহারে এবং উপবাসপরায়ণ হইয়া সে যে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া চারি প্রহরে বিল্বপত্র দিয়া শিবপূজা করিয়াছে তাহার ফলে, ভগবান্ আশুতোষ ব্যাধের উপর সুপ্রসন্ন হইলেন ও ব্যাধকে তাঁহার স্বকীয় মনোহর মূর্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাকে অভিমত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শিবসন্দর্শনে ব্যাধ জীবন্মুক্ততা লাভ

করিয়া মহাদেবের চরণতলে পতিত হইল এবং করজোড়ে নিবেদন করিল—"হে ভগবন্, আপনার দর্শনেই আমার সমস্ত প্রাপ্তব্য আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; আর অন্য বরের প্রয়োজন নাই"। মহাদেব ব্যাধের এই উক্তিতে অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং ব্যাধকে "গুহ" নামে অভিহিত করিয়া, তাহাকে বর প্রদান করিলেন—"তুমি এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ সুখ ও রাজত্ব উপভোগ কর; দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র যখন তোমার গৃহে আগমন করিবেন, তখন তাঁহার পূজা ও তাঁহাতে ভক্তি করিয়া তুমি মুক্তি লাভ করিবে"—

"শিবোঽপি তং গুহং নাম স্থাপয়িত্বা বরং দদাৎ
শৃণু ব্যাধ ইদানীন্ত্বং ভুক্তিং ভুঙ্ক্ষ্ব মনেপ্সিতম্॥
রাজধানীঞ্চ সম্ভুঙ্ক্ষ্ব বংশবৃদ্ধিস্তথা শুভা।
অনপায়িনী ভবেন্নিত্যং শ্লাঘনী দৈবতৈরপি॥
গৃহে রামস্তব ব্যাধ সমায়াস্যত্যসংশয়ঃ।
তৎপূজা তস্য ভক্তিঞ্চ কৃত্বা যাস্যস্যসংশয়ম্।
মুক্তিং সর্বজনৈঃ সদ্ভির্দুর্ল্লভা মুনিসত্তমৈঃ॥" শিবপুরাণ-জ্ঞানসংহিতা
৭৪।৯১-৯৪

এই ব্যাধ বৃত্তান্ত ক্রমে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল এবং অনেকে শিবরাত্রি মাহাত্ম্য অবগত হইয়া ভক্তিভরে শিবরাত্রিব্রত গ্রহণ করিয়া যথাকালে যথানিয়মে শিবপূজায় তৎপর হইলেন এবং তাঁহারা শিবানুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনান্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন। ব্যাধ আহারাভাবে উপবাসী থাকিয়া, শিকারের অপেক্ষায় শিবরাত্রিতে জাগরণ পূর্ব্বক নিজের অজ্ঞাতসারে স্বয়ং পতিত বিল্বপত্রদ্বারা শিবপূজা করিয়া উত্তম পদ লাভ করিয়াছিল; যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিধি অনুসারে শিবচতুর্দশীতে শিবপূজা করিবেন, তাঁহাদিগের যে সদ্গতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

"অজ্ঞানাচ্চ ব্রতং হ্যেতৎ কৃত্বা সাযুজ্যতাং গতঃ।
কিং পুনর্ভক্তিসম্পন্না যান্তি তন্ময়তাং শুভাম্"। শিবপুরাণ-জ্ঞানসংহিতা ৭৪।৯৮

ওঁ নমঃ শিবায়।

সন্ন্যাস-পদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, এম্. এ., স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে 'বৌধায়নধর্মসূত্র' (২. ১০. ১১-৩০), 'বৌধায়ন গৃহ্যশেষসূত্র' (৪. ১৬) ও 'বৈখানসসূত্র' (৯. ৬-৮)—এই গুলিতে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ সম্বন্ধে পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ ও নানাপ্রকার বিধি দৃষ্ট হয়। বৌধায়নের মতে সন্ন্যাসেচ্ছু ব্যক্তি কেশ, শ্মশ্রু, লোম ও নখ ছেদন করিয়া ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু ও পাত্র গ্রহণ করিয়া গ্রামান্তে বা গ্রামসীমান্তে অথবা কোন অগ্ন্যাগারে গমন করিবে। তথায় ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি গব্য মিশ্রিত করিয়া উহা পান করিবে এবং তৎপর উপবাসে রহিবে অথবা কেবল জল পান করিয়া থাকিবে। তৎকালে প্রণবমন্ত্র-সহিত ব্যাহৃতি পাদক্রমে উচ্চারণ করিবে এবং গায়ত্রীর প্রতিপাদ উচ্চারণের পর 'সাবিত্রীং প্রবিশামি' এইরূপ সঙ্কল্প মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। পরিশেষে সম্পূর্ণ গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। ইহাকে সাবিত্রীপ্রবেশ বলা হয়। ব্রহ্ম-প্রবেশের নিমিত্ত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সূর্যাস্তকালে ব্রহ্মান্বাধান নামক হোমের অনুষ্ঠান করিবে[১]। উক্ত অনুষ্ঠানের পর রাত্রিকালে অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া পুনরায় প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করিবে। অনন্তর বৈশ্বানর অগ্নির উদ্দেশ্যে দ্বাদশকপাল সংস্কৃত পুরোডাশ নির্বপন করিবার বিধি আছে। এই প্রসিদ্ধ ইষ্টিই তাহার শেষ অনুষ্ঠান। ইহার পর অগ্নিসকল আত্মায় আরোপ করিয়া গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নির ধূম্রবেষ্টিত বেদির মধ্যে দাঁড়াইয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া"—(বৌধায়ন ২. ১০. ২৭) এই মন্ত্র তিনবার মনে মনে বলিয়া ও তিনবার উচ্চারণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া নিম্নোক্ত ব্রত সঙ্কল্প করিবে— "অভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ" (বৌধায়ন ২. ১০. ২৯)। ইহার পর বাক্‌সংযমের আরম্ভ। তৎকালে দণ্ড, পাত্র ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী কোন জলাশয়ে গমন করিয়া স্নান ও আচমন অন্তে জলমধ্যে ১৬ বার প্রাণায়াম জপ করিবে ও তীরে উঠিয়া সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্রে দেব ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিয়া অবশেষে "ওঁমিতি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বা এষ জ্যোতিঃ" – (বৌধায়ন ২. ১০. ৩৪) এই মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে তর্পণ করিবে। ইহার পর, শত বা সহস্রবার সাবিত্রী জপ করিতে হয়। এবং ইহার পর সন্ন্যাসব্রতচর্যার আরম্ভ।

ব্রত দ্বিবিধ মহাব্রত ও উপব্রত। পঞ্চ মহাব্রত যথা—

'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং মৈথুনস্য চ বর্জনং ত্যাগ ইতি' (বৌধায়ন ২. ১০. ৪১)

অর্থাৎ অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও দান। পাঁচটী উপব্রত বলিতে অক্রোধ

---

১ বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২. ১০. ১৮-১৯ সূত্রে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

গুরুশুশ্রূষা, অপ্রমাদ অর্থাৎ ভ্রান্তি পরিহারে সতর্কতা, শৌচ ও আহারশুদ্ধি। ভৈক্ষচর্যাপ্রসঙ্গে উল্লেখ হয়—ভিক্ষাসংগ্রহ করিবার পর কোন বিশুদ্ধ স্থানে উহা রাখিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া "উদু ত্যম্" (ঋগ্বেদ ১. ৫০. ১) "চিত্রং" (ঋগ্বেদ ১. ১১৫.১) মন্ত্রে আদিত্যকে কিছু নিবেদনকরিবে, পর "ব্রহ্ম জজ্ঞানম্" (তৈ. সং ৪. ২ ৮. ২ = অথর্ববেদ ৪. ১. ১)—এই মন্ত্রে ব্রহ্মকে নিবেদন করিবে। ব্রহ্মাধান করিবার পর গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি (অন্বাহার্য পচনাগ্নি) আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চ অগ্নি প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান—এই পঞ্চপ্রাণবায়ুতে আরোপিত হয়। তাই উক্ত হয়—'পঞ্চ বা এতেঽগ্নয় আত্মস্থাঃ' (বৌধায়ন ২. ১০. ৪৭), এবং ভিক্ষাসামগ্রী ব্রহ্মকে নিবেদন করিতে গিয়া ভিক্ষু আত্মাতেই আহুতি দিয়া থাকে—'আত্মন্যেব জুহোতি' (বৌধায়ন ২. ১০. ৪৮)। ভৈক্ষ্যভোজনের পর আচমনান্তে 'উদ্বয়ং তমসঃ পরি' এই জ্যোতিষ্মতী ঋকে (ঋগ্বেদ ১. ৫০. ১০)[২] আদিত্যের উপাসনা করিতে হয়।

ভিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লিখিত হয়—

অযাচিতমসংক্লিপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া।
আহারমাত্রং ভুঞ্জীত কেবলং প্রাণযাত্রিকম্॥ (বৌধায়ন ২. ১০. ৫২)

অর্থাৎ ভিক্ষায় মাত্র সেই আহার গ্রহণ করিবে যাহা প্রার্থনা করা হয় নাই, যাহার সম্বন্ধে পূর্বে কোন চিন্তা করা হয় নাই, যাহা হঠাৎ আগত। কোনরূপে প্রাণধারণ উপযোগী আহার গ্রহণ করিতে হইবে। এসম্বন্ধে উল্লেখ আছে—'অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ'[৩]

চিত্তপ্রণিধান উদ্দেশ্যে যে ক্ষেত্রে আচার্য উপনিষদ্ রহস্যের ব্যাখ্যা করেন সেক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিধি পালন করিবার আবশ্যকতা আছে। উপনিষদ্ব্যাখ্যা শ্রবণকালে বাক্-সংযত অবস্থায় দিবাভাগে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে এবং রাত্রিকালে বীরাসনে[৪] উপবিষ্ট থাকিতে হইবে। অবশ্য অশক্ত হইলে বাক্‌সংযম, দণ্ডায়মান থাকা বীরাসন—ইত্যাদি তিনটীর যে কোন একটীও করা যাইতে পারে। তৎকালে দিনে তিনবার স্নান এবং তণ্ডুলকণা, তিলপিষ্টক, যবের ক্ষুদ ইত্যাদি ভোজন করিতে হইবে। মৌনব্রত অবলম্বনে সমাহিত মনে শাস্ত্রার্থ শ্রবণ করিবে—ইহাই তাহার ব্রত। তবে তাহার পক্ষে নিম্নোক্তআটটীতে ব্রত হানি হইবে না : যথা—

---

২ মন্ত্রবর্ণ :—'উদ্বয়ং তমসস্ পরিজ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্'। P. V. Kane তাঁহার History Dharmasastra, Vol II Pt II. ৯৫৬ পৃষ্ঠায় এই ঋক্‌কেই জ্যোতিষ্মতী বলিয়াছেন ও Buhler এর মত (S. B. E Vol. 14, পৃ ২৮১) খণ্ডন করিয়াছেন। 'বুহ্লর' (Buhler) 'উদ্বয়ম্' মন্ত্রকে জ্যোতিষ্মতী ঋক্ হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন।

৩ বৌধায়ন, ২. ১০. ৫৩

৪ বীরাসনের সংজ্ঞাঃ—

একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরৌ তু সংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথৈবোরুং বীরাসনমুদাহৃতম্॥

অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ঘৃতং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা[৫] চ গুরোর্বচনমৌষধম্ ॥ (বৌধায়ন ২. ১০. ৬০)

সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্র মন্ত্র জপ করা চলিবে। বারুণ মন্ত্রে (তৈ. সং. ৩. ৪ ১১. ৬) সায়ং সন্ধ্যা এবং মিত্রদেবতা সম্বন্ধী মন্ত্রে (তৈ. সং ৩. ৪. ১১. ৫) প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়। মৌনী হইলেও প্রণব উচ্চারণে জপ করা দরকার এবং তাহাতেই স্বাধ্যায় বা বেদ অধ্যয়ন হইবে। ইহাতে বেদসন্ন্যাস বা বেদের প্রণব ব্যতীত অপর অংশ বর্জন হইবে, কিন্তু বেদমূল যে প্রণব[৬]—তাহা কখনই ত্যাগ করা চলিবে না। কারণ 'প্রণবাত্মকো বেদঃ, প্রণবো ব্রহ্ম' (বৌধায়ন ২. ১০. ৬. ৮-৯) এবং পরমাত্মরূপী ব্রহ্মধ্যানে মোক্ষসাক্ষাৎ-কারই সন্ন্যাস আশ্রমের লক্ষ্য। তাই উক্ত হয় :—'এবং ব্রতো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি হোবাচ প্রজাপতি' :—(বৌধায়ন ২. ১০. ৭১)

জাবাল উপনিষদে (৪) ও মনুস্মৃতিতে (৬. ৩৮) বিধান আছে—প্রাজাপত্য ইষ্টি করিবার পরে সর্ব দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নি আরোপ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে হয়। মনু বলেন—

প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্‌গৃহাৎ ॥ (৬. ৩৮)

শঙ্খসূত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও (৩. ৫৬) অনুরূপ বিধি দৃষ্ট হয়। কূর্মপুরাণ প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয়ী ইষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—'প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা পুনঃ'— (কূর্মপুরাণ ১. ২. ২৮. ৪)। মাধবাচার্য পরাশর-স্মৃতির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কূর্মপুরাণের উক্ত বিধি উল্লেখে বলেন—প্রাজাপত্য ইষ্টি আহিতাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে করণীয়, কারণ ইহাতে বহু প্রকার অগ্নির উল্লেখ আছে। অপর পক্ষে যিনি আহিতাগ্নিক নন তিনি একাগ্নি-সাধ্য আগ্নেয়ীষ্টি করিবেন। কিন্তু ইষ্টি অনুষ্ঠান করিবার পূর্বে দেব ও পিত্রাদি উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিবার উপদেশ আছে। নৃসিংহ পুরাণের নিম্নোক্ত অনুশাসনে ঐরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

দেয়ং পিতৃভ্যো দেবেভ্যঃ স্বপিতৃভ্যোঽপি যত্নতঃ।
দত্ত্বা শ্রাদ্ধমৃষিভ্যশ্চ মনুজেভ্যস্তথাত্মনে ॥

(কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে (১৩. ৫২) এই যোগাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন)।

৫ 'ব্রাহ্মণকাম্যা' অর্থে ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা।

৬ অকারং চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥—মনু. ২. ৭৬ দ্র°।

ইষ্টিং বৈশ্বানরীং কৃত্বা প্রাজাপত্যামথাপি বা।
অগ্নিং স্বাত্মনি সংস্থাপ্য মন্ত্রবৎ প্রব্রজেৎ পুনঃ॥ নৃসিংহপুরাণ ৬০. ৩-৪

সন্ন্যাসগ্রহণের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে 'স্মৃত্যর্থসার' (পৃ° ৯৬—৯৭) 'স্মৃতিমুক্তাফল'[৭] 'যতিধর্মসংগ্রহ'[৮] 'নির্ণয়সিন্ধু' (উত্তরার্ধ ৩য় অধ্যায়)[৯] ও 'ধর্মসিন্ধু' [১০] প্রভৃতি মধ্যযুগের গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। ধর্মসিন্ধুর মতে সূর্যের উত্তরায়ণ গতির সময় সন্ন্যাস গ্রহণ বিধেয়। তবে মুমূর্ষুর পক্ষে দক্ষিণায়ন গতির সময়েও সন্ন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশকামী ব্যক্তি শমদমাদি-গুণসম্পন্ন আচার্যের সহিত তিন মাস কাল বাস করিয়া সন্ন্যাসীর ব্রতচর্যা সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। গায়ত্রী, ও রুদ্রমন্ত্র জপে এবং কুষ্মাণ্ড হোম অনুষ্ঠানে[১১] নিজের শুদ্ধি সম্পাদন করিতে হয়। তাহার পর রিক্তা তিথিতে সঙ্কল্পমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চতুঃকৃচ্ছ্রাত্মক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। পরে একাদশী অথবা দ্বাদশী তিথিতে নিজের ষোড়শ শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডকরণ সম্পন্ন করিবে। ইহার পর অষ্ট শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া সেইদিন বা তৎপর দিন শিখা ধারণ পূর্বক কেশ মুণ্ডন ও নখ বাপন করিবে। স্নানান্তে ব্রাহ্মণদিগকে ও পুত্রদিগকে বস্ত্র ব্যতীত সর্বস্ব দান করিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু ও পাদুকা ধারণ পূর্বক প্রব্রজ্যা করিবে। দণ্ড সম্বন্ধে উল্লেখ হয়—উহা ঊর্দ্ধে মস্তক পর্যন্ত হইবে এবং অঙ্গুলির মত স্থূল হইবে। বস্ত্র গৌরিক রঙে রঞ্জিত করিতে হইবে। পারমহংস্য গ্রহণের সঙ্কল্প উচ্চারণ করিয়া পরে পুণ্যাহবাচন, গণেশপূজা, মাতৃদেবতার পূজা ও নান্দী শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ইত্যাদির নাম জপ করিবে, প্রণব উচ্চারণ করিয়া সমন্ত্রক যব ও দধিমিশ্র দুগ্ধ প্রাশন করিবে। ইহার পর বৌধায়নোক্ত পদ্ধতিতে সাবিত্রী-প্রবেশ করিতে হইবে। পরে সায়ংসন্ধ্যা ও বৈশ্বদেব হোম ও সায়ংহোম করিবার পর রাত্রিজাগরণ করিবে, পর দিবস প্রাতঃকালে বৈশ্বানর অগ্নিকে অন্নাহুতি দিয়া, প্রাণ ইত্যাদি পঞ্চ অগ্নিতে আহুতি দিবে এবং তৎপর বিরাজহোম অনুষ্ঠান করিবে। পরিশেষে আত্মাতে অগ্নি আহুতি দিয়া কৃষ্ণসার চর্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবে। গৃহ হইতে বাহির হইয়া জলাশয়ে গমন করিয়া পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে ব্রতসঙ্কল্প করিবে। আদিত্য ও সকল দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়া সাবিত্রী প্রবেশ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রত সঙ্কল্প করিবে। প্রৈষমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিখা ও উপবীত হস্তে ধরিয়া জলমধ্যে উহা বর্জন

---

৭ পৃ° ১৭৭—৮২।

৮ পৃ° ১০—২২।

৯ পৃ° ৬২৮—৩২।

১০ ৩য় অধ্যায়, উত্তরার্ধ দ্রষ্টব্য।

১১ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (২. ৭) ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিবে। গুরু তাহাকে এই সময় বেদান্তবাক্য শোনাইবেন এবং প্রণব ও পঞ্চীকরণের ১২ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবেন। সন্ন্যাসীর তখন যে নামকরণ হইবে তাহার শেষে তীর্থ বা আশ্রমী—এইরূপ উপসংজ্ঞা দেওয়া হইবে। তৎকালে পর্যঙ্কাশৌচ অনুষ্ঠানের পর গুরু তাঁহার শিষ্যকে যোগপট্ট প্রদান করিবেন। যোগপট্ট দিবার সময় গুরু শিষ্যের মস্তকের উপর একটী বস্ত্র আবৃত করিয়া অন্যান্য যতিগণের সহিত ভাগবদ্গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায় (১১. ১৫—৩৩) উচ্চারণ করিবেন। তৎপর উক্ত শিষ্যকে গৃহী ও অন্যান্য সন্ন্যাসী প্রণাম করিবে। শিষ্য প্রত্যভিবাদন প্রসঙ্গে 'নারায়ণ'—এই শব্দ প্রয়োগ করিবে। গুরুকে উচ্চ আসনে উপবেশন করাইয়া শিষ্যও তখন গুরু ও অন্যান্য সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিবে।১৩

মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ বিস্তারিত অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। আতুর ও মুমূর্ষু ব্যক্তি কেবল মনঃসঙ্কল্পমাত্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে। তৎসম্বন্ধে 'জাবালোপনিষদে' উক্ত হয়—

'যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ' (৫)

'স্মৃতিমুক্তাফল ধৃত' সুমন্তুর বচনে উল্লিখিত হয়—

আতুরাণাঞ্চ সন্ন্যাসে ন বিধির্নৈব চ ক্রিয়া।
ত্রৈপ্রৈষমাত্রং সমুচ্চার্য সন্ন্যাসং তত্র পূরয়েৎ ॥
সন্ন্যস্তোঽহমিতি ব্রূয়াৎ সবনেষু ত্রিষু ক্রমাৎ।
ত্রীন্বারাংস্তু ত্রিলোকাত্মা শুভাশুভবিশুদ্ধয়ে ॥ (স্মৃতিমুক্তাফল—পৃ° ১৭৪)

'যতিধর্ম সংগ্রহ গ্রন্থে'১৪ 'অঙ্গিরস' কৃত অনুরূপ বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে। ধর্মসিন্ধুর (৩, উত্তরার্ধ) মতেও মুমূর্ষুর সন্ন্যাসগ্রহণে অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই। সঙ্কল্প, ত্রৈপ্রৈষমন্ত্রোচ্চারণ, সর্বভূতে অভয় ও অহিংসা ব্রতের স্বীকার—ইহাই যথেষ্ট।

শিখা ও উপবীত বর্জন সম্বন্ধে প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্রে মতদ্বৈধ আছে। সন্ন্যাসাশ্রমীকে সাধারণতঃ চারিশ্রেণীতে ভাগ করা হয়:—কুটীচক বহূদক, হংস ও পরমহংস (মহাভারত অনুশাসনপর্ব, ১৪১. ৮৯ দ্রষ্টব্য)। ইহাদের ব্রতচর্যা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পরমহংসের পক্ষে শিখা ও উপবীত বর্জন শাস্ত্রে সমর্থিত। পরাশরমাধব-ধৃত স্কন্দপুরাণের বচন যথা—

---

১২ পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উ. ৫. ৩. ৪ ও বেদান্তসূত্র ৩. ৪. ২০ এবং শঙ্করাচার্য কৃত 'পঞ্চীকরণ' গ্রন্থ (Bengal Sanskrit Series) দ্রষ্টব্য।

১৩ ধর্মসিন্ধু ৩ অধ্যায় (উত্তরার্ধ) দ্রষ্টব্য।

১৪ পৃ° ২।

পরমহংসস্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালনির্ম্মিতাম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যং কর্ম্ম পরিত্যজেৎ ॥[১৫]

'জাবলোপনিষদ্' বলেন—

'তত্র পরমহংসানাং·· ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জলপবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ'—(৬)

উক্ত উপনিষদে অত্রি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন—যে ব্যক্তি যজ্ঞোপবীত বর্জ্জন করে সে কিরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে পারে ? তদুত্তরে ঋষি বলেন—'ইদমেবাস্য তদ্ যজ্ঞোপবীতং য আত্মা' (৫)—অর্থাৎ আত্মাই তাহার যজ্ঞোপবীত।

'আরুণিকোপনিষদে[১৬]' উক্ত হয়—যজ্ঞোপবীত ভূমিতে অথবা জলে পরিত্যাগ করিবে। 'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের (৩. ৫. ১) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বিশদভাবে আলোচনা পূর্বক যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতেও শিখা ও উপবীত ত্যাগের উপদেশ আছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির (৩.৫৬ শ্লোকের) টীকায় বিশ্বরূপও ইহার আলোচনা করিয়া পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই স্থাপিত করিয়াছেন।

অপর পক্ষে হারীতস্মৃতির বচনে ইহার দোষ দেখান হইয়াছে—

চত্বারোঽপ্যাশ্রমা হ্যেতে সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়ন্তে যদ্যপ্যুগ্রতপোধরাঃ ॥ (হারীত স্মৃ. ১৪. ৬৮)

বৃদ্ধ হারীতও ইহার নিন্দা করিয়াছেন।[১৭] অত্রিস্মৃতির (৩) মতে যজ্ঞোপবীতই দ্বিজগণের মুক্তিসাধন ; অতএব যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উহা বর্জন করে সে নরকগামী।

আবার কেহ কেহ বলেন—উপবীত ত্যাগের অনুকূল বচনগুলি পুরাতন উপবীত ত্যাগ অর্থে প্রযোজ্য। তাই পরাশরমাধব ধৃত বচনে দৃষ্ট হয়—

'নখানি নিকৃত্য পুরাণং বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতং কমণ্ডলুং ত্যক্ত্বা নবং গৃহীত্বা গ্রামং প্রবিশেৎ'।[১৮]

মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের ৩. ৫৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শিখা ও যজ্ঞোপবীত বর্জন সম্বন্ধে বৈকল্পিক বিধান দিয়াছেন। কিন্তু 'জীবন্মুক্তিবিবেক' [১৯] গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের সিদ্ধান্তই

---

১৫ পরাশর মাধব, ২য় খণ্ড পৃ° ১৬৪ দ্র°।

১৬ 'আরুণিকোপনিষদ্' (১-২) দ্র°।

১৭ শিখাযজ্ঞোপবীতাদি ব্রহ্মকর্ম যতিস্ত্যজেৎ।
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতঃ শ্বানোঽভিজায়তে ॥—বৃদ্ধহারীত ৮. ৫৭

১৮ পরাশরমাধব, ২য় খণ্ড পৃ° ১৭১ দ্র°।

১৯ 'জীবন্মুক্তিবিবেক'—৬ পৃষ্ঠা হইতে দ্র°।

গ্রহণ করা হইয়াছে। মাধবাচার্য পরাশর স্মৃতির ব্যাখ্যায় উভয় মত আলোচনা করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন :—একমাত্র পরমহংস সন্ন্যাসীই শিখা ও যজ্ঞোপবীত বর্জন করিতে পারিবে এবং শ্রুতিতেও তদনুকূল অনুশাসন আছে। পূর্বপক্ষখণ্ডন প্রসঙ্গে বিরোধিবচন সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি—

'এতেষাং বচনানাং পরমহংস-ব্যতিরিক্ত-বিষয়ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ। পারমহংস্যং তু বহুষু প্রত্যক্ষশ্রুতিষু পলভ্যমানং কেন প্রদ্বেষ্টুং শক্যম্'—(পরাশরমাধব, ২য় খণ্ড, পৃ° ১৬৫)

সন্ন্যাসীর প্রাত্যহিক আচরণ সম্বন্ধে 'যতিধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থে[২০] বিশেষ বিধি দৃষ্ট হয়। দন্তধাবন, ও শৌচাদি বিষয়ে তাঁহাদিগকে গৃহীর ন্যায় নিয়ম পালন করিতে হইবে—ইহা মনু (৫. ১৩৭), বশিষ্ঠ (৬. ১৯) ও বিষ্ণু (৬০. ২৬) প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের মত। পুরুষোত্তম, ব্যাস ও ভাস্কর শঙ্করের উপাসনাবিধিও দৃষ্ট হয়। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের বিশিষ্ট নিয়ম পালন করিতে হইত। হারীতের মতে সন্ন্যাসী দেবতা ও অপর যতিকে নমস্কার করিবে, কিন্তু গৃহস্থকে কখনও নমস্কার করিবেনা।[২১] যদি কেহ যতিকে প্রণাম করে তাহা হইলে তাহাকে কোন আশিষ প্রদান করিবে না, কেবল 'নারায়ণ' এই শব্দ উচ্চারণ করিবে।[২২]

মুমূর্ষু অবস্থায়ও যদি কেহ সন্ন্যাসসঙ্কল্প করে তাহা হইলে তাহার মৃত্যুতে দাহ করা উচিত নহে। তাহার দেহ মৃত্তিকায় সমাধিস্থ করাই শাস্ত্রের বিধান। যতিদিগের মৃত্যুতে মরণাশৌচের বিধান নাই। অত্রি বলেন—

ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈবং মন্ত্রে পূর্বকৃতে তথা।
যজ্ঞে বিবাহকালে চ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ (৯৭)।

মৃত্যুর পর একাদশ দিবসে কেবল পার্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয় কিন্তু যতির মৃত্যুতে অন্য কোন প্রকার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই (অপরার্ক পৃ° ৫৩৮ দ্র°)। পুত্র অথবা সপিণ্ডাদির মৃত্যু বশতঃ সন্ন্যাসীর কোন অশৌচ স্বীকার করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না, তবে মাতা বা পিতার মৃত্যু হইলে মহাগুরুনিপাত বশতঃ সদ্যঃশৌচ পালন করিতে হয় এবং সে স্থলে স্নানমাত্র শুদ্ধি ('সন্ন্যাসপদ্ধতি' পুথি—Deccan College Catalogue, No 119 of 1882-83)[২৩]।

---

২০ 'যতিধর্মসংগ্রহ'—পৃ° ৯৫ হইতে দ্র°।

২১ স্বধর্মস্থান্ যতীন্ বৃদ্ধান্ দেবাংশ্চ প্রণমেদ্ যতিঃ……সাধুবৃত্তং গৃহস্থাগ্র্যং ন নমস্যেৎ ক্বচিদ্ যতিঃ।—'স্মৃতিমুক্তাফল' ধৃত (পৃ° ২০৬) হারীতবচন।

২২ প্রণতং ন যতির্ব্রূয়াদাশিষ্যং ব্যাসশাসনাৎ।
নারায়ণেতি ব্রূয়াৎ প্রণতায় বিবৃদ্ধয়ে ॥ – অত্রি (স্মৃতিমুক্তাফলধৃত পৃ° ২০৬)।

২৩ Folio 51 a : ন স্নানমাচরেদ্ভিক্ষুঃ পুত্রাদিনিধনে শ্রুতে।
পিতৃমাতৃক্ষয়ং শ্রুত্বা স্নানাৎ শুধ্যতি সাম্বরম্ ॥
শঙ্খসংহিতা (১৫. ২১) দ্র°।

প্রাচীন সাহিত্যে ভারতবর্ষের আকৃতি ও আয়তন

শ্রীনলিনাক্ষ সেনগুপ্ত, এম্. এ.

আজকাল আমরা একখানি মানচিত্র খুলিলেই পৃথিবীর এবং তাহার অন্তর্ভূত মহাদেশ ও দেশসমূহের আয়তন ও আকৃতি জানিতে পারি। আমাদের এই সহজলভ্য জ্ঞানের মূলে যে কত শতাব্দীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিহিত আছে তাহা আমরা একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারি। পুরাকালে যখন যানবাহনের সুবিধা ছিল না, তখন মানুষের পক্ষে স্বীয় বাসস্থানের দূরবর্তী অঞ্চলের বৃত্তান্ত জানা যে কত দুষ্কর ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহা সত্ত্বেও প্রাচীন মনীষীবা লোকপরম্পবায় যতটুকু বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাহার সহিত স্ব স্ব কল্পনানুসারে যৎকিঞ্চিৎ যোগ করিয়া একটী অখণ্ড বিবরণ গড়িয়া তুলিতে প্রযাস পাইতেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। তাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি অনেকস্থলে কাল্পনিক মনে হইলেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ এইসব কল্পনামিশ্রিত তথ্যগুলিই ভারতের প্রাচীন মনীষিদের জ্ঞান-সাধনার প্রকৃষ্ট নিদান এবং তাঁহাদের ভাবধারা ও সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিচার করিবার শ্রেষ্ঠ উপাদান। ভারতবর্ষের আকৃতি ও আয়তন সম্বন্ধে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে পুরাণগুলিই আমাদের প্রধান উপাদান।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনানুসারে ভারতবর্ষ "চতুঃসংস্থানসংস্থিত"। ইহার পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ধনুকের গুণের ন্যায় অবস্থিত১। আবার সেই পুরাণেরই এবং বৃহৎসংহিতার কূর্মবিভাগ অধ্যায়ে ভারতবর্ষ কূর্মরূপী২ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই কূর্মসদৃশী আকৃতি যথার্থ না হইলেও, বৃহৎসংহিতায় নির্দিষ্ট, ভারতবর্ষের নয়টী রাষ্ট্রীয় বিভাগ যে অনেকাংশে অবিকল সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের স্থলান্তরে ভারতবর্ষকে নয়টী পরস্পর অগম্য দ্বীপের সমষ্টিরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে৩। এই দ্বীপগুলির নাম যথাক্রমে, ইন্দ্র, কশেরুমান্, তাম্রপর্ণ বা তাম্রবর্ণ,

---

১ এতত্তু ভারতং বর্ষং চতুঃসংস্থানসংস্থিতম্।
দক্ষিণাপরতোহ্যস্য পূর্বেণ চ মহোদধিঃ।
হিমবানুত্তরেণাস্য কার্মুকস্য যথা গুণাঃ॥ মার্কণ্ডেয় ৫৭. ৫৯.

২ প্রাঙ্মুখো ভগবান্ দেবঃ কূর্মরূপী ব্যবস্থিতঃ
আক্রম্য ভারতং বর্ষং নবভেদমিদং দ্বিজ॥ মার্কণ্ডেয় ৫৮. ৪

৩ সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম॥ মার্কণ্ডেয়, ৫৭. ৫,

গভস্তিমান্, নাগ, সৌম্য (পুরাণান্তরে কটাহ), গান্ধর্ব (পুরাণান্তরে সিংহল), বারুণ এবং কুমারী বা কুমারিকা৪। এই দ্বীপগুলির কয়েকটীকে নির্দিষ্ট করিতে পারা গিয়াছে এবং কয়েকটীর অবস্থিতি এখনও রহস্যময়। ইহাদের বিশদ আলোচনা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। ইহাদিগকে যে দ্বীপ বলা হইয়াছে ভারতবর্ষের আকৃতি বিচারে তাহাই আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বর্ণনাকে অনেকেই নিছক কল্পনা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয় তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। এখানে দুইটী বিষয়ের প্রতি আমাদের অবহিত থাকা দরকার। প্রথমটী দ্বীপশব্দের প্রকৃতিগত অর্থ এবং দ্বিতীয়টী পরস্পর "অগম্য" এই শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। "দ্বিরাপত্বাৎ স্মৃতো দ্বীপঃ"—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত দ্বীপ শব্দের এই মৌলিক অর্থ হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, পুরাকালে যে-ভূখণ্ডের দুইপার্শ্বে জল তাহাকেই দ্বীপ বলা হইত। এই প্রচলিত অর্থে উক্ত ভূভাগগুলির অনেকগুলিকেই দ্বীপ বলা চলে। উহাদের মধ্যে যেটী নবম, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা হইতে জানা যায় যে তাহার নাম কুমারিকাদ্বীপ৫। তাহাই হইল প্রকৃত ভারতবর্ষ। এই কুমারীদ্বীপ মার্কণ্ডেয় পুরাণে "সাগরসংবৃত" অর্থাৎ সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া বর্ণিত আছে। "সমস্ত কুলপর্বতই কুমারিকা দ্বীপে অবস্থিত"৫—রাজশেখরের এই উক্তি যদি আমরা ইহার সহিত একত্র করিয়া পাঠ করি এবং মলয়পর্বতশ্রেণীকে যদি কাবেরী নদীর দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণাংশের সহিত সমীকৃত করি (যাহা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন), তাহা হইলে কুমারিকা অন্তরীপ তিনদিকে যে সাগরদ্বারা বেষ্টিত তাহা সুস্পষ্ট। ইন্দ্রদ্বীপকে মহামহোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী ব্রহ্মদেশের সহিত সমীকৃত করিয়াছেন। কুমারিকা দ্বীপের ন্যায় ব্রহ্মদেশেরও প্রায় তিনদিকেই জল। নাগদ্বীপকে বর্তমান জাফ্‌না অন্তরীপের সহিত অনেকে সমীকৃত করেন।

সিংহল যে একটী দ্বীপ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং দেখা গেল যে ইহাদের অনেককেই দ্বীপ বলা চলে। তাহারা কী বাস্তবিকই পরস্পরের অগম্য ছিল? যখনকার কথা বলা হইতেছে তখন একস্থান হইতে অন্যত্র বিশেষতঃ জলপথে গমনাগমন দুষ্কর ছিল। কুমারিকা দ্বীপ যেরূপ 'সাগরসংবৃত', অজ্ঞাত বিভাগগুলিকেও তাঁহারা উপমিতিদ্বারা কুমারিকার মত দ্বীপ বলিয়াই মনে করিতেন। যাহাই হউক মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত ভারতের এই

---

৪ ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমাংস্তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বো বারুণস্তথা।
অয়স্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ মার্কণ্ডেয়, ৫৭. ৬

৫ কুমারীদ্বীপশ্চায়ং নবমঃ...অত্র চ কুমারীদ্বীপে
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ
মহেন্দ্রসহ্যমলয়াঃ সপ্তৈতে কুলপর্বতাঃ ॥ কাব্যমীমাংসা, দেশবিভাগ।

সংস্থান মোটেই উপেক্ষণীয় নহে এবং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে ভারতবর্ষ বলিতে শুধু প্রকৃত ভারতখণ্ড নয়, ব্রহ্মদেশ, মলয় অন্তরীপ, সিংহল এবং ছোট বড় আরও অনেক দ্বীপকে বুঝাইত।

মৎস্যপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এবং মহাভারতে জম্বুদ্বীপের উত্তরতম বর্ষ (উত্তরকুরু) ও দক্ষিণতম বর্ষ (ভারতবর্ষ) ধনুকের আকারের ন্যায়—এইরূপ বর্ণনা আছে।[৬] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠও তাহাই সমর্থন করিয়াছেন।[৭] ভারতবর্ষের আকৃতি বিষয়ে তাঁহাদের এই জ্ঞান ভ্রমাত্মক। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও অনুরূপ ভুল করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষকে উত্তরদিকে ব্যাসযুক্ত একটী অর্ধচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[৮] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ একস্থলে ভারতবর্ষকে ত্রিকোণাকার বলিয়া গিয়াছেন[৯]। চীনদেশীয় ফা-কাই-লিপংটোর বর্ণানুসারে ভারতবর্ষ উত্তরদিকে ক্রমশঃ প্রশস্ত এবং দক্ষিণদিকে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে[১০]। টলেমির বিবরণানুযায়ী যদি ভারতবর্ষের মানচিত্র অঙ্কন করা যায় তাহা আমাদের কাছে হাস্যকর বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার গণনায়, অন্তরীপের কূলদ্বয়টী মিলিয়া কুমারিকায় যে একটী সূক্ষ্ম কোণ উৎপন্ন করিয়াছে তাহার কোন চিহ্নই নাই। তাহার পরিবর্তে তিনি সিন্ধুনদীর মোহানা হইতে গঙ্গানদীর মোহানা পর্যন্ত একটী সরলরেখাকে ভারতের দক্ষিণের সীমানারূপে কল্পনা করিয়াছেন।

নীলকণ্ঠের টীকায় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জম্বুদ্বীপ 'চতুর্দলকমলাকার' বলিয়া বর্ণিত আছে।[১১] পদ্মের কর্ণিকাটী মেরু এবং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের পত্রচতুষ্টয় যথাক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তরকুরু ও ভারতবর্ষ এই বর্ষচতুষ্টয়ের উপমান। তাহা হইলে ভারতবর্ষের আকৃতি পদ্মপত্র সদৃশ হইল। এবং ইহা অনেকাংশে ঠিক। প্রথমেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের যে চতুঃসংস্থান সংস্থিত বর্ণনাটীর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে।

মনুর ধর্মশাস্ত্রে শুধু আর্যাবর্তের অবস্থান ও চতুঃসীমার উল্লেখ আছে।[১২] তাহাতে

---

৬ ধনুঃসংস্থে চ বিজ্ঞেয়ে দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে। মৎস্যপুরাণ, ১১৩. ৩২.

৭ ভারতবর্ষস্য ধনুকাকাকারত্বম্।—টীকা (মহাভারত ৬. ৬. ৩-৫)

৮ Watters Yuan Chwang, Vol. 1, P, 140.

৯ ভারতবর্ষস্ত্রিকোণঃ—টীকা মহাভারতে ৬. ৬. ৩-৫

১০ "This country in shape is narrow towards the south and broad towards north." (Cunn, Geogrophy P. 12).

১১ জম্বুদ্বীপশ্চতুর্দলকমলাকারঃ—নীলকণ্ঠ (মহাভারত ৬. ৬. ৩-৫)

১২ আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদুর্বুধাঃ ॥ মনু. ২, ২২,

বিন্ধ্যের দক্ষিণস্থ ভারতের কোন স্থান নাই। কুমার সম্ভবের ১. ১ শ্লোক হইতে এইটুকু জানা যায় যে উত্তরে হিমালয় পর্বতরাজি এবং তাহা পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রের তোয়রাশি কর্তৃক ধৌত হইতেছে।[১৩] রঘুবংশের চতুর্থসর্গের রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনী পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অবস্থান সম্বন্ধে কালিদাসের অভিমত জানা যায়। রঘুর সৈন্যগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া প্রথমে বঙ্গদেশ জয় করিল। তাহার পর কপিশা (মেদিনীপুরান্তর্গত কাঁসাই) অতিক্রম করিয়া কলিঙ্গদেশ জয়ের পর সমুদ্রের উপকূলভাগ দিয়া দক্ষিণে যাইতে লাগিল। কাবেরী নদী অতিক্রম করিয়া তাহারা ক্রমান্বয়ে পাণ্ডু ও কেরলদেশ জয় করিল। তৎপরে পশ্চিমসমুদ্রোপকূলস্থ পাশ্চাত্য রাজগণকে পরাভূত করিয়া পারসীকদের রাজ্যে উপনীত হইল। পারসীক ও যবনেরা রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিল। তাহার পরে বংক্ষুনদীর (oxus) উপকূলে হূণদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে হূণেরা পরাজিত হইল। অনন্তর কম্বোজ জয় করিয়া রঘুর সৈন্যগণ হিমালয়ের পার্বত্যরাজগণকে পরাজিত করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌ ও কামরূপ স্বীয় বশে আনিলেন। রঘুর এই দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় যেন কেহ আমাদের সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্রটী তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং রঘুর দিগ্বিজয়কে কল্পনামূলক মনে করিলেও কালিদাসের যুগে[১৪] ভারতবর্ষের অবস্থান ও তাহার আভ্যন্তরীণ বিভাগ সমূহের সংস্থান সম্বন্ধে যে লেখকের একটী স্পষ্ট ধারণা ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কোন দেশের আকৃতি নির্দেশ করিতে গেলে নির্ভুল জরিপের প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিব্যতিরেকে তাহা সম্ভব হয় না। তাই ভারতবর্ষের প্রকৃতরূপ তৎকালীন জনসাধারণের অজ্ঞাত থাকা মোটেই বিস্ময়কর নহে। এবং তদবস্থায় আকৃতি বর্ণনায় অনৈক্য থাকাও অস্বাভাবিক নহে। সভ্যতার প্রথমাবস্থায় সর্বদেশেই এইরূপ দেখা যায়। এই বিচিত্র মত গুলির মধ্যে এক্ষণে যেগুলিকে অধিক বলিয়া বুঝিতে পারি সেগুলিরও অনেক মূল্য আছে; কারণ জ্ঞানের সাধনায় মানুষ অজ্ঞাত বিষয় হইতেই জ্ঞেয়ের সন্ধান পায়।

---

১৩ অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ কুমারসম্ভব ১. ১.

১৪ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্ত)

পণ্ডিত **শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ**

(৯) নির্ণয়

নির্ণয়—(কোনও ধর্মীতে) অর্থের—কোন ধর্মের অবধারণ নির্ণয়। যেমন—বহ্নি উষ্ণ (বহ্নিঃ উষ্ণঃ) এইরূপ অবধারণ নির্ণয়। ইহা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানবিশেষ সুতরাং গুণে অন্তর্ভূত[১]।

(১০—১২) বাদ, জল্প, বিতণ্ডা

তত্ত্বনিশ্চয় কিংবা জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে-সমুদায় বাক্য প্রয়োগ করেন উহাকে কথা বলে। বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা কথারই বিভাগ-মাত্র। কথা শব্দবিশেষ অতএব এই তিনটী পদার্থ গুণে অন্তর্ভূত[২]।

বাদ—বীতরাগ অর্থাৎ জয় পরাজয়ের অভিপ্রায় শূন্য হইয়া কেবল তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য যে বিচার হয় তাহার নাম বাদ। ইহার উদাহরণ—গুরু ও শিষ্যের শাস্ত্রালাপ।

জল্প—যে বিচারে জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বাদী ও প্রতিবাদী স্বমতের সমর্থন ও পরমত খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন তাহার নাম জল্প।

বিতণ্ডা—যে বিচারে প্রতিবাদী বিজিগীষু হইয়া কেবল পরমতে দোষ প্রদর্শনই করেন স্বপক্ষ সমর্থন করেন-না, ঐপ্রকার বিচারের নাম বিতণ্ডা।

---

১. ১০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ' ১।১।৪১ ন্যায়সূত্র। এই লক্ষণে 'বিমৃশ্য' শব্দ আছে। উহার অর্থ—সংশয়ের পরে। মহর্ষির উক্ত পদ প্রয়োগের দ্বারা মনে হয় যে, সকল প্রকার নির্ণয়েরই পূর্বে সংশয় আবশ্যক। কিন্তু তাহা নহে। বাদী ও প্রতিবাদী জয় পরাজয় উদ্দেশ্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কথার আরম্ভে মধ্যস্থ বিপ্রতিপত্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সংশয় প্রদর্শন করিবেন। তদ্দ্বারা কোন্ ধর্মীতে কোন্ পক্ষ কিরূপ ধর্ম সাধন করিবেন তাহা স্পষ্ট হইবে। পরে বাদী ও প্রতিবাদী স্ব স্ব অভিমত সংশয়কোটি অবলম্বন করিয়া ন্যায়প্রয়োগ করিলে একতর কোটির নিশ্চয় হইবে। এইভাবে নির্ণয়ে সংশয়ের উপযোগিতা প্রদর্শন করাই এস্থলে মহর্ষির অভিপ্রায়। অতএব প্রত্যক্ষ কিংবা স্বার্থানুমানের স্থলে নির্ণয়ের জন্য সংশয় নিষ্প্রয়োজন। এমন কি শাস্ত্র এবং বাদ বিচারেও সংশয়ের আবশ্যকতা নাই।

২. ৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। অতিদীর্ঘ এজন্য বাদ প্রভৃতির সূত্রোল্লেখ সম্ভব হইল না। বিচারে উচ্ছৃঙ্খলতা বারণের জন্য প্রাচীনেরা বহুবিধ নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। উহার দ্বারা প্রাচীনকালের সামাজিক অবস্থা জানা যায়। কৌতুহলী পাঠক অবয়ব বাদ জল্প বিতণ্ডা প্রভৃতির বিবরণে উহার অনুসন্ধান পাইবেন। ন্যায়দর্শন (বং সাঃ প. প্রকাশিত) ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড ৩৩৩পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১৩) হেত্বাভাস

হেত্বাভাস—'হেত্বাভাস' শব্দ "দুষ্ট হেতু" এবং "হেতুর দোষ" এই দুই অর্থে প্রসিদ্ধ। সূত্রকার 'দুষ্টহেতু' অর্থেই হেত্বাভাস শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন১।

দুষ্ট হেতু—যাহা 'হেতু'রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ ন্যায়২ প্রয়োগকালে যথার্থ হেতুর ন্যায় উল্লিখিত হওয়ায় যাহা পঞ্চবিধ রূপ৩ বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু সত্যই পঞ্চরূপ বিশিষ্ট নহে তাহা দুষ্টহেতু। উক্ত সপ্ত পদার্থের প্রত্যেকটি অনুমিতি বিশেষে হেতু হইতে পারে। অতএব হেত্বাভাস যথাসম্ভব সপ্তপদার্থের অন্তর্গত৪।

'হেতুর দোষ' এই অর্থেও হেত্বাভাস উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত। বিশেষ এই যে— এই হেত্বাভাস সপ্তবিধপদার্থের অন্তর্গত কোনও একটী অখণ্ড পদার্থস্বরূপ নহে কিন্তু উহাতে অন্তর্ভূত একাধিক পদার্থবিশেষ্য-বিশেষণভাবাপন্ন হইলে সেই প্রকার বিশিষ্টপদার্থই হেত্বাভাস বা হেতুদোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দুষ্টহেতু পঞ্চবিধ৫ —ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ এবং সৎপ্রতিপক্ষ। তদনুসারে দুষ্ট হেতুও সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, বাধিত এবং সৎপ্রতিপক্ষ এইরূপে পাঁচ প্রকার।

জলহ্রদঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ—(অর্থাৎ জলহ্রদে ধূম আছে যেহেতু উহাতে বহ্নি আছে) এইরূপে ন্যায়প্রয়োগ করিলে 'বহ্নি'স্বরূপ হেতু ব্যভিচার, অসিদ্ধি, বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষ এই চতুর্বিধ দোষে দুষ্ট হয়৬।

এইস্থলে ব্যভিচার—ধূমাভাববদ্‌বৃত্তি-বহ্নি (ধূমাভাবের অধিকরণে—ধূমশূন্যস্থানে = উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ডে অবস্থিত বহ্নি) অথবা বহ্নিমদ্‌বৃত্তি-ধূমাভাব।

এই দ্বিবিধ ব্যভিচারের প্রথমটি—ধূমাভাববদ্‌বৃত্তি বহ্নি। ইহার বিশেষ্য—বহ্নি তেজঃ-পদার্থবিশেষ অতএব দ্রব্য। ইহার বিশেষণভাগে ধূম, অভাব, অধিকরণ ('অভাববৎ' এই মতুপ্ প্রত্যয়ের অর্থ) এবং বৃত্তিত্ব এই চতুর্বিধ পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। উহার মধ্যে ধূম

---

১. "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীতা হেত্বাভাসাঃ" ১।২।৪ ন্যায়সূত্র।

২. ১৪২ পৃঃ অবয়ব নিরূপণ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩. এইস্থানে 'রূপ' শব্দের অর্থ ধর্ম বা আধেয়, ৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পঞ্চ রূপ—পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। ইহাদিগের বিবরণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

৪. ১৩৭পৃঃ অনুমানের অন্তর্ভাব টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৫. ৩।১।১৫ বৈশেষিকসূত্রে ত্রিবিধ হেত্বাভাসের উল্লেখ দেখা যায়—অপ্রসিদ্ধ বা অসিদ্ধ, অসন্ অর্থাৎ বিরুদ্ধ, ও সন্দিগ্ধ-সব্যভিচার। প্রশস্তপাদাচার্য্যের মতে হেত্বাভাস চতুর্বিধ উক্ত ত্রিবিধ এবং অনধ্যবসিত। সপ্তপদার্থীমতে হেত্বাভাস ছয় প্রকার—গৌতমোক্ত পঞ্চবিধ এবং অনধ্যবসিত। প্রাচীন মতবিশেষে অপ্রযোজক এবং সিদ্ধসাধন নামে আরও দ্বিবিধ হেত্বাভাস স্বীকৃত হইয়াছে।

৬. দুষ্ট হেতু হেত্বাভাস এইমতেও এই হেতু—বহ্নি তেজঃস্বরূপ অতএব দ্রব্যে অন্তর্ভূত।

পার্থিব দ্রব্যে, অভাব সপ্তম পদার্থে, উহার (ধূমাভাবের) অধিকরণ—বস্তুতঃ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড পার্থিব দ্রব্যে, এবং উক্ত অধিকরণের বৃত্তিত্ব—সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা স্থূলদৃষ্টিতে সংযোগ-স্বরূপ হওয়ায় গুণে অন্তর্ভূত হইতেছে। এই স্থলে শেষে নির্দিষ্ট ব্যভিচারেও কোন নূতন পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই। অতএব এই স্থানের সকল পদার্থই পূর্ব স্বীকৃত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত থাকায় ব্যভিচার স্বরূপ হেত্বাভাসও সপ্ত পদার্থের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। দুষ্ট—দোষবিশিষ্ট। সুতরাং উক্ত স্থলে ধূমাভাববদ্‌বৃত্তি-বহ্নি এবং বহ্নিমদ্‌বৃত্তিধূমাভাববিশিষ্ট-বহ্নি সব্যভিচার।

ঐ স্থলের তৃতীয়[১] হেত্বাভাস অসিদ্ধি। উহা "বহ্ন্যভাববিশিষ্ট জলহ্রদ" অথবা "জল-হ্রদস্থ বহ্ন্যভাব"। সুতরাং বহ্ন্যভাবাশ্রয়জলহ্রদবিশিষ্ট-বহ্নি এবং জলহ্রদস্থ-বহ্ন্যভাববিশিষ্ট বহ্নি অসিদ্ধ। এই ক্ষেত্রে বাধ—ধূমাভাববিশিষ্ট জলহ্রদ ও জলহ্রদবৃত্তিধূমাভাব। অতএব 'ধূমাভাবাশ্রয় জলহ্রদবিশিষ্ট বহ্নি' এবং 'জলহ্রদস্থ ধূমাভাববিশিষ্ট বহ্নি' বাধিত।

এই সমস্ত হেত্বাভাসের মধ্যেও কোন নূতন পদার্থ নাই; বহ্নি, বহ্ন্যভাব, ধূম, ধূমাভাব জলহ্রদ সমস্তই সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত।

উক্ত প্রকারে সকল হেতুদোষই স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত হয় বলিয়া কোনরূপ হেত্বাভাস দ্বারা সপ্তপদার্থের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় নাই[২]।

ছল ও জাতি

পূর্বোক্ত কথাত্রয়ে অর্থাৎ বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডায় ছল এবং জাতির অবতারণা হয়। বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদী ও প্রতিবাদী পরস্পরের বাক্যে দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, উহারই প্রকারবিশেষ ছল ও জাতি নামে অভিহিত হয়। ফলতঃ, উল্লিখিত দোষোদ্ভাবন উহাদিগের বাক্যেরই অংশ সুতরাং শব্দ স্বরূপ। অতএব ছলও জাতি গুণে অন্তর্ভূত।

(১৪) ছল

ছল—বিপক্ষীয় বাক্যের অনুচিত অর্থ কল্পনাপূর্বক দোষোদ্ভাবনের নাম ছল। যথা—বাদী বলিল—নেপাল হইতে আগত এই ব্যক্তির নব কম্বল আছে। ("নব" শব্দে "নূতন" অর্থ বুঝান অভিপ্রেত)

প্রতিবাদী উক্ত বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিল—

এই ব্যক্তির নয়খানা কম্বল কোথা হইতে আসিবে? দ্বিতীয় পক্ষের এই উত্তর ছল।

প্রথম পক্ষ 'নব'শব্দের স্থানে "নবন্" শব্দই প্রয়োগ করিয়াছেন এইরূপ মনে করিয়া

---

১. দ্বিতীয় হেতুদোষ—বিরোধের তুলনায় অসিদ্ধি বুঝা সহজ এজন্য বিরোধ উপেক্ষিত হইল।

২. হেত্বাভাস অতিরিক্ত পদার্থ নহে ইহা দেখাইবার জন্য এইস্থানে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল। অষ্টম অধ্যায়ে এই বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত প্রকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর কথায় কোনও অসঙ্গতি নাই তথাপি প্রতিবাদী জবরদস্তি পূর্বক প্রথম পক্ষের স্কন্ধে দোষ চাপাইতেছেন এজন্য ছল অসৎ অর্থাৎ অসাধু উত্তর১।

(১৫) জাতি

জাতি—ছলের ন্যায় জাতি ও অসদুত্তর। ব্যাপ্তির অপেক্ষা না রাখিয়া কেবলমাত্র সাধর্ম্য কিংবা বৈধর্ম্য অবলম্বনে যে দোষোদ্ভাবন হয় তাহা জাতি২। 'প্রতিষেধ' জাতির নামান্তর।

জাতি চব্বিশ প্রকার—(১) সাধর্ম্যসমা (২) বৈধর্ম্যসমা (৩) উৎকর্ষসমা (৪) অপকর্ষসমা (৫) বর্ণ্যসমা (৬) অবর্ণ্যসমা (৭) বিকল্পসমা (৮) সাধ্যসমা (৯) প্রাপ্তিসমা (১০) অপ্রাপ্তিসমা (১১) প্রসঙ্গসমা (১২) প্রতিদৃষ্টান্তসমা (১৩) অনুৎপত্তিসমা (১৪) সংশয়সমা (১৫) প্রকরণসমা (১৬) অহেতুসমা (১৭) অর্থাপত্তিসমা (১৮) অবিশেষসমা (১৯) উপপত্তিসমা (২০) উপলব্ধিসমা (২১) অনুপলব্ধিসমা (২২) অনিত্যসমা (২৩) নিত্যসমা (২৪) কার্যসমা।

সাধর্ম্যসমা জাতির উদাহরণ—

কোন ব্যক্তি বলিলেন—শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ (শব্দ অনিত্য যে-হেতু উহাতে 'কার্যত্ব' অর্থাৎ উৎপন্নত্ব-ধর্ম আছে, যেমন ঘট)। যে যে পদার্থ উৎপন্ন তাহা সকলই অনিত্য সুতরাং কার্যত্ব-হেতু অনিত্যত্ব রূপ সাধ্যের ব্যাপ্য। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মতে ঘটে কার্যত্ব (হেতু) এবং অনিত্যত্ব (সাধ্য) আছে সুতরাং বাদী ব্যাপ্তি অবলম্বন করিয়াই 'ঘট'কে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই মত স্থলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দে যেমন ঘটের সাধর্ম্য কার্যত্ব আছে তদ্রূপ আকাশের সাধর্ম্য অমূর্তত্ব (ক্ষুদ্র পরিমাণ শূন্যত্ব, পরিমাণ দ্রব্যেরই ধর্ম, শব্দ গুণের অন্তর্গত এজন্য উহাতে কোন পরিমাণই নাই) থাকায় শব্দ আকাশের ন্যায় নিত্য (শব্দঃ নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ আকাশবৎ) হউক। ঘটের রূপ অমূর্ত কিন্তু উহা নিত্য নহে অতএব অমূর্তত্ব (হেতু) নিত্যত্বের (সাধ্যের) ব্যাপ্য নহে, তথাপি প্রতিবাদী কেবলমাত্র আকাশের সাধর্ম্য অবলম্বনে দোষ উদ্ভাবন করিতেছেন। অতএব প্রতিবাদীর এই উত্তর **সাধর্ম্যসমা** জাতি।

বৈধর্ম্য সমা জাতি—

বাদী পূর্ববৎ "শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ" এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা শব্দে অনিত্যত্ব স্থাপন করিলে যদি প্রতিবাদী বলেন—শব্দে যেমন অনিত্য ঘটের সাধর্ম "কার্যত্ব" আছে তদ্রূপ

---

১. 'বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং' ১।২।১০ ন্যায়সূত্র। ন্যায়সূত্রে বলা হইয়াছে ছল ত্রিবিধ—বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল এবং উপচারচ্ছল। উল্লিখিত উদাহরণটী বাক্‌ছলের। অন্য দুইটীর উদাহরণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

২. "সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ" ১।২।১৮ ন্যায়সূত্র। সপ্ত পদার্থের মধ্যে সামান্য-নিরূপণে যে 'জাতি' আছে তাহা এই ১৫শ পদার্থ জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাপ্তি অষ্টম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

উহার (ঘটের) বৈধর্ম্য অমূর্ত্তত্বও আছে। সুতরাং শব্দে মূর্ত (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণ যুক্ত) ঘটের বিরুদ্ধ ধর্ম—অমূর্তত্ব যদি সম্ভবপর হয় তবে অনিত্যত্বের বিপরীত ধর্ম—নিত্যত্বই বা থাকিবে না কেন? অর্থাৎ শব্দ নিত্য হউক। (এই স্থানের প্রয়োগ—শব্দঃ নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ)

প্রতিবাদীর এই উক্তি বৈধর্ম্যসমা জাতি। এই জাতি অতিদুরূহ। জিজ্ঞাসুগণ ভাষ্য বার্তিকাদি গ্রন্থে এবং তার্কিক রক্ষায় ইহার বিবরণ পাইবেন[১]।

(১৬) নিগ্রহস্থান

নিগ্রহস্থান—যে সকল উপায় দ্বারা বিচার্য বিষয়ে বাদী অথবা প্রতিবাদীর অজ্ঞতা অর্থাৎ সন্দেহ কিংবা বিপরীত নিশ্চয় প্রকাশ পায় তাহা নিগ্রহস্থান[২]।

নিগ্রহ স্থান দ্বাবিংশ প্রকার—(১) প্রতিজ্ঞাহানি (২) প্রতিজ্ঞান্তর (৩) প্রতিজ্ঞাবিরোধ (৪) প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস (৫) হেত্বান্তর (৬) অর্থান্তর (৭) নিরর্থক (৮) অবিজ্ঞাতার্থ (৯) অপার্থক (১০) অপ্রাপ্তকাল (১১) ন্যূন (১২) অধিক (১৩) পুনরুক্ত (১৪) অননুভাষণ (১৫) অজ্ঞান (১৬) অপ্রতিজ্ঞা (১৭) বিক্ষেপ (১৮) মতানুজ্ঞা (১৯) পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ (২০) নিরনুযোজ্যানুযোগ (২১) অপসিদ্ধান্ত (২২) হেত্বাভাস।

ইহাদের মধ্যে অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা ও পর্যনুযোজ্যোপেক্ষণ এই ছয়টী প্রতিবাদীর অজ্ঞতা সূচনা করে এবং ইহারা অভাব পদার্থের অন্তর্গত; অবশিষ্ট পনরটী নিগ্রহ স্থান প্রতিবাদীর বিপরীত জ্ঞানের পরিচায়ক এবং প্রায়শঃ বাক্যস্বরূপ হওয়ায় গুণে অন্তর্ভূত। হেত্বাভাসের অন্তর্ভাব পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উদাহরণ—কেহ বলিল—শব্দঃ অনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ (শব্দ অনিত্য, কারণ উহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব আছে, যথা ঘট)।

ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিল—জাতি (গোত্ব প্রভৃতি) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অথচ নিত্য, সেইরূপ শব্দও কেন নিত্য হইবে না ?

ইহার উত্তরে যদি প্রথমব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলেন—যদি সামান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ নিত্য হয় তবে অবশ্যই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়ায় ঘটও নিত্য হইবে।

এইস্থানে প্রথম বক্তা স্বীয় দৃষ্টান্ত ঘটের নিত্যত্ব স্বীকার করায় প্রতিজ্ঞাদি নিগমন পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বপক্ষ ত্যাগ করিলেন এজন্য "প্রতিজ্ঞা হানি" হইল।

---

১. সামান্য প্রকরণের জাতি—মনুষ্যত্ব যেমন সকল মনুষ্যকে ও গোত্ব-জাতি যেমন সকল গরুকে "সমান" ভাবে নির্দেশ করে তদ্রূপ অসদুত্তরবিশেষ এই জাতিও বাদী এবং প্রতিবাদীর হেতুদ্বয়কে তুল্য বলিয়া ভ্রম জন্মায়। এই সাদৃশ্য বশতই প্রথমোক্ত জাতি অনুসারে এই অসাধু উত্তরের 'জাতি' নাম হইয়াছে কি না তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন।

২. "বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং" ১।২।১৯ ন্যায়সূত্র। নিগ্রহস্থান বাদী অথবা প্রতিবাদীরই নিগ্রহের কারণ নহে স্থলবিশেষে উহা মধ্যস্থেরও নিগ্রহের হেতু হয়।

ফলে বক্তা স্বপক্ষ পরিত্যাগ করায় পরাজিত হইলেন। কথা সমাপ্ত হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে—কথায় ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানের অবতারণা হয়, কিন্তু সকল কথাতেই উহাদের সকলের প্রয়োগ সম্ভব হয় না। বাদ-বিচারে ছল, জাতি এবং কতকগুলি নিগ্রহস্থানের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। জল্প ও বিতণ্ডায় সম্ভবমত ঐ সকলেরই ব্যবহার করা যায়। নিগ্রহস্থান গুলির প্রত্যেকের লক্ষণ ও দৃষ্টান্ত বিস্তৃতিভয়ে প্রদর্শিত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা ন্যায়দর্শনে পাইবেন।

হেত্বাভাসের উল্লেখ পূর্বে একবার করা হইয়াছে, পুনরায় এখানে তাহার উল্লেখ কেন এই প্রশ্নে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ উত্তর দিয়াছেন যে—হেত্বাভাস স্বয়ংই নিগ্রহস্থান নহে কিন্তু উহার উদ্ভাবনই নিগ্রহস্থান ইহাই মহর্ষির অভিপ্রায়।

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য পদার্থের অন্তর্ভাব

ন্যায়সূত্রোক্ত ষোড়শ পদার্থের বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থে অন্তর্ভাব কিরূপে সম্ভবে তাহা বলা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রে এমন আরও অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায় যাহার দ্বারা উক্ত সপ্তবিধ পদার্থের সীমা উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে এইরূপ মনে হয়। এই অধ্যায়ে ঐরূপ কতিপয় শব্দের অর্থ আলোচিত হইবে।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অনুমান প্রধান। তদনুসারে ন্যায়শাস্ত্রে অনুমানের উপযোগী পদার্থ সমূহের আলোচনা অধিক দেখা যায়। উহার মধ্যে ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য ও ব্যাপক ইহারা প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

ব্যাপ্তি

ব্যাপ্তি পদার্থ বুঝাইতে প্রাচীনেরা—নিয়ম, অবিনাভাবসম্বন্ধ অনৌপাধিক সম্বন্ধ, প্রতিবন্ধ, অবিনাভাবনিয়ম, সম্বন্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে "ব্যাপ্তি" কথাটির প্রচলনই বেশী।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধবিশেষ ইহা উক্ত নামান্তর হইতে বুঝা যায়। সমস্ত সম্বন্ধই প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই উভয়সাপেক্ষ[১]। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের যাহা প্রতিযোগী তাহা **ব্যাপক** এবং যাহা অনুযোগী তাহা **ব্যাপ্য**। অনুমান ক্ষেত্রে সাধ্য 'ব্যাপক' ও হেতু 'ব্যাপ্য' বলিয়া ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ব্যাপ্যতা বা ব্যাপ্তি হেতুর ধর্ম এবং ব্যাপকতা সাধ্যের ধর্ম।

---

১. ১১২পৃঃ দ্রষ্টব্য।

সাধ্য—অনুমিতির বিধেয়। যাবতীয় পদার্থই অনুমিতি বিশেষে বিধেয় অর্থাৎ সাধ্য হইতে পারে। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রয়োগে সাধ্য—বহ্নি; হেতু ধূম। অয়ং রূপবান্ গন্ধবত্বাৎ' এইস্থলে সাধ্য রূপ, হেতু গন্ধ। এই প্রকারে ইদং দ্রব্যং রূপবত্বাৎ (ইহা দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে রূপ আছে) এই প্রয়োগে দ্রব্যত্ব সাধ্য, রূপ হেতু।

ব্যাপ্তি বুঝিতে সাধ্য ও হেতুর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। সাধ্য বুঝিবার জন্য প্রাচীনেরা একটি সংক্ষিপ্ত সরল সঙ্কেত বাহির করিয়াছেন—

মান্ বান্ ত্যজিয়া সাধ্য লও বুঝিয়া।
যদি না থাকে মান্ বান্। 'ত্ব' চড়া'যে সাধ্য আন্॥

অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বাক্যের দ্বিতীয় পদে প্রায়শঃ 'মান্' অথবা 'বান্ থাকে; যথা—বহ্নিমান্ রূপবান্ ইত্যাদি; উহা বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশের যাহা অর্থ তাহাই সেই ক্ষেত্রে সাধ্য। যেমন—উক্ত দুই স্থানে যথাক্রমে বহ্নি ও রূপ সাধ্য। প্রতিজ্ঞাবাক্যে 'মান্' কিংবা 'বান্' না থাকিলে দ্বিতীয় পদে 'ত্ব' যোগ করিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই সাধ্য। যেমন 'ইদং দ্রব্যং' এই স্থানে দ্রব্যত্ব সাধ্য।

হেতু—হেতু-বাক্যে যে-পদে পঞ্চমী বিভক্তি থাকে তাহা হেতু[১]। পূর্বোক্ত প্রয়োগত্রয়ে যথাক্রমে ধূম, গন্ধ ও রূপ হেতু।

ব্যাপ্তি—সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। সাধ্যাভাববৎ—সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট বা সাধ্যশূন্য (কোন ও বস্তু) বৃত্তিত্ব—বিদ্যমানতা, আধেয়তা, অবস্থান করা। ন+বৃত্তিত্ব—অবৃত্তিত্ব—অবিদ্যমানতা, অবস্থান না করা অর্থাৎ না থাকা। সুতরাং "সাধ্যাভাববতি ন বৃত্তিত্বং" এইরূপ সমাস বাক্যের অর্থ—সাধ্যশূন্য কোনও পদার্থে অবস্থানের (আধেয়তার) অভাব। অতএব উক্ত লক্ষণ অনুসারে বুঝা— যায়ব্যাপ্তি অভাববিশেষ[১]।

'ইদং দ্রব্যং রূপাৎ' এই প্রয়োগে হেতু রূপপদার্থ দ্রব্যত্ব শূন্য—গুণ প্রভৃতি ষড়্‌বিধ পদার্থের কোন একটিতেও থাকে না; কারণ, রূপ পৃথিবী, জল এবং তেজঃ এই ত্রিবিধ দ্রব্যেরই গুণ ইহা স্থির হইয়াছে। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব প্রকৃতস্থলে **দ্রব্যত্বাভাববদবৃত্তিত্ব**।

সাধ্য—দ্রব্যত্ব। সাধ্যাভাব—দ্রব্যত্বাভাব। সাধ্যাভাববৎ—দ্রব্যত্বাভাববৎ—গুণ কর্ম ইত্যাদি। সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তি—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তি গুণত্ব কর্মত্ব ইত্যাদি। সুতরাং সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব; ইহা গুণত্ব কর্মত্ব প্রভৃতিতে থাকে, কোন প্রকারেই রূপে (হেতুতে) থাকে না। অতএব সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাব—দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাব স্বরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণ রূপে সঙ্গত হইল। ফলে, রূপ (হেতু) দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য এবং দ্রব্যত্ব (সাধ্যের) রূপের ব্যাপক হইল।

যে সকল হেতু যথার্থতঃ যে-সমস্ত সাধ্যের ব্যাপ্য হইবে তাহারাই এই লক্ষণের লক্ষ্য সুতরাং সেই সকলেই উল্লিখিত লক্ষণের সমন্বয় আবশ্যক। নতুবা, হেতুমাত্রই এই লক্ষণের লক্ষ্য নহে। উক্ত প্রয়োগের হেতু ও সাধ্য উল্টাইয়া লইলে অর্থাৎ 'অয়ং রূপবান্

দ্রব্যত্বাৎ' এইরূপ প্রয়োগে সাধ্য রূপ এবং হেতু দ্রব্যত্ব। ইহা ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্য নহে। দ্রব্যত্ব (হেতু) রূপশূন্য বায়ু আকাশ প্রভৃতি দ্রব্যেও বিদ্যমান ; এজন্য উহাতে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব (প্রকৃতস্থলে রূপাভাববদবৃত্তিত্ব) থাকিতে পারে না। অতএব দ্রব্যত্ব রূপের ব্যাপ্য নহে এবং রূপও দ্রব্যত্বের ব্যাপক নহে।

হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব অন্যপ্রকারেও নির্দেশ করা যায়। ইহাতে ব্যাপকত্বের লক্ষণ হয়—হেতুসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব।

পূর্বোক্ত লক্ষণ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছে—যেক্ষেত্রে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব যথার্থ, সে ক্ষেত্রে হেতুর কোন অধিকরণই সাধ্যশূন্য হইতে পারে না। 'অভাব' পদার্থ কেবলান্বয়ী অর্থাৎ সার্বত্রিক হওয়ায় হেতুর অধিকরণে কোন অভাব অবশ্য থাকিবে ইহাও সত্য। তবে উহা সাধ্যের অভাব নহে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। সুতরাং সর্বত্র লক্ষ্যস্থলে হেতুসমানাধিকরণ (হেতুর অধিকরণে বর্তমান) অভাব যাহাই হউক উহার প্রতিযোগী সাধ্য নহে। ফলে, হেতুসমানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিত্ব না থাকায় সাধ্যে হেতুসমানাধিকরণ অভাবীয় প্রতিযোগিত্বের অভাব (হেতুসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব)-স্বরূপ ব্যাপকত্ব সম্ভব হয়।

'ইদং দ্রব্যং রূপাৎ' এই প্রয়োগে দ্রব্যত্ব সাধ্য, রূপ হেতু। রূপের অধিকরণ—পৃথিবী, জল ও তেজঃ। উহার কোনটিতে জ্ঞান নাই, যেহেতু জ্ঞান কেবল আত্মার গুণ। সুতরাং রূপ সমানাধিকরণ অভাব—জ্ঞানাভাব (সুখাভাব বা দুঃখাভাব ইত্যাদিও হইতে পারে কিন্তু দ্রব্যত্বাভাব কখনই নহে) অতএব রূপসমানাধিকরণাভাবের প্রতিযোগিত্ব জ্ঞানে সম্ভবে, দ্রব্যত্বে নহে। ফলে "রূপসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব"স্বরূপ রূপের ব্যাপকত্ব "দ্রব্যত্ব দ্রব্যত্বে থাকিল।

"অয়ং রূপবান্ দ্রব্যত্বাৎ" ইহা লক্ষ্যস্থল নহে। এখানে ঐ লক্ষণও সঙ্গত হয় না। কারণ, দ্রব্যত্ব-হেতুর অধিকরণ আকাশ, উহা রূপ-(সাধ্য)শূন্য। সুতরাং দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ অভাব—রূপাভাবও বটে। উহার প্রতিযোগিত্ব থাকায় রূপে "দ্রব্যত্ব করণাভাবপ্রতিযোগিত্ব"ই থাকিল, "দ্রব্যত্বসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগিত্ব" থাকিল না। অতএব রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপক নহে।

এই ব্যাপকত্বও অভাববিশেষ। এই প্রকার ব্যাপকসামানাধিকরণ্য ও (অর্থাৎ হেতুসমানাধিকরণাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানাধিকরণ্যও) ব্যাপ্তি। দ্রব্যত্বের এইরূপ ব্যাপ্তি থাকায় রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য। এই প্রকার ব্যাপ্তি সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ আধেয়তাবিশেষ, ভাবপদার্থ।

উক্ত দুই প্রকার ব্যাপ্তি অন্বয়ব্যাপ্তি নামে প্রসিদ্ধ। ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ ইহা হইতে পৃথক্, তবে দ্বিবিধ ব্যাপ্তিরই লক্ষ্যস্থল সমান।

---

১. ব্যাপ্তির লক্ষণে 'সাধ্যসামাধিকরণ্য' এই অংশও থাকা আবশ্যক। যদি উহা বিশেষ্য হয় তবে অর্থাৎ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সাধ্যসমানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি হইলে উহা আধেয়তা বিশেষ-ভাবপদার্থ। যেহেতু আধেয়তা আধেয় বা আধেয়তাবচ্ছেদক স্বরূপ। গ্রন্থের শেষভাগ দ্রষ্টব্য।

২. পূঃ হেত্বাভাস দ্রষ্টব্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

কাব্য-বন্দনা

শ্রীজিতেন্দ্র মল্লিক

কবিতা কুসুমে আছে যে গন্ধ।
তারি মোহে সদা আমি গো অন্ধ॥
ক্ষুধার বেদনা দূরে চলে যায়।
শোকের আগুন নিমেষে নিভায়॥
কোন্ সে কাননে আছে তব স্থান।
ব'লে দাও মোরে তাহার সন্ধান॥
ব্যাকুল হ'য়েছি করিতে চয়ন।
গাঁথিবারে মালা অতি সযতন॥
কথায় কথায় করিয়া যোজন।
নেহারিব আমি তাহার মিলন॥
সুমধুর ধারা হৃদয়ে ঢালিয়া।
অনুদিন আমি রহিব মাতিয়া॥
সাগর গর্ভে থাকিলে লুকায়ে।
আনিব তাহারে বলেতে ছিনায়ে॥
ঋষিগণ মিলি' করিয়া সাধনা।
যুগে যুগে তব গাহে বন্দনা॥
কবিতা কুসুম করিয়া অর্পণ।
অনুরাগী করে ভারতী পূজন॥
কাব্য-রস মুগ্ধ করিল আমারে।
বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিছে অন্তরে॥

[আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকের ইচ্ছা যে শ্রীভারতীতে মধ্যে মধ্যে শিক্ষা ও কৃষ্টিমূলক ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হয়। এজন্য আমরা বর্তমান সংখ্যায় কাব্যানুরাগী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের এক ছোট কবিতা প্রকাশ করিতেছি।—সম্পাদক]

(২)

বেদব্রত

অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী এম্. এ., স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ

গৃহ্যসূত্রে বেদব্রত সম্বন্ধে নানাবিধ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কালক্রমে এইগুলি অনেকাংশে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিতেও দেখা যায়—'বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বা' (১. ৫২) অর্থাৎ বেদ বা ব্রতগুলি সমাপন করিয়া সমাবর্তন সংস্কারের পর গৃহী হইতে হয়। উপনয়নের পর বেদপাঠ ও ব্রতচর্যা পালনের রীতি ছিল, এবং সেইজন্যই ত্রিবিধ স্নাতকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক। ব্রতশব্দ যে তৎকালে গৃহ্যসূত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটী ব্রতবিশেষকে বুঝাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্তী ব্যাখ্যাকারের সময় উহা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে বলিয়া মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের উপরিলিখিত বিধির ব্যাখ্যায় বলেন—ব্রত অর্থে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গৃহ্যসূত্রের যুগে উহা বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য হইত।

গৃহ্যসূত্রের মতে প্রত্যেক ব্রতচর্যা বৎসরকাল যাবৎ পালন করিতে হইত। উপনয়ন সংস্কারে যেরূপ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত প্রত্যেক ব্রতানুষ্ঠানে তাহার আবৃত্তি করিতে হইত। আশ্বলায়ন বলেন—'এতেন বাপনাদি-পরিদানান্তং ব্রতাদেশনং ব্যাখ্যাতম্' (১. ২২. ২০)।

আশ্বলায়ন স্মৃতির মতে ব্রত চারিপ্রকার:—মহানাম্নী, মহাব্রত,[১] উপনিষদ্ ব্রত ও গোদান। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে:—শুক্রিয়, শক্করী, ব্রাতিক ও ঔপনিষদব্রত (২. ১১-১২)। শুক্রিয় ব্যতীত অন্য কোনব্রত পালন করিতে হইলে প্রত্যেক বারে পৃথক্‌ভাবে উপনয়ন করিতে হয় এবং পরিশেষে উদ্দীক্ষণিকা নামক প্রাথমিক আয়োজনের সমাপ্তিসূচক এক অনুষ্ঠান করিয়া এক বৎসর কাল যাবৎ প্রত্যেকটি ব্রত পালন করিতে হয়। মনুও বিধি দিয়াছেন - ব্রতগুলির প্রারম্ভে নূতন যজ্ঞোপবীত, মেখলা, দণ্ড ও কৃষ্ণসার চর্ম ইত্যাদি ধারণ করিতে হয় (২. ১৭৪)। গোভিলগৃহ্যসূত্রে (৩১. ২৬-৩১) বর্ষকালসাধ্য পাঁচটী ব্রতের উল্লেখ আছে—গোদানিক, ব্রাতিক, আদিত্য, উপনিষদ ও জ্যৈষ্ঠসামিক। বেদের বিভিন্ন প্রকরণ পাঠের পূর্বে ঐগুলি পালন করিতে হইত। সামবেদের পূর্বার্চিক[২] নামক প্রকরণ পাঠের পূর্বে গোদানিক ব্রত, আরণ্যক পাঠের (শুক্রিয় অধ্যায় ব্যতীত) পূর্বে ব্রাতিকব্রত, শুক্রিয় অধ্যায়

---

১ ঐতরেয় আরণ্যক ১ ও ৫ দ্রঃ।

২ অগ্নি, ইন্দ্র ও সোম পবমানের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত সামমন্ত্রগুলিকে পূর্বার্চিক বলা হয়।

পাঠের পূর্বে আদিত্যব্রত, উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ পাঠের পূর্বে ঔপনিষদব্রত এবং আজ্যদোহ পাঠের পূর্বে জ্যেষ্ঠসামিক ব্রত করিতে হইত।

আদিত্যব্রতে কেবল একবস্ত্র হইয়া থাকিতে হইত। ব্রতচারী ও সূর্যের মধ্যে গৃহচূড়া ও বৃক্ষাদি ব্যতীত অন্য কোন আড়াল বা ব্যবধান যাহাতে না থাকে সেইদিকে বিশেষ যত্ন লইতে হইত। এই সময়ে কোন জলাশয়ে জানুর অধিক গভীর স্থানে যাওয়া নিষেধ ছিল।

শক্বরী অথবা মহানাম্নী ব্রতে তিনবার স্নান, কৃষ্ণবাস ধারণ, ও কৃষ্ণবর্ণের আহার গ্রহণ করিতে হইত। তৎকালে দিবাভাগে দাঁড়াইয়া ও রাত্রিকালে বসিয়া থাকিতে হইত। বৃষ্টির সময় আশ্রয়গ্রহণ ও নদী উত্তরণ—এইগুলি নিষিদ্ধ ছিল। বৎসরের এক তৃতীয়াংশ কাল এইরূপ ব্রত পালনের পর মহানাম্নীর প্রথম স্তোত্রীয় মন্ত্র তিনটী[৩] গুরু শিষ্যকে গান করিয়া শোনাইতেন।

জ্যেষ্ঠসামিক ব্রতেরও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে। এখানেও পূর্বের মত আজ্যদোহ পাঠের প্রাথমিক অনুষ্ঠানরূপে তিনটী মন্ত্র[৪] শিষ্যকে গান করিয়া শোনাইতে হইত। এই ব্রত যে পালন করিত তাঁহার পক্ষে আজীবন কয়েকটী বিধিনিষেধ মানিতে হইত। সে শূদ্র, বিবাহ করিতে পারিবে না বা পাখীর মাংস খাইতে পারিবে না; কোন মৃণ্ময় পাত্রে পানীয় বা আহার্য গ্রহণ নিষেধ। তাহাকে দুই বস্ত্র পরিধান করিতে হইত—ইত্যাদি।

গৌতমসূত্রে (৮. ১৫) প্রধান চারি ব্রতকে সংস্কারের তালিকায় ধরা হইয়াছে। পাণিনির ৫. ১. ৯৪ সূত্রের বার্ত্তিকে উল্লেখ আছে—'তদস্য ব্রহ্মচর্যমিতি মহানাম্ন্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্ চ' (১-২)। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে (২য়, পৃ° ৩৮০) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাহানাম্নিক, আদিত্যব্রতিক প্রভৃতি পদ উদাহরণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন। 'সংস্কারকৌস্তভ'[৫] গ্রন্থে ব্রতগুলির বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। ইহার মতে একাদশ ও ষোড়শবর্ষ বয়সে মহানাম্নী ও গোদান ব্রত করিতে হইত। ফলতঃ কালক্রমে বেদ অধ্যয়নের অনুষ্ঠান যখন হ্রাস পাইতে লাগিল তখনই এই সকল ব্রতচর্যা অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। বর্তমানে ব্রহ্মচর্য তো চরম হ্রাস পাইয়াছে—বেদাধ্যয়ন আজ কেবল সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারে পর্যবসিত। অতএব তার বেদব্রত বহুপূর্বেই লোপ পাইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যে 'বেদং ব্রতানি বা পারং নীত্বা'—এই বচনের মিতাক্ষরা ব্যাখ্যা (ব্রত=ব্রহ্মচর্যব্রত) হইতে বোঝা যায় তাঁহার সময়েই প্রাচীন বেদব্রত অনেকটা অপ্রচলিত হইয়াছে।

---

৩ 'বিদা মঘবন্ বিদা', 'আভিষ্টম্', 'এবাহিশক্রো'—সামবেদের জৈমিনীয় সংহিতা ২. ৭ দ্র°।

৪ 'মূর্ধানিং দিবঃ' (সাম বে. ১. ৬৭), 'তাং বিশ্বে' (সাম বে. ২. ৪৯১) 'নাভিং যজ্ঞানাম্' (সাম বে. ২. ৪৯২)।

আমাদের কথা

আগামী সোমবার, ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দোললীলার উৎসব ভারতের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিবসেই বর্তমান যুগের বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ও প্রতীক শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব প্রায় ৪৫০ শত বৎসর পূর্বে এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হ'ন। দোললীলার কাহিনী ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবনী ইতিপূর্বেই গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যা শ্রী ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ঐ শুভদিনে পাঠকবর্গকে এই পূত জীবনী ও দোললীলা কাহিনীর বিষয় অনুধ্যান করিতে অনুরোধ করি।

*　　*　　*　　*

বর্তমান বৎসরের ঐ দিবসে আবার চন্দ্রগ্রহণ ও চূড়ামণি যোগ। শ্রীচৈতন্যের জন্ম-দিবসেও চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। সোমবার দিন যদি চন্দ্রগ্রহণ এবং রবিবার দিন যদি সূর্যগ্রহণ হয় তাহাকে চূড়ামণি যোগ বলে। সুতরাং ঐ দিবস হিন্দু মাত্রেরই বিশেষ পুণ্যাহ।

*　　*　　*　　*

কিছুকাল পূর্বে বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী-উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র ভারতের একটী মহাগৌরবের বিষয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী তাঁহার আজীবন সাধনায় এই প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণতার পথে চালিত করিতেছেন। এই উপলক্ষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রথমনাথ তর্কভূষণ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশিষ্ট উপাধিদানে ভূষিত করা হইয়াছে।

আমরা এই মহা-প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ও পণ্ডিতজীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

*　　*　　*　　*

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের হঠাৎ পরলোক গমনে আমরা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি। গত ১৩ই মাঘ, মঙ্গলবার রাত্রি ৮।২০ মিনিট সময়ে ৬৬ বৎসর বয়সে কাশীধামে তিনি দেহত্যাগ করেন। কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হঠাৎ প্রয়াণ আশা করি নাই। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের, বিশেষতঃ ন্যায়-দর্শনের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ভারত হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বর্তমান যুগে এই প্রকার বিশিষ্ট বিষয়ে গভীরতাপূর্ণ পণ্ডিতের ক্রমশঃই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের শোকজ্ঞাপন করিতেছি।

*　　*　　*　　*

যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি নিবন্ধন কলিকাতার বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। বহু প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমানে এই প্রকার অবস্থা দাঁড়াইতেছে যে ভবিষ্যতে আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। যে সময় এই সব স্কুল-কলেজকে বন্ধ করিবার জন্য হঠাৎ আদেশ দেওয়া হয়, তখন কলিকাতার অবস্থা তত গুরুত্বপূর্ণ হয় নাই। এই ভাবে বন্ধ না করিয়া যদি এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগকে লইয়া একটী সভা করা হইত এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ঐ সব ছাত্রদিগকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করিয়া তথায় বিদ্যালয়গুলিকে পরিচালনা করা হইত, তাহা হইলে স্কুলগুলিও একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইত না, ছাত্রদিগেরও অধ্যয়ন নষ্ট হইত না এবং স্বাস্থ্যকর স্থানেও থাকিবার সুবিধা হইত।

*　　*　　*　　*

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তীর পরেই পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য নাম নাথীবাঈ দামোদর থ্যাকারসে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। বোম্বাই-এর এক বিশিষ্ট ধনী বিঠল্ দামোদর থ্যাকারসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন এবং ঐ দানের সর্তানুযায়ী তাঁহার মাতার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। কি ভাবে ও প্রেরণায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টী গড়িয়া উঠিল তাহা ভাবিবার বিষয়। পুণার অধ্যাপক ঢোণ্ডে কেশব কার্ভে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন। ইহার উদ্দেশ্য জাপানে যেমন নারীদের পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ভারতে সেই প্রকার একটী প্রতিষ্ঠান তৈয়ারী করা—মাতৃভাষায় জ্ঞানের বস্তুগুলি শিক্ষা দেওয়া এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও মহিলাদের উপযোগী অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া। তিনি এখনও এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ এবং বিনা অর্থেই তিনি এই কাজ আরম্ভ করেন। বহুবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি এই মহাবিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এপর্যন্ত ৫১৭টী মহিলা এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়াছেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। এইভাবেই জাতীয় অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠে। আমরা অধ্যাপক কার্ভেকে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই বিশ্ববিদ্যালয় এখনও সরকারী অনুমোদন (charter) প্রাপ্ত হয় নাই।

পুস্তক সমালোচনা

কালসিদ্ধান্তদর্শিনী—কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রিমহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্. এ. মহাশয় রচিত ইংরাজীভূমিকা সহ গ্রন্থকার কর্তৃক কলিকাতা ৬৫।৫ বি বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। পৃ° ১১০।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও বৈদুষ্য ভারতের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত। তর্ক দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্রে, বিশেষতঃ পাণিনীয় শাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ। কাশীর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় হইতে যখন ইঁহাকে কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের পাণিনির অধ্যাপকপদে নিযোগ করা হয় তখন কর্তৃপক্ষ সর্বান্তঃভাবে ইঁহাকেই মনোনীত করেন। দ্বিতীয় কোন প্রার্থীর মনোনয়নের প্রসঙ্গই উত্থাপিত হয় নাই। ইহাতেই বোঝা যায় তাঁহার পাণিনীয় শাস্ত্রের পণ্ডিত্যে কিরূপ অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা।

শাস্ত্রি মহাশয় সম্প্রতি কালতত্ত্বের নানাবিধ শাস্ত্রীয় মত সঙ্কলিত করিয়া প্রাঞ্জল সংস্কৃতে 'কালসিদ্ধান্তদর্শিনী' নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে সংস্কৃত পাঠার্থী, গবেষণানুরাগী শিক্ষিত সমাজ ও পণ্ডিতবৃন্দ—সকলেই তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিবেন সন্দেহ নাই। ভারতের সুপ্রাচীন কাল হইতে কালতত্ত্ব লইয়া বহু মতবাদ ও বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। সেই সকল বিভিন্ন চিন্তাখনির গভীর কন্দর হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া শাস্ত্রি মহাশয় একাধারে গ্রথিত যে-মণিমাল্য সুধীবৃন্দের হস্তে উপহার দিলেন তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ অসম্ভব।

প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় যখন কালসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন হইতেই উহা পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আজ এই গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থখানিতে ন্যূনাধিক ভারতীয় পঞ্চাশটী মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও কারিকা ইত্যাদি সমেত প্রায় ১৭২খানি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রতীতি হয় শাস্ত্রি মহাশয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র কত ব্যাপক অথচ কত গভীর। ইহাতে মূল গ্রন্থাদির অনুসন্ধান সূত্রেরও (reference) পরিচয় আছে এবং অক্ষরানুক্রমিক বিষয়সূচী ও গ্রন্থনামসূচী যোজিত হওয়ায় ইহার সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য সকলেরই সুপরিচিত। অনুগ্রহ করিয়া তিনি গ্রন্থের যে ভূমিকাটী যোজনা করিয়াছেন তাহাতে বহু মৌলিক তথ্যের অনুসন্ধান রহিয়াছে। ভূমিকাতে তিনি ডক্টর শ্রেডর (Dr. Schrader) এর নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার মতে প্রাগ্-বৌদ্ধযুগে 'কালবাদ' নামে একটী বিশিষ্ট মতবাদের প্রচলন ছিল।

তাহার সারমর্ম এই যে—কাল নামক পদার্থ সর্বক্রিয়াশক্তির মূল এবং উহাই বিশ্বনিয়ামক। তিনি ইহাও বলিয়াছেন—পাশ্চাত্য 'অদৃষ্টবাদের' সহিত ইহার কতক অংশে মিল আছে। অথর্ববেদের কালসূক্তেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়[১] এবং মহাভারতেও এই প্রাচীন মতের অভিব্যক্তি আছে।

শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে ঋক্‌মন্ত্র ও অথর্ববেদের কালসূক্ত প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন—কাল বিশ্বের আধার, নিত্য এবং সকল উৎপত্তি ও স্থিতির মূল। সায়ণাচার্যের ব্যাখ্যা অনুসারে কালসূক্তে কালকে পরমেশ্বররূপে স্তুতি করা হইয়াছে এবং এই সূক্তই যে ভর্তৃহরির ব্যাখ্যার উপজীব্য—ইহাও শাস্ত্রিমহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে মূল সূক্ত উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত বলিয়া মনে করি। কারণ তাহাতে ব্যাখ্যা ছাড়াও মূলগত অর্থের আভাস মেলে।

গ্রন্থখানিতে যে সকল মতবাদের সমাবেশ আছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। তবে মাত্র কয়েকটী বিষয়ের সূচনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে গ্রন্থখানি কিরূপ উপযোগী। কয়েকটী মত যথা—উপনিষদ্ মতে ব্রহ্ম হইতে কালের উৎপত্তি এবং কাল ঈশ্বরাধীন। 'কালকারণিক' মতে পরমেশ্বর অস্বীকৃত, কেবল কাল হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি। মনুসংহিতার মতে কালের উৎপত্তি আছে, অতএব কাল অনিত্য। ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের মতে কাল বিভু, নিত্য, জগদাধার, সর্বোপত্তিনিদান পদার্থ বিশেষ; কেবল উপাধিবশে ক্ষণ, দিন মাসাদির ব্যবহার। অদ্বৈত বেদান্তমতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা নাই। তবে ইঁহাদের কেহ কেহ কালের ব্যবহারিক সত্তা ও প্রত্যক্ষবিষয়তা স্বীকার করেন। ব্যাখ্যাতৃভেদে কেহ বলেন—কাল অবিদ্যা, কেহ বলেন ব্রহ্ম ও অবিদ্যার সম্বন্ধই কাল, আবার কেহ বলেন কাল ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তি অথবা বুদ্ধি সঙ্কলনরূপেই কালশব্দের ব্যবহার। সেশ্বর সাংখ্যমতে ক্ষণাতিরিক্ত কাল নাই, তবে উক্ত ক্ষণাত্মক কাল যোগজ প্রত্যক্ষের বিষয়। নিরীশ্বর সাংখ্যমতে মূলতঃ কাল অস্বীকৃত, তবে ব্যাখ্যাভেদে উহা পরিণামাত্মক বা উহাই প্রকৃতি অথবা ক্রিয়াই কালের সংজ্ঞা। 'মানসোল্লাস' বর্ণিত পৌরাণিক মতে পরমেশ চেষ্টাই কাল। ফলতঃ এই সকল বিভিন্ন দার্শনিক মতের সম্প্রদায় ও ব্যাখ্যাতৃভেদে যাবতীয় আলোচনা শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আগম ব্যাকরণ, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, পাশুপত, বৌদ্ধ ও জৈনমত; এমন কি লোকায়ত, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ ও কামশাস্ত্র প্রভৃতিরও মত শাখা, সম্প্রদায় ও ভাষ্যকারাদি ভেদে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় শাস্ত্রি মহাশয় কিরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহার অনুসন্ধান দৃষ্টি কিরূপ ব্যাপক ও সূক্ষ্ম। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

---

১ বঙ্গীয়মহাকোষের 'অদৃষ্ট' প্রবন্ধে বর্তমান সমালোচক এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

এরূপ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। এবং শাস্ত্রিমহাশয় পতঞ্জল মহাভাষ্যের সম্প্রতি অনুবাদে যেরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিতেছেন, আশা করি তাঁহার সুনিপুণ হস্তে বর্তমান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলে বঙ্গভাষায় দার্শনিক সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

Clash of Three Empires—ভি:. ভি. যোশী এম. এ (অক্সন) প্রণীত। এলাহাবাদ কেতাবীস্তান কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা—২০৭। মূল্য টাকা ৪||০।

পুস্তকের প্রথমে স্যর সাফাৎ আহাম্মদ খাঁ একটী মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে তিনটী শক্তির সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। তখন মুঘল ও মহারাষ্ট্র শক্তির সংঘর্ষ হইতেছে। সে সময় আবার কতকগুলি বৈদেশিক শক্তি, বিশেষতঃ বৃটিশশক্তি বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল—এই তিনশক্তির সংঘর্ষ লইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ই হাতে মারাঠার ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতেব ইতিহাস পাঠার্থিগণেব নিকট পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগিবে। পুস্তকের ভাষা খুব প্রাঞ্জল। ইহার ছাপা ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। সূত্রধার মণ্ডলকৃত দেবতামূর্তিপ্রকরণম্—কলিকাতা।

২। The Devolopment of Hindu Iconography—by Mr. Jitendra Nath Benerjee, M.A. কলিকাতা

৩। Adam's Reports on Education, 1835-38 edited—by Mr. A. N. Basu, M.A., T.D (Lond) কলিকাতা।

৪। Kamala Lectures—by Mr. Hirendra Nath Datta, M. A. B. L.

৫। গীতার বাণী—অনিলবরণ রায়। কলিকাতা।

৬। শারীরিক মীমাংসা ভাষ্যবার্ত্তিক, প্রথমভাগ (আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থশিরিজের প্রথম সংখ্যা)—বেদান্তবিশারদ মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত অশোকনাথ ভট্টাচার্য, বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী, এম.এ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা।

৭। হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম. এ.

৮। The Din-i-Ilahis—Prof. Makham Lal Roy Choudhury,

৯। বিদ্যাপতি—২য় সংস্করণ। স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা।

সাময়িক সাহিত্য—মাঘ, ১৩৪৮

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—বৈদিক ক্রিয়া কলাপে জননী—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি. এইচ. ডি।

ভারতবর্ষ—মহামন্ত্র—শ্রীজনরঞ্জন রায়।

ব্রহ্মবিদ্যা—মানবতা—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —আত্মানুভূতি—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

সাহিত্য

প্রবাসী—বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

,, —ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা গদ্য—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্. এ., পি. এইচ. ডি।

,, —রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের অভিব্যক্তি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।

বঙ্গশ্রী—দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে "মা"—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়।

,, —রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী, এম্. এ।

,, —রাশিয়ার সাহিত্য—শ্রীজিতেন্দ্র নাগ চৌধুরী।

ইতিহাস

প্রবাসী—ইতিহাসের খুঁটিনাটি—শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম্. এ।

,, প্রাচীন ভারতে নগররক্ষী—ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম্. এ., বি. এল্., পি. এইচ. ডি., ডি. লিট্।

ভারতবর্ষ—ওহাবিযা ধর্ম ও আরব জাতীয়তা—শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —চিদম্বরম—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত।

বঙ্গশ্রী—বাঙ্গালার প্রাচীন কীর্তি—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত।

বিবিধ

প্রবাসী—মথ প্রজাপতি ও রেশম কীট—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বঙ্গশ্রী—পল্লী-সংস্কার—শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৮শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

ইতিহাস ও ঐতিহ্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ।

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা—ডক্টর মুহম্মদ সাহীদুল্লাহ্, এম. এ., বি. এল।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ।

পুরাতন পত্রিকা

সাহিত্য (১৩২৮)

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ বি. এ. সংকলিত

বৈশাখ—স্বর্গীয় বড়াল কবি—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ। স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের স্মৃতি সভায় পঠিত। স্বর্গীয় কবিবরের কবিতাগুলি প্রকৃতই মনোরম। লেখক অতি অল্প কথায় সুন্দর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য।

আষাঢ়—বিবর্তন বাদ—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়—Darwin-এর Evolution থিওরির সমালোচনা। Darwin-এর মতবাদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহার মধ্যে যে অনেক স্থানে গলদ আছে তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মত উদ্ধার করিয়া লেখক নিপুণভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

ভাদ্র—শেখ মসলে উদ্দিন সাদী—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—শেখ সাদী গুলিস্তাঁ জগৎবিখ্যাত। লেখক অতি সুন্দরভাবে এই উন্নতমনা পূতচরিত্র কবির জীবনী লিখিয়াছেন ও পরের কয়েকটী মাসে উহার পুস্তকের কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছেন। প্রবন্ধটী অতি সুন্দর।

অগ্রহায়ণ—ভাবসাধক দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ—দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়ে যে স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুবিদিত। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কি মত বা ব্যক্তিগত কি মত তিনি পোষণ করিতেন তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। লেখক নানাস্থান হইতে সেইগুলি একত্র করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের মনের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণ আশাবাদী।

সাময়িক সংবাদ

মার্শাল চিয়াং কাইসেকের ভারত পরিদর্শন—মার্শাল চিয়াং কাইসেক ও মাদাম কাইসেক ভারতে আসিয়াছেন। বর্তমানে যখন সিঙ্গাপুরের ভাগ্যপরীক্ষা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ভারতে চীনের রাষ্ট্রনায়কের আগমন বিভিন্ন মহলে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে। চীন ও ভারতের সম্মিলিত অস্ত্রবলে জাপানী বিভীষিকা দূরীভূত হইলে সমগ্র এশিয়াখণ্ডের উপর হয়তো আবার শান্তির শ্বেতচ্ছায়া নামিয়া আসিবে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ম্যুজিয়ম—শান্তিনিকেতনে একটী রবীন্দ্র ম্যুজিয়ম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় নানা দ্রব্যের মধ্যে তাঁর ফটোগ্রাফ, হস্তলিপি, চিঠি তাঁর সম্বন্ধে খবরের কাগজ কর্তিত অংশ, বহি, সাময়িক পত্র রাখা হইবে। তাঁর সম্বন্ধে যত রকম রচনা প্রকাশিত হয়েছে ও সংগৃহীত হবে, সমস্তই বিষয় অনুসারে সাজিয়ে রাখা হবে।

শোক সংবাদ

পরলোকে স্যার আকবর হায়দারী—গত ৮ই জানুয়ারী সার আকবর হায়দারীর অর্ধ শতাব্দীর কর্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল। শেষ বয়সে তিনি নিজের বার্ধক্য সত্বেও ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়া ভারতের সর্বত্র সংবাদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

সর্বশ্রেণী এবং সকল সম্প্রদায়েরই তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

ভূমিকা

আর্ষেয়ব্রাহ্মণ বা অনুব্রাহ্মণ সামবেদের অষ্ট ব্রাহ্মণের অন্যতম। বেদচার্য মহামতি সায়ণ ইহাকে সামবেদের ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়ের মতে চল্লিশ প্রপাঠকযুক্ত প্রৌঢ় ষড়্‌বিংশমন্ত্রোপনিষৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেরই নামান্তর এবং সামবিধি, আর্ষেয়, দৈবত, সংহিতোপনিষৎ এবং বংশ সামবেদের এই পাঁচটি ব্রাহ্মণই অনুব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ।

এই আর্ষেয় ব্রাহ্মণ অতিশয় প্রাচীন এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ। সামশ্রমী মহোদয় সত্যই বলিযাছেন যে তৃণগুল্মাদির সহিত অপরিচিত ভিষকের ন্যায় আর্ষেয় ব্রাহ্মণেব জ্ঞানবর্জিত সমুদয় সামবেদাধ্যেতারা উক্ত বেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানও নিষ্ফল।

আর্ষেয় ব্রাহ্মণের অধ্যয়নেব দ্বারা যথাক্রমে গায়ত্র, গেয়, আরণ্য ও মহানাম সামের নাম অবগত হওয়া যায়। ইহা হইতে ঋষি ও দেবতার নাম এবং উহ, উহ্য প্রভৃতি সামের ঋষি সম্বন্ধ অতিদেশ বিধি হইতে জানিতে পারা যায়। সামবেদের উৎপত্তি ও মন্ত্রসংখ্যা নির্দেশে ইহার উপকারিতা অসামান্য।

যতদূর সম্ভব আমরা সায়ণ ভাষ্যের মর্মানুবাদ করিয়াছি। ইহা সামবেদাধ্যায়িগণের সামান্য উপকারে আসিলেও শ্রম সফল মনে করিব। আলমতিপল্লবিতেন। ইতি—

সম্পাদক

भरद्वाजस्य व्रतं भरद्वाजिनां व्रतं यमव्रते द्वे अङ्गिरसां वोत्तरमश्विनोर्व्रते द्वे गवां व्रते द्वे कश्यपव्रते द्वे ॥ २१ ॥

ইন্দ্রোরাজা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ভরদ্বাজের ব্রত — অভীনবন্তে অদ্রুহঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা ভরদ্বাজিগণের ব্রত। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রন্নরো এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটীর নাম যমব্রত। অথবা ইহাদের অন্তিমটী অঙ্গিরসের ব্রত।

ই মা উ বাং দিবিষ্টয়ঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের ব্রত। তে মন্বত প্রথম নাম গোনাম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নিমীড়ে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী গবাং নামে প্রসিদ্ধ। কশ্যপস্য স্বর্বিদঃ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম কশ্যপব্রত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের একবিংশ খণ্ড

अङ्गिरसां व्रते द्वे अपां व्रते द्वे अहोरात्रयोर्व्रते द्वे अह्नः पूर्वं रात्रेरुत्तरं विष्णोर्व्रतं विश्वेषान्देवानां व्रतं वसिष्ठव्रते द्वे ॥ २२ ॥

ইন্দ্রন্নরোনেমধিতাহবন্তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। অভিত্বশূরনোনুমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী অঙ্গিরসের ব্রত। সমন্যায়ম্ এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম অপাং ব্রত। উদুত্যং জাতবেদসম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। আপ্রাগাদ্ভদ্র'-যুবতিঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী অহোরাত্রির ব্রত। প্রথম সামটী অহের এবং দ্বিতীয় সামটী রাত্রির।

প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্যনমহঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বিষ্ণুর ব্রত। বিশ্বেদেবামম শৃণ্বন্তু যজ্ঞম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বিশ্বদেবের ব্রত। উদু ব্রহ্মাণ্যৈরয়তশ্রবস্যা এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা বসিষ্ঠের ব্রত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের দ্বাবিংশখণ্ড

इन्द्रस्य सञ्जय मगस्त्यस्य यशः प्रजापतेस्त्रयस्त्रिंशत्सम्मितश्चतुस्त्रिंशत्सम्मिते द्वे जमदग्नेर्व्रतं युग्यश्च दशस्तोभ मिन्द्रस्य च वार्त्रघ्नं प्रजापतेश्चाष्टानिधन मिन्द्रस्य राजनरौहिणे द्वे रौहिणे वैकर्षवा राजनन्धातूरौहिणम् ॥ २३ ॥

ইন্দ্রন্নরোনেমধিতাহবন্তে এই ঋ.ক একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ইন্দ্রের সঞ্জয় অর্থাৎ জয়ের কারণ। যশোমাস্তাবাপৃথিবী এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। যশঃ-শব্দযুক্ত বলিয়া ইহার নাম অগস্ত্যের যশ।

প্রবোমহে মহেবৃধেভরধ্বম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্রন্নরোনেমধিতা হবন্তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী ক্রমে প্রজাপতির ত্রয়স্ত্রিংশৎ ও চতুস্ত্রিংশৎ সন্নিত নামে খ্যাত।

অভিত্বাশূরংনোনুমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম জমদগ্নির ব্রত। ইন্দ্রন্নরোনেমধিতাহবন্তে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। দশটী স্তোভযুক্ত বলিয়া ইহাদের নাম দশস্তোভ।

ইন্দ্রস্যনুবীর্য্যাণি প্রবোচম এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ইন্দ্রের বাত্রঘ্ন অর্থাৎ বৃত্রহননের যোগ্য। সত্যমিথ্যাবৃষাদসি এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। আটটী নিধনের সহিত যুক্ত বলিয়া ইহার নাম প্রজাপতির অষ্টনিধন।

ইন্দ্রন্নরো নেমধিতাহবন্তে এই ঋকে সামদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম ইন্দ্রের রাজনরৌহিণ। অথবা ইহারা রৌহিণ সংজ্ঞক। অথবা পূর্বটী এক ঋষি সম্বন্ধী রাজন ও অন্তিমটী ধাতার রৌহিণ।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশ খণ্ড

अग्नेरिलान्दं पञ्चानुगान मिरान्नं वा त्रीणि देवानां व्रतानि देवस्य वा रौद्रं पूर्वं वैश्वदेवं तृतीयं वैश्वदेवे वा पूर्वे रौद्रं तृतीय मृतुष्ठा यज्ञायज्ञीय मजितस्य जितिः सोमव्रतं दीर्घतमसश्च व्रतम् ॥ २४ ॥

অগ্নিবস্মি জন্মনা জাতবেদা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম অগ্নির ইলান্দ। ইহা পাঁচটী অনুগানের সহিত যুক্ত। অথবা ইহার নাম ইরান্ন।

অধিপতাগ্নি ইত্যাদি ঋকে সামত্রয় উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম দেবতাদিগের অথবা দেবতার ব্রত। অথবা প্রথম দুইটী বৈশ্বদেব ও তৃতীয়টী রৌদ্র।

বসন্ত ইন্নুরন্ত্যো এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম ঋতুষ্ঠা যজ্ঞাযজ্ঞীয়। অভিত্বাশূরনোনুমঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম অজিতের জিতি। সত্রেপয়াংসি সময়ন্তবাজাঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম সোমব্রত। আক্রান্‌ৎসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম দীর্ঘতমার ব্রত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্বিংশ খণ্ড

দ্বে পুরুষব্রতে পঞ্চানুগানং চৈকানুগানং চ ত্রীণি লোকানাং ব্রতানি দিবোন্তরিক্ষস্য পৃথিব্যা ইত্যথাপরং দ্যাবাপৃথিব্যোর্বিপরীতে হৃদয়স্য সাম ব্রতং বা ॥২৫॥

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি ছয়টী ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা দিগ হইতে আরও কতকগুলি অনুগান রূপ সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের নাম দুইটী পুরুষ ব্রত। প্রথমটী পাঁচটী অনুগানের সহিত যুক্ত এবং দ্বিতীয়টী একটী অনুগানের সহিত যুক্ত।

মন্বে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভুজসো এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। কয়ানশ্চিত্রা আভুবৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। মন্বে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসো এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগত্রয়াশ্রিত তিনটী সাম লোকের ব্রত নামে খ্যাত। ইহারা ক্রমে দিবের ব্রত, অন্তরিক্ষের ব্রত ও পৃথিবীর ব্রত। এস্থানে বিকল্প প্রদর্শিত হইতেছে। অথবা ইহারা দ্যাবাপৃথিবীর বিপরীতক্রমে অর্থাৎ প্রথমে পৃথিবীর ব্রত, পরে অন্তরিক্ষের ব্রত এবং দ্যুলোকের ব্রত।

হরীত ইন্দ্র শ্মশ্রূণ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম হৃদয়ের সাম অথবা হৃদয়ের ব্রত।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের পঞ্চবিংশ খণ্ড

দিশাংব্রতং দশানুগানম্ ॥ ২৬ ॥

যদ্ বর্চোহিরণ্যস্য এই একটী ঋকেই স্তোভবিশেষ সহ দশটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই দশানুগানযুক্ত সামের দিশাং ব্রত এই নাম।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের ষড়্‌বিংশ খণ্ড

কশ্যপব্রতং দশানুগানং কশ্যপগ্রীবা দ্বিতীয়ং প্রজাপতের্হৃদয়ং পঞ্চমমিডানাম্ সংক্ষারঃ ষষ্ঠঃ কশ্যপপুচ্ছং দশমং প্রাগ্ দশমাদ্ গবাংব্রতে নিহবাভিনিহবৌ দ্বা বনড়ুদ্ব্রতে বা ॥ ২৭ ॥

যস্তেদমারজোযুজ ইত্যাদি ঋকে দশটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই সামরূপ অনুগান সমূহের নাম কশ্যপব্রত। হাউ ঔহো ইতি দ্বিতীয় অনুগান কশ্যপ গ্রীবানামক। পঞ্চম অনুগানের নাম প্রজাপতির হৃদয়। ষষ্ঠ অনুগানের নাম ইড়ার সংস্কার।

তে মন্বত প্রথমন্নামগোনাম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। সহর্ষং ভাঃ সহ বৎসা উদেত এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই সাম দুইটী অষ্টম ও নবম অনুগানের সহিত গবাং ব্রত নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নিরশ্মিজন্মনা জাতবেদাঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। দশম অনুগানের সহিত ইহার নাম কশ্যপ পুচ্ছ।

ইতি ইতি ই ত্যাদি স্তোভোৎপন্ন একটী সাম। স্বয়ং স্বুম্নারি ইত্যাদি স্তোভযুক্ত অপর একটী সামের সহিত নিহ্নব ও অভিহ্নব নামে প্রসিদ্ধ অথবা ইহারা অনড়ুৎ ব্রত নামে পরিচিত।

ইতি আর্ষের ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের সপ্তবিংশ খণ্ড

अग्नेर्व्रतं वायोश्च व्रतं महावैश्वानरव्रते द्वे सूर्यस्य भ्राजाभ्राजे द्वे वायोर्विकर्णभासे द्वे मृत्योर्वैन्द्र महादिवाकीर्त्यम् सौर्यं वा दशानुगानं तस्य शिरश्च ग्रीवाश्च स्कन्धकीकसौ च पुरुषाणि च पक्षौ चात्मा चोरू च पुच्छं चैतत्साम सुपर्ण मित्याचक्षते ॥ २८ ॥

অগ্নির্মূর্দ্ধা এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম ব্রত। অয়া রুচা হিরণ্যা পুনানঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বায়ুর ব্রত।

প্রক্ষস্য বৃষেতা অকষস্যুমহঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। কায়মানো বণাত্বম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই ঋগ্‌দ্বয়াশ্রিত সাম দুইটী মহাবৈশ্বানর ব্রত সংজ্ঞক। অগ্ন আয়ূংসি পবসে এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম সূর্য্যের ভ্রাজ। অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম সূর্য্যের আভ্রাজ।

বিভ্রাড্‌বৃহৎ পিবতুসোম্যম্ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বায়ুর বিকর্ণ। প্রক্ষস্য বৃষ্ণো অরুষস্য নূমহঃ এই ঋকে একটী সাম উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার নাম বায়ুর ভাস অথবা এই সামদ্বয় মৃত্যুর বিকর্ণ ও ভাস নামক।

মহাদিবাকীর্ত্য নামক সামের দেবতা ইন্দ্র বা সূর্য। তাহার দশটী অনুগান আছে। পূর্বোক্ত সামে গীয়মান সপ্তম অনুগান ইহার আত্মা। ছয়টী অনুগানের সহিত শির, গ্রীব, স্কন্ধ, কীকস, পুরীষ ও পক্ষ তত্তৎ নামে পরিচিত। অষ্টম, নবম ও দশম অনুগান যুক্ত সাম উরুদ্বয় ও পুচ্ছসংজ্ঞক। এই মহাকীর্ত্য নামক সাম সুপর্ণ বলিয়া কথিত।

ইতি আর্ষের ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের অষ্টবিংশ খণ্ড

आदित्यव्रत मेकवि`शत्यनुगानं शाण्डिलीपुत्रो द्वावि`शति रिति वार्ष्या-यणीपुत्रो वैश्वदेवाः समैरयाः संशानानि भूतवदित्येकं चित्रं देवाना मन्तरिति द्वयोरपरं गन्धर्वाप्सरसा मानन्दप्रतिनन्दौ पक्षौ, सौर्योऽतीषङ्ग इन्द्रस्य च सधस्थं मरुतां भूतिः, प्रजापतेस्तिस्रः सार्पराज्ञः सर्पाणां वार्बुदस्य वा सर्पस्य धर्मरोचन मिन्द्रस्य वा षडैन्द्राः परिधय ऋतूनां वागादि पित्र्य मन्त्यं वैकल्पिकं तन्मित्रावरु-णयोश्चक्षु रित्याचक्षते श्रोत्रं च तदेवेके द्वितीयोऽतीषङ्गस्तन्मित्रावरुणयोः श्रोत्र मित्याचक्षते चक्षुश्च तदेवैके तृतीयोऽतीषङ्गस्तदिन्द्रस्य शिर इत्याचक्षत आदि-त्यस्योन्नयन्तदादित्यात्मेत्याचक्षत। ऐन्द्रो महानाम्न्यः प्रजापतेर्वा विष्णोर्वा विश्वामित्रस्य वा सिमा वा महया वा शक्वर्यो वा ॥ २९ ॥

॥ इति तृतीयः प्रपाठकः ॥

इत्यार्षेयं नाम सामवेदीयं तृतीयं ब्राह्मणम्

अनुब्राह्मणं वा समाप्तम् ॥

এখন আদিত্যব্রত নামক সাম কথিত হইতেছে। শাণ্ডিলী পুত্রের মতে মহাব্রত সাম একবিংশতি অনুগানযুক্ত কিন্তু বার্ষ্যায়ণী পুত্রের মতে ইহা দ্বাবিংশতি অনুগানযুক্ত।

বৈশ্বদেবাঃ সমৈরয়াঃ সংশানানি ভূতবৎ—ইহা দ্বারা প্রথম অনুগানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রং দেবানামও ইত্যাদি ঋগ্‌দ্বয়েগীয়মান দ্বিতীয় অনুগান। গন্ধর্বাপ্সরসাং আনন্দপ্রতিনন্দপক্ষৌ ইহা দ্বারা তৃতীয় ও চতুর্থ অনুগান প্রদর্শিত হইয়াছে।

সৌর্যোঽতিষঙ্গ ইন্দ্রস্য চ স্বধাস্থং মরুতাং ভূতিঃ—ইহা দ্বারা প্রজাপতেস্তিস্রঃ সার্পরাজ্ঞঃ—ইহাদ্বারা অষ্টম, নবম ও দশম অনুগান প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘর্ম্মরোচনমিন্দ্রস্য—ইহা দ্বারা একাদশের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ষড়ৈন্দ্রাঃ পরিধয়ঃ—ইহা দ্বারা দ্বাদশ হইতে সপ্তদশ পর্যন্ত অনুগানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋতূনাং বাগাদি পিত্র্যম্—ইহা দ্বারা অষ্টাদশ অনুগান প্রদর্শিত হইয়াছে। এক-বিংশতি অনুগানপক্ষে ঊনবিংশ অনুগান গীত হয় না। কিন্তু দ্বাবিংশতি অনুগান পক্ষে ইহা গীত হয়। কোন কোন ঋষি ইহাকে মিত্রাবরুণের চক্ষু বলেন আবার কেহবা ইহাকে মিত্রাবরুণের শ্রোত্র বলেন।

দ্বিতীয়োঽতিষঙ্গস্তন্মিত্রাবরুণয়োঃ শ্রোত্রমিত্যাচক্ষতে চক্ষুশ্চতদেবৈকে—ইহা দ্বারা বিংশ অনুগানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়োঽতিবঙ্গস্তদিন্দ্রস্ত শির ইত্যাচক্ষতে—ইহা দ্বারা একবিংশতি অনুগানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদিত্যস্তোম্রয়ং তদাদিত্যাম্বেত্যাচক্ষতে—ইহা দ্বারা দ্বাবিংশ অনুগানের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর মহানাম্নীর ঋষিসম্বন্ধ ও যোগরূঢ়ি দ্বারা সংজ্ঞা চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইতেছে। ইন্দ্র-বৃত্রের যুদ্ধে এই সকল সামের দ্বারা মহাশব্দ উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম মহানাম্নী। অথবা ইহারা প্রজাপতির সম্বন্ধীয়। অথবা ইহাদের দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সিমা অর্থাৎ শিরো-মধ্যদেশ ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা সিমাসংজ্ঞক। অথবা ইহা অনুকরণশব্দ। ইন্দ্র এইরূপ মহাশব্দ করিয়াছিলেন। অথবা ইহাদের নাম শাক্বর্য। এ সম্বন্ধে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা আছে—ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়া ছিলেন আমি বৃত্রকে বধ করিব। প্রজাপতি এই সকল ছন্দ হইতে ইন্দ্রিয়, বীর্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া ইন্দ্রকে দিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা দ্বারা বৃত্র বধ করিতে সমর্থ হইবে।" এই জন্য ইহাদের নাম শক্বরী হইয়াছে। বিষ্ণু ও বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধ শাখান্তরের জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্বরীর দুইবার উচ্চারণ অধ্যায় সমাপ্তি প্রদর্শনের জন্য।

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় প্রপাঠকের উনত্রিংশ খণ্ড

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত

ইতি আর্ষেয় ব্রাহ্মণ সমাপ্ত

এখানে তৃতীয় প্রপাঠক শেষ

ওঁ শম্

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ | ৮ম সংখ্যা

লোকায়ত*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের কথা উঠিলে আমাদের সাধারণতঃ মনে হয় "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চার্বাকপন্থীগণও একটি সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত দর্শনপ্রস্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজে যে তাঁহাদের প্রভাব আদৌ নগণ্য ছিল না তাহা বিপক্ষবাদী বহু দার্শনিকের বিবিধ উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। চার্বাক দর্শন সাধারণ্যে নাস্তিক দর্শন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু "নাস্তিক" কথাটির অর্থ "nihilist" নহে। স্বয়ং পাণিনি (সূ ৪।৪।৬০) নাস্তিক কথাটির ব্যুৎপত্তি বিধান করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার ব্যাখ্যাতৃগণের মতে যে-ব্যক্তি পরলোকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। কিন্তু পরলোকে যিনি বিশ্বাস করেন না তিনি আত্মার অস্তিত্বেই বা বিশ্বাস করিবেন কেন? হিন্দু ও বৌদ্ধ সকল সম্প্রদায়ই কোন না কোন রূপে আত্মবাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নৈরাত্ম্য বৌদ্ধগণের একটি প্রধান মন্ত্র হইলেও তাঁহারা যে ভিন্ন নামে এই আত্মাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা অনায়াসেই বলা যায়, কারণ পূর্বেই একাধিক বার দেখান হইয়াছে যে বৌদ্ধের অভিসম্মত আলয়বিজ্ঞান ও ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্ততি কার্যতঃ আত্মারই নামান্তর। পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মা সম্বন্ধে এই ঐক্যমত্যের প্রধান কারণ পরলোকে সকলের সমবিশ্বাস। নাস্তিকগণ এই পরলোকই স্বীকার করেন নাই, সুতরাং দেহাতিরিক্ত কোন আত্মা স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না। এইজন্য নাস্তিক দর্শন "দেহাত্মবাদ" নামেও পরিচিত।—তত্ত্বসংগ্রহে চার্বাক দর্শনের যেরূপ দীর্ঘ আলোচনা আছে সেরূপ আর কোথাও নাই। এই দর্শনের সূত্র ও বৃত্তিও তত্ত্বসংগ্রহে বহুবার উদ্ধৃত হইয়াছে।

নাস্তিক প্রথমে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর নিজের কথা হইতেই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে পরলোকে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নহে :—

যদি নানুগতো ভাবঃ কশ্চিদপ্যত্র বিদ্যতে।
পরলোকস্তদা ন স্যাদভাবাৎ পরলোকিনঃ ॥ ১৮৫৭ ॥

অর্থাৎ স্থিতিশীল কোন ভাববস্তুই যদি না থাকে তবে পরলোকের অস্তিত্বও অসম্ভব, কারণ পরলোকী জীব ও বস্তু অস্বীকার করিলে পরলোক স্বীকার করার কোন কারণ থাকে না।— বৌদ্ধ বলিতে পারেন না যে দেহ বিনষ্ট হইলেও আত্মা হইবে পরলোকী, যাহা আশ্রয় করিয়া পরলোক কল্পনা করা সম্ভব হইবে, কারণ বৌদ্ধ তো আত্মাই স্বীকার করেন না। বৌদ্ধের অভিসম্মত বিজ্ঞানও পরলোকী হইতে পারে না, কারণ সে-বিজ্ঞান হইল ক্ষণবিধ্বংসী।

এ-কথাও বৌদ্ধ বলিতে পারেন না যে ইহলোকের দেহাদিই পরলোকে অনুবৃত্ত হইয়া পরলোকীর কার্য করিবে, কারণ

দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদীনাং প্রতিক্ষণবিনাশনে।
ন যুক্তং পরলোকিত্বং নান্যশ্চাভ্যুপগম্যতে ॥ ১৮৫৮ ॥
তস্মাদ্ভূতবিশেষেভ্যো যথা শুক্তসুরাদিকম্।
তেভ্য এব তথা জ্ঞানং জায়তে ব্যজ্যতেঽথবা ॥ ১৮৫৯ ॥

অর্থাৎ, বৌদ্ধ নিজেই যখন বলেন যে দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি প্রতিক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে তখন দেহাদির পরলোকিত্ব তিনি সমর্থন কবিতে পাবেন না, এবং দেহাদি ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা যে বৌদ্ধ স্বীকার করেন তাহাও নহে ; সুতরাং বলিতে হইবে যে সুরাদির ন্যায় জ্ঞানও ভূতবস্তু (material substauce) হইতেই উৎপন্ন (জায়তে) বা অভিব্যক্ত (ব্যজ্যতে) হয়।— কমলশীল "পঞ্জিকায়" যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই কারিকাদ্বয়ে লোকায়তসূত্রের কথাই ছন্দোবদ্ধরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। কমলশীলের উদ্ধৃতি অনুযায়ী সূত্রটি এই :—"পরলোকিনোঽভাবাৎ পরলোকাভাবঃ"। লোকায়ত সম্প্রদায়ের সূত্রে আরও আছে :—"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি চত্বারি তত্ত্বানি, তেভ্যশ্চৈতন্যমিতি।" এই বচনটির ব্যাখ্যাচ্ছলে কোন কোন বৃত্তিকার বলিয়াছেন "উৎপদ্যতে তেভ্যশ্চৈতন্যম্", আবার অপরাপর বৃত্তিকার বলিয়াছেন "অভিব্যজ্যতে (তেভ্যশ্চৈতন্যম্)।" লোকায়তসূত্রের বৃত্তিকারদিগের মধ্যে এই মতভেদ আছে দেখিয়াই শান্তরক্ষিত কারিকায় বলিয়াছেন "জায়তে ব্যজ্যতেঽথবা।"

নাস্তিবাদীর এই কথার বিরুদ্ধে বৌদ্ধপক্ষ হইতে আপত্তি করা যাইতে পারে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও রূপাদি বিষয়াবলীর পরস্পর সংযোগের (প্রত্যয়, প্রতীত্যসমুৎপাদ) ফলেই যে জ্ঞানের উদ্ভব এ-কথা "অতিপ্রতীত" ; সুতরাং নাস্তিবাদী কিরূপে বলিতে পারেন যে পৃথিব্যাদি তত্ত্ব-চতুষ্টয় হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি ? লোকায়তপক্ষ হইতে ইহার উত্তর :—

সন্নিবেশবিশেষে চ ক্ষিত্যাদীনাং নিবেক্ষ্যতে।
দেহেন্দ্রিয়াদিসংজ্ঞেয়ং তত্ত্বং নান্যদ্ধি বিদ্যতে ॥ ১৮৬০ ॥

অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদিরই বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশের প্রতি দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞা আরোপিত হইয়া থাকে, ক্ষিত্যাদি ভিন্ন অপর কোন তত্ত্বের অস্তিত্বই নাই।—এই কারিকার ব্যাখ্যায় কমলশীল পুনরায় লোকায়ত সূত্র (তথা চ তেষাং সূত্রম্) হইতে একটি দীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :— "ক্ষিত্যাদির সমুদায়কেই বিষয় ও ইন্দ্রিয় বলা হয়; ইন্দ্রিয়াদি মহাভূতাবলী হইতে পৃথক্ কিছু নহে, ভূতাবলীর বিবিধ সংস্থানই ইন্দ্রিয়াদি নামে পরিচিত, কারণ সংস্থান কখনও সংস্থানী হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। ক্ষিত্যাদি মহাভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং এই চতুষ্টয়ের অতিরিক্ত অপর কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ মহাভূতও নাই; প্রত্যক্ষ ভিন্ন অপর কোন প্রমাণও নাই যদ্দারা (মহাভূতচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত) পরলোকাদি প্রমাণিত হইবে।"

অনুবর্তী কারিকাদ্বয়ের ব্যাখ্যাক্রমেও কমলশীল লোকায়ত মতের অনেক মূল্যবান্ কথার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু এই অংশও লোকায়তসূত্র হইতে হুবহু উদ্ধৃত কিনা তাহা বলা যায় না :—অতীতদেহবর্তী চৈতন্য যদি সদ্যোজাত দেহস্থ চৈতন্যের কারণস্বরূপ এবং অধুনামৃত চৈতন্য যদি আগামী চৈতন্যের কারণস্বরূপ হয় তাহা হইলে চিত্তধারার অবিচ্ছিন্নত্ব-বশতঃ পরলোক কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিবাদের বিষয়ীভূত চৈতন্যদ্বয়ের মধ্যে বাস্তবিক কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, যেহেতু চৈতন্যদ্বয় দুইটি বিভিন্ন দেহে অবস্থিত— অশ্বস্থ জ্ঞান যেমন গরুতে অনুবৃত্ত হইতে পারে না ইহাও তদ্রূপ (গবাশ্ববর্তিনোরিব জ্ঞানয়োঃ)।— এইরূপে পূর্বজন্ম খণ্ডন করিয়া নাস্তিবাদী এইবার পরজন্ম খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—

সরাগমরণং চিত্তং ন চিত্তান্তরসন্ধিকৃৎ।
মরণজ্ঞানভাবেন বীতক্লেশস্য তদ্যথা ॥ ১৮৬৩ ॥

অর্থাৎ, রাগযুক্ত (influenced by affection) যে চৈতন্য মৃত্যুর কবলে পতিত হইতেছে তাহা অপর কোন চৈতন্যের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, কারণ ক্লেশমুক্ত পুরুষের ন্যায় এই চৈতন্যও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।—লোকায়ত মতে তাহা হইলে চৈতন্য পূর্বজন্মলব্ধও নহে এবং পরজন্মবিস্তারীও নহে। চৈতন্যের উৎপত্তি তাহা হইলে কোথা হইতে হয়? ইহার উত্তরে লোকায়ত সম্প্রদায়ের সূত্রকার কম্বলাশ্বতর দ্বিধাশূন্য ভাষায় বলিয়াছেন "কায়াদেব", অর্থাৎ দেহ হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। ইহাতে কিন্তু আপত্তি করা যাইতে পারে, কললাবস্থায় যখন দেহ সম্পূর্ণরূপে গঠিতই হয় নাই তখনই এক প্রকারের চৈতন্য পরিলক্ষিত হয়। এই চৈতন্য মূর্ছিত, সম্পূর্ণ জাগ্রত নহে; কিন্তু তথাপি ইহা যে চৈতন্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শরীর সম্পূর্ণ আকারে উপস্থিত না থাকিতেই যখন বিজ্ঞানের উদ্ভব হইতেছে তখন চৈতন্যকে দেহজ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে?

ইহার উত্তরে নাস্তিবাদী বলিতেছেন, কললাদির কোন চৈতন্য নাই। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বস্তুই (ইন্দ্রিয়ার্থঃ) হইল বিজ্ঞানোৎপত্তির কারণ, কারণ জ্ঞান সর্বদা অধিগত অর্থের আকারেই দেখা দেয় (অর্থাধিগমরূপত্বাজ্‌জ্ঞানস্য)। কললাদ্যবস্থায় ইন্দ্রিয়াবলী

ও তজ্জন্য বিষয়াবলীরই যখন অভাব তখন এই ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগের ফল যে জ্ঞান তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে? সুতরাং বলিতে হইবে যে কললাদির মূর্চ্ছিতাবস্থায় প্রকৃত কোন চৈতন্যই সম্ভব হয় না। একথাও বলা যাইবে না যে কললাদিতে বিজ্ঞান শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে, কারণ কললাবস্থায় নৈয়ায়িকপরিকল্পিত জ্ঞানাশ্রয় আত্মা এবং বৌদ্ধপরিকল্পিত বিজ্ঞানসন্তান এই দুইয়েরই অভাব। শক্তি যখন একটা কিছু আশ্রয় না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, এবং কললাদিতে যখন আত্মা, বিজ্ঞানসন্তান বা তৃতীয় কোন জ্ঞানাশ্রয়ের প্রমাণ নাই, তখন এ-কথাও বলা যাইবে না যে কললাদিতে চৈতন্য শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে দেহই হইল জ্ঞানের আশ্রয়, কারণ দেহ ভিন্ন অপর কোন জ্ঞানাধারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এখন এই দেহই যখন জ্ঞানাশ্রয় তখন দেহান্তে জ্ঞান নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হইলে এই আশ্রয়হীন জ্ঞান কিরূপে তৎপরেও অবস্থান করিতে থাকিবে? সুতরাং বলিতে হইবে যে পরজন্ম নাই।

লোকায়ত মতের বিরুদ্ধে যদি এখন বলা হয় যে মরণের অব্যবহিত কাল পরে পূর্ব-চৈতন্য একটি অন্তরাভাবী (intermediate) দেহ আশ্রয় করিয়া অনুবৃত্ত হইতে থাকে তবে তাহার উত্তর, একই চৈতন্য যদি পূর্বদেহ এবং অন্তরাভাবী দেহ এই দুইটি বিভিন্ন দেহে প্রবাহিত হইতে পারে তবে গজ অশ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জন্তুতেও একই চৈতন্যধারা প্রবাহিত হইতেছে এ-কথা মনে করা যাইবে না কেন? সুতরাং

> একো জ্ঞানাশ্রয়স্তস্মাদনাদিনিধনো নরঃ।
> সংসারী কশ্চিদেষ্টব্যো যদ্বা নাস্তিকতা পরা ॥ ১৮৭১ ॥

অর্থাৎ, পরজন্মে পূর্বচৈতন্যের অনুবৃত্তি স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাশ্রয় রূপ অনাদিনিধন একটি সংসারী (=দুইটি প্রলয়ের অন্তর্বর্তী সমস্ত কাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত) পুরুষও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু তাহা যখন বৌদ্ধ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন তখন তাঁহাকে নাস্তিকতাই সমর্থন করিতে হইবে (অর্থাৎ, বলিতে হইবে যে পরজন্ম নাই এবং দেহ হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি)।—ইহাই গেল নাস্তিবাদীর পূর্বপক্ষ। শান্তরক্ষিত এইবার দীর্ঘচ্ছন্দে চার্বাকদর্শনের খণ্ডন আরম্ভ করিলেন।

নাস্তিবাদীকে বৌদ্ধ প্রথমেই প্রশ্ন করিতেছেন তিনি যে পরলোক অস্বীকার করিতে চাহেন তাহা প্রকৃত পক্ষে কি? বিজ্ঞানাদির ক্ষণসন্ততিমূলক যে স্কন্ধচতুষ্টয় উপাদান ও উপাদেয় রূপে কারণ ও কার্যে পরিণত হয়—এই পরলোক কি তাহা হইতে পৃথক্ আর কিছু না তাহাই? এখানে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না, কারণ উপাদান ও উপাদেয়ে পরিণত বিজ্ঞানসন্ততি ভিন্ন অপর কোন প্রকারের "পরলোকই" বৌদ্ধের অভিসম্মত নহে। অনাদ্যনন্ত বিজ্ঞানসন্তানের কয়েকটি বর্ষশতাদিব্যাপী বিভিন্ন খণ্ডকে বিশিষ্টার্থে পরলোক, পূর্বলোক বা ইহলোক বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে (জ্ঞানাদিসন্ততেরনাদ্যনন্তায়াঃ কাচিদেব বর্ষশতাদ্যবধিরূপমর্যাদা-ব্যবচ্ছিন্ন পরলোকঃ পূর্ব ইহেতি বা ব্যবস্থাপ্যতে), কিন্তু ইহা পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত নহে।

নাস্তিবাদী বলেন, "পুরুষ কেবল ততখানি যতখানি ইন্দ্রিয়গোচর হয়, এবং পরলোক হইল ভিন্ন দেশ ভিন্ন কাল এবং ভিন্ন অবস্থা" ; দৃষ্ট সুখ অপেক্ষা মহত্তর কিছু নাস্তিবাদী কল্পনা করিতে পারেন না বলিয়াই তিনি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে পরলোকও ইন্দ্রিয়ভোগ্য হওয়া চাই।—অপর দিকে, নাস্তিবাদীর "পরলোক" যদি কার্যকারণে পরিণত বিজ্ঞানাদি সন্ততি হইতে পৃথক্ আর কিছু হয়, এবং নাস্তিবাদী যদি এই পরলোক অস্বীকার করিতে চাহেন, তবে বৌদ্ধের সহিত তাঁহার কোন মতবৈরুধ্যই নাই, কারণ বৌদ্ধও এই প্রকারের পরলোক অস্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে বিজ্ঞানসন্ততি যখন অবস্তু তখন সেই সন্ততির অন্তর্গত যে অবস্থাবিশেষকে বৌদ্ধ পরলোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত তাহাও অবস্তু, পারমার্থিক নহে। এই আপত্তি কিন্তু গ্রাহ্য নহে, কারণ "সন্ততি" বলিতে বস্তুভূত বিভিন্ন ক্ষণাবলীই (সন্তানিনঃ) বুঝায়, ধবখদিরাদি বিভিন্ন বৃক্ষকে যেমন যুগপৎ "বন" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। কিন্তু সন্ততি যদি বস্তুভূত ক্ষণাবলীই হয় তবে আর তাহাকে অবস্তু বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন, যে-সন্ততিকে একাত্মক বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা ক্ষণাবলী হইতে পৃথক্ এবং অপৃথক্ দুইই হওয়ায় (তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্) অবাচ্য বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় অবস্তু; এই সন্ততিরূপ অবস্তুর অবস্থাবিশেষকেই যে বৌদ্ধ পরলোক বলিয়া মনে করেন তাহা নহে (ন তস্যা অবস্থা-বিশেষে পরলোকব্যবস্থাস্মাভিঃ ক্রিয়তে)। এখন পূর্বপক্ষী এই বিজ্ঞানসন্ততিকেই পরলোক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তিনি এই সন্ততির স্বরূপ পর্যন্ত অস্বীকার করিয়া সেই অস্বীকৃতির বলে পরলোক খণ্ডনের চেষ্টা করিতে পারেন না, কারণ বিজ্ঞানসন্ততি অস্বীকার করিলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্যেরই অপলাপ করা হইবে। পরলোকনিষেধই যদি পূর্বপক্ষীর উদ্দেশ্য হয় তবে তিনি বড়জোর বলিতে পারেন যে বিজ্ঞানসন্ততি অনাদ্যনন্ত নহে।

কিন্তু বিজ্ঞানসন্ততি অনাদি এবং অনন্ত নয়ই বা কেন? যদি বলা হয় যে জন্মের সময়ে জীবের মধ্যে যে-চৈতন্য দেখা যায় তাহাই হইল আদিচৈতন্য তাহা হইলে এই পাঁচটি পক্ষের একটি না একটি অঙ্গীকার করিতে হইবে:—(১) চৈতন্য নির্হেতুক, (২) চৈতন্য বিজ্ঞান, ঈশ্বর প্রভৃতি কোন না কোন নিত্য হেতু হইতে উদ্ভূত, (৩) চৈতন্য স্বতঃই নিত্য, (৪) চৈতন্য যেকোন ভূতবস্তু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, (৫) অথবা চৈতন্যের হেতু অপর কোন সন্তানে অবস্থিত। অপর দিকে, যদি দেখান যায় যে বিজ্ঞানসন্ততির প্রতিক্ষণের হেতু হইল পূর্বক্ষণে বর্তমান তাহা হইলে প্রমাণিত হইবে যে বিজ্ঞানসন্ততি অনাদি।

এখন জন্মচৈতন্যকেই আদিচৈতন্য রূপে গ্রহণ করিলে যে পাঁচটি পক্ষ পাওয়া যায় তাহার কোনটিই যুক্তিসহ নহে। প্রথম পক্ষানুযায়ী এ-কথা বলা যায় না যে চৈতন্য নির্হেতুক, কারণ তাহা হইলে চৈতন্য নিত্য হইয়া পড়িবে যাহা বৌদ্ধ বা নাস্তিক কেহই বিশ্বাস করেন না। যে বস্তুর উৎপত্তিতে কোন হেতুর অপেক্ষা নাই সেই বস্তুর বিনাশও কোন কারণেই ঘটিতে পারে না—এইজন্য চৈতন্যকে নির্হেতুক বলার অর্থ চৈতন্যের নিত্যত্ব

অঙ্গীকার করা। এই কারণেই দ্বিতীয় পক্ষও অসম্ভব, কারণ যে বস্তুর হেতু নিত্য সেই বস্তুটি স্বয়ং নিত্য না হইয়া পারে না। চৈতন্য যে আপনা হইতেই নিত্য হইতে পারে না (তৃতীয় পক্ষ) তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ চৈতন্যের ক্ষণিকত্ব পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। চতুর্থ পক্ষ খণ্ডনের জন্য কমলশীল দীর্ঘ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এখানে পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে ভূতবস্তু (matter) হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি। চার্বাকগণ চারিটি মহাভূত স্বীকার করিতেন (বোধ হয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ)। এখন ভূতাবলীর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিয়া যদি চার্বাক বলেন যে মহাভূত হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি তাহা হইলেও কি বৌদ্ধ আপত্তি করিবেন? উত্তরে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল দেখাইতেছেন যে ক্ষণিকবাদ ও নাস্তিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে অঙ্গীকার করা যায় না।

প্রথমেই বিবেচ্য, দেহ ও বুদ্ধির মধ্যে যে কারণকার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার কোনই প্রমাণ নাই। দেহ ও চৈতন্য একত্র অবস্থিত বলিয়া দেহকে চৈতন্যের হেতু বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই; যে-দেশে মাতার বিবাহ হইয়াছে সেই দেশে খর্জুর পাওয়া যায় বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে যে-দেশে খর্জুর আছে সেই দেশেই পিতা বর্তমান? দেহ যে চৈতন্যের কারণ হইতে পারে না তাহা পরে দেখান হইবে। কিন্তু তর্কের অনুরোধে যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে দেহই চৈতন্যের কারণ তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে অবয়বীরূপ সমগ্র দেহটিই কারণ, অথবা দেহ যদ্দ্বারা গঠিত সেই পরমাণুসমষ্টিই প্রকৃত কারণ। আরও প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সেই কারণস্বরূপ দেহটি সেন্দ্রিয় না অনিন্দ্রিয়? কারণ হইলেও দেহটি কোন্ কারণ, উপাদান কারণ না সহকারী কারণ? পূর্বপক্ষীকে এইরূপে প্রশ্নজালে আচ্ছন্ন করিয়া কমলশীল বলিতেছেন অবয়বীরূপ দেহটিকে চৈতন্যের হেতু বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ অবয়ব হইতে পৃথক্ কোন অবয়বীর যে অস্তিত্বই নাই তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে। আরও বিবেচ্য এই যে, এই উক্তি পূর্বপক্ষীর নিজের মতেরই বিরুদ্ধে যাইবে, কারণ দেহ যখন তাঁহার মতে 'একটি' অবয়বী তখন আর তিনি কিরূপে বলিতে পারেন যে সেই দেহ চতুর্মহাভূতের সমবায়ে উৎপন্ন? চতুর্বিধ বস্তুর সমবায়ে যাহা গঠিত তাহা কখনই একস্বভাব হইতে পারে না। বহু পরমাণুর একত্র সঞ্চয়ের ফলে যে চৈতন্যের হেতুস্বরূপ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও নহে, কারণ সে-ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে প্রত্যেক পরমাণুই চৈতন্যের একটি হেতু না পরমাণুসমষ্টি চৈতন্যের অদ্বিতীয় হেতু। প্রত্যেকটি পরমাণু পৃথক্‌ভাবে চৈতন্যের হেতু হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে প্রতি বীজ হইতে যেমন এক একটি অঙ্কুর উৎপন্ন হয় প্রতি দেহপরমাণু হইতেও সেইরূপ এক একটি পৃথক্ চৈতন্য উৎপন্ন হইবে। আবার দেহের অঙ্গাবলী যে সমগ্রভাবে চৈতন্যের অদ্বিতীয় কারণ তাহাও নহে, কারণ তাহা হইলে নাসিকাদি ছিন্ন হইলেও চৈতন্য অক্ষুণ্ণ থাকে কিরূপে? পূর্বপক্ষী যদি এখন বলেন যে সেন্দ্রিয় দেহই চৈতন্যের হেতু, নিরিন্দ্রিয় দেহ নহে,—তবে জিজ্ঞাস্য প্রসুপ্তিকাদি রোগবশতঃ কার্যেন্দ্রিয়াদি উপহত হইলেও চৈতন্য অক্ষুণ্ণ থাকে কেন? আবার নিরিন্দ্রিয় দেহও এই হেতু হইতে পারে না

কারণ তাহা হইলে কলেবরচ্যুত হস্তাদিরও হেতুত্ব নিবারণ করা যাইবে না।—অনুক্ত। আরও বহু যুক্তির অবতারণা করিয়া কমলশীল দেখাইলেন যে দেহ চৈতন্যের উপাদান কারণ বা সহকারী কারণও হইতে পারে না, এবং দেহনিরপেক্ষ এই চৈতন্য হইল অনাদি। সুতরাং চার্বাক যে বলিবেন ক্ষণভঙ্গী দেহই চৈতন্যের হেতু—তাহাও সম্ভব নহে। শান্তরক্ষিত এখানে চার্বাককে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন :—

যদি ন্যায়ানুরাগাদ্বঃ স্বপক্ষেঽপ্যনপেক্ষতা।
ভূতান্যেব ন সন্তীতি ন্যায়োঽয়ং পর ইষ্যতাম॥ ১৮৮৮॥

অর্থাৎ, চার্বাক যদি ন্যায়ের প্রতি অনুরাগবশতঃ স্বপক্ষীয় মত পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গীকার করেন যে সর্ববস্তু ক্ষণিক তবে আর তাঁহার এইটুকু স্বীকার করিতেই যা বাকি থাকে কেন যে ভূতাবলীর প্রকৃত অস্তিত্ব নাই?—এইরূপে আদি চৈতন্যবিষয়ক পাঁচটি পক্ষের মধ্যে প্রথম চারিটি খণ্ডিত হইল। পঞ্চম পক্ষটির বিরুদ্ধে (চৈতন্যের হেতু পৃথক্ চিত্তসন্তানে অবস্থিত) এইবার শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

সন্তানান্তরবিজ্ঞানং তস্য কারণমিষ্যতে।
যদি তৎ কিমুপাদানং সহকার্যথবাস্য কিম্॥ ১৮৯৩॥
উপাদানমভীষ্টং চেত্তনয়জ্ঞানসন্ততৌ।
পিত্রোঃ শ্রুতাদিসংস্কারবিশেষানুগমো ভবেৎ॥ ১৮৯৪॥
উপাদানতদাদেয়ধর্মোঽয়ং যদ্ব্যবস্থিতঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং নিশ্চিতশ্চ স্বসন্ততৌ॥ ১৮৯৫॥
স্বোপাদানবলোদ্ভূতে সহকারিত্বকল্পনে।
সন্তানান্তরচিত্তস্য ন কাচিদ্ব্যাহতির্ভবেৎ॥ ১৮৯৬॥

অর্থাৎ, আদিচৈতন্যের হেতু যদি পৃথক্ কোন চিত্তসন্তানে অবস্থিত হয় তাহা হইলে প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, সেই হেতুটি উৎপদ্যমান আদিচৈতন্যের উপাদান কারণ না সহকারী কারণ? পূর্বপক্ষী যদি বলেন উপাদানকারণ, তাহা হইলে পিতামাতার বিদ্যাদি বিষয়ক বিশেষ সংস্কারও তনয়ের জ্ঞানসন্ততিতে অনুক্রান্ত হওয়া উচিত। স্বীয় জ্ঞানসন্ততির উপাদান কারণের যে ইহাই নিয়ম তাহা যখন অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন সে-নিয়মের এ ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম হইবে কেন? কিন্তু যদি মনে করা হয় যে সন্তানান্তরস্থ চৈতন্য স্বীয় উপাদান হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথক একটি আদিচৈতন্যের সহকারী কারণ স্বরূপ কার্য করিতেছে তবে তাহাতে আপত্তির কিছু নাই।—শান্তরক্ষিত এখানে বিচার করিতেছেন, পিতামাতার জ্ঞানসন্তানের সহিত পুত্রের জ্ঞানসন্তানের কি সম্বন্ধ। পিতামাতার জ্ঞানসন্তান সদ্যোজাত শিশুর জ্ঞানসন্তানের উপাদান কারণ হইতে পারে না, কারণ পিতামাতার জ্ঞানসন্তান পুত্রের জ্ঞানসন্তানের উপাদান হইলে পিতামাতার জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় পুত্রেও অর্শান উচিত—যাহা অবশ্যই কখনও ঘটে না। তবে যদি চার্বাক এইমাত্র বলিতে চাহেন যে পিতামাতার জ্ঞান

পুত্রের জ্ঞানের সহকারীকারণ—তাহা বৌদ্ধও স্বীকার করিতে প্রস্তুত।—কমলশীল এই সম্পর্কে আরও অনেক প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু বাহুল্যভয়ে সেগুলির আলোচনা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইবে।—অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে,

তস্মাত্তত্রাদিবিজ্ঞানং স্বোপাদনবলোদ্ভবম্।
বিজ্ঞানত্বাদিহেতুভ্য ইদানীন্তনচিত্তবৎ ॥ ১৮৯৭ ॥

অর্থাৎ, এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে আদি বিজ্ঞান অপর কোন বিজ্ঞানধারা হইতে উৎপন্ন না হইয়া স্বীয় উপাদান হইতেই উদ্ভূত হয়, (পিতামাতার বিজ্ঞান যে পুত্রে সংক্রামিত হয় তাহা নহে)। কারিকাটির দ্বিতীয়ার্ধ কমলশীলের সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী সত্ত্বেও দুর্বোধ্য।

পূর্বজন্ম এইরূপে প্রমাণিত করিয়া শান্তরক্ষিত এইবার পরজন্ম সাধনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—

মরণক্ষণবিজ্ঞানং স্বোপাদেয়োদয়ক্ষমম্।
রাগিণো হীনসঙ্গত্বাৎ পূর্ববিজ্ঞানবত্তথা ॥ ১৮৯৯ ॥

অর্থাৎ, মরণক্ষণের বিজ্ঞান স্বীয় উপাদান হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা উৎপাদন করিতে সমর্থ; এই বিজ্ঞান যে কেন কিছু না কিছু উৎপাদন করিতে বাধ্য তাহাই দেখাইবার জন্য শান্তরক্ষিত কারিকাটির দ্বিতীয়ার্ধে বলিতেছেন যে পূর্বজন্মের চৈতন্যের ন্যায় ইহজন্মের চৈতন্যও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাগাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া পরজন্ম পরিহার কবিতে পারে না।

চার্বাক স্বীকার করেন না যে কললাদিতেও (foetus) চৈতন্য আছে। ইহার বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

কললাদিষু বিজ্ঞানমস্তীত্যেতন্ন সাহসম্।
অসঞ্জাতেন্দ্রিয়ত্বেঽপি জ্ঞানং তত্র ন কিং ভবেৎ ॥ ১৯২০ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থবলোদ্ভূতং সর্বং বিজ্ঞানমিত্যদঃ।
সাহসং বেদ্যতে যস্মাৎ স্বপ্নাদাবন্যথাপি তৎ ॥ ১৯২১ ॥
রূপমর্থগতেরন্যদপ্যন্য ব্যবসীয়তে।
মূর্ছাদাবপি তেনাস্য সদ্ভাব উপপদ্যতে ॥ ১৯২২ ॥

অর্থাৎ, কললাদিতেও যে বিজ্ঞান আছে ইহা হঠকারিতার কথা নহে, ইন্দ্রিয়সঞ্জাত না হইলে যে জ্ঞান সম্ভব নয় ইহা মনে করিবার কি কারণ আছে? প্রকৃতপক্ষে হঠকারিতার কথা যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই যে সর্ববিজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও অর্থাবলী হইতে উৎপন্ন, কারণ এতদ্ব্যতিরেকেও যে বিজ্ঞান উদ্ভূত হইতে পারে তাহা স্বপ্নাদি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আরও বিবেচ্য এই যে বিজ্ঞাত বস্তুর যে-রূপটি বাস্তবিক ব্যবসিত (apprehended) হয় সেই রূপটি অনেক সময় প্রকৃত অর্থগত রূপ হইতে বিভিন্ন,—মূর্ছাদির সময় যাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল কারণে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে কললাদিতে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আদৌ অসম্ভব নহে। শান্তরক্ষিতের এই কারিকাত্রয় সরল, সুতরাং এখানে কোন টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই।

জন্মান্তরবাদের সপক্ষে বিজ্ঞানবাদীর প্রধান যুক্তি এইখানে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের দিক হইতেও এই কারিকাত্রয় অতিশয় মূল্যবান্।—পূর্বপক্ষী কিন্তু ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া আপত্তি করিতেছেন যে কললাদির বিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞানের শক্তি মাত্র (potential consciousness)। সাধারণ বুদ্ধিতে লোকে এই কথাই বলিবে, কিন্তু শান্তরক্ষিত এ-কথা স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন :—

ন চাপি শক্তিরূপেণ তথা ধীরবতিষ্ঠতে।
স্বরূপেণৈব বুদ্ধীনাং ব্যবস্থানং তথা মতম্ ॥ ১৯২৩ ॥
সুপ্তমূর্ছাদ্যবস্থাসু চেতো নেতি চ তে কুতঃ।
নিশ্চয়ো বেদনাভাবাদিতি চেৎ স কুতো গতঃ ॥ ১৯২৪ ॥
যদীত্থং ভবতস্তাসু নিশ্চয়ঃ সংপ্রবর্ততে।
ন বেদ্মি চিত্তমিত্যেবং সতি সিদ্ধা সচিত্ততা ॥ ১৯২৫ ॥
স্যান্মতং যদি বিজ্ঞানং দশাস্বাস্বস্তি তৎ কথম্।
ন স্মৃতিঃ প্রতিবুদ্ধাদেঃ তদাকারা ভবেদিতি ॥ ১৯২৬ ॥
তদকারণমত্যর্থং পাটবাদেবসম্ভবাৎ।
স্মরণং ন প্রবর্তেত সদ্যোজাতাদিচিত্তবৎ ॥ ১৯২৭ ॥

পূর্ববর্তী কারিকাদ্বয়ের ন্যায় এই কারিকাকয়টিতেও কেবল যে বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে তাহাই নহে; এখানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বেদান্তাদি দর্শনের পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য; বিশেষ করিয়া বেদান্ত দর্শনের পক্ষে, কারণ ক্ষণিকত্ব ব্যতিরেকে বিজ্ঞানবাদ ও বেদান্তে বাস্তবিকই বিশেষ কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।—শান্তরক্ষিত বলিতেছেন, কললাদির চৈতন্য কেবল মাত্র চৈতন্যশক্তি নহে, তাহাও পূর্ণ চৈতন্য। বৌদ্ধের মত হইল এই যে কললাদিতে বুদ্ধি পূর্ণ স্বরূপে বর্তমান থাকে। সুপ্তি, মূর্ছা প্রভৃতির অবস্থায় যে চৈতন্য লোপ পায়—এই অদ্ভুত কথা পূর্বপক্ষী কোথা হইতে শিখিলেন? পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে এই সকল অবস্থায় অনুভূতির (বেদনা) অভাব ঘটে দেখিয়াই মনে করা হয় যে চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, তবে জিজ্ঞাস্য অনুভূতির যে বাস্তবিকই লোপ ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল কিরূপে? পূর্বপক্ষী যদি ইহার উত্তরে বলেন "মূর্ছাদির অবস্থায় চৈতন্য উপলব্ধি করিতে পারি না" ("ন বেদ্মি চিত্তং") তবে তাঁহার এই কথা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে ঐ অবস্থাতেও তাঁহার চৈতন্য বিদ্যমান ছিল। (কারণ চৈতন্য না থাকিলে কেহ বিদ্ ধাতুর প্রয়োগ করিতে পারে না।) পূর্বপক্ষী এখন আপত্তি করিতে পারেন, মূর্ছাভঙ্গের পর তদ্বিষয়ক কোন স্মৃতি থাকে না কেন? শান্তরক্ষিত ইহার উত্তরে বলিতেছেন, এই যুক্তি এমন কোন সম্যক্ কারণ নহে যদ্দ্বারা বৌদ্ধ পক্ষ খণ্ডিত হইবে। মূর্ছাবস্থার স্মৃতি যে বিদ্যমান থাকে না তাহার কারণ তখন চৈতন্যের তীক্ষ্ণতা (পাটব) লোপ পায়; সদ্যোজাত শিশুর চৈতন্যও এইরূপ।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল যে মূর্ছাদির অবস্থায় অথবা সদ্যোজাত শিশুতে যে একেবারেই

চৈতন্য থাকেনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই সকল অবস্থায় চৈতন্য যে বিদ্যমান থাকেই তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, স্বপ্নমূর্ছাদির অবস্থায় চৈতন্য একেবারেই থাকেনা বলার অর্থ স্বপ্নাদিকে মৃত্যুর সমান জ্ঞান করা, এবং স্বপ্নাদির পর যে-চৈতন্য উদ্ভূত হয় তাহাকে পৃথক্ চৈতন্য মনে করিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা অস্বীকার করা হয়। (কমলশীল এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছেন:—মূর্ছার পর "নব" চৈতন্যের অভ্যুদয়েই যদি মানুষের বুদ্ধি জাগ্রত হয় তবে এই "নব" চৈতন্য পুনর্জন্মের নবচৈতন্য হইতে পৃথক্ করার উপায় থাকিবে না, এবং মৃত্যু ও মূর্ছার মধ্যে ভেদও লোপ পাইবে, কারণ মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের চৈতন্যও যে এই অর্থে "নব" চৈতন্য তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এক্ষেত্রে মৃত্যুকেও মূর্ছা মনে করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না)। সুতরাং

স্বতন্ত্রা মানসী বুদ্ধিশ্চক্ষুরাদ্যনপেক্ষণাৎ।
স্বোপাদানবলেনৈব স্বপ্নাদাবিব বর্ত্ততে ॥ ১৯৩০ ॥

অর্থাৎ, মানসী বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধীন নহে; জাগ্রত অবস্থাতেও ইহা স্বপ্নাদির অবস্থার মত স্বীয় উপাদানের বলেই উদ্বুদ্ধ হয়।—ইহা প্রায় বেদান্তের কথা। তত্ত্ব-সংগ্রহে ইহার পর লোকায়ত সম্বন্ধ আর যে-সমস্ত কথা আছে সেগুলিতে কেবল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-বাদের উৎকর্ষ প্রমাণ করিবার চেষ্টা, সুতরাং তাহার আর আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কমলশীল ১৯৩৮ সংখ্যক কারিকার উপর টিপ্পনীতে সাংখ্যপরিকল্পিত আতিবাহিক শরীর (= লিঙ্গশরীর) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা ইহতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বৌদ্ধমতে সাংখ্যের লিঙ্গশরীর চৈতন্যধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহানির্বাণ তন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব

জপ—বিধিবৎ মন্ত্রোচ্চারণের নাম জপ। জপ কেবল মন্ত্র আবৃত্তি করা নহে; জপে মন্ত্র-প্রতিপাদ্য দেবতার ভাবনা করিতে হয়। এইজন্য পাতঞ্জল দর্শনে জপের সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"। জপের নিয়ম ষট্‌কর্ম দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। জপ তিনপ্রকার—(১) বাচিক (২) উপাংশু (৩) মানসিক। বাচিক জপে মন্ত্র শ্রুতি-গোচর হয়। উপাংশুজপে কেবল একটা অস্পষ্ট ওষ্ঠ সঞ্চালনের শব্দ হয় মাত্র। মানসজপে শুধু মনে মনে মন্ত্র উচ্চারিত হয়। তিনপ্রকার জপের মধ্যে মানস জপই সর্বোৎকৃষ্ট, তন্নিম্নে উপাংশুজপ, এবং সর্বনিম্নে বাচিক জপ। মন্ত্রার্থের প্রতি চিন্তাধারা যতবেশী নিবিষ্ট হয় জপ ততই বেশী কার্যকরী হয়। জপ নির্দিষ্ট সংখ্যায় করিতে হয়। সাধারণতঃ ১০৮ বার জপ করিতে হয়। জপ হস্তাঙ্গুলে এবং সম্প্রদায় ভেদে রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিক মালায়ও করা হয়।

পুরশ্চরণ—নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্রজপকরাকে পুরশ্চরণ বলে। মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় পুরশ্চরণে প্রত্যহ সম সংখ্যক জপ করিতে হয়, ন্যূনাধিক করিলে ব্রতভঙ্গ হয়। স্বগৃহ, বিল্বমূল, বা তীর্থস্থান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পুরশ্চরণ করা যায় বটে, কিন্তু স্থানভেদে ফলের তারতম্য হয়। স্বয়ং কিংবা উপযুক্ত গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিবার বিধি। যদি তেমন গুরু না থাকেন, তবে নানা গুণ-বিশিষ্ট অন্য সৎব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করিতে হয়। পুরশ্চরণের প্রণালী তন্ত্রসারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

মনের স্থিরতা সাধনের জন্য **মুদ্রাসাধন** করিতে হয়। মুদ্রা অসংখ্য, তন্মধ্যে কতকগুলি কেবল যোগসাধনায় করা হয়।

পূজায় সাধারণতঃ পঞ্চমুদ্রা (আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সংবোধিনী, সম্মুখীকরণী), ধেনুমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, সংহারমুদ্রা, কূর্মমুদ্রা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এইগুলির বিবরণ মূলগ্রন্থের স্থানে স্থানে বিবৃত হইল। যোনীমুদ্রা পূজায় ও যোগসাধানায় বেশ উভয়বিধ যোনীমুদ্রামধ্যে উভয়ত্র ব্যবহৃত হয়। তবে পার্থক্য আছে। পূজার যোনীমুদ্রা যথা—

মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জন্যুপরি সংস্থিতে।
অনামিকা মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠকে॥
সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠ পরিপীড়িতাঃ।
এষা তু প্রথমা মুদ্রা যোনীমুদ্রেয়মীরিতা॥ (মুদ্রানির্ঘণ্ট)

অর্থাৎ মধ্যমা বক্র করিয়া তর্জনীর উপরে রাখিবে এবং কনিষ্ঠাকে অনামিকার মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া সকলগুলি একত্র সংযোজিত করতঃ অঙ্গুষ্ঠদ্বারা চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ করিলে যে মুদ্রা হয় তাহাই যোনীমুদ্রা। যোগসাধনায় যে যোনীমুদ্রা ব্যবহৃত হয় ঘেরণ্ডসংহিতায় বর্ণিত তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইতেছে "সিদ্ধাসনে সমাসীন হইয়া কর্ণযুগল অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, নেত্রযুগল তর্জনীদ্বয় দ্বারা, নাসিকাদ্বয় মধ্যমাদ্বয় দ্বারা এবং মুখ অনামিকাদ্বয় দ্বারা নিরুদ্ধ করিবে। কাকীমুদ্রা[১] দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত করিবে এবং শরীরস্থ ষট্‌চক্রকে তাহাদের ক্রম অনুসারে মনে মনে চিন্তা করতঃ 'হং' ও 'হংস' মন্ত্রদ্বয় দ্বারা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিবে ও জীবাত্মার সহিত মিলিত করিয়া তাহাকে সহস্রারে উত্থাপিত করতঃ চিন্তা করিবে—"শক্তিময় আমি শিব সহ সঙ্গমাসক্ত হইয়া পরম আনন্দ ভোগ করিতেছি এবং শিব শক্তির সংযোগে আমিই আনন্দময় ব্রহ্ম।"

তন্ত্রে যোগের কথা—তন্ত্র প্রকৃতপক্ষে একটি কঠিন যোগশাস্ত্র। যে শাস্ত্রে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ বা তন্ত্রের ভাষায় সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ বিবৃত হইয়াছে তাহাকেই যোগশাস্ত্র বলা হয়। পাতঞ্জলদর্শন মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। যোগ দ্বিবিধ—হঠযোগ ও রাজযোগ। হঠযোগী ঘেরণ্ড ঋষি বলেন যে হঠযোগ রাজযোগের সোপান মাত্র। কিন্তু হঠযোগের সমস্ত প্রক্রিয়া রাজযোগের সোপান গণ্য হইতে পারে না; অনেকগুলি প্রক্রিয়া শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ও ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়মাত্র।

রাজযোগ অষ্টাঙ্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার বহিরঙ্গ, এবং ধ্যান, ধারণা ও সমাধি অন্তরঙ্গ। যম ও নিয়ম[২] প্রত্যেকটি আবার দশটি করিয়া। যম দশটী যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জব (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমভাব) ক্ষমা, ধৃতি (চিত্তের স্থৈর্য্য) আহার ও শৌচ (বাহ্য ও অভ্যন্তর)। নিয়ম দশটী যথা—তপ, সন্তোষ, অস্তিক্য, দান, ঈশ্বরার্চনা, শ্রবণ (বেদান্ত দর্শনে শ্রবণকে সিদ্ধান্তশ্রবণ বলা হইয়াছে), লজ্জা, মতি, জপ এবং ব্রত বা যজ্ঞ।

(১) আসন—আসন অসংখ্য, তন্মধ্যে বত্রিশটী আসনই কল্যাণকর বলিয়া ঘেরণ্ড ঋষি বলেন। এই বত্রিশটী আসনের মধ্যে, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, মুক্তাসন, স্বস্তিকাসন ও বীরাসন এই কয়টীই সাধারণতঃ সাধন ভজনে ব্যবহৃত হয়।

(ক) **সিদ্ধাসন**—বামপায়ের গোড়ালিদ্বারা যোনীদেশ সংপীড়ন করিয়া অন্য গোড়ালি উপস্থের উপরে রাখিবে এবং চিবুক হৃদয়ের উপর স্থাপিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে হৃদয়ের মধ্যভাগে দৃষ্টি রাখিবে। (খ) **পদ্মাসন**—দুই রকমের—মুক্ত পদ্মাসন ও বদ্ধ পদ্মাসন। বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামপদ রাখিয়া হস্ততলদ্বয় উরুদ্বয় মধ্যে স্থাপন করতঃ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে। ইহাই মুক্ত পদ্মাসন। এইরূপভাবে

---

(১) ঘেরণ্ড-সংহিতা দ্রষ্টব্য।
(২) যম ও নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ঘেরণ্ড-সংহিতায় দ্রষ্টব্য।

পদ ও উরুদ্বয় রাখিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা পৃষ্ঠদেশ হইতে পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে বদ্ধ পদ্মাসন হয়। (গ) **মুক্তাসন**—পায়ু মূলে বাম গুল্ফ বিন্যাস পূর্বক দক্ষিণ গুল্ফ তদুপরি স্থাপন করিবে এবং শির ও গ্রীবা সমভাবে রাখিয়া সবলদেহে উপবিষ্ট হইবে। (ঘ) **স্বস্তিকাসন**—জানুদ্বয় ও উরুদ্বয়ের মধ্যে পদতলদ্বয় বিন্যাস পূর্বক ত্রিকোণাকার আসন বন্ধন করতঃ ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইলে স্বস্তিকাসন হয়। (ঙ) **বীরাসন** [১] —একটী পদ একটী উরুর উপর স্থাপনপূর্বক অন্যপদ পশ্চাৎ দিকে রাখিলেই বীরাসন হয়। এইসব আসনের মধ্যে যেটী যাহার পক্ষে সুখকর বা আরামদায়ক হয় তাহাকে সুখাসন কহে। সাধক তাহার নিজের আরামদায়ক আসনেই বসিবেন।

প্রাণায়াম—প্রাণায়াম অর্থ প্রাণ ও অপান বায়ুর পরস্পর সম্মিলন। কেহ কেহ প্রাণের আয়াস বা বিস্তারকে প্রাণায়াম বলেন। প্রাণায়ামে উপযুক্ত স্থান ও কাল নির্বাচন, মিতাহার, ও নাড়িশুদ্ধি এই কয়টি নিয়ম পালন করার বিধি রহিয়াছে। উহা ঘেরণ্ডসংহিতায় বিস্তৃভাবে বর্ণিত। প্রাণায়ামে পূরক কুম্ভক ও রেচক এই তিনটী ক্রিয়া করিতে হয়। পূর্ণমাত্রায় করিতে হইলে বাম নাসিকাদ্বারা ষোলবার প্রণব কিম্বা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু আকর্ষণ (পূর্বক) করিবে। পরে উভয় নাসিকা বন্ধকরতঃ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে পূরিত বায়ুকে ধারণ (কুম্ভক) করিবে। পরে দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা এই বায়ুকে নিঃসারিত (রেচক) করিবে। উপরের নিয়মে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ, উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ুবদ্ধ করতঃ কুম্ভক এবং বাম নাসিকাদ্বারা রেচন এবং পুনরায় বাম নাসিকায় পূরক আরম্ভ করিয়া তৎপর উভয় নাসিকা বন্ধ করতঃ কুম্ভক এবং দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা রেচন করিবে। উপরের নিয়মে তিনবার করিলে এক প্রাণায়াম হয়। ইহার অর্দ্ধেক মাত্রায়ও অর্থাৎ ৮ : ৩২ : ১৬ মাত্রায়ও প্রাণায়াম হয়। এইরূপ প্রাণায়ামকে অর্দ্ধমাত্রা প্রাণায়াম বলে এবং ইহার অর্দ্ধেক মাত্রায়ও প্রাণায়াম হয়। প্রথম সাধকের পক্ষে নিম্ন মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রার প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্তব্য মাত্রানুসারে প্রাণায়াম যে তিন প্রকার তাহা যোগিবর ঘেরণ্ডও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ষোড়শমাত্রার প্রাণায়ামকে মধ্যম বলিয়া ২০ মাত্রায় প্রাণায়ামকে উত্তম এবং দ্বাদশ মাত্রার প্রাণায়ামকে অধম বলিয়াছেন। সকল প্রণায়ামেই পূরক, কুম্ভক ও রেচকের অনুপাত ১ : ৪ : ২। প্রাণায়ামে নানা বিভূতি লাভ হয়। উক্ত যোগিবরের মতে প্রাণায়ামে সিদ্ধ হওয়া গেল কি না বুঝিবার কতকগুলি উপায় আছে। অধম মাত্রায় স্বেদ নির্গমন হইলে, মধ্যম মাত্রায় মেরুকম্পন হইলে এবং উত্তম মাত্রায় শূন্যে উত্থিত হইবার ক্ষমতা জন্মিলে বুঝিতে হইবে যে প্রাণায়ামে সিদ্ধি হইয়াছে।

---

(১) যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে এক উরুর উপরে অন্য চরণ এবং অন্য উরুর উপরে অন্য চরণ রাখিয়া বসিলে সেই আসনকে বীরাসন বলে। যথা—একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যস্যোরুণি সংস্থিতঃ।

ইতরস্মিন্ তথা চান্যং বীরাসনমুদীরিতম্॥

প্রত্যাহার—প্রকৃতিগত বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার ; প্রত্যাহারের ইহাই সাধারণ সংজ্ঞা। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য ইহার ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। যথা—যৎ যৎ পশ্যতি তৎসর্ব্বং পশ্যেদাত্মানমাত্মনি। প্রত্যাহারঃ স চ প্রোক্তো যোগবিদ্ভি-র্মহাত্মভিঃ॥[১] অর্থাৎ বাহিরে যাহা যাহা দর্শন করা যায় তৎসমুদয়কে শরীরের অভ্যন্তরে বা আত্মায় দর্শন করাকে যোগবিৎ পণ্ডিতগণ প্রত্যাহার বলিয়া থাকেন। তিনি আবার ভিন্ন স্থানে বলিতেছেন—"কর্ম্মাণি যানি নিত্যানি বিহিতানি শরীরিণাম্। তেষাং আত্মন্যনুষ্ঠানং মনসা যদ্বহির্বিনা॥[২] অর্থাৎ সন্ধ্যা বন্দনাদি যে সকল নিত্যানুষ্ঠান আছে এই গুলির বাহ্যানুষ্ঠান ত্যাগ করতঃ মনে মনে অনুষ্ঠান করাকে প্রত্যাহার বলা হয়।

ধারণা—ধ্যেয় বস্তুতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখা বা মনের স্থৈর্য সম্পাদন করাকে ধারণা বলা হয়। বেদান্তসারেও প্রায় এই কথাই বলা হইয়াছে। যথা—"অদ্বিতীয় বস্তু-ন্যন্তরেন্দ্রিয় ধারণম্" অর্থাৎ অদ্বিতীয় বস্তুতে বা পরব্রহ্মে অন্তরেন্দ্রিয়কে ধারণ করিয়া রাখাই ধারণা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্র তাৎপর্যবেদিভিঃ॥

অর্থাৎ, মন যৎকালে যম নিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া আত্মাতে অবস্থান করে তখন তাহাকেই ধারণা বলা হয়। তাঁহাব মতে শরীরেব মধ্যে ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই যে পঞ্চ তত্ত্ব আছে, সেই পঞ্চতত্ত্বেব পঞ্চদেবতাকে ধারণ করিতে হয় বলিয়া ধাবণা পাঁচ প্রকাব। পঞ্চ দেবতা যথা—পৃথ্বীতত্ত্বে ব্রহ্মা ; জলতত্ত্বে বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বে রুদ্র, বায়ুতত্ত্বে ঈশ্বর এবং আকাশ তত্ত্বে সদাশিব। এই তত্ত্বগুলির আপন আপন বীজ জপ করিযা সেই সেই তত্ত্বস্থিত দেবতাকে ধ্যান করিলে ধারণার অভ্যাস হয়।

ধ্যান—ধারণা বিষয়ে যে এক প্রত্যয়ভাব বা একাবচ্ছিন্ন অবস্থিতি তাহাই ধ্যান—(তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম)। ধ্যান তিন প্রকার—স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও সূক্ষ্মধ্যান। যাহাতে মূর্ত্তিমান ইষ্ট দেবতাকে কিম্বা পরম গুরুকে চিন্তা কবা যায় তাহাই স্থূল ধ্যান। তেজোময় ব্রহ্মকে একাগ্রমনে চিন্তা করা জ্যোতির্ধ্যান এবং যে ধ্যানের দ্বারা বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুণ্ডলিনী শক্তির সাক্ষাৎ লাভ হয় তাহার নাম সূক্ষ্ম ধ্যান। স্থূলধ্যানে চিন্তা করিতে

---

(১) গরুড় পুরাণেও প্রায় এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। যথা—
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সমাহৃতস্থিতো হি সঃ।
মনসা সহ বুদ্ধ্যা চ প্রত্যাহারেষু সংস্থিতঃ॥

(২) বিষ্ণু পুরাণেও এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশিত হইয়াছে। যথা—
শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানু কারিণ প্রত্যাহার পরায়ণঃ॥

হয় যে, স্বীয় হৃদয়ে একটা সুধা সাগর আছে এবং সেই সুধা সাগরে কদম্ব ইত্যাদি সুরভিময় নানা বৃক্ষ সমন্বিত একটী রত্নময় দ্বীপ আছে। ঐ দ্বীপে কল্পতরু বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে এবং তাহার চতুর্বেদময় চারিটী শাখা আছে। এই কল্পতরুমূলে মহামাণিক্য বিনির্মিত একটী মণ্ডপ আছে এবং তাহাতে মণিময় এক পর্য্যঙ্কের উপরে নিজ অভীষ্টদেব বিরাজ করিতেছেন, স্বীয় অভীষ্টদেবের কল্পিতরূপ অনুসারে তাঁহার ধ্যান করাই স্থূলধ্যান। স্থূলধ্যানের আরোও নানা প্রকার অবান্তর ভেদ আছে।

জ্যোতির্ধ্যান—মূলাধারের যেস্থান কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে বিরাজিতা আছেন সেই স্থানে দীপ কলিকার ন্যায় জ্যোতিরূপী ব্রহ্মের চিন্তা করা জ্যোতির্ধ্যান।

সূক্ষ্মধ্যান—কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন। শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বনে এইরূপ চিন্তা করাকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য চিত্তমধ্যে আত্মার স্বরূপ চিন্তা করাকে ধ্যানের সংজ্ঞা দিয়া (ধ্যানমাত্মস্বরূপস্য বেদনং মনসা খলু) সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যানকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ধ্যান সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। যাহারা বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন তাহারা ঘেরণ্ড সংহিতা ও যোগী যাজ্ঞবল্ক্য পাঠ করিবেন।

সমাধি—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন বা প্রজ্ঞার সহিত মনের মিলনকে সমাধি কহে (সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ)। বেদে প্রজ্ঞানকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। জীবাত্মার মন যখন প্রজ্ঞানাকারে আকারিত হয় অথবা প্রজ্ঞায় বিলীন হইয়া যায় তখনই সমাধি হয়। ধ্যানের ভিতর দিয়াই ইহা নিষ্পন্ন হয়। সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীযুক্ত হইয়া আবির্ভূত হয় এবং নির্বিকল্প সমাধি ত্রিপুটী শূন্য হইয়া কেবল বোধরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও বলা হয়। এই অবস্থায় চক্ষু জগতের রূপ দেখে না, কর্ণ শব্দ শুনে না, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন কি শরীরের প্রত্যেক অনু পরমাণু এক অচিন্তনীয় আনন্দরসে নাচিয়া ; এই পরমানন্দই নির্বাণ বা মুক্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি, এ

যিনি ব্যাস সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হইতে চাহেন, তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণের প্রথমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়, এবং বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপরযুগে এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস। বিষ্ণুপুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই যে, ব্রহ্মার আদেশে যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদ-বিভাগ আরম্ভ করেন, তখন তিনি পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি এবং সুমন্ত—এই চারিজন শিষ্যের সাহায্য গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের স্ব রচিত "উপনিষদ্—ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে তিনি বলেন,—"বেদের সঙ্কলন কাল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিয়া ঐ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই এসম্বন্ধে একমত যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বেদসঙ্কলন সমসাময়িক ঘটনা।" তিনি আরও বলেন, "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অল্পদিন পরেই পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ভবলীলা সংবরণ করেন। তখনও জনমেজয় কিশোর বয়স্ক। জনমেজয়ের অন্তর্ধানের পর যখন শতপথ ব্রাহ্মণ সংকলিত হইয়াছিল, তখন শতপথ ও ভারতযুদ্ধের মধ্যে ১৫০ বৎসর ব্যবধান ধরিলে অসঙ্গত হইবে না। * * * আমরা দেখিয়াছি যে, বেদসংকলন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমসাময়িক ঘটনা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের এদেশীয় শিষ্যেরা কতকগুলি অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার দৃঢ়তা সহকারে খ্রীষ্টপূর্ব ১১৯৪ বৎসরকেই ঐ যুদ্ধের কালরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এনির্ণয় সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। × × শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ ব্রাহ্মণের সময় কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত। × × ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের সংকলন সময়ে কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বিষুবৎবৃত্তে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র পুঞ্জে বিষুবন্ থাকিত। সে কত দিনের কথা ? এগণনা কঠিন নহে। এখন বিষুবন্ উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রে রহিয়াছে। কৃত্তিকানক্ষত্র পুঞ্জ হইতে উত্তরভাদ্রপদের দূরত্ব প্রায় ৬০ অংশ। অর্থাৎ তখন হইতে এখন পর্যন্ত বিষুবন্ প্রায় ৬০ অংশ (degree) সরিয়া আসিয়াছে। ৬০ অংশে ৬০×৬০×৬০ = ২১৬০০০ বিকলা। বিষুবন্ যখন প্রতি বৎসরে ৫০ বিকলা সরিয়া

যায়, তখন মোটামুটী ধরিতে গেলে ইতিমধ্যে ৪৪০০ বৎসর কাল অতীত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময় প্রায় খ্রী° পূ° ২৫০০ বৎসর।

শতপথ ব্রাহ্মণ রচনাকাল যদি খ্রী° পূ° ২৫০০ বৎসর অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে বেদের সংকলন যে ৫০০০ বৎসরের সমীপবর্তী, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। বেদের সংকলন কাল যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, তখন কিরূপে আমরা পাশ্চাত্য মতের প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে খ্রীস্টের ১৩০০ বৎসরের পূর্ববর্তী ঘটনা বলি? বরঞ্চ জ্যোতিষিক প্রমাণে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তদ্দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রায় ৫০০০ বৎসরের প্রাচীন ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। এদেশের প্রচলিত মতও তাহাই।"

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়, তাঁহার রচিত "পুরাণ প্রবেশ" নামক গ্রন্থে বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, নন্দাভিষেক কাল অর্থাৎ মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যারোহণকাল ৪০১ খ্রী° পূ অব্দ। তিনি লিখিতেছেন, "নন্দাব্দ ৪০১ খ্রী° পূ° ধরিয়া পরীক্ষিতের জন্ম ও ভারতযুদ্ধ কাল ৪০১+১০১৫=১৪১৬ খ্রী° পূ° অব্দ। কলি আরম্ভ ১৪১৬+৪২=১৪৫৮ খ্রী° পূ°।" কিন্তু, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, জ্যোতিষ-গণনালব্ধ ফল দ্বারা এই পৌরাণিক কাল-নির্দেশ সমর্থিত হয় না। প্রাচীন পণ্ডিত বরাহমিহির গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, মহাভারতের যুদ্ধ খ্রী° পূ° ২৪৪৯ অব্দে হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গণিতবিদ্ 'অলবেরুণী' স্বাধীনভাবে গণনা করিয়া ভারতযুদ্ধের যে তারিখ নির্দেশ করেন, তাহা বরাহমিহিরের প্রদত্ত তারিখের সহিত আশ্চর্যভাবে মিলিয়া যায়।

১৩৪৬ সনের বৈশাখ হইতে ভাদ্রসংখ্যা "শ্রীভারতী" নামক মাসিক পত্রিকায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়…"ভারতযুদ্ধ কাল নির্ণয়" শীর্ষক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মহাভারত আশ্রিত গণনায় গণিতলব্ধ ভারতযুদ্ধ কাল ২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ অর্থাৎ ঠিক ২৫২৬ শক পূর্বকাল। এই প্রবন্ধটী হইতে নিম্নে কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত হইল,—

" * * মহাভারতকে ত্যাগ করিয়া ভারতযুদ্ধ কাল নিরূপণের প্রয়াস যুক্তিসঙ্গত মনে করা যায় না, কারণ ভারতযুদ্ধের বর্ণনা কেবলমাত্র মহাভারতেই আছে। * * * মহাভারত, পুরাণ বা জ্যোতিষীদের উক্তি যাহা যুক্তিদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয় তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আলোচনা কার্যে আমাদিগকে নিজমত রক্ষা করিবার জন্য অযথা প্রয়াস বর্জন করিতে হইবে। * * * *

বৃহৎসংহিতা হইতে দেখা যায় যে, যুধিষ্ঠির রাজার পৃথিবী শাসনকালে সপ্তর্ষিপুঞ্জ মঘা নক্ষত্র পুঞ্জে ছিলেন। শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে সেই রাজারও কাল হয় ২৫২৬=২৪৪৯ খ্রী° পূ° অব্দ; সুতরাং এই অব্দ প্রচলন বর্ষই ভারতযুদ্ধ বর্ষ—এইরূপ সিদ্ধান্ত বৃহৎসংহিতার বাক্য হইতে আইসে।—"

আসন্ মঘাসু মণয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥"

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম"—এই পুরাণোক্ত শ্লোকের শেষ চরণে ভিন্ন ভিন্ন পাঠযুক্তও দেখা যায়, তাহাতে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দাভিষেক কাল ১৫০০, ১১১৫, ১০৫০ বা ১০১৫ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ মতে পরীক্ষিত ও নন্দের ব্যবধান ১০১৫ বা ১০৫০ বৎসর; কিন্তু এই পুরাণদ্বয়ের ঐতিহাসিক বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রত্যেক ঐতিহাসিকই জানেন যে প্রদ্যোতবংশীয় রাজগণ অবন্তীতে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন প্রদ্যোত-রাজগণ মগধেরই রাজা ছিলেন। আমরা পরে প্রদর্শন করিব যে পুরাণের রাজবংশাবলী এবং রাজগণের রাজত্ব কাল ইত্যাদি সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য নহে। * * * মহাভারত এবং পুরাণ সকলের মধ্যে মহাভারতই প্রাচীনতম। সুতরাং মহাভারত আশ্রয় করিয়াই পাণ্ডবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা সর্বপ্রথমে কর্তব্য। * * মহাভারতের যুদ্ধারম্ভের দিন,—অগ্রহায়ণ শুক্লা চতুর্দশী তিথি এবং রোহিণীনক্ষত্র। যুদ্ধ শেষ শ্রবণানক্ষত্রে হইয়াছিল। যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। * * *

ন্যায়প্রবেশ

(পূর্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত **শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ**

ব্যতিরেকব্যাপ্তি—ইহা 'সাধ্যাভাবব্যাপক-অভাব-(ইহা বস্তুতঃ হেত্বভাব) প্রতিযোগিত্ব'।

হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে ঐ হেতুর অভাব অবশ্যই সাধ্যাভাবের ব্যাপক হইয়া থাকে। রূপ দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য, সুতরাং রূপাভাব দ্রব্যত্বাভাবের ব্যাপক হইবেই। ফলে, রূপে 'দ্রব্যত্বাভাব ব্যাপক—অভাবীয় (রূপাভাবীয়) প্রতিযোগিত্ব'স্বরূপ দ্রব্যত্বের ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির লক্ষণও সঙ্গত হয়।

পক্ষ—সাধ্য ও হেতুর ন্যায় পক্ষও অনুমিতির অঙ্গ। সাধারণতঃ প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রথম পদের **অর্থই পক্ষ**। "পর্বতো বহ্নিমান্" 'ঘটঃ রূপবান্" এই দুই প্রতিজ্ঞায় যথাক্রমে পর্বত ও ঘট পক্ষ। ইহারা পার্থিব দ্রব্য। সকল পদার্থই অনুমিতিবিশেষে পক্ষ হইতে পারে।

পক্ষতা—ইহা সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়ের অভাব। যে সময়ে যে পদার্থে যে ব্যক্তির যে প্রকার সাধ্যের নিশ্চয় থাকে না, কেবল সেই সময়ে সেই পদার্থ ঐ ব্যক্তির নিকটে ঐ প্রকার সাধ্যের অনুমানে **পক্ষ** হইয়া থাকে। পক্ষের সহিত **পক্ষতার** সম্বন্ধ এই পর্যন্ত। বস্তুতঃ জ্ঞানবিশেষের অভাবস্বরূপ হওয়ায় পক্ষতা অনুমাতা পুরুষের আত্মার ধর্ম এবং সেই ভাবেই উহা অনুমানে কারণ হইয়া থাকে। ফলতঃ যখন যে ব্যক্তির 'পর্বত বহ্নিমান্' এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে না তখনই ঐ ব্যক্তির নিকটে বহ্নির অনুমানে পর্বত **পক্ষ** হইতে পারে এবং ঐপ্রকার নিশ্চয়াভাব স্বরূপ **পক্ষতা** পর্বতে বহ্নির অনুমিতি জন্মাইতে সমর্থ হয়।

পক্ষে সাধ্যনিশ্চয় বিদ্যমান থাকিলে সাধ্যের অনুমান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত কথায় পরিস্ফুট হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে ঐ অবস্থায় অনুমিতি হয় ইহাও শাস্ত্রসম্মত। ঐরূপ ক্ষেত্র নির্ধারিত হয় অনুমাতা পুরুষের ইচ্ছা দ্বারা অর্থাৎ সাধ্যের নিশ্চয় বর্তমান থাকিলেও যদি কেহ ইচ্ছা করে যে—এই পক্ষে আমি সাধ্যের অনুমান করিব তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির অনুমিতি হয় ইহা স্বীকার্য। অতএব উক্তরূপে সিষাধয়িষার—সাধ্যসাধনেচ্ছার অর্থাৎ অনুমিতি বিষয়ে ইচ্ছার অসমানকালীন সিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয়ই[১] অনুমিতির বিরোধী ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। ন্যায়ের

---

১. সমান কালীন—যাহারা একই সময়ে বর্তমান—Contemporary। যাহারা সমানকালীন নহে তাহারা পরস্পর অসমানকালীন। ইহা পরিভাষাগত 'বিশিষ্ট'শব্দের অর্থ। বিরহ—অত্যন্তাভাব।

তাহার এই প্রকার নিশ্চয়ের পরিচয়—সিষাধয়িষা-বিরহ-বিশিষ্ট সিদ্ধি। এই প্রকার সিদ্ধির অভাবই অর্থাৎ 'সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব'ই নব্যসম্প্রদায়মতে[১] পক্ষতা। ফলে অনুমাতা পুরুষের সিষাধয়িষা থাকিলে সিদ্ধি বা সাধ্যনিশ্চয় থাকুক বা না থাকুক কোন অবস্থাতেই অনুমিতি হইতে বাধা নাই; এবং সিষাধয়িষা না থাকিলেও যদি সাধ্যনিশ্চয় না থাকে তাহা হইলেও অনুমিতি স্বীকার্য কিন্তু যদি সিদ্ধি বর্তমান থাকে অথচ সিষাধয়িষা না থাকে এমত অবস্থায় অনুমিতি স্বীকার্য নহে।

প্রতিবন্ধক ও **প্রতিবধ্য**—যে কার্যে কোন অভাব কারণ হয়, উক্ত অভাবের প্রতিযোগী সেই কার্যে **প্রতিবন্ধক** এবং কার্য বস্তু স্বয়ং উহার **প্রতিবধ্য**।

উল্লিখিত প্রকারে অভাব অনুমিতি-কার্যে কারণ হওয়ায় **সিদ্ধি** অনুমিতির **প্রতিবন্ধক** এবং **অনুমিতি** সিদ্ধির **প্রতিবধ্য**। প্রতিবন্ধকের ধর্ম—প্রতিবন্ধকতা; উহা কারণস্বরূপ অভাবের প্রতিযোগিতা। প্রতিবধ্যের ধর্ম প্রতিবধ্যতা—ইহা কারণস্বরূপ অভাবদ্বারা বিনাশ-যোগ্য প্রাগভাবের প্রতিযোগিতা[২]।

উত্তেজকতা—যে-অভাব প্রতিবন্ধকের বিশেষণ তাহার প্রতিযোগী **উত্তেজক**। সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক, সিষাধয়িষার অভাব সিদ্ধির বিশেষণ হওয়ায় ঐক্ষেত্রে সিষাধয়িষা **উত্তেজক**। উত্তেজকের ধর্ম—**উত্তেজকতা**; উহাও অভাববিশেষের প্রতিযোগিতা।

সপক্ষ—যে অধিকরণে অনুমাতা পূর্বে সাধ্যের অস্তিত্ব নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা **সপক্ষ**। পর্বত-পক্ষে বহ্নি-সাধ্যের অনুমানে মহানস (রন্ধনগৃহ) সপক্ষ।

সাধ্য ও হেতুর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একত্র অবস্থান বিষয়ে নিশ্চয় ব্যতীত ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভবে না। প্রায়শঃ অনুমিতির পূর্বে পক্ষে সাধ্যজ্ঞান সম্ভাবিত নহে। অতএব পক্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থান ঐজন্য আবশ্যক। রন্ধনগৃহে বহ্নি ও ধূমের অস্তিত্ব নিশ্চিত। অতএব উহা সপক্ষ।

বিপক্ষ—যাহা 'সাধ্যশূন্য' এইরূপে নিশ্চিত তাহা **বিপক্ষ**। পর্বতে বহ্নির অনুমানে জলাশয় বিপক্ষ; যে-হেতু উহা বহ্নিশূন্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

পক্ষসম—সপক্ষ ও বিপক্ষ ব্যতীত অন্য যে সকল স্থানে সাধ্যের অস্তিত্ব সন্দিগ্ধ অর্থাৎ সন্দেহযোগ্য সাধারণতঃ সেই সমস্ত পদার্থ **পক্ষসম** বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

গমক হেতু—যে সমস্ত হেতু পক্ষে ও সপক্ষে বিদ্যমান এবং বিপক্ষে থাকে না, অথচ বাধ কিংবা সৎপ্রতিপক্ষ স্বরূপ দোষে দুষ্ট নহে; পক্ষসত্ত্ব সপক্ষসত্ত্ব বিপক্ষাসত্ত্ব অবাধিতত্ব এবং অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব এই পঞ্চরূপ থাকায় তাহারা গমক অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের যথার্থ অনুমানে

---

১. প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনমতে সাধ্যসংশয়, অন্যমতে কেবল সিষাধয়িষা এবং মতান্তরে কেবল সিদ্ধ্যভাব পক্ষতারূপে স্বীকৃত হইত।

২. প্রাগভাব সামগ্রীবাদ এই মতে অনুমিতির প্রাগভাব পক্ষতাস্বরূপ অভাবদ্বারা বিনাশযোগ্য। ১৩১ পৃঃ ১. টিপ্পনী দ্বারা এই মত ব্যক্ত হইয়াছে।

উপযোগী। কারণ, ঐরূপ স্থলের পরামর্শ প্রমাত্মক অর্থাৎ যথার্থ। পরামর্শ অভ্রান্ত হইলে তদ্দ্বারা অনুমিতির প্রমাত্বের দাবী করা যায়।

হেত্বাভাস—পূর্বে বলা হইয়াছে[১] পরামর্শ অনুমিতির অব্যবহিত পূর্ববর্তী নিশ্চয়-বিশেষ। তদ্দ্বারা পরামর্শ অনুমিতির কারণ এবং অনুমিতি উহার কার্য ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। কোন ভাবপদার্থ এবং উহার অত্যন্তাভাব একত্র থাকিতে না পারায় উহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। যে-ধর্মীতে যখন বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একটির নিশ্চয় থাকে তখন সেই ধর্মীতে অপরটির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না[২]। যেমন 'শঙ্খ শ্বেত' এইরূপ নিশ্চয় যাহার বিদ্যমান "শঙ্খ শ্বেত নহে" এইরূপে শঙ্খে শ্বেতগুণের অভাব জ্ঞান তাহার পক্ষে সম্ভবে না[৩]।

এইরূপে স্থির করা যায় বিপরীত কোটিদ্বয়ের একটির নিশ্চয়ের অভাব অন্য বিপরীত কোটির জ্ঞানে কারণ। ইহাতে সিদ্ধ হয়—এক বিরুদ্ধ কোটির নিশ্চয় অপর কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধক[৪]। অতএব একধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের নিশ্চয় পরস্পরের প্রতিবধ্য এবং প্রতিবন্ধক।

উল্লিখিত বিপরীত ধর্ম নিশ্চয়ের একটি যথার্থ এবং অন্যটি অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক হইবে। উহারা উভয়েই যথার্থ কিংবা উভয়েই ভ্রম ইহা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু নিশ্চয়ের যথার্থতা কিংবা ভ্রমত্ব স্বরূপতঃ[৫] উহার প্রতিবন্ধকতার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ বিপরীত একতর কোটির নিশ্চয় ভ্রম হউক বা প্রমা হউক অন্য কোটির জ্ঞানে বাধা দিবেই।

বিপরীত জ্ঞানদ্বয়ের এই প্রকার প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব প্রত্যক্ষ অনুমিতি ইত্যাদি সমস্ত বিশিষ্টজ্ঞান সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় কিন্তু হেত্বাভাস জ্ঞানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে।

যে পরামর্শ ও উহার কার্য অনুমিতি এই উভয়ের কোন অংশে ভ্রম হয় কেবল সেই ক্ষেত্রেই হেত্বাভাস স্বীকৃত হয়, কিন্তু ভ্রমাত্মক বিপরীত নিশ্চয় বশতঃ প্রমাত্মক ভাবী পরামর্শ এবং অনুমিতির উৎপত্তি না ঘটিলেও ঐ ক্ষেত্রে হেত্বাভাস স্বীকৃত হয় না। হেত্বাভাস স্থলে উক্ত প্রকারে প্রতিবধ্য বিপরীত জ্ঞানের অর্থাৎ পরামর্শ বা অনুমিতির ভ্রমত্ব নিয়মিত থাকায় উহাদিগের বিপরীত নিশ্চয়স্বরূপ হেত্বাভাসের নিশ্চয়ও প্রমাত্মকই হইবে এই সিদ্ধান্তে কোন বাধা নাই। অতএব বলা যায়—

১, ৯৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২, দোষবিশেষ অথবা লৌকিক সন্নিকর্ষস্থলে এই নিয়মের ব্যত্যয় হয়।

৩. বিপরীত ভাবেও দৃষ্টান্ত সম্ভবে। কামলারোগী দেখে—শঙ্খ শ্বেত নহে (পীত)। তখন 'শঙ্খ শ্বেত' এই জ্ঞান তাঁহার পক্ষে সম্ভবে না।

৪. ১৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. প্রতিবন্ধক নিশ্চয় প্রমা বা ভ্রম যাহাই হউক নিশ্চয়কারী "উহা (আমার এই জ্ঞান) ভ্রম" এইরূপে বুঝিলেই উহার প্রতিবন্ধকতা লুপ্ত হয়; তদনুসারে বলা হইয়াছে—"স্বরূপতঃ" অর্থাৎ অজ্ঞাত অবস্থায় জ্ঞানের আমার ইহা 'অপ্রামাণ্যজ্ঞানানাস্কন্দিত' অবস্থা।

যে প্রকার যথার্থ নিশ্চয় অনুমিতি্র অথবা উহার কারণ পরামর্শের প্রতিবন্ধক সেই নিশ্চয়ের বিষয় **হেত্বাভাস** বা **হেতুদোষ**।

হেত্বাভাস নিশ্চয় কিরূপে অনুমিতি এবং পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয় তাহা উদাহরণ ব্যতীত বুঝা সম্ভব নহে। ক্রমশঃ উহাদের প্রত্যেকতঃ উদাহরণ দেওয়া হইবে। তদ্দ্বারা বিভিন্ন হেত্বাভাস সমূহের কোন্‌টি পরামর্শ বা অনুমিতির কোন্ অংশে বিপরীত তাহা ব্যক্ত হইবে।

হেত্বাভাস পঞ্চবিধ[১] —অনৈকান্ত, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ ও সৎ প্রতিপক্ষ।

অনৈকান্ত—ব্যভিচার ইহার নামান্তর। তদনুসারে অনৈকান্ত-দোষে দুষ্ট হেতু অনৈকান্ত[২], অনৈকান্তিক, ব্যভিচারী এবং সব্যভিচার নামে উল্লিখিত হয়।

অনৈকান্ত ত্রিবিধ[৩] —সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী।

সাধারণ—সাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিহেতু। "ঘটো দ্রব্যং সত্ত্বাৎ" এই স্থলে উহা **দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিসত্ত্ব**। সত্ত্ব (হেতু) দ্রব্যত্ব (সাধ্য) শূন্য গুণ ও কর্মপদার্থে বিদ্যমান। অতএব "দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তি সত্ত্ব" এইরূপ জ্ঞান যথার্থ। এই স্থলীয় অনুমিতির কারণ—পরামর্শ "দ্রব্যত্ব-ব্যাপ্যসত্ত্ববান্—দ্রব্যত্বাভাববদবৃত্তি সত্ত্ববান্ (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাববৎ সত্ত্ববান্) ঘটঃ" এইরূপ। 'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব' এবং 'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বাভাব' ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। "সত্ত্ব"রূপ ধর্মীতে উহাদিগের একতর কোটির নিশ্চয় অন্য কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধকও বটে। সুতরাং পরামর্শের অন্তর্গত ব্যাপ্তির বিপরীত কোটি থাকায় উহা পরামর্শের প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় সাধারণ হেত্বাভাস হইল[৪]।

অসাধারণ—ইহা 'সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতু'। পূর্বে বলা হইয়াছে[৫] অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ। সুতরাং সাধ্য—সাধ্যাভাবাভাব। ফলে—'সাধ্যব্যাপকীভূতা-ভাবপ্রতিযোগিহেতু' এবং 'সাধ্যাভাবাভাবব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতু' (ইহাই সাধ্যাভাবের ব্যতিরেকব্যাপ্তি বিশিষ্ট হেতু) একই কথা। "পক্ষঃ হেতুমান্" এইরূপ জ্ঞানকালে উল্লিখিত

---

১. জৈন,বৌদ্ধ এবং অন্য প্রাচীন সম্প্রদায়ে আরও বহুবিধ হেত্বাভাসের কথা প্রচলিত ছিল। তাহা সংক্ষেপে প্রকাশ করা অসম্ভব। পৃঃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য।

২. ক্বচিৎ 'অনেকান্ত' নামও দেখা যায়।

৩. হেতুর বিশেষণরূপেই 'সাধারণ' ইত্যাদি শব্দত্রয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সুতরাং 'সাধারণ্য, অসাধারণ্য ও অনুপসংহারিত্ব' ইহারাই হেতুদোষ। কেশব মিশ্রের মতে অনৈকান্ত দ্বিবিধ - সাধারণ ও অসাধারণ। তর্কভাষা ২৫ পৃঃ।

৪. প্রাচীন মতে সপক্ষ ও বিপক্ষবৃত্তি হেতু সাধারণ।

যতটুকু বিষয়ের জ্ঞান প্রতিবন্ধকতার পক্ষে উপযোগী কেবল ততটুকু বিষয়ই হেত্বাভাস, উহা হইতে ন্যূন বা অধিক বিষয় হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। ফলে কেবল 'দ্রব্যত্বাভাব' ইত্যাদি কিংবা 'প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিসত্ত্ব' হেত্বাভাস নহে।

৫. ১১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অসাধারণ জ্ঞান বিপরীতকোটির অনুমিতিজনক সামগ্রী হওয়ায় উহা সাক্ষাৎ অনুমিতির প্রতিবন্ধক। ইহা সৎপ্রতিপক্ষস্থলে ব্যক্ত হইবে।

"শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাৎ" এই স্থলে 'নিত্যত্বব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগি-শব্দত্ব' অসাধারণ।

অনুপসংহারী—ইহা 'অভাবাপ্রতিযোগি-হেতু'। ইহার জ্ঞান ব্যতিরেকব্যাপ্তির অন্তর্গত "অভাবপ্রতিযোগিহেতু" এই অংশের বিরোধী। ফলে পরামর্শের প্রতিবন্ধক[১]। কারণ হেতু-ধর্মীতে কোন অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব এবং অভাবাপ্রতিযোগিত্ব—অভাবীয় প্রতিযোগিত্বাভাব পরস্পর বিপরীত। হেতু ব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ী হইলে এই দোষ ঘটে[২]। "ঘটঃ বাচ্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ" এই স্থলে 'অভাবাপ্রতিযোগি প্রমেয়ত্ব' অনুপসংহারী[৩]।

বিরোধ—ইহা 'সাধ্যাসমানাধিকরণ-(সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাববিশিষ্ট) হেতু'। ইহার জ্ঞান অন্বয়ব্যাপ্তির অন্তর্গত "সাধ্যসমানাধিকরণহেতু" এই অংশের বিরোধী। সুতরাং পরামর্শের প্রতিবন্ধক। বিরোধ-হেত্বাভাসযুক্ত হেতু-বিরুদ্ধ।

"অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাৎ" এইস্থলে গোত্বাসমানাধিকরণ-অশ্বত্ব বিরোধ[৪]। ইহাও ব্যাপ্তি অংশে পরামর্শের প্রতিবন্ধক।

অসিদ্ধি—ইহা তিন প্রকার—আশ্রয়াসিদ্ধি বা পক্ষাসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি। অসিদ্ধিদোষ যুক্ত হেতু—অসিদ্ধ।

আশ্রয়াসিদ্ধি—যে অনুমানে 'পক্ষ'পদার্থ পক্ষতাবচ্ছেদক-ধর্ম-শূন্য হয় সে স্থলে আশ্রয়াসিদ্ধি-দোষ ঘটে[৫]। ইহা 'পক্ষতাবচ্ছেদকশূন্য পক্ষ' স্বরূপ।

'সুবর্ণময়ঃ পর্বতঃ (পক্ষ) বহ্নিমান ধূমাৎ' এইস্থলে 'সুবর্ণময়ত্বাভাববৎপর্বত' আশ্রয়াসিদ্ধি। ইহা পরামর্শ এবং অনুমিতি উভয়েরই বিরোধী। কারণ, "সুবর্ণময়ত্বাভাববান্ পর্বতঃ" এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ সুবর্ণময়পর্বতঃ' এইরূপে পরামর্শ এবং সুবর্ণময়-পর্বতঃ বহ্নিমান্' এইরূপে অনুমিতি সম্ভবে না।

---

১. হেত্বাভাস বিষয়ক নিশ্চয় সমূহ কিরূপে প্রমা হয় প্রত্যেক উদাহরণে তাহা বলা হইবে না। পক্ষমাত্র-বৃত্তি অর্থাৎ সমুদায় সপক্ষ এবং বিপক্ষে অবিদ্যমান হেতু অসাধারণ; এবং অবৃত্তি অর্থাৎ নিরাধার গগনাদি হেতুই অসাধারণ এইরূপ মতান্তর প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত।

২. ব্যাপ্যবৃত্তি ৬০ পৃঃ এবং কেবলান্বয়ী ১২৭ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৩. প্রাচীন মতে পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্ম কিংবা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম কেবলান্বয়ী হইলে হেতু অনুপসংহারী হয়

৪. উভয়বিধ অন্বয়ব্যাপ্তির মধ্যে সাধ্যসামানাধিকরণ্য' অবশ্য বক্তব্য। ১৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. আকাশকুসুম প্রভৃতির ন্যায় অলীক বিষয় পক্ষরূপে নির্দিষ্ট হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি দোষ হয় এই প্রকার মতও গ্রন্থান্তরে দৃষ্ট হয়।

স্বরূপাসিদ্ধি—পক্ষ হেতুশূন্য হইলে স্বরূপাসিদ্ধি হয়। ইহা 'হেত্বভাববৎপক্ষ' স্বরূপ। "জলাশয়ঃ দ্রব্যং ধূমাৎ" এই স্থলে 'ধূমশূন্য-(ধূমাভাববৎ) জলাশয়' স্বরূপাসিদ্ধি। ইহা পরামর্শের অন্তর্গত "হেতুমান্ পক্ষঃ" এই অংশের বিরোধী।

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি—ইহা আশ্রয়াসিদ্ধির অনুরূপ। পক্ষ ব্যতীত পরামর্শ কিংবা অনুমিতির কোনও বিষয় —সাধ্য, হেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম ইত্যাদি ; যদি উহাদের স্ব স্ব অবচ্ছেদকধর্মশূন্য হয় তবে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়[১]।

প্রয়োগস্থল	অবান্তর প্রকার	দোষস্বরূপ
পর্বতঃ স্বর্ণময়বহ্নিমান্ ধূমাৎ	সাধ্যাপ্রসিদ্ধি	স্বর্ণময়ত্বশূন্য বহ্নি
গুণীয় সংযোগেন বহ্নিমান্ ..	সাধ্যসম্বন্ধাপ্রসিদ্ধি	গুণীয়ত্বশূন্য সংযোগ
......বহ্নিমান্ রজতময়ধূমাৎ	হেত্বপ্রসিদ্ধি	রজতময়ত্বশূন্য ধূম
......জলময় দণ্ডিমান্...	সাধ্যতাবচ্ছেদকাপ্রসিদ্ধি	জলময়ত্বশূন্য দণ্ড ইত্যাদি।
(দণ্ড সাধ্যতাবচ্ছেদক)		

উল্লিখিত হেত্বাভাসসমূহ প্রায়শঃ পরামর্শের অন্তর্গত ব্যাপ্তিজ্ঞানের এবং কচিৎ অনুমিতিরও বিরোধী।

বাধ—ইহার প্রাচীন নামান্তর কালাত্যযাপদেশ। এই দোষযুক্ত হেতু বাধিত, বা কালাত্যযাপদিষ্ট ও কালাতীত। পক্ষ সাধ্যশূন্য হইলে এই দোষ ঘটে। ইহা 'সাধ্যাভাববৎ পক্ষ'।

"জলাশয়ঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এইস্থলে 'বহ্নিশূন্য জলাশয়' বাধ। ইহা অনুমিতির প্রতিবন্ধক। কারণ, 'জলাশয় বহ্নিশূন্য' এইরূপ নিশ্চয় থাকিলে "জলাশয়ঃ বহ্নিমান্" এইপ্রকার অনুমিতি সম্ভবে না[২]।

সৎপ্রতিপক্ষ—বিরোধী কোটিদ্বয়ের মধ্যে একতর কোটির নিশ্চয়জনক সামগ্রীও অন্য কোটির জ্ঞানে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

"পর্বত বহ্নিশূন্য" এইপ্রকার নিশ্চয় থাকিলে যেমন 'পর্বত বহ্নিমান্' এইরূপ জ্ঞান সম্ভবে না তদ্রূপ 'পর্বত বহ্ন্যভাবব্যাপ্যবান্' (ইহা "পর্বতঃ বহ্ন্যভাববান্" এই অনুমিতির জনক পরামর্শ স্বরূপ) এইরূপ নিশ্চয় থাকিলেও "পর্বতঃ বহ্নিমান্' এই অনুমিতি জন্মে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত সমুদায় দোষস্থলে ঐরূপে ব্যাপ্যবিশিষ্ট বিশেষ্যভাগ দোষ হইবে এবং উহারও সেই সংজ্ঞা হইবে। যেমন—

---

১. হেতু নিষ্প্রয়োজন বিশেষণে ভারাক্রান্ত হইলেও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি দোষ হয়। উদাহরণ স্থল—"বহ্নিমান্ প্রমেয়-ধূমাৎ" ইত্যাদি।

২. বাধ আশ্রয়াসিদ্ধি ইত্যাদি কতিপয় দোষ প্রায়শঃ হেতুঘটিত হয় না তথাপি শাস্ত্রে উহারা হেত্বাভাস বা হেতুদোষ নামেই চিরপ্রসিদ্ধ। মতান্তরে পক্ষাভাস সাধ্যাভাস ইত্যাদি পরিভাষার কথাও জানা যায়।

'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ববিশিষ্ট সত্ত্ব' এবং 'দ্রব্যত্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্বব্যাপ্যবিশিষ্ট সত্ত্ব' উভয়ই সাধারণ ব্যভিচার ; 'সুবর্ণময়ত্বাভাববিশিষ্ট পর্বত' এবং 'সুবর্ণময়ত্বাভাবব্যাপ্যবিশিষ্ট পর্বত' উভয়ই আশ্রয়াসিদ্ধি। বাধস্থলের সংজ্ঞা অন্যরূপ। 'সাধ্যাভাববিশিষ্ট পক্ষ' বাধ কিন্তু 'সাধ্যাভাবব্যাপ্য-বিশিষ্ট পক্ষ' সৎপ্রতিপক্ষ। এই দোষে দুষ্ট হেতুও সৎপ্রতিপক্ষ এবং সৎপ্রতিপক্ষিত নামে প্রসিদ্ধ। তবে বিশেষ এই যে অন্যত্র যথার্থতঃ দোষ না থাকিলে হেতু "দুষ্ট" নামে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু দোষ না থাকিলেও অর্থাৎ পক্ষ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবিশিষ্ট না হইলেও বিপরীত কোটিদ্বয়ের সাধক হেতুদ্বয়ের পরামর্শ হইলে উভয় হেতুই সৎপ্রতিপক্ষিত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।'

অসাধারণ্যদোষ সৎপ্রতিপক্ষেরই কার্য করে। কারণ "সাধ্যব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিহেতু" এবং "হেতুমান্ পক্ষ" এই উভয়জ্ঞান মিলিত হইলে উহা "সাধ্যাভাবাভাব-ব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতুমান্ পক্ষ" এই প্রকারে পরিণত হওয়ায় পক্ষে সাধ্যাভাবের অনুমিতির জনক সাধ্যাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পরামর্শ স্বরূপ[১]।

প্রথম হেত্বাভাস অর্থাৎ ব্যভিচার যথার্থই হইয়াছে কিনা তাহা "উপাধি" দ্বারা বুঝা যায়।

উপাধি। উপ—সমীপ। আ(ঙ) + ধা + কি—উপাধি। সমীপবর্তী পদার্থে যাহা স্বীয় ধর্ম আধান অর্থাৎ আরোপিত করিতে সমর্থ তাহা **উপাধি**। স্ফটিক স্বচ্ছ শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ জবাফুলের সান্নিধ্যবশতঃ স্ফটিক রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব স্ফটিকের লৌহিত্যের আরোপে জবাকুসুম উপাধি। আত্মা সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয়; দেহ ক্ষুদ্র ও সক্রিয়। এই দেহের সম্বন্ধ বশতই ব্যবহার হয়—আমি সাড়ে তিন হাত লম্বা এবং যথেচ্ছ গমন করিতেছি। এখানেও দেহ আত্মার উপাধি।

ব্যাপ্তিক্ষেত্রের এই উপাধিও ঐরূপ। যাহা সাধ্যের ব্যাপক অথচ হেতুর অব্যাপক—ব্যাপক নহে, তাহা উপাধি।

যেমন—"ধূমবান্ বহ্নেঃ" এই প্রয়োগে আর্দ্র ইন্ধন (ভিজা কাঠ) **উপাধি**। কারণ, কাঠ ভিজা না হইলে ধূম হয় না। এজন্য বলিতে হইবে—যে যে স্থানে ধূম, সেই সেই স্থানেই আর্দ্র ইন্ধন অবশ্য আছে; অতএব আর্দ্রেন্ধন ধূমের (সাধ্যের) ব্যাপক। (সুতরাং ধূম আর্দ্রেন্ধনের ব্যাপ্য) আর্দ্রেন্ধন বহ্নির (হেতুর) ব্যাপক নহে। কারণ, তপ্ত লৌহপিণ্ডে

---

১. 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য'রূপ বিরোধের স্থলেও এইরূপ কথা বলা যায়। মতান্তরে বিরোধ এবং অসাধারণ্যের পরস্পর সংজ্ঞা ব্যত্যয়ও দৃষ্ট হয়। প্রাচীনমতে দুষ্টের অন্তর্গত দোষ সর্বপ্রকার অনুমিতি বা পরামর্শের প্রতিবন্ধক যথার্থ নিশ্চয়ের বিষয় হয় না। এ জন্য হেত্বাভাস বিষয়ে প্রাচীন ও নব্যমতে বহুস্থলে অনৈক্য ঘটিয়াছে। হেত্বাভাস অতি কঠিন। মৌখিক উপদেশ ব্যতীত ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। এই বিষয়ে মতান্তরও বিস্তর। কাঠিন্য ও বিস্তৃতি ভয়ে দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল।।

বহ্নি দৃষ্ট হয় কিন্তু তথায় আর্দ্র ইন্ধন দৃষ্ট হয় না। অতএব এইক্ষেত্রে আর্দ্রেন্ধনে উপাধির লক্ষণ সঙ্গত হইল।

উপাধিবশতঃ আরোপ প্রতীপভাবে অর্থাৎ উল্টা রকমেও হইয়া থাকে। দর্পণাদি উপাধি, উহাতে শরীরের দক্ষিণ ও বামভাগ উল্টা দেখা যায়, ইহা সর্বজনসিদ্ধ। অধিকন্তু উপাধি স্বয়ং অজ্ঞাত থাকিয়া ভ্রম জন্মায় ইহাও স্ফটিক এবং জবাকুসুমের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। তদনুসারে ধূম এবং আর্দ্রেন্ধনের উক্ত অবিনাভাবসম্বন্ধ বহ্নিতেও আরোপিত হইতে পারে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিরূপে আর্দ্রেন্ধনের স্বরূপ অজ্ঞাত থাকে ততক্ষণ ঐরূপ প্রয়োগে "বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য" এইরূপে বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি আরোপিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। উপাধিস্বরূপে অর্থাৎ সাধ্যের ব্যাপকত্ব এবং হেতুর অব্যাপকত্ব উভয় প্রকারে আর্দ্রেন্ধনাদি উপাধি-পদার্থের জ্ঞান হইলে আর উহার (উপাধির) ঐপ্রকারে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব আরোপে সামর্থ্য থাকে না। সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়ে প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—অনৌপাধিকত্ব বা উপাধির অভাবই ব্যাপ্তি। প্রকৃত স্থলে উপাধি—আর্দ্রেন্ধন, দ্রব্যপদার্থ।

অনুমিতি স্থলে হেত্বাভাসের ন্যায় অযথার্থ প্রত্যক্ষ, উপমিতি এবং শাব্দবোধের ক্ষেত্রেও কোন কোন পদার্থের 'দোষ'সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

চাক্ষুষ ভ্রমপ্রত্যক্ষে পিত্ত ও দূরত্ব প্রসিদ্ধ দোষ। 'পিত্ত'দোষ বশতঃ কামলারোগী শঙ্খাদি শ্বেতবর্ণ বস্তুকে পীতবর্ণ দেখে। অতিদূরত্ব বশতঃ সূর্য চন্দ্রাদি আমাদিগের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। মিথ্যাজ্ঞানজন্য বাসনা অর্থাৎ 'ভাবনা' নামক সংস্কারও দোষ। কারণ, উহাই 'দেহাত্মবোধ'স্বরূপ ভ্রমের মূল[১]। প্রত্যক্ষস্থলে প্রয়োজনানুসারে এইপ্রকারে নানা পদার্থ দোষ হয়।

ঐরূপে উপমিতি এবং শাব্দবোধ স্থলেও উহাদিগের কারণ জ্ঞানবিশেষ 'দোষ' বলিয়া গণ্য হয়। যেমন—অশক্য (যাহা শক্য অর্থাৎ শক্তির বিষয় নহে, এরূপ) পদার্থে সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতিভ্রমে দোষ। মহিষ গোসদৃশ কিন্তু 'গবয়'পদের বাচ্য নহে। সুতরাং 'মহিষ গবয়-পদবাচ্য' এইরূপ উপমিতি ভ্রমে মহিষে গো-সাদৃশ্যজ্ঞান দোষ।

সাদৃশ্য—ইহাও সপ্ত পদার্থের বহির্ভূত নহে। দুগ্ধফেন ও শয্যার সাদৃশ্য প্রচলিত। ঐ দুইটি বস্তু পরস্পর ভিন্ন এবং উভয়ের শুভ্রবর্ণ প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই স্থানের সাদৃশ্য = শয্যাস্থিত দুগ্ধফেনের ভেদসহকৃত শুভ্রবর্ণ, সুতরাং গুণপদার্থ[২]।

ঐরূপ অশক্য পদার্থে শক্তিজ্ঞান এবং অবান্তর বাক্যের ভ্রমাত্মক শাব্দবোধ ইত্যাদি অযথার্থ শাব্দবোধ স্থলে দোষ।

---

১. ৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২. বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব উল্টাইয়া লইলে অর্থাৎ 'তদ্‌গত ভূয়োধর্ম বিশিষ্ট তদ্‌ভেদ' এইরূপ লক্ষণ করিলে সাদৃশ্য অভাবে অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৫২ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য

যেমন—'পঙ্কজ' শব্দ হইতে কুমুদ বিষয়ক শাব্দবোধ হইলে কুমুদে পঙ্কজপদের শক্তিজ্ঞান দোষ।

অতএব অন্যান্য দোষসমূহও উল্লিখিত সপ্তবিধ পদার্থের অন্তর্গত।

শক্তি—ইহা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধবিশেষ[১]।

কোন পদ শুনিলে কোন বিশেষ বস্তুর জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সকল পদ হইতে সকল পদার্থ বুঝা যায় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। এজন্য পদবিশেষের সহিত বস্তুবিশেষের একটি অসাধারণ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। উহারই নাম শক্তি। ইহার অন্য নাম বৃত্তি।

শক্তি দ্বিবিধ[২]—অভিধা ও লক্ষণা।

অভিধা—ইহার অন্য নাম সঙ্কেত। "এই শব্দ হইতে এইরূপ বস্তু বুঝিতে হইবে" এই প্রকার ইচ্ছা[৩] অভিধা। সাধারণতঃ 'শক্তি'শব্দে উক্তরূপ অভিধাই বুঝায়। যেমন—'বৃক্ষ' শব্দের শক্তি উদ্ভিদ্ বিশেষে। এইস্থলে উহা "বৃক্ষ-শব্দ এই বস্তুকে (শাখাপল্লবাদি বিশিষ্ট বস্তুকে) বুঝাউক্" এই প্রকার ইচ্ছা। শক্তির বিষয়—শক্য। সুতরাং, 'বৃক্ষ'পদের শক্য বৃক্ষ (উদ্ভিদ্)। 'পদ' স্বরূপ বৃক্ষ শ্রাবণ প্রত্যক্ষযোগ্য, পদার্থস্বরূপ বৃক্ষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়[৪]। অতএব শক্তি গুণবিশেষ।

লক্ষণা—ইহা শক্যপদার্থের সম্বন্ধবিশেষ। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (অর্থাৎ গঙ্গার মধ্যে ঘোষ--গোপালদিগের গ্রাম) এইরূপ বলিলে শ্রোতা ভাবেন—গঙ্গা ত জলপ্রবাহ, উহার উপরে একটি পল্লীর অবস্থান কিরূপে সম্ভবে ? পরে তিনি স্থির করেন—এইস্থানে 'গঙ্গা' শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু উহার অতিনিকটবর্তী তীর রূপ অর্থ বুঝাইবার জন্য বক্তা উহা প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব এইস্থলে 'গঙ্গা' শব্দের শক্য জলপ্রবাহ, উহার নৈকট্য স্বরূপ সম্বন্ধ **লক্ষণা**। লক্ষণার বিষয়—লক্ষ্য ; সুতরাং তীর 'গঙ্গা'পদের লক্ষ্য।

শক্তির ন্যায় আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানও শাব্দবোধে উপযোগী।

আকাঙ্ক্ষার নামান্তর আনুপূর্বী। যেমন—'রাম' শব্দের আকাঙ্ক্ষা 'র্' আ+ম্+অ =রাম। ইহা বর্ণস্বরূপ, অতএব শব্দগুণ[৫]।

এ পর্যন্ত বহুক্ষেত্রে 'কারণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং উহার অর্থও বুঝা আবশ্যক।

---

১. মীমাংসক মতে ইহা পৃথক্ পদার্থ। ঐমতে সকল পদার্থেরই এক এক প্রকার শক্তি স্বীকৃত। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি ইত্যাদি।

২. মতান্তরে ব্যঞ্জনা নামে আর একটি শক্তি স্বীকৃত হয়। ব্যঞ্জনা জ্ঞানবিশেষ। কেহ কেহ 'তাৎপর্য' নামে আরও একটি বৃত্তি মানিতেন। সাহিত্যদর্পণ ২য় পরিচ্ছেদ।

৩. উক্ত প্রকারে ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই অভিধা ইহাই প্রসিদ্ধ মত। মতান্তরে উক্তরূপ মনুষ্যাদির ইচ্ছাও অভিধা।

৪. ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫. আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাবিশেষ, ইহাও প্রসিদ্ধ মতান্তর।

কারণ—যে পদার্থ ব্যতীত যাহার উৎপত্তি সম্ভবে না সেই পদার্থ তাহার কারণ। যেমন—দণ্ড কুম্ভকার ইত্যাদি ঘটের এবং সূত্র, তুরী বেমা (তাঁত) তন্তুবায় ইত্যাদি বস্ত্রের কারণ।

ভাবকার্যের কারণ ত্রিবিধ[১]—সমবায়িকারণ বা উপাদানকারণ[২], অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। যাহার সহিত যে কার্যের সম্বন্ধ সমবায়, তাহা সেই কার্যের সমবায়িকারণ। সূত্র বস্ত্রের সমবায়িকারণ। কেবল দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। সমবায়িকারণে সমবেত গুণ ও কর্মবিশেষ অসমবায়িকারণ। যেমন সূত্রগুলির পরস্পর সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়িকারণ। কার্য-স্বরূপ অভাবের অর্থাৎ ধ্বংসের কোন সমবায়িকারণ এবং অসমবায়িকারণ সম্ভবে না, উহার কেবল নিমিত্তকারণই সম্ভবে, অতএব ঐক্ষেত্রে কারণের বিভাগ করা হয় নাই। কারণের ধর্ম—**কারণতা**।

কারণতা—ইহা কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণাবচ্ছিন্নব্যাপকতা। অতএব উহা অভাবের অন্তর্গত[৩]।

কার্য—যাহার উৎপত্তি বিষয়ে যে পদার্থ অবশ্যই পূর্ববর্তী হয় অথচ অন্যথাসিদ্ধ নহে, তাহা সেই পদার্থের কার্য। যেমন—ঘট মৃত্তিকা, দণ্ড, কুম্ভকার ইত্যাদির কার্য। কার্যের ধর্ম—**কার্যতা**। উহা প্রাগভাববিশেষের প্রতিযোগিত্ব[৪]।

বস্তুদ্বয়ের পরস্পর কার্যকারণভাব অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা বুঝা যায়।

অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা অর্থাৎ কোনও স্থানে একের অস্তিত্বে অপরের অস্তিত্ব। যেমন—সূত্রের অস্তিত্বে বস্ত্রের অস্তিত্ব। ইহা সূত্র ও বস্ত্রের অন্বয়।

ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা অর্থাৎ একের অভাবে অন্যের অভাব। যেমন—সূত্রের অভাবে বস্ত্রের অভাব। ইহা সূত্র ও বস্ত্রের ব্যতিরেক।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—প্রকৃত কারণের সহিত এরূপ অনেক পদার্থ সংশ্লিষ্ট যাহাদের অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রকৃত কার্যের সহিত সম্ভবে। যেমন—সূত্রের রূপ (শুক্লাদিরঙ) সূত্রের জাতি (সূত্রত্ব) ইত্যাদিও বস্ত্রের সহিত অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্ত। তথাপি উহারা বস্ত্র-কার্যে কারণ বলিয়া স্বীকৃত নহে। ফলতঃ অন্বয় এবং ব্যতিরেক থাকিলেই কোন পদার্থ কারণ হইবে ইহা সিদ্ধান্ত নহে কিন্তু উহা (অন্বয়-ব্যতিরেকযুক্ত বস্তু) অন্যথাসিদ্ধ কি না তাহাও বিচার করিতে হইবে। যদি অন্যথাসিদ্ধ হয় তবে উহার কারণত্ব স্বীকৃত হইবে না।

---

১. অন্যদার্শনিকেরা 'অসমবায়ি কারণরূপে বিভাগ স্বীকার করেন নাই।

২. ক্বচিৎ 'উপাদান' শব্দে নিমিত্তকারণও বুঝায়।

৩. ১৫৩ পৃঃ ব্যাপকতা দ্রষ্টব্য। কারণতা উক্তরূপে কাল ঘটিত হইলে উহার প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। দীধিতিকার-মতে কারণতা ও কার্যতা সপ্ত পদার্থের বহির্ভূত। ১৩ পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

৪. ১৭১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্যথাসিদ্ধ—যাহা অন্যথা অন্যপ্রকারে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কার্যের উৎপত্তি ব্যতীতও, সিদ্ধ—প্রমাণসিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অস্তিত্বলাভ করিয়াছে, তাহা **অন্যথাসিদ্ধ**। যেমন—বস্ত্র-কার্যে সূত্রের রূপ, তাঁতের রূপ, তন্তুবায়ের মাতামহ ইত্যাদি অন্যথাসিদ্ধ। সুতরাং উহারা বস্ত্রের কারণ নহে। কিন্তু সূত্রের রঙ বস্ত্রের বর্ণে অন্যথাসিদ্ধ নহে বলিয়া উহার কারণ। অন্যথা-সিদ্ধের ধর্ম—**অন্যথাসিদ্ধি** বা অন্যথাসিদ্ধত্ব। ইহা নিষ্প্রয়োজনত্ব কিংবা প্রকারান্তরে প্রমাণ-বিষয়ত্ব। সুতরাং নির্বাচন অনুসারে ইহাকে অভাব কিংবা ভাবপদার্থের অন্তর্গত বলা যায়।

এপর্যন্ত অনেক পদার্থ প্রতিযোগিতা, বিষয়তা ইত্যাদি স্বরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মত-বিশেষে ঐ সকল স্বীকৃত পদার্থসমূহে অন্তর্ভূত। যেমন—ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব ঘট অথবা ঘটত্ব স্বরূপ ইত্যাদি। মতান্তরে উহারা সপ্তপদার্থ বহির্ভূত অতিরিক্ত পদার্থ[১]

সমাপ্ত

১, 'বিষয়তাত্বাদিবৎ- প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্ব-তত্ত্ব-সম্বন্ধত্বাদয়োঽপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা। ইত্যেকদেশিমতং' সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতিঃ

গুপ্তিপাড়ার প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর-বিদ্যালঙ্কার-রচিত

দেবীস্তোত্র

(পূর্বানুবৃত্ত ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা হইতে)

শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী, এম্‌. এ.,

দরাম্ভোজরাজন্মহাপঞ্জরস্থং ২১
শুকং বেদসিদ্ধান্তমধ্যাপয়ন্তীম্‌। ২২
মহারত্নপীঠে নিষণ্ণাং প্রসন্নাং
বিষণ্ণার্ত্তিহন্ত্রীং পরাং ভাবয়ামি ॥ ১৫

নিধায়ৈকমম্ভোরুহে পাদপঙ্কে
রুহং সন্নিষণ্ণাং মহারত্নপীঠে।
করাব্জস্থিতাং বল্লকীং নাদয়ন্তীং
শুকব্যাহৃতিং শৃণ্বতীং ভাবয়ামি ২৩ ॥ ১৬

২১। পুনাতু বঃ সরস্বত্যা বিলাসশিশুকঃ শুকঃ।
করাংশুময়মাণিক্যপঞ্জিরান্তরগোচরঃ ॥
—মঙ্গলাচরণ শ্লোক, রাঘবপাণ্ডবীয়।

২২। আম্নায়বাগ্‌ভিঃ প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধয়ন্তীং শুকমাদরেণ।
—শারদাতিলক, ১২শ পটল, ১৫৮ শ্লোক।

২৩। মাতঙ্গীর ধ্যান (শাঃ তিঃ, ১২শ পটল, ১২৮ শ্লোক)—
ধ্যায়েয়ং রত্নপীঠে শুককলপঠিতং শৃণ্বতীং শ্যামলাঙ্গীং
ন্যস্তৈকাঙ্‌ঘ্রিং সরোজে শশিশকলধরাং বল্লকীং বাদয়ন্তীম্‌।
কহ্লারাবদ্ধমালাং নিয়মিতবিলসচ্চূলিকাং রক্তবস্ত্রাং
মাতঙ্গীং শঙ্খপত্রাং মধুমদবিবশাং চিত্রকোদ্ভাসিভালাম্‌ ॥

তন্ত্রান্তরে—
শ্যামাঙ্গীং বল্লকীং দোর্ভ্যাং বাদয়ন্তীং সুভূষণাম্‌।
চন্দ্রাবতংসাং বিবিধৈর্গায়নৈর্মোহয়ন্তীং জগৎ ॥

ভজে শঙ্খপত্রদ্বয়ীশোভিকর্ণাং ২৪
বিলোলালকা-লম্বি-কহ্লারমালাম্। ২৫
কদম্বপ্রসূনোল্লসৎকেশপাশাং ২৬
ত্রিলোকেশ্বরীং শঙ্করীমদ্রিকন্যাম্॥ ১৭

দরকমলস্থিত শোভমান মহাপঞ্জরের অভ্যন্তরবর্তী শুকপক্ষীকে বেদসিদ্ধান্ত পাঠননিরতা, রত্ননির্ম্মিত মহা আসনে উপবিষ্টা, প্রফুল্লা, খিন্নজনের দুঃখনাশিনী, পরা দেবীকে ভাবনা করি। ১৫

কমলের উপর একটী চরণপদ্ম স্থাপন করিয়া মহারত্নপীঠে উপবিষ্টা হস্তস্থিত বীণা বাদনশীলা, শুকমুখোচ্চারিত মন্ত্র বিশেষ শ্রবণনিরতা (দেবীকে) ধ্যান করি। ১৬

শঙ্খতাটঙ্ক (কর্ণভূষণবিশেষ) দ্বারা শোভিতকর্ণা, চঞ্চল কেশভার হইতে লম্বিত কহ্লারমালাধারিণী, কদম্ব কুসুমের দ্বারা শোভিত কেশপাশযুক্তা, ত্রিলোকেশ্বরী, শৈলকণ্যা শঙ্করীকে ভজনা করি। ১৭

ভবাম্ভোধিমধ্যে পতন্তং নিতান্তং
ভজন্তং মহাদৈন্যমেকান্তভীতম।
শরণ্যে গিরীশানকন্যে বরেণ্যে
পরিত্রাহি নান্যা গতির্বিদ্যতে মে॥ ১৮
ন যাগো ন যোগো ন পূজাপ্রয়োগো
মহাপাপরাশের্ন চ ধ্যানযোগঃ।
নতির্বা স্তুতির্বা ন মে কিঞ্চিদস্তি ২৭
ত্বমেকা গতিঃ পর্বতাধীশকন্যে॥ ১৯
নৃণাং ঘোরদারিদ্র্যবিদ্রাবিতানাং ২৮
মহাপাতকস্তোমবিত্রাসিতানাম্।
মহোগ্রাধিভির্ব্যাধিভির্বাধিতানাং
শরণ্যে ত্বমেকা গতির্নাপি বাস্তি॥ ২০

২৪। 'ক'—পুষ্পপত্রং অর্থাৎ বাণদ্বয় দ্বারা শোভিতকর্ণা।
'খ' ধ্যানোঘোরবাণাবতংসে—কর্পূর স্তবঃ 'শকুন্তপক্ষসংযুক্ত বাণকর্ণ বিভূষিতাম্'
২৫। 'তালীদলেনার্পিত কর্ণভূষাম্।'—স্তোত্রে।
কদম্বমালাভরণাং'—ধ্যানে। আলোললীলালকমায়তাক্ষং'—স্তোত্রে।
২৬। 'কদম্বমালাঙ্কিতকেশপাশাং'—স্তোত্রে।
২৭। 'খ'—নতির্বা স্তুতির্বা কৃতং মেঽস্তি কিঞ্চিৎ।
২৮। 'ক' —°র্বিদ্রাণিতানাম্।

বিপদ্ঘোর [পা] থো নিধৌ মজ্জমানৈঃ
স্মৃতা যৈঃ ক্ষণং কাতরৈস্ত্বং কৃপাব্ধে।
সমাসাদ্য সদ্যোঽতিদুঃখাব্ধিপারং
লভন্তে মনোঽভীপ্সিতার্থাদিকং তে ॥ ২১

গিরা তে গিরামীশ্বরং দিব্যকাব্যৈ-২৯
স্তথা কাব্যমব্যাজমুচ্চৈর্জয়ন্তি।
মহাবীর্যসৌন্দর্যগাম্ভীর্যধৈর্যৈ
রবিং শম্বরারিং সমুদ্রান্ [মহা-] দ্রীন্ ॥ ২২

হে শরণ্যে, বরেণ্যে, পর্বতাধীশকন্যে, ভবসাগরে সুমজ্জমান, মহাদৈন্যগ্রস্ত, একান্তভীত (আমাকে) পরিত্রাণ কর। আমার অন্য কোন গতি নাই। ১৮

যাগ, যোগ, পূজাপ্রয়োগ, ধ্যানযোগ, স্তব, প্রণাম—মহাপাপী আমার এ সব কিছুই নাই। হে শৈলরাজপুত্রি, তুমিই আমার একমাত্র গতি। ১৯

হে শরণ্যে, ভীষণ দারিদ্র্যের দ্বারা উপদ্রুত, মহাপাতক সমূহের দ্বারা বিত্রাসিত, অতি ভীষণ আধি ব্যাধি দ্বারা বাধিত জনগণের তুমিই একমাত্র গতি, আর কেহ নাই। ২০

হে কৃপাব্ধে, ঘোর বিপত্তিরূপ সমুদ্রে নিমজ্জমান হইয়া যাহারা কাতরভাবে তোমাকে স্মরণ করে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ভীষণ দুঃখরূপ সাগর পার হইয়া বাঞ্ছিত বস্তুসকল প্রাপ্ত হয়। ২১

তাহারা বাক্যের দ্বারা বৃহস্পতিকে, দিব্য কাব্যের দ্বারা শুক্রাচার্যকে, মহাবীর্যের দ্বারা রবিকে, সৌন্দর্যের দ্বারা মদনকে, গাম্ভীর্যের দ্বারা সাগরকে এবং ধৈর্যের দ্বারা মহাদ্রিকে বিশেষরূপে জয় করে। ২২

প্রভূতাপরাধাবলীজাতবাধা-
শতৈর্জর্জরং নির্জরাধীশপূজ্যে।
মহাপাপসম্পাদি[তা]শেষতাপং
প্রপন্নং বিপন্নার্তিভঙ্গে পুনীহি ॥ ২৩

সহস্রা[ব-]পঙ্কেরুহান্তশ্চরন্তীং
পরং তীব্রযোগং ভজন্তোঽ৩০ তিধীরাঃ।
সমালোক্য যাং নিবৃতিস্তাং ভজন্তে
প্রসাদং তদীয়ং কদা সাদয়ামি ॥ ২৪

নবীনার্ককোটিপ্রকামপ্রকাশাং
বিচিত্রাম্বরং ভাস্বরং সন্দধানাম্।

২৯। 'খ'—বিব্যকাব্যৈ।

৩০। 'খ'—ভজন্তে।

প্রনৃত্যন্তমীশানমালোক্য হৃষ্টাং [৩১]
প্রপদ্যেঽন্নদামন্নদানাবধানাম্[৩২] ॥ ২৫
নবার্কপ্রকাশাং মৃগেন্দ্রাধিবাসাং
চতুর্ভির্ভুজৈঃ শোভিতাং চারুহাসাম্।
মুনীন্দ্রৈর্বৃতাং নারদাদ্যৈঃ সমস্তা-
ন্মহাদুর্গতিধ্বংসিনীং নৌমি দুর্গাম্ ॥ ২৬
প্রসীদাম্বিকে চণ্ডিকে চন্দ্রচূড়ে
ত্রিলোকেশ্বরি ত্রাসবিধ্বংসদক্ষে।
বিধায়ানুকম্পাং পরাং দীনমেনং
প্রপন্নং পরিত্রাহি মাতর্ভবানি ॥ ২৭

হে দেবেন্দ্র পূজিতে, হে বিপন্নার্তিনাশিনি, অপরিমিত অপরাধ সমূহ হইতে উৎপন্ন পীড়াশতের দ্বারা জর্জরিত, মহাপাপজাত অশেষ তাপ দ্বারা যুক্ত, শরণাগত (আমাকে) পবিত্র কর। ২৩

শ্রেষ্ঠ ও উৎকট যোগের অনুশীলনকারী অতি ধীর ব্যক্তিগণ যে সহস্রারপদ্মবিহারিণীকে দর্শন করিয়া প্রসিদ্ধ পরমানন্দ প্রাপ্ত হ'ন, কবে তাঁহার কৃপা লাভ করিব। ২৪

কোটি বালসূর্যের অতিশয় প্রকাশযুক্ত', দীপ্তিমৎ ও বিচিত্র বস্ত্র পরিহিতা, নৃত্যশীল মহাদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিতা অন্নদার শরণ লই। ২৫

বালসূর্যের দীপ্তিযুক্তা, সিংহচর্মপরিহিতা, চতুর্ভুজের দ্বারা শোভিতা চারুহাসিনী, চতুর্দিক্ হইতে নারদাদি মুনিগণের দ্বারা স্তুতা, মহাদুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে প্রণাম করি। ২৬

হে অম্বিকে, হে চণ্ডীকে, হে চন্দ্রচূড়ে, হে ভয়বিনাশকার্যে নিপুণা ত্রিলোকেশ্বরি প্রসন্না হও। পরম কৃপা প্রদর্শন করিয়া এই দীন শরণাগতকে, মা ভবানি, পরিত্রাণ কর। ২৭

স্বয়ং মাতরুৎপাদ্য শুম্ভাদিদৈত্যান্
প্রমত্তানথাক্রীড়সে তৈ রণেন।[৩৩]
ততস্তজ্জয়ে কা স্তুতিস্তাবকীনা
জগন্মাতরিত্যেব পর্যাপ্তমাস্তাম্ ॥ ২৮

৩১। 'নৃত্যন্তমীশমনিশং দৃষ্ট্বাঽনন্দময়ীং পরাম্।—তন্ত্রে।
'নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং'—ধ্যানে।

৩২। 'খ'—সদৈবান্নদানাবধানাং প্রপদ্যে।

৩৩। 'খ'—প্রমত্তানথ ক্রীড়াশ তৈ রণেন।

[নমস্তারিণি ত্রাণকারিণ্যনন্তে
নমস্তে ভবাম্ভোধিনিস্তারকর্ত্রি ।]
নমো রাজরাজেশ্বরী রূপবত্যৈ
ভবত্যৈ রমাখ্যস্ববীজাবগত্যৈ[৩৪] ॥ ২৯
নমামঃ[৩৫] সদা ভৈরবীং[৩৬] ভীতিহন্ত্রীং
তথা ছিন্নমস্তাং[৩৭] সমস্তার্তিহন্ত্রীম্ ।
নমো মেঽদ্য[৩৮] ধূমাবতীরূপিণীং ত্বাং
মকার[াদি]ত[ত্ত্ব]প্রদারপ্রচারাম্ ॥ ৩০
অচিন্ত্যামচিন্ত্যপ্রভাবপ্রকাশাং[৩৯]
নিরীহাং স্বতন্ত্র[স্ব]কাং স্বপ্রকাশাম্ ।
সমাধৌ মহাযোগিভিশ্চিন্ত্যমানাং
চিদানন্দরূপামরূপাং[৪০] নমামি ॥ ৩১
মদোত্তুঙ্গমাতঙ্গলীলাভিযানাং
সদাপীতমাধ্বীমদাঘূর্ণিতাক্ষীম্ ।[৪১]
প্রমত্তাং নমস্তা[প]হন্ত্রীং [সুতন্ত্রীং]
মহাবল্লকীং বাদয়ন্তীং নমামি ॥ ৩২

মা, প্রমত্ত শুম্ভাদি দৈত্যগণকে স্বয়ং উৎপাদন করিয়া তুমি তাহাদের সহিত রণক্ষেত্রে ক্রীড়া কর। সুতরাং জগন্মাতঃ, তাহাদিগকে জয় করায় তোমার আর কি প্রশংসা করিব ?' আমরা এইখানেই বিরাম করিতে চাহি । ২৮

হে তারিণি, ত্রাণকারিণি, অনন্তে, তোমাকে নমস্কার, হে ভবসাগর পারকর্ত্রি, তোমাকে নমস্কার। রমা নামক তোমার নিজবীজের অবগতির জন্য রাজরাজেশ্বরী রূপ ধারিণী তোমাকে নমস্কার । ২৯

ভয়নাশিনী ভৈরবীকে এবং সমস্ত দুঃখনাশিনী ছিন্নমস্তাকে সর্বদা নমস্কার করি । মকারাদি তত্ত্বের ধারাপ্রচারকারিণী ধূমাবতী রূপিনী তোমাকে অদ্য নমস্কার করি । ৩০

তুমি অচিন্ত্যা, তোমার প্রভাবের প্রকাশ অচিন্ত্য, তুমি নিষ্ক্রিয়া, স্বাধীন তোমার আত্মা, তুমি স্বপ্রকাশ, মহাযোগিগণের দ্বারা সমাধিতে চিন্ত্যমানা চিদানন্দরূপা অরূপা তোমাকে নমস্কার । ৩১

---

৩৪ । 'খ'—ভবত্যৈ চ মামখ্য বীজাবগত্যৈ । রমাখ্যবীজং যথা—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং হ্রীং (তন্ত্রসার দ্রষ্টব্য) ৩৫ । 'খ'—নমামি । ৩৬ । 'খ'—ভৈরবী । ৩৭ । 'খ'—ছিন্নমস্তা ।
৩৮ । 'খ'—নমাম্যদ্য । ৩৯ । 'খ'—আচন্ত্যোমচিন্ত্যং
৪০ । 'খ'—চিদানন্দরূপাং স্বরূপাং । ৪১—মাধ্বীমদাঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাং—স্তোত্রে ।

মদোন্মত্ত হস্তির ন্যায় গমনকারিণী, সদা সুরাপান জনিত মত্ততার দ্বারা ঘূর্ণিতনয়না, প্রমত্তা, প্রণতজনের দুঃখনাশিনী সুন্দরতন্ত্রীযুক্ত বীণাবাদননিরতা (তোমাকে) নমস্কার। ৩২

প্রধানাভিধানা গুণানাং বিতানৈ-
র্গুণোঽধিপ্রপঞ্চং সমগ্রং ত্বমেব।
তথা পুরুষত্বেন সাক্ষীব সর্বং
নিরীক্ষ্যাসি তূষ্ণীং দ্বিধাভূমিকাসি৪২ ॥ ৩৩
পরে শব্দরূপামরূপাং৪৩ তমৈতৎ
ত্বনাদ্যন্তধারা[-বহং] ব্যাহরন্তি।
পরে যোগগম্যামগম্যামবোধৈঃ
শিবাকারভাজং মহান্তো বদন্তি ॥ ৩৪
অনন্তাকৃতিং বিষ্ণুমাযাভিধানাং ৪৪
পুরাণাদ্যভিজ্ঞাঃ সদা জ্ঞাপযন্তি ৪৫
পরাং শক্তিমাদ্যাং পরানন্দরূপা-
মচিন্ত্যাং বিদুস্তান্ত্রিকা বুদ্ধিঃ মন্তঃ ৪৬ ॥ ৩৫
চলে নিশ্চলে বারি ভানোর্যথা স্যাদ্
গতিস্থৈর্যযোর্ভানমেবং ভবত্যাঃ।
অবিদ্যাবিলে মানসে ভূবিভাবঃ
প্রকাশাববোধশ্চিদানন্দরূপে ॥৩৬
অনির্বচ্যযা স্বীযশক্ত্যা ত্বমেকা-
প্যনেকা নিরাকারসাকারতা তে।
নবাশ্চর্যরূপামচিন্ত্যপ্রভা[বা-]
মতস্তাং শ্রুতিঃ প্রাহ শৈলেন্দ্রকন্যে ॥৩৭

'প্রধানা' সংজ্ঞায় তুমি অভিহিতা, গুণের বিস্তারের দ্বারা তুমি সমস্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি কর।

৪২। ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥ কুমারসম্ভব ২।১৩

৪৩। শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদগীথ রম্যপদপাঠবতাং চ সাম্নাম্। চণ্ডী ৪।১০

৪৪। দুর্গা নারায়নীশানা বিষ্ণুমায়া শিবা সতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৫৪ অধ্যায়।

৪৫। 'খ'—পুরাণাভি বিজ্ঞাপয়ন্তি। ৪৬। 'খ'—বুদ্ধিমাতুঃ।

[নমস্তারিণি ত্রাণকারিণ্যনন্তে
নমস্তে ভবাম্ভোধিনিস্তারকর্ত্রি।]
নমো রাজরাজেশ্বরী রূপবত্যৈ
ভবত্যৈ রমাখ্যাস্ববীজাবগত্যৈ[৩৪] ॥ ২৯
নমামঃ[৩৫] সদা ভৈরবীং[৩৬] ভীতিহন্ত্রীং
তথা ছিন্নমস্তাং[৩৭] সমস্তার্তিহন্ত্রীম্।
নমো মেহদ্য[৩৮] ধূমাবতীরূপিণীং ত্বাং
মকার[া]দি[ত[ত্ব]প্রদাবপ্রচারাম্॥ ৩০
অচিন্ত্যামচিন্ত্যপ্রভাবপ্রকাশাং[৩৯]
নিরীহাং স্বতন্ত্র[স্ব]কাং স্বপ্রকাশাম্।
সমাধৌ মহাযোগিভিশ্চিন্ত্যমানাং
চিদানন্দরূপামরূপাং[৪০] নমামি॥ ৩১
মদোত্তুঙ্গমাতঙ্গলীলাভিযানাং
সদাপীতমাধ্বীমদাঘূর্ণিতাক্ষীম্।[৪১]
প্রমত্তাং নমস্তা[প]চন্ত্রীঃ [সুতন্ত্রীং]
মহাবল্লকীং বাদয়ন্তীং নমামি ॥ ৩২

মা, প্রমত্ত শুম্ভাদি দৈত্যগণকে স্বয়ং উৎপাদন করিয়া তুমি তাহাদের সহিত রণক্ষেত্রে ক্রীড়া কর। সুতরাং জগন্মাত', তাহাদিগকে জয় করায় তোমার আর কি প্রশংসা করিব?' আমরা এইখানেই বিরাম করিতে চাহি। ২৮

হে তারিণি, ত্রাণকারিণি, অনন্তে, তোমাকে নমস্কার, হে ভবসাগর পারকর্ত্রি, তোমাকে নমস্কার। রমা নামক তোমার নিজবীজের অবগতির জন্য রাজরাজেশ্বরী রূপ ধারিণী তোমাকে নমস্কার। ২৯

ভয়নাশিনী ভৈরবীকে এবং সমস্ত দুঃখনাশিনী ছিন্নমস্তাকে সর্বদা নমস্কার করি। মকারাদি তত্ত্বের ধারাপ্রচারকারিণী ধূমাবতী রূপিনী তোমাকে অদ্য নমস্কার করি। ৩০

তুমি অচিন্ত্যা, তোমার প্রভাবের প্রকাশ অচিন্ত্য, তুমি নিষ্ক্রিয়া, স্বাধীন তোমার আত্মা, তুমি স্বপ্রকাশ, মহাযোগিগণের দ্বারা সমাধিতে চিন্ত্যমানা চিদানন্দরূপা অরূপা তোমাকে নমস্কার। ৩১

৩৪। 'খ'—ভবত্যৈ চ মামখ্য বীজাবগত্যৈ। রমাখ্যবীজং যথা—শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং স্ত্রীং (তন্ত্রসার দ্রষ্টব্য) ৩৫। 'খ'—নমামি। ৩৬। 'খ'—ভৈরবী। ৩৭। 'খ'—ছিন্নমস্তা।
৩৮। 'খ'—নমাম্যদ্য। ৩৯। 'খ'—আচম্মোমচিন্ত্যং
৪০। 'খ'—চিদানন্দরূপাং স্বরূপাং। ৪১—মাধ্বীমদাঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাং—স্তোত্রে।

মদোন্মত্ত হস্তির ন্যায় গমনকারিণী, সদা সুরাপান জনিত মত্ততার দ্বারা ঘূর্ণিতনয়না, প্রমত্তা, প্রণতজনের দুঃখনাশিনী সুন্দরতন্ত্রীযুক্ত বীণাবাদননিরতা (তোমাকে) নমস্কার। ৩২

প্রধানাভিধানা গুণানাং বিতানৈ-
র্গুণোঽখিপ্রপঞ্চং সমগ্রং ত্বমেব।
তয়া পুরুষত্বেন সাক্ষীব সর্বং
নিরীক্ষ্যাসি তূষ্ণীং দ্বিধাভূমিকাসি[৪২] ॥ ৩৩
পরে শব্দরূপামরূপাং[৪৩] তমৈতৎ
ত্বনাদ্যন্তধারা[-বহং] ব্যাহরন্তি।
পরে যোগগম্যামগম্যাসবোধৈঃ
শিবাকারভাজং মহান্তো বদন্তি ॥ ৩৪
অনন্তাকৃতিং বিষ্ণুমায়াভিধানাং ৪৪
পুরাণাদ্যভিজ্ঞাঃ সদা জ্ঞাপযন্তি ৪৫
পরাং শক্তিমাদ্যাং পরানন্দরূপা-
মচিন্ত্যাং বিদুস্তান্ত্রিকা বুদ্ধিঃ মন্তঃ ৪৬ ॥ ৩৫
চলে নিশ্চলে বারি ভানোর্যথা স্যাদ্
গতিস্থৈর্যয়োর্ভানমেবং ভবত্যাঃ।
অবিদ্যাবিলে মানসে ভূবিভাবঃ
প্রকাশাববোধশ্চিদানন্দরূপে ॥৩৬
অনির্বচ্যযা স্বীয়শক্ত্যা ত্বমেকা-
প্যনেকা নিরাকারসাকারতা তে।
নবাশ্চর্যরূপামচিন্ত্যপ্রভা[বা-]
মতস্তাং শ্রুতিঃ প্রাহ শৈলেন্দ্রকন্যে ॥৩৭

'প্রধানা' সংজ্ঞায় তুমি অভিহিতা, গুণের বিস্তারের দ্বারা তুমি সমস্ত প্রপঞ্চের সৃষ্টি কর।

৪২। ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥ কুমারসম্ভব ২।১৩

৪৩। শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীথ রম্যপদপাঠবতাং চ সাম্নাম্। চণ্ডী ৪।১০

৪৪। দুর্গা নারায়নীশানা বিষ্ণুমায়া শিবা সতী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৫৪ অধ্যায়।

৪৫। 'খ'—পুরাণাভি বিজ্ঞাপয়ন্তি। ৪৬। 'খ'—বুদ্ধিমাতুঃ।

আবার 'পুরুষ'রূপে সাক্ষীর স্থায় তুমি সমস্ত দর্শন করিয়া উদাসীন থাক। তোমার ভূমিকা দুই প্রকার।৩৩

পণ্ডিতগণ তোমাকে নিরাকারা শব্দরূপা এবং জগৎকে আদি ও অন্তহীন ধারাবহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। অপরে তোমাকে যোগগম্যা এবং অজ্ঞান ব্যক্তিগণ তোমাকে অগম্যা কহিয়া থাকেন। মহৎ ব্যক্তিসকল তোমাকে শিবাকারা কহিয়া থাকেন।৩৪

পুরাণবেত্তাসকল তোমাকে অনন্তাকৃতি বিষ্ণুমায়া (অর্থাৎ ভগবতী) নামে খ্যাপন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ তান্ত্রিকগণ তোমাকে অচিন্ত্যা, পরানন্দরূপা, শ্রেষ্ঠা আদ্যাশক্তি বলিয়াই জানেন।৩৫

চঞ্চল ও নিশ্চল জলে সূর্য্যের যেরূপ গতি ও স্থিরতার জ্ঞান হয়, সেইরূপ তোমারও প্রকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অবিদ্যা দ্বারা পঙ্কিল মানসে তোমার বহু প্রকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানময় হৃদয়ে তুমি জ্যোতির্ময়ীরূপে দৃষ্ট হও।৩৬

তোমার অনির্বাচ্য নিজ শক্তির দ্বারা তুমি একা হইয়াও অনেকা—অতএব তোমার সাকারতা ও নিরাকারতা। হে শৈলপুত্রি, এই জন্যই বেদ তোমাকে নবাশ্চর্যরূপা ও অচিন্ত্য-প্রভাবা বলিয়াছেন।৩৭

ও নৈর্ভাবনাভির্বিভিন্নারীশে
প্রসিদ্ধাভিরুক্তাভিরুচ্চৈস্ত্রয়ীভিঃ।
বিভিন্নৈব সংবীক্ষ্যসে[৪৬] বিশ্বমূর্তে
বিভিন্নং[৪৭] ন কিঞ্চিত্ত্বয়ীতি প্রতীমঃ ॥ ৩৮
যতো মানসানাং মুনীনাং প্রসূতৌ
ন রেতো ন বা শোণিতং হেতুরাসীৎ।
অতঃ সর্বতঃ সর্বসম্ভাবনং স্যা[দ্]
যদীচ্ছা[৪৮] ত্বদীয়া তদঙ্গীকরোতি ॥৩৯
মহাপাতকধ্বান্তকোটীন্দুরূপাং
মহামোহবিস্তারনিস্তারহেতুম্।
বিপদ্ঘোরবারাং নিধেঃ পারদাত্রীং
ধরিত্রীধরেন্দ্রাত্মজামাশ্রয়ামি ॥৪০
দিনেশানবিম্বান্তরে[৪৯] দীপ্যমানাং
চতুর্বর্গদাং ভাবয়ে ভগদ্রূপাম্।
জগৎসর্গসংহাররক্ষাতিদক্ষাং
মহাদুর্গতিধ্বংসিনীং দক্ষকন্যাম্ ॥৪১

৪৬। 'খ'—সম্বীক্ষ্যসে। ৪৭। 'খ'—বিরুদ্ধং। ৪৮। 'খ'—স্বদীচ্ছা
৪৯। 'খ'—বিদ্যান্তরে।

বিচিন্ত্যাত্মদুর্বারঘোরাপরাধান্
নিরুক্তাঞ্চ বেদৈস্তবোদারশক্তিম্।
ভয়াশ্বাসধীদ্বন্দ্বসন্দোহদোলা-৫০
সমান্দোলনৈর্মন্দতামাগতোঽস্মি ॥৪২

হে ঈশ্বরি, তুমি জনগণ কর্তৃক বিভিন্না দৃষ্ট হও, যেহেতু বেদত্রয়ে বিভিন্নভাবের দ্বারা আরাধনা করার কথা উক্ত আছে। হে বিশ্বমূর্তে, আমি কিন্তু তোমাতে বিভিন্নতা কিছুই অনুভব করি না।৩৮

যেহেতু মানস মুনিগণ রেতঃ-শোণিত-সংযোগে উৎপন্ন হ'ন নাই, অতএব চতুর্দিকে সবই সম্ভব হইতে পারে যদি সে সকল তোমার ইচ্ছার বিষয় হয়।৩৯

মহাপাপরূপ অন্ধকার নাশের কোটিশশধরূপা, মহামোহজালের নিস্তারকর্ত্রী, বিপত্তিরূপ ঘোর সমুদ্রের পারদাত্রী, ভূধরেন্দ্র কন্যাকে আশ্রয় করি।৪০

সূর্যমণ্ডলমধ্যে প্রকাশমানা, ধর্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ-দায়িনী, তেজঃস্বরূপা, জগতের সৃষ্টি স্থিতিলয় নিপুণা, মহাদুঃখনাশিনী, দক্ষকন্যাকে ভাবনা করি।৪১

নিজের অপ্রতিকার্য ঘোর অপরাধ এবং বেদোচিত তোমার উদার শক্তির কথা চিন্তা করিয়া, ভয় ও আশ্বাস এই উভয়ের দোলায় দোদুল্যমান হওয়ায় মন্দতাপ্রাপ্ত হইয়াছি (অর্থাৎ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না কি করিব)। ৪২

পুরাণেতিহাসাদিতো নির্বিবাদং৫১
কৃতেঃ৫২ শ্রূয়তে নাগসাং রাশিরীদৃক্।
অনুদ্‌ঘাটিতোহ৫৩প্যুদ্ভবতো যাম্যদৃষ্টে-
র্ভবেৎ৫৪ তন্মহত্যদ্য শঙ্কাভ্যুদেতি ॥ ৪৩
তথা দুর্ঘটানাং বিধানেঽতিশক্তাং
ত্বদীয়োরুশক্তিং শ্রুতিঃ প্রব্রবীতি।
অতঃ সাহসান্মাতরাশ্বাসিতাত্মা ৫৫
পরিত্রাণসঙ্কল্পতল্পং ভজামি ॥ ৪৪

৫০। 'খ'—ভয়াশ্রাসধী°।
৫১। 'খ'—নোবদা। ৫২। 'খ'—কৃতি।
৫৩। 'খ'—অনুপদিতো। ৫৪। 'খ'—রভাবৎ।
৫৫। 'খ'—°রাশ্বাসিতানো।

জগদ্‌বৈজয়ন্তীং বিপক্ষাঞ্জয়ন্তীং
জয়ন্তীং ব্র[জেৎসুস্ব-]মুৎপাদয়ন্তীম্। ৫৬
ভজে সর্বদা সর্বদাং সর্বদ[ারা-] ৫৭
বতারাং সদারাধিতাং সর্বদেবৈঃ ॥ ৪৫
নমাম্যুগ্রতারামনন্তাবতারাং ৫৮
নতা৫৯রাধনৈস্তোষিতাং দেববৃন্দৈঃ।
[পুনর্জন্মবিধ্বংসনায়াতিখিন্নো
বিপন্নশ্চ বাণেশ্বরো নশ্বরোঽহম্ ॥] ৪৬

পুরাণ ও ইতিহাস আদিগ্রন্থ হইাত জ্ঞাত হওয়া যায় যে পাপানুষ্ঠান লোকচক্ষুর অন্তরালে করিলেও যমের দৃষ্টির কাছে উহা গোপন থাকে না। আমার পাপ এত অধিক যে তজ্জন্য অদ্য আমার মনে শঙ্কার উদয় হইতেছে। ৪৩

এদিকে বেদ তোমার অঘটনঘটনপটীয়সী মহতী শক্তির কথা বলিয়া থাকেন। তজ্জন্য মা, মনে সাহস হয় যে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব। ৪৪

সংসারের পতাকাস্বরূপা, বিপক্ষনাশিনী, ব্রজধামে জয়ন্তীযোগে অবতীর্ণা, শিবদারা-বতারা, দেবগণ কর্তৃক সদা আরাধিতা সর্বদাকে সর্বদা ভজনা করি। ৪৫

আমি নশ্বর বাণেশ্বর, অতি বিপন্ন ও খিন্ন। পুনর্জন্ম নাশের জন্য দেবগণ কর্তৃক প্রণাম ও আরাধনার দ্বারা তোষিতা, অসংখ্য অবতারে অবতীর্ণা, উগ্রতারাকে প্রণাম করি। ৪৬

৫৬। গৌণভাদ্রস্য কৃষ্ণপক্ষেঽর্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তাষ্টমী জয়ন্তীত্যুচ্যতে তস্যামেব শ্রীকৃষ্ণযোগমায়য়োরুৎপত্তিরাসীৎ অতস্তত জয়ন্তীব্রতং ভবিষ্যপুরাণাদৌ বিহিতম্।

৫৭। শর্বঃ সর্বঃ ইতি দ্বয়মেব শিবনাম।

৫৮। তারকত্বাৎ সদা তারা সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্তিতা ॥—তন্ত্রসার।
তামুগ্রতারামৃষয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ।
উগ্রাদপি ভয়াত্ত্রাতি যস্মাৎ ভক্তান্ সদাম্বিকা ॥
—কালিকাপুরাণ, ৬১ অধ্যায়।

৫৯। নম্+ভাবে ক্তঃ=নতম (নতিঃ)।

আসামের বৈষ্ণবধর্মে ভক্তির স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীতীর্থনাথ শর্মা, এম্. এ. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

শঙ্করদেবের পূর্ব হইতে আসামে বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। মাধব কন্দলি, হরিহর বিপ্র, হেম সরস্বতী প্রভৃতি প্রাক্‌শঙ্করযুগের কবিগণের রচনায় ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মাধবকন্দলিকেই প্রকৃতপক্ষে আসামের বৈষ্ণব ধর্মের অগ্রদূত বলা যায়। শঙ্করদেবের প্রচারিত বিষ্ণুভক্তির প্রায় সমস্ত তত্ত্ব মাধবকন্দলির রামায়ণের "উপদেশ পাঠের"[১] মধ্যে পাওয়া যায়। তথাপি শঙ্করদেবকেই আসামের বৈষ্ণবধর্মপ্রবর্তক বলা অসঙ্গত নহে। কারণ বিষ্ণু-ভক্তির যে সুধাভাণ্ড একদিন মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকায়স্থের গুপ্তধন ছিল, শঙ্করদেবের চেষ্টায় তাহাই আদ্বিজচণ্ডালের আস্বাদনীয় হইয়া উঠিল। মাধবদেব 'নামঘোষার' একস্থলে এইরূপ গাহিয়াছেন :—

হরিনামরসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে
প্রেম অমৃতর নদী।
শ্রীমন্ত শঙ্করে পার ভাঙ্গি দিলা
বহে ব্রহ্মাণ্ডক ভেদি॥ নামঘোষা-৩৭১.

শঙ্করদেবের অসমাপ্ত কার্য হাতে লইয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য মাধবদেব অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কার্যক্ষমতা ছিল অসাধারণ। প্রচারের গোড়ামিও হয়ত তাঁহার ছিলনা এমন নহে। ফলতঃ তাঁহার নির্দেশেই আসামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শুদ্ধিসংগঠনের কাজ আরম্ভ হইল, এবং তাঁহার তিরোধানের পূর্বেই সমস্ত বৈষ্ণবসমাজ এবং বৈষ্ণবধর্ম সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ হইয়া পড়িল।

শঙ্করদেব মাধবদেবকেই তাঁহার ধর্মাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। অসমীয়া বৈষ্ণবেরা ইহাকে "গার বদল"[২] আখ্যা দিয়া থাকেন। মাধবদেব শঙ্করদেবের 'গার-বদল' পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তন্নিবন্ধন শঙ্করদেবের প্রচারিত সমস্ত তত্ত্বই যে মাধবদেবের সময়ে অপরিবর্তিত রহিয়াছিল ইহা আমরা মনে করি না। শরণভজন আদি যাবতীয় সাধন-প্রণালীতে বিশেষ পরিবর্তন না আসিলেও তত্ত্বের দিক্ দিয়া যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল সে বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

---

১ অধ্যায়ের শেষের দিকে বিষ্ণুভক্তি নাম ধর্ম আদির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে 'উপদেশ পাঠ' বলা হয়।

২ গার বদল—আপনার সমস্ত শক্তির ও ধর্মে শিষ্যে অর্পণ করার নাম গার বদল।

অসমীয়া বৈষ্ণবদিগের চারিখানি প্রধান গ্রন্থ,—কীর্তন, দশম, নামঘোষা ও রত্নাবলী। ইহা ছাড়াও শঙ্করদেবের 'ভক্তিরত্নাকর' নামে একখানি ভক্তিতত্ত্বসম্পর্কীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। এই গ্রন্থ এখনো মুদ্রিত হয় নাই। ইহা হস্তলিখিত 'সাঁচিপতীয়া পুথি' রূপে পাওয়া যায় (সাঁচি-পতীয়া অগুরু গাছের বল্কলে লিখিত পুথি)। উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণ্য সম্বন্ধে অনেকেই একমত। নামঘোষা ও রত্নাবলী গ্রন্থ দুইটী মাধবদেবের রচিত।

রত্নাবলী গ্রন্থ বিষ্ণুপুরী সন্ন্যাসীর ভক্তিরত্নাবলীর টীকাসহ পদ্যানুবাদ। চরিত পুথির বিবরণে দৃষ্ট হয় শঙ্করদেবের আদেশেই মাধবদেব অসমীয়া ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। 'নামঘোষা' অবশ্য শঙ্করদেবের তিরোধানের পরে রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরীর সংগ্রহ এবং টীকায় মাধবদেব যে কিছু প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন নামঘোষাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ 'নামঘোষার প্রথম ঘোষাটিই বিষ্ণুপুরীর 'কান্তিমালা' টীকার মঙ্গলাচরণের পদ্যানুবাদ— যদিও মূলের সামান্য পরিবর্তন তিনি করিয়াছেন।

শঙ্করদেব পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু ভক্তিকে পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া তিনি কোথাও দৃঢ়ভাবে স্বীকার করেন নাই। ভক্তিমার্গের প্রধান্য তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য কিন্তু ভক্তিই যে একমাত্র চরম সাধ্য বস্তু—এই কথা এত স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিয়া যান নাই। অনেক স্থলে ভক্তিই যে ভক্তের নিতান্ত প্রিয় বস্তু তাহা তিনি বলিয়াছেন বটে কিন্তু তুলনায় সেগুলি প্রশংসাপর মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মোক্ষের সাধ্যত্ব তিনি মানিয়া লইয়াছেন এবং ভক্তিকে স্পষ্টই মোক্ষের বীজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

ভকতি সে চিত্ত ভকতি সে বিত্ত
ভকতি মোক্ষর বীজ। দশম ২২১

ভক্তির পরে যে বিষ্ণু-জ্ঞান মহাতত্ত্বের উদয় হয় তিনি ইহাও দশমের একস্থলে বলিয়াছেন।

শুনি লোক অভিপ্রায় অতিপরে পুণ্য নাই
হোরে শুদ্ধ মহা অন্ত্যজাতি।
পরম বান্ধব নাম মিটো লয় অবিশ্রাম
তার সাত কার্য্য সিজে অতি॥
দহয় পাতকগণ পুণ্য করে উপার্জ্জন
বিরকতি মিলে বিষয়ত।
কৃষ্ণর চরণ প্রেম ভকতিক উপজায়
পায় বিষ্ণুজ্ঞান মহাতত্ব॥ দশম ৬৬-৬৭

ইহাতে বোঝা যায় ভক্তির পরেও এক মহাতত্ত্ব আছে এবং তাহা প্রয়োজনীয়ও বটে। 'কীর্তন' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের উপদেশপাঠেও মোক্ষপদকে স্মরণকীর্তনের ফল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

কৃষ্ণর রহস্যকথা শুনা সর্বজনে ।
মোক্ষপদ সাধে যার স্মরণ কীর্তনে ॥ কীর্তন ৩৩.

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা। ভক্তিরত্নাকরের মঙ্গলাচরণ শ্লোকটিই তাঁহার মত সম্পর্কে একটী ধারণা আনিয়া দেয়। সেই শ্লোকটি এই—

যন্নামধেয়েন ভবাব্ধিমগ্নসা ।
তর্যা সমুত্তীর্য নরঃ পরং পদম্॥
প্রাপ্নোতি পাতক্যপি তং সনাতনম্।
সদা সদানন্দমুপাস্মহে হৃদি ॥

শঙ্করদেব তাহার ভক্তিতত্ত্ব সম্পর্কীয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই সদানন্দ সনাতনকে হৃদয়ে উপাসনা করিতেছেন। কেননা সেই সদানন্দের নাম করিয়া পাতকী নরও অতিশীঘ্রই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকে। এইস্থলে নামের আনন্দকে চরমসাধ্য না বলিয়া পরম পদেরই প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। অধিকন্তু নামমাত্র সাধনত্বে পর্যবসিত হইতেছে।

ইহার সঙ্গে মাধবদেবের নাম ঘোষার মঙ্গলাচরণ তুলনা করা দরকার। নামঘোষাগ্রন্থের প্রথম ঘোষাটি এই—

মুক্তিত নিস্পৃহ মিটো। সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোহোঁ ভকতি
সমস্ত মস্তকমণি নিহ ভকতর বশ্য
ভজোঁ হেন দেব যদুপতি ॥

পূর্বে বলা হইয়াছে এই ঘোষাটি ভক্তিরত্নাবলীর কান্তিমালা টীকার মঙ্গলাচরণের অনুবাদ। শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি—

যে মুক্তাবপি নিস্পৃহাঃ প্রতিপদপ্রোন্মীলদানন্দদাম ।
মামাস্থায় সমস্তমস্তকমণিং কুর্বন্তি যং স্বে বশে ॥
তান্ ভক্তানপি তাঞ্চ ভক্তিমপি তং ভক্তপ্রিয়ং শ্রীহরিম্।
বন্দে সন্ততমর্থয়েহনুদিবসং নিত্যং শরণ্যং ভজে ॥

অনুবাদের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে ধরা পড়িবে যে মাধবদেব মূলের 'প্রোন্মীলদানন্দদাম্' অংশের তর্জমা করিতেছেন রসময়ী মাগোহো ভকতি। মূলে ভক্তির দুইটি বিশেষণ আছে প্রোন্মীলদা ও আনন্দদা। মাধবদেব দুইটির স্থলে একটি বিশেষণ ব্যবহার করিতেছেন 'রসময়ী'। উন্মীল শব্দের অর্থ জাগরণ প্রবোধ, কাজেই জ্ঞান; আর প্রোন্মীল অর্থে প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্রোন্মীলদা প্রকৃষ্টজ্ঞানদায়িনী। ভক্তিকে যখন জ্ঞানদা বলা হইল সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সাধ্যত্ব মানিয়া লওয়া হইল। মাধবদেব এই কথা স্বীকার করিতে চাননা এবং সেই জন্যই তিনি এই কথাটা একেবারে বাদ দিয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে ভক্তি আনন্দদা

নহে, আনন্দময়ী। সেইজন্য তিনি লিখিয়াছেন 'রসময়ী মাগোহোঁ ভকতি'। যেখানে পার্থক্য লক্ষিত হয় সেইখানেই আপন মতটিও ধরা পড়ে। এই ঘোষাতেও তাহাই হইয়াছে। এই গেল নাম-ঘোষার উপক্রমের কথা। উপসংহারেও মাধবদেব স্পষ্টভাষাতে ভক্তির পরম পুরুষার্থতা ঘোষণা করিতেছেন,—শেষের এই পরম পুরুষার্থশীর্ষক ঘোষাটি এই—

পরম পুরুষার্থ

একান্ত ভকত যারা হয় অর্থ কিছু ন বাঞ্ছয়।

মহা অদভুত হরিগুণ নামময়।

পরম মঙ্গল কৃষ্ণ যশ যাত পরে আন নাহি রস

পরম সমুদ্রে মজি রহয়॥ নামঘোষা ৬৮৪

ভক্তি পরমপুরুষার্থই শুধু নহে, পঞ্চম পুরুষার্থও বটে। মাধদেব ভক্তিকে মুলধারা আর চারি পুরুষার্থকে তাঁহার নির্ঝর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

গোবিন্দর প্রেম অমৃতর নদী

বহে বৈকুণ্ঠর পরা (বৈকুণ্ঠের পরা=বৈকুণ্ঠ হইতে)

চারি পুরুষার্থ তাহার নিঝরা

হরিনাম মূলধাবা।—নামঘেষা ৩৭২

শঙ্করদেবের পবে নামঘোষা রচিত হইয়াছিল এবং ভক্তিতত্ত্বের এই দিকটা নাম-ঘোষাতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইযাছে। শঙ্করদেব ভক্তিকে পরমপুরুষার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। মোক্ষকেই ভক্তির চরম বলিয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। মোক্ষকে ভক্তির প্রাসঙ্গিক ও অনায়াসলভ্য ফল বলিয়া কোথাও কিছু লিখেন নাই। মাধবদেব কিন্তু ভক্তির পবে আর কিছু প্রার্থনীয় আছে বলিয়া মনে করেন না। আসামের বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বে মাধবদেবের সময়ে এই পরিবর্তন আমরা দেখিতে পাই।

অসমীয়া বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিবর্তন একটি আলোচনীয় বিষয়। এই পর্যন্ত তাহা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। প্রাচীন বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তির সাধন বিষয়েই বেশী আলোচনা পাওয়া যায় কিন্তু তত্ত্বের দিকটা তত বিশদ এবং স্পষ্টভাবে আলোচিত হয় নাই। এইজন্য শঙ্কর মাধবাদি প্রথম গুরুগণের গ্রন্থ হইতে অনেকটা উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। মাধবদেবের পরেও কিছু কিছু নূতনত্ব আসিয়া পরিয়াছে।

---

* বস্তুতঃ নামঘোষা এই খানেই শেষ হয় নাই, কিন্তু নামঘোষা গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য বিষয় এইখানেই শেষ হইয়াছে। ইহার পরে নিত্য চারিপ্রসঙ্গে নামকীর্তন করার উপযোগী নাম গ্রহণাদি মাত্র আছে।

মহাকবি কালিদাসের কালনির্ণয়

(আলোচনা)

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত বৎসর চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যার 'শ্রীভারতী'তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্. এ. মহোদয় 'মহাকবি কালিদাসের কালনির্ণয়' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া মহাকবির সময় মোটামুটি ৫৫০ খ্রীস্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। আজ প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে Ferguson সাহেব কালিদাসের কাল মোটামুটি ৫৫০ খ্রীস্টাব্দ—এরূপ এক অদ্ভুত মত প্রচার করেন। আচার্য ম্যাক্সমুলার সাহেবও ইহা ঠিক মনে করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবোধ বাবু আবার জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে উহাই মহাকবির ঠিক সময় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মহাকবির সময় যে এত পরবর্তী কালে হইতে পারে না, তাহার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রবোধ বাবু এ সব না জানিয়া মহাকবির সময় সম্বন্ধে যে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেখাইতেছি।

প্রবোধ বাবু প্রথমেই লিখিতেছেন যে যাঁহারা জ্যোতির্বিদাভরণ-গ্রন্থকার কালিদাস ও মহাকবি কালিদাস অভিন্ন বলিয়া মানেন। তাঁহাদের মতে কালিদাসের কাল খ্রীঃ পূঃ ৩৪ অব্দ। কিন্তু ইহা মোটেই সত্য নহে। জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাস অপর কেহ, স্বীকার করিলেও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' প্রভৃতির গ্রন্থকার যে প্রথম খ্রীঃ পূর্বাব্দে ছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মহাকবি কালিদাস যে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্বকারী বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন ইহাই সর্বভারতীয় অবিসংবাদিত কিম্বদন্তী। কালিদাসের সময় সম্বন্ধে নানা মত ডাঃ ফ্লীট্ কর্তৃক গৌপ্তাব্দের আরম্ভকাল নির্ণয়ের পরই উদ্ভব হইয়াছে। এক্ষণে কালিদাস যে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বে ছিলেন তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি :—

কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক পাঠে পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে শুঙ্গরাজবাটীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এরূপ সুন্দরভাবে ঘটনাবলী বর্ণনা সম্ভব নহে। কালিদাস শুঙ্গরাজগণের পতনের (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক) প্রায় ৪০০ বৎসর পরের লোক হইলে তাহার পক্ষে ওরূপ হুবহু বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ কালিদাস গুপ্তরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ হন ও তাঁহার রাজত্বকাল ৫৮ খ্রীঃ পূঃ হইতে আরম্ভ অর্থাৎ শুঙ্গদের পতনের অল্প পরেই। ইহার সমর্থনে স্কন্দগুপ্তের ভিটারি লিপির প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। শুঙ্গদের পতনের অল্প পরে স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে (সং ১৩৬ = ৭৮ খ্রীঃ অঃ) পুষ্যমিত্রের বংশধরেরা পুনরায় বলশালী হইয়া বিনষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু স্কন্দগুপ্তের নিকট তাঁহারা পরাজিত হন। ইহা ভিটারি লিপিতে স্পষ্ট লেখা

আছে—'সমুদিত-বল-কোপান্ পুষ্যমিত্রাংশ্চ জিত্বা'। ফ্লীটের গৌপ্তাব্দ ঠিক হইলে শুঙ্গদের পতনের প্রায় ৫০০ বৎসর পর (সং ১৩৬=খ্রীঃ) এই ঘটনা স্বীকার করিতে হয় ও ইহা অসম্ভব বলিয়া বুঝা যাইবে। শুঙ্গদের সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অভ্যুত্থান ও গুপ্তদের সময় তাহার চরম পরিণতি পরপরই হইয়াছে। ফ্লীটের গৌপ্তাব্দ ঠিক ধরিলে শুঙ্গদের পতনের প্রায় ৪০০ বৎসর পর হঠাৎ পুনরভ্যুত্থান স্বীকার করিতে হয় ও ইহাও অসম্ভব বলিয়া বুঝা যাইবে।

কালিদাস যথাক্রমে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও কিছুকাল পর্যন্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অনুমান ৭০ গুপ্ত বিক্রমাদিত্য অব্দে কুমারগুপ্তের জন্ম হইলে তিনি কুমারসম্ভব কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি এই কাব্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এই কাব্যের ভাষাপাঠে পণ্ডিতগণ বলেন এই কাব্যের প্রথম হইতে অষ্টম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের লেখা। অবশিষ্ট সর্গগুলি কালিদাসের লেখা নহে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে টীকাকারগণ সকলেই প্রথম হইতে অষ্টম সর্গ পর্যন্তেরই টীকা লিখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবার বিষয়, প্রাপ্তবয়স্ক কুমারগুপ্ত ৯১ গুপ্তবিক্রমাদিত্য সম্বতে পিতৃসিংহাসন লাভ করেন।

কালিদাস বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন ও এই বিক্রমাদিত্য গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—এই অনুমান করিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে গুপ্তরাজগণের নামের ইঙ্গিত আছে কিনা ইহা অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতির নামের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পর কালিদাস ছিলেন ইহা স্বীকার করিলে ফ্লীট্ সাহেবের মতানুযায়ী বুধগুপ্তের পরও কালিদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাই কালিদাসের কাব্যে '...বুবুধে ন বুধোপমঃ' পাইয়াই ইহা বুধগুপ্তের ইঙ্গিত এরূপ ধারণা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। ঈদৃশ অনুমানের সাহায্যে 'সমুদ্রাদূর্মির্মধুমাঁ উদারৎ' 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং' 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' প্রভৃতি মন্ত্রগুলি গুপ্তরাজত্বের পরে রচিত এরূপ অদ্ভুত অনুমান কেহ করিতে পারেন। বস্তুতঃ অন্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত না হইলে এসব অনুমানের কোনও মূল্য নাই। কালিদাস যে সম্রাট্ কুমারগুপ্তের পরে ছিলেন না তাহার প্রমাণ দিতেছি। অধ্যাপক কীলহর্ণ ও বুলার ('Indian Inscriptions and the antiquity of Indian artificial poetry' প্রবন্ধে) উভয়েই পৃথক্‌ভাবে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের ৫২৯ 'মালবগণ' অব্দের মন্দাশোর লিপির রচয়িতা বৎসভট্টি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত, ঋতুসংহার, রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্য হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম কুমারগুপ্তের ভ্রাতা বৈশালীর শাসনকর্তা গোবিন্দগুপ্তের ৫২৪ 'মালবগণ' অব্দের লিপি পাওয়া গিয়াছে। ফ্লীট্ সাহেবের গৌপ্তাব্দের আরম্ভকাল যাঁহারা মানেন তাঁহাদের মতে এই ৫২৯ 'মালবগণ' অব্দ=৪৭২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বের পূর্বে ও প্রবোধ বাবুর নির্ণীত ৫৪১ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্বে যে মহাকবি জীবিত ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়।

হুয়েন্ সাঙের শিষ্য শ্রমণ হুই-লি লিখিত হুয়েন্ সাঙের জীবনীতে নালন্দা বিহারের

স্থাপয়িতা কুমারগুপ্ত ও পরবর্তী অন্যান্য গুপ্তরাজগণের উল্লেখ আছে। এই বিহারের স্থাপন ছই-লির সময়ের (৬৮৭ খ্রী°) প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে ইহাও তিনি হুয়েন্ সাঙের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন তদনুযায়ী লিখিয়াছেন। এই উক্তি হইতেও **গুপ্ত রাজগণ যে খ্রী°পূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে** রাজত্ব করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইবে।

অল্পদিন পূর্বে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূট দেজ্জ মহারাজের সময়ের লিপির তারিখ 'যখন আগুপ্তায়িক রাজাদিগের ৮৪৫ বৎসর গত হইযাছে' ('আগুপ্তায়িকানাম রাজ্ঞাম্ অষ্টসু বর্ষশতেষু পঞ্চচত্বারিংশদ্ অগ্রেষু গতেষু') তখন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ের ৮৪৫ বৎসর পর গ্রহণ করিলে লিপির প্রমাণে ইহা অনেক পূর্ববর্তী (৮৪৫-৩২৫-৫২০ খ্রী°) হইযা পড়ে। ফ্লীটের গোপ্তাব্দ অনুসারে লিপির কাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে (৮৪৫ + ৩২০ = ১১৬৫ খ্রী°) আসিযা পড়ে। লিপির প্রমাণে ইহা অসম্ভব পরবর্তী কাল। গুপ্ত বিক্রমাদিত্য অব্দই বিক্রমাব্দ হইলে এই লিপির কাল (৮৪৫-৫৭, বা) ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পাওযা যায ও এই সময লিপির প্রমাণের সমর্থক। রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের (ধর্মপালের শ্বশুর) ৯২৭ বিক্রমাব্দের (=৮৬১ খ্রী°) লিপি হইতে জানিতে পারি। পরবলের পিতামহের নাম 'জেজ্জ'। অধ্যাপক কীলহর্ণ সাহেব এই জেজ্জের কাল ৭৫৭ হইতে ৮১২ খ্রীস্টাব্দের (=৮১৪ হইতে ৮৬৯ বিক্রমাব্দের) মধ্যে নির্ণয় করেন। এই 'জেজ্জ' ও গোকক লিপির 'দেজ্জ' মহারাজ যে অভিন্ন তাহা উভযের সময ও নাম সাম্যেও বুঝা যাইবে। উত্তর ভারতে 'দশরথ' শব্দটি 'জশরথ' এভাবে উচ্চারিত হয। দ্রাবিড়ী ভাষায় 'দুবরাজ' 'যুবরাজ' একই নামান্তর। বস্তুতঃ 'আগুপ্তায়িকানাম্, রাজ্ঞাম্' শব্দটির প্রকৃত অর্থ আ (আরভ্য), গুপ্ত + অযিক = গুপ্ত + অনুযযিক অর্থাৎ (আরভ্য গুপ্তান্বযিকানাম্ রাজ্ঞাম্) গুপ্তবংশীয় রাজগণের আরম্ভ কাল হইতে ৮৪৫ বৎসর গত হইলে এই লিপিটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই 'আগুপ্তায়িকানাম্ রাজ্ঞাম্ (=আগুপ্তান্বয়িকানাম্ রাজ্ঞাম্)' বাক্যটি ১০৬ (গুপ্ত) সম্বতের উদযগিরি গুহালিপির 'শ্রীসংযুতানাং গুপ্তান্বযানাম্ নৃপসত্তমানাং রাজ্যে' বাক্যের সমতুল্য। উপরোক্ত গোকক লিপির প্রমাণ হইতে গুপ্ত বিক্রমাদিত্য রাজগণের অব্দই যে বিখ্যাত বিক্রমাব্দ তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে সোমদেব 'কথাসরিৎসাগর' লিখেন। এই বৃহৎ কথায় উজ্জয়িনীর মহেন্দ্রাদিত্য ও তৎপুত্র বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত আছে। Allan প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন এই মহেন্দ্রাদিত্য ও বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য ও তদীয় পুত্র স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে গুণাঢ্যের পূর্বে ইঁহাদের রাজত্বকাল। গুণাঢ্যের কাল সকলেই খ্রী° দ্বিতীয় শতক স্বীকার করেন। সুতরাং গুপ্ত রাজগণের কাল যে খ্রী° দ্বিতীয় শতকেরও পূর্বে তাহা বুঝা যায়। কালিদাসের রঘুবংশে অতি প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী পাণ্ড্যরাজধানী উরগপুরের (প্রাচীন ত্রিচিনপল্লীর) উল্লেখ আছে। (পাণ্ড্যদের প্রাগ্‌ঐতিহাসিক রাজধানীর নাম ছিল 'সনালুর')। খ্রী° প্রথম শতকের শেষে কারিকল (চোল কর্তৃক উরগপুর পরিত্যক্ত হয় ও কারিকল) 'কবিরী জন্দীনম্' এর প্রতিষ্ঠা

করিয়া সেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রমাণ হইতেও কালিদাস যে খ্রী° দ্বিতীয় শতকের পূর্বে জীবিত ছিলেন তাহা বুঝা যায়।

কালিদাস বৌদ্ধ আচার্য দিঙ্‌নাগকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্লেষ করিয়াছেন 'দিঙ্‌নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্'—ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। এমতাবস্থায় কালিদাস ও দিঙ্‌নাগ সমসাময়িক। তিব্বতীয় প্রমাণের অনুবাদে দিঙ্‌নাগকে বসুবন্ধুর শিষ্য বলা হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয় এটি ভুল। তিব্বতীয় শব্দটির অনুবাদ **'বসুবন্ধু' না হইয়া 'বসুমিত্র' হইবে**। বসুমিত্র কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন। বসুবন্ধু ১২৯ গুপ্তসম্বতের পরবর্তী হওয়ায় কালিদাসের পক্ষে বসুবন্ধুর শিষ্যের উল্লেখ অসম্ভব। কারণ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে ১২৯ গুপ্তসম্বতের পরও কালিদাসের জীবিত থাকা অসম্ভব। Dr. F. W. Thomas তিব্বতীয় Tanjur সংগ্রহ হইতে 'হস্তাবাল' নামক একখানি গ্রন্থের অনুবাদ আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার কোনও কোনও সময় দিঙনাগ বা আর্যদেব বলিয়া উল্লিখিত থাকায় ডাঃ টমাস মনে করেন আর্যদেব হয়ত গ্রন্থকর্তা ও ইহার টীকাকার দিঙ্‌নাগ (J. R. A. S. 1918, p. 118)। আমার মনে হয় দিঙ্‌নাগই গ্রন্থকর্তা ও আর্যদেব ইহার টীকাকার। সম্ভবতঃ এই 'হস্তবাল' (Hand Treatise) সম্বন্ধেই কালিদাস 'স্থূলহস্তাবলেপান্' বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন—ডাঃ টমাসের এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হইবে। 'হস্তবাল' গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের উল্লেখ আছে। কিন্তু নাগার্জুনের 'শূন্যতা'বাদের উল্লেখ না থাকায় এই গ্রন্থখানি নাগার্জুনের কিছু পূর্বের, সুতরাং ইহা বসুমিত্রের শিষ্য দিঙ্‌নাগের রচিত (নাগার্জুনের পরবর্তী আর্যদেবের নহে), ইহা সমর্থিত হইবে।

অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যেই যে বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার সম্বৎ আরম্ভ কাল ৫৮খ্রীঃ পূঃ—তাহার স্বপক্ষে আরও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে এজন্য এ সম্বন্ধে আর অধিক না লিখিয়া প্রবোধ বাবু কথিত জ্যোতিষিক প্রমাণের সাহায্যে কালিদাসের সময় কি পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

মহাকবি কালিদাসের কাব্যগ্রন্থের জ্যোতিষিক সময়-জ্ঞাপক বাক্যাবলী হইতে তাঁহার কাল নির্ণয় করিতে গিয়া আধুনিক সংস্কৃত রামায়ণের মেঘাগম কালবিষয়ক কয়েকটি শ্লোক প্রবোধ বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলির অনুবাদ দিয়া তিনি মন্তব্য করিতেছেন 'সুতরাং বর্তমান রামায়ণের কবির মতে সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই মেঘাগম হইয়া থাকে। এই সময়েই সায়ন সৌর শ্রাবণ মাস আরম্ভ হইয়া থাকে।' তাঁহার এই মন্তব্যের অর্থ বুঝিলাম না। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইলেই যে মেঘাগম হয় ইহা বর্তমান রামায়ণের কবির মতে নহে পরন্তু সর্বকালের সমস্ত লোকের মতেই ইহা সত্য। 'এই সময় সায়ন সৌর শ্রাবণ আরম্ভ হইয়া থাকে' ইহার অর্থ কি? দক্ষিণায়নের সহিত কিছু পূর্বে সৌর শ্রাবণের সম্বন্ধ ছিল। বর্তমানে সৌর আষাঢ়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। আবার অনেক

পূর্বে সৌরভাদ্র, সৌর আশ্বিন প্রভৃতির সহিত দক্ষিণায়নের সম্বন্ধ ছিল। প্রবোধ বাবুর উপরোক্ত উক্তি ভ্রমপূর্ণ, উহা হইতে রামায়ণের কাল সম্বন্ধে কিছুই নির্ণীত হয় না। পরে তিনি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড হইতে অপর একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় বর্ষাকালের প্রথম মাস শ্রাবণ। তৎপরের অংশের অনুবাদ করিতেছেন 'এক্ষণে বার্ষিক মাস চতুষ্টয়ের প্রবৃত্তি হইল।' অনুবাদটি 'এক্ষণে চারিমাসবিশিষ্ট বর্ষা ঋতুর আরম্ভ হইল'—এরূপ করিলে সাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইত। ইহার সরল অর্থ, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারি মাসে বর্ষাঋতু। পরবর্তী চারিমাসে শীতঋতু ও চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারি মাসে গ্রীষ্মঋতু। প্রবোধ বাবু ভারতীয় ঐতিহাসিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন বৎসরের তিনটী ঋতুবিভাগ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভকালে ও তৎপূর্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার অনুমিত রামায়ণের কাল ৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে এরূপ ঋতুবিভাগ প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনুমিত রামায়ণের কাল যে বিশেষ ভ্রমাত্মক তাহা সহজেই বুঝা যায়। আর রামায়ণের সেই বচনটি হইতে ('পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ') তিনি সৌর শ্রাবণ মাস কোথা হইতে পাইলেন? ইহা যে চান্দ্র শ্রাবণ মাস নহে তাহা বুঝা যায় কি? প্রবোধ বাবু স্বীকার করিবেন তাঁহার নির্ণীত ভারতযুদ্ধ বর্ষকালে (২৪৪৯ খ্রী° পূ°তে) মাঘমাসে উত্তরায়ণ ও শ্রাবণ মাসে দক্ষিণায়ণ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালেও (অনুমান ১৮০০ খ্রী° পূ°) যে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 'মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা', ইহা তাঁহার হয়ত মনে নাই। যাহা হউক, রামায়ণের ঐ উক্তি হইতে রামায়ণ রচনার কাল ৪০০ খ্রী° পূর্বে নহে, তাহার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণই হয় না, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

তারপর 'কালিদাসের গ্রন্থে কালজ্ঞাপক বাক্যাবলী' আলোচনা করিতে গিয়া 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' বা 'প্রশমদিবসে' পাঠ লইয়া প্রবোধ বাবু মল্লিনাথের এক ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মল্লিনাথের যুক্তি ধীরভাবে আলোচনা করিলে 'প্রথম দিবসেই যে ঠিক পাঠ ও মাসটি চান্দ্র তাহা বুঝা যাইবে অর্থাৎ চান্দ্র আষাঢ়ের প্রথম দিবসেই যক্ষের মনে হইল অল্পদিন পরেই নভোমাস প্রত্যাসন্ন বা দক্ষিণায়নারম্ভ অর্থাৎ বর্ষাঋতু আসিতেছে। প্রবোধ বাবুর মনে রাখা উচিত তাঁহার নির্ণীত ভারতযুদ্ধ কালে (২৪৪৯ খ্রী° পূ°তে) ও মাঘ অতএব তপোমাসে উত্তরায়ণ, বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালেও (১৮০০ খ্রী° পূ°) 'মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং-হ্যুদক্'। সুতরাং ঐ ঐ কালেও শ্রাবণ বা নভোমাসে দক্ষিণায়ন। কালিদাসের সময়ও শ্রাবণ ও নভোমাসে দক্ষিণায়ন বলিলে কালিদাসের সময় নিরূপণে কোনও সাহায্যই হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে নভঃ ও তপঃ মাস যথাক্রমে সূর্যের সায়ন দক্ষিণ ও উত্তরায়ণারম্ভ কাল হইতে গণিত। ঐ ঐ মাসগুলির আরম্ভের সহিত সৌর শ্রাবণ বা মাঘ মাসের প্রথম দিবসের কোনও সম্বন্ধ নাই। কাল বিশেষে সম্বন্ধ থাকিতে পারে মাত্র। প্রবোধ বাবু যেরূপ অনুমান করিয়াছেন অর্থাৎ আষাঢ় শুক্লা একাদশীতে দক্ষিণায়নারম্ভ ইহা স্বীকার করিলেও কালিদাসের কাল খ্রী° পূ° প্রথম শতকের কোনও বৎসর হইতে পারে আশা করি প্রবোধ

বাবু তাহা জানেন। যেমন দুইটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কালিদাসের জ্যোতির্বিদাভরণে উক্ত কাল ৩০৬৮ কল্যব্দ=৩৪ খ্রী° পূ°। ইহার পর বৎসর ৩৩ খ্রী° পূ° (=২৫ বিক্রমাব্দ) ২৫এ জুন আষাঢ় শুক্লা একাদশী ও ঐদিন দক্ষিণায়নারম্ভ। অপর, ৩৩ খ্রী° পূ°র ১৯ বৎসর পর অর্থাৎ ১৪ খ্রী° পূ° (=৪৪ বিক্রমাব্দ) শুক্লা একাদশী দিনে দক্ষিণায়নারম্ভ অর্থাৎ চান্দ্রআষাঢ়ের প্রথম দিবসের দশদিন পরই নভোমাস বা দক্ষিণায়নারম্ভ। প্রবোধ বাবু কালিদাসের সমসাময়িক বরাহমিহিরকে ৫৫০ হইতে ৫৬০ খ্রী° মধ্যে স্থাপন করিয়া নিকটবর্তী ৫৪১ খ্রী° অব্দে আষাঢ় শুক্লা একাদশীতে দক্ষিণায়ন পাইয়া উহাই কালিদাসের সময় স্থির করিয়াছেন। তাঁহার এই কাল নির্ণয় যে অসত্য তাহা এই আলোচনায় উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।

'অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং দিগুত্তরা ভাস্বতি সন্নিবৃত্তে।...' এই শ্লোকটিরও অর্থ করিতে গিয়া প্রবোধ বাবু মল্লিনাথের সম্বন্ধে অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ, 'অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ,' এর অর্থ মল্লিনাথ যেরূপ করিয়াছেন অর্থাৎ 'দক্ষিণায়নাৎ'ই প্রকৃত অর্থ। বরাহমিহিরও লিখিয়াছেন 'যাম্যাশাবনিতামুখবিশেষতিলকো মুনিরগস্ত্যঃ,' অর্থাৎ অগস্ত্যতারা দক্ষিণদিক্‌রূপ বনিতার মুখের তিলক স্বরূপ। অগস্ত্য যে দক্ষিণাকাশস্থ উজ্জ্বলতারকা তাহা সকলেই জানেন। মল্লিনাথ এই শ্লোকের টীকার শেষে বলিতেছেন 'অত্র প্রোষিতপ্রিয়াসমাগমসমাধির্গম্যতে।' অর্থাৎ এই শ্লোকে প্রবাসাগত নায়কের সহিত নায়িকার মিলন-জনিত আনন্দ ব্যাপার বুঝাইতেছে। অর্থাৎ এখানে সূর্য হইলেন নায়ক আর উত্তরদিক্ হইলেন নায়িকা। অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে গিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই। তাই নায়িকা উত্তরা দিকের আশঙ্কা ছিল যে তাঁহার নায়ক সূর্য দক্ষিণদিকে গিয়াছেন, তিনি কি আর ফিরিবেন না? নায়িকা উত্তরাদিকের এই নৈরাশ্য দূর হইল, নায়ক সূর্যকে দক্ষিণায়ন হইতে পুনরায় তাঁহার (নায়িকা উত্তরাদিকের) সমীপে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া ও তজ্জন্য নায়িকা উত্তরাদিকের অতিশয় আনন্দে হিমালয়ের হিমস্রাবরূপ আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। ইহাই যে মহাকবির অভিপ্রায় তাহা তাঁহার রচিত কুমারসম্ভবের অপর একটি শ্লোক (৩।২৫) হইতেও বুঝা যাইবে, 'কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌগন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য। দিগ্‌দক্ষিণাগন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিঃশ্বাসমিবোৎসসর্জ॥' এখানে নায়িকা দক্ষিণাদিক্, নায়ক সূর্যকে উত্তর দিকে যাইতে দেখিয়া (অর্থাৎ দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে ফিরিতে দেখিয়া বিরহে দক্ষিণ মলয়পর্বতস্থ সর্পমুখনিঃসৃত বায়ুরূপ বিরহীদের তাপকারী বসন্তের দক্ষিণানিল ত্যাগ করিতে লাগিল। সুতরাং 'অগস্ত্যচিহ্নাৎ—' এই শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ (দক্ষিণায়ন হইতে) সূর্য উত্তরাদিকের সমীপে প্রত্যাগত হইল উত্তরাদিক্ আনন্দশীতল হিমালয়ের হিমস্রাবরূপ আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। অপর, 'সন্নিবৃত্তে' অর্থাৎ 'প্রত্যাগতে', ইহা হইতেও বুঝা যায় দক্ষিণায়ন হইতে প্রত্যাগত হইলে। সুতরাং মল্লিনাথ কৃত ব্যাখ্যাই যে মহাকবির অভিপ্রেত প্রকৃত ব্যাখ্যা তাহা সুধীগণ সকলেই স্বীকার করিবেন। 'অগস্ত্যচিহ্নাদয়নাৎ সমীপং'

'অগস্ত্যচিহ্ন অয়নবিন্দুর নিকটবর্তী স্থানে', প্রবোধ বাবুর এই অর্থ বাস্তবিকই অসঙ্গত। এরূপ অর্থ স্বীকার করিলেও সূর্য উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর নিকটে আসিলে ত হিমস্রাবের সৃষ্টি হয় না। সকলেই জানেন বসন্ত বিষুবদিনের কিছু পরেই হিমালয়ের বরফ গলিতে থাকে। প্রবোধ বাবু এই সত্যটুকু তাঁহার 'মহাকবি কালিদাসের সময়' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৪১, ৭২ পৃ°) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন 'কবির অভিপ্রায় এই যে গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হইবামাত্র হিমালয়ের তুষার গলিতে আরম্ভ হইল ও শীতল জল নদী দিয়া বহিতে লাগিল।' গ্রীষ্মকাল যখন আরম্ভ হয় তখন সূর্য উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর ৬০° অংশ পশ্চাতে থাকে, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক অর্থ স্বীকার করিলে 'অগস্ত্যচিহ্ন অয়ন বা উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর নিকটে সূর্য আসিলে হিমালয়ের বরফ গলিতে থাকে', তাঁহার কল্পিত বর্তমান প্রবন্ধোক্ত এই অর্থ মোটেই খাটে না। কেননা, উত্তরায়ণান্ত বিন্দুর নিকটে সূর্য আসিবার অন্ততঃ দুইমাস পূর্ব হইতেই বরফ গলিতে আরম্ভ করে, ইহাই সত্য। সুতরাং মল্লিনাথ-কৃত ব্যাখ্যাই যে ঠিক্ ও তাঁহার সম্বন্ধে 'যিনি জ্যোতিষ ভিন্ন অন্য শাস্ত্রে পটিষ্ঠ'…প্রবোধ বাবুর এইসব মন্তব্য যে কতদূর অসঙ্গত, তাহা সুধীপাঠক মাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

'কালিদাস ও বরাহমিহির' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উভয়েই যে সমসাময়িক এই সত্যটুকু প্রবোধবাবু স্বীকার করিয়াছেন। ইহা কালিদাসের সময় নিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট ও এই সময় কি পাওয়া যায় তাহা পরে দেখাইতেছি। এখানে বৃদ্ধ আর্যভট্টের কাল সম্বন্ধে আমার মতকে অপব্যাখ্যা বলিয়া প্রবোধবাবু উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বরাহমিহির স্বকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় কয়েকটি তারার সংস্থান দিয়াছেন। ম, ম, সুধাকর দ্বিবেদী ও Thibaut সাহেব, ও পরবর্তী সকলেই নির্বিচারে এগুলিকে সমবিভাগীয় নক্ষত্রের আদি হইতে গণিত মনে করিয়াছেন। ফলে সমবিভাগীয় সূর্য সিদ্ধান্তোক্তি সংস্থান হইতে সর্বোচ্চ প্রায় ৯° অংশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পুষ্যা তারার সংস্থান সূর্য সিদ্ধান্ত মতে ধ্রুবক ১০৬° ও বিক্ষেপ ০°। এটি যে δ Cancri তারা তাহা সহজেই বুঝা যায়। বরাহমিহির পুষ্যা তারার সংস্থান দিয়াছেন ধ্রুবক স্বক্ষেত্রে ৪° অংশ ও উত্তর বিক্ষেপ ৩° ১০´। এই তারাটি γ Cancri অথবা ε Cancri (Praesepe group-এর) তাহা বুঝা যায়। γ ও ε cancri তারাদ্বয়ের ধ্রুবকের পার্থক্য মাত্র ০°.৩ অংশ অর্থাৎ নাই বলিলেই হয়। δ Cancri তারার ধ্রুবক উপরোক্ত দুইটি তারা হইতে প্রায় ১° অংশ অধিক। অপর সম ও অসম (গর্গমতে) বিভাগীয় পুষ্যা-নক্ষত্রের আদিস্থান ৯৩°.৩ (ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত মতে অসম বিভাগীয় আদি স্থান ৯২°.৩ অংশ) অংশ। অথচ বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত মতে পুষ্যা (δ Cancri) তারার স্বক্ষেত্রে স্থান ১২° ৪০´ (অর্থাৎ ধ্রুবক ১০৬° অয়নাংশ) ও বরাহমিহির মতে পুষ্যা (γ অথবা ε canceri) তারার স্বক্ষেত্রে স্থান ৪° অংশ (অর্থাৎ ধ্রুবক ৯৭°.৩ অংশ)। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এই দুই মতের আদি বিন্দু ও শূণ্য অয়নাংশকাল এক নহে। বস্তুতঃ অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইবে বরাহমিহির প্রদত্ত তারাসমূহের সংস্থান অসম

বিভাগীয় (ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বা গর্গ মতের) নক্ষত্রের আদি স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। একটি মাত্র প্রমাণ এখানে দিতেছি। বরাহমিহির প্রদত্ত পুনর্বসু (Pollux) তারার ধ্রুবক সম বিভাগীয় নক্ষত্রে প্রদত্ত স্বীকার করিলে উহা ৮৮° অংশ হয়। এদিকে তৎপ্রদত্ত পুষ্যা তারার (γ অথবা ε cancri) ধ্রুবক, সম বা অসম উভয় বিভাগেই ৯৭°.৩ অংশ হয়। অর্থাৎ পুষ্যা ও পুনর্বসুর ধ্রুবকের অন্তর প্রায় ৯° অংশ হয়। কিন্তু জ্যোতিষীগণ জানেন এই দুইটি তারার ধ্রুবকের অন্তর কখনও ১৪°.৫ অংশের কম হয় না। বরাহমিহির প্রদত্ত এই তারা দুইটির ও অপর তারাগুলির সংস্থান যে অসমবিভাগীয় নক্ষত্রের আদি হইতে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত সারণী হইতে সুন্দর বুঝা যায়। অসম বিভাগীয় গর্গমতানুযায়ী সংস্থানের সহিতই ৪২৭ শাক্যা-ব্দের = ১১৯ খ্রী° পূ°র সংস্থানের সুন্দর মিল পাওয়া যায়। বিভিন্ন গণনাফল মিলাইবার জন্য সংস্থানগুলি সারণ্যাকারে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুনর্বসুর তারা দুইটি কালিদাসের কেন প্রিয় ছিল ইহার কারণ প্রবোধবাবু বলিতেছেন যে, এই দুই তারার সান্নিধ্যে উত্তরায়ণান্ত রেখা ছিল। বরাহমিহির, অতএব কালিদাসের সময় পুষ্যা তারার প্রায় ৭° অংশ পশ্চাতে অতএব পুনর্বসু তারার প্রায় ৭° অংশ পূর্বে উত্তরায়ণান্ত রেখা ছিল তাহা নিম্নে প্রদত্ত সারণী হইতে সুন্দর বুঝা যাইবে। সুতরাং প্রবোধবাবুর সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। বস্তুতঃ এই দুইটি তারা কেবল কালিদাসেরই নহে পরন্তু বহুলোকেরই বহুকাল হইতে প্রিয় তাহা উহাদের Castor ও Pollux নাম হইতে বুঝা যায। আবার প্রবোধবাবুর মতে ৫৪১ খ্রী° কালিদাসের সময় হইলে সেকালে দক্ষিণায়নারম্ভের এক সপ্তাহ পূর্বে Pollux তারা পশ্চিমগগনে অদৃশ্য (অস্ত) যাইতেন ও দক্ষিণায়নারম্ভের দুই সপ্তাহ পর পর্যন্ত অদৃশ্য থাকিয়া পূর্ব গগনে সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হন। সুতরাং দক্ষিণায়নের আরম্ভের সময় তারা দুইটি অদৃশ্য থাকায় প্রবোধবাবুর অনুমান অসঙ্গত। বরাহ লিখিয়াছেন "সাম্প্রতময়নং পুনর্বসুতঃ"

পঃ সিঃ ৩য় অঃ, ২১ শ্লোক— সম্পাদক

প্রথম বরাহমিহির-কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার করণাব্দ ৪২৭ শক = ৪২৭ শাক্যকাল = (৫৪৬-৪২৭, বা) ১১৯ খ্রীঃ পূঃ। ইহা হয়ত বরাহমিহিরের জন্মকাল বা তাঁহার সময়ের অল্প পূর্ববর্তী কাল যাহা তিনি করণাব্দ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা যে সত্য তাহা বরাহমিহিরের উক্তি হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি ৪২৭-শক রোমকসিদ্ধান্তের করণাব্দ উল্লেখ করিয়া অহর্গণানয়নের নিয়ম দিয়াছেন ও পূর্বে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন পূর্বাচার্য্যদের মত অবিকল উদ্ধার করিবেন। রোমক সিদ্ধান্তের বর্ষমান অবিকল প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী হিপার্কাসের বর্ষমান। এই হিপার্কাসের গ্রন্থ রচনাকাল অনুমান ১৬০ হইতে ১২০ খ্রী° পূ°। উপরোক্ত বর্ষমান টলেমী (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী) গ্রহণ করেন। কিন্তু রোমক সিদ্ধান্তের সূর্য মন্দ ফল প্রভৃতি টলেমী-প্রদত্ত ফলের সহিত এক নহে। ইহা হইতে বুঝা যায় রোমকসিদ্ধান্তের কাল টলেমীরও (খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী) পূর্বে। অপর প্রশ্ন এই, এই রোমকসিদ্ধান্তের 'মীনান্ত' বা 'কর্কটাদি' কোথায় হইবে?

সকলেই জানেন গ্রীক্ জ্যোতিষীদের মীনান্ত বা মেষাদি (first point of Aries) হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অয়ন চলন ২৮° অংশ হইয়াছে অর্থাৎ এই মেষাদি রেবতী (Piscium). তারার ৯° অংশ পূর্বে। ৪২৭ শক = ৫০৫ খ্রীস্টাব্দ লইলে এই সময়ের মেষাদি গ্রীক জ্যোতিষের মেষাদির ৯° অংশ পশ্চাতে হয়। গ্রীক জ্যোতিষের মেষাদি যে অশ্বিনীর যোগ তারার (β Arietis এর) কিছু পশ্চিমে ও রেবতী তারার ৫।৬ অংশ পূর্বে তাহা Thibaut Whitney প্রভৃতিও স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রথম বরাহমিহির যে স্থানকে মেষাদি ধরিয়াছেন রোমকসিদ্ধান্তমতেও সেই স্থানই মেষাদি। নতুবা মেষাদিতে পূর্বোক্ত ৯° অংশ পার্থক্যের বিষয় বরাহমিহির নিশ্চয় উল্লেখ করিতেন ও গ্রহাদির সংস্থানও দুই সিদ্ধান্ত-মতে এক হইত না। অপর, ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন রোমকসিদ্ধান্তকার আর্যভট হইতে মন্দোচ্চ, জাত, গ্রহমধ্য প্রভৃতি গণনা করিযাছেন। অথচ ৫০৫ খ্রী° বরাহমিহিরের সময় হইলে উহা প্রবোধ বাবু প্রভৃতির মতে আর্যভটেরও সময়। সুতবাং বোমকসিদ্ধান্ত ৫০৫ খ্রীস্টাব্দেরও পরবর্তী হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ রোমকসিদ্ধান্তেব কবণাব্দ ১১২খ্রী° পূঃ (= ৪২৭ শাক্যকাল) ও পূর্বে দেখান হইয়াছে বৃদ্ধার্যভটের কাল ১৬৪ খ্রীঃ পূঃ। সুতবাং আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত যেরূপ বলিয়াছেন, রোমকসিদ্ধান্তকাবেরও পূর্ববর্তী।

বরাহমিহির স্বকৃত 'কুতূহলমঞ্জরী' নামক করণগ্রন্থে যুধিষ্ঠিরাব্দের ৩০৪২ বর্ষগতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন, এরূপ লিখিয়াছেন। এই ৩০৪২ যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কল্যব্দ = ৬০খ্রীঃ পূঃ, বিক্রমাব্দের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে। পরলোকগত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত তাঁহার ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রন্থে (২১২-১৩পৃঃ) এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বরাহ-মিহিরের কাল প্রচলিত শককাল ৪২৭ = ৫০৫ খ্রীঃ বুঝিয়া 'কুতূহলমঞ্জরীর' উক্তির সত্যতা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ পববর্তী জ্যোতিষীগণ '৪২৭ শক' বর্তমান প্রচলিত শককাল বুঝিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহাবস্থানগুলি সংশোধন কবিয়া সদুদ্দেশ্যেই তৎকালোচিত করিয়া-ছেন। এই গ্রন্থকার যে প্রকৃতই যুববাজ সমুদ্রগুপ্তেব সমসাময়িক ছিলেন তাহা এই গ্রন্থের ১৭ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোক ও ২২ অধ্যায়ের শেষ অংশ বিশেষতঃ ১১, ১৩, ১৫ ও ১৭ শ্লোক সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির সহিত একত্রে মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যাইবে। 'কালকাচার্য্যকথানক' ও 'জ্যোতির্বিদাভরণ' উভয় গ্রন্থেই লিখিত আছে বিক্রমাদিত্য ৯৫ জন প্রধানকে পরাজিত করিয়া নিজ অব্দ প্রচলিত করেন। "শ্রীমদ্‌বিক্রমাদিত্য ভূভুজা প্রতিদিনং মুক্তামণিস্বর্ণ গোসপ্তীভাস্ব-পবর্জনেন বিহিতো ধর্মঃ সুবর্ণাননঃ ॥' ও 'যেনাপ্যুগ্রমহীধরাগ্রবিষয়ে দুর্গাণ্যসহ্যান্যহো নীত্বা যানি নতীকৃতান্তদধিপে। দত্তানি তেষাং পুনঃ।' ও 'যো রুমদেশাধিপতিং শকেশ্বরং গৃহীত্বোজ্জয়িনীং মহাহবে। আনীয় সংভ্রাম্য মুমোচয়ত্যহো স বিক্রমার্কঃ সমসহ্যবিক্রমঃ।' এই সব শ্লোকগুলিও যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। এই রুমদেশাধিপতি খুব সম্ভবতঃ হিম কদফিস বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী কনিষ্ক, যাঁহারা নিশ্চয়ই রোমের অধীন ছিল। বস্তুতঃ বরাহমিহিরের প্রকৃত কাল যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী তাহার আর একটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছি।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় অগস্ত্য তারার উদয় সম্বন্ধে লিখিত আছে 'তচ্চোজ্জয়ন্যাং অগতস্ত কন্যাং ভাগৈঃ স্বরাখ্যৈঃ স্ফুটভাস্করস্ত' অর্থাৎ সূর্যের স্ফুট যখন কন্যা রাশির সাত ('স্বর') অংশ কম অর্থাৎ সিংহ রাশির ২৩° অংশ হইবে তখন অগস্ত্য (Conopus) তারা পূর্ব ক্ষিতিজ উজ্জয়িনী হইতে প্রথম দৃশ্য হইবে। প্রবোধ বাবু পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সাহায্যে গণনা করিয়া দেখিবেন ৫০৫ খ্রীস্টাব্দে সূর্যের স্ফুট ১৩৬° অর্থাৎ সিংহের ১৬° অংশ হইলে ২৪° উত্তর অক্ষাংশ দেশ হইতে অগস্ত্যের উদয় দেখা যাইত। সিংহরাশির ২৩° অর্থাৎ ১৪৩° অংশ কোনক্রমেই হয় না। এমন কি বর্তমান ১৯০০ খ্রীস্টাব্দেও সিংহ রাশির চারি বা ১২৪° অংশে (রেবতী তারা আদি বিন্দু ধরিলে) অথবা ১২১° অংশে (চিত্রাপক্ষীয় আদি বিন্দু হইতে) সূর্য থাকিলে অগস্ত্য তারার উদয় হয়। দেখা যাইতেছে সূর্যের স্ফুট ক্রমশঃই কমিতেছে। এ অবস্থায় সিংহ রাশির ২৩° অংশ বা ১৪৩° অংশ সূর্যের স্ফুট হইলে অগস্ত্য উদিত হন, ইহার তাৎপর্য কি ? বস্তুতঃ প্রবোধ বাবু দেখিবেন খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সূর্যের সায়ন স্ফুট ১৩৪° অংশ হইলে উজ্জয়িনী প্রভৃতি ২৪° উত্তর অক্ষাংশ দেশে অগস্ত্যের উদয় হইত। এই অবস্থান পূর্বোক্ত প্রাচীন অশ্বিনীর আদি হইতেই গণিত। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ৪২১ শাক্যকাল বর্তমান প্রচলিত ৪২৭ শককালে পরিবর্তিত হইল অর্থাৎ অশ্বিনীর আদি ৯° অংশ পশ্চাতে সরাইয়া ৪২৭ শক = ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের সায়ন বিষুববিন্দুতে Piscium বা রেবতী তারায় স্থির করা হইল তখন প্রবোধ বাবুর ভাষায় কোনও 'জগদ্‌বঞ্চক' রৈবতপক্ষীয় আদি বিন্দু হইতে (১৩৪° + ৯° বা) ১৪৩° অংশ সূর্যের স্ফুট হইলে অগস্ত্য উদিত হন, ইহা লিখিলেন। বস্তুতঃ যিনি এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন তিনি নূতন আদি বিন্দু হইতে খ্রীস্ট পূর্ব প্রথম শতকের অবস্থান জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই একটী প্রমাণ হইতেই কি বরাহমিহিরের সময় যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় না ?

অগস্ত্য (conopus) তারার স্থান উল্লেখ করিতে গিয়া প্রবোধ বাবু অনেকগুলি ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন। ১৩৪১ সালের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়ও এই ভ্রান্ত উক্তিগুলি তিনি করিয়াছিলেন। আজ আট বৎসরেও তাঁহার সেই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদিত হয় নাই ইহা দুঃখের বিষয়। ব্রহ্মগুপ্ত [৬২৮ খ্রী°) অগস্ত্যের 'ধ্রুবক ৮৭° লিখিয়াছেন। ৬২৮খ্রীঃ অব্দে অগস্ত্য (conopus) ধ্রুবক ৮৮°.৬। ব্রহ্মগুপ্তের আদি বিন্দু ৪২১ শক বা ৪৯৯ খ্রীঃ অব্দের সায়ন বিষুব স্থান। সুতরাং (৬২৮-৪৯৯, বা) ১২৯ বৎসরে ১°.৮ অংশ অয়ন চলন হয়। সুতরাং ব্রহ্মগুপ্তের সময় অগস্ত্যের ধ্রুবক (৮৮°.৬-১.°৮, বা) ৮৬.°৮। তিনি ইহা ৮৭° অংশ বলায় কিছুই ভুল করেন নাই। আবার কালিদাস বা বরাহমিহির কেহই নিজ নিজ গ্রন্থে অগস্ত্য তারার কোনও সংস্থান দেন নাই। ১১৯ খ্রীঃ পূঃ তে অগস্ত্য তারার সায়ন ধ্রুবক ৮৪°. ৯, ০ খ্রীষ্টাব্দের সায়ন ধ্রুবক ৮৫°.৫ ও ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের সায়ন ধ্রুবক ৮৭°.৯ (চিত্রাপক্ষীয় বা ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের সায়ন বিষুব বিন্দুকে আদি বিন্দু গ্রহণ করিলে উপরোক্ত সংস্থানগুলি যথাক্রমে ৯১°, ৯০° ও ৮৫,°৫) পাওয়া যায়। সুতরাং বরাহ ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্তী, অতএব বরাহের

অগস্ত্য ধ্রুবক ব্রহ্মগুপ্তের অগস্ত্য ধ্রুবক হইতে কম হওয়া উচিত ছিল' ('মহাকবি কালিদাসের সময়'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪১, ৭৩ পৃঃ) প্রবোধ বাবুর এই ধারণা যে ভ্রান্ত, আশা করি তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। প্রবোধ বাবু লিখিতেছেন 'বরাহমিহির তাঁহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকায় ১৪ অধ্যায় শ্লোক অগস্ত্যের (conopus) স্থান কর্কটাংশ বলিয়া সূচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বরাহমিহির এরূপ কোনও উক্তিই করেন নাই। অগস্ত্যের উদয় সম্বন্ধে যে শ্লোকটি পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেখানে ববাহমিহির বলিতেছেন 'তাভিঃ কর্কটকাদ্যাদ্ যল্লগ্নং তাদৃশে সহস্রাংশৌ…'অর্থাৎ যত বিনাড়ী পাওয়া গেল তাহা কর্কটের আদি হইতে লইয়া ক্রান্তিবৃত্তের যত অংশ পাওয়া যায় সেই স্থানে সূর্য আসিলে অগস্ত্যের প্রথম উদয় হয়।

উপরে যে সব প্রমাণ সংক্ষেপে উক্ত হইল উহা হইতে সুধী সত্যান্বেষী পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন মহাকবি কালিদাস, ববাহ মিহির ও সমসাময়িক গুপ্ত বিক্রমাদিত্য বাজগণ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতেই বর্তমান ছিলেন।*

---

*লেখককৃত বিস্তৃত প্রবন্ধের কতকাংশ মাত্র যাহাতে প্রবোধবাবুর মতকে খণ্ডন করিতে প্রয়াস আছে এবং যে যে স্থানে কয়েকটী নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইতেছে মাত্র তাহা প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

স্বর্গের ধারণা

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

নানা দেশের পৌরাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা স্বর্গের যে সমস্ত বর্ণনা পাই তাহার পশ্চাতে সেই যুগের মানবগণ যেভাবে সমগ্র জগৎকে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই বর্ণিত হয়। এই কারণে পুরাণসমূহ যথার্থরূপ বুঝিতে হইলে সেই সময়ের মানবগণ কি ভাবে জগৎকে দেখিতেন তাহা আমাদের জানা দরকার।

প্রাচীন যুগের মানবগণ সমগ্র জগৎকে প্রধান চারিটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম ভাগে—দেবতাগণ বাস করিতেন। দ্বিতীয় ভাগ মানবের আবাসভূমি। তৃতীয় ভাগে মৃত ব্যক্তিগণের আত্মাগণ বাস করিতেন ও চতুর্থ ভাগে দৈত্যগণ বিচরণ করিত।

এক্ষণে এই চারিটী স্থান নির্ণয় করিতে হইলে পৃথিবীকে একটী গোলক অনুমান করিয়া ইহা নক্ষত্রখচিত আকাশের মধ্যবর্তী হইয়া উহার সমান্তরালে অবস্থিতি করিতেছে এরূপ ধারণা করা আবশ্যক। এইরূপ অনুমান করিলে Polestar বা ধ্রুব নক্ষত্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এবং ইহার নিকটস্থ প্রদেশে দেবতাগণ বাস করেন। এইরূপে পূর্ব অনুমান অনুসারে পৃথিবীর উপরিভাগ বা উত্তরদিক্ মনুষ্যগণের আবাসস্থল এবং ইহার নিম্নদিক্ বা দক্ষিণ দিক্ পাতাল প্রদেশ এক্ষণে অশরীরিগণ বাস করেন এবং সর্বাপেক্ষা নিম্নতম প্রদেশই নরক।

হোমারও তাঁহার গ্রন্থে এইভাবে জগৎকে কল্পনা করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র দেবতাদের আবাসভূমি Lofty Olympos, পৃথিবীর মধ্যস্থল বেষ্টন করিয়া সমুদ্র—ইহা 'The Ocean Stream অশরীরিগণের আবাসস্থল Hades ও দৈত্যদিগের আবাসস্থল Gloomy Tartaros।

পুরাণকারগণের ন্যায় যদি অনুমান করা হয় যে স্বর্গ হইতে আলোকরশ্মি বহির্গত হইয়া পৃথিবীর উপরিভাগ উদ্ভাসিত করিয়াছে ও এইজন্য পৃথিবীর নিম্নভাগ চির অন্ধকারময় হইয়া দৈত্য ও রাজ্যচ্যুত দেবতাদের কারাগৃহে পরিণত হইয়াছে; সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতির্ময় নক্ষত্রসমূহ পৃথিবীর উপরিভাগ প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহা হইলে হোমার-কল্পিত সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে যাহা কিছু অসামঞ্জস্য বা গোলযোগ দেখা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হয়।

উপরোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বানুসারে স্বর্গের উত্তরতম প্রদেশকে যদি A বলা হয়। এবং উহার দক্ষিণতম প্রদেশকে যদি B বলা হয়, তবে A B রেখার চতুর্দিকে সমগ্র আকাশ প্রদক্ষিণ করিতেছে। কল্পনা করা হয় A B axisটী একটী প্রকাণ্ড স্তম্ভ এবং ইহা সমগ্র আকাশকে ধরিয়া আছে। Euripides এবং Aristotle ইহাকে pillar of Atlas বলিয়া গিয়াছেন।

পুনরায় উপরোক্ত মতানুসারে উত্তর মেরুই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চস্থান এবং এই কারণে পৃথিবীর সমগ্র উপরিভাগকে সমুদ্র হইতে উত্থিত একটী বিশাল পর্বত বলিয়া কল্পনা করা খুব স্বাভাবিক।

আরও পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশের উপরিভাগে দেবতাদের আবাসভূমি বিবেচিত হওয়ায় এই বিশাল পর্বতকে এত উচ্চ কল্পনা করা হইয়াছিল যে যেন ঠিক ইহারই শৃঙ্গে দেবতাগণ বাস করিতেন।

উপরোক্ত কল্পনা প্রায় সমগ্র প্রাচীন জাতির সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে। **প্রাচীন মিশর**—প্রাচীন মিশর জাতির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও পবিত্র অংশ উত্তর দিকেই অবস্থিত। সেই প্রদেশ উচ্চতায় স্বর্গের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ পৃথিবীর দক্ষিণ দিকেও আর একটী পর্বত আছে—তাহাতে দৈত্যগণ বাস করে।

প্রাচীন একাডিয়ান (The Akkadians) জাতির মধ্যে উক্ত কল্পনা দৃষ্ট হয়। Kharsak Kurra নামে একটী সর্বোচ্চ পর্বত আছে—সমগ্র স্বর্গ ইহারই উপর স্থাপিত ও ইহারই চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই পর্বত স্বর্ণ, রৌপ্য হীরকাদি পূর্ণ বলিয়া ইহা হইতেই তীব্র জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। প্রাচীন এসিরিয়ান ও ব্যাবিলোনিয়ান জাতিদ্বয়েরও কল্পনা অনুরূপ।

প্রাচীন চীন জাতিও Kwen lum. নামক পূর্বোক্ত প্রকারের একটী পর্বত কল্পনা করিয়াছিল। এই পর্বতটীকে 'pearl mountain' বলা হইত। উহারই উপরিভাগে স্বর্গ এবং ইহার নিকটস্থ বা নিম্নস্থ নক্ষত্রসমূহে নিকৃষ্ট দেবতা বা অপদেবতা বাস করে।

প্রাচীন মিশর ও একাডিয়ান জাতিদ্বয় যেমন দুইটী পর্বত কল্পনা করিয়াছিলেন একটী উত্তর মেরুতে ও অপরটী দক্ষিণ মেরুতে—একটী স্বর্গ ও অপরটী নরক, প্রাচীন ভারতেও ঠিক অনুরূপ কল্পনা প্রচলিত ছিল। একটী সুমেরু (স্বর্গ) ও অপরটী কুমেরু (নরক)। বৌদ্ধগণও ভারতের প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছেন ও ইহার প্রধান অংশগুলির উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাহাদের মতে কেবলমাত্র আমাদের পৃথিবী নয়, প্রত্যেক পৃথিবীরই একটী সুমেরু আছে ও ইহাই সকলের কেন্দ্রস্থল।

প্রাচীন ইরানিয়ান জাতির মধ্যেও উপরোক্ত কল্পনা দৃষ্ট হয়। তাহাদের মতে এই পর্বতের নাম Hera-bere Gaiti এখানে ভূত প্রেতাদি বাস করে। ইহার চতুর্দিকে সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদি প্রদক্ষিণ করে এবং ইহার উপরিভাগ হইতে স্বর্গে যাইবার পথ আছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন জাতি সমূহ প্রায় একভাবেই জগৎকে কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেই একটী বিশাল পর্বতের কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার উপরে দেবতাগণ বাস করেন ও গ্রহ তারকাদি ইহাকে প্রদক্ষিণ করে।

(২)

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকাল

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র লাহিড়ী

ভক্তিবাদের অবতার বর্তমান বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-দিবস সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ নাই। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে পূর্ণিমা তিথিতে সিংহরাশি ও সিংহলগ্নে নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শচীদেবীর দশম ও শেষ সন্তান। কথিত আছে তিনি ত্রয়োদশ মাস গর্ভে থাকিয়া ঠিক চন্দ্রগ্রহণের সময় ভূমিষ্ঠ হয়েন। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলায় এইরূপ উক্তি আছে :—

"লীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া। এইমাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দ শত সাত শকে মাস ফাল্গুণ। পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ॥
সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ। ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥
জগত ভরিয়া লোক বলে হরি হরি। সেইক্ষণে গৌরচন্দ্র ভূমি অবতরি॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন। হরি বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকাল **১৪৮৬ খ্রী অব্দ ১৮ই ফেব্রুয়ারী** (O. S.) **শনিবার**। কাহারও কাহারও ধারণা এই যে তাঁহার শুক্রবারে জন্ম হয়। কিন্তু তাহা নহে। গ্রেগরীর সংস্কারযুক্ত বর্ষপঞ্জী অনুসারে, অর্থাৎ বর্তমানে যেরূপ বর্ষ গণনা চলিতেছে তদনুসারে জন্মতারিখ ২৭শে ফেব্রুয়ারী (N. S.) শনিবার। তদ্দিনে জুলিয়ান দিন সংখ্যা ২২৬৩৮৬৮। জন্মদিবসে বাংলা তারিখ **২৩শে ফাল্গুন ১৪০৭ শক অথবা ৮৯২ বঙ্গাব্দ**। বর্তমানে যেভাবে নির্দিষ্টীকৃত তারিখ গণনা হইতেছে তদনুসারে জন্মতারিখ ২২শে ফাল্গুন।

চৈতন্যদেবের জন্মরাত্রিতে একটি পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল ও এই দিবস সারাদিন পূর্ণিমা তিথি ছিল। পূর্ণিমা তিথির অন্ত হইয়াছিল রাত্রি ঘঃ ১০।৪০ মিনিটের সন্নিহিত কালে (স্থানীয় সময়)। চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল রাত্রি ৮।৫৬ মিনিট সময়ে, নিমীলন কাল ঘঃ ১০।১০ মিঃ, উন্মীলন কাল ঘঃ ১১।১০ মিঃ এবং গ্রহণ সমাপ্তি ঘটিয়াছিল রাত্রি ঘঃ ১২।২৪ মিনিট সময়ে।

চৈতন্যদেবের জন্মতারিখে সূর্য্যাস্ত কাল ঘঃ ৫।৫৮ মিঃ এবং গ্রহণারম্ভকাল রা ঘঃ ৮।৫৬ মিঃ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঘঃ ৫।৫৮ হইতে ঘঃ ৮।৫৬ মিনিটের মধ্যে চৈতন্যদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যদি ধরা যায় যে তাঁহার জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণারম্ভ হইয়াছিল, তবে জন্মকাল ৮।৫৬এর সন্নিহিত বলিয়া ধরিয়া হয়। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাঁহার জন্ম লগ্ন সিংহ

বলিয়া উল্লেখ আছে। গণনা দ্বারা দেখা যায় যে সে দিবসে ঘঃ ৬।৩০ মিঃ পর্যন্ত সিংহলগ্ন ছিল। যদি সিংহ লগ্নে তাঁহার জন্ম ধরিয়া লওয়া যায় তবে জন্মকালের আড়াই ঘণ্টা পরে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। আবার যদি ঠিক গ্রহণারম্ভকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ধরা যায় তবে জন্মলগ্ন সিংহ না হইয়া তুলা হইয়া যায়। অতএব জন্মলগ্ন লইয়া কিছুটা অনিশ্চয়তা আসিয়া পড়িতেছে। যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক বিতর্কে প্রবেশ না করিয়া যেরূপ উল্লেখ আছে সেইভাবে সিংহলগ্ন ধরিয়া সন্ধ্যা ঘঃ ৬।৩০ মিনিটের কিছু পূর্বে জন্মকাল নির্দেশ করাই বোধ হয় সঙ্গত। এই জন্মসময় লইয়া চৈতন্যদেবের জন্মপত্রিকা* নিম্নে দেওয়া হইল :—

০ ০	শু ৪।৪১	বু ১০।৩২ রা ২৬।৪৪ র ২২।২৬
০		ম ১১।৩০
চ ২০।১৩ কে ২৬ ৪৪ নং ২৯।০ ০	০	হাঃ ১ ।৫৪ বৃ ২০।৬ শ ২৪।১৬ বঃ নেঃ ২৯।৩৮
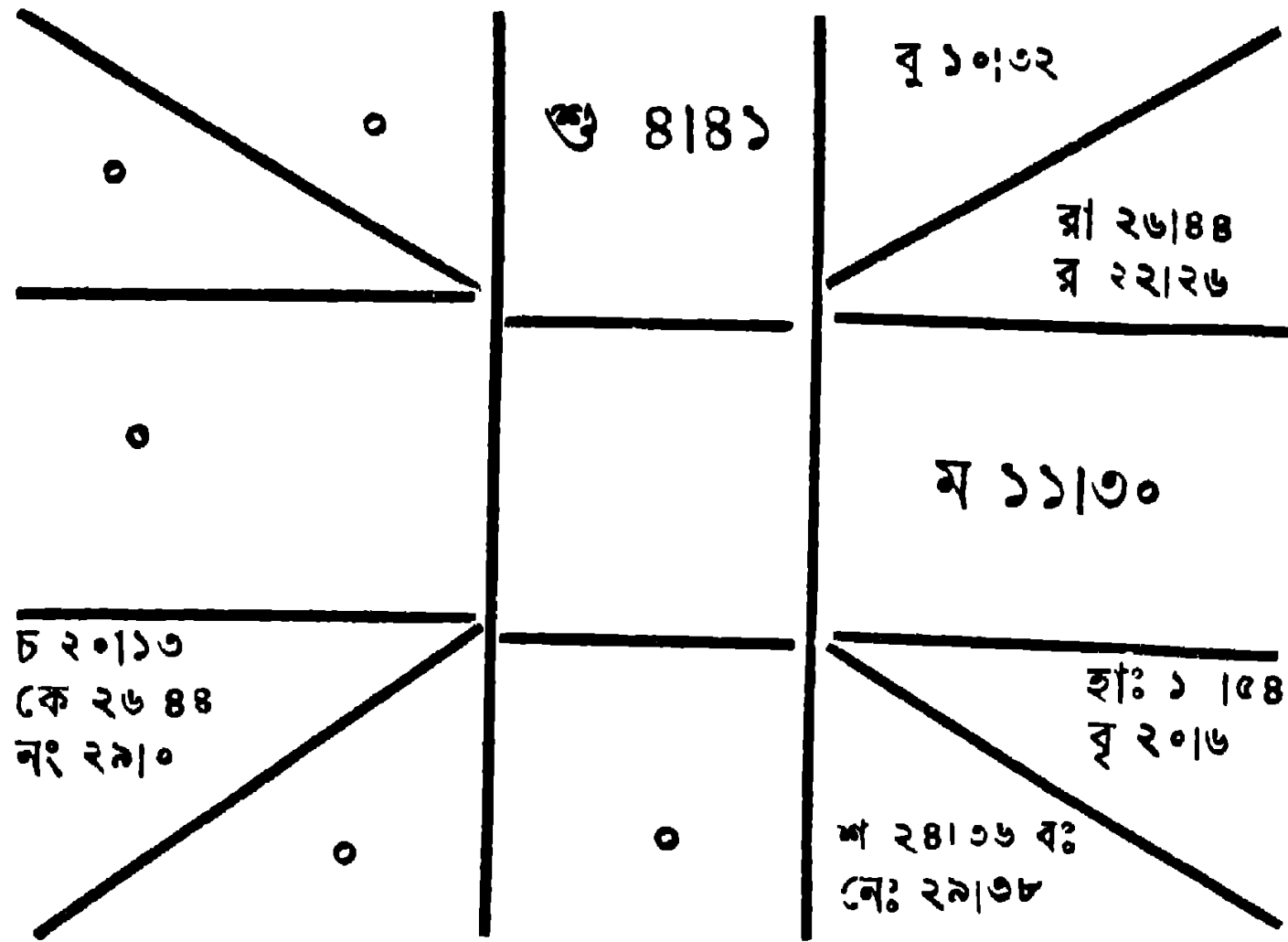
অয়নাংশ ১৬°।৪০' (চিত্রাপক্ষীয়)। চৈতন্যদেব সিংহরাশি, (১১ পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র,) ক্ষত্রিয়বর্ণ, নরগণ।

চৈতন্যদেবের জন্মলগ্ন সিংহ কি তুলা তাহা ফলশাস্ত্রবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সৌরচান্দ্রিক যুগ অনুসারে গণনা করিয়া দেখা যায় যে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ চৈতন্যদেবের জন্ম বৎসরের সহিত তিথি নক্ষত্রানুসারে সদৃশ বৎসর।

বর্তমান বৎসর ১৩৪৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে চৈতন্যদেবের জন্মকাল হইতে ৪৫৬ বৎসর পূর্ণ হইল। ভারতবর্ষে অব্দ গণনায় যেরূপ গতাব্দ গ্রহণ করা হয়, তদনুসারে আগামী ২রা মার্চ হইতে চৈতন্যাব্দ ৪৫৬ আরম্ভ হইল। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় ও পি. এম. বাগচীর পঞ্জিকায় চৈতন্যাব্দ উক্ত প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় গতাব্দের পরিবর্তে চলিতাব্দ লইয়া চৈতন্যাব্দ ৪৫৭ আরম্ভ হইল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে চলতাব্দ গণনার প্রথা প্রচলিত আছে। যদিও এই অব্দের কোথাও লৌকিক ব্যবহার নাই, তথাপি এই প্রকার মতদ্বৈধ থাকা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা হইয়া সর্বসম্মত কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া উচিত।

---

*Sri Chaitanya and his stars by F. C. Dutta—এই পুস্তিকা হইতে শ্রীচৈতন্যের কোষ্ঠীপত্র গ্রহণ করিয়া অয়নাংশ সংস্কার করিয়া প্রদত্ত হইল। রায় বাহাদুর শ্রীকৈলাশ চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের জ্যোতিষ প্রভাকর গ্রন্থে যে কোষ্ঠী দেওয়া আছে তাহার সহিত এই পত্রিকার কিছু পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে মঙ্গল ধনুতে এবং বুধ শুক্র কুম্ভে অবস্থিত। অবসর মত গ্রহাবস্থানগুলি গণনা করিয়া পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহামহোপাধ্যায় কাণে-রচিত 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস'

(৩)

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., বি. এল্., কাব্যতীর্থ

গত ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসের 'উদয়াচল' পত্রে আমি 'বিংশশতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রের গবেষণা' নামক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিযাছিলাম যে, "(ধর্মশাস্ত্রেব ইতিহাসের) দ্বিতীয় খণ্ডখানি সম্প্রতি যন্ত্রস্থ অবস্থায় রহিয়াছে। এখানিতে স্মার্ত সংস্কার ও অনুষ্ঠানাদির গবেষণামূলক পরিচয় আছে এবং এখানিরও কলেবর প্রথম খণ্ডেরই অনুরূপ হইবে। * * *

উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এখন ভারতবর্ষ বা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুর সমগ্র ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় আইনের সম্মিলিত জ্ঞান তাঁহাব (অর্থাৎ পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের) ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো মনুষ্যেব নাই। তাঁহাব নিকট ঋণের আংশিক পরিশোধস্বরূপ তাঁহার গুণমুগ্ধ ভারতীয় পণ্ডিতগণ আগামী ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে তাঁহার একষষ্টিবর্ষপূরণ উপলক্ষে একখানি ইংরাজীসংস্কৃত প্রবন্ধসমষ্টি তাঁহাকে উপহার দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।"

বোম্বাইএর লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল আজীবন সংস্কৃতসেবী কাণে মহাশয়ের History of Dharmasastra (বা ধর্মশাস্ত্রেব ইতিহাস) এর প্রথমখণ্ড গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ আটশত পৃষ্ঠা এবং ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পর্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদিগের বহু সহস্রবৎসরব্যাপী ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৭ সালের ফাল্গুন মাসে যন্ত্রস্থ ছিল। ১৩৪৮ সালের ১৪ই আষাঢ় তারিখে (১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন) ইহা পুণাসহরের ভাণ্ডারকর ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামক সংস্কৃত গবেষণাভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেই দিনই ইংরাজী-সংস্কৃতপ্রবন্ধপূর্ণ জয়ন্তীপুস্তকও উক্ত ভবনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত মাসানি মহাশয় কর্তৃক কাণে মহাশয়ের হস্তে উপহৃত হইয়াছে। এই জয়ন্তীপুস্তক গত শ্রাবণ মাসে এবং ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড গত পৌষমাসে আমার হস্তগত হইয়াছে। সর্বসমেত চুযাত্তরটি প্রবন্ধের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় প্রভৃতি বঙ্গদেশের সাত আটজন পণ্ডিতের রচনা জয়ন্তীপুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। বর্তমান লেখকেরও একটি ক্ষুদ্র ইংরাজী প্রবন্ধ ইহার অন্তর্গত হইয়াছে।

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের কলেবর আমার ধারণামত প্রথম খণ্ডের অনুরূপ না হইয়া প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। ইহাতে ১৪০০ পৃষ্ঠা আছে এবং বাঁধাইএর সুবিধার জন্য ইহা দুইটি ভাগে বদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এদিকে ১৩৪৮ সালের ১৭ই পৌষ (১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) তারিখে শ্রীযুক্ত কাণে মহাশয় ভারত সরকার কর্তৃক 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে

ভূষিত হইয়াছেন। আমি গত চারিমাস ধরিয়া ঐ ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড অবসর মত ধারাবাহিক ভাবে পড়িয়াছি। এই পুস্তকখানির পঁয়ত্রিশটি অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিলেই ইহার বিষয় বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেগুলি এই :—

ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণ, বর্ণের অধিকার ও কর্তব্য, অস্পৃশ্যতা, ক্রীতদাসত্ব, সংস্কার, উপনয়ন, আশ্রম, বিবাহ, মধুপর্ক, বহুপত্নীত্ব বহুপতিত্ব ও বিবাহের কর্তব্য ও অধিকার, বিধবাধর্ম, নিয়োগ, বিধবাবিবাহ, সতীদাহ, বেশ্যা, আহ্নিক ও আচার, পঞ্চমহাযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, নৃযজ্ঞ, ভোজন, উপাকর্ম ও উৎসর্জন, ক্ষুদ্র গৃহকর্ম ও বাস্তুপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠান, দান, প্রতিষ্ঠা ও উৎসর্গ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, শ্রৌত অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়-পশুবন্ধ, অগ্নিষ্টোম, অন্যান্য সোমযজ্ঞ, সুত্রামণী ও অন্যান্য যজ্ঞ। এই সমগ্র পুস্তকখানির মধ্যে অস্পৃশ্যতা ও ক্রীতদাসত্ব (১৬৫ পৃ° হইতে ১৮৭ পৃ°) এবং বিবাহ হইতে বেশ্যা পর্যন্ত অধ্যায় গুলি (৪২৭ পৃ° হইতে ৬৩৭ পৃ°) অধিকতর চিত্তাকর্ষক। সতীদাহের অধ্যায়টি (৬২৪ পৃ° হইতে ৬৩৬ পৃ°) সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মনোরম ও মর্মস্পর্শী।

কাণে মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে এই পুস্তক প্রকাশের তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত করিবেন, এই তৃতীয় খণ্ডেই তাঁহার গ্রন্থ শেষ হইবে, এবং ইহাতে এই বিষয়গুলি থাকিবে :—ব্যবহার, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থ, ব্রত, কাল, শান্তি, ধর্মশাস্ত্রের উপর পূর্বমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রভাব, আচারের দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের পরিবর্তন, ধর্মশাস্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি এবং ধর্মশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ পরিণতি। হিন্দুর কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র লইয়া বহুলোকই ইহার পূর্বে ইংরাজীতে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন কিন্তু হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র লইয়া ইংরাজীতে বিরাট পুস্তকপ্রণয়ন করিবার চেষ্টা এই এই প্রথম। কিন্তু প্রথম হইলেও ইহা গভীরতা ও ভ্রমশূন্যতার দিক্ দিয়া বহুদিনই আদর্শ পুস্তক রূপে পণ্ডিত সমাজে আদৃত হইবে।

আমাদের কথা

বর্ত্তমান সংখ্যার সহিত বাংলা ১৩৪৮ সাল শেষ হইল। বর্তমান বৎসর পৃথিবীর সমস্ত দেশের পক্ষেই যুদ্ধবিগ্রহ ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিশেষ দুর্বৎসর। জানি না, আগামী বৎসরে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে কিংবা ইহা অধিকতর অমঙ্গলদায়ক হইবে। জাতিগত স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে মানবত্ব ধ্বংসোন্মুখ, শিক্ষা-কৃষ্টি লুপ্তপ্রায়, ধর্ম ব্যাহত, আর শান্তিকামী জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, মরণোন্মুখ। বিধাতা তাঁহার কঠোর হস্তে এই ধ্বংস-লীলার আশু অবসান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

*　　*　　*　　*

বর্তমান সংখ্যায় 'ন্যায়প্রবেশ' নামে যে ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ হইল। অন্যান্য বিষয়ে সংযুক্ত হইয়া ইহা পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইল। 'আর্ষেয় ব্রাহ্মণ' নামে সামবেদের যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছিল তাহাও গতবারে সমাপ্ত হইয়াছে ও পৃথক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জৈনশাস্ত্রের একখানি অপ্রকাশিত পুস্তক আগামী বৈশাখ সংখ্যা হইতে মূল ও অনুবাদাদিসহ প্রকাশিত হইবে।

*　　*　　*　　*

অনেকেই নীতিশাস্ত্র আলোচনায় উৎসুক। প্রাচীনকালে হিন্দুদের নীতিশাস্ত্র কিরূপ সর্বতোমুখী ছিল তাহা অনেকে জানেন না। শুক্রাচার্যকৃত নীতিশাস্ত্র একটি প্রামাণিক গ্রন্থ কিন্তু ইহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিতেছেন ও ইহার বঙ্গানুবাদ করিতেছেন। আগামী সংখ্যা হইতে উহা ধারাবাহিকরূপে 'শ্রীভারতী'তে প্রকাশিত হইবে।

*　　*　　*　　*

ডক্টর নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত এম-এ, পি-এচ্-ডি মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতাস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজে বহু পুঁথি আছে ও সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা ও প্রচারের জন্য বহুপ্রকার অর্থ ব্যবস্থা (Endowment) আছে। আশা করি তিনি যাহাতে এই সব পুঁথি প্রকাশিত হয় ও এই সব অর্থ সাহায্য দ্বারা সংস্কৃতশাস্ত্রের ও কৃষ্টির প্রচার হয় তাহার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইবেন। আমরা তাঁহার কার্যে সাফল্য কামনা করি।

*　　*　　*　　*

মার্শাল ও মাদাম চিয়াংকাইশেক ভারতে আগমন করিয়া শান্তিনিকেতন সন্দর্শনে যান। তাঁহাদের অভ্যর্থনার উত্তরে মার্শাল যাহা বলেন তাহা উল্লেখযোগ্য—"আপনাদের দেশের মহান্ নেতা আপনাদের সমুদয় মহাজাতির হাতে যে কাজটির ভার ন্যস্ত করে দিয়েছেন, সেই মহৎ কাজটি আপনারা সম্পন্ন করতে সমর্থ হোন্, আমার এই কামনা"। তিনি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকা ও চীনা ভবনের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান ক'রে গেছেন। বিশ্বভারতীকে এক মহান্ আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্ররূপে পরিণত করাই বিশ্বকবির উদ্দেশ্য ছিল, তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা মার্শাল চিয়াংকাইশেকের মত বদান্যতা প্রকাশ করুন ইহাই কামনা।

পুস্তক সমালোচনা

সম্বন্ধ নির্ণয়—চতুর্থ পরিশিষ্ট প্রথমখণ্ড (৪র্থ সংস্করণ)। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৬৪। মূল্য ১৸০।

বর্তমান গ্রন্থখানিতে বাৎসগোত্রীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী কুলপরিচয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। পিতৃপুরুষের সম্বন্ধ পরিচয়ের সহিত বংশমর্যাদার ইতিবৃত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামাজিক ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানি যথোচিত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। বংশধারার বৃত্তান্ত সঙ্কলনে তিনি যে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কাঞ্জারি, কাঞ্জিলাল, ঘোষাল দীঘালগ্রামী, পিপলাই, পূতিতুণ্ড, মতিলাল শিমলাল ও বারেন্দ্রবংশ প্রভৃতি বিভিন্ন বংশাবলীর ইতিবৃত্তের সমাবেশ আছে। মহাকবি জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য, মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি পণ্ডিতপ্রবর যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার উদাচ্য ভট্টাচার্য এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মনীষিবর্গের বংশপরিচয় আলোচিত হওয়ায় পাঠক-মাত্রেই ইহাতে উৎসাহবোধ করিবেন সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত বহুখ্যাতনামা অধ্যাপক, পণ্ডিত, চিকিৎসক, আইনজীবী এবং ব্যায়াম ও সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিবর্গের বংশধারা নির্ণয়েও বিদ্যানিধি মহাশয় বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। স্বয়ং বিদ্যানিধি মহাশয়ের বংশপরিচয়ও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বহুতথ্যের সমাবেশে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু তথ্যগুলির সন্নিবেশে যে-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে—উহা ক্রম ও শৃঙ্খলার দিক দিয়া আরও উন্নততর হওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থখানির ছাপা সুন্দর। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

ভাষাপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ—(ইংরাজী অনুবাদ) স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক অনূদিত। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

স্বামী মাধবানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হইলেও বিদ্বৎ সমাজে তিনি বিশেষভাবে সুপরিচিত। তিনি বৃহদারণ্যকের অতি সুন্দর ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপে সংস্কৃত প্রাচীন সাহিত্য প্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থখানিও অতি যত্নের সহিত অনুবাদ করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে Dr. Roer ইহার কারিকাবলীর একটী সাধারণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান অনুবাদটী ভাষা পরিচ্ছেদের প্রসিদ্ধ টীকা মুক্তাবলীর সহিত প্রকাশিত হওয়ায় বাস্তবিকই অনেক দিনের একটী অভাব দূর হইল। এ জাতীয় গ্রন্থের অনুবাদ বোধহয় এই

প্রথম। নব্যন্যায়ের পরিভাষায় এইরূপ সুন্দর অনুবাদের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানির ভাষা যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল। আমরা গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। বঙ্গের সকল সুধীবর্গকেই আমরা এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

বংশ ব্রাহ্মণম্—মূল ও বঙ্গানুবাদ—অধ্যাপক মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম. এ. কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত। ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারিআনা মাত্র।

সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণের মধ্যে বংশব্রাহ্মণ অন্যতম। ইহতে সামবেদের আচার্যগণের বংশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। মহামতি সায়নাচার্য ইহার ভাষ্য লিখিয়াছেন। আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় ইহা এক সময়ে তাঁহার বৈদিক পত্রিকা 'উষায়' প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা পাওয়া যায় না। রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ ইহা প্রকাশ করিয়া বাস্তবিকই বৈদিক পণ্ডিত মণ্ডলীর বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণখানি অতি যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানি সকলকেই সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি, কারণ সামশ্রমী মহাশয়ের মতে ইহারাই প্রাচীন উদ্গাতাচার্য। সামবেদী ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। যোগে দীক্ষা—শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা

২। হ্যাভেলক এলিস ও যৌনবিজ্ঞান—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা

৩। সূত্রধার কুল-পরিচয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। কলিকাতা

৪। The Status of women in Ancient India.—By Prof. Indra, M A, Lahore.

৫। Anecdotes of Hazrat Mohammad—By Rezaul Karim, M.A., B.L Calcutta.

৬। প্রক্রিয়াসর্বস্ব (তদ্ধিত)—নারায়ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। মাদ্রাস।

৭। রাজমালা—শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, এম্. এ.। আগড়তলা।

৮। India and the Pacifiic world—By Dr. Kalidas Nag, Calcutta.

সাময়িক সাহিত্য—ফাল্গুন, ১৩৪৮

সাহিত্য

বিশ্ববাণী—সংস্কৃত সাহিত্যে সমাজতত্ত্বিক অনুসন্ধান—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ. এম., পি. এইচ্. ডি।

বঙ্গশ্রী—সাহিত্যের নেশা—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম. এ., এফ. এস্. এস্., এফ. আর. ই. এস্।

,, —বাঙ্গালীর জীবন-যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক এম. এ. বি. টি।

,, —বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—শ্রীকালিদাস রায়।

,, —বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য।

প্রবাসী—বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুবাদ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম ও দর্শন

উদ্বোধন—উপনিষদে সৃষ্টিতত্ত্ব—শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম এ., বিদ্যাবিনোদ।

,, —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

,, —শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি. এল্।

ব্রহ্মবিদ্যা—সোয়েডেন্‌বর্গ ও দিব্যদৃষ্টি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —আত্মানুভূতি—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

বিশ্ববাণী—অদ্বৈতবাদ—পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তভূষণ।

,, —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী শঙ্করানন্দ।

ভারতবর্ষ—ভবিষ্যৎ বিশ্বশৃঙ্খলায় ধর্মের স্থান—অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, রায়বাহাদুর, এম-এ।

প্রবাসী—ফ্রয়েড কি বলেন ?—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

,, —সংযম ও সাম্যবাদ—অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ।

প্রত্নতত্ত্ব

ভারতবর্ষ—রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত দ্বিতীয় লিপি—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পি-এইচ-ডি।

প্রবাসী—জেম্‌স প্রিন্‌সেপ ও প্রাচীন ভারতীয় লিপি—শ্রীসুশোভন দত্ত।

পুরাতন পত্রিকা

নবজীবন

(১২৯১—১২৯২) সাল

['নবজীবন' প্রাচীন পত্রিকার মধ্যে অন্যতম। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র বঙ্গদর্শনেও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১২৮০ সালে ১১ই কার্ত্তিক চুঁচুড়া হইতে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি 'সাধারণী' সাপ্তাহিক—বাহির করেন। সেকালে সাধারণীর ন্যায় সংবাদ পত্র অতি বিরল ছিল। সাধারণীর মতামত রাজপুরুষগণও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সাধারণীর নির্ভীক সমালোচনাতেই অক্ষয়চন্দ্রের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পরে বঙ্কিম বাবুর সহিত তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়ায় ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি নবজীবন প্রকাশ করেন। বঙ্কিম বাবুর লিখিত 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' 'অনুশীলন' প্রথমে সাধারণীতেই বাহির হয়। পরে তিনি স্বাধীনভাবে মত ব্যক্ত করিবার জন্য 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। 'নবজীবনে' রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেরই হাতে খড়ি হইয়াছিল। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন সরস তেমনি ভাবপূর্ণ। আমরা প্রবন্ধগুলির লেখকের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় কেবল লেখকবর্গের সুচী আছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের নীচে বা প্রথমে লেখকের নাম নাই। তবে মনে হয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি অধিকাংশ অক্ষয়চন্দ্র অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-প্রসূত। যাঁহারা প্রাচীন পত্রিকাগুলির সমাদর করেন বা সুলিখিত সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাঁহারা 'নবজীবন' পুনঃপুনঃ পাঠ করুন। নবজীবনের জন্ম ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাস]

ভাদ্র—১২৯১—বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম—বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেমভক্তির উজ্জল প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরাধিকার চরিত্র বিশ্লেষণ ও আত্ম নিবেদনের অপূর্ব ছবি। প্রবন্ধটী অতি সুন্দর।

আশ্বিন—ঐ—ষোড়শোপচারে পূজা—অক্ষয়চন্দ্র সরকার? হিন্দুর Idealism কিরূপে Idolatory কে আত্মসাৎ করিতে পারে সেই সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা।

আশ্বিন—বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব—দুর্গোৎসবের তত্ত্ব কি। ইহার মধ্যে কিরূপে বিশ্বপূজার ভাব নিহত আছে। তাহার অপূর্ব ব্যাখ্যা। ভাষায় ও ভাবে প্রবন্ধটী অতি উৎকৃষ্ট।

আশ্বিন—হুতোম পেঁচার গান। কলিকাতা সহরের ও তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের 'ছড়ায়' সুন্দর চরিত্র সমালোচনা। গানটী অতি উপভোগ্য।

সাময়িক সংবাদ

স্যর আজিজুলের নূতন সম্মান লাভ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার স্যর মোহাম্মদ আজিজুল হক সাহেব লণ্ডনে-ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় শীঘ্রই তিনি বিলাত যাত্রা করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানজনক সাহিত্যাচার্য (ডক্টর অফ্ লিটারেচার্স) উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস-চান্সেলর—ডাঃ স্যর আজিজুল হকের লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার স্থলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচান্সেলর নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ডাঃ রায়ের কৃতিত্বে বিশেষ আস্থাবান্; তাঁহার নেতৃত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; ইহাই আমাদের কামনা।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ | ৯ম সংখ্যা

বহিরর্থ*

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

৺শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের কথা খুব সহজ ও সরল, এক কথায় "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"। গৃহী ও যোগী সকলের পক্ষে এই মন্ত্রই যথেষ্ট এবং ইহাই বেদোদিত বেদান্তদর্শনের সারমর্ম। বেদপন্থী না হইয়াও বৌদ্ধগণ এই মন্ত্র পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় বৌদ্ধাচার্যগণও বলিতেন জাগ্রতাবস্থাও এক প্রকারের স্বপ্ন। আমি অবশ্য এখানে পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রের কথা বলিতেছি না। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁহার পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে পালিতেই আদি ও অকৃত্রিম বৌদ্ধদর্শন সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রাচীনতার দোহাই দিয়া পালিপন্থী বৌদ্ধদর্শনকে আদি বৌদ্ধদর্শন বলা চলিবে না, কারণ অগ্রবর্তী ও পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত পালিবদ্ধ চিন্তাধারার বিশেষ কোন সাদৃশ্যই নাই; পালিতে যে কোন প্রকারের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও ঠিক বলা যায় না। আরও বিবেচ্য এই যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের আদি জন্মভূমি এই ভারতবর্ষে পালিবদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না কেন? পালি বৌদ্ধশাস্ত্র সারাংশে অশোকেরও পূর্ববর্তী হইতে পারে—ইহাই আমার বিশ্বাস—কিন্তু তথাপি ইহা আদি বা অকৃত্রিম নহে। ভাষা ও ভাব এই দুই দিক্ হইতেই মনে হয় যে পালি শাস্ত্র কৃত্রিম, বিশেষভাবে পৃথক্‌জনের প্রতিবোধার্থে রচিত; সেইজন্যই দার্শনিক প্রশ্নাবলী পালিভাষার শাস্ত্রগ্রন্থে "অব্যাকৃত" বলিয়া পরিহার করা হইয়াছে। বেদ, বেদান্ত ও প্রকৃত বৌদ্ধ দর্শন—যাহার পরিচয় সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়—একই চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ক্রমবিকাশ। এই তিনের সমন্বয়ের ফল হইল অনাদিনিধন হিন্দুধর্ম।—ইতিপূর্বে বহুবারই দেখান হইয়াছে, বৌদ্ধগণ কিরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম অর্থাৎ বিজ্ঞানই সত্য। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হইল জগৎ যে

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, Second Series, No. 17.

মিথ্যা সেই সম্বন্ধে বৌদ্ধপরিকল্পিত প্রমাণ। এই আলোচনা হইতে বেদান্তদর্শন ও বিজ্ঞানবাদের যে পার্থক্য তাহাও সুপরিস্ফুট হইবে। বেদান্তমতে মায়ামুক্ত সমগ্র জগৎ এক ও অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান; বৌদ্ধমতে কিন্তু জগৎ হইল অসংখ্য সুপরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানধারার সমষ্টি, এবং সেই অসংখ্য বিজ্ঞানধারার প্রত্যেকটি আবার ক্ষণভঙ্গী।

বিজ্ঞানবাদী প্রথমেই বলিতেছেন, ত্রৈধাতুক এই জগৎ বিজ্ঞপ্তিমাত্র; বিভিন্ন সত্ত্ব অনুযায়ী এই অনন্ত বিজ্ঞানসন্তান বিভিন্ন; প্রকৃত তত্ত্ব যাহাদের অধিগত হয় নাই তাহাদের পক্ষে এই সন্তান অবিশুদ্ধ, কিন্তু যাহাদের কর্ম প্রহীণ হইয়াছে (প্রহীণাচরণানাম্) তাহাদের পক্ষে এই সন্তান বিশুদ্ধ; উভয় পক্ষেই কিন্তু বিজ্ঞান ক্ষণবিধ্বংসী। উপনিষদ্বাদিগণ বলিয়া থাকেন বিজ্ঞান এক ও অবিকারী,—ইহা কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মত নহে। সমস্তই যে বিজ্ঞপ্তিমাত্র তাহা দুই উপায়ে প্রমাণিত হয়:—(১) পৃথিব্যাদি বাহ্য বস্তু যখন নাই তখন গ্রাহ্য বস্তুও কল্পনা মাত্র, এবং গ্রাহ্যবস্তু না থাকায় গ্রাহকত্বও অসম্ভব (বাহ্যস্য পৃথিব্যাদিস্বভাবস্য গ্রাহ্যস্যাভাবে গ্রাহকস্যাপ্যভাবাৎ); (২) আর গ্রাহ্য বস্তু থাকিলেও তাহা যখন গ্রাহকসন্তান হইতে পৃথক্ সন্তানের অন্তর্গত তখন এতদ্দ্বয়ের মধ্যে গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না (সত্যপি বা সন্তানান্তরে গ্রাহ্যগ্রাহকলক্ষণবৈধুর্যাৎ)।—পূর্বপক্ষী ইহাতে প্রশ্ন করিতেছেন:—

> যদি জ্ঞানাতিরেকেণ নাস্তি ভূতচতুষ্টয়ম্।
> তৎ কিমেতন্ন বিচ্ছিন্নঃ বিস্পষ্টমবভাসতে ॥ ১৯৬৫ ॥
> তস্যৈবং প্রতিভাসেঽপি নাস্তিতোপগমে সতি।
> চিত্তস্যাপি কিমস্তিত্বে প্রমাণং ভবতাং ভবেৎ ॥ ১৯৬৬ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানই যদি একমাত্র সত্য হয়, এবং ভূতচতুষ্টয়ের অস্তিত্ব না থাকে, তবে এই ভূতচতুষ্টয়ের বিস্পষ্ট অনুভূতি (অবভাস) হয় কেন? আর ভূতাবলীর বিস্পষ্ট অবভাস সত্ত্বেও যদি বলা হয় যে সেগুলির অস্তিত্ব নাই তবে বিজ্ঞানের যে অস্তিত্ব আছে তাহাই বা কিরূপে বলা যায়?

বৌদ্ধ ইহাতে উত্তর করিতেছেন, এই তথাকথিত প্রত্যক্ষ বাহ্যার্থ যদি বাস্তবিকই সৎ হয় তবে তৎসম্বন্ধে এই তিনটি পক্ষের একটি স্বীকার করিতে হইবে:—হয় বলিতে হইবে বাহ্যার্থ হইল এক এবং পরমাণু হইতে অভিন্ন; না হয় বলিতে হইবে বাহ্যার্থ এক কিন্তু অবয়বী, পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে বাহ্যার্থ স্থূল হইলেও অনারব্ধ। এ-ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষটি সম্ভব নয়, কারণ গ্রাহক প্রত্যয়ে অনেক নিরংশ পরমাণুর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় না, স্থূলাকার বস্তুর জ্ঞানই কেবল অনুভূত হয়।—কমলশীলের এই কথা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বপক্ষী পরমাণুবাদে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানবাদী অবশ্যই পরমাণু সম্বন্ধে সন্দিহান; তিনি বলিতেছেন বাহ্যার্থ যদি প্রথম পক্ষ অনুযায়ী পরমাণু হইতে অভিন্নই হয় তবে বহু পরমাণুর সমষ্টিরূপেই তাহা অনুভূত হওয়া উচিত। পূর্বপক্ষী ভদন্ত শুভগুপ্ত ইহার উত্তরে বলিয়াছেন "প্রত্যেকপরমাণূনাং স্বাতন্ত্র্যে নাস্তি সম্ভবঃ। অতোঽপি পরমাণূনামেকৈকা-

প্রতিভাসনম্॥" অর্থাৎ, পরমাণুগুলির প্রত্যেকটি যে পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হয় তাহা নহে; এইজন্যই পরমাণুগুলির প্রত্যেকটির পৃথক প্রতিভাসও ঘটে না। কিন্তু শুভগুপ্তের এই উত্তর অগ্রাহ্য, কারণ

সাহিত্যেনাপি জাতাস্তে স্বরূপেণৈব ভাসিনঃ।
ত্যজন্ত্যনংশরূপত্বং নচ তাস্তু দশাস্বমী॥ ১৯৭০॥
লব্ধাপচয়পর্যন্তং রূপং তেষাং সমস্তি চেৎ।
কথং নাম ন তেঽমূর্তা ভবেয়ুর্বেদনাদিবৎ॥ ১৯৭১॥

অর্থাৎ, সমস্ত পরমাণু একত্রে (সাহিত্যেন) উৎপন্ন হইলেও ঐ অবস্থায় যে পরমাণু স্বীয় অনংশ রূপ পরিত্যাগ করিবে তাহার কোন কারণ নাই। যদি বলা হয় যে এই অবস্থায় অণ্বাবলী অপচয়ের শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছায় তবে এ-কথা স্বীকার করিতেই বা আপত্তি থাকে কেন যে পরমাণুও বেদনাদির ন্যায় অমূর্ত?—ইহার উত্তরে শুভগুপ্ত বলিতে পারেন :—

তুল্যাপরক্ষণোৎপাদাদ্যথা নিত্যত্ববিভ্রমঃ।
অবিচ্ছিন্নসজাতীয়গ্রহে চেৎ স্থূলবিভ্রমঃ॥ ১৯৭২॥

অর্থাৎ, পরম্পরাক্রমে অনুরূপ বিচ্ছিন্ন ক্ষণাবলীর উৎপত্তি হইতে যেমন নিত্যত্বের বিভ্রম হয়, অবিচ্ছিন্ন সজাতীয় অণ্বাবলীর সন্নিধান হইতেও সেইরূপ স্থূলত্বের ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে।—ইহার প্রত্যুত্তরে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, প্রত্যক্ষ যদি স্বব্যাপারের বলেই পরমাণুর জ্ঞান উৎপাদন করিতে না পারে তবে পরমাণু যে প্রত্যক্ষগোচর তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? ভাবাবলী যে ক্ষণিক তাহা প্রমাণসিদ্ধ; কিন্তু পরমাণু যে শ্বেত, পীত প্রভৃতি হইতে পারে তাহার প্রমাণ কি (কা ১৯৭৩-৪)?

দিগম্বর জৈনাচার্য সুমতি পরমাণুবাদ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে একাধারে সামান্য ও বিশেষ এই দুইই হওয়ায় পরমাণু দ্বিরূপ। কিন্তু সুমতির মত স্যাদ্বাদের সম্পর্কেই আলোচনা করা হইয়া গিয়াছে। কুমারিলেরও মত এই যে পরমাণু অতিসূক্ষ্ম হইলেও যে তাহা হইতে স্থূল বস্তুর উৎপত্তি ঘটিতে পারে না তাহা নহে, কারণ একই বস্তুর পরস্পর বিরুদ্ধ আকার সম্ভব। বস্তুর আকার যে এক প্রকারেরই হইতে হইবে এরূপ কোন রাজাজ্ঞা আছে কি? বস্তুর বিবিধরূপত্ব যখন প্রতীতিলব্ধ তখন তাহা স্বীকার করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ।—কুমারিলের এই যুক্তি খণ্ডন করা অবশ্য কঠিন নহে :—

তন্নাসতোঽপি সংবিত্তেঃ কম্বুপীতাদিরূপবৎ।
বিরুদ্ধধর্মসঙ্গাত্তু নান্যদ্ভেদস্য লক্ষণম্॥ ১৯৮৮॥

অর্থাৎ, যাহা পীতশঙ্খ প্রভৃতির ন্যায় অসৎ তাহারও যখন প্রতীতি জন্মে তখন যাহারই প্রতীতি জন্মে তাহাই সৎ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কুমারিল বলিতে চাহেন যে একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম সম্ভব; কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্মের সহিত সাহচর্যই যখন ভেদের লক্ষণ তখন একই বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম স্বীকার করা যায় কিরূপে?—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পরমাণুর অস্তিত্ব

প্রত্যক্ষ বা অনুমান (বৌদ্ধ কেবল এই দুই প্রমাণই স্বীকার করেন) কিছুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে না।

পূর্বপক্ষী এখন বলিতেছেন, অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলেই যে বলা যাইবে পরমাণু অসৎ ইহাও ঠিক নহে ; বহিরর্থ পরমাণুর অসত্তারও পৃথক্ প্রমাণ চাই। এই প্রমাণ শান্তরক্ষিত ও কমলশীল যথেষ্ট পরিমাণেই দিয়াছেন। যে-অনুমান অনুযায়ী পরমাণুর অসত্তা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা এই :—সত্তামাত্রেই এক বা অনেক ; এক বা অনেক এই দুইয়ের কোনটিরই স্বভাব যাহার মধ্যে নাই তাহা অসৎ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য ; যথা আকাশকুসুম। এখন পূর্বপক্ষী যে বহিরর্থ পরমাণুর কথা বলিতেছেন তাহা এক বা অনেক কিছুই হইতে পারে না। পরমাণুর একত্ব এই কারণে স্বীকার করা যায় না যে তাহা হইলে পরমাণুর প্রচয়ে উৎপন্ন যে ভূধর তাহাতেও পূর্ব পশ্চাৎ প্রভৃতি দিগ্‌ভেদ সম্ভব হইত না। এখানে বিবেচ্য, পরমাণু হইতে কি ভাবে ভূধরাদির উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন অণ্বাবলী পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে (সংযুজ্যন্তে) ; আবার কেহ কেহ বলেন, পরমাণুগুলির মধ্যে সব সময়েই ব্যবধান থাকায় সেগুলি পরস্পরকে স্পর্শ কবিতে পারে না (সান্তরা এব নিত্যং ন স্পৃশন্তীত্যপরে) ; আর একটি মত হইল এই যে অণ্বাবলী নিরন্তর এবং পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকাই তাহাদের ধর্ম। এখন এই তিন পক্ষের যে-পক্ষই গ্রহণ করা হউক না কেন, মধ্যবর্তী যে পরমাণুটি অপর পরমাণুর দ্বারা চারিদিক হইতে পরিবারিত তাহা যদি চিত্তচৈত্তাদির (mental faculty) মত এক ও দিগ্‌ভাগশূন্য হইত তাহা হইলে অণ্বাবলীর প্রচয়ে ভূধরাদির উদ্ভব কখনই সম্ভব হইত না। পূর্বপক্ষী যদি পরমাণুকে নিরংশ বলিয়াও অণুপ্রচয়ের অনুরোধে তাহার উর্ধ্বভাগ অধোভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ স্বীকার করেন তবে তাঁহার পক্ষে চিত্তচেত্তেরও উর্ধ্বাদি ভাগ অস্বীকার করার কোন কারণ থাকিবে না। এক কথায়, "দিগ্‌ভাগভেদো যস্যাস্তি তস্যৈকত্বং ন যুজ্যতে"। এখন তথাকথিত নিরংশ পরমাণুর একস্বভাবত্ব যদি সিদ্ধ না হয় তবে সেই পরমাণুর সমুচ্চয়ে গঠিত ভূধরাদি বহিরর্থ যে অনেকস্বভাব তাহাই বা কিরূপে বলা যাইবে ? আবার ভূধরাদি বহিরর্থ যে একস্বভাব নহে তাহাও সুস্পষ্ট, কারণ :—

পরমাণোরযোগাচ্চ ন সন্নবয়বী যতঃ।
পরমাণুভিরারব্ধঃ স পরৈরুপগম্যতে ॥ ১৯৯৮ ॥

অর্থাৎ, পরমাণুরূপ অবয়বগুলি পরস্পর সংযুক্ত না হইলে ভূধরাদি অবয়বীর সত্তা সিদ্ধ হয় না বলিয়াই পূর্বপক্ষী (প্রমাণ না থাকিলেও) ধরিয়া লইয়া থাকেন যে ভূধরাদি অণ্বাবলীর দ্বারা আরব্ধ।—শান্তরক্ষিতের ভাষা এখানে অস্পষ্ট। কমলশীল টিপ্পনীতে বলিয়াছেন, যাঁহারা পরমাণুর দ্বারা অনারব্ধ স্থূল বস্তুতে বিশ্বাস করেন তাঁহাদেব পক্ষে এই স্থূল বস্তুকে একস্বভাব বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না ; দেহাদি অবয়বী যদি একস্বভাব হইত তাহা হইলে হাত নাড়িলেই সমস্ত দেহটি নড়ে না কেন (পাণ্যাদিকম্পাদৌ সর্বকম্পাদিপ্রসঙ্গাৎ) ;—এতদ্বারা

প্রমাণিত হইল যে বহিরর্থ একস্বভাব বা অনেকস্বভাব কিছুই হইতে পারে না ; অতএব বহিরর্থ অলীক ,—একমাত্র বিজ্ঞপ্তিই সত্য।

এইরূপে বহিরর্থের অসত্তা হইতে (অর্থাযোগাৎ) বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রাহ্য ও গ্রাহকের লক্ষণের অভাব হইতেও ঐ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

অনির্ভাসং সনির্ভাসমন্যনির্ভাসমেব চ।
বিজানাতি নচ জ্ঞানং বাহ্যমর্থং কথঞ্চন ॥ ১৯৯৯ ॥

শান্তরক্ষিতের এই কারিকাটিকে বিজ্ঞানবাদিগণের battle-cry রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ হইল, নিরাকার সাকার বা বিষয়াকার হইতে পৃথক্ আকার—এই ত্রিবিধাকারের কোন আকারেই বিজ্ঞান বাহ্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে না।—জ্ঞান সর্বদাই আত্মসংবেদন, যদিও পৃথক্ বিজ্ঞানসন্তান সম্ভব (সত্যপি সন্তানান্তরে)। শান্তরক্ষিত যথাক্রমে দেখাইয়াছেন যে এই ত্রিবিধ জ্ঞানের কোনটির দ্বারাই বহিরর্থ গৃহীত হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে এক আকারের জ্ঞানের দ্বারা অন্যাকারের অর্থ সংবেদিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, জ্ঞানটি পীতাকার হইলেও তাহা শুক্ল শঙ্খের গ্রাহক। যেমন কুমারিল :—

সর্বত্রালম্বনং বাহ্যং দেশকালান্যথাত্মকম্।
জন্মন্যেকত্র ভিন্নে বা সদা কালান্তরেঽপি চ ॥

অর্থাৎ, যখনই বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তখনই তাহার একটি বাহ্য অবলম্বন থাকেই, যে-অবলম্বন এই জন্মের, অন্য জন্মের বা কালান্তরের হইতে পারে।—কুমারিলের এই কথা স্মরণ করিয়াই শান্তরক্ষিত কারিকায় "অন্যনির্ভাস' জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন।

পূর্বপক্ষী এইখানে প্রশ্ন করিতেছেন, অনির্ভাসাদি যে তিনটি পক্ষ বৌদ্ধ বহিরর্থ সম্বন্ধে স্বীকার করিলেন সেই তিন পক্ষ আত্মসংবেদন সম্বন্ধেও স্বীকার্য নয় কেন ? ইহার উত্তর :—

বিজ্ঞানং জড়রূপেভ্যো ব্যাবৃত্তমুপজায়তে।
ইয়মেবাত্মসংবিত্তিরস্য যাঽজড়রূপতা ॥ ২০০০ ॥

অর্থাৎ বিজ্ঞান সর্বপ্রকার জড়রূপ হইতে পৃথক্‌রূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে , এই অজড়রূপতাই বিজ্ঞানের আত্মসংবিত্তি।—কমলশীল এখানে বুঝাইয়া দিয়াছেন, শান্তরক্ষিত যে আত্মসংবেদক জ্ঞানের কথা বলিতেছেন তাহা গ্রাহকজ্ঞান নহে ; সে-জ্ঞান নভস্তলবর্তী আলোকের ন্যায় আপনা হইতেই প্রকাশমান।—এই স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান গ্রাহকজ্ঞান নহে কেন ? তাহার উত্তর :—

ক্রিয়াকারকভাবেন ন স্বসংবিত্তিরস্য তু।
একস্যানংশরূপস্য ত্রৈরূপ্যানুপপত্তিতঃ ॥ ২০০১ ॥
তদস্য বোধরূপত্বাদ্যুক্তং তাবৎ স্ববেদনম্।
পরস্য ত্বর্থরূপস্য তেন সংবেদনং কথম্ ॥ ২০০২ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানের স্বসংবিত্তি"এ-রূপ কিছু নহে যে তাহাতে জ্ঞানক্রিয়াকেই জ্ঞানের কারক হইতে হইবে বা হইতে পারে ; তাহা যদি হইত তাহা হইলে একই জ্ঞান একাধারে বেদ্য, বেদক ও বিত্তি—এই ত্রিরূপ হইয়া পড়িত, যাহা অবশ্যই অসম্ভব। জ্ঞান বোধরূপ হওয়াতেই তাহা স্বসংবেদন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। এখন তাহাই যদি হয় তবে জ্ঞানের দ্বারা বহিরর্থের সংবেদন কিরূপ সম্ভব হইবে ?—পূর্বপক্ষী এখানে আপত্তি করিতেছেন, আত্মসংবিত্তি যেমন গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরহিত বাহ্যসংবিত্তিও সেইরূপ হইতে বাধা কি ? ইহার উত্তর :—

নহি তদ্রূপমন্যস্য যেন তদ্বেদনে পরম্।
সংবেদ্যেত বিভিন্নস্বাস্তাবানাং পরমার্থতঃ ॥ ২০০৩ ॥

অর্থাৎ. নির্বিষয় বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ এমন কোন বস্তুই নাই যাহার সংবিত্তি হইতে অপর এক বস্তুরও সংবেদনা আপনা হইতেই সাধিত হইয়া যাইবে, কারণ এরূপ কোন বস্তু বাস্তবিক যদি থাকে (যাহা অবশ্যই অসম্ভব) তবে তাহা পারমার্থিক অর্থেই বিজ্ঞান হইতে বিভিন্ন।—পূর্বপক্ষী এখনও প্রশ্ন করিতেছেন, পারমার্থিক অর্থে পৃথক্ হইলেই যে বহিরর্থ বিজ্ঞানের দ্বারা সংবেদিত হইতে পারিবে না তাহার কারণ কি ? ইহার উত্তর :-

বোধরূপতয়োৎপত্তের্জ্ঞানং বেদ্যং হি যুজ্যতে।
ন ত্বর্থো বোধ উৎপন্নস্তদসৌ বেদ্যতে কথম্ ॥ ২০০৪ ॥

অর্থাৎ জ্ঞান বোধরূপে উৎপন্ন হয় বলিয়াই সংবিদিত হইতে পারে। জ্ঞেয়ার্থ কিন্তু কখনই কেবল বোধরূপে উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং তাহা জ্ঞানের দ্বারা সংবিদিত হইবে কিরূপে ?—এখানে "বোধ" কথাটির অর্থ বোধ হয় "awareness"। এইরূপে প্রমাণিত হইল যে জ্ঞান স্বসংবেদন ভিন্ন আর কিছুই নহে। শান্তরক্ষিত এইবার দেখাইতেছেন যে বাহ্যবস্তু কখনই এই নিরাকার জ্ঞানের দ্বারাও সংবেদিত হইতে পারে না :—

নির্ভাসিজ্ঞানপক্ষে তু তয়োর্ভেদেঽপি তত্ত্বতঃ।
প্রতিবিম্বস্য তাদ্রূপ্যাদ্ভাক্তং স্যাদপি বেদনম্ ॥ ২০০৫ ॥
যেন ত্বিষ্টং ন বিজ্ঞানমর্থাকারোপরাগবৎ।
তস্যায়মপি নৈবাস্তি প্রকারো বাহ্যবেদনে ॥ ২০০৬ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা মনে করেন যে জ্ঞান সাকার (নির্ভাসি) তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান ও জ্ঞানের আকারের মধ্যে ভেদ অনিবার্য ; বস্তু ও তাহার প্রতিবিম্বের মধ্যে যে-সম্বন্ধ এই মতে তাহা হইলে জ্ঞান ও জ্ঞানের আকারের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ ; কিন্তু প্রতিবিম্ব তদ্রূপ হওয়ায় তাহা হইতে যেমন বস্তুর ভাক্ত (=গৌণ, partial) রূপের সংবেদন সম্ভব হয়, জ্ঞানের আকার হইতেও সেইরূপ এই মতে প্রকৃত জ্ঞানের আংশিক সংবেদন সম্ভব হইবে। অপর পক্ষে, যাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে বিজ্ঞান বিজ্ঞাতার্থের আকারের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়, তাঁহারা এ-কথাও বলিতে পারিবেন না যে বিজ্ঞান ঐরূপে বাহ্যবস্তুর আকারের দ্বারা

গৌণভাবেও প্রভাবান্বিত হয়।—কমলশীল এই মূল্যবান্ কারিকাদ্বয়ের উপর কোন টিপ্পনী করেন নাই।

কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞানাকারের মধ্যে ভেদ থাকায় দোষ কি? খড়্গ হস্তীকে ছেদন করে বলিয়া কি খড়্গ হস্ত্যাকার হইবে? জ্ঞানও কি এইরূপ জ্ঞাতার্থের আকার গ্রহণ না করিয়াও জ্ঞাতার্থটি সংবেদন করিতে পারে না? ইহার উত্তরে বক্তব্য :—

তদিদং বিষমং যস্মাত্তে তথোৎপত্তিহেতবঃ।
সন্তস্তথাবিধাঃ সিদ্ধা ন জ্ঞানং জনকং তথা ॥ ২০০৮ ॥

অর্থাৎ, হস্তী ও খড়্গের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহার সহিত জ্ঞান ও জ্ঞেয়াকারের কোনই সাদৃশ্য নাই; কারণ খড়্গ হইল ছিন্ন হস্তীটির "উৎপত্তিহেতু" (যেহেতু খড়্গদ্বারা আহত না হইলে হস্তী ছিন্নহস্তীতে পরিণত হইত না); জ্ঞান কিন্তু এই অর্থে জ্ঞানাকারের জনক নহে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা যে গ্রাহ্য বস্তুটির "উৎপত্তি" ঘটিতেছে তাহা বলা যায় না।

জ্ঞানের নির্বিষয়ত্বের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি করা যাইতে পারে। গ্রহণই হইল জ্ঞানের কার্য; এখন গ্রাহ্য বহিরর্থ যদি কিছু না থাকে তবে গ্রাহক জ্ঞানই বা সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর :—

পরিচ্ছেদঃ স কস্যেতি নচ পর্যনুযোগভাক্।
পরিচ্ছেদঃ স তস্যাত্মা সুখাদেঃ সাততাদিবৎ ॥ ২০১১ ॥

অর্থাৎ, "জ্ঞানের দ্বারা কিসের গ্রহণ হইতেছে"—এইরূপ আপত্তি অযৌক্তিক, কারণ গ্রহণই হইল জ্ঞানের স্বরূপ, সুখের স্বরূপ যেমন আনন্দ।—বলা হইয়াছে যে প্রকৃত জ্ঞান হইল স্বসংবিৎ; কিন্তু এই স্বসংবিৎ কি? তাহার উত্তর :—

স্বরূপবেদনায়ান্যদ্বেদকং ন ব্যপেক্ষতে।
নচাবিদিতমস্তীদমিত্যর্থোঽয়ং স্বসংবিদঃ ॥ ২০১২ ॥

অর্থাৎ, যাহা স্বরূপের গ্রহণের জন্য অপর কোন গ্রাহকের মুখাপেক্ষী নহে, এবং তৎসত্ত্বেও যাহা অবিদিত থাকে না,—তাহাই হইল স্বসংবিৎ।—ইহার পর শান্তরক্ষিত বহিরর্থবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে কুমারিলাদি প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতের আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। কুমারিলের কথা এই :—

ব্যাপৃতং হ্যর্থবিত্তৌ চ নাত্মানং জ্ঞানমৃচ্ছতি।
ততঃ প্রকাশকত্বেঽপি বোধায়ান্যৎ প্রতীক্ষতে ॥ ২০১৩ ॥

অর্থাৎ, প্রকাশাত্মক হইলেও জ্ঞান যখন বস্তুর গ্রহণে ব্যাপৃত থাকে তখন তাহা আপনাকে স্পর্শ করে না; সেই জন্যই বোধের জন্য জ্ঞানকে অপর কিছুর উপর নির্ভর করিতে হয়।—কিন্তু এই কথা যে সর্বত্রসিদ্ধ নহে তাহা স্বয়ংপ্রকাশ প্রদীপের দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়। সেইজন্যই কুমারিল আরও বলিয়াছেন :—

ঈদৃশং বা প্রকাশত্বং তস্যার্থানুভবাত্মকম্।
নচাত্মানুভবোঽস্ত্যস্তেত্যাত্মনো ন প্রকাশকম্ ॥ ২০১৪ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানের এই প্রকাশাত্মকত্ব বলিতে আবার ইহাও বুঝাইতে পারে যে তদ্দ্বারা বহিরর্থেরও অনুভব ঘটিয়া থাকে; এবং জ্ঞানের যেহেতু আত্মানুভব সম্ভব নয় সেইহেতু জ্ঞান যে আপনারই প্রকাশক তাহা বলা যায় না।—কুমারিল এই সম্পর্কে চক্ষুর দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জ্ঞান আত্মপ্রকাশক না হইলেও বহিরর্থ সংবেদনে সমর্থ হইতে পারে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, জ্ঞান প্রথমে নিজেকে প্রকাশিত না করিয়া বহিরর্থ সংবেদনে সমর্থ হইবে ইহা কিরূপ কথা, তখন কুমারিল বলিবেন ভাবাবলীর কার্যাবলী স্বস্ব সামর্থ্যানুযায়ী প্রতিনিয়ত, তদ্বিষয়ে বিস্ময় বা আপত্তি প্রকাশ করা বাতুলতা (কা ২০১৬)।—কুমারিলের এই যুক্তি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

নন্ু চার্থস্য সংবিত্তির্জ্ঞানমেবাভিধীয়তে।
তস্যাং তদাত্মভূতায়াং কো ব্যাপারোঽপরো ভবেৎ ॥ ২০১৭ ॥

অর্থাৎ, অর্থের সংবিত্তির নামই হইল জ্ঞান; সুতরাং কুমারিল যে (২০১৩ সংখ্যক কারিকায়) বলিয়াছেন "জ্ঞান যখন বস্তুর গ্রহণে ব্যাপৃত থাকে ইত্যাদি" তাহা অসঙ্গত, কারণ অর্থবিত্তি জ্ঞান হইতে পৃথক্ কিছু নহে। অর্থবিত্তিই যখন জ্ঞান তখন জ্ঞানের তদ্ভিন্ন আর কোন্ ব্যাপার সম্ভব হইতে পারে?

কুমারিল (২০১৪ সংখ্যক কারিকায়) যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন :—

প্রকৃত্যা জড়রূপত্বান্নাস্যাত্মানুভবো যদি।
জ্ঞানসংবেদনাভাবাৎ পরার্থানুভবস্তথা ॥ ২০২১ ॥

অর্থাৎ কুমারিলের মতে জ্ঞান হইল জড়; কিন্তু তাহাই যদি হয় তবে জ্ঞানের পক্ষে আত্মানুভবও সম্ভব হইবে না; এখন যে-জ্ঞান স্বসংবেদনে অসমর্থ তাহা পরার্থ সংবেদনে সমর্থ হইবে কিরূপে?—পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন, একই জ্ঞানের দ্বারা যে বহিরর্থ গৃহীত ও সেই অর্থবিত্তি সংবেদিত হইয়া থাকে তাহা নহে; যে-জ্ঞানটি বহিরর্থ গ্রহণ করে সেইটি নিজে আবার আর একটি জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর :—

তজ্জ্ঞানজ্ঞানজাতৌ চেদসিদ্ধঃ স্বাত্মসংবিদি।
পরসংবিদি সিদ্ধস্তু স ইত্যেতৎ সুভাষিতম্ ॥ ২০২৪ ॥

অর্থাৎ, গ্রাহ্য বিষয়টি নিজে যখন গৃহীত হইতেছে তখন গ্রাহ্যবিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে

না অথচ গ্রাহ্যবিষয় বিষয়ক জ্ঞানটি যখন গৃহীত হইবে তখন গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে—ইহা সুভাষিতই বটে!—শান্তরক্ষিত এখানে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইল সহোপলম্ভ-বাদ (বস্তুর সংবেদন ও সেই সংবেদনের উপলব্ধির সহোৎপত্তি)।—তাহার উপর আরও বিবেচ্য প্রথম জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য যদি অপর এক দ্বিতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তবে দ্বিতীয় জ্ঞানটির সিদ্ধির জন্য পুনরায় এক তৃতীয় জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে না কেন? সুতরাং সহোপলম্ভ স্বীকার না করিলে অনবস্থা দোষ অপরিহার্য (বা ২০২৫)।—অনুরূপ আরও বহু যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া শান্তরক্ষিত প্রতিপন্ন করিলেন যে অনির্ভাসাদি ত্রিবিধ জ্ঞানের (কা ১৯৯৯) প্রথমটির দ্বারা বাহ্যার্থ গৃহীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় সনির্ভাস জ্ঞানও যে তথৈবচ তাহা দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে:—

অস্তু তাবৎ সসারূপ্যং বিজ্ঞানং বাহ্যবেদকম্।
তস্যাপি সর্বথাঽযোগান্ন যুক্তা বেদকস্থিতিঃ ॥ ২০৩৬ ॥

অর্থাৎ, নিরাকার জ্ঞানের দ্বারা না হয় বাহ্যবিষয় গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু গৃহীত বিষয়ের সহিত সারূপ্যবিশিষ্ট সাকার জ্ঞানও কি বাহ্যবিষয় গ্রহণে সমর্থ হইবে না? ইহার উত্তর, এই সাকার জ্ঞানকেও বেদক জ্ঞান বলা যায় না। কারণ সাকার জ্ঞান সর্বত্রই অলীক। কেন অলীক! তাহার উত্তর:—

জ্ঞানাদব্যতিরিক্তত্বান্নাকারবহুতা ভবেৎ।
ততশ্চ তদ্বলেনাস্তি নার্থসংবেদনস্থিতিঃ॥ ২০৩৭ ॥

অর্থাৎ জ্ঞানের এই তথাকথিত আকার যেহেতু জ্ঞানটি হইতে পৃথক্ কিছু নহে, সেইহেতু জ্ঞানের বহুধাকারত্ব সম্ভব নহে। বিচিত্র বর্ণের একটি আস্তরণ সম্মুখে থাকিলেও যেমন মানুষ আস্তরণটির বিবিধ বর্ণ লক্ষ্য না করিয়া সমগ্রটিকে "একটি" বর্ণের আস্তরণ বলিয়াই মনে করে, সর্ববিধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেইরূপ জ্ঞান হইতে পৃথক্ কোন জ্ঞানাকার সংবেদিত হয় না। সুতরাং জ্ঞান যে জ্ঞাতার্থের আকারের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা বলা যায় না। পরিশেষে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন:—

সর্বাত্মনা চ সারূপ্যে জ্ঞানেঽজ্ঞানাদিতা ভবেৎ।
সাম্যে কেনচিদংশেন সর্বং স্যাৎ সর্ববেদকম্ ॥ ২০৩৯ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞান যদি জ্ঞাতার্থের সহিত সম্পূর্ণরূপে সারূপ্যবিশিষ্ট হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না; আর অর্থজ্ঞান ও জ্ঞাতার্থের মধ্যে সারূপ্য যদি আংশিক হয় (এবং সেই আংশিক সারূপ্যের বলেই বলা হয় "এই জ্ঞানটি ঐ অর্থের") তাহা হইলে যে-কোন অর্থ সম্বন্ধে যে-কোন জ্ঞান স্বীকার করা হইবে॥ এই কারিকাটিতে বিজ্ঞানবাদ দর্শনের

একটি প্রধান তথ্য আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু শুষ্ক তর্কবিলাসী কমলশীল কারিকাটির উপর কোন মন্তব্য করেন নাই।

এইবার শান্তরক্ষিত তৃতীয় পক্ষ অন্যনির্ভাস (কা ১৯৯৯) খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

অন্যাকারমপি জ্ঞানং কথমন্যস্য বেদকম্।
সর্বঃ স্যাৎ সর্বসংবেদ্যো ন হেতুশ্চ নিয়ামকঃ ॥ ২০৪০ ॥

অর্থাৎ, গৃহীতার্থ হইতে পৃথক্ আকারের জ্ঞানের দ্বারা গৃহীতার্থ কিরূপে গৃহীত হইতে পারে? জ্ঞেয়ার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যদি বলা হয় যে জ্ঞান ভিন্নাকারের বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা হইলে সে-কথার অর্থ এই যে যে-কোন জ্ঞান যে-কোন বস্তুর সংবেদক হইতে পারে।—এইরূপে প্রমাণিত হইল যে নিরাকার, সাকার বা অন্যাকার এই কোন প্রকারের জ্ঞানের সহিত বহিরর্থের কোন বাস্তব সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। অথচ এই ত্রিবিধ জ্ঞান ভিন্ন বহিরর্থের আর কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে বহিরর্থ অসৎ। একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য।

মনসামঙ্গলের কবি সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ., তত্ত্বরত্নাকর

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বহু জাতীয় মঙ্গল কাব্য রহিয়াছে। এই সকল মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের কবির সংখ্যাই সর্বাধিক। এখন পর্যন্ত ১৪২ জন মনসামঙ্গল-কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ২৬৫ খানি মনসামঙ্গলের পুঁথি সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাদিতে ৬০ খানি মনসামঙ্গল পুঁথির অল্পবিস্তর পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। মনসামঙ্গল গ্রন্থ স্থলভেদে মনসার পাঁচালী, মনসার ভাসান, পদ্মাপুরাণ, অথবা মনসামঙ্গলোক্ত বিভিন্ন পালা বা অধ্যায়ের নামানুসারে প্রচলিত। যেমন "বাণযুদ্ধ" "উষাহরণ পালা", "ধন্বন্তরি পালা", "রাখাল পূজা পালা" ইত্যাদি। প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থাদি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল গ্রন্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পদ্মাপুরাণ নামে অভিহিত। রাঢ় অঞ্চলে পদ্মাপুরাণ নাম কচিৎ দৃষ্ট হইবে। এখানে মনসামঙ্গল নামেরই প্রাধান্য।

একই নামের একাধিক কবি লইয়া বাঙলা সাহিত্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। বাঙলা পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসসমস্যা অন্যতম জটিল সমস্যা। কাহারও মতে চণ্ডীদাস এক। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন তাঁহার বাল্যের রচনা—আমাদের বহুশ্রুত চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত কান্ত-মধুর পদাবলীসমূহ তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা। অপর পক্ষে অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাস পৃথক বলিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে চণ্ডীদাস নামক কবি নাকি দুইজনেরও অধিক ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও পদসাহিত্যে মতভেদ রহিয়াছে। বাঙলার প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ এবং মিথিলাধিপতি রাজার রামেশ্বর সিংহের মাতামহ-কুলজাত গোবিন্দদাস ঝার নাম সাদৃশ্যে উভয়ের পদ লইয়া বাঙলা ও মিথিলায় মতানৈক্য চলিয়াছে। মিথিলাবাসীরা বাঙালী গোবিন্দদাসের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অপর পক্ষে বাঙালীরা মৈথিল গোবিন্দ ঝাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও গোবিন্দ কবিরাজের শ্রেষ্ঠতম পদসমূহকে মৈথিল কবির বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

মনসামঙ্গল সাহিত্যেও এই নামসাদৃশ্য বশতঃ কবি বিভ্রাট অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যরসিকদিগকে অসুবিধায় ফেলিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস পৃথক ব্যক্তি। এই মতাবলম্বীরা "শ্রীকেতকানন্দ দাস সাহায্যে শ্রীক্ষেমানন্দ দাস কর্তৃক বিবিধ ছন্দে বিরচিত" বলিয়া মনসামঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। অপর পক্ষে কেহ কেহ ক্ষেমানন্দ নামধারী জনৈক কবি নিজকে কেতকাদাস অর্থাৎ মনসার দাস নামে অভিহিত করিতেছেন বলিয়া মনে করেন। আবার ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ নামক দুই কবির

অস্তিত্ব অনেকে স্বীকার করিতেছেন। বর্তমানে শুধু ক্ষেমানন্দ নামধারী একাধিক কবি থাকাও বিচিত্র নহে মনে হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শুধু ক্ষেমানন্দ নামধারী একাধিক কবির রচিত মনসামঙ্গলের প্রমাণও খানিকটা' পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রে একই পদের ভণিতায় বিভিন্ন কবির নাম দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এই সকল কবিতা বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা খাঁটি কবি নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। পদসাহিত্যের এই ভণিতা বিভ্রাটের কথা প্রাচীন সাহিত্যরসিক মাত্রই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন। স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত পদকল্পতরুর ২১৮৯ সংখ্যক শেখরের পদের পাঠান্তরে "কবিরঞ্জনের" নাম আছে, তদ্রূপ ২২৫০ সংখ্যক পদ কোন কোন পুঁথিতে "নটবরের" ও কোন কোন পুঁথিতে "বলরামের" নামে পাওয়া যাইতেছে। এই ভণিতা বিভ্রাটের ফলে যে কবিবিভ্রাট তাহা মনসামঙ্গল সাহিত্যেও বিশেষভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

হস্তলিখিত একাধিক পুঁথির ভণিতা বিভ্রাট লইয়া আলোচনা করিলে অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল পুঁথি মিলাইয়া দেখা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভবপর হইবে না মনে করিয়া তিনখানি মুদ্রিত মনসামঙ্গল গ্রন্থের ভণিতা লইয়া নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম। মুদ্রিত গ্রন্থত্রয় যথাক্রমে 'ক', 'খ', ও 'গ' অক্ষর দ্বারা নির্দেশ করা হইল।

'ক'—ইহা ১৩০১ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণান্তর্গত।/ বাইশ কবি মনসা।/ শ্রীনবীনচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। / চট্টগ্রাম ভারতী যন্ত্রে শ্রীগুরুপ্রসন্ন সেন দ্বারা মুদ্রিত। / চট্টগ্রাম আন্দরকিল্লা বিশ্বাস কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।/Price 1½ Rs. মূল্য ১।৷৹ টাকা মাত্র।/ এক ব্যক্তি এক সঙ্গে ১০ খানা কি ততোধিক পুস্তক নগদ মূল্যে ক্রয় করিলে উচিত কমিসন দেওয়া যাইবে।/" পৃ° ৩+১৶০+৬৭২ ; আকার ১১½"×৪¾" ইঞ্চি।

'খ'—ইহা ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"বাইশ কবি মনসা।/ শ্রীচন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক/ সংগৃহীত ও প্রকাশিত/ তৃতীয় সংস্করণ।/ কলিকাতা।/ ফকিরচাঁদ চক্রবর্তীর লেন, ৩০নং ভবনে "হারমোনিয়াল যন্ত্রে"/ শ্রীঅমূল্য রতন ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত।/ সন ১৩১৮ সাল।/ মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।/ এই পুস্তক/ চট্টগ্রাম সাধারণ যন্ত্রে/শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর/নিকট পাওয়া যায়।/ নগদ মূল্যে একত্রে/১০খানা লইলে কমিশন দেওয়া যায়।/" পৃ° ।/০+১৲+৬০৮ ; আকার ১০½"×৪" ইঞ্চি।

"গ"—ইহা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। নিম্নে এই গ্রন্থের আখ্যাপত্র উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীশ্রীপদ্মপুরাণ বাইশ কবি মনসামঙ্গল।/ অর্থাৎ/ শিব-নন্দিনী মনসার জন্ম কর্মাদি এবং চান্দ সদাগরের সহিত বাদ বিসম্বাদ ও বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের জীবন-বৃত্তান্ত ঘটিত পদ্মা-পূজা প্রকরণ।/ বাইশজন প্রসিদ্ধ কবি কর্তৃক বিরচিত।/ শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত ও /শ্রীশশিভূষণ দেব কবিরঞ্জন কর্তৃক সংশোধিত।/ ঢাকা মোগলটুলী পুস্তকালয় হইতে/শ্রীসীতানাথ

পাল কর্তৃক প্রকাশিত ।/ ৩য় সংস্করণ । ১৩৩৪ সাল ।/ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র ।/" পৃ০ ১৲+ ৩১৮, আকার ১০″×৪½″ ইঞ্চি ।

'ক' ও 'খ' গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। 'গ' গ্রন্থ আমাদের পারিবারিক "সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারের সচ্চিদানন্দ সংগ্রহে" আছে। 'গ' গ্রন্থের একাধিক পরবর্তী সংস্করণ এখনও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। 'ক' ও 'খ' গ্রন্থ মূলতঃ অভিন্ন, শুধু বহু ক্ষেত্রে মোট ২৩০টী পদে ভণিতার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 'গ' গ্রন্থের ভণিতার সহিত 'ক' গ্রন্থের মাত্র ২টী ভণিতার ও 'খ' গ্রন্থের ১০২টী ভণিতার মিল আছে। একটী পদে 'ক' 'খ' ও 'গ' গ্রন্থের কোনটীরই ভণিতার মিল নাই। নিম্নে 'ক', 'খ' ও 'গ' গ্রন্থের এই পদটীই উদ্ধৃত হইল। এই পদ হইতেই ভণিতা পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। উদ্ধৃত কবিতাটী 'ক' ও 'খ' গ্রন্থে একইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। শুধু 'ক' গ্রন্থের—

"কবি বিশ্বেশ্বর দেব ভাবি বিষহরী।
বসন দানেতে বলে একটা লাচাড়ী।" পৃ০ ৬১৪

পংক্তিদ্বয়ের পরিবর্তে 'খ' গ্রন্থে নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় পাইতেছি—

"কবি রমাকান্ত বলে ভাবি বিষহরী।
বসন দানেতে বল একটা লাচাড়ী ॥" পৃ০ ৫৫৬

'গ' গ্রন্থে এই বিষয়টীই সামান্য ভিন্ন আকারে ভিন্ন কবির নামে মুদ্রিত হইয়াছে। নিম্নে 'ক' ও 'গ' গ্রন্থ হইতে এই পদটী যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

"ক"

পদ্মা কর্তৃত লক্ষীন্দরের প্রাণদান ও গায়ক কর্তৃক দান মাহাত্ম্য বর্ণন।

ধুয়া। গৌরাং গুণমণি আমার কৃষ্ণ গুণমণি।
পাসরিতে নাহি পারি, মুখের হাসনি ॥
পয়ার। কহিতে লাগিল পদ্মা, দেবের গোচরে।
বিপুলা করিল সত্য সভার ভিতরে ॥
আমাকে লইয়া যাবে চম্পক নগর।
পূজিবেক লক্ষ বলি দিয়া সদাগর ॥
এত শুনি দেবগণ লাগে বলিবারে।
শুনিছি সকল বাক্য জীয়াও সত্বরে ॥
দেবগণ পদে পদ্মা করি নমস্কার।
জীয়াইতে লক্ষীন্দরে হল আগুসার ॥

যে বোয়াল ভিতরে রাখিয়া লক্ষীন্দরে।
পদ্মাবতী প্রবেশিল তাহার ভিতরে ॥
ব্রহ্মমন্ত্র জপি পদ্মা আরম্ভিল ধ্যান।
শিবের চরণ বন্দি পড়ে মহাজ্ঞান ॥
ধ্যান করি বিষহরি মারিল হুঙ্কার।
লক্ষীন্দর পঞ্চপ্রা· হ'ল আগুসার ॥
মূল মন্ত্র পড়ি পুনঃ মারিল চাপড়।
উঠি বসে লক্ষীন্দর যেরার ভিতর ॥
নাগকন্যা লক্ষীন্দর দেখে চক্ষু মেলি।
পুনরপি কালকূটে পড়িলেক ঢলি ॥
এক হাতে ধরে নেতা দেবের কুমারী।
আর হাতে ধরে তার বিপুলা সুন্দরী ॥
সমস্ত শরীর তার বসনে ঢাকিয়া।
ঝাড়িতে লাগিল পদ্মা আগম পরিয়া ॥
উভনালে নাম বিষ হরিদ্রা বরণ।
পড়িয়া ভ্রমরা মন্ত্র ঝাড়িল লোচন ॥
শূন্যে উপজিল বিষ শূন্যে বিনাশিয়া।
রাউলে যাইল বিষ চাউলে মাখিয়া ॥
উখুয়া ঢলিলে তার, নারী কান্দে রায়।
বাহিরাও কালকুট মনসার রায় ॥
নাম নাম ওরে বিষ ত্রিবেণীর দ্বারে।
ত্যজিয়া সৃষ্টির ঘর নাম হুহুঙ্কারে ॥
শূন্যে তোর ঘর থান শূন্যেতে পসার।
শূন্যমধ্যে কালকুট, জনম তোমার ॥
বাহিরাও কালকুট মনসার র'য়।
যে জন দিয়াছে বিষ সেই লয়ে যায় ॥
তুড়ী তালী দিয়া বলে আস্তিকের মাতা।
উড়ি যাও কালকুট, জন্মিয়াছ যথা ॥
মন্থনে ক্ষীরোদ সিন্ধু, মন্দারের লড়ি।
তা হাতে বাসুকী হল ছাঁদনের দড়ী ॥
টানিতে বাসুকি নাগ ছাড়িল নিশ্বাস।
এড়িলেক কালকুট হইয়া হুতাশ ॥

এই বিষ খেয়ে পিতা শঙ্কর ঢলিল।
গঙ্গা দুর্গা দুই ভার্য্যা ডরে পলাইল ॥
কেশে ধরি বলে দিয়া ধর্ম্মের দোহাই।
দেখ দেখ লক্ষীন্দর অঙ্গে বিষ নাই ॥
পদ্মার হুঙ্কারে বিষ পাতালে নামিল।
বিছানাতে লক্ষীন্দর উঠিয়া বসিল ॥
অমৃত নয়নে পদ্মা চক্ষে দিল চুম।
দুই চক্ষু প্রকাশিল, ভাঙ্গে কালঘুম ॥
চারিভিতে দেখিলেক দেবের সমাজ।
পরিধান নাহি, লক্ষীন্দর পায় লাজ ॥
বস্ত্রহীন লক্ষীন্দর উলঙ্গ হইয়া।
বিপুলার আড়ে গিয়া রহে লুকাইয়া ॥
বিবসন লক্ষীন্দর সভার ভিতর।
একালে গায়কে পায় প্রমাদ কাপড় ॥
এ সময়ে সকলেরে পদ্মা দেন বর।
যার যেই মনবাঞ্ছা হ'ক লঙ্কেশ্বর ॥
বিষহরি বর দেন সভায় সকলে।
যার যেই মনবাঞ্ছা থাকুক সকলে ॥
উত্তম, মধ্য, মাধম এই তিন প্রকার।
দান দ্বারা জানি এই তিনের বিচার ॥
যার পূর্ব্ব বংশাবলী করিয়াছেন দান।
কদাচ না ঘুচে তার দানের বাখান ॥
থাকিতে না করে দান, ভোগ নাহি করে।
সর্ব্বলোকে অধম পুরুষ বলে তারে ॥
আপনে যে ভোগ করে পরে করে দান।
সে জন মধ্যম বলি সংসারে বাখান ॥
শক্তি অনুরূপদান যেই জন করে।
শ্রদ্ধা ভক্তি করি দিলে লক্ষ গুণে বাড়ে ॥
মহাদানী হরিশ্চন্দ্র জন্ম সূর্য্যবংশে।
দান ফলে পুরিসহ গেল স্বর্গবাসে ॥
সাবধানে শুন লোক দানের শকতি।
দান ফলে সর্ব্বলোকে খণ্ডয়ে দুর্গতি ॥

স্ত্রী-পুরুষ যত জন বসেছ সভায়।
সকলের কল্যাণ করুন মনসায়॥
কার নাম জানি আমি, কার নাহি জানি।
সকলে কল্যাণ কর মনসা ব্রাহ্মণী॥
এতেক শুনিয়া দান না করে যে জন।
স্বর্গেতে না যায় কভু সেই পাপী জন॥
কবি বিশ্বেশ্বর দেব ভাবি বিষহরি।
বসন দানেতে বলে, একটা লাচাড়ী॥

পদ্মা কর্তৃক লক্ষ্মীন্দরের প্রাণদান এবং গায়ক কর্তৃক দান মাহাত্ম্য বর্ণন।

ধুয়া।　　গৌরাঙ্গ গুণমণি আমার কৃষ্ণগুণমণি।
　　পাসরিতে নাহি পারি মুখের হাসনি॥

পয়ার।　　বিপুলার সত্য শুনি যতেক অমরে।
　　একবাক্যে বলে জীয়াইতে লক্ষ্মীন্দরে।

দেবগণ পদে পদ্মাকরি নমস্কার।
জীয়াইতে লক্ষ্মীন্দরে হৈল আগুসার॥
ঘেরোয়াল ভিতরে রাখিয়া লক্ষ্মীন্দরে।
পদ্মাবতী প্রবেশিলা তাহার ভিতরে॥
ব্রহ্মমন্ত্র যপি পদ্মা আরম্ভিল ধ্যান।
শিবের চরণ বন্দি পড়ে মহাজ্ঞান॥
ধ্যান করি বিষহরি মারিল হুঙ্কার।
লক্ষ্মীন্দর পঞ্চপ্রাণ হৈল আগুসার॥
মূলমন্ত্র পড়ি পুনঃ মারিল চাপড়।
উঠি বসে লক্ষ্মীন্দর ঘেরার ভিতর॥
নাগকন্যা লক্ষ্মীন্দর দেখে চক্ষু মেলি।
পুনরপি কালকূটে পড়িলেক ঢলি॥
এক হাতে ধরে নেতা দেবের কুমারী।
আর হাতে ধরে তার বিপুলাসুন্দরী॥
সমস্ত শরীর তাঁর বসনে ঢাকিয়া।
ঝারিতে লাগিল পদ্মা আগম পড়িয়া॥
উভনালে নাম বিষ হরিদ্রাবরণ।
পড়িয়া ভ্রমরা মন্ত্র ঝাড়িল লোচন॥
শূন্যে উপজিল বিষ শূন্যে বিনাশিয়া।
যাউলে খাইল বিষ চাউলে মাখিয়া॥
উথুয়া ঢলিলে তার নারী কান্দে রায়।
বাহিরাও কালকূট মনসার রায়॥
নাম নাম ওরে বিষ ত্রিবেণীর দ্বারে।
ত্যজিয়া সৃষ্টির ঘর নাম হুহুঙ্কারে॥
শূন্যে তোর ঘরখান শূন্যেতে পসার।
শূন্য মধ্যে কালকূট জনম তোমার॥
বাহিরাও কালকূট মনসার রায়।
যে জন নিয়াছে বিষ সেই লয়ে যায়॥
তুড়ি তালি দিয়া বলে আস্তিকের মাতা।
উড়ি যাও কালকূট জন্মিয়াছ যথা॥
মন্থনে ক্ষীরোদ সিন্ধু মন্দারের লড়ি।
তাহাতে বাসুকী হৈল ছাঁদনের দড়ি॥
শূন্যের হাটখানি শূন্যেতে বাজার।
শূন্য মধ্যে কালকূট জনম তোমার॥
মাও নাহি বাপ নাহি শূন্যেতে উৎপত্তি।
অযোনি সম্ভবা বিষ ছাড় শীঘ্রগতি॥
অমৃত নয়নে পদ্মা কৈল বরিষণ।
ভাঙ্গিল চক্ষুর ঘুম মেলিল নয়ন॥
চক্ষু মেলি দেবসভা দেখে বিস্ময়মান।
লজ্জিত হইল লখাই নাহি পরিধান॥

বেহুলার বসন আড়ে লুকাইতে চায়।
এই কালে গায়কে উত্তম বস্ত্র পায়॥
বিবস্ত্রে রহিল লখাই সভার ভিতর।
এই কালে বস্ত্র দিলে পদ্মা দেন বর॥
বিবস্ত্র দেখিয়া তবে দেব মহেশ্বরে।
অর্দ্ধেক কৌপিন চিরি দিলা লক্ষ্মীন্দরে॥
দাঁড়াইল লক্ষ্মীন্দর কৌপিন পরি।
ব্রহ্মা দান করিলেন গায়ের উত্তরী॥
বিষ্ণু দিলা পীতাম্বর ছিঁড়ি অর্দ্ধখানি।
চণ্ডিকা দিলেন তায় গায়ের উড়ানী॥
পদ্মা দিলা পাটাম্বর বাঁধিয়া মাথায়।
আর যত দেবগণ দিল গায় গায়॥
লক্ষ্মীন্দরে সাজাইয়া বস্ত্র আভরণে।
পুষ্পমালা চন্দন পরায় জনে জনে॥
লক্ষ্মীন্দর দেখি সব মানিলা বিস্ময়।
বেহুলারে পুনঃ পুনঃ কত জিজ্ঞাসয়॥
দ্বিজ বংশীদাসে পদ্মার গুণ গায়।
সবার কল্যান করুণ জয় পদ্মা মায়॥

পৃঃ ২৯৯—৩০০

(ক্রমশঃ)

ভাব-সম্মিলন

—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দৃষ্টিতে

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র মিত্র, এম্. এ.

দেহের বিলাসকে ভিত্তি করিয়া নহে, তত্ত্ববিলাসের উপর চির-প্রতিষ্ঠিত রাধা-কৃষ্ণের অমানবীয় প্রেমাঙ্কুরের নিত্য নব উন্মেষ মহাকবি চণ্ডীদাস মরমী পাঠককে তাঁহার আপনার কাব্যকুঞ্জে লইয়া দেখাইয়াছেন। গোষ্ঠবিহার, দৌত্য, অভিসার, মান, প্রবাস, মাথুর প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কবি চলিয়াছেন খণ্ডমিলন হইতে শাশ্বত মিলনের রাজ্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম প্রকাশ পূর্বরাগের বর্ণচ্ছটায়, আর শেষ ভাব-সম্মিলনের ব্রজপুরী কাঁদাইর সমাহিত সৌন্দর্যে কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাধার প্রাণের অন্দরে এখনও সেই কুলভাঙা বাঁশীর সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ফিরিতেছে, সেই কালরূপের আকর্ষণ এখন দুর্বার হইয়া পড়িয়াছে—"কানু-পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে।"—কালার রূপগুণের প্রসঙ্গ ছাড়া এক তিলের জন্যও প্রাণে বাঁচা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দশমী দশা এখন অবসর পাইয়াছে। এতদিনে রাধার ব্যাকুলতা প্রিয়গৌরবে আত্মহারা হইয়া তাহাকে ধ্যানস্তব্ধ করিয়াছে; অরুণোদয়ের আর বিলম্ব নাই। বিরহের সুদীর্ঘ রজনীর নিভৃতে যে গিরিসরিতের জন্ম হইয়াছিল, এখন রজনী অবসানে সেই ক্ষীণকায়া প্রবলা হইয়াছে,—রাজার রাজা যিনি, তাঁহারই প্রয়োজনে সে আকুল-করা জলসম্ভার বহিয়া, জনপদ বহাইয়া চলিয়াছে। মহাভাবময়ীর একনিষ্ঠ সাধনা বলিয়া উঠিল—

"কাননে রহব একা, না হবে কাহারে দেখা,
থাকি যেন যোগীর ধেয়ানে"।[1]

এই যোগিনী-সুলভ সঙ্কল্পেরও যেন সাফল্য আসিয়া পড়িয়াছে,—

"আমি যে তার গান শুনেছি
মনের গোপনে।"

এই আভাস পাইয়াই বিরহক্লিষ্টা উৎফুল্ল হইয়া নিবেদন করিল ;

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব।
কপাল কহিয়া গেল॥

১। আহারে বিরতিঃ সমস্ত বিষয় গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদেকতানং মনঃ।
মৌনং চেদমিদং চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি।—অজ্ঞাত (পদ্যাবলী, ২৩৮(

প্রসন্ন বিধাতা আজ ইঙ্গিতে আমাকে জানাইয়াছেন, সুদিনের আর বিলম্ব নাই আমার মাধব আমার মন্দিরে আসিতেছেন। চারিদিকে নানা শুভ লক্ষণ। প্রভু কি না আসিয়া পারেন? আকাশে বাতাসে তাঁহার জন্য মাঙ্গলিকীর অনুষ্ঠান সুরু হইয়াছে, তাঁহার গোপনে আসা আজ আমার কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এবার প্রাণবঁধু আসিলে তাঁহাকে

'মরম যেখানে রাখিব সেখানে'—

কি জানি বাহিরে রাখিতে ভয় করে, বিশ্বাস করিয়া চোখ ফিরাইতে পারি না, পাছে তিনি চলিয়া যান! ঘরের বাহিরে ওই তাঁহার পায়ের শব্দ!

ভাবাত্মক কৃষ্ণ আসিয়াছেন। বিদ্যাপতি রাধিকাকে বলাইলেন—

চিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল।
পিয়া পরসাদে ভেল অনুকূল॥

*   *   *

জনি বনজানলে দগধ পরাণ।
ঐসন হোয়ল অমিয়া-সিনান॥

—চির প্রতিকূল বিধি প্রিয়ের প্রসাদে আজ অনুকূল হইল।...দাবদগ্ধ প্রাণ যেন আজ অমৃত সরোবরে এইরূপে স্নান করিল।

মাথুরে রাধিকার যে আকুলতা দেখিয়াছি তাহা অপূর্ব। সমস্ত প্রকৃতিই তাহার নিকট বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—

বিরহ-আগুন হিয়ার ভিতরে
কি করে মলয় রাজে।[১]

মন একান্ত অধীর। কখনও বা ব্যাকুল হৃদয়ে সুমধুর প্রতিশোধের বাসনা জাগিয়া উঠে—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

মরণকালের কামনা নাকি পূর্ণ হয়। বিরহ যাতনা কি গভীর, তাহা বিদ্যাপতিও অনুরূপ ভাষায় জানাইতে চাহেন—

১। জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগিরে।
জা লাগি দখিন পবন ভেল সারক
মদন বৈরি জা লাগি রে॥
—বিদ্যাপতি।

হাম সায়রে তেজব পরাণ।
আনি জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহ বাধা॥

একমাত্র তখনই কৃষ্ণের এই হৃদয়-কোরক লইয়া যথেচ্ছ ক্রীড়ার অবসান হইবে। গোবিন্দদাস আবার ক্ষণে ক্ষণে নূতনতর কামনা দিয়া তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন।—

যাহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হোই মঝু গাত॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হোই তছু মাহ॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তছু মাহ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝ অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥

অরুণচরণে প্রভু যে সকল স্থান দিয়া চলিয়া যান, আমার গাত্র যেন সেই সেই স্থানের মৃত্তিকায় পরিণত হয়। যে দর্পণে প্রভু মুখ দেখেন, অঙ্গের অঙ্গ যেন জ্যোতি হইয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লয়। যে সরোবরে প্রভু নিত্যই স্নান করেন, আমার অঙ্গ যেন তাহার সলিল হইয়া যায়। জলধর-শ্যামল প্রভু আমার যেখানে যেখানে বিহার করেন, অঙ্গ যেন আকাশ হইয়া সেই সেই জায়গায় তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে। প্রিয়স্পর্শ পাইবার জন্য কত উদ্বেগ! কি সুন্দর আকুতি! জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই;—অসীম অনুরাগের সূত্রে গাঁথা এই প্রার্থনায় অত্যাচারী প্রেমিকের বিরুদ্ধে এতটুকুও অনুযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এই মাথুরের পরেই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল গতিতে ভাবসম্মিলনের আবির্ভাব,—সাধনার পরেই সিদ্ধি।

বসন্তের মদির হাসি, বর্ষার করুণ উচ্ছ্বাস, এ সকলের অবসানে এখন প্রশান্ত শারদশ্রী আসিয়া বিশ্বের দরবারে আসন লইয়াছে। রামগিরি হইতে যে চঞ্চল বিচিত্র যাত্রার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এতদিনে অলকায় আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। পূর্বরাগে আমরা রাধার কপোলে লজ্জার চপল ছায়া দেখিয়াছি। বিরহে, প্রবাসে এবং মাথুরে অশ্রুর বর্ষা ধারায় সেই গণ্ডযুগল নিরন্তর অভিষিক্ত হইয়াছে। এখন ভাবসম্মিলন-খণ্ডে কবি ভোগ্যতত্ত্ব এবং ভোক্তার—জীব ও ভগবানের মিলন দেখাইয়াছেন। এই অংশে চণ্ডীদাস ভাবতান্ত্রিক। এ সম্মিলন মাত্র দেহাতিগ দুইটী ভাবে।. বাহিরের জগৎ তাহাদের নিকট হইতে এইবার বিদায় লইতে চলিয়াছে।

আমরা জানি, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া আর ব্রজধামে স্থূল সত্তায় ফিরিয়া আসেন নাই। বৈষ্ণব-গ্রন্থে আছে, বৃন্দাবণ্যে নিরন্তর রাসাদি লীলা দ্বারা বিহারপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবী (ব্রজগোপিকা)-গণের কখন বিরহ হয় নাই। শুধু প্রকটলীলায় অক্রূরের অনুরোধে মথুরায় গিয়াছেন ; নিত্যলীলায় বৃন্দাবনে সর্বদাই অবস্থান করিতেছেন। এই জ্যোতির্ময় বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন আবাস। তিনি সকল সখা সখীর সঙ্গে নিয়ত বিহার করিতেছেন। এখানে গোপকন্যারা যোগিনী হইয়া তাঁহার সেবায় নিরত। এই লীলা চর্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ইহা ধ্যানগম্য। তাঁহার কৃপালেশের অধিকারী হইলেই ইহা জানিতে পারা যায়। দুজ্ঞের্য় রহস্য বলিয়া জানিতে পারিলেও কেহ এই নিত্যলীলার কথা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া যান নাই। যাহা একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়, তাহাকে দশজনের সমক্ষে রূপ দেওয়া যায় না।[১]

"হৃদয়েব অন্তস্তলে যে মণি গোপনে জ্বলে,
সে মাণিক কখন বাজারে বিকায় ?

তাই সাধক হৃদয়ের ধন হৃদয়েই চাপিয়া রাখেন।

ভাবসম্মিলনের বৃন্দাবন মৃণ্ময় নহে, চিন্ময়। গভীর দুঃখ সহিয়া সহিয়া রাধা আজ ধ্যানমগ্না। ভবভূতি যেমন লিখিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যান কবিতে করিতে প্রোষিত প্রিয়জন যেন কল্পনায় গড়া নূতনতররূপে সম্মুখে অবস্থান করে। কাজেই প্রবাসগতও যে আশ্বস্ত করে

১। "বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোঽস্তি ন কর্হিচিৎ ॥"
—উজ্জ্বল নীলমণি (সংযোগবিয়োগস্থিতি, ১)।

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
... ...
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা।"
—বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্র।

"গো-গোপ-গোপিকা-সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।"
—পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড।

"বৃন্দাবনে মুকুন্দস্য নিত্যলীলা বিরাজতে।
স্পষ্টমেবা রহস্যত্বাৎ জানদ্ভিরপি নোচ্যতে। ৩১২ ক।
... ...
তাভির্নিত্যবিহারমেব তনুতে বৃন্দাবনে মাধবঃ"
... ... ৩১২ খ।
—ডক্টর সুশীল কুমার দে-সম্পাদিত পদ্যাবলী।

না, এখন নহে।[১] ছায়া আজ কায়ায় পরিণত হইয়াছে। বিরহ সাগরের অপর পার হইতে তাহার ধ্যানের ছবি তাহার নিকট বাস্তবে দাঁড়াইয়াছে। ভাব আর বস্তুতে এখন পার্থক্য নাই। নাই বলিয়াই ভাবসম্মিলনের পদগুলিতে সাক্ষাৎ সম্ভোগের কথা সাক্ষাৎ ভাষায় লিখিতে হইয়াছে। ভক্তের ক্রন্দন এতদিনে সফল হইল। নিভৃত প্রাণের অন্তর হইতে ভগবান ভক্তকে ডাকিয়াছেন, সে ডাক উপেক্ষা করা চলে না। বাহিরের বিরহ এখন আর প্রাণ কাঁদায় না। "একঃ স এব সঙ্গে ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।"[২] মিলন-বেলায় সে একক, তাহার সত্তা পরিচ্ছিন্ন; আর বিরহে ত্রিভুবন ছড়াইয়া থাকে, সর্বত্র তাহার সঙ্গে অনুভব করা যায়। এই অনুভবের পর ভক্ত আরাধ্যকে অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠে,—

"একদিকেতে ভাসাও আঁখিজলে
আরেক দিকে জাগিয়ে তোলো হাসি।"[৩]

হাসিকান্নার ধন এমনি করিয়াই মানুষের মুখে ইন্দ্রধনুর শোভা দেখিতে চাহেন। এমনই সজল হাসির বিচিত্রতায় তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে চাহেন। তারপর তাঁহাদের ভাবাম্বিকা লীলার সূত্রপাত।

বিদ্যাপতি স্বপ্নে প্রিয়-সমাগমের কথা তুলিয়াছেন। এই স্বপ্নে গতাগতি অতি মধুর। এখানে বহির্জগৎ হইতে বাধা পাইবার ভয় নাই—লোকলজ্জা, গুরুজন গঞ্জনা, সবই এখানে পরাহত। অতি সহজেই স্বপ্ন সম্ভোগ চলিয়াছে। "নাগর রাজ" স্বপ্নে আসিয়া রাধাকে কতই সোহাগ করিলেন, রাধাও সখীকে সোহাগের বার্তা জানাইল।

আনন্দে নোরে নয়ন ভরিয়া গেল।
পেমক আঁকুরে পল্লব দেল ॥

আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভরিয়া গেল, প্রেমের অঙ্কুর পল্লবে পরিণত হইল।

চণ্ডীদাস স্বপ্নের আশ্রয় লইতে চাহেন নাই। সাধারণভাবেই রাধাকৃষ্ণের আনন্দঘন চিত্র আঁকিয়া তাহাকে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছেন। রাধা ভাবনয়নে দেখিতেছে—তাহারই ভক্ত কৃষ্ণ ঘনবর্ষা মাথায় করিয়া আসিয়া অঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তারপর কিঞ্চিৎ বিলম্বে

১। চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্মায় পুরতঃ
প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ ॥
... ...
—উত্তররামচরিত, ৬।৩৮

২। পদ্যাবলী, শ্লোক ২৩৮।

৩। গীতাঞ্জলি, গানসংখ্যা ১১০

বাহিরে গিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া কত বিনয়-বচন শুনাইতেছে। আবার কৃষ্ণ এই কষ্ট পাওয়ায় তাহার আত্মগ্লানিও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা প্রেমের একটী সুন্দর চিত্র। কিন্তু কৃষ্ণের এই আগমন বহুদিন পরে।—

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলন ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস।

বিচ্ছেদের একমুহূর্ত ও শতবর্ষ বলিয়া বোধ হয় না কি ? কৃষ্ণের বিহনে যে রাধাকে একদা বলিতে হইয়াছিল—"গতো যামো গতৌ যামৌ গতা যামা গতং দিনম্।"[১] এক প্রহর চলিয়া গিয়াছে, দুই প্রহরও কাটিয়া গেল—ক্রমে তিন প্রহর—তারপর দেখিতে দেখিতে একটী দিনের অবসান হইল—হায়, কৃষ্ণ যে এখনও আসিলেন না ? সেই রাধা যে বহুদিন পরে প্রাণবঁধুকে পাইয়া অন্তরে উল্লাসিত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—ইহা প্রেমের সাধারণ সূত্রানুসারেই হইয়া থাকে। হৃদয়-সন্নিহিত দয়িতকে পাইয়া আজ রাধার হৃদয়ে সঞ্চিত কথার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
এতেক সহিল অবলা বলে
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

জন্মদুঃখিনীর দুঃখের ব্যাপকতা, গভীরতার কি অন্ত কথায় সম্ভব ? কেমন ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়া অন্তরের ব্যথা নিবেদন। নিমেষের মধ্যে সরলা সকল মর্মান্তিক দুঃখ ভুলিয়া গেল। প্রিয়জনের আনন্দে নিজে বিভোর হইয়া রহিল। এই প্রকার মান-অভিমান-ভোলা আত্মহারা ভাব গীতগোবিন্দেও কিছু দেখা যায়।[২] জানেনা বলিয়াই রাধা নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া বিশেষিত করিয়াছে। প্রিয়তম আসিবেন বলিয়া বিদ্যাপতির রাধা চপল ভঙ্গীতে বলিতেছে—

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া
পলটি চলব হাম ইষত হসিয়া ॥ (ক্রমশঃ)

১। পদ্যাবলী, শ্লোক ৩২০, (শঙ্কর বিরচিত)

২। হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ।
কুবলয়ভূমাং বামঃ কামো নিকাম-নিরঙ্কুশঃ ।—গীতগোবিন্দ, ৭।৩০

লেখমালায় সরস্বতী

স্বর্গত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

নদীরূপা

নদীরূপা সরস্বতীর উল্লেখ নানা শিলালেখ ও তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়। স্থানাভাব-বশতঃ নিম্নে মাত্র কয়েকটীর উল্লেখ করা হইল :—

১। সারঙ্গদেবের রাজত্বকালেব চিত্র প্রশস্তিতে পাওয়া যায়—

সরস্বতীসাগরসংপ্রযোগবিভূষিতাভোগমথাগমস্তঃ।

সোমেশচুডাবলমানবালচন্দ্রপ্রভাসং বলিতং প্রভাসং। ৩১ শ্লোক

—Epigraphia Indica, Vol I, p 283.

ত্রিপুরান্তক শেষে উত্তর পশ্চিমে ফিরিয়া গিয়া দেবপত্তন বা প্রভাসে আগমন করেন। এখানে সরস্বতী সমুদ্রাভিমুখিনী। প্রভাস = দেবপত্তন = সোমনাথপত্তন। দেবপত্তন কাঠিয়াবাড়ের শৈবতীর্থ।

২। কনৌজের মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালের পেহোয়া (Pehoa) প্রশস্তি স্রকৃধরাছন্দে বলিতেছেন—সরস্বতীর (সুন্দর) জলপ্রবাহ তোমাদের দুরিত দূর করিয়া ফেলুক। ভবার্ণবতরণে এই স্রোত নৌকাস্বরূপ, সুরপথগমনে ইহা স্যন্দনস্বরূপ, প্রলয়কালীন বহ্নিবর্ষী এবং পঙ্কবিধ্বংসী ভানুস্বরূপ যিনি নানা ব্যাধিরূপ প্রচুরতর তম নাশ করেন।

— — ᴗ ৎপৌ সুরপথগমনে স্যন্দনস্সাধু [বর্গ] — — — —া ত বহ্নে ᴖ প্রলয় জলধর সম্পৎসান্দ্রাধরঃ। নানাব্যাধি প্রবন্ধ প্রচুরতর তম ᴖ পঙ্ক বিধ্বংসভানুর্নীরন্ধ্রৈতৎ সমস্তাত্তু দুরিত ᴗ— — ᴗ [স] ারস্বতং বঃ। ৪

৩। পূর্ণপালের বসন্তগঢ় লিপিতে বটপুরের অবস্থিতি সরস্বতী নদীর উপর বলিয়া অঙ্কিত।—Ep. Ind. Vol 9. p 12.

ইন্দ্রস্থানমিবাপরং বটপুরং ক্ষৌণীতলে সংস্থিতম্। ২৩

স্বরুন্দাতা যত্র সরিৎ-সরস্বতী স্বপানপর্ত্তীক নৃণাম্। ২৪

দেবীরূপা

১। ওঁ॥ বং দে সরস্বতীং দেবীং যাতি যা ক [ব] মানসং নী [যমা] না

[নিজেনে] ব [যানমা] নস [ব] া সি [া।]। ১ যঃ [ক] া ংতি যা [নপ্য] ক [পঃ

পকীপে শাং তোপি দীপ্ত]ঃ স্মরনিগ্রহায়। নিমীলিতাক্ষো [পি সম] প্রদর্শী

[বাত] নুজঃ॥

* * * *

দেবী সবোজাসনসং ভবাং কিং কামপ্রদা কিং স্তবসৌরভেয়ী।

প্রহ্লাদনাকারধরা ধরা যামাযাতবত্যেব ন নিশ্চয়ো মে ॥ ৩৯ শ্লোক

আবুলিপি—Ep. Ind. vol viii, p. 216

* * * *

৩°। আমি কবিমানসগামিনী সরস্বতীকে বন্দনা করি যিনি নিজ যানরূপমানস দ্বারা নীতা।

দেবী সবোজাসন-(ব্রহ্মা) সম্ভূতা অথবা ধরাধামাগতা

প্রহ্লাদন-আকৃতিধরা কামপ্রদা স্তবসৌরভেয়ী।

—দেবপাল ও ২য় জয়বর্মার মান্ধাতা লিপি।

২। কাব্যগংধর্ব সর্বস্বনিধিনা

যেন সাং প্রতং। ভাবাবতরণং দেব্যাশ্চক্রে পুস্তকবীণয়োঃ। ১৮

—Ep. Ind. vol 9. p 109.

কাব্য-গন্ধর্বনিধি অর্জুন সম্প্রতি দেবীকে (সরস্বতীকে) তাঁহার পুস্তক ও বীণার ভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

৩। প্রোলের (Prola) অম্মকোণ্ড লিপি

পংক্তি ৫০। অতিশয়-জৈন-ধর্ম-সময়োচিত

৫১। শাসনদেবি ভারতী সতি শসি (শ) বিম্ববক্ত্র ইত্যাদি

—Ep. Ind. vol 9. p 257.

বেত নামক মন্ত্রীর পত্নী জৈনধর্মমতোচিত শাসনদেবী ভারতীস্বরূপা ছিলেন।

খ্রীস্টীয় ১০০১ অব্দের লিপি—

৪। পশুপতিবদনচ্ছদ্মনি কৃতবসতিঃ পদ্মসদ্মনি সদা যা।

জয়তি বিলক্ষণরূপা সু [শু] ক্লাভা ভারতী প্রবরী ॥ ৪

—Ep. Ind. vol I, p 140.

৫। বালাদিত্যের চাটসু লিপি (দশম শতক)

যাজ [ম্] ০ স্বাজশ্রীঃ শ্রীমতা যা বি [রো] ধিনী। তাং বন্দে বাগ্দেবীং দেবীং বাক্প্রপঞ্চ সিদ্ধয়ে। ১—Ep. Ind., vol xii, p 13.

[জয়পুররাজ্যে জয়পুর নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে চাটসু নামক স্থানে এই লিপিটী পাওয়া গিয়াছিল]

৬। সাধারণের লাডু * লিপি (১৩৭৩ বিক্রমসংবৎ)

প্রথমে গণপতি-স্তুতি, তৎপরে সরস্বতী-স্তুতি, তারপর বরুণ-স্তুতি

"যা [শোক্লীং] দ্যুতিমাতনোক্তি বিলসন্মুক্তাবলে রবং"

প্রমশ্চং চ (২ কং) বুভুযারকুংদকলিকাকপূ র পুরোত্তরাং। ব (া)

* যোধপুর স্টেটে ডিড্‌বানা নগরের ২০ মাইল দক্ষিণে লাডু।

থ (থ) ত্রা হরিণাহরেণ সততং সর্বার্থসিদ্ধৈ স্তৃতা [।] সা বঃ
পাতু সরস্বতী ভগবতী স্বা [ন] প্রদা সর্ব্বদা ॥

৭ ।　　　[১১২১ খ্রী°]

"জলধিপ্রাবৃতধাত্রিয়োম্লেগন্দনলূভে শব্দবিত্তা পতঞ্জলি সত্তর্কষড়াননম্ সকললোকস্তুত্য সাহিত্যসঙ্কুলসর্বজ্ঞাম্বুদাত্ত নীতিনিকর প্রখ্যাত চাণক্যমুজ্জ্বলবাণীতান নটলীলাপ্রাঙ্গণম্ সিংগন ॥ ৪৮

কৃতবিত্তম্ শব্দশাস্ত্রাগমদোলবিগতানম্ মহাতর্কশাস্ত্র-শ্রুতিয়োল্ সাহিত্য শাস্ত্র প্রকর-দোলধিকম্ কোবিদম্ শুক্রশাস্ত্রোন্নত্তিয়োল্ ভূলোকদোলভাগ্র্গবনেনিসিযশম্ বেত্তু সংস্তুত্য সারস্বত-লক্ষ্মী শুদ্ধজিহ্বম্ নেত্রবলদন ।

পদ্মাধিরূঢ়াং সুস্মিতাং ত্রিনেত্রং শূলাক্ষ মালে কমলং চ যানিং ।
করৈপ্রতিভিঃ সততং বহংতিং সরস্বতীং সিদ্ধিং করীং নমামি ॥
ইতি ধ্যানম্ স্ব হ্রীং ঐং হ্রীং ওং সরস্বত্যৈ নমঃ

—নীল সরস্বতী-তরা ত্রিকাণ্ড ১. ১. ১৮ মনু ও হেমকোষ দ্র° । শতপথ-ব্রাহ্মণ—৪. ১. ৩. ১৬ ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৬. ১. ৪. ১ ; ঋক্—১০. ১২৫. ৩. ৬

তিব্বতে সরস্বতী

dlya'ns can—সরস্বতী অমরকোষ (তিব্বতী অনুবঙ্গ) A. S. B. পৃ° ৪০৮,
dlya'ns can ma=সরবতী—সরস্বতী স্বর+মতুপ্, ঙীপ্—S. C. Das,—Tibe tan Dictionary, p. 913.

সরস্বতীর বিভিন্ন নাম

১ । tshan's pahi srastno—ব্রাহ্ম-কন্যা (Brahma daughter)

২ । dlay'ns ldan ma (sound-having + fem suth + a female having (good sound)—স্বরবতী (স্বরস্বতী) ।

৩ । sgra dlya's tha mo [sgra dlya'ns pleasing tone, harming, (S. C. Das. p 331) নির্দোষ ; tha mo=দেবী goddess of sweet sound, নির্দোষ দেবী)

৪ । sma iha mo sma বাক্য ; tha mo=দেবী]—বাগ্দেবী

৫ । rgyamtshohi lha mo [rgya=বিস্মিত ; matshohi=সর ; rgyamtsohi সমুদ্র—সমুদ্রদেবী

৬ । mtsholdn ma [সরস্ + মতুপ্] সরস্বতী

৭ । 2la lahiari'n ma [2ls lahi=চন্দ্র ; sri'n ma ভগিনী] চন্দ্রস্বসা

৮ । Ser hla mo [ser=প্রজ্ঞা ; hla mo দেবী] প্রজ্ঞাদেবী

৯ । n'ag dlan' tha mo [n'g=বাক্ ; plan শক্তি, lhamo দেবী] বাকশক্তিদেবী

১০ । blo yigler [bloyl intelligence ; sler=treasure] এটা মঞ্জুশ্রীর একটা নাম (S. C. Das. p 905) ।

১১। rdorle dlyin's kyi dbain phyngma [rdc rie = বজ্র ; dlyin's kyi = ধাতু ; dlain phing ma = ঈশ্বরী ; S. C. Das. p. 909—বজ্রধাত্বীশ্বরী

আখ্যায়িকায় সরস্বতী

গণেশের শুঁড় কেন

গণেশের শুঁড় সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা আছে। মধ্য প্রদেশে গণেশের গজমুণ্ড সম্বন্ধে একটী গল্প আছে।* ব্রহ্মার ঘরণী সরস্বতী বড়ই সুন্দরী। গণেশ তাঁর পুত্র। ব্রহ্মা একদিন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, বিবাহ করবে?' গণেশ সম্মতি জানাইল। পিতা প্রশ্ন করিলেন—'তোমার কনেকে দেখতে কেমন হ'বে?' গণেশ উত্তর দিল—'মার মতন'। ব্রহ্মা রাগিয়া গণেশের মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিলেন। সরস্বতী সেখানে আসিয়া ঘটনা দেখিয়া অবাক্। পুত্র রক্তাক্তকলেবর—মুণ্ড নাই। হঠাৎ তিনি একটী হাতী দেখিতে পাইলেন। মাথায় তাঁর বুদ্ধি জোগাইল; তিনি হাতীর মস্তক কাটিয়া তাড়াতাড়ি ছেলের মাথায় জুড়িয়া দিলেন। তাই গণেশের করি-মুণ্ড।

দারুভূতো মুরারিঃ

কোন রাজা এক কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীহরি কাষ্ঠময় হইয়া শ্রীক্ষেত্রে বাস করিলেন কেন?

কবি উত্তর করিলেন,—

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রস্ত্বেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্ণিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ বাহনং পন্নগারিঃ।
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

অতিদানে সরস্বতী

অগ্নিপুরাণ (৬৩. ১০) বলেন—

'ত্রীণ্যাহুরতিদানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী।'

গো, ভূমি ও সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যা—এই তিনকে অতিদান বলে।

সরস্বতীর অনুগ্রহ

নবসাহসাঙ্কচরিত পদ্মগুপ্ত-রচিত। এখানি খ্রীস্টীয় দশম শতকের শেষপাদের গ্রন্থ। ইহার প্রথম সর্গে বাক্‌পতিরাজের প্রশংসায় লিখিত আছে—

---

* Indian Antiquary. 1903, Vol 32. pp. 98-99.

সরস্বতীকল্পলতৈকাণ্ডং বন্দামহে বাক্‌পতিরাজদেবম্। শ্লোক ৬

একাদশ সর্গে—

অতীতে বিক্রমাদিত্যে গতেস্তং সাতবাহনে।
কবিমিত্রে বিশশ্রাম যস্মিন্ দেবী সরস্বতী॥ শ্লোক ৯৩

বিক্রমাদিত্য গত হইলে, সাতবাহন গৃহগমন করিলে, এই কবিমিত্রের পার্শ্বে দেবী সরস্বতী বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

প্রবাদে সরস্বতী

রাজশেখরসূরি তাঁহার প্রবন্ধকোষে একটী প্রচলিত প্রথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকারগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ কাশ্মীরে লইয়া যাইতেন। সেখানে পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাদের গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া সিংহাসনাস্থা দেবী সরস্বতী বা ভারতীর হস্তে দিতেন। পুস্তক ভাল হইলে দেবীর ঈষৎ স্মিতভাব দেখা যাইত এবং কবির উপর পুষ্পবৃষ্টি হইত। নতুবা মাটিতে বই পড়িয়া যাইত।

সরস্বতী কূপ

কৌষিতকী-ব্রাহ্মণে সরস্বতী কূপের কথা দুইটী উল্লেখ আছে। বর্তমান ধারা-নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী মসজিদ আছে। এই মসজিদের স্তম্ভগাত্রে অনেকগুলি ক্ষোদিত প্রস্তর আছে। কতকগুলি প্রাকৃত ও সংস্কৃত লিপির ভগ্নাবশেষও আছে। ঐ প্রস্তরগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের তালিকা সুন্দরভাবে ক্ষোদাই করা। ধারার ভোজরাজ-প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতবিদ্যাপীঠে এই পাথরগুলি পূর্বে ছিল। পরে সেইগুলি মস্‌জিদের কাজে লাগান হয়। এই মস্‌জিদের সন্নিকটে একটী কূপ আছে। কূপটীর বর্তমান নাম "অকল-কুই"। ইহার প্রাচীন নাম "সরস্বতী-কূপ"। ধারার একটী প্রাচীন প্রবাদ এই, যে ব্যক্তি সরস্বতী-কূপের জল পান করিবেন তিনি খুব বড় পণ্ডিত হইবেন।*

সরস্বতীকুণ্ড ও টিলা

মথুরার অন্তর্গত কাটরা হইতে দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গমন করিলে 'ভূতেশ্বর' পাওয়া যায়। এই ভূতেশ্বর হইতে উত্তরমুখে প্রায় এক মাইল গিয়া মথুরা সিটি ষ্টেশন। ইহারই নিকটে সরস্বতী-কুণ্ড। এই কুণ্ড হইতে একটী খাল যমুনায় গিয়া মিশিয়াছে। খালটী এখন শুকাইয়া গিয়াছে। সরস্বতী-কুণ্ডের পার্শ্বেই সরস্বতী-টিলা। ইহার অপর নাম 'সরস্বতী-আশ্রম'। এই টিলার উপর একটী ছোট মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর বিষ্ণু, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি কয়েকটী মূর্তি আছে।

সারস্বত-তীর্থ

সরস্বতীতীরে নিবাস স্বর্গতুল্য পবিত্র সুখপ্রদ জানিয়া, ঋষিরা সর্বপ্রথমে সরস্বতীতীরে

---

* Bombay Gazetteer Vol. I, pt. I, d 180.

বাস করিয়া, সকল দেশের মধ্যে সারস্বত দেশকে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন। এইজন্য বোধ হয় দশ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে সারস্বত ব্রাহ্মণই সর্বপ্রথমে মান্য ও গণনীয়। সরস্বতী নদীর জন্য কুরুক্ষেত্র-শাস্ত্রে তীর্থপ্রধান বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রও তাই বলিয়াছেন—"যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিবিষ্টপে।" গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু সরস্বতী নদীর তীরে এক তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রাচীনকালের গান্ধার দেশের সরস্বতীর স্মৃতি তাঁহাকে এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। মহাভারতের বনপর্বে (৮৩ অধ্যায়) কয়েকটী সারস্বত তীর্থের নাম পাওয়া যায়। তীর্থবর্ণনায় মহাভারত বলিয়াছে,—কুরুক্ষেত্র হইতে অধিকতর পবিত্র হইতেছে সরস্বতী। তার চেয়ে বেশী পবিত্র তীর্থসমুদয়; তীর্থগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হইতেছে পৃথূদক (১৪৫ শ্লোক); পৃথূদকের চেয়ে বড় তীর্থ আর নাই (শ্লোক ১৪৮, ১৪৯)। বনপর্বে সরস্বতী নদীতটে তুরন্তকতীর্থের কথা আছে (৫২ শ্লোক)। শ্রীকুঞ্জ (১০৮ শ্লোক) ও 'সপ্তসারস্বত' তীর্থের (১১৩ শ্লোক) মহিমা বর্ণিত আছে। পোবকতীর্থ (১৮৭, ১৮৮ শ্লোক) সারস্বত বংশীয় অঙ্গিরার জন্মভূমি। ৮৪ অধ্যায়ে সারস্বত (৬৬ শ্লোক) ও বিনশন (১১২ শ্লোক) তীর্থের মহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গম পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ (শ্লোক ৩৮)।

দুষ্টু সরস্বতী

দুষ্টু সরস্বতী স্কন্ধে চাপার কথা আমাদের দেশে অজ্ঞাত নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে—বিষ্ণু সরস্বতীকে 'বাগ দুষ্টা' কলহপ্রিয়া বলিয়াছেন। উদ্ভট কবিতায়ও সরস্বতী "প্রকৃতি-মুখরা"। সরস্বতীর এরূপ হইবার কারণ কি? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সরস্বতীর স্তনের কল্পনা করিয়াছেন। একটী সত্যরূপ—অপরটী মিথ্যা-রূপ। বোধ হয়, মিথ্যারূপ ব্যাপার হইতেই দুষ্টু সরস্বতী নামের উদ্ভব।

দশকর্মে সরস্বতীর আহ্বান

বিবাহে সপ্তপদী গমনের সময় সরস্বতী আহ্বানের কথা শাস্ত্রে আছে। পরাশর ও হিরণ্যগৃহ্যসূত্রে গর্ভাধান সংস্কারের সময়ে সিনিবালী ও সরস্বতীর আহ্বান করিবার বিধি আছে। ঋগ্বেদে শিশুর নামকরণের সময়ে তাহার জননীর স্তনমধ্যে আবির্ভূত হইবার জন্য সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ইহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

নানা বাসনা পূরণে সরস্বতীর প্রার্থনা

অথর্ববেদ বীর্যলাভের জন্য সরস্বতীর প্রার্থনা করিতেছেন। আবার ছোট ছোট ছেলেদের পেটে কৃমি হইলে, তাহা নাশ করিবার জন্য অথর্ববেদ সরস্বতীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। তখন সরস্বতী 'বিষঘ্নী'। বশীকরণের সময়েও সরস্বতী বাদ পড়েন নাই। বুদ্ধি পাইবার জন্য সরস্বতীর নিকট বুদ্ধি চাহিতেছেন—'শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র মেখলা খণ্ডনের সময়ে ব্রহ্মচারিদিগকে সরস্বতীর নিকট নিষ্পাপ হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন'। শতপথ ব্রাহ্মণ ইন্দ্র রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার জন্য সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্বৈতসিদ্ধি ও তৎপরীক্ষা

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সাংখ্যশ্রমী (কাপিল মঠ, মধুপুর)

এই বিচারের প্রধান অঙ্গ পরমার্থদৃষ্টি। প্রথমতঃ বাদস্থাপক পরমার্থদৃষ্টির কথা উঠাইয়া থাকেন। তাঁহাকে স্বীকার করাইতে হয় যে পরমার্থদৃষ্টি যেমন আছে, পরমার্থসিদ্ধিও তেমন আছে এবং ঐ দুই পদার্থ বিভিন্ন। পরমার্থদৃষ্টিতে বা দর্শনে যুক্তিযুক্ত ভাষায় পরমার্থের বা দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তিসম্বন্ধীয় তথ্যসকল কথিত হয়। আর পরমার্থসিদ্ধিতে মন বাক্য নিবৃত্ত হয়। সুতরাং তখন কোন ভাষা থাকে না এবং অন্তঃকরণ নিরুদ্ধ হয়। এবিষয় পরে বিশদ করিয়া বলা হইবে।

অদ্বৈতবাদস্থাপক বলিয়া থাকেন, পরমার্থসিদ্ধি হইলে ব্যবহারজগৎ বা প্রপঞ্চ থাকে কি না?

পরীক্ষক—তাঁহার নিকট থাকে না, অন্যের নিকট থাকে। আর তিনি নিরোধভঙ্গে উঠিলে দেখিতে পাইবেন।

বাদস্থাপক—কেহ যদি সম্যক্ পরমার্থসিদ্ধি করেন তাহা হইলে কি হইবে?

পরীক্ষক—সম্যক্ পরমার্থসিদ্ধি করা অর্থে যদি সদাকাল নিরুদ্ধভাবে থাকা বুঝায় তবে তাঁহার নিকট দৃশ্য আর কখন উপস্থিত হইবে না, কৃতার্থং প্রতি নষ্টম্; অন্য সকলের নিকট হইবে অপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।

বা—যখন দৃশ্য তাঁহার নিকট থাকিবে না, তখন তাহা নাই, থাকিবে না ও ছিল না বলিতে হইবে।

প—এরূপ বলার কোন যুক্তি নাই। কারণ তাহা ছিল, বর্তমানে তাঁহার নিকট নাই এবং ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট থাকিবে না ইহাই যুক্তিযুক্ত বক্তব্য কথা হইবে। কারণ যাহা ছিল তাহাকে ছিল বলিতে হইবে, নাই বলা যায় না। বর্তমানে কাহারও নিকট যাহা অদৃশ্য তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা নাই বলা যায় না। কোন বস্তু না জানাকে নাই বলিলে বুঝাইবে, যে জানে না তাহার নিকট নাই; যে জানিতেছে তাহার নিকট আছে। সদাকালের জন্য তাহা না দেখিলে তাঁহার নিকট ভবিষ্যত থাকিবে না এরূপই বলিতে হইবে। পরন্তু চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে সেই ব্যক্তির আছে ও নাই বলা থাকিবে না। সুতরাং রুদ্ধচেতা পুরুষ প্রপঞ্চকে আছেও যেমন বলিবে না, নাইও তেমন বলিবে না। কিন্তু পরমার্থদৃষ্টি যাহাদের আছে তাহাদিগকে আছে বা নাই এরূপ বলিতেই হইবে। না বলিলে অসম্বদ্ধ কথা বলিতে হইবে অথবা চুপ করিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, ক্রিয়া, কারক ও কাল ব্যতীত বাক্য হইতে পারে না। অতএব ব্যবহারদৃষ্টিতে (আর্থিক ও পরমার্থিক এই দুই প্রকার ব্যবহারদৃষ্টি) পরমার্থ ভাষণ করিতে গেলে বলিতেই হইবে কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।

এইস্থলে বাদস্থাপক পূর্বোক্ত যুক্তির পুনরাবর্তন করিয়া থাকেন এবং যুক্তি পরীক্ষককে

প্রায়ই ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া থাকেন। যেমন, একবার নাই বলিয়া পরে আবার আছে বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় ইত্যাদি। এইরূপে এই বাদস্থাপকেরা নিরুত্তর না হইয়া পূর্বোক্ত যুক্তির পুনরাবৃত্তি করতঃ এই বিচারকে অপ্রতিষ্ঠ করার চেষ্টা করেন। ইহা প্রকৃত বিচার নহে। এখানে ইহা দ্রষ্টব্য যে, ব্যবহার জগৎকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যা অর্থে নাই এরূপ নহে, কিন্তু সদসদ্‌ভ্যামনির্বাচ্যা। শঙ্করাচার্যও বলেন ব্যবহারিক জগৎ আপেক্ষিক সত্য 'ইহ পুনর্ব্যবহারিক-বিষয়মাপেক্ষিকং সত্যম্'—তৈত্তিরীয় ভাষ্যম্। অতএব মিথ্যা মানে আপেক্ষিক সত্য, কিন্তু নাই এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং বাদস্থাপকের পক্ষ কোনও দিকেই ন্যায়সঙ্গত নহে।

অতএব ইহার দ্বারা একই ব্রহ্ম আছেন ও ব্যবহার জগৎ নাই এরূপ অদ্বৈতবাদ সিদ্ধ হয় না।

আরও দ্রষ্টব্য যে, নাভাবো বিদ্যতে সতঃ অর্থাৎ যাহাকে একবার সৎ বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার অসত্তা কখনও চিন্তা করা যায় না। কারণ, ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া অর্থাৎ যাহাকে অভাব বলি তাহা অন্য এক প্রকার ভাব, তাহা সম্পূর্ণ নাই এরকম চিন্তা করা সাধ্য নহে। অতএব ব্যবহার বিষয় তখন অব্যাকৃত বা অব্যক্তভাবে থাকিবে এরূপ কথনই যুক্তিযুক্ত ভাষণ হইবে না। নাই বলিলে পরমার্থ সম্বন্ধে মিথ্যাদৃষ্টির ভাষণ হইবে।

মিথ্যা অর্থে (১) সদসৎ হইতে অনির্বাচ্য, (২) অসৎ এবং (৩) ব্যবহার সত্য। এই তিন অর্থ পরমার্থদৃষ্টি ও পরমার্থসিদ্ধির ভেদ না বুঝিয়া নির্বিশেষে ব্যবহার করতঃ অদ্বৈতসিদ্ধির মৌখিক বিচার গুলাইয়া দিয়া অপ্রতিষ্ঠ করা ঐ বাদস্থাপকদেব চিরন্তন প্রথা বলিয়া মনে হয়। জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে এবং বিজ্ঞানভিক্ষু বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে উঁহাদিগকে এইরূপে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যথা—'যদি তাবদ্ অদ্বৈতসিদ্ধৌ প্রমাণমস্তি তর্হি তদেব দ্বিতীয়মিতি নাঽদ্বৈতম্। অথ নাস্তি প্রমাণং তথাপি নতরাম্ অদ্বৈতম অপ্রামাণিকায়াঃ সিদ্ধেরভাবাদিতি।" অর্থাৎ যদি অদ্বৈতসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ থাকে তাহা হইলে সেই প্রমাণই দ্বিতীয় বস্তু। অতএব অদ্বৈতসিদ্ধি হইতে পারে না। আর যদি বল প্রমাণ নাই, তাহা হইলে নিতান্তই অদ্বৈত অসিদ্ধ। কারণ, অপ্রামাণিক বিষয়ের সিদ্ধি নাই। আব বিজ্ঞানভিক্ষুও বলেন, "অপিচ চৈতন্যাতিরিক্তস্য সর্বস্যাত্যন্তাসত্ত্বং যেন প্রমাণেন সাধনীয়ং তৎ সদ্ অসদ্ বা? আদ্যে তেনৈব সর্বমিথ্যাত্ববাধঃ, অন্ত্যে অসতোঽপ্যর্থসাধকত্বে অসতা প্রমাণেন সর্বসত্যত্বমপি সিধ্যতু।" অর্থাৎ চৈতন্যাতিরিক্ত অন্য সব অসৎ ইহা যে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণটা সৎ কি অসৎ? যদি বল সৎ, তাহা হইলে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য সব বস্তুরই মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না (কারণ তাহাতে ব্রহ্ম এবং প্রমাণ অন্ততঃ এই দুইটা পদার্থ সৎ হয়)। আর যদি বল ঐ প্রমাণটাও অসৎ তাহা হইলে অসৎ প্রমাণের দ্বারাও সত্যার্থ সিদ্ধ হয় বলিতে হইবে। অতএব অসৎ প্রমাণের দ্বারা সর্বসত্যত্ব সিদ্ধ হইতেও বাধা নাই। অর্থাৎ প্রমাণই যখন মিথ্যা, তখন 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' বা 'ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ সত্য' এই দুই মতই তুল্যমূল্য। ফলে প্রমাণকে অসৎ বা নাই বলিলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই বলিতে হইবে।

অধুনা এই অদ্বৈতবাদস্থাপকগণ ন্যায়াতীত পদার্থের সত্তা স্বীকার করিয়া ঐ বাদকে স্থাপন করার চেষ্টা করেন। এবিষয়ে প্রথমতঃ নিম্নস্থ বিষয় দ্রষ্টব্য।

ন্যায় বা যুক্তি একটী প্রমাণ। প্রমাণ অর্থে কোনও অনধিগত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান। স্মরণ জ্ঞানও যথার্থজ্ঞান বটে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বে অধিগত, নূতন কিছু নহে। অন্যান্য জ্ঞানের নাম মিথ্যা জ্ঞান বা বিপর্য্যয় বা অযথার্থ জ্ঞান। সর্বদাই আমরা অনুমান প্রমাণের দ্বারা কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই বা কর্ম হইতে নিবৃত্ত হই। ইতর প্রাণীরাও অনেক সময় আনুমানিক নিশ্চয়ের দ্বাবা কর্ম করে।

দার্শনিক বিষয়সকল নিশ্চয়ে অনুমানই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ সর্বমূল হইলেও অনুমান বা যুক্তি ব্যতীত তদ্দারা দার্শনিক তথ্যসকল ভাষিত হইতে পারে না। এইরূপে অনুমানের দ্বারা মূলপর্যন্ত দার্শনিক বিষয় নিশ্চয় করা আন্বিক্ষিকী নামক দর্শন শাস্ত্রের প্রথা। কিন্তু কোন কোন আধুনিক দার্শনিক মূল বিষয়কে ন্যায়াতীত বলেন। অন্যায্য ত্যাগ করিয়া ন্যায্য বিষয় গ্রহণ, সাধারণ প্রথা হইলেও উক্ত দার্শনিকেরা বলেন অন্যায্য গ্রাহ্য না হইলেও মূলে ন্যায়াতীত বিষয়ও গ্রাহ্য। ইহা পরীক্ষার জন্য প্রথমে ন্যায়াতীত বা ন্যায় খাটে না যেখানে, এরূপ তথ্য কি প্রকার তাহা বিচার্য।

বিকল্প নামক এক প্রকার জ্ঞান আছে (যোগদর্শনে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য), যাহার বিষয় অবস্তু হইলেও আমাদিগকে সর্বদা ঐরূপ বৈকল্পিক বিষয়কে যথার্থবৎ বা ন্যায্যবৎ ভাষিত করিতে হয়। যেমন—আকাশ অনন্ত। অনন্ত অর্থে যাহার অন্ত নাই। কিন্তু কোনও বিষয় জ্ঞাত হইতে থাকিলে তাহা সর্বদাই অন্তবান্ হইবে, কখনও কখনও অনন্ত হইবে না। অতএব অনন্তরূপ একটী জ্ঞেয় বিষয় কেবল বাঙ্মাত্র, উহা জ্ঞানশক্তি দ্বারা অধিগম্য নহে। অসংখ্য, অভাব প্রভৃতি শব্দের বিষয়ও ঐরূপ। অনন্ত, অভাব এবং অধিকরণমাত্র যে কাল ও অবকাশ তাহারা সমস্তই বাস্তব অর্থহীন বা অবাস্তব পদার্থ। সুতরাং তাহা ভিত্তি করিয়া যে সমস্ত বস্তু বা ন্যায় সিদ্ধ হয় তাহাদিগকে ন্যায়াতীত বলিলে বলা যাইতে পারে, যদিচ উহারা ঠিক ন্যায়াতীত নহে। এরূপ স্থলে ব্যবহার সিদ্ধির জন্য অবস্তুকে বস্তু ধরিয়া লইয়া সত্যভাষণ করিতে হয়। যেমন, জ্যামিতির বিন্দু পরিমাণশূন্য ধরিয়া লইয়া সত্যনিয়ম ভাষণ করা হয় সেইরূপ। অসংখ্য এই পদের অর্থঘটিত অঙ্কসকল ন্যায়সঙ্গত না হইলেও অন্যায্য নহে। সাধারণ যোগবিয়োগাদির নিয়ম সেখানে খাটে না (যেমন, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে)। ইহাও ব্যবহারসিদ্ধির জন্য ভাষিত নিয়ম। এই ব্যবহারিক জগতের মূলে যে অব্যবহার্য সত্তা আছে তৎসম্বন্ধে প্রায়ই নিষেধ-বাচক পদ ব্যবহার করিতে হয়; যেমন—অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনন্ত ইত্যাদি। এইজন্য কোনও কোনও বাদী ঐরূপ পদার্থ স্বীকার করেন না বা স্বীকার করিলেও তাহাকে শূন্য বলেন। কিন্তু তাদৃশ শূন্য আছে ও দ্রষ্টব্য ও উপলভ্য বলিতে হয়। যথা—শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্যেৎ পশ্যেচ্ছূন্যং বহির্গতম্ (নাগার্জ্জুন), শূন্যরূপেণ কৌষিক তিষ্ঠতা (প্রজ্ঞাপারমিতা)।

ইহা সত্য বটে যে অব্যবহার্য পদার্থের ভাষণ করিতে গেলে আমাদের বহুশঃ নিষেধ-বাচক পদ ব্যবহার করিতে হয়। তাহাতে এরূপ সিদ্ধ হয় না যে অব্যবহার্য পদার্থ নাই। কিন্তু আমাদের ভাষা ব্যবহার্য পদ লইয়াই কৃত হইয়াছে বলিয়া ব্যবহার্যতার নিষেধ করিতে হয়। ব্যবহার জগতে সবই আপেক্ষিক—সম্পূর্ণ কিছুই নাই। তজ্জন্য যে ইহার মূলে সম্পূর্ণ পদার্থ নাই এরূপ সিদ্ধ হয় না। আপেক্ষিকতা থাকিলে সম্পূর্ণতাও আছে; ইহা ন্যায়ানুসারে স্বীকার করিতে হয়। উত্তর দিকে চলিতে থাকিলে সম্মুখে উত্তর থাকিবে এবং পশ্চাতে দক্ষিণ থাকিবে বা উত্তর-দক্ষিণ আপেক্ষিক হইবে। কিন্তু সুমেরুবিন্দুতে উপনীত হইলে তখন আর সম্মুখে উত্তর থাকিবে না; তাহাই সম্পূর্ণ উত্তর বলিতে হইবে। সেইরূপ, একটী বিন্দু আছে যাহা সম্পূর্ণ দক্ষিণ। অবশ্য ইহা ব্যবহারিক জগতের দৃষ্টান্ত। ইহার ঐটুকুমাত্রই গ্রাহ্য। সেইরূপ সম্পূর্ণ জ্ঞাতা ও সম্পূর্ণ জ্ঞেয় এই দুই বিরুদ্ধ পদার্থ যে আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয়। কারণ, উহা অনুভবসিদ্ধ। এই বিরুদ্ধ কোটিস্থ (Polar) পদার্থদ্বয় স্বীকার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন জ্ঞাতা আছে যাহা জ্ঞেয় নহে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞাতা এবং এমন জ্ঞেয় আছে যাহা জ্ঞাতা নহে কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞেয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রত্যেক জ্ঞানেই মিলিত থাকে। এই মিলনকে (Synthesis কে) কেহ কেহ স্বাভাবিক বা এইরূপ সমবায়ের বিশ্লেষ নাই এরূপ মনে করেন। কিন্তু সমবায় হইলে ন্যায়ানুসারে তাহার বিশ্লেষণও স্বীকার্য হইবে। সমবায় অর্থেই একাধিক পদার্থের মিলন। দুই পদার্থ সমবেত হইলে যদি সেই দুই পদার্থ বিরুদ্ধ কোটির হয় তাহা হইলে ঐ কোটি-মধ্যস্থ সমস্ত সত্তা আপেক্ষিক হইবে বটে কিন্তু কোটিস্থ (Polar) পদার্থদ্বয় সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে। উপনিষদে ও সাংখ্যাদি মোক্ষদর্শনে তাই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বিষয় ও বিষয়ী বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা স্বীকৃত হয় এবং তাহাদেব উপলব্ধির উপায়ও প্রদর্শিত হয়। অন্যবাদীরা তাহাতে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। যথা দ্রষ্টৃত্ব ও দৃশ্যত্ব যখন আপেক্ষিক সত্তা বলিয়া দেখা যায় তখন সম্পূর্ণ দ্রষ্টা ও সম্পূর্ণ দৃশ্য ন্যায়সঙ্গত নহে। সম্পূর্ণ দ্রষ্টা ও সম্পূর্ণ দৃশ্য এই বিরুদ্ধ কোটিস্থ বা অত্যন্ত অসংকীর্ণ পদার্থদ্বয়ের পরিবর্তে "শূন্য" পদার্থ তাঁহারা স্বীকার করেন। এইরূপ শূন্যকে তাঁহারা সৎ বা আছে, অসৎ বা নাই, সদসৎ বা আছেও বটে নাইও বটে এবং নসদসৎ ইহার কিছুই বলেন না। আছে ও নাই ইহার একতর ক্রিয়া যোগ না করিলে ভাষাই হয় না। সুতরাং এই বাদীদের মত অবচনীয় হইয়া পড়ে। যথা—"তথা অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তো নাস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্ত যদেতদন্তয়োর্বন্তয়োর্মধ্যং তদবাচ্যম্"—(মাধ্যমিকা ১৫)। অবচনীয়কে বাচন করা অন্যায্য বলিলে ইঁহাদের কেহ কেহ উত্তর দেন "উহা ন্যায়াতীত"। কিন্তু উপরেই দেখান হইয়াছে যে বিরুদ্ধ কোটিস্থ দুই সৎপদার্থ স্বীকার করিলে আর ন্যায়াতীত পদার্থ স্বীকার করিতে হয় না। পরন্তু ঐ ন্যায়াতীত পদার্থ স্বীকারের মূলেও যখন ন্যায় আছে তখন "ন্যায়াতীত পদার্থ ন্যায়সঙ্গত" এরূপ বোক্তিবিরোধ হইয়া পড়ে।

ন্যায়াতীত শূন্যস্বীকার যাঁহারা করেন না, কিন্তু ন্যায়াতীত মায়া স্বীকার করেন

তাঁহাদেরও পক্ষ ঐরূপ দোষদুষ্ট। মায়া কেন ন্যায়াতীত তাহার জন্য প্রভূত যুক্তি দিতে হয়। আর ওরূপ মায়া স্বীকার করার প্রয়োজন কি তাহারও যুক্তি দিতে হয়। কিন্তু সেই যুক্তি প্রকৃত যুক্তি নহে। কেন মায়া স্বীকার করেন? এতদুত্তরে তাঁহারা বলেন যে, আমাদের শাস্ত্র যখন এক পদার্থকে জগতের মূল বলিয়াছেন এবং সেই পদার্থ নির্বিকার বা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম তখন প্রপঞ্চজননী মায়ার স্থান কোথায়? কিন্তু উহা আবার স্বীকার না করিলেও চলে না। শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া প্রকৃত দার্শনিক যুক্তি নহে। উহা দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ পদার্থের দৃঢ় নিশ্চয়ের জন্য আবশ্যক হইতে পারে। সাংখ্যাদি অন্যবাদীরা ন্যায়াতীত পদার্থ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের সমস্তই ন্যায়সঙ্গত বা প্রমাণসঙ্গত। তাঁহারা চিদ্রূপ নিত্যসত্তা বা দ্রষ্টা আত্মা এবং পরিণামী ত্রিগুণরূপ নিত্যসত্তা বা প্রকৃতি (উপাদান কারণ) এই দুই কারণ ন্যায়ানুসারে সিদ্ধ করিয়া মোক্ষমার্গের মনন করেন। শূন্যবাদাদের মায়াবাদ এবং ব্রহ্মবাদীদের মায়াবাদ্ স্থাপনের প্রয়োজন একই প্রকার। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের প্রামাণ্য শাস্ত্র যখন বলিয়াছেন যে মূল পদার্থ "শূন্যরূপমনিমিত্তং" বা "সদেব সৌম ইদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ", তখন দ্বিতীয় পদার্থ যাহা "অশূন্য" বা "অব্রহ্ম" তাহা কোনও প্রকারে অপলাপিত করিতে হইবে। তদর্থে তাঁহারা এই প্রকার যুক্তি দেন। যথা—প্রপঞ্চ সমস্ত ভ্রান্ত। ভ্রান্তির উদাহরণ যথা, শুক্তিকাতে রজত জ্ঞান; কিন্তু শুক্তিকাতে যখন রজত বর্তমানে নাই, পূর্বে ছিল না এবং কখন থাকিবেও না তখন উহা ত্রিকালে অসৎ। কিন্তু আবার যখন রজতের জ্ঞান হইতেছে তখন উহাকে সম্পূর্ণ অসৎও বলিতে পারি না। তাই তাহাকে মায়া বলি এবং মায়াকে সদসদ্ভ্যামনির্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী বলিতে হয়। কিন্তু ঐরূপ ভ্রান্তি-জ্ঞানের প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ, ইহা অন্যবাদীরা বলেন। জ্ঞান মনের ভিতর হয়। মনের ভিতর রজতজ্ঞানের সংস্কার আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দোষবিশেষবশতঃ সেই রজতজ্ঞানের সৎসংস্কার সৎস্মৃতিরূপে উঠে এবং শুক্তিকা জ্ঞানকে বিপর্যস্ত করে। এরূপ অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠ জ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞান। ইহার জন্য অনির্বচনীয়বাদের আবশ্যকতা নাই। আর একাধিক পদার্থ অর্থাৎ একাধিক বিষয় এবং ভ্রান্ত জ্ঞানের শক্তি বা ভ্রান্ত মন ব্যতীত ভ্রান্তিজ্ঞান হয় না। সুতরাং মূল কারণের অদ্বিতীয়ত্ব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

ন্যায়াতীত পদার্থ থাকিলে তাহার কি লক্ষণ হইবে? তাহার লক্ষণ হইবে যে, যে সদ্‌বিষয় প্রত্যক্ষানুভূতিগম্য ও যুক্তিগম্য নহে তাহাই ন্যায়াতীত। পরঞ্চ তাহা স্বতঃসিদ্ধ এক প্রমেয় হইবে। কিন্তু এরূপ পদার্থের উদাহরণ আছে কি?

সংক্ষেপতঃ, ব্রহ্ম ও মায়ার অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য, মায়ার সদসৎ হইতে অনির্বাচ্যত্ব এবং একবার সদসৎ নহে বলিয়া পুনরায় অসৎ বলিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি করাই হইতেছে "ন্যায়াতীত প্রমাণ"। শূন্যবাদপক্ষেও ঐরূপ। তাহাতে শূন্যের ও সতের তাদাত্ম্য, সতের অসত্তা বা অসতের সত্তা ধরিয়াই ন্যায়াতীত প্রমেয় সাধ্য হয়।

উপসংহারে পরমার্থদৃষ্টি ও পরমার্থসিদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ কথা বলা হইতেছে। প্রথমে ব্যবহারদৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি বিচার্য। ব্যবহার ও পরমার্থ এই দুই শব্দের অর্থ লইয়া অনেক গোল হয় এবং ঐ দুই পদের অনেক দার্শনিক অপব্যবহার হয়। ব্যবহারদৃষ্টি অর্থে সাধারণতঃ আমরা অন্তর্বাহ্য বিষয় যেরূপ জানি যে অর্থে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করি। পরমার্থ অর্থে পরম প্রয়োজন যে মোক্ষ তাহা। তদর্থে যাহা জ্ঞেয় ও কার্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরমার্থদৃষ্টি। পরমার্থ বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান পরমার্থ সত্যজ্ঞান, আর ব্যবহার বিষয় লইয়া বা তাহাকে ভিত্তি করিয়া পরমার্থ সত্যে আমরা উপনীত হই।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে পরমার্থদৃষ্টি ও পরমার্থসিদ্ধি—এই দুইটী পৃথক্ পদার্থ। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলে পরমার্থসিদ্ধি হয়। সুতরাং তখন বাক্য ও মনের নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ তখন কোন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, কথাও থাকে না, অতএব সত্যমিথ্যা আদি কোনও পদার্থের দৃষ্টি থাকে না। আর পরমার্থদৃষ্টি অর্থে পরম অর্থ সাধনের উপযোগী প্রজ্ঞা বা দর্শন। তাহাতে অবশ্য চিত্ত বা জ্ঞান-ইচ্ছাদি সব থাকে। সুতরাং সত্য-মিথ্যা, ভাব-অভাব, সৎ-অসৎ, কার্য-অকার্য ইত্যাদি সব যথাযথ জানিতে ও করিতে হয়। বাদীদের কেহ বলেন এই অবস্থায় জগৎ শূন্য, কেহ বলেন তাহা মায়া; কেহ বা বলেন অব্যক্ত, ত্রিগুণ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা যথার্থের বা সত্যের ভাষণ তাহাই বিচার্য।

অনেকে পরমার্থসিদ্ধি ও পরমার্থদৃষ্টি এই দুইয়ের ভেদ করিতে না পারিয়া পরমার্থ সিদ্ধিতে যাহা হয় পরমার্থদৃষ্টিতে তাহার অবতারণা করিয়া দার্শনিক অপরিপাকের পরিচয় দেন। পরমার্থ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষানুমানাদি প্রমাণের দ্বারা পদার্থ প্রমিত করিয়া চলিতে হয়, তাহাতে 'অপ্রমেয়', 'অনির্বাচ্য' ইত্যাদি কথা বলা নিতান্ত অযুক্ততা।

বৌদ্ধেরা বলেন 'নির্বাণং শূন্যোপমং মায়োপমং তথাগতঃ শূন্যোপমো মায়োপমঃ'। এইরূপ কথা সর্ববাদীদের অনুমত; কারণ সাংখ্য-বেদান্ত আদি নির্বাণবাদীরা সকলেই জগৎকে ও জাগতিক দ্রব্যকে ঐরূপ ভ্রান্তি বলেন। ঐ চরম অবস্থায় যাওয়ার জন্য ঐ ভ্রান্তি বা অবিদ্যা যে ত্যাজ্য তাহাও সর্বসম্মত। ঐ পদ উপলব্ধি করার জন্য যুক্তিযুক্ত দর্শন চাই। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' এই সত্য স্বস্থ ও সরল ন্যায়প্রবণচিত্ত দার্শনিকদের মূল অবলম্ব্য তথ্য। কিন্তু শূন্যবাদীদের বলিতে হয় সতের মূল শূন্য, মায়াবাদীদের বলিতে হয় তাহা অসৎ—ইত্যাকার অযুক্ত কথা বলিয়া ইহাদের অসম্যক্ পরমার্থ দর্শন স্থির করাইতে হয়।

যদি সবই শূন্য, তবে শূন্য দুঃখের জন্য শূন্য দেহী, সব শূন্য চারি আর্যসত্যের প্রজ্ঞা-পূর্বক শূন্য আষ্টাঙ্গিক মার্গে গমন করিয়া শূন্য নির্বাণের শূন্য লাভ করে। সেইরূপ সব মায়াময় বা মিথ্যা হইলে, মিথ্যাজীব মিথ্যা বেদের মিথ্যা প্রমাণে মিথ্যা কর্তব্য সাধন করিয়া মিথ্যামুক্তি লাভ করে। এরূপ 'শূন্য' ও 'মিথ্যা' পদ পরমার্থদর্শনে ব্যবহার করা যে সম্পূর্ণ অন্যায্য ও অপ্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য।

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি. এ.

ভারতযুদ্ধের দশমদিনে ভীষ্মদেব শরশয্যায় পতিত হ'ন এবং দেহত্যাগের জন্য উত্তরায়ণ আরম্ভের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এইরূপ মহাভারতে কথিত আছে। ভারতযুদ্ধাবসানের পঞ্চাশ রাত্রি পরে ইহা দৃষ্ট বা স্থিরভাবে অনুমিত হইয়াছিল যে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়াছে। ......অতএব, আমাদের মহাভারত-আশ্রিত গণনায় গণিতলব্ধ ভারতযুদ্ধকাল ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দ অর্থাৎ ঠিক ২৫২৬ শকপূর্বকাল।

মহাভারতে অনেকস্থলে আছে যে, ভারতযুদ্ধ কলিযুগের প্রারম্ভে হইয়াছিল। কলি এবং দ্বাপরের সন্ধিকাল প্রাপ্ত হইলে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। ......শল্যপর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন যে, "এখন কলিযুগ প্রাপ্ত হইযাছে জানিবেন।" ......শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ভারতযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে হয়, (মৌষলপর্ব—২য় অধ্যায়) অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৪১৩ অব্দে। ......মহাভারতাশ্রিত গণনায় ভারতযুদ্ধবর্ষ ঠিক ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে দাঁড়ায় এবং এই নিরূপণ বৃদ্ধ গর্গমতানুযায়ী বরাহোক্তি যে, শককালের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দ পাওয়া যায়, তাহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাব্দের • শূন্যসংখ্যক বর্ষই যুদ্ধবর্ষ ইহাই প্রমাণিত হয়। ......মহাভারতোক্তি হইতে যুদ্ধবর্ষীয় দিনপঞ্জী নিরূপণ সম্পূর্ণ সম্ভবপর। ভারতযুদ্ধ ২৪৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দের ৪ঠা নভেম্বর, বুধবার হইতে ২১শে নভেম্বর শনিবার পর্যন্ত ঘটিয়াছিল; দক্ষিণায়ণ শেষ হইয়াছিল ৯ই জানুয়ারী, শনিবার, ২৪৪৮ খৃঃ পূঃ অব্দের এবং ভীষ্মের দেহত্যাগ পরদিন হইয়াছিল।"

এই আলোচনার ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৯ অব্দ হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইযাছিল, এবং আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, যুধিষ্ঠির ৬ অব্দে শ্রীনিম্বার্কের জন্ম হয়। হিন্দী সুদর্শন পত্রিকায় যে জন্মলগ্ন উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতে ইহাই দেখা যায়। সুতরাং (২৪৪৯—৬) অর্থাৎ ২৪৪৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অর্থাৎ ১৫৩০ শকপূর্বকালে, কার্তিকের শুক্ল পূর্ণিমায়, বৃহস্পতিবারে, গোধূলিগতে, শ্রীনিম্বার্ক ধরাধামে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল ২৫০১ খ্রীঃ পূঃ অব্দের ২১শে জুলাই, শ্রাবণের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্ধরাত্রিক্ষণে চন্দ্ররোহিণী সমাগমে। অর্থাৎ ভারতযুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের ৫২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এই গণনা হইতে দেখা যায় যে, (২৫০১—২৪৪৩) শ্রীনিম্বার্কাচার্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ৫৮ বৎসরের ছোট,—সুতরাং প্রচলিত অন্যতম কিম্বদন্তী যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য শ্রীকৃষ্ণের শৈশবে তাঁহাকে নন্দগৃহে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্তবরূপ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে। সুতরাং, আমরা দেখিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণের জীবিতকাল ৮৮ বৎসর।*

---

* বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতপুরাণে মতভেদ দৃষ্ট হয়,—বিষ্ণুপুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণ শতবর্ষের অধিক এবং ভাগবত-পুরাণমতে ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। মহাভারত আশ্রিত গণনার ফলে যখন দেখা যায় ৮৮ বৎসর, তখন ইহাই অধিকতর প্রামাণ্য।

এই প্রবন্ধে এই পর্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভবিষ্যপুরাণোক্ত উক্তিতে যাহা বলা হইয়াছে,—নিম্বার্কাচার্য দ্বাপরান্তে আবির্ভূত হইবেন,—ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দ্বাপরান্তে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব মোটেই হয় নাই। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইবে যে, যীশুখ্রীস্টের জন্মের বহু বৎসর পরে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতেও এই বিষয় প্রমাণ করিতে পারা যাইবে।

শ্রীনিম্বার্কসভার মুখপত্র,—বৃন্দাবন হইতে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত,—"শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় ১৯৯২ সংবৎ মাঘ সংখ্যায় ১৬ পৃষ্ঠায় শ্রীযুত নৃসিংহদাস বসু, বি, এল্, এড্‌ভোকেট্, মহাশয় শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সময় সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই স্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু হাওড়া-শিবপুরে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রয় কমিটীর সুযোগ্য সম্পাদক, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা। নিম্বার্কভাষ্যরচনার কালসম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে,—ইহা বসুবন্ধুর পরে এবং কুমারিলভট্টের পূর্বে। তাঁহার মতে শ্রীশঙ্করাচার্য কুমারিলভট্টের অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরবর্তী।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীনিম্বার্কভাষ্য খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত হইয়াছিল। (বৌদ্ধাচার্য) বসুবন্ধু খ্রীঃ ৫ম শতাব্দীতে, অর্থাৎ মগধের রাজা স্কন্দগুপ্তের সময়ে জীবিত ছিলেন। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ অব্দ।—কুমারিলভট্টের জীবিতকাল ৫৯০—৬৫০ খ্রীঃ অঃ। শ্রীশঙ্করাচার্যের জীবিতকাল ৬৮৬—৭২০ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং কুমারিল ও শঙ্কর সমসাময়িক নহেন। শ্রীনিম্বার্কচার্যের জীবদ্দশায় তদীয় শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ভাষ্যের নাম—"বেদান্তকৌস্তভ"। স্বীয় গুরুদেবের আজ্ঞায় শ্রীনিবাসাচার্য এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।—কাশী সংস্কৃত সাবিজ পুস্তকমালার ৯৯ সংখ্যক গ্রন্থে (ব্রহ্মসূত্রের শ্রীনিম্বার্কভাষ্য ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যভাষ্য) শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকাদাস কর্তৃক সংস্কৃতভাষায় লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। স্বীয় ভাষ্যের ২।২।১৯ সূত্রের টীকায় শ্রীনিবাসাচার্য "ইতি বুদ্ধবচনাৎ" বলিয়া কয়েকটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরবর্তী ২৮ সংখ্যক সূত্রের ভাষ্যে "উক্তঞ্চ বিপ্রভিক্ষুণা" বলিয়া যে একটী শ্লোক ("অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি। ইত্যাদি) উদ্ধৃত করা হইয়াছে,—তাহার আলোচনা করিলে সশিষ্য শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সময় নিরূপণে বিশেষ সাহায্য হইবে। এই শ্লোকটী ভাস্করভাষ্যে এবং ভামতীতেও আছে। খণ্ডনখণ্ডনখাদ্য-টীকা বিদ্যাসাগরী হইতে ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বিপ্রভিক্ষুই ধর্মকীর্তি। তিব্বতের রাজা স্রোংসাংগাম্পো এবং এই ধর্মকীর্তি সমসাময়িক, এবং উভয়েরই সময় খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দী। এই বিষয়ে বিরোধ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ধর্মকীর্তি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের পূর্ববর্তী। এই কথাগুলি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (অধুনা স্বামী শ্রীমৎ চিদ্‌ঘনানন্দ) মহাশয়ের লেখা হইতে সংক্ষেপতঃ সংগৃহীত। এই বিপ্রভিক্ষু সম্বন্ধে হিন্দী সুদর্শন পত্রিকায় (মাঘ ১৯৯২ সং) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত

নৃসিংহবাবু এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীদাসজী যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি। নৃসিংহবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ এই,— শ্রীনিবাসাচার্য-উদ্ধৃত "বিপ্রবন্ধু" কে যদি "বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি" বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহার নাম শ্লেষসহকারে লিখিয়াছেন, কারণ. তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করায় সমকালীন লোকেরা তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং শ্রীনিবাসাচার্যও তাঁহার সমকালীন ছিলেন। এই কারণে ধর্মকীর্তির উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাসাচার্য "বিপ্রবন্ধু" এই নিন্দাসূচক শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন।

। "বিপ্রবন্ধু" এই শব্দদ্বারা বিপ্রভিক্ষুকেই বুঝাইতেছে। নৃসিংহ বাবুর উক্তি হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীনিবাসাচার্য এবং বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি সমসাময়িক।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীদাসজী যাহা বলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—শ্রীনিবাসাচার্য-কৃতভাষ্যে বিপ্রভিক্ষু ধর্মকীর্তির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—তিনি কুমারিল ভট্টের ভ্রাতুষ্পুত্র বা শিষ্য ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কথা বলা হইয়া থাকে। বিপ্রভিক্ষু ধর্মকীর্তি প্রথম শতাব্দীর লোক ছিলেন। কুমারিলের মৃত্যুসময়ে শ্রীশঙ্করাচার্যের বয়স প্রায় ১৫ বৎসর। এই ধর্মকীর্তি (কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র) অন্য এক ব্যক্তি, কারণ বৌদ্ধকালে মাত্র একজন ধর্মকীর্তিই ছিলেন। এক নামের বহু লোকই থাকিতে পারে।

কি কারণে পণ্ডিতজী ধর্মকীর্তিকে প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই। যাহা হউক, তাঁহার উক্তি হইতে অন্ততঃ ইহাই প্রমাণিত হইল যে জন্মেজয়ের রাজত্বকালে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব, এই যে প্রচলিত কিম্বদন্তী তাহা ভিত্তিহীন।

এস্থলে একজন নিরপেক্ষ লেখকের প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম, এ, বি, এল্) মহাশয় ১৩৪২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকার "বৈষ্ণব মতবিবেক" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিতেছেন,—

"শঙ্কর সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীমদাচার্য শঙ্করের পূর্ববর্তী হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, শ্রীপাদ নিম্বার্ক ও নিম্বার্কভাষ্য শঙ্করের শারীরক ভাষ্যের পূর্ববর্তী হইলে শ্রীমদাচার্য শঙ্কর অবশ্যই স্বীয়ভাষ্যে তাহার উল্লেখ করিতেন। কিন্তু এরূপও হইতে পারে যে, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা হেতু ঐ সম্প্রদায় আচার্য শঙ্করের গোচরীভূত না হওয়ায় তাঁহার ভাষ্যে বা পরবর্তী শঙ্করবিজয়গ্রন্থে নিম্বার্কের বা তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীমদাচার্য রামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য উভয়েই শ্রীমন্নিম্বার্কদেবের পরবর্তী; কিন্তু তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের ভাষ্যে নিম্বার্কমতের উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, শ্রীমদাচার্য (নিম্বার্ক) ইঁহাদের পরবর্তী।

পক্ষান্তরে এ আপত্তিও উঠিতে পারে যে, আচার্য শঙ্করের মতবাদ যখন নিম্বার্কভাষ্যে খণ্ডিত হয় নাই, তখন আচার্য শঙ্কর আচার্য নিম্বার্কের পরবর্তী, কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, দেবর্ষি নারদের শিষ্য সত্ত্বগুণাবলম্বী নিম্বার্ক মাত্র ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্যমাত্র ব্যাখ্যা সম্প্রদায় রক্ষণের জন্য করিয়াছেন, বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, তাঁহাদের আচার্যদেব যখন শ্রীমন্নারদের শিষ্য, তখন তিনি বহু পূর্ববর্তী। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেব প্রমুখ ঋষিগণ কল্পান্তজীবী। তাঁহারা এখনও বর্তমান আছেন। উপযুক্ত অধিকারী এখনও তাঁহাদের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন, না হইলে মধ্বসম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য মধ্ব কি প্রকারে শ্রীমৎব্যাসদেবের শিষ্যত্বলাভ করিলেন? আচার্য শঙ্করই বা কি প্রকারে

ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন? সুতরাং শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যকে ঐতিহাসিককালে আনয়ন করিলেও তাঁহার ঋষি সম্প্রদায়ের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইবে না। পরন্তু ঋষি সম্প্রদায়ের সহিত অদ্যাপিও বর্তমান থাকিয়া তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের পরম মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং উপযুক্ত অধিকারীকে তাঁহারা এখনও দর্শন দান করিয়া শক্তিসঞ্চার করিতেছেন, এবিশ্বাস যেন তাঁহারা পরিত্যাগ না করেন।"

১৩৩২ সনে বরিশাল শ্রীশঙ্করমঠ হইতে প্রকাশিত, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী প্রণীত এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" (প্রথমভাগ) নামক গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্কভাষ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে,—"নিম্বার্কভাষ্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৈদান্তিক অন্যমতের উপর আক্রমণ নাই। অনেকস্থলে কেবল সূত্রার্থ অতিসংক্ষেপে নির্দেশ করিয়াছেন। সমন্বয়সূত্রে একটু বিচার আছে, তাহা ছাড়া বিচার আর কোথাও বিশেষ নাই। বাস্তবিক নিম্বার্কের ব্যাখ্যা, ঠিক ভাষ্য নহে। উহা সূত্রার্থসংক্ষেপ মাত্র। শ্রীমৎ দেবাচার্যের বৃত্তিতে শাঙ্কর মত খণ্ডনের প্রয়াস আছে। নিম্বার্ক ও শ্রীনিবাস কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত নির্দেশ করিয়াছেন এবং দেবাচার্য শাঙ্করমতের আক্রমণ হইতে দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত রক্ষা করিবার জন্য শাঙ্করমত খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্বার্কের জীবনের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে দেখিতে পাই—তিনি যোগী ছিলেন। হইতে পারে, তিনি কেবল স্বীয় সিদ্ধান্তমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তচ্ছিষ্য শ্রীনিবাসও গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। দেবাচার্য যখন দেখিলেন শাঙ্করমতের প্রভাবে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতবাদ হীনপ্রভ হইতেছে, তখন শাঙ্কর মত নিরসন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।"

এই পর্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, যদি আমরা শ্রীনিবাসাচার্যের ভাষ্যরচনার কাল খ্রী° সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধেও গ্রহণ করি তাহা হইলেও ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করা হয় না। সুতরাং শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব খ্রী° ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ, এবং ভাষ্য রচনা ঐ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হইয়াছিল বলিয়া যদি ধরা যায় তাহা হইলে সত্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় না। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের জীবিতকালেই শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের ভাষ্য রচিত হয়। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের কিংবা শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের মত সিদ্ধযোগী পুরুষের পক্ষে অন্ততঃ দেড়শত কি দুইশত বৎসর জীবিত থাকা কোনও প্রকারেই অসম্ভব নহে। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়, তাঁহার রচিত "আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ" (দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৩৮—৬৪০ পৃষ্ঠা) নামক গ্রন্থে বলেন, "শঙ্কর সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধযোগী। ইনি, যতদিন ইচ্ছা দেহ রাখিতে পারেন, অথবা দেবী ভাগবতের মতে, ইনি ছায়া শুকদেবের সন্তান। শুক, ব্রহ্মজ্ঞানানন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যাসের অনুরোধে ছায়া আকারে গৃহে ফিরিয়া আসেন; ইনিই সেই ছায়া শুক।…যোগশক্তিতে অবিশ্বাসী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে, শুকদেব ও গৌড়পাদের মধ্যে বহু সহস্র বৎসর ব্যবধান হওয়ায় শঙ্কর সম্প্রদায়, মুনি ঋষিগণের সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচিত হন।…আর যোগশক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন কথাই নাই; কারণ তাঁহাদেরমতে গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই যোগী, তাঁহারা যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া থাকিতে পারেন।"

উক্ত গ্রন্থের ৬৩৮ পৃষ্ঠায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন—"গোবিন্দপাদ শেষাবতার, ইনিই এক সময়ে পতঞ্জলিরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই সেই পতঞ্জলিদেব, যোগসাহায্যে কলিকালে শঙ্করাবির্ভাব পর্যন্ত দেহরক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।"

(ক্রমশঃ)

মহানির্বাণতন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসতীস চন্দ্র দেব

ষট্‌চক্র—উপরে যোগাঙ্গের যে সব কথা বলা হইল তাহা বুঝিতে হইলে দেহতত্ত্ব ও তদনুসঙ্গীয় ষট্‌চক্র ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকটা জানিয়া লওয়া দরকার। যোগশাস্ত্রমতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা যাহা আছে মানবদেহেও তৎসমস্তই আছে, এইজন্য মানবদেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মানবদেহেও মেরু (spinal chord) আছে। এই মেরুদণ্ডে সাতটি চক্র আছে, প্রতি চক্রে একটী করিয়া সাত চক্রে সাতটী লোক বিদ্যমান। সহস্রারে সত্যলোক, আজ্ঞাচক্রে তপলোক, বিশুদ্ধচক্রে জনলোক, অনাহত চক্রে মহর্লোক, মণিপুর চক্রে স্বর্লোক, স্বাধিষ্ঠান চক্রে ভুর্লোক, এবং মূলাধার চক্রে ভূর্লোক। এই মেরুর অন্তর্গর্ভে সুষুম্না বলিয়া একটা নাড়ি আছে। তাহার মধ্যভাগে চিত্রিণী বলিয়া আর একটি নাড়ি আছে। এই নাড়ি পদ্মসমূহকে ভেদ করিয়া অবস্থিত আছে। সুষুম্না নাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা ও বামে ইড়া নাড়ী আছে। সুষুম্না নাড়িকে সরস্বতী, পিঙ্গলাকে যমুনা এবং ইড়াকে গঙ্গা নদী বলা হয়। এই তিনটি নাড়ির মুখ মূলাধার চক্রে আসিয়া মিলিয়াছে বলিয়া মূলাধারকে ত্রিবেণী ও সুষুম্না নাড়ীর মুখকে ব্রহ্মদ্বার বলা হয়। এই ব্রহ্মদ্বারকে রুদ্ধ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন। সাধনা দ্বারা এই কুণ্ডলিনীকে চক্রভেদপূর্বক সহস্রার পদ্মে উঠানই কুণ্ডলিনী উত্থাপন বা ষট্‌চক্রভেদবিশিষ্ট যোগাঙ্গবিশেষ।

চক্র—দেহের মধ্যে ছয়টী তান্ত্রিক শক্তিকেন্দ্রকে চক্র বা পদ্ম বলে। চক্র সর্বশুদ্ধ ছয়টী—(১) মূলাধার (২) স্বাধিষ্ঠান (৩) মণিপুর (৪) অনাহত (৫) বিশুদ্ধ (৬) আজ্ঞা। এই ছয়টীর উপরে সহস্রদলবিশিষ্ট সহস্রার পদ্ম বিদ্যমান।

(১) মূলাধার—গুহ্যের উর্ধে এবং লিঙ্গের নীচে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যভাগে আধার পদ্ম অবস্থিত। কুলকুণ্ডলিনীর আধার বলিয়া ইহাকে মূলাধার বলা হয়। এই পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট, এবং অধোমুখে বিকসিত। দল চারিটীতে দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিন্দুযুক্ত তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ ব, শ, ষ, স এই চারিটী বর্ণ ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত আছে। পদ্মের কর্ণিকায় ধরামণ্ডল, ইহা চতুষ্কোণ, পীতবর্ণ ও শূলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত। ধরামণ্ডলের মধ্যভাগে ধরাবীজ 'লং' শোভমান। এই বীজ চতুর্ভুজ, ঐরাবতরূঢ়, পীতবর্ণ ও বজ্রহস্ত। বীজের ক্রোড়দেশে রক্তবর্ণ, চারি হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র ও অভয়ধারী শিশুরূপী চতুর্মুখ ব্রহ্মা আছেন; কর্ণিকা মধ্যে রক্তপদ্মোপরি চক্রাধিষ্ঠাত্রী ডাকিনী শক্তি আছেন। উনি রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা এবং শূল, খট্টাঙ্গ, খড়্গ ও বষকধারিণী। কর্ণিকা মধ্যে ত্রৈপুর নামক একটা ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র তাড়িতের ন্যায় দীপ্তিমান এবং তন্মধ্যে কামবায়ু ও কামবীজ আছেন। তাহাদের উপরিভাগে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শিব অধোমুখে অবস্থান করিতেছেন। স্বয়ম্ভুলিঙ্গ কোমল, নবপল্লববর্ণ

এবং নদীর আবর্তবৎ বর্তুলাকার। উক্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গের উর্ধভাগে মৃণালতন্তুবৎ অতি সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী শক্তি অধিষ্ঠিত আছেন এবং আপন মুখ ব্যাদন করিয়া ব্রহ্মদ্বারের মুখদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সুপ্ত ভুজঙ্গবৎ সার্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মস্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। কুণ্ডলিনী শক্তি মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, নিত্যানন্দস্বরূপিণী, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি রহিয়াছেন। কুণ্ডলিনী শক্তির উপরে লিঙ্গাগ্রে দণ্ডাকার চিৎকলা বিদ্যমান।

(২) স্বাধিষ্ঠান—সুষুম্নার মধ্যে লিঙ্গের মূলদেশে সিন্দুরবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জল ষড়্দলবিশিষ্ট একটী পদ্ম আছে, ইহাই স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। এই পদ্মের ষড়্দলে বিন্দুযুক্ত ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টী বর্ণ বিন্যস্ত আছে। এই ষড়্দলে ছয়টী বৃত্তি যথা—প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্বনাশ (অজ্ঞানতা যদ্দ্বারা সর্বস্ব নষ্ট হয়) ও ক্রূরতা বিদ্যমান। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল বিদ্যমান. তাহার মধ্যে শারদায় চন্দ্রমাবৎ শুভ্র মকরবাহন বরুণবীজ 'বং' শোভমান। এই বীজের ক্রোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর, পীতবসন পরিহিত নবযৌবনবিশিষ্ট শ্রীবৎস ও কৌস্তভমণি পরিশোভিত শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রধারী চতুর্ভুজ দেব নারায়ণ গরুড়োপরি বিরাজমান আছেন। কর্ণিকা মধ্যে রক্তপদ্মোপরি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা শূল, পদ্ম, ডমরু ও অসিধরা, ত্রিনেত্রা, কুটিল দংষ্ট্রা, ভয়ঙ্করী রাকিণীশক্তি বিরাজিতা আছেন।

(৩) মণিপুর—স্বাধিষ্ঠান পদ্মের উর্ধভাগে নাভিমূলে দশদলসমন্বিত এক পদ্ম আছে, ইহাই মণিপুর পদ্ম। এই পদ্ম গাঢ় মেঘবৎ এবং দশদলে ক্রমান্বয়ে বিন্দুযুক্ত ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ. এই দশটী বর্ণ বিন্যস্ত আছে। এই সকল বর্ণ নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী। দশদলে আবার দশটী বৃত্তি আছে। যথা,—লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায় (নিশ্চেষ্টতা) মোহ, ঘৃণা ও ভয়। কর্ণিকা মধ্যে ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল বিদ্যমান। ইহা অরুণবর্ণ ও প্রাতঃকালীন ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট এবং ইহার বাহিরে তিনটী দ্বার বিদ্যমান। এই ত্রিকোণ-মণ্ডলে বহ্নিবীজ রং বিদ্যমান। বহ্নিবীজ মেষাধিরূঢ় নবোদিত সূর্যসন্নিভ ও চতুর্বাহু সমন্বিত। বীজের ক্রোড়দেশে সিন্দুরবৎ, অরুণবর্ণ, ভস্মবিলিপ্তাঙ্গ, ত্রিলোচন, বরাভয়ধারী, দ্বিভুজ। বৃদ্ধরূপী সংহারকর্তা রুদ্র অবস্থান করিতেছেন। এবং কর্ণিকা মধ্যে রক্তপদ্মোপরি নীলবর্ণা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বজ্র-শক্তি-বর-অভয়ধরা ঘোর দ্রংষ্ট্রা লাকিণীশক্তি বিরাজ করিতেছেন।

(৪) অনাহত পদ্ম—হৃদয়ে বন্ধুক পুষ্পবৎ সমুজ্জল একটী দ্বাদশদল পদ্ম আছে, ইহাই অনাহত পদ্ম। পদ্মের দ্বাদশদলে সিন্দুরের ন্যায়, অরুণবর্ণ, সবিন্দু, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, এই দ্বাদশটী বর্ণ আছে। দ্বাদশদলে আবার দ্বাদশটী বৃত্তি আছে। যথা—আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, অহঙ্কার, বিবেক, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ। কর্ণিকা মধ্যে ধূম্রবর্ণ, ষড়কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল। তদুপরি সূর্যমণ্ডল, তন্মধ্যে কোটি বিদ্যুৎপ্রভাবিশিষ্ট ত্রিকোণ বর্তমান। তদুর্ধ্বে কৃষ্ণসারারূঢ়-ধূম্রবর্ণ-অঙ্কুশহস্ত-চতুর্ভুজ বায়ুবীজ 'যং' বিদ্যমান। বায়ু বীজের ক্রোড়ে, দ্বিভুজ বরাভয়কর হংসের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শিব বিদ্যমান আছেন। কর্ণিকা মধ্যে সর্বালঙ্কারভূষিতা, সুধার্দ্রহৃদয়া কঙ্কালমালাধরা, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা, পাশ-কপাল-বরাভয়করা,

পীতবস্ত্রপরিহিতা কাকিনীশক্তি আছেন। মধ্য ত্রিকোণে স্বর্ণবর্ণ অর্ধচন্দ্রবিন্দুরূপ (৺) মস্তকধারী বাণলিঙ্গ শিব আছেন। ইহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। তাহার নিম্নদেশে স্থির দীপকলিকাকার হংসরূপী জীবাত্মা। কর্ণিকার অধোদেশে রক্তবর্ণ অষ্টদল কমল। তাহাতে কল্পবৃক্ষতুল্য সর্বকামপ্রদ দেবতার আবাসভূমি। ইহাই মানস পূজার স্থান।

(৫) বিশুদ্ধ চক্র—কণ্ঠমূলে ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধ চক্র। ইহা ধূম্রবর্ণ এবং ইহার ষোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ সবিন্দু অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ বিদ্যমান। ষোড়শ দলের সাতটী দলে নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, দৈবত ও পঞ্চম এই সাতটী স্বর, অষ্টমদলে বিষ, অবশিষ্ট আটটী দলমধ্যে সাতটী দলে হুঁ, ফট, বৌষট্, বষট্, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ—এই সাতটী বীজ, এবং ষোড়শদলে অমৃত। কর্ণিকা মধ্যে শুক্লবর্ণ, বৃত্তাকার গগনমণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ চন্দ্রমণ্ডল, তদুপরি শুক্লবর্ণ, শুক্লগজারূঢ়, শুক্লবসনপরিহিত, পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়ধারী নভোবীজ 'হং' বিদ্যমান। বীজের ক্রোড়ে বৃষভোপরি অর্ধনারীশ্বর সদাশিব আসীন। উনি শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধারী ভস্মলিপ্তাঙ্গ ও নাগহার শোভিত; দশহস্তে শূল, টঙ্ক, খড়্গ, বজ্র, দহন, নাগেন্দ্র, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ, ও অভয় বিদ্যমান। কর্ণিকার চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, পীতাম্বরা, পঞ্চবক্ত্রা, ও ত্রিনেত্রা শাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর ও সবাসন বিদ্যমান।

(৬) আজ্ঞাচক্র—ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে দ্বিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্র বিদ্যমান। ইহা শুক্লবর্ণ এবং তাহাতে সবিন্দু স্বর্ণ বর্ণ 'হ' ও 'ক' দুইটী বর্ণ বিন্যস্ত আছে। কর্ণিকা মধ্যে শুক্ল পদ্মোপরিস্থিতা শুক্লবর্ণা, রক্তবর্ণবিশিষ্ট ষড়্‌বক্ত্রা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভুজা, বর, অভয়, অক্ষমালা, কপাল, ডমরু, ও পুস্তকধৃতা হাকিনীশক্তি বিরাজমান আছেন। তদূর্ধে ত্রিকোণ, তাহাতে শুক্লবর্ণ বিদ্যুদাকার ইতর লিঙ্গ শিব। তদূর্ধে ত্রিকোণে প্রণবাকৃতি অন্তরাত্মা, তদূর্ধে সূক্ষ্মরূপ মন, তদূর্ধে চন্দ্রমণ্ডলে হংসক্রোড়ে সশক্তিক পরম শিব বিদ্যমান। যোগীব্যক্তিরা আজ্ঞাপদ্মস্থিত হাকিনী শক্তিকে ও তৎপর মন, তৎপর কর্ণিকা মধ্যে ইতরাখ্য শিব ও তৎপর প্রণব চিন্তা করিবেন। এইরূপ করিলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়।

আজ্ঞাচক্রের উর্ধ্বে ও সহস্রদল কমলের নিম্নভাগে গুপ্তাবস্থায় আরও কয়েকটী চক্র আছে। গুপ্তচক্র মধ্যে প্রথমে ষড়্‌দলবিশিষ্ট মনশ্চক্র। ষড়্‌দলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধতত্ত্ব বিদ্যমান। তদূর্দ্ধে ষোড়শদলবিশিষ্ট সোমচক্র। ষোড়শদলে ধৈর্য, বৈরাগ্য, কৃপা মৃদুতা, ধৃতি, সম্পদ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য এবং একাগ্রতা নামক কলা বিদ্যমান। এই শেষ চক্রের উপর নিরালম্বপুরী, ইহা বায়ুর লয়-স্থান। এই স্থানের উপরে বর ও অভয়প্রদ, শুদ্ধজ্ঞানপ্রকাশক শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মাত্মক ত্রিকোণ আছে। যোগীব্যক্তি গুরুর চরণকমল ধ্যান করিতে করিতে যখন ইহা দর্শন করেন তখন তাহার বাক্‌সিদ্ধি হয়।

(ক্রমশঃ)

শুক্রনীতিসার

(বঙ্গানুবাদ)

শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন

প্রথম অধ্যায়

মহর্ষি শুক্রাচার্যকে অসুরগণ বন্দনা, পূজা এবং স্তব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, জগতের আধার জগদীশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহাদিগকে যথাক্রমে নীতিসার বলিলেন। ১২। পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকহিতের নিমিত্ত শতলক্ষশ্লোকপরিমিত নীতিশাস্ত্র বলিয়াছিলেন। ২। তৎপরে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আমরা সকলে, অল্পায়ু রাজা ও প্রজাদিগের বৃদ্ধির জন্য তর্কসঙ্কুল নীতিশাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সঙ্কলন করিয়াছি। ৩২। এক এক বিষয়ে শিক্ষাপ্রদ শাস্ত্র বহু আছে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র সকল লোকেরই উপযোগি এবং লোকরক্ষার উপায় স্বরূপ। ৪২। এই জন্যই ইহাকে ধর্ম, অর্থ এবং কামের মূল কারণ ও মোক্ষদায়ী বলা হয়। ৫। অতএব রাজা সর্বদা বিশেষ যত্নসহকারে এই নীতিশাস্ত্র অভ্যাস করিবেন, কারণ এই শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে রাজা, অমাত্য প্রভৃতি সকলে শত্রুজয়ী এবং প্রজারঞ্জক হইয়া থাকে। ৬। সুনীতি-কুশল নরপতিগণ নিত্যই অভ্যুদয় লাভ করে। ব্যাকরণশাস্ত্র ব্যতিরেকে শব্দ ও অর্থজ্ঞান কি হয় না? ৭। ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি ব্যতীত প্রাকৃত পদার্থ অর্থাৎ সাধারণ বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয় না কি? মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞান ভিন্ন যজ্ঞাদির বিধি ও অনুষ্ঠান কি হইতে পারে না? ৮। দেহ পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থের নশ্বরত্বজ্ঞান বেদান্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে হয় না কি? এই সব শাস্ত্র আছে, তাহারা স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায়ই বুঝাইয়া থাকে। ৯। এবং যাঁহারা ঐ ঐ মতাবলম্বী (একদেশদর্শী) তাঁহারাই উহা আলোচনা করেন। ইহা কেবল বুদ্ধিকৌশলমাত্র। ইহাতে সাধারণ লোকের কি উপকার হয়? (অর্থাৎ কোন উপকার হয় না।) ১০। আহার ব্যতীত যেমন দেহীদিগের দেহ রক্ষা হয় না, সেইরূপ নীতিশাস্ত্র ব্যতীত লোক-ব্যবহার রক্ষা হয় না। ১১। নীতিশাস্ত্র সকলেরই উপকারী এবং সকলেরই সম্মত। রাজা সকলের প্রভু। অতএব এই শাস্ত্র তাঁহার অত্যন্ত আবশ্যক। ১২। যেমন কুপথ্যসেবী ব্যক্তির ব্যাধি সদ্য বা কালক্রমে হয়, অথবা হয় না, সেইরূপ নীতিহীন ব্যক্তিরও শত্রু সদ্য বা যথাকালে হয়, অথবা হয় না। ১৩। প্রজার পরিপালন এবং সর্বদা দুষ্টের দমনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই দুইটীই নীতি ভিন্ন হয় না। ১৪। ছিদ্রের ন্যায় অনীতি রাজার পক্ষে নিত্য ভয়াবহ, শত্রু-সংবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত বলহ্রাসকর কথিত হইয়াছে। ১৫। যে নীতিত্যাগকারী সে স্বতন্ত্র অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল এবং সে দুঃখপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্বতন্ত্র প্রভুর সেবা অসিধারের অবলেহনের ন্যায়। ১৬। নীতিমান্ রাজাকে সন্তুষ্ট করা যায় কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ রাজা দুরারাধ্য।

যেখানে নীতি এবং শক্তি বর্তমান, সেখানে সকল দিকেই লক্ষ্মী বিরাজিতা থাকেন। ১৭। নরপতি আত্মহিতের জন্য নীতিকে এমনভাবে গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সমস্ত রাষ্ট্র অপ্রেরিত হিতকর হয় অর্থাৎ বিশেষ প্রেরণা ব্যতিরেকে সকলে রাষ্ট্রের হিতসাধন করে। ১৮। যে রাজা সর্বদা অনীতিপরায়ণ তাহার অকৌশল্য (অর্থাৎ অনৈপুণ্য) হেতু তাহার রাষ্ট্র, সৈন্য, অমাত্য ও পারিষদ্‌বর্গ সমস্তই ভেদপ্রাপ্ত হয়। ১৯। তপস্যায় শক্তি লাভ হয়। রাজা শাস্তিদায়ক, পালনকারী এবং প্রজারঞ্জক। তিনি পূর্ব জন্মের কর্মফলে এবং তপস্যা করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন করেন।২০।

বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম, নক্ষত্র ইহাদের গতি ও রূপের স্বভাব হইতে কালের সাধারণ বিভাগ আছে। কিন্তু আচার হইতে ইষ্ট (শুভ) ও অনিষ্ট (অশুভ) এর ন্যূনাধিক্য দ্বারাও কালের (যুগধর্মের) বিভাগ হয়। ২১। রাজাই আচারের চালক এবং এই আচারই কালের (যুগাদির) কারণ। যদি কালই একমাত্র প্রমাণ (অর্থাৎ আচারের প্রবর্তক) হয় তাহা হইলে কর্তার ধর্ম থাকে কি করিয়া ?। ২২। রাজদণ্ডের ভয়েতেই লোকসকল স্ব স্ব ধর্মে রত থাকে। যে স্বধর্মে নিরত সে এই জগতে তেজস্বী হয়। ২৩। স্বধর্ম ব্যতীত সুখ হয় না। স্বধর্মই পরম তপস্যা। যে ব্যক্তি স্বধর্মপালনরূপ তপস্যাকে বর্দ্ধিত করে দেবতারাও তাহার কিঙ্কর হয়, সুতরাং সেখানে মানুষের কথা বলিবার আর কি আছে। ২৪;। রাজা স্বধর্মে থাকিয়া ভয়প্রদ সুদণ্ড পরিচালন করিয়া প্রজাবর্গকে ধর্মে অনুরক্ত করিবেন। ইহার অন্যথায় রাজার তেজঃক্ষয় হয় অর্থাৎ রাজশক্তির হ্রাস হয় ৫;। অভিষিক্তরূপে রাজ্য পাইয়া অথবা বুদ্ধি, বল এবং শৌর্যের দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া রাজা প্রতিদিন সকল প্রজাকে যথানীতি পালন করিবার জন্য সর্বদা অচ্ছিদ্র ও দণ্ডধারী হইয়া থাকিবেন। ২৭। সতত বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যদর্শী ব্যক্তির অতি অল্প অর্থও বাড়িয়া যায়। এমন কি তীর্যক্‌ জাতিও শৌর্য্য, নীতি, বল ও ধনের দ্বারা বশীভূত হয়। ২৮। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক এই তিন প্রকার তপস্যা আছে। যে রাজা যে বিষয়ে অতিমাত্র তপস্যা করেন, তিনি সেইরূপ হন। ২৯। যিনি স্বধর্মনিরত, প্রজাপালক, সর্ববিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, শত্রুবর্গের শিক্ষাদাতা, দানবীর, ক্ষমাশীল, শূর, বিষয়ে অনাসক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত এবং সত্ত্বগুণসম্পন্ন হন, অন্তে সেই রাজারই মোক্ষ-লাভ হয়। ৩১। ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন দয়াহীন, মদোন্মত্ত, হিংসুক এবং অসত্যপরায়ণ রাজাই তমোগুণসম্পন্ন হন এবং মরণান্তে নরকে যান। ৩২। দাম্ভিক, লোভী, বিষয়ী, বঞ্চক, শঠ, মন-বাক্য-কর্মে বিপরীত কার্যকারী (অর্থাৎ মনে এক, মুখে আর এবং কার্যে আর একরূপ ব্যবহারকারী) কলহপ্রিয়, নীচপ্রিয়, স্বতন্ত্র (স্বেচ্ছাচারী), নীতিহীন এবং ছলনাপরিপূর্ণ রাজাই রাজসিক গুণযুক্ত। এই নৃপাধমই মৃত্যু অন্তে তীর্যক্‌-যোনি বা স্থাবর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৩৪। সাত্ত্বিক ব্যক্তি দেবতার অংশ-সম্পন্ন, তামস্‌ ব্যক্তি রাক্ষসাংশসম্পন্ন এবং রাজস্‌ ব্যক্তি মানবাংশসম্পন্ন। অতএব সর্বদাই সাত্ত্বিকবিষয়ে মনকে নিবেশ করিবে। ৩৫।

সত্ত্ব এবং তমোগুণের সমান মিলনে (অর্থাৎ রজোগুণ উৎপন্ন হইলে) মানুষ জন্মগ্রহণ করে। কর্মানুসারে মানুষ যখন যে গুণ আশ্রয় করে তখন তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৩৬।

সুগতি এবং দুর্গতির কারণ-ই কর্ম। কর্মই প্রাক্তন (অদৃষ্ট)। কেহ কি ক্ষণমাত্রও কোন কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে? ৩৭। জাতিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ বলিয়া কেহ নাই; এসকলই গুণ এবং কর্মের ভেদে হইয়া থাকে। ৩৮। ব্রহ্ম হইতে যাহরা জন্মিয়াছে তাহারা সকলেই কি ব্রাহ্মণ? বর্ণ হইতে বা জনক হইতে ব্রহ্মতেজ পায় না। ৩৯। জ্ঞান এবং কর্মের উপাসনা দ্বারা দেবতার আরাধনে নিরত, শান্ত, দান্ত, দয়ালু, এই সকল গুণ যাহার আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। ৪০। লোকরক্ষায় দক্ষ, শূর, জিতেন্দ্রিয়, পরাক্রমী এবং দুষ্টদমনকারী ব্যক্তি ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকারী। ৪১। ক্রয়-বিক্রয়ে কুশল, নিত্যপণ্যজীবী, পশুরক্ষাকারী, এবং কৃষিকার্যকারী ব্যক্তিই জগতে বৈশ্যখ্যাতিসম্পন্ন। ৪২। দ্বিজের সেবা এবং অর্চনায় রত, শূর, শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, লাঙ্গল, কাষ্ঠ ও তৃণ বহনকারী, অর্থাৎ ক্ষুদ্রকর্মকারী ব্যক্তি শূদ্রআখ্যাধারী। ৪৩। স্বধর্ম্মের আচরণ ত্যাগকারী, নির্দয়, পরপীড়ক, উগ্রস্বভাব, হিংসক এবং সর্বদা বিচারশূন্য ব্যক্তিই ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত। ৪৪। পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারেই মানুষের বুদ্ধি জন্মায়। (এ জন্মের) পাপ বা পুণ্য-কর্মের দ্বারা তাহার কোনও পরিবর্তন করিবার শক্তি থাকে না। ৪৫। যেরূপ প্রাক্তন কর্ম, সেই-রূপই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেরূপ ভবিতব্যতা, সেইরূপই সহায় পাওয়া যায়। ৪৬। সকলেই পূর্বজন্মের কর্মফলের বশীভূত ইহা নিশ্চিত, অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বোধক উপদেশ বৃথা। ৪৭। বুদ্ধিমান্, আদর্শচরিত্র ব্যক্তিগণ পুরুষকারকেই প্রধান বলেন। আর পুরুষকারে অশক্ত ক্লীব ব্যক্তিরাই দৈবের উপাসনা করে। ৪৮। দৈব এবং পুরুষকারেতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্মই দৈব এবং ইহজন্মে অর্জিত কর্মই পুরুষকার। ইহাতেই কর্ম দুই প্রকার হইয়াছে। ৪৯। বলবান্ ব্যক্তি সর্বদাই দুর্বলের প্রতিকার (অর্থাৎ উপকার বা অপকার) করে। ফল দেখিয়াই সবল এবং দুর্বল নির্ণয় হয়, অন্যথা হয় না। ৫০। প্রত্যক্ষ কারণে ফলপ্রাপ্তি দেখা যায় না (অর্থাৎ কার্য করা হইল তাহার ফল পাওয়া উচিত বুঝা যাইতেছে কিন্তু তাহা হইল না)। ইহার কারণ প্রাক্তন কর্ম; ইহা ছাড়া অন্য কারণ নাই। ৫১। অল্প কার্য করিয়া বৃহৎ ফল পাওয়া যায়, তাহাই প্রাক্তন। কেহ বলেন, ইহা দৈব ও পুরুষকারের কর্মফল। ৫২। কাহারও মত, মানুষের পৌরুষ ইহজন্মের ক্রিয়া দ্বারা জন্মায়, যেমন তৈল ও সলিতাযুক্ত প্রদীপকে বাতাস হইতে যত্ন করিয়া রক্ষা করিতে হয়। ৫৩। অবশ্যম্ভাবী কার্যের যদি প্রতীকারের ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে যতদূর বুদ্ধি ও বল তদনুসারে দুষ্ট বিষয়ের দূর করাই শ্রেয়ঃ। ৫৪। অতএব রাজাও প্রতিকূল এবং অনুকূল ফল হইতে অল্প, মধ্য ও অধিক এই তিন প্রকার দৈব চিন্তা করিবেন। ৫৫। একটি বানর হইতে বনভঙ্গে রাবণের এবং একটি মনুষ্য হইতে গোগ্রহে ভীষ্মাদির পরাজয়ে দৈবের প্রতিকূলতা জানা গিয়াছিল। ৫৬। এবং রাম ও অর্জুনের দৈব অনুকূল তাহা (উক্ত কর্মে) স্পষ্টই জানা গিয়াছিল। দৈব অনুকূল থাকিলে অল্প চেষ্টাতেই সুফল পাওয়া যায়। ৫৭। দৈব প্রতিকূল থাকিলে বৃহৎ চেষ্টাও অনিষ্ট ফলপ্রদ হয়। যেমন দান করিয়া হরিশ্চন্দ্র এবং বলি বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৮। সৎক্রিয়াতে শুভ হয়, অসৎক্রিয়াতে অশুভ হয়। শাস্ত্রদ্বারা সৎ এবং অসৎ বুঝিয়া অসৎ কর্ম ত্যাগ করিয়া সৎকর্ম করিবে। ৫৯। রাজাই কালের

কারণ এবং তাহা হইতেই তিনি সৎ অসৎ কর্মের কারণ। রাজা সৎকার্য করিয়া ও উদ্যতদণ্ড হইয়া (অর্থাৎ বিহিতদণ্ড দিতে প্রস্তুত থাকিয়া) প্রজাসকলকে স্বধর্মে রক্ষা করিবেন। ৬০।

স্বামী (রাজা), অমাত্য (মন্ত্রীবর্গ), সুহৃৎ (মিত্ররাজ), কোশ, রাষ্ট্র (প্রজাসহ অধিকৃত ভূমি), দুর্গ, বল (সৈন্য) এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ। রাজাই তাহার মস্তক। ৬১। অমাত্যই চক্ষু, সুহৃৎই কর্ণ, কোশই মুখ, বলই মন, দুর্গ ই হস্ত এবং রাষ্ট্রই চরণ।৬২। ক্রমশঃ এই অঙ্গগুলির সর্বদা শুভাবহ গুণগুলি বলিতেছি; ঐ গুণসমূহে যুক্ত হইলে রাজাগণ বুদ্ধিমান্ নিরূপিত হন। ৬৩। যেমন চন্দ্র সমুদ্রের বৃদ্ধির হেতু, সেইরূপ বৃদ্ধদিগের নয়নানন্দকর রাজা এই জগতের বৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। ৬৪। যদি রাজা উপযুক্ত নেতা না হন, তাহা হইলে সমুদ্রে নাবিক-বিহীন নৌকার ন্যায় প্রজাগণ বিপন্ন হয়। ৬৫। পালক ব্যতীত প্রজাগণ স্বীয় স্বীয় ধর্মে রত থাকে না। এবং প্রজা না থাকিলে পৃথিবীতে রাজার শোভা হয় না। ৬৬। ন্যায়প্রবৃত্ত নরপতি আপনার এবং প্রজাবর্গের ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম সাধক হন, ইহার অন্যথায় নিশ্চয়ই ত্রিবর্গের নাশ হয়। ৬৬। রাজা যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে ধর্ম আচরণ করিয়া স্বর্গ ভোগ করিয়াছিলেন এবং (ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত) নহুষ (স্বর্গেই) অধর্মাচরণ করিয়া রসাতল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৮। বেণরাজা অধর্মে নষ্ট হইয়াছিলেন এবং পৃথুরাজা ধর্ম আচরণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব রাজা ধর্মকে প্রধান করিয়া অর্থলাভের যত্ন করিবেন। ৬৯। ধর্মপরায়ণ রাজাই দেবাংশসম্ভূত। ধর্মলোপী প্রজাপীড়নকারী রাজা রাক্ষসাংশসম্ভূত। ৭০। সর্বত্র অরাজক হইয়া যখন সমস্ত ভয়ে বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তখন তাহা হইতে রক্ষা করার জন্য প্রভু (ব্রহ্মা), ইন্দ্র, বায়ু, রবি, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের ইহাদিগের অংশ আকর্ষণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করেন। ৭২। ইন্দ্রের ন্যায় নরপতি নিজের তপঃপ্রভাব দ্বারা স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি হন, রক্ষাকার্যে কুশল হন। এবং ভাগভাক্ (ইন্দ্রপক্ষে—যজ্ঞভাগগ্রাহী ; রাজাপক্ষে—করগ্রাহী) হন। ৭৩। বায়ু যেমন গন্ধ বহনের হেতু, সেইরূপ নরপতি সৎ এবং অসৎ কর্মানুষ্ঠানের হেতু হন। রবি যেমন অন্ধকারনাশক সেইরূপ ধর্মের প্রবর্তক রাজা অধর্মের নাশক হন। ৭৪। যম যেমন দণ্ডধর, সেইরূপ সংযমস্থাপক রাজা দুষ্টকর্মের দণ্ডদাতা। অগ্নি যেমন রক্ষার জন্য সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও শুচি, রাজাও সেইরূপ রক্ষা করেন বলিয়া সকলের নিকট হইতে কর লইয়াও শুচি থাকেন। ৭৫। বরুণ যেমন জলের রস দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে পোষণ করেন, রাজা সেইরূপ স্বীয় ধন দ্বারা রাজত্বের পুষ্টিসাধন করেন। চন্দ্র কিরণ-বিস্তারে আহ্লাদ উৎপাদন করেন; রাজা স্বীয় সদ্গুণ কর্মদ্বারা রাজ্যের আনন্দদায়ী হন। ৭৬। কুবের নিধি রক্ষণে পটু; সেইরূপ রাজাও কোশরক্ষায় দক্ষ। চন্দ্র যেমন পূর্ণ কলা না পাইলে সুশোভিত হন না সেইরূপ রাজারও এই আটটী অংশ ব্যতীত পূর্ণবিকাশ হয় না। ৭৭। পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, বন্ধু, বৈশ্রবণ (কুবের) ও যম (অর্থাৎ শাসনশক্তি) এই সাত জনের সাত প্রকার গুণ রাজার সর্বদা বর্তমান থাকিবে। ইহার অন্যথায় রাজা উপযুক্ত হন না। ৭৮। পিতার ন্যায় রাজা স্বীয় প্রজাবর্গকে সৎগুণ উপার্জনে পটু করিবেন। মাতার ন্যায় রাজা পোষণগুণ

সম্পন্ন হইয়া অপরাধের ক্ষমাকারী হইবেন। ৭৯। গুরু (অর্থাৎ অধ্যাপক) যেমন শিষ্যকে সুবিদ্যা শিক্ষা দেন, তেমন রাজাও প্রজাবর্গকে হিত উপদেশ করিবেন। ভ্রাতা যেমন পৈতৃক ধন-সম্পত্তি হইতে স্বীয় ভাগ যথাশাস্ত্র গ্রহণ করে সেইরূপ রাজাও যথাশাস্ত্র (অর্থাৎ ন্যায়বিচারে) নিজের অংশ প্রজার নিকট হইতে লইবেন। ৮০। রাজা মিত্রের ন্যায় প্রজার দেহ, স্ত্রী, ধন এবং গুহ্য বিষয়ের রক্ষক হইবেন। রাজা কুবেরের ন্যায় ধনদাতা হইবেন এবং যমের ন্যায় সুশাসন করিবেন। ৮১। এই গুণ সাতটি প্রচুর অভ্যুদয়শালী রাজাতে বর্তমান থাকে। এই সাতটী গুণ হইতে রাজা কখনও ভ্রষ্ট হইবেন না। ৮২। শক্তিমান্ পুরুষই অপরাধের ক্ষমা করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তিই সুশাসনে সক্ষম। সমস্ত গুণে বিভূষিত হইলেও যে ভূপতির ক্ষমাগুণ নাই তাঁহার শোভা থাকে না। ৮৩।

যে রাজা নিজের দোষ পরিত্যাগ করিয়া নিন্দাবাদও সহ্য করেন; দান, মান, ও সৎকার দ্বারা স্বীয় প্রজাবর্গের রঞ্জক হন; যিনি দান্ত (ইন্দ্রিয় দমনকারী), শূর, শস্ত্র এবং অস্ত্র পরিচালনায় কুশল, শত্রুবিনাশে দক্ষ, স্বেচ্ছাচারী নহেন, মেধাবী, জ্ঞান ও বিজ্ঞানসংযুক্ত, নীচ ব্যক্তির সংসর্গহীন, দীর্ঘদর্শী, বৃদ্ধ (শাস্ত্রের জ্ঞান ও প্রয়োগে কুশল), সেবী, সুনীতিপরায়ণ, গুণী-জনপরিবেষ্টিত, তিনিই দেবতার অংশসম্পন্ন। ৮৬। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট রাজা রাক্ষসাংশসম্ভূত এবং তিনি নরকগামী হন। ৮৭½।

রাজার সহচরবর্গ রাজার অংশের তুল্য হইয়া থাকে। ৮৭। তাহাদের কৃতকার্য রাজা মানিয়া লন এবং তাহাদের আচরণে সর্বদাই সন্তুষ্ট হন এবং আনন্দিত হন। তিনি জোর করিয়া ইহার অন্যথা আচরণ করেন না। ৮৮।

প্রতিকার না করিলে কৃতকর্মের ফল মানুষকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। প্রতীকার করিলে আর ভোগ করিতে হয় না। ৮৯। যেমন রোগের চিকিৎসা হইলে লোক রোগমুক্ত হইয়া ভোগক্ষম হয়, তেমন ইহা অনিষ্টজনক জানিতে পারিলে কে সেই অনিষ্টকর কার্য করিতে যায়? । ৯০। মন শুভফল প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, অনিষ্টফলে আনন্দিত হয় না; অতএব হিতাহিত প্রতিপাদক শাস্ত্র পর্যালোচনা করিয়া ব্যবহার করিবে। ৯১। বিনয় (discipline) নীতির মূল। বিনয় শাস্ত্রনিশ্চয় হইতে উৎপন্ন হয়। বিনীত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়জয়ী এবং সেই ব্যক্তি শাস্ত্র মানিয়া চলে। ৯২। রাজা প্রথমে আপনাকে বিনয়সম্পন্ন করিবেন, তারপরে পুত্রদিগকে, পরে অমাত্যদিগকে, অতঃপর ভৃত্যদিগকে এবং শেষে প্রজাসকলকে বিনীত করিবেন। ৯৩। রাজার কেবল অন্যকে উপদেশ দিলে চলিবে না। গুণবান্ রাজাকেও কখন কখন প্রজাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ৯৪। প্রজাগণ দুর্বৃত্ত হইলেও রাজাবিহীন হইবে না। যেমন ইন্দ্রাণী বিধবা হন না, সেইরূপ প্রজাও কখন রাজাশূন্য হয় না। ৯৫। যে রাজার মন্ত্রিগণ দান্ত (বিনয়গুণযুক্ত) না হয়, দায়াদ (জ্ঞাতি) গণ অবিনীত, এবং পুত্রগণ দুষ্ট হয় তাহার রাজ্য ভ্রষ্টশ্রী ধারণ করে। ৯৬। যে রাজার প্রজা সর্বদা অনুরক্ত, যিনি প্রজাপালনে তৎপর, স্বয়ং বিনীতাত্মা, তাঁহার নিয়ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। ৯৭।

বিস্তৃত বিষয়রূপ অরণ্যে বিপ্রমাথী (দুর্দান্ত) ইন্দ্রিয়রূপ হস্তী দৌড়াইতেছে, তাহাকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশের আঘাতে বশীভূত করিতে হয়। ৯৮। মন বিষয়রূপ আমিষের লোভে ইন্দ্রিয়গণকে চালিত করে, তাহাকে যত্ন করিয়া রোধ করিতে হয়। যিনি ইহাকে রোধ করিতে পারেন তিনিই জিতেন্দ্রিয়। ৯৯। যিনি একমাত্র মনকেই সংযত করিতে পারেন না, তিনি কি করিয়া সাগরমেখলা বসুমতী জয় করিতে সমর্থ হইবেন। ১০০। যে রাজা কার্য শেষে অনিষ্টপ্রদ অথচ আপাতমনোহর বিষয়েতে লোভাকৃষ্ট হৃদয় হন, তিনি হস্তীর ন্যায় বন্ধনপ্রাপ্ত হন। ১০১। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটির এক একটীই বিনাশসাধনে যথেষ্ট। ১০২। হরিণ পবিত্র কুশের অঙ্কুর খায়, বহু দূর ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যাধের বাঁশীর ধ্বনিতে মোহিত হইয়া নিজের মৃত্যু খুঁজিয়া লয়। ১০৩। পর্বতের ন্যায় বৃহদাকার, অবলীলাক্রমে বৃক্ষ উৎপাটনে সক্ষম হস্তী হস্তিনীর মোহে বন্ধনপ্রাপ্ত হয়। ১০৪। স্নিগ্ধ দীপশিখার আলোক দর্শনে আকৃষ্টচক্ষু পতঙ্গ অগ্নিশিখার রূপে মোহিত হইয়া সহসা তাহাতে পতিত হয় ও মরিয়া যায়। ১০৫। অগাধসলিলসঞ্চারী মৎস্য ধীবর হইতে বহুদূরে বাস করিয়াও টোপযুক্ত বড়সী (রসলোভে) মৃত্যুর জন্য গিলিয়া ফেলে। ১০৬। ভ্রমরের উড়িবার জন্য পাখা আছে এবং কাটিবার শক্তি আছে তথাপি গন্ধ লোভে ঐ ভ্রমর পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়। ১০৭। বিষ তুল্য এক একটী বিষয়ই জীবের বিনাশে যথেষ্ট, যেখানে এই পাঁচটী একত্র কার্যকর হয় সেখানে বিনাশ কেন না হইবে ?। ১০৮।

দ্যূত (জুয়াখেলা), স্ত্রী ও অর্থ' এই তিনটী যখন অবিবেচনার সহিত সেবিত হয় তখন বহু অনিষ্টকর হয়, কিন্তু এইগুলিই যখন বিচারের সহিত সেবিত হয় তখন ধন, পুত্র ও বুদ্ধি প্রদান করে। ১০৯। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং নল প্রভৃতি রাজাগণ সরলতার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিজের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। দ্যূতক্রীড়ায় পটু ব্যক্তি কপটতার সহিত এই দ্যূতক্রীড়ায় ধন আহরণ করিতে পারে। ১১০। স্ত্রীলোকদিগের নামই আহ্লাদ উৎপাদন করিয়া চিত্তের বিকার আনয়ন করে। আর বিলাসে উৎফুল্ল ভ্রূযুগলশালিনী রমণীগণকে দর্শন করিলে যে কি হয় তাহা আর কি বলিব। ১১১। যে নারী নির্জনস্থানে স্বীয়ভাব প্রকাশে অত্যন্ত নিপুণা, যে নারী মৃদুস্বরে গদ্‌গদ বাক্য বলে এবং যাহার নয়নপ্রান্ত রক্তবর্ণ, এইরূপ নারী কোন পুরুষকে বশীভূত না করে। ১১২। অঙ্গনা জিতেন্দ্রিয় মুনির মনকেও অবশ্যই অনুরক্ত করে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরই যখন এই অবস্থা, তখন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কথা আর কি বলিব। ১১৩। স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া ইন্দ্র, দণ্ডক, নহুষ, রাবণাদি অনেকেই বিনষ্ট হইয়াছেন। ১১৪। যে পুরুষ স্ত্রীতে বিশেষ আসক্ত নয়, তাহার স্ত্রী সুখের হেতু হইয়া থাকে। স্ত্রী ব্যতীত গার্হস্থ্য কর্মে আর কেহই সহায় হইতে পারে না। ১১৫। অতিরিক্ত মদ্যপানে বুদ্ধি লোপ পায়। কিন্তু পরিমিত মদ্যপানে প্রতিভার বিকাশ, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ধৈর্যলাভ এবং চিত্ত স্থির হয়। মাত্রাধিক্য হইলে এই মদ্য বিনাশকারী হয়। ১১৬।

কাম এবং ক্রোধ মদ্য অপেক্ষাও মাদক। এই দুইটীকে যথাযথভাবে ব্যবহার

করিবে। ১১৭। প্রজাশাসনের জন্য কামের প্রয়োগ এবং শত্রু দমনের জন্য ক্রোধের ব্যবহার হইবে। ১১৭½।

জয়প্রার্থী রাজা সেনাসংধারণে (সেনাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য) লোভ রাখিবেন। ১১৮। নৃপতিগণ কখনও পরস্ত্রী সহবাসে কামনা করিবেন না, অন্যের অর্থে লোভ করিবেন না এবং স্বকীয় প্রজাবর্গের দণ্ডদানে ক্রোধ দেখাইবেন না। ১১৯। পরস্ত্রীসংসর্গকারীকে কি গৃহস্থ বলা যায়? আপনার প্রজাগণের দণ্ডদাতাকে কি শূর বলা যায়? অপরের ধনে কি ধনী হওয়া যায়? । ১২০। দেবগণ রক্ষাকার্যে বিমুখ নরপতিকে, তপস্যাশূন্য ব্রাহ্মণকে, আর দানকার্যে বিমুখ ধনীকে বিনাশ করেন এবং নরকে প্রেরণ করেন। ১২১। স্বামিত্ব (প্রভুত্ব), দানশীলতা এবং অর্থশালী হওয়া তপস্যার ফল। যাচক হওয়া, দাসত্ব করা এবং দরিদ্র হওয়া পাপের ফল। ১২২। অতএব নরনাথ শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করিয়া চিত্তকে সংযত করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য আপনার কর্তব্য পালন করিবেন। ১২৩।

দুষ্টের নিগ্রহ, দান, প্রজার পালন, রাজসূয়াদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ন্যায় পথে থাকিয়া অর্থোপার্জন, রাজাসকলকে করদ রাজ্য করা, রিপুবর্গের শাসন এবং রাজস্ববৃদ্ধি এই আট প্রকার রাজার বৃত্তি। ১২৫। যে রাজা বলবর্ধন করে না, রাজাগণকে অধীন করিয়া কর লইতে পাবে না, সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করিতে পারে না, তাহাকে ষণ্ডতিল (নপুংসক অর্থাৎ অকর্মণ্য) বলে। ১২৬। যে রাজা প্রজাগণকে সর্বদা উদ্বিগ্ন রাখে, যাহার কার্যকে সকলে নিন্দা করে এবং ধনী ও গুণী ব্যক্তিগণ যাহাকে ত্যাগ করে, তাহাকে অধম নৃপ বলে। ১২৭। যে রাজা নট, গায়ক, গণিকা, মল্ল, ষণ্ড, (নপুংসক), ও নিকৃষ্ট জাতিগণে আসক্ত, তিনি নিন্দনীয় এবং শত্রু সহজেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারে। ১২৮। যে রাজা বুদ্ধিমানের দ্বেষ করেন, বঞ্চকগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করেন এবং নিজের দুর্গুণ বুঝিতে পারেন না, তিনি আত্মনাশ করেন। ১২৯। যখন রাজা অপরাধের ক্ষমা করেন না, প্রচণ্ডদণ্ডদাতা হন, পরস্ব অপহরণ করেন এবং আপনার দোষ শ্রবণ করিয়া প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত পীড়ন করেন, তখন প্রজাবর্গ বিরক্ত এবং ভেদগ্রস্ত (অর্থাৎ রাজার প্রতি অনাসক্ত) হয়। ১৩০½।

গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া রাজা সংবাদ রাখিবেন যে, তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যাহারা জ্ঞাত আছে তাহারা এবং অমাত্যবর্গের মধ্যে কে কিভাবে তাঁহার সম্বন্ধে দোষারোপ করে বা গুণ আরোপ করে। তাঁহার প্রতি কাহার কিরূপ সম্প্রীতি বা অপ্রীতি আছে তাহা জানিবেন। ১৩২। নিজের গুণ এবং দোষ এসমস্তই গুপ্তভাবে জানিবেন। গুপ্তচর হইতে এবং লোকপরম্পরায় রাজা সর্বদা নিজের দোষ জ্ঞাত হইয়া যশ লাভের জন্য ঐদোষ নিরন্তর ত্যাগ করিবেন এবং কোন প্রকারেই প্রজাগণকে অপমান (অর্থাৎ অত্যাচার) করিবেন না। ১৩৩½। "লোকে আপনার নিন্দা করে" ইহা গূঢ়চর রাজাকে শুনাইলে (দুষ্ট) রাজা স্বীয় দোষ অস্বীকার করিয়া নিজ দুষ্ট স্বভাব বশতঃ ক্রোধই প্রকাশ করেন। ১৩৪½।

সীতা সতী হইলেও রামচন্দ্র লোকাপবাদ জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৩৫। রামচন্দ্র সমর্থ হইয়াও সীতাচরিত্রে কলঙ্কারোপকারী রজককে কিছুমাত্র দণ্ড দেন নাই। ১৩৫ঃ। জ্ঞানবিজ্ঞানবিদ্ রাজা অভয় প্রদান করিলেও তাঁহার গুরুতর দোষ, ভয়ে কেহ তাঁহার সমক্ষে বলিতে সাহসী হয় না। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ স্তুতিপ্রিয় ইহাই বেদবাক্য। ১৩৭। মানুষের কথা আর কি বলিব। এই কারণে নিন্দা হইতে ক্রোধ সর্বদা জন্মাইয়া থাকে। অতএব রাজা সুভাগদণ্ডী হইয়া (সুব্যবস্থা অনুসারে দণ্ড পরিচালনা করিয়া) সর্বদা অতি ক্ষমাশীল ও প্রজারঞ্জক হইবেন। ১৩৮।

যৌবন, জীবন, চিত্ত, ছায়া, লক্ষ্মী এবং স্বামিতা (প্রভুত্ব) এই ছয়টী বিষয় অস্থির জানিয়া (সকলের) ধর্মপরায়ণ হওয়া উচিত। ১৩৯। রাজা যদি দানশীল না হন, অথবা অপাত্রে দান করেন, অপমান করেন, প্রতারণাপরায়ণ হন, কটুবাক্য প্রয়োগ করেন এবং প্রচণ্ড দণ্ড প্রদান করেন তাহা হইলে প্রজাগণ ঐ রাজাকে ত্যাগ করেন। ১৪০।* এই সকল পূর্বোক্ত বিপরীত গুণ রাজার থাকিলে প্রজাগণ সপরিবারে রাজার প্রতি বিরাগভাজন হয়। একটী মাত্র দোষ দুষ্কীর্ত্তি (অপযশ) বিস্তার করে; আর যদি বহু দোষ মিলিত হয়, তাহা হইলে যে কতদুর অপযশ হয় তাহা কি আর বলিতে হইবে। ১৪১।

মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া এবং মদ্যপান এইগুলি রাজাদের পক্ষে গর্হিত কার্য। মৃগয়াতে পাণ্ডুরাজার, অক্ষক্রীড়ায় নিষধপতি নলের এবং মদ্যপানে যদুবংশের বিপদ ঘটিয়াছিল, ইহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। ৪২। কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ, মান, এবং মদ এই ষড়বর্গ ত্যাগ করিবে। রাজা এইগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিলে সুখী হন। ১৪৩। এই শত্রু স্বরূপ ষড়বর্গ আশ্রয় করিলে লোকে বিপন্ন হয়, যেমন দণ্ডক রাজা কামবশতঃ, জনমেজয়(১) ক্রোধহেতু, রাজর্ষি ঐল লোভেতে, বাতাপি অসুর মোহেতে, রাবণ মানহেতু এবং দম্ভপুত্র রাজা মোহহেতু নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৪৫। এই শত্রু স্বরূপ ষড়বর্গকে ত্যাগ করিয়া প্রতাপশালী জামদগ্ন্য পরশুরাম, এবং মহাভাগ অম্বরীশ বহুকাল পৃথিবী-ভোগ করিয়াছিলেন। ১৪৬। এই জগতে সজ্জনগণের সেবিত ধর্ম এবং অর্থকে বাড়াইয়া এবং ইন্দ্রিয়-সংযম করিয়া গুরুসেবা করিবে। ১৪৭। শাস্ত্র শিক্ষার জন্য গুরুকরণ। বিনয় বৃদ্ধির জন্য শাস্ত্রসেবা। বিদ্বান্ এবং বিনীত নরপতি সজ্জনগণের অভিমত হন। ১৪৮। যে রাজা অসৎ ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রণোদিত হইয়াও অন্যায় কার্য করেন না, বেদ-স্মৃতিশাস্ত্র-লোকাচার এবং মানসিক বিচার দ্বারা নির্ণীত ধর্মানুমোদিত কার্য করেন, এবং দান ও গ্রহণ বিষয়ের বিভাগে বিচক্ষণ তিনিই পণ্ডিত। ১৫০। নীতিশাস্ত্রের অনুসরণ তৎপর, জিতেন্দ্রিয় নৃপতির ঐশ্বর্যের ক্রমশঃই উন্নতি হয় এবং কীর্তি বহুদুর বিস্তৃত হয়। ১৫১।　　(ক্রমশঃ)

---

* অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের ইংরেজী অনুবাদে নিম্নোক্ত অংশ অধিক আছে,—People do not take to a king who is very cowardly, procrastinati 1g, very passionate, and excessively attached to the enjoyable things through ignorance. (279-80 lines) But the people are satisfied with the opposite qualities. (281). ইহার শ্লোক পাই নাই।

(১) বোধ হয় ইহা 'পরীক্ষিৎ' হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

ভগবান বুদ্ধদেব

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্‌-এ., বি-এল্‌.

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্বে প্রাচীর ধর্মচক্রবালে যে উজ্জ্বলতম ভাস্করের আবির্ভাবে অর্দ্ধপৃথিবী উদ্ভাসিত হয়েছিল আজ সেই শাক্যকুলোদ্ভব মহামহীয়ান্‌ গৌতম বুদ্ধের জন্মতিথি। শুভ পুণ্যময়ী এই বৈশাখী পূর্ণিমা, এই তিথিতে শুধু এই মহামানবের আবির্ভাব হয় নাই, অমরগণ-বাঞ্ছিত বহুকল্পদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল, আবার অভিনব মহাপরিনির্বাণ লাভও হয়েছিল।

ভারতের ও ভারতেতর স্থানের এমন নরনারী অল্পই আছেন যাঁরা এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও বাণী কিছু না কিছু জানেন। শিশুপাঠ্য ভারত ইতিহাসেও ইহার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে, সর্বজনবিদিত এই জীবনীর পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? তাঁর শুভ জন্মতিথি বাসরে তাঁর অপরূপ জীবন, অভিনব নির্বাণ ও পরাবাণী আলোচনার সার্থকতা যথেষ্ট আছে। ইহা অতীত-গৌরব-বিস্মৃত-প্রায় ভারতের জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এমনি দিনে ভারত জননা যে সন্তানকে প্রথম বক্ষে ধারণ করেছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অর্দ্ধসংখ্যক মানব এখনও তাঁর গুণগরিমায় মুগ্ধ, তাঁর ধর্মে দীক্ষিত এবং তাঁর দর্শনালোচনায় ব্যাপৃত। তাঁর পূত জীবনীর পুনঃপুনঃ আলোচনায় অনধিকারীদেরও হৃদয়মালিন্য মুছে যায়, দৌর্বল্য দূরে যায়, এবং সংকীর্ণতা কেটে যায়।

প্রায় ৬২৩ পূ° খ্রী° অব্দে নগাধিরাজ হিমালয় প্রান্তে কপিলবাস্তু নগরস্থ প্রকৃতির লীলানিকেতন লুম্বিনী উপবনে আবির্ভূত হলেন এই জ্যোতির্ময় মূর্তিধারী সৌম্যদর্শন মহাপুরুষ।

তাঁর এই শাক্যবংশ পৌরাণিক সূর্যবংশের একটি শাখা। অযোধ্যার সুজাত নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক নৃপতি তাঁর পুত্রদিগকে কোন কারণে নির্বাসিত করেছিলেন। আর এই নির্বাসিত পুত্রেরাই হিমালয়ের নেপালরাজ্যের অন্তর্গত কপিল ঋষির আশ্রমের নিকটে যে নগর নির্মাণ করেছিলেন উহাই কপিলবাস্তু নগর। বর্তমানে ইহার নাম কোহানা। গৌতমবুদ্ধ এই বংশেরই রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁর মায়ের নাম মায়াদেবী। সন্তান প্রসবের সাতদিনের মধ্যেই মায়াদেবীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ভগিনী ও সপত্নী মহাপ্রজাপতি কর্তৃক বাল্যকালে গৌতম লালিত হন। ইঁহার জন্মে রাজা ও রাণীর সর্বকামনা সিদ্ধ হয়েছিল বলে ইঁহার অপর নাম সিদ্ধার্থ, আর বংশ অনুযায়ী ইঁহাকে শাক্যমুনি বা শাক্যসিংহও বলা হ'ত। যথাসময়ে শিশুর অন্নপ্রাশন, নামকরণ, বিদ্যারম্ভাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধিবলে অল্পকালেই বালক বহুবিদ্যায় পারদর্শী হলেন। কিন্তু তাঁর ধ্যানপরায়ণ চিত্ত ক্রীড়ামোদে একেবারে বীতস্পৃহ হ'ল আর বাল্যকালেই সামান্য

কয়েকটা ঘটনাতে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের মৈত্রী ও করুণার অপূর্ব বাণী প্রচারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেল। পিতা পুত্রের এবংপ্রকার ভাবান্তর সংসারবৈরাগ্যের কারণ মনে ক'রে, তাঁহার বিবাহের জন্য কৃতসংকল্প হলেন ও পুত্রের মতামত চাহিলেন। সিদ্ধার্থ ৬দিন এই বিষয়ে বিবেচনা ক'রে ৭ম দিনে তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করলেন ও কি কি লক্ষণযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত তাহাও বলে পাঠলেন। এবংপ্রকার সর্বগুণসম্পন্না কন্যারত্ন মিলিল। ইনি দণ্ডপাণি শাক্যতনয়া কুমারী গোপা। যথাসময়ে উনবিংশ বর্ষ বয়সে সিদ্ধার্থের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল। বিবাহের কয়েক বর্ষ পরে কোন একটি ঘটনায় (এবিষয় সকলেই জানেন) সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য, যাহা পুর্বেই বীজাকারে ছিল, তাহা তীব্র ভাব ধারণ করিল এবং প্রায় ত্রিশবর্ষ বয়সে এই কমনীয়কান্তি রাজপুত্র প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্বেই তাঁর একমাত্র পুত্র রাহুলের জন্ম হয়। সন্ন্যাসীবেশে তিনি প্রথমে বৈশালী নগরে (বর্তমান পাটনার উত্তরে) গমন করেন ও সেখানে অড়ার নামক পণ্ডিতের নিকট হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। তারপর রাজগৃহে (ইহা পূর্বে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল এবং সে সময় মগধেশ্বর বিম্বিসারের রাজধানী ছিল, বর্তমান বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্তী) রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রুদ্রকের নিকট তিনি বহুশাস্ত্র ও যোগপ্রণালী শিক্ষা করিয়া কোণ্ডান্য, বাপা, ভদ্রায, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পাঁচজন শিষ্যসহ গয়ার নিকটস্থ উরুবিল্বগ্রামে আসেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য—জনকোলাহলহীন নিরঞ্জনা নদীর তীর, শান্তরসাস্পদ তপোবনসদৃশ বনরাজি তাঁর চিত্ত মুগ্ধ করে ও তপস্যানুকূল স্থান বিবেচনায় এখানে দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিনি তপস্যায় রত হলেন। সে কি কঠোর তপস্যা! তিনি সমাহিত হবার সময় বলেছিলেন "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম"। তারপর সেই শুভলগ্ন সমুপস্থিত হ'ল। সেও আজিক'র এই বৈশাখী পূর্ণিমা—যেদিন তিনি সুজাতার পায়সান্নে পুষ্টদেহ হ'যে বহুকল্পদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর এই নবীন ধর্ম জগতকে জানাবার জন্য, মানবের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও পরাশান্তি-পরানির্বাণের জন্য তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তনের প্রয়াসী হলেন। যে ৫জন শিষ্য সঙ্গে (যাদের নাম বলিলাম) প্রথমে তিনি তপস্যা-নিরত হয়েছিলেন তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁকে ত্যাগ করে চলে যান। ইনি তাঁহাদিগকেই অধিকারী বিবেচনা ক'রে ধ্যানযোগে জানলেন, তাঁরা কাশীধামের নিকটস্থ মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথ) অবস্থান করছেন ; ইনি তাঁদের নিকট গমন ক'রে এই স্থানেই তাঁহার সঙ্ঘের প্রথম বীজ বপন করেন। তারপর তিনি মহারাজ বিম্বিসারকে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করেন। স্বনগরে গিয়া তাঁর স্ত্রী, পুত্র রাহুল ও আনন্দ প্রভৃতি আত্মীয়গণকে একে একে অভিনব ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এইরূপে সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর কাল তাঁর অপরূপ ধর্ম সর্বত্র প্রচার ক'রে অশীতিবর্ষ বয়সে আজিকার এই শুভদিনেই বোধিসত্ত্ব মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ৫৩৪ পূ° খ্রী° অব্দে কুশীনগরে (ইহা বর্তমান বারানসী ও পাটনার নিকটবর্তী গণ্ডকনদীতীরস্থ ১টী স্থান) তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ হয়। ইহাই অতি সংক্ষেপে বুদ্ধের জীবন-কথা। তাঁর এই সুদীর্ঘ প্রচার কার্যের সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক বৃত্তান্ত মহাবগ্‌গ, জাতকত্থ-

বয়না, ধর্ম্মপদ, অৎথকথা প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তাঁর লঙ্কাদ্বীপেও গমন বৃত্তান্তের কথা মহাবংশ, দ্বীপবংশ প্রভৃতি পালিগ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

এক্ষণে জগতে বুদ্ধের কি মহান্ অবদান তারই বিষয় ২।১টী কথা ব'লে এই প্রবন্ধের উপসংহার করব। প্রাচীন আর্যঋষিগণ উপনিষদের বাণী ও দার্শনিকতত্ত্বসমূহ উচ্চশ্রেণীর দ্বিজাতীয়দের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন, অধিকারী হিসাবে। কিন্তু তথাগত সেই সমুদয় বাণী ও তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞানরাজি অতি সহজ প্রচলিত ভাষায়, আখ্যায়িকা প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আর ধর্ম বা দার্শনিক জগতে তিনি কোন authority মানেন নাই। আর তদানীন্ত যুগে বুদ্ধের ধর্মসংঘ স্থাপন, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘ স্থাপন ভারতের একটি অপূর্ব কল্যাণময় অনুষ্ঠান। তাঁর ধর্মমত ও দার্শনিক তত্ত্বের সামান্যকথাও আলোচনা এই ক্ষুদ্রপ্রবন্ধে অসম্ভব। তাঁর জীবদ্দশায় এবিষয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। নির্বাণলাভের পর তাঁর ৫শত শিষ্য রাজগৃহে সমবেত হ'য়ে বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ সংকলন করেন এবং ঐ বিরাট গ্রন্থসমূহকে সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্মপিটকে বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে মহারাজ অশোক এই অপূর্বধর্মকে জাগতিক ধর্মে পরিণত করেন।

সুত্তপিটকে তাঁর প্রদত্ত নীতিসমূহ, বিনয় পিটকে তাঁর সংঘের শাসন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ও অভিধম্মপিটকে তাঁর দার্শনিক মতবাদ অতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মৈত্রী ও করুণার অবতার, অপূর্ব ত্যাগের জলন্ত প্রতীক, জ্ঞানের উজ্জ্বল ভাস্কর, বোধিসত্ত্ব যে মহান্ ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন ২॥০ হাজার বছর আগে, আজও সেই ধর্মের সেই উদার মতবাদের সুশীতল ছায়ায় জগতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক তাঁদের জীবনের লক্ষ্যের ধ্রুবতারার সন্ধান পেতেছেন ও নির্বাণ-বাণীলাভে ধন্য হ'তেছেন।

হে মহামানব, আজ তোমার শুভ জন্মতিথি, তোমার বুদ্ধত্বলাভ ও মহানির্বাণ তিথি। জগতের এই বিশিষ্ট স্মরণীয়দিনে প্রার্থনা করি যেন ধর্মজগৎ থেকে, সামাজিক জগৎ থেকে বৈষম্যের বিবাদ, দ্বেষহিংসার গ্লানি মুছিয়ে দেয় তোমার মৈত্রী ও করুণার ভাবধারা, ভারত আবার তোমার সাধনাসম্পদের সঞ্জীবনীস্পর্শে নবশক্তিলাভে, কর্মপ্রেরণায় ও জ্ঞানগরিমায় জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহন করে, তোমার করুণার অমৃতময়ী ত্রিবেণীতে প্লাবিত হয় আমাদের হৃদিরাজ্য, ও দিকে দিকে ধ্বনিত হয় তোমার মহিমাগাথা।*

নমো ভগবতে অর্হতে সম্মসম্ বুদ্ধস্

---

* বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রচিত।

(২)

যোগ সাধনায় হৃদয় ও নাসাগ্রের স্থান

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

দেখিতে পাওয়া যায় যে দেহের বক্ষঃস্থলকে "হৃদয়" ও নাসিকাব সম্মুখস্থ বহির্ভাগকে "নাসাগ্র" নির্ণয় করিয়া অনেকেই ধর্মাচরণ করিয়া থাকেন। ইহা যেন একটা রীতি হইয়া পড়িয়াছে। আয়ুর্বেদ এই স্থূল অর্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই চিকিৎসাদিব বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ইহার বিপরীত। ধর্মসাধনার ব্যাপারে "হৃদয়" ও "নাসাগ্র" মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

(১) হৃদয়—হৃদয়ের আভিধানিক অর্থ বক্ষঃস্থল, মন, অন্তঃকরণ। স্থূল অর্থেই বক্ষঃস্থল ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদ এই স্থূল অর্থেরই সমর্থক, কেননা, স্থূল দেহই আয়ুর্বেদের লক্ষ্যবস্তু। মন ও অন্তঃকরণ একার্থবাচক। মনের স্থান বক্ষঃস্থল নহে। সাধনার সঙ্গে প্রধানতঃ মনেরই সম্পর্ক। যোগশাস্ত্র বলেন, মন আজ্ঞাপদ্মান্তরালে অবস্থিত, যথা :—

"আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং।
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপদ্মং সুশুভ্রম॥
এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং।"
(ষট্‌চক্রনিরূপণম্)

এই পদগুলি প্রতিপন্ন করে, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে "আজ্ঞা" নামক পদ্ম বিরাজিত এবং এই পদ্মের অন্তরালে সূক্ষ্মরূপী প্রথিত মন অবস্থিত। মহাভারত শান্তিপর্ব (২১৪ অঃ) দৃষ্টে জানা যায়, হৃদয়ের মধ্যভাগে "মনোবহা" নামে একটী নাড়ী আছে। আজ্ঞাপদ্ম ভ্রূযুগলের মধ্যে অবস্থিত, যথা :—

"আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্মধ্যেহক্ষোপেতং দ্বিপত্রকম্।"
(শিবসংহিতা)

আধ্যাত্মিক হৃদয় যে বক্ষ নহে, শাস্ত্রাদিতে ইহার সমর্থন রহিয়াছে। "হৃদয়" বুঝাইতে গিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"সাধো! জগতি ভূতানাং হৃদয়ং দ্বিবিধং স্মৃতম্।
উপাদেয়ঞ্চ হেয়ঞ্চ বিভাগোহয়ং তয়োঃ শৃণু॥
ইয়ত্তয়া পরিচ্ছিন্নে দেহে যদ্বক্ষসোঽন্তরম্।
হেয়ং তদ্ধৃদয়ং বিদ্ধি তনাবেকতটেবস্থিতম॥

সংবিন্মাত্রন্তু হৃদয়মুপাদেয়ং স্থিতং স্মৃতম্।
তদন্তরে চ বাহ্যে চ ন চ বাহ্যে ন চান্তরে ॥
তৎতু প্রধানং হৃদয়ং তত্রেদং সমবস্থিতং।
তদাদর্শঃ পদার্থানাং তৎকোশঃ সর্বসম্পদাম্ ॥
সর্বেষামেব জন্তূনাং সংবিদ্ধৃদয়মুচ্যতে।
ন দেহাবয়বৈকাংশো জড়জীর্ণোপলোপমঃ ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

অর্থাৎ—"হে সাধো ! এই জগতে প্রাণিগণের হৃদয় দুই প্রকারে বিভক্ত আছে। তন্মধ্যে একটী হেয় ও অপরটী উপাদেয় বলিয়া নির্দিষ্ট হয় ; তন্মধ্যে দেহাত্মবাদীদের বক্ষ ও পৃষ্ঠের মধ্য-স্থলে যে হৃদয় থাকে উহাকেই হেয় বলিয়া জানিবে এবং জ্ঞানীদের জ্ঞানমাত্রেই যে হৃদয় উহাই উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট বাহিরে ও অন্তরে সর্বত্রই রহিয়াছে অথচ কোথায়ও (কোন নির্দিষ্ট সীমাতে) অবস্থিত নহে, উহাই প্রধান হৃদয়, উহাতেই এই বিশ্ব রহিয়াছে, উহাই সকল পদার্থের দর্পণস্বরূপ, সমুদয় সম্পদের কোষাগার ও সকল পদার্থের চিণ্ময় জ্ঞানরূপ হৃদয় বলিয়া অভিহিত হয় ; উহা দেহীর দেহের কোন অবয়বেরই অংশ নহে, কেবল জড় অতিজীর্ণ শিলাখণ্ডের সহিত উহার কথঞ্চিৎ তুলনা সম্ভব হইতে পারে।"—এই বশিষ্ঠ-উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, যে নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ স্থির অবস্থা হইতে এবং পুনঃ যাহাতে স্পন্দন বা ক্রিয়ার বিকাশ ও লয় হয়, সেই অবস্থা বা সঙ্গম স্থানটাই আধ্যাত্মিক হৃদয। দেহপক্ষে, দ্বিদল হইতে বিক্ষেপণে ক্রিয়ার বিকাশ ও আকর্ষণে পুনঃ দ্বিদলে বিলয় হয় সুতরাং দ্বিদলই হৃদয়। "সাংখ্য" প্রণেতা মহর্ষি কপিল বিষয়টা আরো সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যথা :—

কণ্ঠাদি ভ্রুকুটিপ্রান্তে বায়ু স্থানন্ত তৎস্মৃতম্।
তালুমূলে স্থিতং পদ্মং দলৈঃ ষোড়শকৈর্যুতম্॥
স্বরাঃ ষোড়শকাস্তত্র তদূর্দ্ধং হৃদি-পঙ্কজম্।
একং সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতরং চক্ষুবপ্রেষু শোভিতম্॥
তদেব হৃদয়ং নাম সর্বশাস্ত্র সুসন্মতম্।
অন্যথা হৃদি কিঞ্চাস্তি প্রোক্তং যৎ স্থূলবুদ্ধিভিঃ ॥"

(কপিলগীতা)

ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, কপাল-বিবরস্থ ভ্রুদ্বয় মধ্যস্থিত স্থানই হৃদয় ; কিন্তু স্থূলবুদ্ধি দেহাত্মবাদিগণ অন্যস্থানকে "হৃদয়" বলিয়া থাকেন। উপনিষদ্, গীতা, মহাভারত সংহিতা ও অন্যান্য যোগশাস্ত্রাবলী "হৃদয়কেই" কেহ "নাসিকাগ্র", কেহ "ভ্রূমধ্যস্থান", কেহ "কপালবিবর", কেহ "গুহা", কেহ "ত্রিবেণী" ইত্যাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। "যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্" বলিয়াছেন :—

"ললাটমধ্যে হৃদয়াম্বুজে বা,
যঃ পশ্যতি জ্ঞানময়ীং প্রভাং তু।
শক্তিং সদা দীপবদুজ্জ্বলন্তীং,
পশ্যন্তি তে ব্রহ্ম তদেকদৃষ্ট্যা ॥
মনোলয়ং যদা যাতি ভ্রূমধ্যে যোগিনাং নৃণাম্।
জিহ্বামূলেঽমৃতস্রাবো ভ্রূমধ্যে চাত্মদর্শনম্ ॥"

ইহাতেও ললাটমধ্যবর্তী স্থানকেই হৃদয় বলা হইল। সুতরাং বক্ষঃস্থলকে হৃদয় বুঝিয়া সাধনাদি করিলে ভুল হইবে।

২। নাসিকাগ্র—ইহার অর্থ নাসিকার অগ্রভাগ। "অগ্র" শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রথম, প্রধান, উর্ধ্বদেশ, শিখর, সূক্ষ্মপ্রান্ত, সম্মুখ। এই সমূহ অর্থ দ্বারা নাসাগ্র নির্ণয় করিতে হইলে শাস্ত্রার্থের অনুসরণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। গীতার ৬ষ্ঠ অঃ ১৩শ শ্লোকে "নাসিকাগ্রং" এবং ২৫শ শ্লোকে "আত্মাসংস্থং মনঃ কৃত্বা" এবং ৮ম অ° ১০শ শ্লোকান্তর্গত 'ভ্রুবোর্মধ্যে" উক্তিগুলি একসঙ্গে পাঠ করিলে, কপালবিবরকেই নাসিকাগ্র বলা হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। আত্মার প্রকাশ স্থান দ্বিদল, নাসার সম্মুখভাগ নহে, ইহা শাস্ত্রসম্মত। উপনিষদাদি শাস্ত্রসমূহ একবাক্যে তাহা বলিয়াছেন, যথা :—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" (কঠোপনিষদ্)
"হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্যমধ্যেবিশদং বিশোকং" (কৈবল্যোপনিষদ্)
"নাসাগ্রে বিন্যসেদ্ দৃষ্টিং * * * "—
"ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ—
"দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং * * * "—(শিবসংহিতা)
"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনোহৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎপরমম্পদম্ ॥" (ব্রহ্মবিন্দুপনিষদ্)
"স্থাণুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োঽচল দৃশাপশ্যন্ ভ্রুবোরন্তরং।"
"নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।"—(ঘেরণ্ডসংহিতা)

দ্বিদলের বহির্ভাগস্থ কোন স্থান (নাসিকার বহিরস্থ সম্মুখভাগ বা বক্ষঃস্থলই হোক) যদি লক্ষ্যের বিষয়বস্তু হয়, তবে তন্মূলে বহির্বিক্ষেপণই সঞ্জাত হয়, যাহা যোগ বা যে কোন সাধনারই পরিপন্থী। বহির্বিক্ষেপণ বারিত করিয়া প্রাণবায়ুকে দ্বিদলে সংস্থিত করিয়া আত্মাকে আত্মস্থ করিবার জন্যই সাধনা। তবেই লক্ষ্যবস্তু দ্বিদল হইবে, কি বক্ষঃস্থল ও নাসার সম্মুখস্থ বহির্ভাগ হইবে, তাহা সাধন-প্রয়াসী সুধীগণ নিরূপণ করিয়া লইতে কষ্টকল্পনার প্রয়োজন হইবে না।

আমাদের কথা

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা শ্রীভারতীর লেখক, গ্রাহক ও পাঠকবর্গকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি লইয়া আমরা নির্দিষ্ট কর্মে অগ্রসর হইতেছি ও ইতিমধ্যে কতটা কৃতকার্য হইয়াছি তাহা শিক্ষিত সমাজ ও দেশবাসীর বিবেচ্য। ভারতের জ্ঞান-কৃষ্টি ও শিক্ষা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ ও প্রচার করাই এই মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্য। কয়েকটী অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য অল্পায়তন গ্রন্থ ইতিমধ্যে অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক অবতার ও আচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, পুরাতত্ত্বমূলক কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায়ে এই ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থের মধ্যে 'ন্যায়প্রবেশ' পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা জন সাধারণের নিকট হইতে ও বাংলার সাধারণ পুস্তকাগারসমূহ হইতে যে প্রকার সহানুভূতির আশা করিয়াছিলাম তাহা এখনও পাই নাই। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যুদ্ধাদি নিবন্ধন দেশের বা পৃথিবীর এই মহাদুর্দিনে জ্ঞান-কৃষ্টির আলোচনায় মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। ইহা কতকটা সত্য, সন্দেহ নাই। এসময়ে শিল্পবিস্তার, কৃষিপ্রসার ও আত্মরক্ষামূলক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন যেমন একান্ত আবশ্যক, শিক্ষা-কৃষ্টিমূলক কার্যেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অল্প আবশ্যকতাও আছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রত্যেক গঠনমূলক কর্মেরই উপযোগিতা সব মনীষিরাই স্বীকার করেন। এই উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র। আর এই প্রকার প্রশ্নের উপর গুরুত্ব স্থাপন করিতে হইলে অনেক কর্মই বন্ধ করিতে হয়।

* * * *

এই বৈশাখমাসের পূর্ণিমাতিথিতে অহিংসা, মৈত্রী ও সাম্যবাদের অবতার ভগবান্ বুদ্ধদেব এই ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই তিথিতেই তিনি বুদ্ধত্বলাভ ও মহানির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে এই পুণ্যময়ী তিথি একটী স্মরণীয় দিন। দানবীয় মোহে উন্মত্ত জগৎ কি শান্তি স্থাপনের জন্য এই মহামানবের বাণীকে স্মরণ করিয়া এই তাণ্ডবলীলার অবসান করিবে?

* * * *

এই মাসেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বপ্রেম ও অপূর্ব ভাবসম্পদ তাঁহার অতুলনীয় লেখনী সাহায্যে জগতকে দিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও কৃষ্টির মিলনভূমিরূপে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আজ তিনি আর ইহজগতে নরদেহে নাই, কিন্তু তাঁহার অমর অবদান দেশের সর্বত্র তাঁহাকে চিরজীবি করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাঁহার আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

* * * *

দেশের বিশেষতঃ সহরসমূহের বর্তমান সঙ্কটাবস্থায় যাহাতে বিভিন্নস্থানে স্বাস্থ্যকর আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে বহু পতিত ভূমিকে উদ্ধার করিয়া অধিক শস্য সংগ্রহ করা হয়, ও সহরবাসীরা মনোরম গ্রাম্য কুটীর নির্মাণ করতঃ সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করিতে পারে সেজন্য 'ভারত-শ্রী' ভূমি প্রতিষ্ঠান (Bharat Sree Land Development Co. Ltd.) নামে একটি কোম্পানী আশু প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাদ্বারা কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় পরিচালিত হইবে এবং কয়েকটী কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্যও এই প্রকার আর একটি কোম্পানীও প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা ইহার উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী দেখিয়াছি এবং উহা সর্বতোভাবে অনুমোদন করি। যাঁহারা এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিতে চান, তাঁহারা বর্তমানে শ্রীভারতীর কার্যালয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন। আশা করি শীঘ্রই ইহার কার্যাদি আরম্ভ হইবে।

* * * *

পুস্তক সমালোচনা

আর্ষেয় ব্রাহ্মণ—মূল ও বঙ্গানুবাদ। অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ, এম. এ কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত। ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৵৹ আনা মাত্র।

আর্ষেয় ব্রাহ্মণ সামবেদের আটখানি ব্রাহ্মণের অন্যতম। মহামতি সায়নাচার্য ইহাকে সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়াছেন। ইহার অধ্যয়নের দ্বারা সামবেদের উৎপত্তি ও মন্ত্রসংখ্যা জ্ঞাত হওয়া যায়। কোন্ কোন্ ঋক্‌মন্ত্রের সহিত কোন্ কোন্ সাম গেয় তাহা আর্ষেয় ব্রাহ্মণই নির্দেশ করে। সামবেদ সম্বন্ধীয় জ্ঞানার্জনে ইহার একান্ত আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করেন। অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস সাংখ্যতীর্থ মহোদয় অতি যত্ন সহকারে ইহা সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা বৈদিক শাস্ত্রালোচনায় নিপুণ সুধীবর্গকে ইহা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

Condensed Ephemeris of Planets' Positions for fifty one years from 1890 to 1940 A. D শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, এম. এ. প্রণীত ও ১১০, মানিকতলা ষ্ট্রীট্ হইতে ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৮ পৃষ্ঠা, মূল ৩৷৹ আনা।

এই গ্রন্থে বিগত একান্ন বৎসরের দৈনিক চন্দ্রস্ফুট, সপ্তাহে দুইদিন বুধস্ফুট, রবি, মঙ্গল,শুক্র, বৃহস্পতির সাপ্তাহিক স্ফুট, রাহু, হার্সেল ও নেপচুনের মাসিক স্ফুট প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Sidereal time এর সারণী, latitude ও declination এর সারণী ও অভীষ্ট দিবসের গ্রহস্ফুট নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন সারণী প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি জ্যোতিষীদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য উপকরণ লইয়া নিরয়ণ মতে ইহা রচিত হওয়ায়, ভারতীয় জ্যোতিষীদের বহুকালের এক অভাব পূরণ করিবে। ইহাতে বাংলা তারিখ, বার, চান্দ্রমাস ও তিথি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কোন জিনিষই বাদ পড়ে নাই। পুরাতন পঞ্জিকার প্রয়োজন ইহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে। ইংরেজী অক্ষরে ইহা লিখিত হইলেও, মাত্র সংখ্যা কয়টির সহিত পরিচয় থাকিলেই ইংরেজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রও ইহা অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ

সম্বন্ধ নির্ণয়—পঞ্চম পরিশিষ্ট—প্রথম খণ্ড (৪র্থ সংস্করণ)। ৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ৯৩।৪ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১২৮। মূল্য ১৷৹।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ-নির্ণয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এদেশের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে পুস্তকখানির সবিশেষ আলোচনা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থখানিতে সাবর্ণ গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীর কুলপরিচয় বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কুন্দবংশ, গাঙ্গুলীবংশ, নান্দীগ্রামী বংশ, সিদ্ধল বংশ ও শিয়ারী বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় বাঙ্গালীর গৌরবের সামগ্রী। রিজলী সাহেবের Hindu Tribes and Castes নামক পুস্তকের বহুপূর্বে লিখিত। জাত্যাভিমানী প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইহা পাঠ করা উচিত।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। World war and its only cure—World order and world Religion. By Dr. Bhagwan Das, M. A., D. Litt.—বেনারস।

২। Drawings, Paintings and Sculptures: A Portfolio of 18 Reproductions: By P. T. Reddy. বোম্বে।

৩। Indian Political Philosophy—Dr. Nalin C. Ganguly, Ph. D. Shastri, কলিকাতা।

৪। The Dvaita Philosophy and its place in Vedanta: By Vidwan H. N. Raghavindrachar, M. A, with a foreword by A. R. Wadia, B. A. (Cantab).

৫। Excavations at Rairh: Dr. K. N. Puri, D. Sc., D. Litt.

৬। Astronomical Ephemeris of Geocentric Places of Planets for 1942: By R. V. Vaidya, M. A., B. T.

৭। Nyaya-Ratna-Mala of Parthasarathi Misra with the Commentary of Ramanujacarya entitled the Nayaka-Ratna. Critically edited with an introduction and indices by K. S. Ramaswami Sastri Siromani of Baroda Oriental Institute, বরোদা।

৮। দয়ানন্দ চরিতম্—Vallabhadas Bhagavanj Ganarta, বোম্বে।

সাময়িক সাহিত্য—চৈত্র, ১৩৪৮

ধর্ম ও দর্শন

প্রবাসী—সত্যই কি আমাদের প্রাণ আছে ?—ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।
ভারতবর্ষ—উপনিষদ্ আলোচনা—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস্।
উদ্বোধন—ক্রমবিকাশের ক্রম ও বৈচিত্র্য—স্বামী বাসুদেবানন্দ।
„ —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মঃ মঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।
ব্রহ্মবিদ্যা—সোয়েডেন্‌বর্গ ও দিব্যদৃষ্টি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সাহিত্য ও ইতিহাস

প্রবাসী—পৃথিবীর তৈল সম্পদ—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এস্-সি।
ভারতবর্ষ—সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার।
„ —রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা—অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
সংহতি—বংশবাটীর প্রাচীন ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল।
বঙ্গশ্রী—সাহিত্যিক নারীচিত্রে দয়ার স্থান—শ্রীরামশশী কর্মকার।

জীবনী

উদ্বোধন—শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।
বঙ্গশ্রী—রামপ্রসাদ—শ্রীকালিদাস রায়।

বিবিধ

প্রবাসী—বৈদিক সংস্কারে কন্যা পুংসবন—ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।
„ —শ্রীঅরবিন্দ কথা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
ভারতবর্ষ—প্রাণশক্তি—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, আই.সি.এস্ (রিটায়ার্ড)।
„ —শ্রীরঙ্গম—শ্রীকেশব চন্দ্র গুপ্ত।
বঙ্গশ্রী—লোক-সাহিত্য ও লোক-সঙ্গীত—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ।
উদ্বোধন—সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস—মার্ক্স, ফ্রয়েড ও বিবেকানন্দ—শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ।
ব্রহ্মবিদ্যা—মরণের পর—শ্রীতুলসীদাস কর।
সংহতি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাতন পত্রিকা

নবজীবন

১২৯২ সাল

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ সংকলিত।

শ্রাবণ—শাস্ত্রীয় সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব—শ্রীচন্দ্রশেখর বসু। নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রলয় ও সৃষ্টি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। প্রবন্ধটী সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে লিখিত।

শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন—ঋগ্বেদের দেবগণ—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত। শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রায় ১০।১২টী প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে বৈদিক সাহিত্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি কিরূপে বীজরূপে বর্তমান আছে তাহাও দেখাইয়াছেন; অনেক স্থলে তিনি পাশ্চাত্য মতানুবর্তী হইলেও তাঁহার প্রবন্ধগুলি সহজ সরল ভাষায় লিখিত হওয়ায় বেশ সুখপাঠ্য।

ভাদ্র, আশ্বিন—কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার কাব্য—অতি সংক্ষেপে গুপ্ত কবি সম্বন্ধে আলোচনা, তবে আলোচনাটী বৈশিষ্ট্যবৰ্জ্জিত নয়। গুপ্ত কবির স্বদেশিকতা ও রসাল কবিতার কয়েকটী নিদর্শনও আলোচনার মধ্যে পাওয়া যায়।

ভাদ্র, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ—ত্রিগুণ ও সৃষ্টি—পাশ্চাত্য মতের সহিত সাংখ্য মতের তুলনা। প্রবন্ধকার অতি সুন্দরভাবে সাংখ্যের মত উপস্থাপন করিয়া জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'সদসৎ খ্যাতি'র আশ্রয় লইয়াছেন। বৈদান্তিকের মতে জগৎ অনির্বচনীয় কিন্তু প্রবন্ধকার পাশ্চাত্য দার্শনিক Spencer, Hume, Lewis, Hegel, Barkley প্রভৃতির মত উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতের অস্তিত্ব একেবারে অনির্বচনীয়বাদের কোঠায় ফেলা যায়—জগৎ কতক অংশে সৎ আর কতক অংশে অসৎ। প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত যুক্তিপূর্ণ, সরল এবং সুচিন্তিত। আজকাল এরূপ সুবিন্যস্ত দার্শনিক প্রবন্ধ অতি বিরল।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ—বৈষ্ণবতত্ত্ব—গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের দার্শনিকাংশ সম্বন্ধে অতি সুন্দর আলোচনা ও রাগমার্গে ভজন ও উহার প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিচার। প্রবন্ধটী অতি উপাদেয়। যেরূপ সুন্দর, সেইরূপ সুলিখিত।

অগ্রহায়ণ—বেদ কাব্য না বিজ্ঞান—প্রবন্ধকার যে সময় প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তখন বৈদিক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ছিল। কেহ কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই পছন্দ করিতেন, আবার কেহ কেহ পাশ্চাত্য মতাবলম্বী হইয়া বেদের মধ্যে কাব্য ও কবিতা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে চাহিতেন না। প্রবন্ধকার এই উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদিক মন্ত্রগুলি নানা সুরের, সুতরাং 'সংহিতা' ও উপনিষদের একজাতীয় ব্যাখ্যা হওয়া অসম্ভব। প্রবন্ধটী সুখপাঠ্য।

সাময়িক সংবাদ

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র—গত ২৯শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের এবৎসরের প্রথম সভায় শ্রীযুত হেমচন্দ্র নস্কর মেয়র ও মিঃ আদম ওসমান ডেপুটী মেয়র নির্বাচিত হইয়াছেন।

অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালা শিক্ষাদান—অনেক অ-বাঙ্গালী সুযোগ সুবিধা না পাওয়াতে বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাঙ্গালা শিখিতে পান না। নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালা ভাষা শিখাইবার দুইটী ক্লাশ কাশীসহরে খুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরলোকে নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র—প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ রায় শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যু সংবাদে সকলেই দুঃখিত হইবেন। ছোট-নাগপুরের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

তত্ত্বার্থসূত্রম্

ভূমিকা

ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে দার্শনিক গবেষণা বা তত্ত্বানুশীলন চলিয়া আসিতেছে। দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে বিভিন্ন দার্শনিক আচার্য পৃথক্ পৃথকরূপে (গ্রন্থের) শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। (ক) ষড়্দর্শন বিভাগ এইরূপ—(১) মহর্ষি জৈমিনির "মীমাংসাদর্শন" (২) মহর্ষি গোতমের "ন্যায়দর্শন" (৩) মহর্ষি কণাদের "বৈশেষিক দর্শন" (৪) মহর্ষি কপিলের "সাংখ্যদর্শন" (৫) মহর্ষি ব্যাসের বেদান্ত দর্শন (৬) মহর্ষি পতঞ্জলির "যোগদর্শন"। এইরূপ প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের বিভাগ সম্বন্ধে "হয় শীর্ষপঞ্চরাত্রে" লিখিত আছে—

"গোতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষডেব হি* ॥"

এইরূপ দর্শন বিভাগে জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনকে পরিহার করা হইয়াছে। বীর-নির্বাণ সম্বৎ সম্প্রতি ২৪৬৬ বৎসর প্রচলিত থাকাতে জৈন সময় বৌদ্ধকালের পূর্ববর্তী অবধারিত হয়। (খ)

"জৈন ষড়্দর্শন সমুচ্চয় সন্দর্ভ" প্রণেতা হরিভদ্র সূরির মতে ষড়্দর্শন বিভাগ অন্য-প্রকারে লিখিত আছে। যথা—

"বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকন্তথা।
জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানি অমূন্যহো ॥"

এই মতে "যোগদর্শন" ও "বেদান্তদর্শন" বাদ দিয়া ষড়দর্শন নিরূপণ করা হইয়াছে। (১) বৌদ্ধ (২) নৈয়ায়িক (৩) সাংখ্য (৪) জৈন (৫) বৈশেষিক (৬) মীমাংসা (জৈমিনীয়) এই ছয়টি দর্শন অবধারিত। অপর পণ্ডিতগণ সূরি হরিভদ্রের এই গ্রন্থখানিকে "সদ্দর্শন সমুচ্চয়" নামেও অভিহিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের টীকাকার দুইজন। (ক) শ্রীমদ্গুণরত্ন সূরি (খ) এবং মণিভদ্র সূরি, উভয়ের মধ্যে গুণরত্নসূরির ব্যাখ্যাই অতি গভীর বিচার পূর্ণ। (গ) "ষড়দর্শন শিরোমণি" নামক অন্য একটি ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লেখ যোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

---

* স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তদীয় স্মৃতিতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে ভূপতি বল্লাল সেন দেশান্তর হইতে দ্বিখণ্ডাক্ষরে লিখিত "হয় শীর্ষপঞ্চরাত্র" আনয়ন করিয়াছিলেন। অনেক সুধীজনের মতে ইহা প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম, ভক্তি, ইতিবৃত্ত এবং শিল্প সম্বন্ধে বহু বিষয় উল্লিখিত আছে। এই পুস্তক এখনও মুদ্রিত হয় নাই। সম্পূর্ণ পুস্তক রাজসাহীর কুমার শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এম, এ. বাহাদুরের নিকট আছে।

"সর্ব সদ্দর্শনসংগ্রহ" নামক অন্য গ্রন্থে সর্বদর্শন সংগ্রহ হইতে অধিক বিষয় বর্ণিত হয় নাই।

"অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থ রচয়িতা ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর শিষ্য কাশ্মীরক সদানন্দযতি। তাঁহার এই সন্দর্ভে ছয় খানি আস্তিকদর্শন এবং ছয়খানি নাস্তিক-দর্শন—আস্তিকদর্শন মধ্যে (১) "মীমাংসা" (২) "বেদান্ত" (৩) "ন্যায়" (৪) "সাংখ্য" (৫) "বৈশেষিক" (৬) "যোগদর্শন"। নাস্তিক দর্শন মধ্যে "বৌদ্ধ যোগাচার", "সৌত্রান্তিক," বৈভাষিক", "মাধ্যমিক", "জৈন," "চার্বাক" এই দ্বাদশখানি দর্শন পরিগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমৎ সায়ণ মাধবাচার্যের "সর্বদর্শনসংগ্রহে" চার্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত (জৈন) রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, পাশুপত (শিব), প্রত্যভিজ্ঞা (অপর শৈব) রসেশ্বর (আয়ুর্বেদ ও মন্ত্রশাস্ত্রীয়), ঔলুক্য (কাণাদ), অক্ষপাদ (ন্যায়), জৈমিনীয় (পূর্ব মীমাংসা), পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), শাঙ্কর (বেদান্ত), শৈবদর্শন (কাশ্মীরের), এই ষোলখানি দর্শনের নাম উল্লিখিত আছে। ষোলখানির আর অধিক দর্শনশাস্ত্রীয় (মূল) গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এইগুলির মধ্যে "প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন" শৈবদর্শনের অন্তর্গত। কাশ্মীর হইতে এই দর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। "রসেশ্বর দর্শন" প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট, তাহারও বহু পুস্তক বোম্বাই হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের সম্বন্ধ দেখা যায়।

জৈনদর্শনের সন্দর্ভনিচয়ের মধ্যে উমাস্বাতি আচার্যের (অথবা উমাস্বামী) "তত্ত্বার্থ সূত্র" কিংবা "তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র"ই সুধীসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এই সূত্র এবং তাহার ভাষ্য রচয়িতা শ্রীমদ্ উমাস্বাতি আচার্য। শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর এই উভয় সমাজের মধ্যে তত্ত্বার্থসূত্র শ্রদ্ধেয় সন্দর্ভ। সূত্রোক্ত দার্শনিক তত্ত্বসকলের মধ্যে সূত্রের পাঠরীতিতে কিছু মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট বেঙ্গল সংস্কৃত এসোসিএশনের উপাধি পরীক্ষায় সভাষ্য তত্ত্বার্থ সূত্র (জৈন দর্শনের) গৃহীত হইয়াছে। এই সূত্রগ্রন্থে দশটী অধ্যায় আছে। 'গন্ধহস্তি-মহাভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ উক্ত তত্ত্বার্থসূত্রের একটি বৃহৎ ভাষ্য আছে। সম্প্রতি এই গ্রন্থ ভারতে পাওয়া যায় না। ইহাতে দশটি অধ্যায় আছে। প্রতি অধ্যায়ই দার্শনিক তত্ত্ববিচারে পরিপূর্ণ। তাহার শ্লোকের পরিমাণ (৮৪০০০) চতুরশীতিসহস্র। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে এই ভাষ্যগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমৎ সমন্তভদ্র স্বামী আর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতে শ্রীমৎ সিদ্ধসেন দিবাকরাচার্য। ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই দর্শনের বৃত্তান্ত এবং ভাষ্য টীকাকারাদির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে অভিপ্রায় রহিল। সম্প্রতি যে অভিনব তত্ত্বার্থসূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব লিখিতেছি। পূর্বের কথিত উমাস্বাতির তত্ত্বার্থসূত্র ভিন্ন অপর প্রভাচন্দ্রাচার্য বিরচিত পুরাতন তত্ত্বার্থসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে। জৈন পণ্ডিতসমাজ মধ্যে তাহাকে প্রভাচন্দ্রাচার্যের রচিত "বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্র" বলা হইয়া থাকে, এই প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কালবিলুপ্ত বহু গ্রন্থ পুনঃ কালান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 'প্রভাচন্দ্রাচার্য' নামে সুগৃহীতনামা অনেক জৈন বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থাবলীও সম্প্রতি পাওয়া যাইতেছে ; (ক) প্রভাচন্দ্রাচার্য দার্শনিক শ্রেষ্ঠ, ইঁহার বিরচিত বৃহদ্গ্রন্থ—প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড এবং ন্যায়কুমুদচন্দ্র।

র্বদর্শন সংগ্রহে শ্রীমৎ সায়ণমাধবাচার্য উপাধিবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁহার নাম বিশেষভাবে ল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিবরণ মাণিকচন্দ্রগ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'রত্ন করণ্ড শ্রাবকাচারের' মিকার ৫৭—৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে এবং 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডে'র (নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত) বতরণিকায় রহিয়াছে। (খ) ইঁহার পূর্বেও অপর একজন প্রভাচন্দ্রাচার্য নামে প্রসিদ্ধ ন্থকার ছিলেন, ইঁহাদের একজন দক্ষিণাপথে পরমুকুলনিবাসী বিনয়নন্দী আচার্যের শিষ্য ছিলেন। লুক্য ভূপতি কীর্তিবর্মার অগ্রহারে (ব্রহ্মত্র, জাইগির্) তাঁহার সাধুতা এবং পাণ্ডিত্যের সিদ্ধি ছিল। এই ইতিহাস 'সাউথ ইণ্ডিয়ান্ জৈনিজম্' পত্রের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত আছে।* ই প্রভাচন্দ্রাচার্যের অবস্থান কাল বিক্রমাদিত্য সম্বতের ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে, যেহেতু ল্লিখিত কীর্তিবর্মার সময় বিক্রম সম্বতের ৬২৪ বলিয়া ইতিহাস-নিপুণ পণ্ডিতগণ অবধারিত রিয়াছেন, (গ) অন্য এক প্রভাচন্দ্রাচার্যের নাম দৃষ্টি গোচর হয়। তাঁহার উল্লেখ জৈনেন্দ্রব্যাকরণে রাত্রেঃ কৃতিঃ প্রভাচন্দ্রস্য" এই সূত্রে আছে, অতএব জৈন পূজ্যপাদাচার্যের সময় বিক্রমসম্বতের ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবধারিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রভাচন্দ্রাচার্যের পরিচয় শ্রবণ (শমণ) বল্‌গোলায় যে প্রথম শিলালিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, ইহার বিষয়ে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, র্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত এক সময়ে শ্রুতকেবলী (জৈন সাধু) ভদ্রবাহু আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ রিয়াছিলেন। ইঁহার সময় বিক্রম সম্বতের অনেক পুর্বকালে। ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলীর শিষ্য ভাচন্দ্রাচার্যের যে এই প্রাচীন তত্ত্বার্থ সূত্র তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে না, কারণ নজন প্রভাচন্দ্রাচার্যের মধ্যে এই সূত্র নিচয় কাহার প্রণীত সে বিষয়ের সংশয় থাকিয়া গেল। হার পর সুধী সমাজের অনুশীলনে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এই পর্যন্ত শ্রুতকেবলী-শিষ্য ভাচন্দ্রাচার্য দ্বারা বিরচিত কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি প্রাপ্ত† সূত্র গুলির সংক্ষেপে সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা রচনা পূর্বক প্রকাশিত রা সমুচিত মনে হয়। সূত্রের পূর্ণসংখ্যা ১০৫টি। এই সূত্রগুলির সঙ্গে পূর্ব প্রকাশিত ভাষ্য উমাস্বাতি আচার্যের সূত্র সমূহের বহুস্থলে পাঠভেদ ও সূত্র সংখ্যার তারতম্য দৃষ্ট হয়। হা অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। এইরূপ পাঠভেদের হেতু সম্প্রদায় (দিগম্বর বং শ্বেতাম্বর) বিভাগ এবং ভিন্ন গ্রন্থকারের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সভাষ্য-জৈন-র্শনের একাধিক টীকা, বার্ত্তিক, ভাষ্য পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। এখানে "অনেকান্ত" পত্রে প্রাপ্ত সূত্রগুলি (প্রভাচন্দ্রাচার্যের) প্রাচীন হইলেও ইহার পূর্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

---

* সাউথ্ ইণ্ডিয়ান্ জৈনিজম্ পত্র দ্বিতীয় ভাগ ৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত।

† 'অনেকান্ত' পত্রে প্রাপ্ত সূত্র (বর্ষ ৩, কিরণ ৬-৭, এপ্রিল ও মে)।

तत्त्वार्थसूत्रम्

(প্রভাচন্দ্রাচার্যের সূত্রসন্দর্ভারম্ভ)

ऐं ओं नमः सिद्धम्। अथ दश सूत्रं लिख्यते।

टीकारम्भः।

शान्तिप्रदं शान्तिसिन्धुं भवरोगमहौषधम्।
सर्वदुःखप्रहर्त्तारं भुवनेशं जिनं भजे॥ १॥
श्रीमतेश्वरचन्द्रेण विप्रेण सुधियां मुदे।
श्रीमत्तत्त्वार्थसूत्रेषु क्रियते बालबोधिनी॥ २॥

ऐंमिति मन्त्रशास्त्रोक्तं सारस्वतं वीजम् सर्वेषाम्। ओं इति सुप्रसिद्धः प्रणवमन्त्रः। ग्रन्थादौ अनयोः संकीर्त्तनात् एतद् ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह-समाप्तिः। तत्त्वज्ञापकत्वं कल्याणं गुरुपरम्परागतं शिष्टाचरणञ्च सूचितम्भवति। अस्मिन्नथशब्दोऽपि ग्रन्हारम्भ परिसूचकः। दशसूत्रमित्यत्र अथादर्शसूत्रमिति साधुपाठः।

लेखक प्रमादादेतादृशो विकल्पः पाठः। सिद्धमिति सकललोकाराध्य-त्वेन प्रविदितं आर्हतं सुप्रसिद्धम्। अत्र चतुर्थ्यर्थे प्रथमा सूत्रत्वात्। मन्त्रपूर्वक सिद्धाय नम इत्यर्थः। यद्वा देवस्त्युत्यनन्तरं शिष्यजिज्ञासानन्तरं वाथ-शब्दस्यानन्तर्य्यार्थः। लिख्यते लोकानां निर्वाणार्थं विरच्यते॥

ঐং ওঁ এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্বক সিদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া অনন্তর দশসূত্র (অর্থাৎ আদর্শ সূত্র) লিখিত হইতেছে।

(সংক্ষেপে শাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিষয় যাহাতে সূচিত হয় তাহার নাম সূত্র)। দশ শব্দটি লিপিকরের প্রমাদবশত উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার স্থানে 'আদর্শ' এইরূপ পাঠ শুদ্ধ, আদর্শ মূল বা প্রথম। পূর্বোক্ত মন্ত্রদ্বয় তন্ত্র ও অপর শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, সুতরাং এই মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, কোন কোন জৈনাচার্যের মতে লিপিকর প্রমাদবশত অথবা অ-জৈনের অনুলিপিকালে উক্ত মন্ত্রদ্বয় লিখিত হইতে পারে। পণ্ডিত রতন লাল জৈনজী যেরূপ পুরাতন পুঁথি পাইয়াছেন সেই রূপই লিখিয়াছেন।

এইটি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণ।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ | ১০ম সংখ্যা

সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীবীণা সেন, বি.এ.

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগ পর্যন্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙ্গালার সাহিত্য জগতে গৌরবময় মূর্তি লইয়া সমাসীন ছিলেন।

সে যুগে সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী পাঠকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী বিষয় লইয়া কবিতা রচনাতে সত্যেন্দ্রনাথ দক্ষ ছিলেন। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বন করিয়া সময়োপযোগী, উদ্দীপনাময় কবিতা রচনা করিয়া বাঙ্গালীর কাব্য-পিপাসা নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন। আর একটী কারণে তিনি জনপ্রিয় হইয়াছিলেন—তাহা তাঁহার আশ্চর্য ছন্দ-কৌশল। সত্যেন্দ্রনাথকে 'ছন্দবাজ' বলা হয়। ছন্দে তিনি, ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসনের সঙ্গে তুলনীয়। যেমন 'Passing of Arthur'এ Tennyson বলিতেছেন,

> 'By zig zac paths and zats of pointed rock,
> Came to the shining level of the Lake.'

তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের রচিত,

> ঝরকায় ঝুরঝুর ফুরফুর বইছে।
> চরকার বুলবুল কোন বোল্ কইছে?
> কোন্ ধন দরকার চরকার আজগো?
> ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজগো।

দুই কবির ছন্দই এমন চমৎকার যে ছন্দের সৌন্দর্যে, কবিতার বিষয়বস্তু ও কবির মনোভাবটী সুস্পষ্টরূপে ভাষার ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়। এই ছন্দের তালে ও ঝঙ্কারে

পাঠকের চিত্ত আনন্দে নাচে, দুঃখে কাঁদে এবং উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত হইয়া ওঠে। সত্যেন্দ্র রচনার ভিতর ভাব ও ভাষার সহিত ছন্দ ও তালের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতে বিরল।

আবার অনুপ্রাস দ্বারা কবিতার চরণ অলঙ্কৃত করিতেও এই দুই কবি অদ্বিতীয়। যেমন 'The Charge of Light Brigade'এ Tennyson বলিতেছেন,

'Storm'd at with shot and shell
While horse and hero fell,'

তেমনি সত্যেন্দ্রনাথের 'গিরিরাণী' কবিতার একটা চরণেও,

'নীলগিরির নীলকান্তমণির নির্মিত ঠিং চাঁদ'—

সত্যেন্দ্র-রচনার ছত্রে ছত্রে এমন সুললিত অনুপ্রাসের ঘনবিন্যাস।

কাব্যবস্তুর সাংবাদিকতা এবং ছন্দ-সৌরব কবির উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তির নিদর্শন নয় বলিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ কেবল এই দুই কারণেই একজন খ্যাতনামা কবি হন নাই। তিনি ছন্দের সাহায্যে বাংলা ভাষার ধ্বনি-সম্পদকে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত করিয়া আনন্দরস উপলব্ধি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কবিকীর্তি কেবলমাত্র ভাষা ও ছন্দের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া নাই। তাঁহার রচনার ভিতর ছন্দ ও ভাষার সহিত ভাব ও অর্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে। ইহাই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কুশলতার প্রধান লক্ষণ।

বিশ্বের প্রতিটী অভিব্যক্তি যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ, তাহাই কাব্যকলা। ধ্বনি ও অর্থের উপরই আবার এই বাক্যের বিকাশ, কবি সত্যেন্দ্রনাথ ধ্বনি ও অর্থের উপর বাক্যকে স্থাপিত করিয়া নিজস্ব শিল্পচাতুর্যকে অতি সুন্দররূপে প্রয়োগ করিয়াছেন। নব নব শব্দবিন্যাস, পদযোজনা ও সুমার্জিত ভাষার ঔজ্জ্বল্যে সত্যেন্দ্র-কবিতা একটা অপরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। ভাবকল্পনার দিক হইতে দেখিতে গেলে আমরা দেখি সত্যেন্দ্রনাথ রহস্যময়, সংশয়াকুল, বস্তুভেদী ভাবকল্পনার অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করেন নাই। তাঁহার বিজ্ঞানবাদী বাস্তবতাপূর্ণ অন্তর সুদুর্লভ ভাবময় আদর্শকে স্থান দেয় নাই, যাহা বাস্তবজগতে মনুষ্যভাষায় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা যায়, ভাবপ্রবণ মনীষির দৃষ্টিতে, বুদ্ধিমান মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত থাকে, তাহাই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সকল সৃষ্টির ভিতরে চিত্রিত করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহার রচনা জ্ঞান ও বুদ্ধিগোচর। তিনি জগতের যাবতীয় বাস্তবরূপকে তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বহির্জগতের সহিত অন্তর্জগতের একটী অপূর্ব ঐক্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রত্যেক কবিরই একটা নিজস্ব বাণী থাকে। এই কবি কল্পনাও সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রাণের বিশিষ্ট বাণী।

একদিকে স্বল্পায়ু কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ইংরেজ কবি কীট্‌সের সহিত তুলনীয় অপরদিকে গীতিকাব্য রচয়িতা হিসাবেও তিনি কীট্‌সের সহিত তুলনীয়। কীট্‌স্ বিশ্বপ্রকৃতির নিছক রূপবর্ণনায় এবং প্রকৃতির সহিত মানুষের নিকট সম্বন্ধ স্থাপনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্তরালে তিনি গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন নাই।

এইজন্যই গীতিকবিদের মধ্যে কীট্‌স্‌ স্বভাব কবি (nature poet) বলিয়া অভিহিত। এই স্বভাব-কবিত্বের গুণেই তিনি বলিয়াছিলেন,

'A thing of beauty is joy for ever.'

অথবা 'Meg Merrilees' কবিতায় তিনি বলিতেছেন,

'Her bed it was the brown health turf
And her house was out of doors
Her wine was dew of the wild white rose,
Her book a churchyard Tomb.'

সেই প্রকার সত্যেন্দ্রনাথ নিছক প্রকৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া 'পাল্‌কীর গান'এ বলিতেছেন,

'গ্রামের শেষে
অশথ তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লি জ্বলে
টাট্‌কা কাঁচা
শাল—পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।'

অথবা প্রকৃতির সহিত মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া কবি 'কিশোরী' কবিতায় বলিতেছেন,

'তার জলচুড়িটীর স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল—
তার আলতা পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল—
তারে আস্‌তে দেখে ঘাটের পথে
শিউলী ঝরে লাখে লাখে
জুয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে।'

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বহু কবিতাতে ভেদাভেদের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সাম্যবাদের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শূদ্র' 'সেবাসাম' 'জাতির পাঁতি', 'মেথর' প্রভৃতি কবিতায় আমরা এই সাম্যবাদের প্রচার দেখিতে পাই। যেমন,

'তফাৎ হয়ে তফাৎ করে নাইকো মহত্ত্ব
দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম বিজত্ব।'

অথবা,

'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে পালিত একই রবিশশী
মোদের সাথী।'

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া স্বদেশপ্রেমের বাণীও দেশবাসীর মর্মমূলে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশকে বিশ্বের সঙ্গে ও স্বদেশপ্রেমের সহিত বিশ্বপ্রেমকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশ্বমানবের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যেমন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'তে তিনি বলিতেছেন,

'বিশ্ববাংলা উঠ্‌ছে গড়ে
জাগ্‌ছে প্রাণের তীর্থ গো,
জাতির শক্তি-পীঠ জগতে গড়্‌ছে
মোদের চিত্ত গো।
তার পিছনে দাঁড়িয়ে তুমি মোদের স্বদেশ মাতৃকা!
দিচ্ছ বুদ্ধি দিচ্ছ গো বল জ্বালিয়ে আঁখির স্থির শিখা!'

আবার সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় প্রতি কবিতাতেই আমরা তাঁহার অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক জ্ঞানেরও পরিচয় পাই। যেমন 'আমরা' কবিতায় তিনি বলিতেছেন,

'বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি,
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি।'

প্রাচীনকালে জীবন ও দৃশ্য জগতকে সুনিয়ন্ত্রিত বিবেকসম্পন্ন আদর্শে বিধৃত করিয়া তাহাকে চিত্তগ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করাই ভারতীয় কবিগণের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যুগপরিবর্তনে বহির্গত রচনাকৌশলই কবির প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইল এবং প্রাচীন আদর্শের প্রতি কাব্যরসিকেরা শ্রদ্ধা হারাইল। তাহারা স্ব স্ব মনোভাব লইয়া ভাববিলাসী হইয়া উঠিল। এই জন্যই আধুনিক কবিরা সুনিয়ন্ত্রিত ভাব ও ভাষার আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত নয়; কেবলমাত্র ভাষার অতীত যে স্বকীয় ভাবব্যঞ্জনা তাহারই প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে; সত্যেন্দ্রনাথ এ যুগের কবি হইয়াও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন নাই। সেইজন্য তাঁহার রচনা, আধুনিক রুচিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার উপযুক্ত সম্মান লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী যুগের আদর্শে কবিকে বিচার করিলে কবির সুবিচার হয় না। কবিকে অতীত, বর্তমান ও ভাবীকালের সমগ্র যুগ লইয়া সমালোচনা করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথাযথ পরিমাপ হয়। যে কাব্য বাস্তবকে সহজবুদ্ধি ও স্বচ্ছ কারুশিল্পে ভূষিত করিয়া মানবের সহজাত নীতিজ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তিকে

সুসম্পূর্ণ করে, সেই কাব্যই জনপ্রিয় হয়। সত্যেন্দ্রনাথ এই প্রকার কাব্যসৃষ্টি করিয়াই তাঁহার কাব্যকলাকে সাহিত্যমন্দিরের স্বর্ণসিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছেন।

যদিও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আধুনিক বিজ্ঞানের সত্যবাদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সংস্কারের সংকীর্ণতাকে একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না—তথাপি তিনি অতীতের মানব ও কীর্তি, বিশেষরূপে ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যেমন 'আমরা' কবিতায় তিনি বলিতেছেন ;

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে
সজ্জিত চতুরঙ্গে
দশানন-জয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের
সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া
জয়,
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্যের
পরিচয়।"

অথবা অতীত যশ কীর্তির কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া বলিতেছেন,

"উজল টুক্‌রা তাজ চন্দ্রালোকের
পড়েছে গো খসে দুনিয়ায়
এ যে মহামৌক্তিক দিগ্‌বারণের
মহাশোক-অঙ্কুশ-ঘায়
এসেছে বাহিরি, নিধি সৌন্দর্যের
প্রেমের কীরিটে শোভা পায়।'

আধুনিক ভাববিলাসীর ন্যায় সত্যেন্দ্রনাথ নবস্বর্গ অথবা নন্দনকাননের ন্যায় ধরণীর স্বপ্ন দেখিতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যে নব্যসংস্কৃতি ভাষায় ও ভাবে সুসম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—সত্যেন্দ্রনাথ সেই মনীষার মূল সুরটীকে গ্রহণ করিয়া নবরচিত কৃষ্টিকে তাহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া বহন করিয়াছিলেন। তিনি সে যুগের সাধনাকে অতি উচ্চ কল্পনার রাজ্য হইতে সাধারণ বোধ-যোগ্য অতি বাস্তবক্ষেত্রে আনিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সংস্কৃতি অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপনে এবং বিদেশী আদর্শকে স্বীকার করিয়াও স্বদেশের অতীত গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র ছিল। সত্যেন্দ্র-কবিতায় এই বাণীই ঘোষিত হইয়াছে যে;—'অতীতের উপর বর্তমানের অধিষ্ঠান এবং বর্তমানে ও অতীতে বাস্তবিকই কোন প্রভেদ নাই—কেবলমাত্র যুগধর্মের তাড়নায় বর্তমান কিঞ্চিৎ প্রভাশূন্য হইয়াছে, এই আশ্বাস নিয়া বাস্তব-জীবনের রূঢ়সত্যকে গ্রহণ করা কর্তব্য'।

সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা পর্যালোচনা করিয়া এই বাণী অনুসারে তাঁহাকে আমরা বাস্তব আশা অভিলাষের চারণ কবি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এই কারণে ইংরেজ কবি টেনিসনের সহিত তাঁহার তুলনা চলে। টেনিসনও তাঁহার আমলে ইংরেজ সমাজের আশা-আকাঙ্খার চারণ-কবি ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের দেশের কীর্তিগৌরবে এত গর্বিত ছিলেন এবং জাতীয়-সমাজের সীমাবদ্ধ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করিতে এত তৎপর ছিলেন যে, তিনি তাঁহার রচনার ভিতর দিয়া সমগ্র বিশ্বকে তাহাদের জাতীয় সমাজের কৃষ্টি অনুসরণের জন্ম বহুবার আহ্বান করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি এই গর্ব্বেই নানা দেশের নানাপ্রকার সভ্যতার ধারা ও নানাজাতির বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভাকে অনুধাবন করিতে পারেন নাই। কিন্তু টেনিসন কবি হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ হইতে নিপুণতর শিল্পী হইলেও সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনাক্ষেত্র টেনিসনের ন্যায় এত সঙ্কীর্ণ ছিল না। তাঁহার জাতীয়তা-বোধ উদারতার উপরে স্থাপিত ছিল এবং জাতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে তিনি বিশ্বসভ্যতার সহিত বিধৃত করিয়া স্বদেশের গৌরবকে সমগ্র দেশের মহিমার মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভবিষ্যতের প্রতি অসীম আশা বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু তিনি বর্ত্তমানের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের আলোক দর্শন করিতেন। যেমন 'ছেলের দল' কবিতায়

'সকল দেশে সকল কালে
উৎসাহ তেজ অচঞ্চল
ওই আমাদের আশার প্রদীপ
ওই আমাদের ছেলের দল।'

অথবা

'ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই
আশা-ভরা আহ্লাদে
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ব্বাদে ;
মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে।
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।'

সমগ্র বিশ্বের উপরে এক নিয়মশীল মহাশক্তির অস্তিত্ব এবং প্রাণীজগতে মনুষ্যের প্রাধান্য ইহাই ছিল তাঁহার ধর্মবিশ্বাস। এই জন্যই সত্যেন্দ্রনাথের কবিকল্পনা বুদ্ধি ও জ্ঞানদ্বারা সীমাবদ্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তবের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। অন্যান্য কবির ন্যায় প্রত্যক্ষ বাস্তবজগতকে অতীন্দ্রিয় জগতে লইয়া যায় নাই। সেই হিসাবে তিনি কবির সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু দক্ষ রূপকারের ন্যায় তিনি জাগ্রত বুদ্ধির জগতে ভ্রমণ করিয়া, ইতিহাস,

দেশ, ধর্ম, প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও সমাজগত মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রভৃতির দ্বারা জীবন ও জগতের অপরূপ রসঘনমূর্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

কাব্যের দিক হইতে আদর্শ যাহাই হউক না কেন সাহিত্যিক-কলাশিল্প ও বাক্‌চাতুর্যে সত্যেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের ভাষার ও ছন্দের অজস্র সৌন্দর্য, শব্দালঙ্কার ও দৃষ্টান্তের অপর্যাপ্ত স্বচ্ছন্দধারা, শক্তিশালিনী কল্পনা এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে অতি সচেতন দৃষ্টি বাংলাসাহিত্য জগতে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরেই সত্যেন্দ্রনাথের স্থান। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যে যাহা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা স্বল্পায়ুতো নহেই, বরং বঙ্গভাষা যতকাল এজগতে জীবিত থাকিবে—তত দীর্ঘকাল সত্যেন্দ্ররচনাও অমর হইয়া থাকিবে—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালার বাণীমন্দিরের এই শক্তিমান সাধকের মৃত্যুতে সেইজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,

'জানি তুমি প্রাণ খুলে
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে
তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে বাঁশীখানি লয়ে হাতে
মুক্তমনে, দীপ্ততেজে ভারতীর বরমাল্য মাথে
আজ তুমি গেলে আগে।
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি মুহূর্তের মাঝে
আজো। যারা জন্মে নাই, তব দেশে
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাঁদের উদ্দেশে
দেখার অতীতরূপে আপনারে করে গেলে দান দূরকালে।'

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি. এ.

শঙ্কর সম্প্রদায়ে শ্রীগোবিন্দপাদকে যেমন শেষাবতার বলা হইয়া থাকে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়েও সেই প্রকার শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে ভগবান বাসুদেব বিষ্ণুর সুদর্শনের * অবতার, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যকে শঙ্খের অবতার, এবং শ্রীদেবাচার্যকে পদ্মের অবতার বলা হইয়া থাকে।

কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব কাল খ্রী° একাদশ শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিম্নে লিখিত হইল—

(১) পূর্বোল্লিখিত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে" ৩৭৬ এবং ৩৭৭ পৃষ্ঠায় এই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"ধ্রুবক্ষেত্রে যে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদি আছে, তাহার মোহান্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। নিম্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতিকাল পঞ্চম শতাব্দী। ধ্রুবক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের অধিক হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ তাঁহারা নির্দেশ করেন। ৺অক্ষয় বাবুও ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই নিম্বার্কাচার্যের কাল নির্ণয় দুরূহ। কারণ, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় বৈদান্তিক ভট্ট ভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মতসাদৃশ্যের জন্যও নামসাদৃশ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয় ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভ প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের মতে প্রভাবিত হইয়া, নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভ প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্যের কাল অষ্টম শতাব্দী। নিম্বার্ক, ভাস্করের পরবর্তী। তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করিলাম। এবিষয়ে অন্য কারণ এই—বেদান্তকেশরী অনন্তরাম, আচার্যের জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তাহাতে দেবাচার্যের কাল বৈক্রম সংবৎ ১১১২ (যুগরুদ্রেন্দু) বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ১১১২ সংবৎ নহে, শকাব্দ। ১১১২ শকাব্দ দেবাচার্যের স্থিতিকাল গ্রহণ করিলে ১১৯০ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ

---

*পূর্বোক্ত "বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে"—৩৭৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, নিম্বাদিত্য (নিম্বার্কাচার্য) সূর্যের অবতার। ইহা ভুল। তিনি শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্রের অবতার।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি বর্তমান ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বৈদান্তিক ভাস্কর ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেবাচার্য বর্তমান থাকায় নিম্বার্কের কাল ১১শ শতাব্দী হওয়াই সমীচীন।

নিম্বার্কাচার্যের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে অন্য হেতুও বিদ্যমান। ভবিষ্যপুরাণ পরিশিষ্টে ভগবদ্ভক্তমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে একবিংশ (২১শ) অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—

"বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ।
মধ্বাচার্যস্তৃতীয়স্তু তুর্যো রামানুজঃ স্মৃতঃ॥"

এস্থলে দেখিতে পাই নিম্বাদিত্য বিষ্ণুস্বামীর পরবর্তী এবং মধ্বাচার্যের পূর্ববর্তী। মধ্বাচার্যের স্থিতিকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ; সুতরাং নিম্বার্কাচার্যের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। এস্থলে রামানুজ ও মধ্বাচার্যের যে ক্রম দর্শিত হইয়াছে, তাহা ভ্রান্তিমূলক মনে হয় ; কারণ, রামানুজাচার্য মধ্বাচার্যের পূর্ববর্তী। সম্ভবতঃ ইনি অন্য রামানুজাচার্য হইতে পারেন। কারণ, ভবিষ্যপুরাণে সম্প্রদায়প্রবর্তক রামানুজাচার্যের বিবরণ অন্যত্র বর্ণিত আছে। যাহা হউক নিম্বার্কাচার্য রামানুজাচার্য হইতেও প্রাচীন। রামানুজাচার্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, নিম্বাদিত্য তৎপূর্ববর্তী। সুতরাং তাঁহার স্থিতিকাল ১১শ শতাব্দী গ্রহণ করাই সমীচীন।

দেবাচার্য নিম্বার্কের ও শ্রীনিবাসাচার্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়াই স্বীয় বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন।

দেবাচার্যের কাল ১১১২ সংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে দেবাচার্য ও ভাস্করাচার্য (ভেদাভেদবাদী) সমসাময়িক হন। কিন্তু ভাস্করাচার্যের মতবাদে যে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছেন, তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, ভাস্করের ভাষ্যে শঙ্করমত নিরস্ত হইয়াছিল বলিয়াই নিম্বার্ক আর পৃথক করিয়া শঙ্করের মত খণ্ডন করেন নাই, কেবল অতি সংক্ষেপে বিষ্ণুপর ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।"

অতঃপর গ্রন্থের ৩৮৮—৩৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—

"নিম্বার্ক ভাস্করাচার্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। বোধহয়, ভাস্করের মতে প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার অন্যনাম ভাস্করাচার্য। দেবাচার্যের গ্রন্থে তাঁহার নাম নিয়মানন্দ। সর্বদর্শনসংগ্রহে নিম্বার্কমত প্রপঞ্চিত হয় নাই, ইহা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন, নিম্বার্ক বিদ্যারণ্যের পরবর্তী। পূর্ববর্তী হইলে সর্বদর্শনসংগ্রহকার তন্মত অবশ্যই প্রপঞ্চিত করিতেন। আমাদের মতে এবিষয়ে আশঙ্কার বা আপত্তির কোনও হেতু নাই। কারণ, সর্বদর্শনসংগ্রহে ভাস্করাচার্যের মতও উদ্ধৃত হয় নাই। ভাস্করাচার্য বিদ্যারণ্য হইতে প্রাচীন। বিদ্যারণ্য বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ নামক ব্যাখ্যায় ভাস্করমত নিরসনও করিয়াছেন, কিন্তু সর্বদর্শনসংগ্রহে ভাস্কর মতের উল্লেখ নাই। অতএব নিম্বার্কের মত সর্বদর্শনসংগ্রহে উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই নিম্বার্কাচার্যকে বিদ্যারণ্যের পরবর্তী বলা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় আমাদের নির্ধারিত নিম্বার্কের কাল সুস্থিত.

নিম্বার্ক স্বীয় ব্যাখ্যায় সৌগত (বৌদ্ধ), জৈন, পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য শঙ্কর ২।২।৪২ সূত্রে ("উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ") পঞ্চরাত্র মত খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু এই সূত্রবলে আচার্য নিম্বার্ক শক্তিকারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাৎ জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ।" নিম্বার্কের সময় শক্তিবাদের অভ্যুদয়ের ইহা নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। তাঁহার মতবাদ নিম্বার্কীয় মতবাদে সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নিম্বার্কের মতবাদ কেবল উত্তর ভারতেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। অন্ততঃ বিদ্যারণ্যের সময় (১৩শ—১৪শ শতাব্দী) নিম্বার্কমতের প্রচার ততটা সাধিত হয় নাই। সুদূর কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞাবাদ বিদ্যারণ্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে; কিন্তু নিম্বার্কের মত স্থান পায় নাই, ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে; বিশেষতঃ নিম্বার্কসম্প্রদায় দক্ষিণভারতে নাই। উত্তর ভারতে ও মথুরার নিকটে ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে মাত্র নিম্বার্কসম্প্রদায়ের লোক দৃষ্ট হয়। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গ্রন্থাভাবের ফলেও ঐমত সবিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল কারণেই নিম্বার্কের মত সর্বদর্শনসংগ্রহে স্থান পায় নাই বলিয়া বোধ হয়।"

(২) "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জাহ্নবীচরণ ভৌমিক মহাশয় শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাবকাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৩) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য, এম্. এ. মহাশয় স্বরচিত "শ্রীনিম্বার্কাচার্য ও তাঁহার ধর্মমত" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"নিম্বার্কাচার্য তাঁহার 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক গ্রন্থে শক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। মুসলমানের আক্রমণে যখন হিন্দুশক্তি পুনঃপুনঃ পরাভূত হইতেছিল, তখন নিরুপায় হিন্দুরা কাতরকণ্ঠে মা, মা, বলিয়া যে আর্তনাদ তুলিয়াছিল, তাহাই শক্তিবাদকে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে নিম্বার্কের স্থিতিকাল আমরা একাদশ শতাব্দী ধরিয়া লইতে পারি।"—(৫২ পৃষ্ঠা।)

"খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে রাধার নাম ও তত্ত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া কেনেডি সাহেবের মত। ঠিক এই সময়েই নিম্বার্কাচার্যেরও আবির্ভাব হয়।"—(১০৯ পৃষ্ঠা।)

"ডক্টর্ সুশীলকুমার দে এম্. এ., ডি. লিট্, মহোদয় জয়দেব ও গীতগোবিন্দের আলোচনায় লিখিয়াছেন,—"নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণও রাগমূলক উপাসনার পদ্ধতি স্বীকার করেন; এবং ইঁহাদের উপাসনাতত্ত্বে রাধারও স্থান রহিয়াছে। নিম্বার্কের সময় ঠিক নির্দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু তিনি জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে জয়দেবের সময় বাঙ্গালাদেশে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রভাবও স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক গ্রন্থই আছে; কিন্তু নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক কোন গ্রন্থ না থাকায় পণ্ডিতেরা 'নিম্বার্কাচার্য ও জয়দেবের যোগসূত্রের বিষয়ে অনেক তথ্যেরই মীমাংসা করিতে পারিতেছেন

।। এমনকি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী-কৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে (History of the Vaishnaba Sect) নিম্বার্কাচার্যের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে বর্তমান ছিলেন। আমি দেখাইয়াছি যে, নিম্বার্কাচার্য একাদশ শতাব্দীতে ধর্মপ্রচার করেন।"—(১১৩ পৃষ্ঠা)।

(৪) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় (অধুনা, শ্রীমৎস্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ) নানা প্রবন্ধাদিতে এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই,—শঙ্করাচার্য পূর্বে এবং নিম্বার্কাচার্য পরে; এমন কি রামানুজেরও পরে, এবং অনেকে অনুমান করেন মধ্বাচার্যেরও পরে। মধ্বাচার্যের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দী।

কিন্তু তিনি ১৩৪৫ সাল, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, "শিবম্" পত্রিকার ৩৭৭ পৃষ্ঠায় "অদ্বৈতবাদীর আত্মরক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্বার্কভাষ্য দশম শতাব্দীর বলিয়াছেন।

(৫) পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী নিম্বার্কভাষ্যের ভূমিকায় নিম্বার্কের কাল ১০৪১ হইতে ১১৯৯ বিক্রম সংবৎ, অর্থাৎ ৯৮৫ হইতে ১১৪৩ খ্রীঃ অঃ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(৬) স্যর আর্ জি. ভাণ্ডারকারের মতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সময় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী, এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্যের তিরোভাব ১১৬২ খ্রীঃ অঃ। তাঁহার হেতু নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তদীয় গ্রন্থ "Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems" ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন,—

"Nimbarka is said to have been a Tailanga Brahman by birth and to have lived in a village called Nimba[1], which perhaps is the same as Nimbapura in the Bellary district. He was born on the third of the bright half of Vaisakha, and his father's name was Jagannatha who was a Bhagvata, and his mother Sarasvati.

As to when he flourished we have no definite information, but he appeard to have lived sometime after Ramanuja.[3]

1. Nimbarka was the son of Nimba,

2. Introduction of the commentary of Dasasloki by Harivyasadeva. It is to be regretted that the commentator does not give the year of Nimbarka's birth.

3. In my report on the Search for Sanskrit Manuscripts for the year 1882-83, I have given two succession lists of spiritual teachers, one of the sect of Anandatirtha (p. 203) and another of that founded by Nimbarka (p. 208-19). This contains 3? names. There is another in Manuscript no 709 of the collection of 1884-7, which contains 45 names. The two lists agree up to no 32 Harivyasadeva After that, while the first has only five names, the second has thirteen names, and none of these agrees with any of these five, so that after Harivyasadeva the line appears to have divided into two branches. No. 709 of the same Collection was written in Samvat 1809 corresponding to 1750 A.D., when Goswami Damodara was living. He was thirty third after Nimbarka in the new branch line The thirty-third after Anandatirtha died in 1879 Anandatirtha according to our revised date died in 1276 A.D; so that his 33 successors occupied 603 years. Supposing that the 33 successors of Nimbarka occupied about the same period and allowing about fifteen years of life to Damodara Goswami, who was living in 1750 A.D. and subtracting from 1765 A.D.

(৭) ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীকরভাষ্যের ভূমিকায় (পৃ° ১৩৫) সুধীবর সি হয়বদন রাও মহাশয় বলেন যে, নিম্বার্কাচার্যের কাল রামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মধ্যবর্তী, অর্থাৎ আনুমানিক ১১৩৮ হইতে ১২৭০ খ্রী° অ°। তাঁহার মতে পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের মত যুক্তিসহ নহে। শ্রীকরভাষ্যের ভূমিকায় (২১১ পৃঃ) সি, হয়বদন রাও আরও বলেন যে, এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে নিম্বার্ক আনন্দতীর্থেরও পরবর্তী। মধ্বাচার্যের নামান্তর আনন্দতীর্থ। ইঁহার মতে মধ্বাচার্যের সময় ১২৩৮—১৩১৭ খ্রী° অ°।

এই বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা হইতে গ্রন্থসম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল,—

"Nimbarka has been assigned by Sir. R. G. Bhandarkar on the basis of a rough approximation, to the middle of twelfth century, his death being fixed at 1162 A.D. Since he shows in some respects, strong resemblance to Ramanuja's views, he may perhaps be put down at least a century later, if not more. There is the greater reason for assigning a later date to him, for his theory is a kind of Bhedābhed, which presupposes the existence of a strong *dvaita* school of thought at the time he propounded his teaching.......

Since Srikantha refutes the view of Nimbarka (see comments of Srikantha and Nimbarka on III. 3, 27-30), it has to be presumed that Nimbarka preceded Srikantha. Since Srikantha lived about 1270 A.D., Nimbarka should be taken to have lived sometime before that date. How many years before Srikantha, Nimbarka lived, we have no materials at present to determine. But his lower and upper limits are fixed by Ramanuja and Srikantha, that is, *circa* 1138 and 1270 A.D. Pandit Bindhyeshvari Prasad Dvivedin has assigned Nimbarka to a date between 1041 and 1199 Vikrama Era, or 985 and 1143 A.D. This seems clearly inadmissible, judging from the independent evidence that has been adduced above for the date of Srikantha and the impossibility of making Nimbarka anterior to Ramanuja, to whom he owes intellectual allegiance.[1] (ক্রমশঃ)

---

603 years, we have 1162 which is about the date of Nimbarka's death, so that he lived after Ramanuja. This calculation of ours is of course very rough and, besides, the date of Manuscript no 706, which is read 1913 by some, but which looks like 1813, conflicts with the calculation as nine more Acaryyas flourished after Damodara. And, if 1813 is the correct date, seven years cannot suffice for these, though 107 may, if the date is read 1913.'

1. ....That Nimbarka was indebted to Anandatirtha (Madhva) and not Anandatirtha to Nimbarka seems also improbable from a comparison of their commentaries on the Brahma Sutras. Wherever their views are identical, it is generally to be seen that Anandatirtha's position is fully supported by argument and citation of authorities, whereas Nimbarka's seems but a bare assertion which presumes much on the part of the reader. —(cf. Comments of these commentators on III. 2. II—Nasthānotopi etc.; II. 2. 41—Utpatyasambhabat).

ভাব-সম্মিলন

—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দৃষ্টিতে

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক **শ্রীজগদীশচন্দ্র মিত্র**, এম্, এ.

আবার কখনও সদ্যস্নাতা পূজারিণী বেশে আসিয়া রাধা সকলকে নূতন কথা শুনাইয়া যায়—

পিয়া যব আওব ই মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়া কুম্ভ করি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্গমে।
আড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হম গরুয় নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিনি সুঝম্প॥

—প্রিয়তম এই গৃহে আসিলে নিজ দেহে সমস্ত মঙ্গল উপচার সাজাইব। কনককুম্ভ হইবে আমার কুচযুগল। চক্ষুতে কাজল পরিয়া দর্পণরূপে তাহার সম্মুখে ধরিব। নিজের অঙ্গকেই বেদী করিব। চিকুর বিসারিত করিয়া সম্মার্জনীর কাজ করিব। আমার গুরুভার নিতম্ব দিয়া কদলী রোপণের কাজ হইবে; এবং স্পন্দমান কিঙ্কিনী দিয়া মাঙ্গলিক আম্র পল্লব রচনা করিব।[১]

তাহার সঙ্কল্প হইল, কৃষ্ণকে আর বাহিরে কোথায়ও যাইতে দিবে না।

—আর দূরদেশে হম পিয়া ন পাঠাও।
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাও॥

আবার বড়ু চণ্ডীদাসও রাধাকে বলিয়াছেন—

আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি॥

---

১ দীর্ঘা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ।
পুষ্পানাং প্রকরঃস্মিতেন রচিতো নো কুন্দ জাত্যাদিভিঃ॥
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরযুগেনার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্॥ অমরুশতক।

ভাবময়ী রাধার সম্মুখ দিয়া ভাবময় রস-সাগর কৃষ্ণ পূর্ব-পরিচিতরূপে বংশী হস্তে চলিয়া যাইতেছে। হঠাৎ একদিন রাধার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আনন্দে রাধার হৃদয় যেন গলিয়া পড়িল। এতদিনে মলয় তাহার নিকট সুখস্পর্শ হইয়াছে, চন্দ্র নির্মলরূপে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া দিয়াছে—

"আজি মলয়ানিল মৃদু মৃদু বহত ;
নিরমল চাঁদ প্রকাশ ॥"

আবার—

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা ॥
—বিদ্যাপতি।

দুইজনের রূপে দুইজনেই সকল কিছু ভুলিয়া গেল—ইহ-পরকালের কথা আজ তাহাদের মন হইতে বিদায় লইয়াছে। দুইটী বিভিন্ন সত্তার আজ মিলন ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকে স্নিগ্ধ ভর্ৎসনা সহিতে হইল ; রাধা বলিল—

"ব্রজপীরিতের প্রদীপ জ্বালিয়ে
দীপ কি নিভাতে হয়।"

আবার সহজিয়ার ভাবে অনুপ্রাণিত গঞ্জনার সুর—

রসিকের রীতি সহজ সরল
বাখালে তাই কি জানে ॥

তারপর রাধার ঐকান্তিক মিনতি—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণবঁধু হইও তুমি ॥

—এত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তোমাকেই চাই। কিশোর বয়সেই আমাকে নিজের রূপে ভুলাইয়া গৃহত্যাগিনী কলঙ্কিনী সাজাইয়াছ। এখন তুমি ভিন্ন ত্রিভুবনে আর গতি নাই। জন্ম-জন্মান্তরের সাথী হইয়া আমার প্রেমের একমাত্র আশ্রয় হইয়া তুমি আমাকে তোমার সঙ্গ-ছাড়া করিবে না—ইহাই আমার চিরন্তন প্রার্থনা। চিরদিন সকলের ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু তোমার ভালবাসায় সকলের ভালবাসা ম্লান হইয়া গেল। তাই তোমার গর্বে আমার জগৎ ভরিয়া যায়—

সখীগণে কহে শ্যাম-সোহাগিনী
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব তুই বাঢ়ায়লি
অব টুটয়ব কে ?

—তোমার গর্বে আমার দেহ ভরিয়া উঠিয়াছে—তুমি আমার যে গৌরব বাড়াইয়াছ—তাহা কিছুতেই ঘুচিবে না—কাহারও সাধ্য নাই তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করে।১ তুমি আজ আমার প্রাণের অতিথি। তোমাকে কি দিয়া সন্তুষ্ট করিব, জানি না। তুমি আমার সর্বস্ব—আমি একান্তই তোমার। "যে ধন তোমারে দিব, সেই ধন তুমি,"—আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সবই তোমা-ময়। আমার—"যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" তবু এখন নূতন করিয়া নিজেকে তোমার শ্রীচরণে সঁপিয়া দিতেছি।

তুমি আমার হস্তের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তাম্বুল, হৃদয়ের কস্তুরী, গলার হার, জীবনের জীবন, বস্তুত আমার সব। ["হাথক দরপণ মাথক ফুল," ইত্যাদি (বিদ্যাপতি)]। এত বলিয়াও শ্রীমতী প্রিয়তমের স্বরূপ বর্ণনা করিতে পারিতেছে না—তাই পুনরায় প্রশ্ন—'তুহুঁ কইসে মাধব কহ তুহুঁ মোয়'।—মাধব, আমাকে বল তুমি কেমন। রসিক ভক্ত ভগবানকে তিল তিল করিয়া বুঝিতে চাহেন, উপভোগ করিতে চাহেন। তাঁহার মধুর সত্ত্বাকে আপনার করিয়া লইয়া আশ মিটাইয়া ভোগ করিয়াও তৃপ্ত হন না। তাই তাঁহার অজ্ঞাত আকার সম্বন্ধে জানিতে গিয়া এত উৎসুক হইয়া উঠেন। রাধা কৃষ্ণকে পাইয়াছে বাহিরে, অন্তরে। আরও নিবিড় করিয়া পাইতে বাসনা জাগে, এ বাসনার কি শেষ আছে ? স্বয়ং ভগবান্ যে বাসনায় ইন্ধন যোগাইয়াছেন, তাহা তো অনির্বাণ। কবি ভণিতায় উত্তর দিতেছেন—"বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহ' হোয়।"—তোমরা উভয়েই উভয়ের মত। ভক্ত-ভগবান, বিষ্ণু-বৈষ্ণব, দুয়েতে বিভেদ নাই। জান না বলিয়াই তোমার এই দুঃখ। মধুর রস-সাধক ভক্তকবি প্রিয়তমের চোখে চোখ রাখিয়া তাই গাহিয়াছেন—

"হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
... ...
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

---

১ "Thou art my glory and in exultation of my heart, thou art my hope and refuge in the day of my tribulation"—Psalms, xxxii [7] L ix [16]

"সকল গর্ব দূর করি দিব, তোমার গর্ব ছাড়িব না।
... ...
যত মান আমি পেয়েছি জীবনে, সেদিন সকলি যাবে দূরে
শুধু তব মান দেহে মনে মোর বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।।" রবীন্দ্রনাথ।

তুমি সজ্জন বলিয়া প্রেমের মর্যাদা দিবে জানি। বিদ্যাপতি বলেন—

পুরুব ভানু যদি পছিম উদীত।
তইঅও বিপরীত নহ সুজন পীরিত॥
অচল চলয় যদি চিত্র কহ বাত।
কমল ফুটয় যদি গিরিবর-মাথ॥
দাবানল শীতল, হিমগির-তাপ।
চান্দ যদি বিষ ধর সুধা ধর সাপ॥১

* * * *

—এতগুলি বিপরীত ধর্মের সমাবেশ যদিও সম্ভব হয়, তথাপি সুজনের অনুরাগ বিপরীত হয় না, অনুগত জনকে পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে; ইহা সাধুগণের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

অতঃপর রাধার চরম প্রার্থনা—

'পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে
সদাই অন্তরে থাক।'

—সুকোমল ভক্তহৃদয়ই তাঁহার যোগ্য আসন। হৃদয়ে অনুভব করিয়া রাধা আজ আপনাকে উপ্‌ছাইয়া পড়িতে চাহিতেছে। অনুভবের পদগুলি অতি মনোহর। কোন সাহিত্যে ইহার অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে রাধার 'আত্মরতি' হৃদয় পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে। এখানকার ছোট বড় সুখদুঃখের অতীত হইয়া প্রেম-পাগল সেই হৃদয় প্রিয়তমকে লইয়াই ব্যস্ত। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি,"—রসস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরমতম আনন্দের আস্বাদনে রাধা অধীর। প্রিয়ের মুখচন্দ্র তাঁহার জীবন-যৌবন সফল করিয়া দিয়াছে। আজ আর পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাহার কোন অভিযোগ নাই। আনন্দময়ের স্পর্শ পাইয়া সবই আনন্দময়। এখন সকল সন্দেহের অবসানে—

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা—(বিদ্যাপতি)

—আজ আমার গৃহ যথার্থ গৃহ বলিয়া মানিলাম। আজ আমার দেহ যথার্থ দেহ

---

১ তুলনীয়—উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্‌ বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্নচলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

হইল। এতদিন শূন্য মন্দিরে প্রাণহীন দেহের ভার বহিয়া বহিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম —এতদিনে 'প্রাণের প্রাণ' আমাকে উজ্জীবিত করিল। না জানি কি পুণ্যের ফলে হারাইয়া-ফেলা রত্ন পাইলাম। মাধব আবার আসিয়াছে —আর কখনই যাইতে পারিবে না। এবারে চিরকালের মত তাহাকে পাইয়া আমার নিরবধি আনন্দের বর্ণনা করিতে পারিতেছি না।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতুন হোয়॥

* * *

জনম অবধি হাম রূপ নেহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল ন গেল॥ —(বিদ্যাপতি)।

—এই অনুভবকে প্রকাশিত করা মানবীয় ভাষার সাধ্যাতীত। প্রশ্ন করিয়া বা উত্তর দিয়া ইহা উপলব্ধি করা যায় না। অনন্ত রস-সাগরের ইয়ত্তা কে করিবে? সেই পরানুরক্তি ব্যাখ্যা করিতে বসিলে প্রতি মুহূর্তে অভিনব রূপ ধারণ করিয়া ভক্তকে অপার আনন্দে ভাসাইয়া দেয়। তৃপ্তি নাই; অনন্তরূপ চিরকাল দেখিয়াছি—রূপ দেখার সাধ এখনও মিটিল না। মর্ম-চোখে রূপের ঘোর লাগিয়া রহিয়াছে। যে রূপের একটুমাত্র কণায় বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে—বাহির ছাড়িয়া অন্তরে হানা দিয়া যে রূপের আভাস প্রেমিককে পাগল করিয়া দিয়াছে সেই রূপ দেখা এতটুকু চোখে কুলায় না। আবার অনন্তকাল প্রিয়জনের বুকে বুক রাখিয়াও শান্তি নাই—প্রীতি নির্ঝর অঝোরে ঝরিতেছে—লক্ষ যুগেও ইহার ঝরা ফুরাইল না, অফুরন্ত ধারার সম্পদে মহনীয় হইয়াই রহিল। প্রেমের খেলায় কতবার জয়পরাজয়ের, অভিমানের পালা চলিল। কত লক্ষ যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল; চিরশ্যামল চিরকিশোর দেবতা আসিলেন কতবার মানুষের হৃদয়ের অভিসারে,—কতবার দুইয়ের মিলন ঘটিয়াছে। লক্ষ মিলনের মাল্য পরিয়াও কাহারও তৃপ্তি নাই -দুজনেরই কণ্ঠে অশান্তির, অপূর্ণতার সেই পুরাতন সুর। প্রাণে জুড়াইতে চাহে না। কী মধুর অশান্তি!

দেবতা আকুল সুরে বলেন—

'রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।'

—মানুষের সঙ্গ ভিন্ন তিনিও অপূর্ণ। চণ্ডীদাস দেখিয়াছেন, অপূর্ণতা ঘুচাইতে গিয়া তিনি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে তুলিয়াছেন। পরম ভিখারীর ইচ্ছা, অনুরক্তের গুণগানে ডুবিয়া থাকেন—

'করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হৈয়া ভোর।'

দেবতার আসন হইতে নামাইয়া কবি তাঁহাকে ধূলার ঐশ্বর্যের, মাটীর গর্বের রাজ-সিংহাসন দিয়াছেন। বড সাধে ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্যের ভার ফেলিয়া দিয়া আজ অকিঞ্চন ভিক্ষুক মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন। শত যুগ তিনিও মানুষের গুণ-গাথা রচেন, গাহিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।—

"অবিরাম যুগ শত গুণ গাই অবিরত
গাহিয়া করিতে নারি শেষ।"

আকাশ সাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। অনন্ত সান্তের সঙ্গে মিশিয়া তাহাকেও অনন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ইন্দ্রিয়-ভোগের শব্দকোশ হইতে অনুরাগের ভাষা আহরণ করিয়া মহাকবিদ্বয় ভাবসম্মিলন-পদাবলী গাথিয়াছেন। তাহা হইতে যে গন্ধ পাওয়া যায়, তাহা স্বর্গের, বহু সাধনায় পাওয়া। ভাব-সাধনার সমাপ্তি বা সিদ্ধি ভাবসম্মিলনে; ভক্তিশাস্ত্রে ইহার চেয়ে বড কথা আর নাই। ইহার পর আপনা হইতে নিস্তব্ধতা আসে—অনুভবের কথা বলিবার শক্তি থাকে না। 'আহা! কি দেখিলাম!'—এইটুকুই বলা সম্ভব। এখন তৃপ্তি অতৃপ্তির পারে নূতন অনুরাগের কুটীর বাঁধিয়া সিদ্ধ-প্রেমের লতায় নিত্য নূতন ফুল ফুটাইয়া আনন্দের হাটে বিকিকিনি আরম্ভ হয়। রস-সাধক সুজনেরা জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার মূল্যে সেই ফুল ক্রয় করিবার প্রয়াস পান—আর হাটের মাঝে তৃষ্ণার্ত ভিখারীরাজ আনন্দ-মেলার যাত্রীদলের হৃদয়মধুর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতে থাকেন। ওদিকে লতায় লতায় ফুল ফুটিয়াই চলে······

মহানির্বাণতন্ত্র

(পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীসতীশ চন্দ্র দেব

সহস্রার পদ্ম :—আজ্ঞাচক্রের ঊর্ধ্বভাগে শঙ্খিনী বলিয়া একটী নাড়ি আছে। ঐ নাড়ীর মস্তকে যে শূন্যাকার স্থান আছে তাহাতে বিসর্গ শক্তি আছেন। ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে অধোমুখী সহস্রদল পদ্ম বিদ্যমান। ইহা পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে বিকসিত। পদ্মের কেশর রক্তবর্ণ এবং ইহার পত্র বিংশতি আবর্তে অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণময়; অর্থাৎ অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ বিংশতিবারে গণিয়া ইহার সহস্রপত্রে বিদ্যমান। কর্ণিকামধ্যে হংস, তারপর পরমশিবরূপ গুরু, তৎপর সূর্যমণ্ডল—চন্দ্রমণ্ডল, তৎপর মহাবায়ু, তৎপর ব্রহ্মরন্ধ্র। তৎপর মহাশঙ্খিনী নামক চন্দ্রমণ্ডলে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ এবং তন্মধ্যে মৃণালসূত্রের শতভাগের এক ভাগ পরিমিত সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ ও অধোমুখী চন্দ্রের ষোড়শকলা। তাহার ক্রোড়ে কেশের সহস্রভাগের এক ভাগ পরিমিত রক্তবর্ণা অধোমুখী নির্বাণ কলা। তাহার নিম্নে অব্যক্ত নাদাত্মক নিরোধিকা নামক বহ্নি। তাহার উপরে নির্বাণ কলা, ক্রোড়ে শিবশক্ত্যাত্মক পরবিন্দু। এই পরবিন্দুর কেশাগ্রের কোটিভাগের একভাগ পরিমাণ তেজো হংসরূপা নির্বাণ শক্তি। এই নির্বাণ শক্তি ও পরবিন্দু মধ্যে শূন্য ব্রহ্মপদ। অন্যান্যচক্রে যাহা যাহা আছে অব্যক্তাবস্থায় এই চক্রে তত্ত্বাবৎ আছে। সহস্রার পদ্মকে শৈবেরা শিবস্থান, শাক্তেরা শক্তিস্থান ও সাংখ্যেরা প্রকৃতি পুরুষস্থান বলেন।

কুণ্ডলিনী উত্থাপন :—উপরে যে সুষুম্না নাড়ির কথা বলা হইয়াছে এই সুষুম্না নাড়ির মধ্যে চিত্রা বা চিত্রিণী বলিয়া আর একটা নাড়ি আছে। এই নাড়িতেই পদ্মগুলি অধোমুখে আছে। চিত্রার অন্তর্গত পদ্মগুলি ভেদ করিয়া আরও সূক্ষ্ম একটা নাড়ি আছে; এই নাড়িকে ব্রহ্মনাড়ি বলে। এই নাড়ির মুখেই কুণ্ডলিনী শক্তি স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে সার্ধ ত্রিবেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া ব্রহ্মনাড়ির মুখ বন্ধ করিয়া আছেন। কুণ্ডলিনী শক্তিই পরমদেবতা বা ইষ্টদেবতা। তিনি কোটি সৌদামিনী তুল্য দীপ্তিসম্পন্না এবং বিবিধ সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তা। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারস্থিত পরম শিবের সহিত যুক্ত করাই কুণ্ডলিনী উত্থাপন এবং ইহা তান্ত্রিক সাধনার একটী প্রক্রিয়া। ইহা অতিশয় কঠিন সাধনা। ষট্‌চক্র-নিরূপণ-গ্রন্থে কুণ্ডলিনী উত্থাপনের প্রক্রিয়া এইরূপ—সাধক পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় উরুর উপরে উত্থানভাবে হস্তদ্বয় রাখিয়া সোঽহং মন্ত্রদ্বারা হৃদয়স্থিত জীবাত্মাকে মূলাধার চক্রে আনিয়া সংযুক্ত করিবেন। তৎপর হুং বীজ উচ্চারণ পূর্বক

কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করতঃ জীবাত্মার সহিত এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার কমলের অন্তর্গত তত্ত্বসমুদয়ে লয় ও স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে ভেদ করতঃ সহস্রার পদ্মস্থিত পরমশিবের সহিত মিলিত করিবেন। লয়ের নিয়ম এই—মূলাধার চক্রের ত্রিকোণে 'লং' বীজের চিন্তা করিয়া ঐ মূলাধারচক্রস্থিত দেবতা, ব্রহ্মা, ডাকিনী শক্তি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধতত্ত্ব সহ পৃথিবীকে জীবাত্মার সহিত স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশ করাইয়া স্বাধিষ্ঠানের জলে লয় করিবেন। তৎপর স্বাধিষ্ঠানের দেবতা নারায়ণ, রাকিনী শক্তি রসেন্দ্রিয় ও রসসহ বরুণবীজ 'বং' কে নাভিমূলে মণিপুর পদ্মস্থিত অগ্নিতে লয় করিবেন। তৎপর মণিপুর পদ্মস্থিত দেবতা রুদ্র, লাকিনী শক্তি ও তেজসহ অগ্নিবীজ 'রং' কে অনাহত পদ্মস্থিত বায়ুতে লয় করিবেন। তৎপর অনাহত পদ্মস্থিত দেবতা ঈশান, কাকিনী শক্তি ও স্পর্শসহ বায়ুবীজ 'যং' কে বিশুদ্ধ চক্রস্থিত আকাশে লয় করিবেন। পরে আকাশস্থ দেবতা সদাশিব, শাকিনী শক্তি ও শব্দসহ আকাশবীজ 'হং' কে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে লয় করিবেন এবং প্রকৃতিই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ ধ্যান করিবেন। পূজা ইত্যাদিতে যে ভূতশুদ্ধি করার বিধান আছে তাহা মূলতঃ সংক্ষেপে এই কুণ্ডলিনী উত্থাপনের প্রক্রিয়া বিশেষ।

তান্ত্রিক পূজায় বলি বিধেয়। তন্ত্রে বলিকে বৈধ ও অবৈধ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈধ বলি দেবতার নিকট উৎসৃষ্ট বলি; হিংসা নহে, তাই তাহা বিধেয়। কিন্তু এই বৈধ বলিকেও সাত্ত্বিক কর্মের শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই, ইহাকে রাজসী বলা হইয়াছে। যথা "বৈধ হিংসা তু রাজসী"। তন্ত্রের লক্ষ্য কেবল পারলৌকিক মঙ্গল নহে, ইহকালেরও মঙ্গল অর্থাৎ ইহকালকে পূর্ণভাবে উপভোগ করা। ইহা করিতে গেলেই শরীরকে সবল ও সতেজ করা দরকার। মাংসভক্ষণে শরীর সতেজ ও সবল হয়। সুতরাং ইহা হিংসামিশ্রিত থাকা স্বীকার করিয়া নিলেও তন্ত্রমতে ইহা ভক্ষণ করা কর্তব্য মধ্যেই দাঁড়ায়। আবার ইহাও দেখা যায় আজকাল বিজ্ঞানমতে তরুগুল্মলতারও প্রাণ আছে। সেগুলি ভক্ষণে কি হিংসার গন্ধ আসে না? আবার যাহারা গো-দুগ্ধ পান করেন তাহারা গোবৎসকে জোর করিয়া তাহার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করায় কি হিংসার কার্য করেন না? প্রাণহানি অর্থ ব্যতীত তন্ত্রে 'বলি' শব্দে পূজোপহারও বুঝায়; যেমন কাকবলি; শিবাবলি ইত্যাদি। (মহানির্বাণতন্ত্র ১৪ উল্লাস দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক সাধনার প্রাচীনত্ব

আজকাল অনেকের মুখেই শুনা যায় যে তান্ত্রিক সাধনা প্রাচীন নহে; ইহা অতি আধুনিক ও কুরুচিপূর্ণ সাধনা। তান্ত্রিক সাধনা যে কি তাহা একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই কথায় তেমন কোনও মূল্য নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ণশক্তি মহাদেবী বা মহাশক্তিই তন্ত্রের উপাস্য। এই মহাদেবী বা মহাশক্তির উল্লেখ ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে দেবী সূক্তের উল্লেখ আছে

তাহাতে আমরা দেখিতে পাই যে, মহাত্মা অম্ভৃণ ঋষির ব্রহ্মবিদুষী কন্যা বাকের হৃদয়ে মহাদেবী আবির্ভূতা হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই স্তবটী শক্তিমন্ত্র ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অথচ বেদে যে উষার স্তব আছে তাহাতেও শক্তি সাধনার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপনিষদেও আমরা দেখিতে পাই যে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কা হি সা দেবী"? ঋষি উত্তর দিতেছেন—তিনি সকল আধার, তাঁহার শক্তি ব্যতীত অন্য কোন শক্তিই নাই। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি সকলেই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্। বেদ ও উপনিষদ ত সত্যযুগের শাস্ত্র। ত্রেতাযুগেও মহর্ষি বশিষ্ঠ, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, বিদেহরাজ জনক এবং শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি, দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব এবং শুকদেব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এই পূর্ণশক্তির উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতগ্রন্থেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্ত্র ত এই পূর্ণশক্তির উপাসনার বিধিই দিতেছেন। সুতরাং তান্ত্রিকসাধনা আধুনিক কালের হ'বে কিরূপ? তবে তান্ত্রিক গ্রন্থ পরে সঙ্কলিত হইতে পারে। পূর্বেত সমূহ শাস্ত্রই মুখে মুখে ছিল; বেদও পূর্বে ঋষিদের মুখে মুখে ছিল, পরে বেদব্যাস কর্তৃক তাহা সঙ্কলিত হয়। এই সকল প্রমাণাদি হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তান্ত্রিক সাধনার মূলতত্ত্ব বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। এই জন্যই তন্ত্রকে পঞ্চমবেদ বলা হয়। তন্ত্র কুরুচিসম্পন্নও নহে। তাহা যদি হইত, তবে ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে তন্ত্রের সাধনা প্রবর্তিত থাকিত না। বৌদ্ধদের মহাযান ধর্মকে একমাত্র তান্ত্রিক ধর্মই বলা যায় এবং এই মহাযান ধর্মের গ্রন্থ যে কতস্থানে কত রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যোগী ও ব্রহ্মবাদীদেরও তন্ত্র আছে, জৈনদের মধ্যেও তন্ত্রের মন্ত্র সম্বলিত সাধনা আছে। বৈষ্ণবদের সাধনায় তন্ত্রের প্রভাব খুব বেশী ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব লইয়া গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি অনেক তন্ত্রই রচিত হইয়াছে। সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও অনেককেই তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া সর্ববাদীসম্মত মতে যিনি মহাপুরুষ ছিলেন সেই ত্রৈলিঙ্গস্বামীও তান্ত্রিকসাধক ছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতি মোহন সেন বলেন যে, "তাঁহার (স্বামীজীর) আশ্রমে এখনও তাঁহার তান্ত্রিক সাধনার পাষাণময় স্থণ্ডিল ও চক্রগুলি বিদ্যমান আছে। এবং তাঁহার তিরোধানের বহুবৎসর পরেও তাঁহার সাধনার শক্তিটি জীবিত ছিলেন।"

তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে "পঞ্চ 'ম'কারের" সাধনার কথা জানিয়াই অনেকে এই সাধনাকে কুরুচিপূর্ণ বলেন। কিন্তু পঞ্চ মকারের সাধনা কি এবং ইহার লক্ষ্য বা কি তাহা প্রণিধান না করিয়া অনেকে এইমত পোষণ করেন এবং তন্ত্রের নামেই শিহরিয়া উঠেন। এবং বলেন যে ইহাতে আমরা নিরয়গামী হইতেছি। ইহাই কি ঠিক? আমাদের আর্য ঋষিগণ কি এমনি অপদার্থ ছিলেন যে ধর্মের নামে অধঃপতনের এমন একটা নিকৃষ্ট পন্থা তাঁহারা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? এমন ধারণা মনে করাও ভুল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ইহা সাধকের প্রাণে আত্মতত্ত্ব উদ্ভাসিত করার একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। মহানির্বাণ তন্ত্রে শিব বলিয়াছেন—

"সুরা দ্রবময়ী তারা জীবনিস্তারকারিণী", কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—"তৃপ্ত্যর্থং সর্বদেবানাং ব্রহ্মজ্ঞানং বিধায় চ। সেবতে মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥" অর্থাৎ দেবতার তৃপ্তির জন্য এবং নিজের ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরণের জন্য পঞ্চতন্ত্রের সাধনা করিবে, কিন্তু তাহা না করিয়া যে নিজের ভোগের জন্য ইহা ব্যবহার করে সে নিম্নগামী হয়। কুলার্ণবতন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—"যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।" পঞ্চতত্ত্বের অপব্যবহার যে হয় না এমন কথা বলা যায় না এবং এই অপব্যবহার করাই নরকের কারণ। কিন্তু তাহা ধরিয়া ইহার বিচার করা চলে না। সকল ধর্মতেই ব্যভিচার দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই ধর্মই দূষনীয় হইবে? প্রবৃত্তির পথে চলিয়া কি ভাবে নিবৃত্তির সন্ধান মিলে তাহাই প্রদর্শন করা তন্ত্রের লক্ষ্য এবং পঞ্চমকারের সাধনা তাহারই উপায় মাত্র। কথাটা বিস্তার করিয়া বলা দরকার।

সাধনার দুইটী পথ—প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। ত্রিগুনাত্মিকা প্রকৃতির বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী যে দুইটি গতি সেই দুই গতিকে লক্ষ্য করিয়াই সাধনার এই দুই পথ নির্দেশিত হইয়াছে। প্রকৃতির বহির্মুখী গতি স্থূলাভিমুখী, ইহাই তাঁহার অনুলোম গতি এবং ইহা হইতেই সৃষ্টি। তাঁহার অন্তর্মুখী গতি সূক্ষ্মাভিমুখী, ইহাই তাঁহার বিলোম গতি। বিষয়ের উপভোগ প্রবৃত্তিমার্গের কাজ। চতুর্বর্গের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, ও কাম—এই ত্রিবর্গের সাধনা প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা। এই সাধনা দ্বারা যে সুখলাভ হয় তাহা অনিত্য, ইহাতে নিত্য শাশ্বত সুখ লাভ হয় না। নিত্য সুখের অস্বাদ পাওয়া যায় তখনই যখন নিবৃত্তিমার্গে পদার্পণ আরম্ভ হয়। কিন্তু সাধনার প্রথম হইতে নিবৃত্তির পথে চলা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সাধনার ফলে যাঁহারা সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারাই পারেন, অন্যে নহে। সেই জন্যই প্রবৃত্তিমার্গের সাধনা দ্বারা পথ সুগম করিয়া পরে নিবৃত্তির পথে সঞ্চরণ করার বিধি তন্ত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং ইহাই স্বাভাবিক ও সুগম পথ। জাগতিক সমূহ পদার্থই প্রকৃতির বহির্মুখী গতির পরিণতি। "একোহহম বহু স্যাম্" এই যে ভগবদিচ্ছা বা প্রবৃত্তি ইহা হইতেই সৃষ্টি। সৃষ্ট মানুষ সুতরাং প্রবৃত্তি ছাড়িয়া পারে কি? ইহাই যে তাহার দেহের প্রতি অনুপরমাণুর সহিত গাঁথা। তন্ত্র বলেন সত্যাদিযুগে যে সব কর্মানুষ্ঠানে অভীষ্ট লাভ হইত, কলিকালে সেই সব কর্মানুষ্ঠানে তদনুরূপ ফল লাভ হইতে পারে না। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কলির মানবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ব্যাপার, সুতরাং এই যুগের মানবের পক্ষে এইগুলির সাহচর্যে থাকিয়া ক্রমে তৎপ্রতি আসক্তিশূন্য হইতে হইবে। তন্ত্র যদিও পারলৌকিক মুক্তিই চাহিয়াছেন, তৎসঙ্গে ধনজনও চাহিয়াছেন। মানুষ মানুষের মত থাকিয়া কিভাবে ধনাদি উপার্জন করিয়া নিজকে সংসারে সমৃদ্ধ করিতে পারে তাহাও দেখাইয়াছেন। ভুক্তিমুক্তি দুইই তন্ত্রের লক্ষ্য, কিন্তু ভোগ যদৃচ্ছামতে নহে; ভোগ এমনিভাবে হওয়া চাই যেন তাহা যোগের অন্তরায় না হইয়া তার সহায়ই হইতে পারে। এইজন্য তান্ত্রিক সাধকের পক্ষে কতকগুলি নিয়মের অধীন থাকিয়া ভোগে রত হইতে হয়। যেমন পঞ্চতত্ত্বের সংস্কার না করিয়া

সেগুলির ব্যবহার তন্ত্রে নিষিদ্ধ (মহানির্বাণ তন্ত্র পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। অধিকন্তু তন্ত্রে যে বিভিন্ন আচার সম্পন্ন সাধকের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে পশ্বাচারীর পক্ষে বৈদিক নিয়ম পালন করারই বিধি রহিয়াছে। বৈদিক নিয়মে মদ্য একেবারে নিষিদ্ধ এবং পরনারীর সহিত মৈথুনও নিষিদ্ধ; কেবল ক্রিয়া নিষ্পত্তি নিষিদ্ধ নহে, অষ্টাঙ্গ মৈথুনের সব ক্রিয়াই নিষিদ্ধ। তন্ত্রমতে বামাচারী ভিন্ন অন্য কোন তান্ত্রিকই পঞ্চতত্ত্ব নিয়া সাধনার অধিকারী নহেন। পশ্বাচারী প্রভৃতি নিম্ন সাধকের পক্ষে এইজন্য কুলচূড়ামণিতন্ত্রে মদ্যের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের জন্য দুগ্ধ, ক্ষত্রিয়ের জন্য ঘৃত, বৈশ্যের জন্য মধু এবং শূদ্রের জন্য তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সাধারণ মদ্য, মাংসের পরিবর্তে আদা, লবণ ও মাষকলাই প্রভৃতি এবং মৎস্যের পরিবর্তে মশুর ও লালমুলা ইত্যাদি ব্যবহারের বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। মহানির্বাণতন্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, আদ্য তত্ত্বের পরিবর্তে দুগ্ধ, শর্করা ও মধু এবং শেষ তত্ত্বের অনুকল্পরূপে দেবীর পাদপদ্ম চিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপ করাই কর্তব্য।

তন্ত্র আরও বলেন যে, স্থূলসাধনায় ক্রমে যখন সাত্ত্বিকগুণের প্রাধান্য জন্মে তখন দেহে আপনি কতকগুলি যৌগিক ক্রিয়াসম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়। এই যৌগিক ক্রিয়াগুলি পঞ্চতত্ত্বের নামান্তররূপে গ্রহণ করা হয়। যেমন মদ্য = সহস্রার চ্যুত সোমধারা; মাংস = বাক্য-রোধ বা মৌনাবলম্বন; মৎস্য = শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ, মুদ্রা = অষ্টপাশকে আয়ত্ত করা; মৈথুন = ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার বিন্দুর সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির মিলন করা। আগমসারতন্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ এই সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মদ্য—সোমধারা ক্ষরেৎ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিয়া যে আনন্দ বা মত্ততা জন্মে তাহাই মদ্যপান।

মাংস—মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥

অর্থাৎ মা = রসনা আর অংশ = রসনার অংশ বা বাক্য। যে ব্যক্তি সর্বদা ইহা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ বাক্যসংযমী হন তাহাকে মাংসসাধক বলা হয়।

মৎস্য—গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা (ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়িদ্বয়) মধ্যে যে দুইটী মৎস্য (শ্বাসপ্রশ্বাস) বিচরণ করিতেছে, এই দুইটী মৎস্য যে ভক্ষণ করে অর্থাৎ যিনি শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে পারেন তিনি মৎস্যসাধক।

মুদ্রা—সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকামুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥

সূর্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

অর্থাৎ সহস্রদল পদ্ম মধ্যে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মা অবস্থিতি করেন। এই আত্মা কোটি সূর্য সদৃশ তেজশীল আবার কোটিচন্দ্র তুল্য স্নিগ্ধ; ইহা অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী শক্তিসম্পন্না। যাহার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তিনিই মুদ্রাসাধক। ইহার অন্য প্রকারেরও ব্যাখ্যাও আছে। যথা—

আশা তৃষ্ণা জুগুপ্সা ভয়বিশদ ঘৃণামান লজ্জাভিষঙ্গাঃ।
ব্রহ্মাগ্ন্যাবিষ্ট মুদ্রাঃ পরমসুকৃতি ন জপাচ্যমানঃ সমন্তাৎ॥

অর্থাৎ আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও ক্রোধ এই অষ্ট মুদ্রাকে আয়ত্ত করা বা ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি দ্বারা এই মুদ্রাগুলিকে সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষন করাকে মুদ্রাসাধন কহে।

মৈথুন—সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডলাৎ মিলনাৎ শিবে।
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনঃ পরিকীর্তিতম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রার বিন্দুর সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন বা জ্ঞানের সহিত ভক্তির মিলনের নাম মৈথুন।

পঞ্চতত্ত্বের আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে কিন্তু এই সবগুলিই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা মাত্র। এই সব ব্যাখ্যামূলে ইহা মনে করিতে হইবে না যে, মদ্য, মাংস প্রভৃতি বাস্তব পদার্থ দিয়া সাধনার বিধি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

যজ্ঞ—সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করাকেই যজ্ঞ* বলা হয়। এরূপ আহুতিকে হোমও বলা হয়। যদিও হোম যজ্ঞের প্রকারভেদমাত্র। যজ্ঞ পাঁচপ্রকার; যথা:—ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ তর্পণ, দৈবযজ্ঞ হোম, ভূতযজ্ঞ বলি, এবং নৃযজ্ঞ অতিথি সৎকার। এই পঞ্চ যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে পঞ্চমহাযজ্ঞ অবশ্য করণীয়। এই পঞ্চমহাযজ্ঞ ব্যতীত, বিবাহ, উপনয়ন ও ব্রতাদিতে আরও নানারকমের যজ্ঞ বা হোম আছে, যেমন প্রায়শ্চিত্ত হোম, ধারা হোম, ইত্যাদি। মহা নির্বাণ তন্ত্রেই অনেক প্রকার হোমের কথা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, যেমন ব্রহ্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি, এইগুলির অধিকাংশই যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ। (গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪—২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

সাধকের ভাব বা মনোবৃত্তি অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে যজ্ঞকে বিভাগ করা হইয়াছে। কামনারহিত অবস্থায় বিধি-নির্দিষ্ট উপায়ে যে যজ্ঞ করা

---

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

হয় তাহা সাত্ত্বিক ; অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিয়া যে যজ্ঞ করা হয় তাহা রাজসিক ; এবং বিধিহীন, মন্ত্রহীন শ্রদ্ধাবিরহিত যে যজ্ঞ তাহা তামসিক।

ব্রত :—কোন অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পুণ্যজনক উপবাসাদি কর্মকে ব্রত কহে। ব্রত নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। ইহা অনেকপ্রকার—যেমন জন্মাষ্টমীব্রত, শিবরাত্রি-ব্রত, দুর্বাষ্টমীব্রত, বীরাষ্টমীব্রত, তালনবমীব্রত, সত্যনারায়ণব্রত, সাবিত্রীব্রত (কেবল স্ত্রীলোকের করণীয়) কার্ত্তিকেয়ব্রত ইত্যাদি। দুর্গাপূজাও ব্রত বিশেষ; ইহাকে মহাব্রত বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের যদিও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে তবু সর্বপ্রকার ব্রতেই সংযম, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, উপবাস ইত্যাদি কয়েকটী সার্বজনীন কার্য করিতে হয়।

আশ্রম সাধারণতঃ চারিটী—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। বীর্য ধারণ করিয়া থাকাই ব্রহ্মচর্য (বীর্যধারণম্ ব্রহ্মচর্যম্)। সত্যাদি যুগে কিরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করা হইত মানবধর্ম সংহিতায় তাহার বর্ণনা আছে। ব্রহ্মচর্য পালন করার পর বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার নিয়ম ছিল। শুধু কামরিপু চরিতার্থ করাই বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল না। বিবাহিত জীবন কিভাবে যাপন করিতে হইত এবং গৃহস্থের কর্তব্য কি কি তাহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থাশ্রম। এই আশ্রমীর পক্ষে শুধু স্বয়ংপক্কফলমূলাদি আহার করিয়া থাকিতে হইত। চার বৎসর কিম্বা ৮ বৎসর ন্যূনকল্পে অন্ততঃ চারি বৎসর বনে বনে বিচরণ করিয়া তপশ্চর্যা করিতে হইত। সর্বশেষ সন্ন্যাসাশ্রম বা অচরন্তাশ্রম। এই সময় আশ্রমীকে দৈনিক ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা উদর পূরণ করতঃ ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মতে এই চারি আশ্রম ব্রাহ্মণের পক্ষেই ব্যবস্থেয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম তিন আশ্রম, বৈশ্যের পক্ষে প্রথম দুই আশ্রম এবং শূদ্রের পক্ষে শুধু গৃহস্থাশ্রম ব্যবস্থেয়। তন্ত্রমতে কলিযুগে মাত্র দুইটী আশ্রমই বিহিত—গৃহস্থাশ্রম ও অবধূতাশ্রম। অবধূত আবার দুই প্রকার—শৈবাবধূত ও ব্রহ্মাবধূত। এই উভয়বিধ অবধূতেরই উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণী বিভাগ আছে। অধম শৈবাবধূত গৃহস্থ সন্ন্যাসী, মধ্যম শৈবাবধূত পরিব্রাজক বটেন, কিন্তু তাহাকে পূজা জপ ইত্যাদি করিতে হয়। শক্তির সহিত সাধনা করা তাহার পক্ষে বিহিত। উত্তম অবধূত কৌপীনধারী হইয়া যোগ সাধন করিবেন। অধম ব্রহ্মাবধূত উত্তমশ্রেণীর শৈবাবধূতের তুল্য কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তি ব্যতীত শৈবশক্তি গ্রহণের অধিকারী নহেন। মধ্যম শ্রেণীর ব্রহ্মাবধূতও ঐ শ্রেণীর শৈবাবধূতের তুল্য, কিন্তু তিনি শক্তি-সাধনার অধিকারী নহেন, যদিও কখন কখন গুরুর অধীনে থাকিয়া শক্তিসহ যোগ সাধন করিতে পারেন। উত্তম ব্রহ্মাবধূতও সেই শ্রেণীর শৈবাবধূতের তুল্য, কিন্তু তিনি কোনও অবস্থাতেই স্ত্রীলোক বা ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে পারেন না।

বর্ণও চারিটী—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মহানির্বাণতন্ত্রে সাধারণ বলিয়া পঞ্চম বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সাধারণ কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। মিশ্রবর্ণই এই সাধারণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত বলিয়া মনে হয়।

তন্ত্রে জাতিভেদ যদিও একেবারে বর্জিত হয় নাই, তবুও সংহিতা অপেক্ষা তন্ত্র অনেকটা উদারভাবাপন্ন। মহাদেবীর প্রশ্নে মহাদেব বলিতেছেন :—

"জাতিভেদো ন কর্তব্য প্রসাদে পরমাত্মনঃ।
যোঽশুদ্ধবুদ্ধিং কুরুতে স মহাপাতকী ভবেৎ॥"

(৩য় উল্লাস, ৯২ শ্লোক)

আবার ষষ্ঠ উল্লাসের ১৯৮ শ্লোকে বলিতেছেন—

"যথা ব্রহ্মার্পিতেঽন্নাদৌ স্পৃষ্ট দোষো ন বিদ্যতে
তথা তব প্রসাদেঽপি জাতিভেদং বিবর্জয়েৎ।"

চক্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

নাত্র জাতিবিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদিবিবেচনম্।

(৮ম উল্লাস, ১৮০ শ্লোক)

এই স্থলে দেখিবার বিষয় যে বেদ ও স্মৃতিমতে চণ্ডালাদি হীনজাতি সর্বদাই অস্পৃশ্য ; ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে অবগাহন, স্নান ও অঘমর্ষণাদি করিতে হয়। কিন্তু তন্ত্র বলেন যে প্রসাদাদি ভক্ষণকালে এই জাতিভেদ মানিতে নাই। তন্ত্র আরও বলেন যে কুলজ্ঞানী চণ্ডাল ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ (শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে)। তন্ত্রমতে আবার সকলেই যখন জগন্মাতার সন্তান তখন তাঁহার উপাসনার সময় জাতিভেদ কল্পনাই করা যায় না। এই কারণেই কি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎসবাদিতে জাতিভেদাচার পালন করা হয় না ?

মহানির্বাণতন্ত্র :—এই তন্ত্ররথাক্রান্ত সম্প্রদায়ের একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি পারমার্থিক ক্রিয়া ব্যতীত রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক ধর্মাদিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথমার্ধ ও উত্তরার্ধ এই দুইভাগে মহানির্বাণতন্ত্র বিভক্ত। অনূদিত গ্রন্থখানা ইহার প্রথমার্ধ ও উত্তরার্ধে পাতাল ভূতল ও জ্যোতিষচক্রের কথা আছে, উত্তরার্ধ আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আর্থার এভেলন নাম দিয়া স্যারজন উড্রফ্ (Sir John Woodroffe) সাহেব যে মহানির্বাণ তন্ত্রের প্রথমার্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে কোনও এক নেপালী পণ্ডিতের নিকট তিনি উত্তরার্ধ দেখিয়াছেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রথমার্ধের দ্বিগুণেরও অধিক। তিনি ইহার একখানা নকল আনিতে চাহিলে উক্ত পণ্ডিত তাঁহাকে বলেন যে ইহাতে ষট্‌কর্মের অনেক মন্ত্র আছে। এইগুলি প্রকাশিত হইলে দুষ্ট লোক তদ্বারা অন্যান্য লোকের অনিষ্ট করিতে পারে বলিয়া ষট্‌কর্মের সমস্ত মন্ত্র তিনি প্রকাশ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে নকল আনিতে দিবেন। মন্ত্রের প্রয়োগজ্ঞান না থাকিলে শুধু মন্ত্র ছাপিলে তাহাতে কোনও অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তিনি পণ্ডিতকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু পণ্ডিত কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় এবং মন্ত্র ছাড়া বাকি অংশ ছাপিলে বহিখানা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া তিনি আর নকল আনেন নাই।

মহানির্বাণতন্ত্রের প্রথমার্ধ ষোলটী উল্লাসে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম উল্লাসে ৭৩টী

শ্লোক। কলির জীব দুষ্ক্রিয়ান্বিত, ক্রূর ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করিতে সমর্থ হইবে না; এই অবস্থায় কলির জীবের উপায় কি হবে এবং কলির লোক কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন হইতে পারিবে ইত্যাদি বিষয়ে ভগবতী পার্বতী মহাশিবকে এই উল্লাসে প্রশ্ন করেন।

দ্বিতীয় উল্লাসে সর্বশুদ্ধ ৫৪টী শ্লোক। ভগবতীর পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব এই উল্লাসে কলির মানবের পক্ষে তন্ত্রই নিস্তারের একমাত্র উপায়; বেদপুরাণাদি নহে— এই বলিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং তন্ত্রমধ্যে মহানির্বাণতন্ত্রের সমধিক প্রশংসা করেন।

তৃতীয় উল্লাসে সর্বসমেত ১৫৪টী শ্লোক। ব্রহ্মের সাধন ও মন্ত্রাদি কিরূপ, এবং ধ্যান ও বিধি কিরূপ, ভগবতী জানিতে চাহিলে সদাশিব এই উল্লাসে ব্রহ্মের লক্ষণ, মন্ত্রোদ্ধার, প্রাণায়াম, ধ্যান, মানসপূজা এবং স্তব কবচাদির বর্ণনা করেন।

চতুর্থ উল্লাসে ১০৭টী শ্লোক। এই উল্লাসে শক্তিবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে সদাশিব পরা প্রকৃতির স্বরূপ, আদ্যাসাধন, কলিতে বীরভাবে সাধনার সফলতা, কৌলের প্রশংসা এবং কুলাচারের আবশ্যকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বর্ণনা করেন।

পঞ্চম উল্লাসে সর্বশুদ্ধ ২০৬টী শ্লোক। ইহাতে আদ্যার মন্ত্রসাধন, আদ্যার ধ্যান, মন্ত্রের প্রকারভেদ ও মন্ত্রোদ্ধার ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম, গুরুর ধ্যান, বিজয়াশোধন, বিজয়াদ্বারা তর্পণ, বিভিন্ন প্রকারের ন্যাস, ভূতশুদ্ধি, পূজা ও যন্ত্রনির্মাণপ্রণালী, এবং সুরাশোধন, মাংসশোধন ও মুদ্রাশোধন প্রভৃতি বহু বিষয়ের বর্ণনা আছে।

ষষ্ঠ উল্লাসে ২০০টী শ্লোক। এই উল্লাসে পঞ্চশুদ্ধাদি কথন, শক্তিশোধন ও চক্রানুষ্ঠান, আদ্যাকালিকার বিভিন্ন ধ্যান, আবাহন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদির পূজা এবং শিবাবলি ইত্যাদি সম্বন্ধে সদাশিব বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

সপ্তম উল্লাসে ১১১টী শ্লোক। এই উল্লাসে ভগবতী স্তবকবচাদি বর্ণনা করার প্রশ্ন করিলে সদাশিব স্তবমাহাত্ম্য, স্তবের ঋষ্যাদি মন্ত্র, আদ্যাশক্তির শতনাম স্তোত্র, সংক্ষেপে পূজা ও সংক্ষেপে পুরশ্চরণাদি এবং পঞ্চতত্ত্বের লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণনা করেন।

অষ্টম উল্লাসে ২৮৯টী শ্লোক। এই উল্লাসে বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে ভগবতীর প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর বর্ণিত হইয়াছে। কলিতে পঞ্চবর্ণ ও দ্বিবিধ আশ্রম নির্দেশিত হইয়াছে। এই উল্লাসে গৃহীর কর্তব্য কর্ম, পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি গৃহীর ব্যবহার প্রণালী, নারীর ধর্ম ও কর্তব্য, ব্রাহ্মণাদি পঞ্চবর্ণের কর্তব্য, রাজার কর্তব্য, সন্ন্যাসধর্ম, সন্ন্যাস গ্রহণের কালনির্ণয় ও বিধিনিষেধ বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে, এই উল্লাসে সদাশিব গৃহীর সুরাপান ও পরশক্তিসঙ্গম নিষেধ করিয়াছেন।

নবম উল্লাসে ২৮৩টী শ্লোক। এই উল্লাসে সদাশিব দশবিধ সংস্কারের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই উল্লাসে তিনি ব্রাহ্মীভার্যার অনুমতি ব্যতিত পুনর্বার ব্রাহ্ম্য বিবাহের

নিষেধ দিয়াছেন এবং শৈব বিবাহের রীতি ও ভেদ এবং অনুলোমজ ও বিলোমজ শৈব সন্তানের শক্তি নির্ণয় ও শৈববিবাহের হেতুবাদ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম উল্লাসে ২১২টী শ্লোক। এই উল্লাসে আভ্যুদায়িক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, পার্বণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সর্ববিধ শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ, পূর্ণাভিষেক ও পূর্ণাভিষিক্ত কৌলের মাহাত্ম্যবর্ণন ও কৌলের লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন।

একাদশ উল্লাসে ১৭০টী শ্লোক। এই উল্লাসে ভগবতী ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমধর্ম ও সংস্কার কি কি জানিতে চাহিলে সদাশিব অনেকগুলি নীতিতত্ত্বের কথা—যেমন নরহত্যা, কর্ত্তব্যপালনে অসম্মতি, বঞ্চকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদান, গো-বধ, ব্যভিচার ও পরস্ত্রীকে কামভাবে দর্শন, ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলিয়া সেইগুলির নিন্দা করিয়াছেন।

দ্বাদশ উল্লাসে ১২৯টী শ্লোক। এই উল্লাসে সদাশিব সনাতন ব্যবহারিক ধর্ম্মের কথা, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ ও তাহাদের পরস্পর ব্যবহার, ধনাধিকার ব্যবস্থা, স্ত্রী-ধন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ত্রয়োদশ উল্লাসে ৩১০টী শ্লোক। এই উল্লাসে সদাশিব মহাকালীর রূপ নিরূপণ, ভজন, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি; দেবীপ্রতিষ্ঠার নিয়ম, জলাশয় প্রতিষ্ঠা, বাস্তু প্রতিষ্ঠা, ধ্যান, পুজা, বিবিধ বীজমন্ত্র ও বিবিধ সংস্কারিক কাণ্ড বিস্তারিতভাবে বলিয়াছেন।

চতুর্দশ উল্লাসে ২১১টী শ্লোক। এই উল্লাসে মহাদেবী শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা ও ফলবিধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সদাশিব শিবলিঙ্গ কি এবং তাঁহার পূজাধ্যান সম্বন্ধে এবং মুক্তপুরুষ কে, মুক্তির উপায় কি, জ্ঞান-মুক্তির সম্বন্ধ কি এবং চতুর্বিধ অবধূত লক্ষণ ইত্যাদি বর্ণনা করেন।

মহানির্বাণ তন্ত্রে কেবল যে সাধনার প্রণালী বিবৃত করা হইয়াছে এমন নহে। উপরের সূচি হইতে দেখা যায় যে মহানির্বাণতন্ত্র গৃহস্থের কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহানির্বাণতন্ত্রকে গার্হস্থ্যধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে এবং এইজন্যই এই তন্ত্রের এত প্রাধান্য।

মনসামঙ্গলের কবি-সমস্যা

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক **শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,** এম্. এ., তত্ত্বরত্নাকর

তিন খানি মুদ্রিত গ্রন্থে যে ভণিতা-বিভ্রাট রহিয়াছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শিত হইল। এস্থলে খাঁটি কবি নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই করি নাই। শুধু কবিসম্বন্ধে সন্দেহের উল্লেখ করিলাম মাত্র। সন্দেহ নিরসনের কোন প্রয়াস ইহাতে নাই। উপযুক্ত ব্যক্তি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কবিনির্ণয়ে সফলকাম হইলে সাহিত্যসেবীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইতে পারিবেন।

নিম্নে মুদ্রিত "ক ২ বিশ্বেশ্বর, খ ২ যদুবর, গ ২ যদুবর"—প্রভৃতি পংক্তির দ্বারা এইরূপ বুঝান হইয়াছে :—ক গ্রন্থের ২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় যে পদটী আরম্ভ হইয়াছে তাহার ভণিতায় বিশ্বেশ্বরের নাম আছে। উক্ত পদটীই খ গ্রন্থের ২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইহার ভণিতায় যদুবরের নাম পাইতেছি। এবং উক্ত পদটীই গ গ্রন্থের ৪ সংখ্যক পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে, ইহার ভণিতায় যদুবরের নাম আছে। যে স্থলে শুধু ক ও খ গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেই পদ গ গ্রন্থে নাই বুঝিতে হইবে।

নিম্নে ক ও খ গ্রন্থের মোট ২২৫টী পদের ভণিতায় যে পাঠান্তর দৃষ্ট হয় তাহাই প্রদর্শিত হইল। ক ও খ গ্রন্থের মোট ১০৫টী পদের সহিত গ গ্রন্থের মিল আছে। ঐ ১০৫টী পদে গ গ্রন্থে যে ভণিতা দেওয়া আছে তাহাও প্রদত্ত হইল।

ক	২	বিশ্বেশ্বর	খ	২	যদুবর	গ	৪	যদুবর
ক	২	অকিঞ্চনদাস	খ	২	দ্বিজ রঘুনাথ	গ	৪	দ্বিজ রঘুনাথ
ক	৬	বিপ্র জগন্নাথ	খ	৭	বৈদ্য জগন্নাথ	গ	৮	বৈদ্য জগন্নাথ
ক	১৫	নারায়ণ	খ	১৩	সীতাপতি	গ	১৩	নারায়ণ দেব
ক	১৬	নারায়ণদেব	খ	১৪	,,			
ক	২০	সীতাপতিদেব	খ	১৮	কবি সীতাদেব			
ক	৩৩	রামকান্ত দাস	খ	৩০	নারায়ণদেব			
ক	৩৫	অকিঞ্চন দাস	খ	৩২	সীতাপতি দেব			
ক	৩৬	নারায়ণদেব	খ	৩৩	রাধাকৃষ্ণ দেব			
ক	৩৮	জগন্নাথ বিপ্র	খ	৩৫	,,			
ক	৩৯	বংশীদাস দ্বিজ	খ	৩৬	,,			
ক	৪৪	অকিঞ্চনদাস	খ	৪০	,,			

ক	৪৮	অকিঞ্চনদাস	খ	৪৪	নারায়ণ দেব			
ক	৫৫	নারায়ণ দেব	খ	৫০	হরিদাস দেব	গ	৫৫	হরিদাস দেব
ক	৫৭	রাধাকৃষ্ণ দেব	খ	৫২	,,	গ	৫৬	,
ক	৫৮	,,	খ	৫৩	,,	গ	৫৬	,,
ক	৬০	,,	খ	৫৫	,,			
ক	৬১	,,	খ	৫৬	নারায়ণ দেব			
ক	৬৩	,,	খ	৫৮	কবি নারায়ণ			
ক	৬৪	,,	খ	৫৮	নারায়ণ দেব			
ক	৭১	গোপীচন্দ্র দেব	খ	৬৫	,,			
ক	৮৩	রাধাকৃষ্ণ দেব	খ	৭৬	,,			
ক	৮৪	,,	খ	৭৬	কেতকা দাস			
ক	৮৯	সীতাপতিদেব	খ	৮১	,,			
ক	৯২	,,	খ	৮৪	,,			
ক	৯৩	,,	খ	৮৫	,,			
ক	৯৪	রমাকান্তদেব	খ	৮৫	নারায়ণ দেব			
ক	৯৫	,,	খ	৮৬	,,			
ক	৯৬	,,	খ	৮৭	,,	গ	৭১	নারায়ণ দেব
ক	৯৬	,,	খ	৮৮	,,	গ	৭১	,,
ক	৯৯	হরিদাস ভট্ট	খ	৯০	,,	গ	৭৩	,,
ক	১০২	,,	খ	৯৩	,,	গ	৭৫	,,
ক	১০২	হরিদাস ভট্ট	খ	৯৩	নারায়ণ দেব	গ	৭৫	নারায়ণ দেব
ক	১০৪	হরিদাস ভট্ট	খ	৯৫	,, ,,	গ	৭৭	,, ,,
ক	১০৬	গোপীচন্দ্র দেব	খ	৯৬	,, ,,			
ক	১১১	গোপীচন্দ্র দেব	খ	১০১	,, ,,	গ	৮১	,, ,,
ক	১৩০	নারায়ণ দেব	খ	১১৯	কমল নয়ন	গ	৯৩	কমল নয়ন
ক	১৩২	নারায়ণ দেব	খ	১২০	,, ,,	গ	৯৪	,, ,,
ক	১৪০	বিপ্রজানকী নাথ	খ	১২৮	শ্রীগোবিন্দ দাস			
ক	১৫৪	নারায়ণ দেব	খ	১৪১	কমল নয়ন	গ	১০৯	,, ,,
ক	১৭৯	যদুনাথ দেব	খ	১৬৪	নারায়ণ দেব	গ	১২৫	নারায়ণ দেব
ক	১৮১	যদুনাথ দেব	খ	১৬৫	কবি রামনিধি দেব	গ	১২৬	কবি রামনিধি দেব
ক	১৮২	,, ,,	খ	১৬৬	কবি রামনিধি দেব	গ	১২৬	,, ,, ,,
ক	১৮৩	,, ,,	খ	১৬৭	,, ,, ,,	গ	১২৭	,, ,,

ক		খ		গ	
ক ১৮৪	যদুনাথ দেব	খ ১৬৮	নারায়ণ দেব	গ ১২৮	নারায়ণ দেব
ক ১৮৬	যদুনাথ	খ ১৬৯	কবি রামনিধি	গ ১২৯	কবি রামনিধি দেব
ক ১৮৬	,, ,,	খ ১৭০	,, ,,	গ ১২৯	,, ,, ,,
ক ১৮৮	যদুনাথ দেব	খ ১৭২	নারায়ণ দেব		
ক ১৮৯	,, ,,	খ ১৭২	,, ,,		
ক ১৯০	যদুনাথ	খ ১৭৩	,, ,,		
ক ১৯১	যদুনাথ দেব	খ ১৭৪	,, ,,		
ক ১৯৪	বলরাম দেব	খ ১৭৭	,, ,,		
ক ১৯৫	বলরাম দেব	খ ১৭৮	,, ,,		
ক ১৯৮	বলরাম পণ্ডিত	খ ১৮০	যদুনাথ পণ্ডিত	গ ১৪১	যদুনাথ পণ্ডিত
ক ২১১	পণ্ডিত জানকীনাথ	খ ১৯২	গোবিন্দ দাস	গ ১৪৯	গোবিন্দ দাস
ক ২১৮	নারায়ণ দেব	খ ১৯৯	বিজয় গুপ্ত	গ ১৫৩	নারায়ণ দেব
ক ২১৮	,, ,,	খ ১৯৯	,, ,,	গ ১৫৩	বিজয় গুপ্ত
ক ২২৫	,, ,,	খ ২০৫	বিজয় কবি	গ ১৫৭	বিজয় কবি
ক ২২৬	হরিদাস দ্বিজ	খ ২০৬	গুপ্তকবি	গ ১৫৮	গুপ্তকবি
ক ২২৭	,, ,,	খ ২০৬	গুপ্তকবি		
ক ২২৮	,, ,,	খ ২০৮	বিজয় কবি	গ ১৫৯	বিজয় গুপ্ত
ক ২২৯	,, ,,	খ ২০৯	নারায়ণ দেব	গ ১৬০	নারায়ণ দেব
ক ২৩১	হরিদাস দ্বিজ	খ ২১০	কবি নারায়ণ	গ ১৬১	কবি নারায়ণ
ক ২৩২	কমল নয়ন	খ ২১২	দেব নারায়ণ	গ ১৬২	দেব নারায়ণ
ক ২৩৪	,,	খ ২১৩	,,	গ ১৬৪	,,
ক ২৩৬	দ্বিজ হরিদাস দেব	খ ২১৪	কবি নারায়ণ দেব	গ ১৬৪	কবি নারায়ণ দেব
ক ২৩৮	হরিদাস দ্বিজ	খ ২১৬	নারায়ণ দেব	গ ১৬৬	দেব নারায়ণ
ক ২৩৯	,,	খ ২১৮	,,		
ক ২৪০	,,	খ ২১৯	,,		
ক ২৪৩	দ্বিজ হরিদাস দেব	খ ২২১	,,		
ক ২৪৪	হরিদাস দ্বিজ	খ ২২২	ভট্ট অনুপচান্দ্র		
ক ২৪৫	,,	খ ২২৩	নারায়ণ দেব, অনুপ চন্দ্র ভট্ট		
ক ২৪৫	,,	খ ২২৪	ভট্ট কবি		
ক ২৪৭	,,	খ ২২৫	,,		
ক ২৪৭	,,	খ ২২৫	ভট্ট অনুপ		
ক ২৫২	,,	খ ২২৯	নারায়ণ দেব	গ ১৭৩	কবি নারায়ণ দেব

ক		খ		গ	
ক ২৫৩	হরিদাস দ্বিজ	খ ২৩০	নারায়ণ দেব	গ ১৭৩	কবি নারায়ণ দেব
ক ২৫৪	,,	খ ২৩১	,,	গ ১৭৪	,,
ক ২৫৭	,,	খ ২৩৪	,,		
ক ২৫৭	,,	খ ২৩৪	,,		
ক ২৬৩	,,	খ ২৪০	,,		
ক ২৬৪	রঘুনাথ দ্বিজ	খ ২৪১	,,		
ক ২৬৬	হরিদাস দ্বিজ	খ ২৪৩	,,		
ক ২৭০	,,	খ ২৪৭	,,		
ক ২৭১	হরিদাস দেব দ্বিজ	খ ২৪৮	,,		
ক ২৭৩	কবি রুহিদাস দ্বিজ	খ ২৪৮	,,		
ক ২৭৫	,,	খ ২৫০	,,		
ক ২৭৫	,,	খ ২৫১	,,		
ক ২৮২	,,	খ ২৫১	রমাকান্ত দেব		
ক ২৮২	নারায়ণ দেব	খ ২৫৮	,,		
ক ২৮৩	কবি রুহিদাস দ্বিজ	খ ২৫৯	,,		
ক ২৮৪	রুহিদাস দ্বিজ	খ ২৫৯	রমাকান্ত দেব	গ ১৭৯	রমাকান্ত দেব
ক ২৮৫	কবি রুহিদাস দ্বিজ	খ ২৬০	নারায়ণ দেব	গ ১৭৯	নারায়ণ দেব
ক ২৮৭	,, ,, ,,	খ ২৬২	,,	গ ১৮০	,,
ক ২৮৭	,, ,, ,,	খ ২৬২	,,	গ ১৮১	,,
ক ২৮৯	,, ,,	খ ২৬৪	,,	গ ১৮২	,,
ক ২৯৪	,, ,,	খ ২৬৮	,,	গ ১৮৫	,,
ক ২৯৫	,, ,, ,,	খ ২৬৯	,,		
ক ২৯৫	,, ,,	খ ২৭০	,,		
ক ২৯৮	দ্বিজ রুহিদাস	খ ২৭২	দ্বিজবংশী দাস	গ ১৮৬	দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩০০	,,	খ ২৭৪	,,	গ ১৮৭	,,
ক ৩০৪	,,	খ ২৭৭	,,	গ ১৮৯	,,
ক ৩০৪	,,	খ ২৭৮	,,	গ ১৮৯	,,

[ক ৩১৩ অংশ বিশেষের সহিত খ ২৮৬ অংশ বিশেষের মিল আছে। কিন্তু ক ৩৩২ পৃষ্ঠায় অতিরিক্ত পাঠ দৃষ্ট হয়। ক ৩১৬ (বিশেষেব) অংশ সহিত খ ২৮৮ অংশ বিশেষের মিল আছে।]

ক	খ	গ
ক ৩৩৬ দ্বিজবংশীদাস	খ ৩০৬ দ্বিজ রঘুনাথ	গ ১৯৮ দ্বিজ রঘুনাথ
ক ৩৪১ ,,	খ ৩১০ ,,	
ক ৩৪২ ,,	খ ৩১১ ,,	
ক ৩৪৪ দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	খ ৩১৪ দ্বিজবংশী দাস	
ক ৩৪৫ ,,	খ ৩১৫ ,,	গ ২০০ দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩৪৮ ,,	খ ৩১৭ ,	গ ২০১ ,,
ক ৩৪৯ দ্বিজ চিত্ত দাস	খ ৩১৮ ,,	
ক ৩৫০ কবি বিশ্বেশ্বর	খ ৩১৮ কবি নারায়ণ	গ ২০২ নারায়ণ দেব
ক ৩৫০ বিশ্বেশ্বর দেব	খ ৩১৯ নারায়ণ দেব	গ ২০২ ,,
ক ৩৫৫ দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	খ ৩২১ দ্বিজ বংশীদাস	গ ২০৪ দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩৫৬ ,,	খ ৩২৪ ,,	গ ২০৫ ,,
ক ৩৫৯ ,,	খ ৩২৭ ,,	গ ২০৭ ,,
ক ৩৬০ বিশ্বেশ্বর	খ ৩২৮ ,,	গ ২০৭ ,,
ক ৩৬২ দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	খ ৩৩০ ,,	গ ২০৮ ,,
ক ৩৬২ ,,	খ ৩৩০ ,,	গ ২০৯ ,,
ক ৩৬৫ দ্বিজ চিত্তদাস	খ ৩৩১ ,,	গ ২১০ ,,
ক ৩৬৭ চিত্তদাস	খ ৩৩৪ বংশীদাস	গ ২১১ দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩৭০ ,,	খ ৩৩৭ দ্বিজবংশী	গ ২১৩ দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩৭৬ কবি বিশ্বেশ্বর দেব	খ ৩৪২ কবি নারায়ণ দেব	গ ২১৬ কবি নারায়ণ দেব
ক ৩৭৯ দ্বিজ বিশ্বেশ্বর	খ ৩৪[illegible] দ্বিজ বংশীদাস	গ ২১৮ দ্বিজ বংশীদাস
ক ৩৮০ দ্বিজ চিত্তদাস	খ ৩৪৬ ,,	
ক ৩৮৪ ,,	খ ৩৪৯ ,,	গ ২১৯ ,,
ক ৩৮৭ ,,	খ ৩৫২ ,,	গ ২২১ ,,
ক ৪০১ কবি নারায়ণ দেব	খ ৩৬৫ কবি রমাকান্ত দেব	গ ২৩০ কবি রমাকান্ত দেব
ক ৪০৬ রামকান্ত দেব	খ ৩৬৯ নারায়ণ দেব	গ ২৩৩ নারায়ণ দেব
ক ৪০৯ কবি রামকান্ত দেব	খ ৩৭১ কবি নারায়ণ দেব	গ ২৩৫ ,,
ক ৪১২ কবি রামকান্ত	খ ৩৭৪ কবি নারায়ণ	
ক ৪২৪ দেব নারায়ণ	খ ৩৮৫ হৃদয় ব্রাহ্মণ	গ ২৪৩ হৃদয় ব্রাহ্মণ
ক ৪২৮ নারায়ণ	খ ৩৮৯ ,	
ক ৪৩০ নারায়ণ দেব	খ ৩৯১ ,,	
ক ৪৫০ কবি বংশীদাস দ্বিজ	খ ৪০৮ কবি নারায়ণ দেব	
ক ৪৫১ বংশীদাস দ্বিজ	খ ৪০৯ নারায়ণ দেব	

ক	৪৫২	কবি বংশীদাসদ্বিজ	খ	৪১০	কবি নারায়ণ দেব			
ক	৪৫২	কমল নয়ন	খ	৪১১	দেব নারায়ণ			
ক	৪৫৪	কবি বংশীদাস	খ	৪১২	কবি নারায়ণ	গ	২৪৮	কবি নারায়ণ
ক	৪৫৫	কবি বংশীদাস দ্বিজ	খ	৪১৩	নারায়ণ দেব	গ	২৪৯	কবি নারায়ণ দেব
ক	৪৫৬	দ্বিজ বংশীদাস	খ	৪১৪	হৃদয় ব্রাহ্মণ	গ	২৫০	হৃদয় ব্রাহ্মণ
ক	৪৫৭	দেব নারায়ণ	খ	৪১৫	,,	গ	২৫১	,,
ক	৪৬৫	কবি যদুনাথ দেব	খ	৪২২	নারায়ণদেব	গ	২৫৫	নারায়ণ দেব
ক	৪৬৬	যদুনাথ দেব	খ	৪২২	,,			
ক	৪৭২	,,	খ	৪২৮	,,			
ক	৪৭৩	দেব যদুনাথ	খ	৪২৯	বল্লভ ঘোষ	গ	২৫৮	বল্লভ ঘোষ
ক	৪৭৬	যদুনাথ দেব	খ	৪৩২	,,			
ক	৪৭৭	,,	খ	৪৩৩	,,			
ক	৪৮৯	কবি রামকান্ত দাস	খ	৪৪৩	কবি নারায়ণ দেব	গ	৩৬৩	নারায়ণ দেব
ক	৪৮৯	,,	খ	৪৪৪	,,	গ	২৬৩	,,
ক	৪৯৯	কবি বলরাম	খ	৪৫২	কবি নারায়ণ			
ক	৫০০	বলরাম দাস	খ	৪৫৩	নারায়ণ দেব			
ক	৫০২	কবি বলরাম	খ	৪৫৫	কবি নারায়ণ			
ক	৫০৩	বলরাম দাস	খ	৪৫৬	নারায়ণ দেব			
ক	৫১৪	কবি বলরাম	খ	৪৬৫	কবি নারায়ণ	গ	২৬৯	কবি নারায়ণ
ক	৫১৬	কবি জগন্নাথ দ্বিজ	খ	৪৬৭	কবি নারায়ণ			
ক	৫১৯	কবি জগন্নাথ	খ	৪৭০	কবি নারায়ণ			
ক	৫২০	,,	ঘ	৪৭১	কবি নারায়ণ			
ক	৫২২	রাধাকৃষ্ণদাস	খ	৪৭৩	নারায়ণ দেব			
ক	৫২৩	কবি রাধাকৃষ্ণদাস	খ	৪৭৪	কবি নারায়ণ			
ক	৫২৩	রাধাকৃষ্ণ দাস	খ	৪৭৪	নারায়ণ দেব	গ	২৭১	কবি নারায়ণ
ক	৫২৪	কবি রাধাকৃষ্ণ	খ	৪৭৫	বল্লভ ঘোষ			
ক	৫২৪	রাধাকৃষ্ণ দাস	খ	৪৭৫	কবি বল্লভ			
ক	৫২৭	কবি রাধাকৃষ্ণ	খ	৪৭৮	কবি নারায়ণ			
ক	৫২৮	দাস অকিঞ্চন	খ	৪৭৯	,,	গ	২৭৩	দেব নারায়ণ
ক	৫৩১	দাস অকিঞ্চন	খ	৪৮১	দেব নারায়ণ			
ক	৫৩২	অকিঞ্চন দাস	খ	৪৮২	নারায়ণ দেব			
ক	৫৩৪	কবি অকিঞ্চন দাস	খ	৪৮৪	কবি নারায়ণ			
ক	৫৩৪	অকিঞ্চন দাস	খ	৪৮৪	নারায়ণ দেব			

ক ৫৩৫ ও ৫৩৬ পৃষ্ঠা খ পুঁথিতে নাই পৃষ্ঠা ওলট পালট হইয়াছে।

ক ৫৩৭	পূর্ণচন্দ্র ভট্ট	খ ৪৮৫	নারায়ণ দেব		
ক ৫৩৮	কবি পূর্ণচন্দ্র	খ ৪৮৬	কবি নারায়ণ		
ক ৫৩৯	অকিঞ্চন দাস	খ ৪৮৮	কবি নারায়ণ দেব	গ ২৭৭	কবি নারায়ণ দেব
ক ৫৪০	বংশীদাস দ্বিজ	খ ৪৮৯	নারায়ণ দেব		
ক ৫৪৩	কবি রামনিধি	খ ৪৯২	কবি নারায়ণ	গ ২৮০	নারায়ণ দেব
ক ৫৪৫	কবি সীতাপতি	ঘ ৪৯৩	কবি নারায়ণ		
ক ৫৪৬	সীতাপতি দেব	খ ৪৯৩	নারায়ণ দেব		
ক ৫৪৮	,,	খ ৪৯৭	নারায়ণ দেব	গ ২৮২	নারায়ণ দেব
ক ৫৫১	কবি সীতাপতি	খ ৪৯৯	কবি নারায়ণ		
ক ৫৫২	সীতাপতি দেব	খ ৫০০	নারায়ণ দেব		
ক ৫৫৬	,,	খ ৫০৩	নাবাযণ দেব		
ক ৫৫৬	কবি সীতাপতি দেব	খ ৫০৪	শ্রীগোবিন্দ দাস		
ক ৫৫৮	কবি সীতাপতি দেব	খ ৫০৫	কবি নারায়ণ দেব		
ক ৫৫৯	সীতাপতি	খ ৫০৬	নারায়ণ		
ক ৫৬০	কবি সীতাপতি	খ ৫০৭	নারায়ণ	গ ২৮৪	কবি নারায়ণ
ক ৫৬১	কবি সীতাপতি দেব	খ ৫০৮	কবি নারায়ণ দেব	গ ২৮৫	কবি নারায়ণ দেব
ক ৫৬২	কবি হরিদাস দ্বিজ	খ ৫০৯	কবি নারায়ণ দেব	গ ২৮৬	দেব নারায়ণ
ক ৫৬৩	কবি হরিদাস	খ ৫০৯	কবি নারায়ণ		
ক ৫৬৪	কবি হরিদাস দ্বিজ	খ ৫১১	কবি নারায়ণ		
ক ৫৬৫	হরিদাস দ্বিজ	খ ৫.১	নারায়ণ দেব		
ক ৫৬৬	হরিদাস দ্বিজ	খ ৫১২	নারায়ণ দেব		
ক ৫৬৬	,,	খ ৫১৩	নারায়ণ দেব	গ ২৮৭	দেব নারায়ণ
ক ৫৬৭	কবি হরিদাস দ্বিজ	খ ৫১৩	কবি নারায়ণ দেব	গ ২৮৭	,,
ক ৫৭০	কবি জগন্নাথ বিপ্র	খ ৫১৬	দৈবজ্ঞ শ্রীগোপীচন্দ্র	গ ২৮৯	দৈবজ্ঞ গোপীচন্দ্র
ক ৫৭১	,,	খ ৫১৬	কবি গোপীচন্দ্র	গ ২৮৯	গোপীচন্দ্র
ক ৫৭২	,,	খ ৫১৮	নারায়ণ দেব	গ ২৯০	নারায়ণ দেব
ক ৫৭৩	কবি জগন্নাথ	খ ৫১৮	কবি নারায়ণ	গ ২৯১	কবি নারায়ণ
ক ৫৭৭	,,	খ ৫২২	কবি নারায়ণ	গ ২৯২	,,
ক ৫৮৫	পূর্ণচন্দ্র ভট্ট	খ ৫২৯	নারায়ণ দেব		
ক ৫৯০	কবি পূর্ণচন্দ্র ভট্ট	খ ৫৩৪	কবি নারায়ণ দেব		
ক ৫৯১	,,	খ ৫৩৫	দৈবজ্ঞ শ্রীগোপীচন্দ্র		

ক ৫৯২ কবি পূর্ণচন্দ্র ভট্ট
ক ৫৯৩ ,,
ক ৫৯৭ কবি পূর্ণচন্দ্র
ক ৫৯৮ পূর্ণচন্দ্র ভট্ট
ক ৫৯৯ কবি পূর্ণচন্দ্র ভট্ট
ক ৬০০ পূর্ণচন্দ্র
ক ৬০৩ কবি গোপীচন্দ্র
ক ৬০৮ ক্ষীণ গোপীচন্দ্র
ক ৬০৯ গোপীচন্দ্র দেব
ক ৬১০ কবি বিশ্বেশ্বর দেব
ক ৬১১ বিশ্বেশ্বর
ক ৬১৪ কবি বিশ্বেশ্বর দেব
ক ৬১৫ বিশ্বেশ্বর দেব
ক ৬১৭ কবি বিশ্বেশ্বর দেব
ক ৬১৮ ,,
ক ৬২৩ কবি রামকান্ত দেব
ক ৬২৩ রামকান্ত দেব
ক ৬২৭ কবি রমাকান্ত দেব
ক ৬২৮ রমাকান্ত দেব
ক ৬৩০ কবি রমাকান্ত দেব
ক ৬৩১ রমাকান্ত দেব
ক ৬৩৫ কবি রামকান্ত
ক ৬৩৭ হরিদাস দ্বিজ
ক ৬৫০ কবি হরিদাসদ্বিজ
ক ৬৫১ হরিদাসদ্বিজ
ক ৬৫৬ কবি হরিদাসদ্বিজ
ক ৬৭২ নারায়ণ দেব

খ ৫৩৬ ,,
খ ৫৩৭ ,,
খ ৫৪১ কবি নারায়ণ
খ ৫৪২ নারায়ণ দেব
খ ৫৪৩ কবি নারায়ণ দেব
খ ৫৪৪ নারায়ণ
খ ৫৪৬ দৈবজ্ঞ শ্রীগোপীচন্দ্র
খ ৫৫০ দ্বিজ গোপীচন্দ্র
খ ৫৫১ রমাকান্ত কবি
খ ৫৫২ কবি নারায়ণ দেব
খ ৫৫৩ নারায়ণ
খ ৫৫৬ কবি রমাকান্ত
খ ৫৫৭ নারায়ণ দেব
খ ৫-৯ কবি নারায়ণ
খ ৫৬০ নারায়ণ দেব
খ ৫৬১ কবি নারায়ণ
খ ৫৬৪ নারায়ণ দেব
খ ৫৬৭ কবি নারায়ণ দেব
খ ৫৬৮ নারায়ণ দেব
খ ৫৭০ কবি নারায়ণ দেব
খ ৫৭১ নারায়ণ দেব
খ ৫৭৫ কবি নারায়ণ
খ ৫৭৭ নারায়ণ দেব
খ ৫৮৮ কবি নারায়ণ দেব
খ ৫৮৯ নারায়ণ দেব
খ ৫৯৪ কবি নারায়ণ দেব
খ ৬০৮ যদুনাথ

গ ২৯৭ দ্বিজ গোপীচন্দ্র
গ ২৯৮ রমাকান্ত
গ ৩০০ দ্বিজ বংশীদাস
গ ৩০৩ নারায়ণ দেব
গ ৩০৪ নারায়ণ দেব
গ ৩০৬ কবি নারায়ণ
গ ৩১১ কবি নারায়ণ
গ ৩১১ নারায়ণ দেব
গ ১১৩ কবি নারায়ণ দেব

শুক্রনীতিসার

(বঙ্গানুবাদ—পূর্বানুবৃত্ত)

শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন

আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী (ঋক্-যজু-সামবেদ), বার্তা (কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য) এবং দণ্ডনীতি (শাসন বিভাগ) এই চারিটী বিদ্যা রাজা সর্বদা শিক্ষা করিবেন। ১৫২। আন্বীক্ষিকী বিদ্যাতেই তর্কশাস্ত্র ও বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ত্রয়ী শাস্ত্রে ধর্ম, অধর্ম, কাম (অভীষ্ট) এবং অকাম প্রতিষ্ঠিত। ১৫৩। বার্তাশাস্ত্রে অর্থ, (ধন) এবং অনর্থ প্রতিষ্ঠিত। আর দণ্ডনীতিতে নীতি ও অনীতি প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য সমস্ত বর্ণ এবং সমস্ত আশ্রম এই চারিটী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৫৪। ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ), চারিবেদ, মীমাংসা (পূর্ব মীমাংসা অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ড), ন্যায়বিস্তর (অর্থাৎ সাংখ্যাদি ন্যায়শাস্ত্র), ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি) এবং পুরাণ এই (চতুর্দশ প্রকার) শাস্ত্রকেই ত্রয়ী বলে। ১৫৫। কুসীদ (সুদগ্রহণ), কৃষি, বাণিজ্য এবং গোরক্ষা ইহাই বার্তা নামে অভিহিত। বার্তা শাস্ত্রে যে সাধু (বণিক) সম্পন্ন (কুশল) তাহার বৃত্তির (জীবিকা-নির্বাহের) ভয় থাকে না। ১৫৬। দমন কার্যকেই দণ্ড বলে। দণ্ডবিধান করেন বলিয়াই রাজাকে দণ্ড বলে ; সেই রাজার যে নীতি তাহার নাম দণ্ডনীতি। নিয়মে চালায় বলিয়া ইহার নাম নীতিশাস্ত্র। ১৫৭।

আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় আত্মজ্ঞান হয় বলিয়া (লোক) হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আর ত্রয়ী-বিহিত কার্যের যথারীতি অনুষ্ঠান করিলে উভয় লোক পবিত্র (এজন্মে অতুল কীর্তি এবং পরলোকে অপার সুখ) হয়। ১৫৮। যখন সকল প্রাণীরই আনৃশংস্যই (ক্রূরতা ত্যাগ বা পরদ্রোহিতা ত্যাগ) পরমধর্ম, তখন রাজা অনৃশংস হইয়া দীনপ্রজাগণকে পালন করিবেন। ১৫৯। রাজা নিজের সুখের জন্য দীনপ্রজাগণকে পীড়ন করিবেন না ; কারণ ঐ দরিদ্র উৎপীড়িত প্রজাগণ তাহাদের নিজেদের মৃত্যু দ্বারাই রাজার নাশ সাধন করে। ১৬০।

ধর্ম এবং সুখের নিমিত্ত সুজনগণের সঙ্গ করিবে। মহৎ ব্যক্তি সুজন সেবিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইয়া থাকে। ১৬১। সুজনের চেষ্টা সেইরূপই চিত্তের আনন্দদায়ক যেমন শীতলকিরণ শশধর নূতন প্রস্ফুটিত কুমুদিনীবিরাজিত সরোবরের আহ্লাদজনক। ১৬২। গ্রীষ্মের সূর্যের কিরণে সন্তপ্ত উদ্বেগকারী আশ্রয়বিহীন বা অনাবৃত মরুভূমির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর দুর্জন-সংসর্গ ত্যাগ করিবে। ১৬৩। যে সকল সর্পের নিঃশ্বাস অগ্নি উদ্গীরণ করে এবং সেই অগ্নির ধূমে তাহাদের মুখ ধূম্রবর্ণ হয়, এইরূপ ভীষণ সর্পের সঙ্গও বরং ভাল তথাপি দুর্জনগণের সহিত কখনও সংস্রব করিবে না। ১৬৪। পূজনীয়

সুজনকে যেরূপ সম্মান করিতে হয়, নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দুর্জনকে তদপেক্ষা অধিকতর সম্মান করিবে। ১৬৫। মনোমুগ্ধকর বাক্য সর্বদা লোকসকলকে আনন্দিত করে। নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগকারী দাতা হইলেও লোকের উদ্বেগকারী হয়। ১৬৬। যে বাক্য হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে মানুষ অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়, মেধাবী ব্যক্তি পীড়িত হইয়াও ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। ১৬৭। মিত্র বা শত্রু সকলের প্রতিই সর্বদা প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে। জনপ্রিয় ব্যক্তি মধুর কেকারবকারী ময়ূরের ন্যায় মিষ্ট বাক্য বলিয়া থাকে। ১৬৮। সুপণ্ডিতের মধুর বাক্য যেমন মনোহারী হয়, মদমত্তহংস কোকিল ও ময়ূরের রব তেমন মনোহরণ করে না। ১৬৯। যাহারা প্রিয়বাক্য বলে, যাহারা প্রীতির সহিত সম্মান প্রদান করে, সেই সকল শ্রীমান্ বন্দনীয়চরিত্র ব্যক্তিগণ নরদেহধারী দেবতা। ১৭০। সকল জীবে দয়া, মৈত্রীদান এবং মধুর বাক্য যেমন বশীকরণের উপায়, ত্রিভুবনে এইরূপ বশীকরণ আর কিছুই নাই। ১৭১। আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন ও পবিত্রচরিত্র ব্যক্তি নিত্য দেবতা-পূজা করিবে। দেবতার ন্যায় গুরুজনের এবং আপনার ন্যায় বন্ধুজনের পূজা করিবে। ইহাই শ্রুতি বাক্য। ১৭২। প্রণিপাত দ্বারা গুরুজন-দিগকে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যবহারদ্বারা সাধুলোকদিগকে এবং যাগাদি পুণ্যকর্মদ্বারা দেবতা-দিগকে, আপনার অনুকূল করিবে। ১৭৩। সদ্ভাব দ্বারা মিত্র এবং বান্ধবগণকে, প্রেমদ্বারা স্ত্রীকে, দান দ্বারা ভৃত্যগণকে এবং সরল ব্যবহার দ্বারা জনসাধারণকে বশীভূত করিবে। ১৭৪।

বলবান্, বুদ্ধিমান্, শূর, যুক্তপরাক্রমী (যথাকালে এবং যথাস্থানে উপযুক্তরূপ পরাক্রম দেখাইতে সমর্থ) রাজাই ধনরত্ন পরিপূর্ণা বসুন্ধরা ভোগ করেন। ১৭৫। পরাক্রম, বল, বুদ্ধি এবং শৌর্য এই চারিটী শ্রেষ্ঠগুণ। নরপতি বলবান্ হইয়াও উক্ত গুণচতুষ্টয়বিহীন হইয়া অন্য গুণযুক্ত হইলেও অল্পমাত্র রাজত্বও রক্ষা করিতে পারেন না এবং শীঘ্রই রাজ্যভ্রষ্ট হন। যিনি এইসকল গুণদ্বারা বিভূষিত, তেজস্বী এবং যাঁহার আদেশ অন্যথা হয় না—এইরূপ রাজা ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইলেও (ঐ সকল গুণবিহীন) মহাধনশালী নৃপতি হইতে অধিক শোভিত হন। রাজার অন্য সাধারণ গুণসমুদয় ভূ-প্রসাধনে (অর্থাৎ পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালী করিতে) সমর্থ হয় না। ১৭৬-১৭৮। দেবদৈত্য-বিমর্দিনী এই ভূমি সকল ধনের খনি। এই ভূমির জন্যই রাজাগণ আপনাদের প্রাণপাত করেন। ১৭৯। যে ব্যক্তি উপভোগের জন্য ধন এবং জীবন রক্ষা করে কিন্তু ভূমি (জন্মভূমি) রক্ষা করে না, তাহার ধন এবং জীবন অসার। ১৮০। আয় ব্যতীত সঞ্চিত ধন যথেষ্ট ব্যয় করা উচিত নহে, কারণ এরূপ ব্যয়ে কুবেরের ধনও নিশ্চিতই ক্ষয় হইয়া যায়। ১৮১। এই সকল পূর্বোক্ত গুণবিশিষ্ট রাজা যেরূপ পূজিত হন, কেবলমাত্র সৎকুল-সম্ভূত হইলেই রাজা ঐরূপ পূজা পান না। বল, শৌর্য এবং পরাক্রম যেরূপ পূজা পায়, কেবল কুল (সদ্ বংশ) সেরূপ পূজা পাইতে পারে না। ১৮২। প্রজাদিগকে পীড়ন না করিয়া যাঁহার প্রতি বৎসরে লক্ষ কর্ষ হইতে তিনলক্ষ কর্ষ পরিমিত পর্যন্ত রাজস্ব নিশ্চিত প্রাপ্তি হয়, তিনি সামন্তরাজা। তিন লক্ষের পর হইতে ১০ লক্ষ কর্ষ পর্যন্ত যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব আদায় তিনি

মাণ্ডলিক নৃপ ৮।১৮৩-৪। দশ লক্ষের পর হইতে ২০ লক্ষ কর্ষ পর্যন্ত যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয়, তিনি রাজা। বিংশতি লক্ষ হইতে ৫০ লক্ষ কর্ষ পর্যন্ত যিনি বার্ষিক রাজস্ব পান, তিনি মহারাজা। ১৮৫। যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তি কোটি কর্ষ পর্যন্ত, তাঁহার নাম স্বরাট্। দশ কোটি কর্ষ পরিমিত যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব আদায়, তাঁহাকে সম্রাট্ বলে। তাহার পর ৫০ কোটি কর্ষ পর্যন্ত যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব, তিনিই বিরাট্। ইহারও বেশী যাঁহার বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয় এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবী যাঁহার বশীভূতা থাকে, তাঁহাকেই সার্বভৌম বলা যায়। ১৮৬-৭।*

বিধাতা রাজাকে প্রজাদিগের দেয় রাজস্ব বা বেতন ভোগ করিয়া প্রজাদিগের দাসত্বে নিয়োগ করিলেন এবং সর্বদা পালনের জন্য তাহাদের স্বামীরূপে কল্পনা করিলেন। ১৮৮। পৃথিবীতে যে সকল রাজকর্মচারী শাসনের অধিকার পাইয়াছে, তাহারা সামন্তাদির সমান ও সামন্ত পদটী পাইয়া থাকে এবং তাহারা যথাক্রমে রাজস্ব হইতে বেতন পায়। ১৮৯। মহারাজা-গণ যে সকল সামন্তাদি নৃপতিকে পদভ্রষ্ট করেন এবং তাহাদের মর্যাদার অনুরূপ বেতন দ্বারা পালন করেন, তাহারা "হীন সামন্ত" বলিয়া কথিত হয়।১৯০। যিনি শতগ্রামের অধিপতি তিনি সামন্ত নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি রাজার অধীনে শতগ্রাম শাসন করে, তাহাকে অনুসামন্ত বলে। ১৯১। যেব্যক্তি দশটি গ্রামের রক্ষাকর্তা তাহাব নাম নায়ক। যিনি দশহাজার গ্রামেব রাজস্ব পাইয়া থাকেন, তাঁহাকে আশাপাল (দিক্‌পাল) বা স্বরাট্ বলে। ১৯২ ।

গ্রামের পরিমাণ এক ক্রোশ এবং তাহার রাজস্ব এক সহস্র রৌপ্যকর্ষ। গ্রামের অৰ্দ্ধেক পরিমিত ভূমিভাগের নাম পল্লী। এই পল্লার অৰ্দ্ধ ভাগকে কুম্ভ বলে। ১৯৩।

প্রজাপতির মতে পাঁচ হাজার হাতে এক ক্রোশ হয়: অথবা মনুর মতে চাব হাজার হাতে এক ক্রোশ হয়। ১৯৪। ব্রহ্মার মতে ক্রোশের বর্গফলের পরিমাণ আড়াই কোটী হস্ত (৫০০০ × ৫০০০ = ২৫০০০০০০), ইহার নাম ক্ষেত্র। আড়াই হাজার ক্ষেত্রে,

---

*কর্ষ = ৮০ রতি রৌপ্য। ৯৬ রতি রৌপ্য = ১ তোলা = ১ টাকা। (এদেশে কুইন্ ভিক্টোরিয়ার প্রচলিত ইংরাজি মুদ্রা।)

সামন্ত	বার্ষিক রাজস্ব মুদ্রায়	৮৩৩৩৩	হইতে	২৫০০০০
মাণ্ডলিক	"	২৫০০০১	"	৮৩৩৩৩৩
রাজা	"	৮৩৩৩৩৪	"	১৬৬৬৬৬৬
মহারাজা	"	১৬৬৬৬৬৭	"	৪১৬৬৬৬৬
স্বরাট্	"	৪১৬৬৬৬৭	"	৮৩৩৩৩৩৩
সম্রাট্	"	৮৩৩৩৩৩৪	"	৮৩৩৩৩৩৩৩
বিরাট্	"	৮৩৩৩৩৩৩	"	৪১৬৬৬৬৬৬৬
সার্বভৌম	"	৪১৬৬৬৬৬৬ অপেক্ষা অধিক		

এক নিবর্ত্তন হয়। ১৯৫। মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্বের যে দৈর্ঘ্য তাহাই আটটি যবোদরের লম্বা উহাই অথবা অন্যমতে মধ্যমাঙ্গুলীর চওড়া যাহা পাঁচ যবোদরের লম্বা তাহাই এক অঙ্গুলী হয়*। ১৯৬। প্রজাপতির মতে চতুর্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণে এক হাত হয়; এবং জমি মাপিতে এই হাতের পরিমাণই শ্রেষ্ঠ। অন্য যে হাতের পরিমাণ আছে তাহা নিকৃষ্ট। ১৯৭। চারি হাতে এক দণ্ড এবং পাঁচ হাতে যে দণ্ড হয়, তাহা লঘু (অর্থাৎ নিকৃষ্ট)। মনুর মতে পাঁচ যবোদরে এক অঙ্গুলি হয়।১৯৮। ব্রহ্মার মতে ৭৬৮ যবোদরে ১ দণ্ড অর্থাৎ (১দণ্ড = ৪ হাত = ৪ × ২৪ = ৯৬ অঙ্গুলী = ৯৬ × ৮ = ৭৬৮ যবোদর)। মনুর মতে ৬০০ যবোদরে এক দণ্ড (অর্থাৎ—১ দণ্ড = ৫ হাত = ৫ × ২৪ = ১২০ অঙ্গুলী = ১২০ × ৫ = ৬০০ যবোদর)। ১৯৯। উভয়তঃ (লম্বায় এবং চওড়ায়) পঁচিশ দণ্ডে এক নিবর্ত্তন। মনুর মতে তিন হাজার অঙ্গুলে অথবা ১৫ হাজার যবে অথবা একশত পচিশ হাতে এক নিবর্ত্তন হয়। প্রজাপতির মতে নিবর্তন বলিতে ১৯২০০ যবোদর অথবা ২৪০০ অঙ্গুলী অথবা ১০০ হাত। ২০০-২০২। উভয়ের মতেই লম্বায় ২৫ দণ্ড ও চওড়ায় পঁচিশ দণ্ড, এই হিসাবে ৬২৫ দণ্ডে এক নিবর্তন হয়।২০৩। মনুর মতে ৭৫০০০ অঙ্গুলীতে এবং প্রজাপতির মতে ৬০০০০ অঙ্গুলীতে এক পরিবর্ত্তন। ২০৪। মনুর মতে ৩১২৫ হাতে এবং প্রজাপতির মতে ২৫০০ হাতে এক পরিবর্তন কথিত হয়। ২০৫। মনুর মতে ৩৭৫০০০ যবোদরে এবং প্রজাপতির মতে ৪৮০০০০ যবোদরে এক পরিবর্ত্তন হয়। ২০৬। মনুর মতে বত্রিশ নিবর্তনে ৪০০০ হাত অথবা ৮০০ দণ্ড। ২০৭। পরিবর্তনের ভুজ ২৫ দণ্ড (অর্থাৎ ২৫ × ৪ = ১০০)। ঐ পরিবর্তনের ক্ষেত্রফল (১০০ × ১০০) ১০০০০ হাত। ২০৮। চারি ভুজই সমান হইবে। এই মাপের পরিবর্তন হইলে কষ্ট হয় (১)। রাজা প্রজাপতির মাপ অনুসারে সর্বদা রাজস্ব আদায় করিবেন। কিন্তু বিপত্তিকালে মনুর মাপ অনুসারে রাজস্ব বা রাজকর গ্রহণ করিবেন। ইহা ব্যতীত যিনি লোভবশতঃ অধিক কর আদায় করেন সে রাজা প্রজার সহিত নষ্ট হন। ২০৯-২১০। রাজা স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কাহাকে এক অঙ্গুলি ভূমিও দান করিবেন না, যদি জীবিকার জন্য কাহাকেও দিতে হয় তাহা হইলে ঐ দান গৃহীতার জীবিতকাল পর্যন্ত (life interest)। ২১১। গুণী (রাজা) দেবতার সেবার জন্য ভূমিদান করিবেন, সাধারণের উপভোগার্থ উদ্যানের জন্য এবং পোষ্যবর্গের আবশ্যক অনুযায়ী বাসগৃহের জন্য ভূমি দান করিবেন। ২১২।

যেস্থান নানাজাতীয় বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ, পশু-পক্ষিবহুল, প্রচুর ভাল জল পরিপূর্ণ, বহুধান্যযুক্ত, সর্বদাই প্রচুর তৃণ ও কাষ্ঠ পরিপূর্ণ, সমুদ্র পর্যন্ত নৌকার গমনাগমন করিবার

---

* এক অঙ্গুলী = ৮ যব লম্বা এবং ৫ যব চওড়া (বিনয় বাবুর ইংরেজী অনুবাদ)। সংস্কৃত অনুযায়ী এ অর্থ হয় না।

(১) Parivartana of Cultivated land is four Bhujas (Eng.tr.)। মূলে Cultivated land এর কথা নাই।

সুবিধাসম্পন্ন এবং পর্বতের অনতিদূরে অবস্থিত এইরূপ রমণীয় সমভূমিতে রাজধানী স্থাপন করিবে। ২১৩-২১৪। এই রাজধানীর আকার অর্ধচন্দ্রের ন্যায়, গোলাকার বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট করিয়া সুন্দরভাবে নির্মাণ করিবে। ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর এবং পরিখা বেষ্টিত থাকিবে। ইহার পূর্বাদি চারিদিকে চারিটি দ্বার থাকিবে। ইহার মধ্যে গ্রাম প্রভৃতির সন্নিবেশ থাকিবে। রাজধানীর মধ্যস্থলে সভাগৃহ (রাজসভাগৃহ Council House) হইবে। রাজধানীর মধ্যে কূপ, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, সুন্দর রাজপথ, উপবন এবং বীথিকা (রাস্তার অথবা দুই পার্শ্বে বৃক্ষযুক্ত ছায়াবহুলপথ), সুদৃঢ় সুরালয় (দেবমন্দির), মঠ (বিহার বা পাঠশালা School or College) এবং পান্থশালা থাকিবে। এইরূপ রাজধানী নির্মাণ করিয়া প্রজাগণের সহিত সুরক্ষিত হইয়া রাজা বাস করিবেন। ২১৫-২১৭। রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত সভাগৃহ (Council House) থাকিবে। ঐ প্রাসাদের সংলগ্ন গো-অশ্ব এবং গজশালা, বাপী কূপ এবং সুশোভিত জলযন্ত্র (shower and pump) থাকিবে। ২১৮। ঐ প্রাসাদ সমচতুষ্কোণ হইবে এবং দক্ষিণদিকে উচু ও উত্তর দিকে নীচু হইবে। (গৃহশালা) ব্যতীত ভূমি (প্রাঙ্গণ) সমভুজ না করিয়া বিষমভুজ অর্থাৎ লম্বাতেও বিষম এবং চওড়াতেও বিষম হস্ত পরিমিত করিবে। ২১৯। চতুঃশাল (চকমিলান বাড়ী)* ব্যতীত অসমানভুজবাড়ী অশুভ বা সুন্দর হয় না। প্রাসাদের প্রাকার রক্ষার্থে শস্ত্রাস্ত্রধারী রক্ষি থাকিবে এবং আপদ্ নিবারণোপযোগী উত্তমযন্ত্র (battery) যুক্ত হইবে। এবং ঐ প্রাকারে সত্রিকক্ষ (গুপ্তচরের গৃহ) এবং চারিদিকে সুন্দর চারটি দ্বার থাকিবে। দিবারাত্রি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত চার পাঁচ বা ছয় জন প্রতিযামে (তিন ঘণ্টা অন্তর) পরিবর্তনশীল প্রহরী প্রতিকক্ষে গুপ্তভাবে থাকিবে। নানাবিধ গৃহ রাজবাসযোগ্য তাঁবু এবং অট্ট দ্বারা রাজভবন পরিশোভিত হইবে। ২২০ ২২২।

রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে বস্ত্রাদিমার্জন স্থান (রজকশালা), স্নানগৃহ, পূজাগৃহ, ভোজনগৃহ এবং পাকশালা হইবে। ২২৩। দক্ষিণদিকে পর পর নিদ্রামন্দির, রতিমন্দির, মধুপানমন্দির, রোষমন্দির, ধান্য রক্ষার মন্দির (ভাড়ার ঘর), ঘরটা মন্দির (গম প্রভৃতি পিষিবার যাঁতার ঘর), দাসীর গৃহ, দাসের গৃহ, এবং উৎসর্গ গৃহ (প্রস্রাব খানা ও পায়খানা) হইবে। ২২৪½। পশ্চিমদিকে গোশালা, মৃগশালা, উষ্ট্রশালা এবং হাতিশালা থাকিবে। ২২৫। উত্তরদিকে রথশালা, অশ্বশালা, অস্ত্রাগার, শস্ত্রাগার, লম্বা ব্যায়ামগৃহ, (১) বস্ত্রগৃহ (পরিচ্ছদাদির গৃহ), দ্রব্যগৃহ (store house) এবং পাঠাগার নির্মিত হইবে। এই সমুদয় গৃহগুলি সুরক্ষিত এবং অতি মনোহর হইবে। অথবা রাজা তাঁহার ইচ্ছা ও সুবিধামত এই সকল গৃহ যে কোনও দিকে করিতে পারেন। ২২৬-২২৭। রাজপ্রাসাদ হইতে উত্তর দিকে ধর্মাধিকরণ এবং শিল্পশালা হইবে। ২২৭½।

গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে দেয়ালের উচ্চতা, ঘরের বিস্তার (অর্থাৎ চওড়া) হইতে

---

* চতুঃশাল—উঠানের চারিদিকে ঘর

(১) রক্ষিগৃহ—ইহা বিনয় বাবুর অনুবাদে আছে, মূলে নাই

এক পঞ্চমাংশ বেশী হইবে। ২২৮॥ ঘরের বিস্তারের এক ষষ্ঠাংশস্থূল ভিত্তি (দেয়াল) করিতে হয়। একতালা বাড়ীর এই মাপ। দোতালা গৃহ হইলে সকল দিকেই এই মাপের বৃদ্ধি হইবে। ২২৯। স্তম্ভদ্বারা বা ভিত্তিদ্বারা কোষ্ঠ (কামরা) পৃথক্ করিবে। তিন কামরা, পাঁচ কামরা বা সাত কামরা থাকিলেই তাহাকে গৃহ (বাড়ী) বলে। ২৩০। এক একটী কামরায় চারিটী দরজা হইবে। কামরার দেয়ালকে আটভাগ করিয়া তাহার মধ্যস্থলের দুইভাগ পরিমিত স্থান দরজা হইবে। (তাহা হইলে লম্বাদিকের দরজা চওড়ায় বেশী হইবে এবং প্রস্থেরদিকের দরজা চওড়ায় অপেক্ষাকৃত সরু হইবে)। কামরার চারিদিকে এইরূপ দরজা থাকিলে গৃহস্থের ধনপুত্রে লক্ষ্মী লাভ হয়। ২৩১। কামরার মধ্যস্থলেই দরজা করিবে, অন্যত্র কদাচ করিবে না। কামরায় জানালা যেদিকে যেমন ইচ্ছা সুবিধা মত করিবে। ২৩২। যেখানে গৃহের দরজা অপর গৃহদ্বার দ্বারা বিদ্ধ হইবে (অর্থাৎ সামনাসামনি পড়িবে), কিংবা বৃক্ষ, কোণ, স্তম্ভ, মার্গপীঠ (পথে ভারবাহীদের ভার রাখিবার উচ্চস্থান) অথবা কূপদ্বারা বিদ্ধ হয় সেখানে গৃহদ্বার করিবে না। ২৩৩। রাজপ্রাসাদ এবং মণ্ডপের (দেবালয়ের) দরজা মার্গবেধস্থলে (রাস্তার সংযোগস্থলে) করিবে না। সমভূমি হইতে গৃহপীঠ (মেঝে floor) গৃহের উচ্চতার এক চতুর্থাংশ উচ্চ হইবে। ২৩৪। প্রাসাদ এবং মণ্ডপের গৃহপীঠ উহাদের উচ্চতার অর্দ্ধাংশ উচ্চ হইবে, ইহাই অপরের মত। পরের বাতায়নের সহিত নিজের বাতায়ন বিদ্ধ (অর্থাৎ রুজু রুজু) করিবে না। ২৩৫। যদি খোলার চাল হয়, তাহা হইলে দেয়ালের উপর হইতে মধ্যস্থল উচ্চ হইবে এবং ঐ উচ্চতা গৃহের বিস্তারের অর্দ্ধাংশ পরিমিত হইবে, তাহা হইলে জলস্বচ্ছন্দে গড়াইয়া পড়িবে। ২৩৬। ছাত কম মজবুত এবং নীচু করা উচিত নহে। কোষ্ঠের উচ্চতা যেরূপ তাহার অনুপাতে ইহার বিস্তার রাখিতে হয়, তদপেক্ষা হীন করা কর্ত্তব্য নয়। প্রাকারের উচ্চতার অর্দ্ধ বা সমান বা এক-তৃতীয়াংশ প্রাকারের ভিত্তিমূল হয় এবং ইহার প্রবিস্তর (স্থূলত্ব) উচ্চতার অর্দ্ধেক হয়, আর ইহাকে এরূপ উচ্ছ্রিত (উচ্চ) রাখা আবশ্যক যাহাতে দস্যুরা ঐ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিতে না পারে। ২৩৭-৮। ঐ প্রাকার সর্বদা নালীকাস্ত্র (বন্দুক) ধারী যামিকগণ (তিন ঘণ্টা অন্তর পরিবর্ত্তনশীল প্রহরী) কর্তৃক রক্ষিত হইবে। ঐ প্রাকার বহুদৃঢ় গুল্ম (ঘাঁটীর ঘর) যুক্ত, গবাক্ষ যুক্ত এবং প্রণালীযুক্ত হইবে। ২৩৯। ঐ প্রাকার পর্বতের নিকটস্থ না হইলে, আর একটী অপেক্ষাকৃত নীচু প্রতিপ্রকার দ্বারা বেষ্টিত করিবে। উহার বাহিরে পরিখা (খাল) কাটিবে। ঐ পরিখা যতটা গভীর হইবে তাহার দ্বিগুণ চওড়া হইবে। ২৪০। উহা প্রাকারের অতি সমীপে হইবে না এবং অগাধ জলে পরিপূর্ণ থাকিবে। যুদ্ধের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার না থাকিলে এবং যুদ্ধকুশল সৈন্য না থাকিলে, রাজার দুর্গবাস অনুচিত। রাজা ঐ সকল বিহীন হইয়া দুর্গবাস করিলে বন্ধন প্রাপ্ত হন। ২৪১½।

রাজা রাজসভাকে সুন্দররূপে সজ্জিত এবং সুগুপ্ত (সুরক্ষিত) করিবেন। ২৪২। ঐ রাজসভা ত্রিকোষ্ঠ (তিন কামরা), পাঁচকোষ্ঠ, অথবা সাতকোষ্ঠ সমন্বিত হইবে। ইহার পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে যতখানি বিস্তৃত হইবে উত্তরদক্ষিণ দিক্ তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ অথবা

তিনগুণ অথবা ইচ্ছামত দীর্ঘ করা চলে। ঐ রাজসভা একতালা, দোতালা, বা তেতালা হইবে এবং ইহার মধ্যে উপকার্যা, (বিশ্রাম গৃহ, Waiting rooms for king & nobles) থাকিবে এবং শিরো গৃহ (চিলেকুঠরী) থাকিবে। ২৪৩-৪। রাজসভার প্রতিকোষ্ঠেই চারিদিকে জানালা থাকিবে এবং মধ্যের কোষ্ঠটী পার্শ্বেরকোষ্ঠ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তার হইবে। ২৪৫। মধ্যের কোষ্ঠটী স্বীয় বিস্তার অপেক্ষা ⅕ (এক-পঞ্চম) অংশ অধিক উচ্চ হইবে। পার্শ্বকোষ্ঠগুলির এক তালার ছাদ বা দ্বিতলের ভূমি (মেঝে) ঐ কোষ্ঠের বিস্তারের সমান উচ্চতার উপরে হইবে অথবা উহা অপেক্ষা ⅕ অংশ উচ্চতার উপরে হইবে। এইরূপস্থলে পার্শ্বকোষ্ঠগুলি দ্বিভূমিক (দ্বিতল) এবং মধ্যের কোষ্ঠটী একতলা হইয়া থাকে। ২৪৭। ঐ সভাগৃহের সহিত একটী পৃথক্ সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ থাকিবে, যাহার চারিদিকে স্তম্ভান্ত (বারান্দা) আছে এবং ঐ গৃহে চারিদিক্ হইতে গমনের প্রশস্ত পথ আছে; উহাতে জলোর্দ্ধপাতযন্ত্র (ফোয়ারা), সুস্বরযন্ত্র (সুন্দর শব্দ-কারী গীতবাদ্যযন্ত্র—হয়তো Radio) বাতপ্রেরকযন্ত্র (কলে চালিত পাখা), কাল প্রবোধক যন্ত্র (ঘড়ি), সুবৃহৎ আয়না, প্রতিরূপক (আলেখ্য painting) থাকিবে।২৪৯। মন্ত্রণাদির জন্য এবং রাজ-কার্য নির্বাহের জন্য কথিতরূপ রাজসভা হইবে। রাজগৃহের উত্তরদিকে একশত হাত ত্যাগ করিয়া অমাত্য-(মন্ত্রী) লেখ্য-শালিকা (Office for the Minister and his staff), সভ্য-অধিকৃত শালিকা (office for members of the Council) পৃথক পৃথক করিবে; এবং পূর্বদিকে দুইশত হস্ত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া সেনাসংবেশনশালা (military office) করিবে। প্রজাদিগের ঘরবাড়ী রাজবাড়ী হইতে দূরে হইবে। ২৫০-২। গুণবান্ রাজা রাজপ্রাসাদের চারিদিকে প্রথমে ধনী ব্যক্তিদিগের, তৎপরে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ জাতিগণকে, তৎপরে প্রকৃতি (big officers) অল্পপ্রকৃতি (small officers) এবং অধিকারীগণের (any sort of officers) বাস করাইবেন। ২৫৩। রাজধানীর মধ্যে সেনাপতিগণের, পদাতিগণের, অশ্বশালার সহিত অশ্বারোহীগণের, গজশালা সহিত গজপাল (মাহুত) গণের, বৃহৎ নালীকযন্ত্রের (কামান), তুরগীগণের (অশ্বতর বা ঘোটকীগণের), গৌল্মিকগণের (গুল্মসৈন্যের, কাহারও মতে দেহরক্ষীগণের) এবং আরণ্যক সৈন্যগণের সুন্দর বাসগৃহ সকল যথাক্রমে থাকিবে। ২৫৬। তারপরে সুরক্ষিত স্থপের জলাশয়ের সহিত পান্থশালা করিবে। গ্রামে বা নগরে সমানজাতীয় লোকগণের গৃহ সকল পূর্ব বা উত্তর মুখ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত হইবে। বাজারে এক এক জাতীয় পণ্যগৃহ এক এক দিকে থাকিবে। ২৫৭-৮। রাজপথের দুইপার্শ্বে ধনিকাদির ক্রমানুসারে বাসগৃহ হইবে। রাজা এই নিয়মে পত্তন (নগর) এবং গ্রাম স্থাপন করিবেন। ২৫৯।

রাজগৃহকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পূর্বাদি চারিদিকে রাজপথ হইবে। উত্তম রাজপথ ৩০ হাত চওড়া হইবে। ২৬০। মধ্যম রাজপথ ২০ হাত চওড়া এবং অধম রাজপথ ১৫ হাত চওড়া হইবে। নগর এবং গ্রাম প্রভৃতিতে এই সকল মার্গ দিয়া পণ্যদ্রব্য সরবরাহ হইয়া থাকে। ২৬১। নগরে ও গ্রামে তিনহাত চওড়া পথকে পদ্যা

কহে। পাঁচ হাত চওড়া পথের নাম বীথি। দশহাত চওড়া পথের নাম মার্গ ২৬২। গ্রামের মধ্যস্থল হইতে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরদিকে এইরূপ পথ নির্মাণ করিবে। নগরের আবশ্যকতা অনুসারে রাজা বহু রাজমার্গ করিবেন। ২৬৩। রাজধানীর মধ্যে বীথি বা পন্থা থাকিবে না। অরণ্য যদি রাজধানী হইতে ছয় যোজন (২৪ ক্রোশ) দূরে হয়, তাহা হইলে ঐ অরণ্য পর্যন্ত উত্তম রাজমার্গ নির্মাণ করিবে। তিনযোজন (১২ ক্রোশ) দূরে অরণ্য হইলে মধ্যম রাজমার্গ করিলে চলিতে পারে, এবং ছয়ক্রোশ দূরে অরণ্য হইলে অধমমার্গ করিলেই হইবে। একগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার রাস্তা ১০ হাত চওড়া হইবে। ২৬৫। গ্রাম্যগণ (গাঁয়ের মোড়লগণ—municipal authorities) রাস্তা কূর্ম পৃষ্ঠের ন্যায় করিবে, তাহাতে সেতু (Bridge) এবং রাস্তার দুইপার্শ্বে খাত কাটিয়া জল নির্গমের নালা করিবে। ২৬৬। সমস্ত গৃহের দ্বার রাজপথের অভিমুখে হইবে। মল বহন করিবার (পায়খানা খাটার) জন্য গৃহের পশ্চাৎ দিকে বীথি রাখিবে। ২৬৭। রাজা প্রতি বৎসর দুই সারবন্দী গৃহগুলির মধ্যবর্তী পথগুলিকে কয়েদীগণ কিংবা গ্রামাজনগণদ্বারা সুধা শর্কর (সাদা কাঁকর lime stone) দিয়া মেরামত করাইবে। রাজা দুই গ্রাম অন্তর পান্থশালা স্থাপন করিবেন। ২৬৮-৯। গ্রামরক্ষক এই পান্থশালার রক্ষা করিবেন এবং নিত্য পরিষ্কৃত রাখিবেন। পান্থশালাধিপ সর্বদা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? কি জন্য কোথায় যাইবেন? সঙ্গে লোকজন আছে কি নাই? তিনি সশস্ত্র এবং বাহনযুক্ত কিনা? তিনি কোন্ জাতি, কোন্ কুলোৎপন্ন, কি নাম ধারী? কোথায় দীর্ঘকাল থাকেন (অর্থাৎ) দেশ কোথায়? এইগুলি সত্যকরিয়া বলিতে বলিবেন; এইগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া রাখিবেন এবং সন্ধ্যাকালে উহার শস্ত্র লইয়া রাখিবেন, আর খুব সাবধানের সহিত নিদ্রা যাইতে নির্দেশ করিবেন। আর কয়জন পথিক আছে তাহা গণনা করিয়া ও পান্থশালার দ্বারবন্ধ করিয়া, যামিক দ্বারা পান্থশালা চৌকী দেওয়াইবেন। অতঃপর প্রভাত হইলে তাহাদিগকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিবেন, শস্ত্র ফেরত দিবেন, পুনরায় তাহাদিগের গণনা করিবেন। অনন্তর পান্থশালার প্রধান দরজা খুলিয়া তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে দিবেন। ২৭০-৪। ঐ পথিকগণকে গ্রাম্যজন গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত আগু বাড়িয়ে দিবে। ২৭৪½।

(ক্রমশঃ)

জৈন দর্শন (*)

(জৈনদর্শনের বিশেষ কথা)

পণ্ডিত **ঈশ্বর চন্দ্র শাস্ত্রী** পঞ্চতীর্থদর্শনাচার্য

এই দর্শনের অপর নাম তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র, কোন কোন আচার্যের মতে "তত্ত্বার্থসূত্র" এইরূপ সংজ্ঞাও প্রসিদ্ধ। জৈনগণ আর্যাবর্তের আর্যজাতিরই অন্তর্গত। তাহারা দুই সমাজে বিভক্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর। উক্ত সূত্র ও ভাষ্যকারের নাম দিগম্বর সমাজে উমাস্বামী এবং শ্বেতাম্বর সমাজে উমাস্বাতি এই নামে প্রসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন বহুগ্রন্থে উমাস্বাতি নামই স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। এই দর্শনগ্রন্থে আচার্য শ্রুতসাগরের বিরচিত "শ্রুতসাগরী" টীকায় (†) "উমাস্বামী" এইরূপ নাম একাধিক স্থানে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নামাংশে কিছু প্রভেদ থাকিলেও উক্ত উভয় সম্প্রদায়ে সূত্রকার উমাস্বামী দেব সম্মানার্হ। তদীয় বিরচিত সূত্রাবলী দর্শনে মুখ্য গ্রন্থ এবং এই সমাজে শ্রদ্ধেয়। এই সূত্র সন্দর্ভে জৈনধর্ম ও দর্শনের সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে সুচিন্তায় সম্বদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ কোনও তাত্ত্বিক বিষয় নাই যে, এই সূত্রগ্রন্থে সংগৃহীত হয় নাই। শাস্ত্রসিদ্ধান্তসমুদ্রকে আচার্যদেব, তত্ত্বার্থসূত্ররূপ ক্ষুদ্রঘট মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা এইরূপ কার্য অতিদক্ষ ও প্রতিভাশালী গ্রন্থকর্তার ছিল।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তত্ত্বার্থ সূত্রাবলীর অর্থগম্ভীরতা দেখিলে সুধীসমাজকেও বিস্মিত হইতে হয়, এই সূত্রাবলী অপর কোন দর্শনের বিষয় ও সূত্রনিচয়ের অনুকরণে রচিত হয় নাই। কেবল প্রমেয় বা পদার্থনিরূপণ প্রমাণাধীনহেতু মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় উল্লিখিত ও অবধারিত হইয়াছে। এই তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের প্রথম চারি অধ্যায়ে জীবতত্ত্ব, পঞ্চম অধ্যায়ে অজীবতত্ত্ব, (‡) যাহা পুদ্গল নামে খ্যাত। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আস্রব-তত্ত্ব। অষ্টম অধ্যায়ে বন্ধতত্ত্ব, নবম অধ্যায়ে সম্বর ও নির্জরতত্ত্ব, এবং দশম অধ্যায়ে মোক্ষতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সকল দর্শনশাস্ত্রেরই চরম লক্ষ্য মোক্ষ বা পরিনির্বাণ হেতু এই দর্শনেও সন্দর্ভের শেষভাগে মোক্ষতত্ত্ব বিচারিত হইয়া মানবের চিরদুঃখনাশের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

---

* অবতীর্ণ জিনদেবের উক্তি পূর্ণদর্শন। ইহার নামান্তর জৈনসিদ্ধান্ত, অনেকান্তবাদ, স্যাদ্বাদ, আর্হতমত, জৈন-দর্শন অহিংসাশাস্ত্র। "শ্বাত্মনীবজিনো যথা" যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

† তাহার রচিত 'যশস্তিলক" মহাকাব্যের টীকা অতিপ্রশস্ত। তদীয় বিবরণ বম্বে মুদ্রিত উক্ত মহাকাব্যের ভূমিকায় আছে।

‡ "নানামুনীনাং মতয়োবিভিন্নাঃ।"—অতএব জৈনমতে কণাদর্ষির বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় সাতটি পদার্থ উক্ত আছে। জীব, অজীব, সম্বর, নির্জর, আস্রব, বন্ধ, মোক্ষ, এই সাতটি পদার্থের সংক্ষেপে জীব ও অজীব এই দুই পদার্থ। এই পদার্থ সকলের বিবরণ বেদান্তভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু, ষড়্দর্শন সমুচ্চয়টীকা, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, জৈনদর্শনের ভাষ্য, টীকা অপর সন্দর্ভাদিতে লিখিত আছে।

উক্ত জীবাদি সপ্ত পদার্থের ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধের শেষভাগে করিবার অভিলাষ আছে। আচার্য উমাস্বামী ন্যগ্রোধিকা নগরীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এই দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন কুসুমপুর বা পাটলিপুত্র নগরে বিহরণকালে করিয়াছিলেন। জ্ঞানপ্রদাত্রী সরস্বতী দেবীর উপাসনাকালে পাষাণময়ী দেবীর সঙ্গে আরাধনাতত্ত্ব বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলেন বলিয়া সুধীসমাজে প্রসিদ্ধি আছে। ইহার পিতৃদেবের নাম স্বাতি, জননীর নাম উমা ও বাৎসী এই উভয় সংজ্ঞা মিলিত হইয়া উমাস্বাতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আচার্য বিজয় সিংহ স্বীয় জম্বূদ্বীপ সমাস নামক টীকায়ও লিখিয়াছেন—"আচার্যের মাতার নাম উমা এবং জনকের নাম স্বাতি ছিল" ইহাতেই তাঁহার নাম উমাস্বাতি হইয়াছে + + + "অস্য গ্রন্থকারস্যোমা মাতা স্বাতিঃ পিতা তৎসম্বন্ধাদ্ উমাস্বাতিরিতি সংজ্ঞা"। বৈয়াকরণসমাজেও উমাস্বাতি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণাচার্য ছিলেন এইরূপ প্রচার রহিয়াছে। হেমচন্দ্রাচার্যসূরি স্বরচিত "শব্দানুশাসন" নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে অনু এবং উপ উপসর্গের উৎকৃষ্টতা অর্থ প্রসঙ্গে উমাস্বাতির নাম উল্লেখ পূর্বক উদাহরণ করিয়াছেন।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মতেও উমাস্বাতি কর্তৃক রচিত গ্রন্থের মধ্যে "প্রশমরতি"। "যশোধরচরিত্র"। "শ্রাবকপ্রজ্ঞপ্তি"। "জম্বুদ্বীপসমাস"। পূজাপ্রকরণ প্রভৃতি সন্দর্ভ পাওয়া যায়। জিনপ্রভসূরি স্বকীয় "তীর্থকল্প" নামকগ্রন্থে এবং হরিভদ্রসূরির প্রশমরতি নামক গ্রন্থের টীকাতে উমাস্বাতি আচার্যকে পাঁচ শত গ্রন্থরচয়িতা বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, উমাস্বামি অতুল প্রতিভাভূষিত বিদ্বান্ ছিলেন,—"ইহাচার্য্যঃ শ্রীমানুমাস্বাতি-পুত্রঃ পঞ্চশত প্রবন্ধপ্রণেতা বাচকমুখ্যঃ"। নগর তালুকের শিলালিপিতে (নং ৪৬) ভাদ্রবাহু উমাস্বাতি সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

"তত্ত্বার্থসূত্রকর্ত্তারমুমাস্বাতি মুনীশ্বরম্।
শ্রুতকেবলি-দেশীয়ং বন্দেঽহং গুণমন্দিরম্॥"

আমি তত্ত্বার্থসূত্রপ্রণেতা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রুতকেবলী সাধুতুল্য অসীম গুণালয় উমাস্বাতি আচার্যকে অভিবাদন করিতেছি, যেহেতু ইনি বিদ্বৎসমাজে বরণীয় ও শ্রুতকেবলী সাধুসদৃশ ছিলেন।

শ্রবণ (শমণ) বেলগোলার শিলালিপিতে (নং ১০৫) ও আচার্য উমাস্বাতি বিষয়ে লিখিত আছে,—

"শ্রীমানুমাস্বাতিরয়ং যতীশ স্তত্ত্বার্থসূত্রং প্রকটীচকার।
যন্মুক্তিমার্গাচরণোদ্যতানাং পাথেয়মর্ঘ্যং ভবতি প্রজানাম্॥"

যতিশ্রেষ্ঠ শ্রীমদুমাস্বাতি (স্বীয় অশেষ বৈদুষ্যগুণে) জৈনদর্শনের তত্ত্বার্থ সূত্রাবলীর ব্যাখ্যা (ভাষ্য) রচনা করিয়াছেন। যাহার প্রদর্শিত মুক্তিপথে গমনোদ্যত জনগণের মহার্ঘ্য (নির্বাণ) তত্ত্বই পাথেয় হয়। শ্রবণ বেল্ গোলার অপর একখানি শিলালিপিতে (নং ১০৮) ও উমাস্বাতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অঙ্কিত আছে।

"অভূদুমাস্বাতি মুনিঃপবিত্রে, বংশে তদীয়ে সকলার্থবেদী।
সূত্রীকৃতং যেন জিন প্রণীতং, শাস্ত্রার্থজাতং মুনিপুঙ্গবেন॥"

সকল তত্ত্ববেত্তা মুনি উমাস্বাতি (কুন্দকুন্দাচার্য্যের) প্রশস্তবংশে আভিজাত্য সহিত জন্মপরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে মুনি শার্দূল ভগবান্ জিনদেবের পূত উক্তি সমূহ সূত্রমালায় গ্রথিত করিয়াছিলেন। (এই মতে সূত্র ও ভাষ্যপ্রণেতা উমাস্বাতি)॥ ১॥

'স প্রাণিসংরক্ষণ সাবধানঃ বভার যোগী কিল গৃধ্রপক্ষান্।
তদাপ্রভৃত্যেব বুধাযমাহুরাচার্য্যশব্দোত্তর গৃধ্রপিচ্ছম্॥ ২॥"

আচার্য উমাস্বাতি প্রাণিবধ ভয়ে সকল সময়ে খুব সাবহিত থাকিতেন। যোগী বেশ ধারণ করিয়া (কোনও কারণবশতঃ) গৃধ্র পক্ষীর পুচ্ছ সকল বেশরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন; সে অবধি সুধীগণ তাহাকে "গৃধ্র পিচ্ছাচার্য্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রথম শ্লোকটি পাঠান্তরিত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

"তত্ত্বার্থসূত্রকর্তারং গৃধ্রপিচ্ছোপলক্ষিতম্।
বন্দে গণীন্দ্র সংঘাত মুমাস্বাতিংমুনীশ্বরম॥"

এই শ্লোকে 'গৃধ্রপিচ্ছ-উপলক্ষিত' এইটি উমাস্বাতির অপর নাম। এই মতে উমাস্বাতির গুরু কুন্দকুন্দাচার্যের (তদীয) শিষ্য উমাস্বাতি উপলক্ষিত বিধায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে জৈনাচার্যগণের মধ্যে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে; বিশেষ বিস্তার ভয়ে এই স্থলে উল্লেখে বিরত হইলাম। একজন আচার্যের অবস্থা ও সময বা কার্য ভেদে অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ কুন্দকুন্দস্বামীর পদ্মনন্দী, এলাচার্য, বক্রগ্রীব, গৃধ্রপিচ্ছ প্রভৃতি নাম প্রকাশিত আছে। পদ্মনন্দী নামে আচার্য স্থানীয সপ্তম ও অষ্টম অনেক আচার্য হইযাছিলেন; তাহাদের মধ্যে "পঞ্চবিংশতিকা" এবং "জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি" সন্দর্ভপ্রণেতা বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে প্রশস্তির শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়, —

'তস্যান্বয়েভূবিদিতেবভুব যঃ পদ্মনন্দী প্রথমাভিধানঃ।
শ্রীকুন্দকুন্দাদিমুনীশ্বরাখ্যঃ সৎ সংযমাদুদ্ভূত-চারণর্দ্ধিঃ॥" ১॥

"অভূদুমাস্বাতিমুনীশ্বরোঽসাবাচায শব্দোত্তর গৃধ্রপুচ্ছঃ।
তদন্বয়ে তৎসদৃশোঽস্তি নান্যঃ স্তাৎকালিকাশেষ পদার্থবাদী॥" ২॥

পূর্বের লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের কিছু পাঠের বিলক্ষণতাযুক্ত এই দ্বিতীয় শ্লোকটি, কিন্তু প্রথম কুন্দকুন্দাদিনামে ব্যবহৃত হইযা পরিণত বযসে উমাস্বাতি আচার্য গৃধ্রপিচ্ছাদি নাম ধারণ করিয়াছিলেন। 'প্রাকৃত বৈদগাহা' (প্রাকৃত বৈদ্যগাথা) নামে চিকিৎসা শাস্ত্রীর একখানি প্রাকৃত গ্রন্থ কুন্দকুন্দাচার্যের বিরচিত পাওয়া যায়। ইহাতে চিকিৎসা বিষয়ে চারিহাজার গাথা আছে। ভাষ্যকার উমাস্বাতির পরবর্তী অপর এক উমাস্বাতি ছিলেন তাঁহার বিরচিত গ্রন্থ "পঞ্চ নমস্কার স্তবন"। "শ্রাবকাচার" (সন্দর্ভ) প্রসিদ্ধ আছে। অপর কাহারও মতে কুন্দকুন্দস্বামী-বিরচিত চতুরশীতি সংখ্যক প্রাভৃত (পাহুড) সন্দর্ভ

প্রখ্যাত রহিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে প্রাকৃত নাটক সময়সার, পঞ্চাস্তিকায়, প্রবচনসার, রয়ণসার, ষট্পাহুড় প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় বহুগ্রন্থ প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু উমাস্বাতি আচার্যের বিরচিত একমাত্র সংস্কৃত তত্ত্বার্থসূত্রভাষ্য ভিন্ন অপর কোন সংস্কৃত সন্দর্ভ পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি তত্ত্বার্থসূত্রের ভাষ্যকার, টীকাকারগণের কথা বলিয়া তাহার পর দর্শনোক্ত পদার্থ বিষয়ে কিছু ব'লিবার ইচ্ছা আছে। এই তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের ভাষ্য ও টীকা বৃ'ত্তিকার অনেক। এখন তত্ত্বার্থসূত্রের যে সকল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তৎসমূহের সংক্ষেপে বিবরণ প্রদান করিতেছি। (১) উক্ত সূত্রভাষ্য শ্রীমৎ সমন্ত ভদ্রস্বামী-বিরচিত, ইহার শ্লোক সংখ্যা চতুরশীতিসহস্র (৮৪০০০)। এই ভাষ্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য। শতবৎসর পূর্বে এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। এই ভাষ্যের প্রারম্ভিক মঙ্গলাচরণ একশত পনের (১১৫) শ্লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এই মঙ্গলাচরণকে "দেবাগম স্তোত্র" বা "আপ্তমীমাংসা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আপ্তমীমাংসার উপরে ভট্ট অকলঙ্ক দেব "অষ্টশতী" এবং বিদ্যানন্দস্বামী "অষ্টসহস্রী" পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইখানি সন্দর্ভ দার্শনিক সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

"আরাধনাকথাকোষ" নামক সন্দর্ভে সমন্ত ভদ্রস্বামীর চরিতকথা স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। তাহার সময় বিক্রম সম্বতের ১২৫ শকাব্দ বলিয়া প্রাচীন আচার্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে "আপ্তমীমাংসা" পুস্তকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। উদয়পুর ও জয়পুরের জৈনপুস্তকালয়ে "গন্ধহস্তি মহাভাষ্যে"র অস্তিত্ব সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়। ভট্টাকলঙ্কদেবের "অষ্টশতী" এবং শ্রীমদ্ বিদ্যানন্দী স্বামীর "অষ্টসহস্রী" এই দুই পুস্তক দার্শনিক তত্ত্ববিচারে পরিপূর্ণ। বিদ্যানন্দী স্বামী সম্বৎ ৬৮১তে বর্তমান ছিলেন। বিক্রম শতাব্দীর ছয়শত সম্বৎসরে (৬০০) অকলঙ্কদেব বিদ্যমান ছিলেন। খেত নামক নগরে তাঁহার জন্ম হয়; স্বীয় অশেষ পাণ্ডিত্য প্রভাবে ভূপতি শ্রীমৎ হিমশীতলের সভায় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

(২) সূত্রের টীকা "সর্বার্থসিদ্ধি", এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা পূজ্যপাদ স্বামী, দেবনন্দী, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, নন্দিসঙ্ঘাচার্য প্রভৃতি ইহার নামান্তর ছিল। প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণের টীকাকারগণ উপাদেয় বুদ্ধিতে বহুশ্লোক "যদাহ জিনেন্দ্রবুদ্ধিঃ" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। জিনেন্দ্রবুদ্ধির স্বতন্ত্রভাবে অপর একখানি ব্যাকরণের সন্দর্ভ মুদ্রিত হইয়াছে। সর্বার্থসিদ্ধি টীকার শ্লোকসংখ্যা ৫৫০০। (৩) তত্ত্বার্থরাজবার্তিক (রাজবার্তিকালঙ্কার) শ্রীভট্টাকলঙ্কদেব-বির'চিত, তদীয় শ্লোকসংখ্যা ১৬০০০। (৪) শ্লোক বার্ত্তিকালঙ্কার স্বামী বিদ্যানন্দী প্রণীত, তাহার শ্লোক পরিমাণ ১৮০০। এই গ্রন্থখানি দুইখণ্ডে পরিষ্কারভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। (৫) তত্ত্বার্থসূত্রের "শ্রুতসাগরী" টীকা, শ্রীমৎ শ্রুতসাগর সূরি বিরচিত, তদীয় শ্লোক পরিমাণ ৮০০০ হাজার। এই শ্রুত সাগর সূরি, সোমদেব সূরি বিরচিত "যশস্তিলক" মহাকাব্যের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই মহাকাব্য বোম্বে মুদ্রিত

হইয়াছে। ইহার "যশস্তিলকচন্দ্রিকা" বিশেষ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বিরচনের সময় সম্বৎ ১৫৫০। (৬) তত্ত্বার্থাধি গমসূত্রের "সুখবোধিনী" টীকা (ইহা নব্য শ্রুত সাগর পণ্ডিত কর্তৃক বিরচিত ?) ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় (৭০০০) সাত হাজার। ভাস্করনন্দ সূরি মতান্তরে ইহার প্রণেতা, গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকদ্বারা বোধহয় অনন্তনাথ শর্মাই (বঙ্গীয়) সুখবোধিনীর কর্তা। এই টীকার সুখবোধা ও সুখবোধিনী টীকায় দুই নামের উল্লেখ আছে। (৭) তত্ত্বার্থ টীকা বিবুধ সেনাচার্য বিরচিত ইহার শ্লোক পরিমাণ ৩২৫০। ইহার বিশেষ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় নাই। (৮) তত্ত্বার্থ প্রকাশিকা টীকা, শ্রীমদ্ যোগীন্দ্র দেব কর্তৃক রচিত। এই টীকার বিবরণ এখনও প্রাপ্ত হয় নাই।

৯) তত্ত্বার্থবৃত্তি, শ্রীযোগদেবগৃহাচার্য প্রণীত, ইহার কোনরূপ ইতিবৃত্ত প্রকাশ পায় নাই। (১০) তত্ত্বার্থ টীকা, শ্রীলক্ষ্মীদেবগৃহাচার্য কৃত, এখনও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হয় নাই। (১১) তাৎপর্যতত্ত্বার্থ টীকা, অভয়নন্দি-সূরিবিরচিত। ইহার পূর্বে অভয়নন্দিসূরি নামে আরও দুইজন আচার্য জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তৃতীয় অভয়নন্দী। (১২) তত্ত্বার্থসূত্র-ব্যাখ্যান, ইহা কর্ণাটদেশীয় ভাষায় রচিত। গ্রন্থকর্তা শ্রীলক্ষ্মী সেন ভট্টারক। আচার্য অভয়নন্দির সময়, সম্বৎ ৭৭৫ শাকে তিনি বিদ্যমান ছিলেন; ইঁহার প্রণীত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের "বৃহদ্‌বৃত্তি" সুপ্রসিদ্ধ ও মুদ্রিত।

এখন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অভিমত ভাষ্যকার ও টীকাকারাদির নাম উল্লিখিত হইতেছে।

(ক) গন্ধহস্তি মহাভাষ্যকার,—সিদ্ধসেন দিবাকর, ইহার জন্ম দক্ষিণাপথের প্রতিষ্ঠানপুর নামক নগরে। মহাবীর সম্বতের ৫০০ শতবর্ষে তাহার সমাধি লাভ হয়। ইহার প্রণীত "দ্বাত্রিংশতশতিকা"। "একবিংশতি গুণস্থানপ্রকরণ" "শাশ্বতজিন স্তুতি"। "কল্যাণমন্দির স্তোত্র" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই বিষয়ে মহাপুরাণের লেখানুসারে "কবয়ঃ সিদ্ধসেনাদিঃ" বুঝিতে পারা যায় যে অপর একজন কবি ছিলেন।

(খ) সূত্রের সিদ্ধসেন গণিবিরচিত টীকা, ইহার শ্লোক সংখ্যা ১৮২৮২। এই বিষয়ে উক্তি এইরূপ,—

"অষ্টাদশ সহস্রাণি দ্বেশতে চ তথাপরে।
অশীতিরধিকাদ্বাভ্যাং টীকায়াঃ শ্লোকসংগ্রহঃ॥"

এই বিষয়ে অপর কোন পণ্ডিত বলেন যে, 'হরিভদ্রসূরি' এই টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার শরীর পরিহারের পর তদীয় শ্রেষ্ঠ শিষ্য যশোভদ্র সূরি অবশিষ্ট টীকা রচনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যান।

হরিভদ্র সূরি-রচিত "ষট্‌দর্শন সমুচ্চয়" নামক (জৈনমতে) ছয়খানি দর্শনের সার সংগ্রহরূপ পুস্তক সুধী সমাজে অতিশয় উপাদেয়। ইহার টীকা সূরিবর-গুণরত্ন প্রণীত বহুতত্ত্ব গবেষণাপূর্ণ। অপর একখানি টীকা মণিভদ্রদেব সূরি-বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে।

(গ) তত্ত্বার্থ টীকা, এই টীকা প্রণেতা উক্ত হরিভদ্রসূরিবর্য্য। ইহার শ্লোকপরিমাণ ১১০০ হাজার।

(ঘ) তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রের ভাষ্যকার উমাস্বাতিবাচক, এই ভাষ্যকার বাচকদিগম্বর সম্প্রদায়ের পট্টাবলী (প্রাচীন আচার্যগণের পুরাবৃত্ত লেখা) অনুসারে বিক্রমার্ক-সম্বতের ১০১ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নন্দিসঙ্ঘের আচার্যপদে একচত্বারিংশদ্ ৪১ বৎসরে ধর্মের উপদেষ্টারূপে সমাসীন ছিলেন। ভগবান্ মহাবীর তীর্থঙ্করের মহানির্বাণ সময়, বিক্রমাদিত্য শকাব্দের ৬০৫ বৎসর পূর্বে উভয় জৈন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায় অনুযায়ী অবধারিত। তাহার পর আচার্য (ধর্মগুরু) পরম্পরাক্রম নির্দিষ্টপট্টাবলীর নিয়মে এইরূপ লিখিত হইল। বিক্রমার্ক সম্বৎ ও শালিবাহন ভূপাল শকাব্দ বিষয়ে জৈনাচার্যগণের মধ্যে মত ভেদ এখনও বর্তমান আছে। জৈনাচার্যগণের কালনিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁহারা প্রায় বিক্রমার্ক সম্বতের অনুসরণ করিয়াছেন। চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের (২৪ ধর্মে অবতার) বিষয় পরে বলিতে ইচ্ছা রহিল। বিক্রমার্ক সম্বতের পূর্বে যাহারা ধর্মাচার্যপদে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের নাম এই স্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত মনে করি (১) কেবলী সাধু গোতম স্বামী (ক) সুধর্মাস্বামী (খ) জম্বূস্বামী (গ) শ্রুতকেবলী—বিষ্ণুকুমার (ক) নন্দিমিত্র (খ) অপরাজিত (গ) গোবর্দ্ধন (ঘ) ভদ্রবাহু। (ঙ)

(৩) একাদশ অঙ্গ এবং দশপূর্বপাঠী (আচার্যগণের বিভাগ অনুসারে উপাধি) (ক) বিশাখাচার্য (খ) নক্ষত্রাচার্য (গ) নাগসেনাচার্য (ঘ) জয় সেনাচার্য (ঙ) সিদ্ধার্থাচার্য (চ) ধৃতি সেনাচার্য (ছ) বিজয়াচার্য (জ) বুদ্ধিলিঙ্গাচার্য (ঝ) দেবাচার্য (ঞ) ধর্ম্মসেনাচার্য।

একাদশ (১১) অঙ্গের পাটী দ্বিতীয় নক্ষত্রাচার্য (ক) জয়পালাচার্য (খ) পাণ্ডবাচার্য (গ) কংসাচার্য (ঘ)।

দশাঙ্গ—সুভদ্রাচার্য। নবাঙ্গ—যশোভদ্রাচার্য, বিক্রমাব্দের পরে যাহারা আচার্য অঙ্গ স্থানীয় তাহাদের নামও উল্লিখিত হইতেছে। (ক) আট অঙ্গ পাটী, দ্বিতীয় ভদ্রবাহু আচার্য, ইনি বিক্রমার্ক শকাব্দের চৈত্র শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে আচার্যের আসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। সপ্তাঙ্গপাটী—লোহাচার্য, ইহার সময়ে কাষ্ঠ সঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। একাঙ্গপাটী, অর্হদবলি (ক) মাঘনন্দি (খ) ধরসেন (গ) পুষ্পদন্ত (ঘ) ভূতবলি (ঙ)। এই আচার্যভূতবলির পরে অঙ্গজ্ঞানের (রীতি) বিচ্ছেদ হইয়াছিল। তাহার পর বিক্রম শকের ২৬ বৎসরে ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে গুপ্তিগুপ্তাচার্য; উক্ত শকের ৩৬ বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষে মাঘনন্দী, এবং ৪০ বিক্রম শকের ফাল্গুন মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে দিন চন্দ্রাচার্য; বিক্রমার্কশকের ৩৯ বৎসরে পৌষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে জৈন বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণেতা আচার্য ক্রমানুসারে শ্রীমৎ কুন্দাচার্য, আচার্য পদে আরোহণ করেন। ইহারই শিষ্য ভাষ্যকার সুখ্যাত শ্রীমৎ উমাস্বামী, বিক্রম সম্বতের ১০১ অব্দেতে আচার্যপদে বৃত হইয়াছিলেন ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রের যে সকল পণ্ডিতগণ হিন্দী ভাষ্য ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন তাহাদেরও নামাদি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—

(ক) সর্বার্থসিদ্ধি টীকার ভাষানুবাদক পণ্ডিত জয়চন্দ্রজী, ইহার শ্লোক সংখ্যা— ১০০০০
(খ) অর্থপ্রকাশিকা, পণ্ডিত সদাসুখদাসজী বিরচিত　,,　,,　১০৮৩২
(খ) রাজবার্তিকভাষা, ,,　ফতেহলালজী প্রণীত ইহাব শ্লোক অজ্ঞাত।
(ঘ) সূত্রদশাধ্যায়　,,　টেকচন্দ্রজী বিরচিত (শ্রুত সাগরী টীকার অনুসার) শ্লোক সংখ্যা অজ্ঞাত।
(ঙ) ,, বচনিকা ,, জয়বন্তজী রচিত। ইহাব শ্লোক সংখ্যা ৪২৭০।
(চ) ,, ,, ,, শিবচন্দ্রজী। ইহাব শ্লোক সংখ্যা ৪০০০০।
(ছ) ,, ,, ,, সদাসুখজী [২। শ্লোক সংখ্যা ১৯০০
(জ) ,, ,, ,, ফতেহলালজী [২য়] ,, অজ্ঞাত
(ঝ) ,, ,, ,, দেবীদাস জী ,, ,,
(ঞ) ,, ,, ,, মকন্দজী ,, ,,
(ট) ,, ,, ,, প্রভাচন্দ্রজী ,, ,,
(ঠ) ,, ,, ,, বহাবব ৭৩০লাল জী ,, ,,
(ড) ,, ,, ,, "ছন্দোবদ্ধ", হীরালালজী ,, ,,
(ঢ) ,, ,, ,, ছোটেলালজী ,, ,,
(ণ) ,, ,, ,, বিধিচন্দ্র জী [বুধ জন] ,, ,,

তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র বা জৈন দর্শনের বর্তমান সময়ে এই পনের খানি ভাষা টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব প্রবন্ধে তত্ত্বার্থ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি। সংপ্রতি এই প্রবন্ধ এখানেই শেষ হইল।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মার্কিণ গ্রন্থাগার

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি.এল্.

ব্যবসা, বাণিজ্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে আমেরিকা আজ যে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়েও মার্কিণ দেশ আজ জগতের মধ্যে অগ্রণী এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই আন্দোলন মার্কিণ দেশে যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া জগতের লোক বিস্মিত হইয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হয় এবং তাহার পর হইতে প্রতিবৎসর গ্রন্থাগারসম্মিলনী আহ্বান করিয়া এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নানাবিধ সাহিত্য ও তথ্যাদি প্রকাশের দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা ও গ্রন্থগারিকগণের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি প্রচার করিয়া আসিতেছে।

আমেরিকায় যে সমস্ত বদান্য ও দেশহিতৈষী ধনকুবের গ্রন্থাগার-প্রসারের কার্যে অর্থদান করিয়াছেন, এণ্ড্রু কার্ণেগী ও রাসেলের নাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহারা স্বদেশে, শুধু স্বদেশে কেন, পৃথিবীর সর্বত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তহস্তে কোটী কোটী টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। আমেরিকায় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাঁহারা সাধারণ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বড বড় গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সমস্ত পাঠাগারের পরিচালনার জন্য সাধারণ 'ট্রাস্টফাণ্ড' করিয়া গিয়াছেন। দানশীল ধনকুবের রকফেলারের নামানুসারে যে "রকফেলার ফাউণ্ডেসন" আছে তাহার দ্বারাও এই বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ কার্য সংঘটিত হইয়াছে।

আমেরিকায় বর্তমানে* তিন সহস্রাধিক সাধারণ পাঠাগার আছে। গ্রন্থাগারিকের শিক্ষাদানের জন্য সেখানে নিয়মিত বিদ্যালয় আছে এবং মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও গ্রন্থাগারিকগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। সেখানে গ্রন্থাগারিকগণ গ্রন্থসমূহের পরিরক্ষকমাত্র নহে, তাহারা এখন পাঠকবর্গকে পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে নানারূপ চিন্তাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া থাকে। মার্কিণের বৃহত্তম পাঠাগার ওয়াশিংটনস্থিত কংগ্রেস পাঠাগার। তাহাতে বর্তমানে* ৪১ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও ১০ লক্ষাধিক হস্তলিখিত পুস্তকের সমাবেশ আছে।

মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রের পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহে গ্রন্থাগার আন্দোলন যেরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে অন্য কোন দেশে সেরূপ সম্ভবপর হয় না। আমেরিকায় এক বিশেষ আইনের বলে সেখানকার পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে করনির্ধারণযোগ্য এক পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তির উপর এক পেনি গ্রন্থাগার-কর ধার্য করিবার কর্তৃত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বোষ্টন প্রভৃতি সহরে যে বড় বড় গ্রন্থাগার আছে তাহা এক

---

* এই Statistics ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে গৃহীত।

একটী দেখিবার জিনিস। সে সমস্ত গ্রন্থাগারে অমূল্য অমূল্য পুস্তকরাজির সমাবেশ। বোষ্টন সহরে যে কেন্দ্রীয় পাঠাগার আছে তাহা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। এই পাঠাগারের গৃহটী কারুকার্য ও শিল্পচাতুর্য্যের একটী নিদর্শন বলা যায়। ওয়াশিংটনের জাতীয় কংগ্রেস পাঠাগারের গৃহনির্মাণের জন্য দুই কোটীর ও অধিক ডলার ব্যয়িত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় আমেরিকায় প্রথম গ্রন্থাগার-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৮৩-৮৪ সালে বাফালো (Buffalo) সহরে আমেরিকান গ্রন্থাগার পরিষদের অধিবেশন হয়। উক্ত পরিষদে স্কুলে, কলেজে লাইব্রেরী পরিচালনা শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য একটী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। শীঘ্রই কতকগুলি গ্রন্থাগার-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০০ হইতে ১৯২৫ এর মধ্যে প্রায় ১৩টী নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে "লাইব্রেরীয়ানসিপ ফ্যাকালটী" গঠনের বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং শীঘ্র একটী লাইব্রেরীয়ানসিপ বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীয়ানসিপের প্রাথমিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

লাইব্রেরী আন্দোলনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য আমেরিকায় মোটামুটি নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অনুষ্ঠিত হয়:—

(১) একটী বোর্ড গঠিত হয়; যে বোর্ডের সাহায্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে Mr. W. W. Charters এর সুদক্ষ পরিচালনায় গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যার পাঠ্যবিষয়গুলি নির্দ্ধারিত হয়।

(২) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানগণের শিক্ষাদানের জন্য নিদাঘ বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তন হয়।

(৩) লাইব্রেরী তহবিল গঠনের জন্য দেশের বদান্য লোকদিগকে অনুরোধ করা হয় ও তাঁহাদিগের এই বিষয়ে সম্মতি অর্জন করা হয়।

(৪) অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানসিপের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

(৫) উপরি উক্ত কার্য্যগুলির সুব্যবস্থার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়:—

(ক) Association of American Library schools.
(খ) The A. L. A. Professional Training Section.
(গ) Pratt Institite School of Library Science.
(ঘ) Drexel Institute School of Library Science.
(ঙ) University of Illinois Library School.
(চ) Syracuse University Library School.

গ্রন্থাগারের সাহায্যে দেশে শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে American Library Association এর কার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশে গণশিক্ষা বিস্তারবিষয়ে সাধারণ পাঠাগার যে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে ইহার প্রমাণ মার্কিণযুক্তরাষ্ট্রে লাইব্রেরী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আমাদের কথা

বর্তমান সংখ্যার সহিত "মহানির্বাণতন্ত্র" এবং আরও ২।১টী প্রবন্ধ যাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল তাহা সমাপ্ত হইল। ইহা স্থির করা হইয়াছে যে, যে সমস্ত বিষয় পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে (যেমন বর্তমানে 'শুক্রনীতি'র বঙ্গানুবাদ) তদ্ব্যতীত অন্ত কোন প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইলে তাহাকে ক্রমিক সংখ্যারূপে (যেমন ১, ২) স্বসম্পূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষযে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত করা হইবে। আমরা আমাদের সহৃদয় লেখকবর্গের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

ইহা আরও স্থির করা হইয়াছে যে শ্রীভারতী প্রকাশের একটী নির্দিষ্ট দিন থাকিবে। ২।১টী দিন অবশ্য নির্দিষ্ট আছে, যেমন ১ম সংখ্যা (ভাদ্র) জন্মাষ্টমী দিবসে ও মাঘ-সংখ্যা শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা দিবসে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংখ্যা প্রতিমাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইবে। যদি গ্রাহকবর্গ ইহার প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে কোন সংখ্যা না পান তবে অনুগ্রহপূর্বক কার্যালয়ে জানাইবেন। বর্তমান পরিস্থিতি-নিবন্ধন কাগজ যথাসময়ে পাওয়া যাইতেছে না সেজন্য হয়ত ২।৪ দিন সময়ের তারতম্য হইতে পারে। এই নিয়মানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা অদ্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইল।

* * * *

আমরা সুখী হইলাম যে 'ভারতী মহাবিদ্যালয়' গত দশহরাতিথিতে ইহার অন্তর্গত একটি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের (Schools) উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকশিক্ষা ব্যতীত অনেক নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে যেমন—মণ্টেসরি, ওয়ার্ধা প্রণালী ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ধর্ম ও নীতি, স্বাস্থ্য, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত করা হইবে এবং বালকদিগের জন্য বিবিধ শিল্প (Small Industries) ও বালিকাদিগের জন্য চারুশিল্প (Fine Arts) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও থাকিবে। শিক্ষাব্রতী বিশেষজ্ঞগণ এই স্কুলগুলির পাঠ্যপ্রণালী ও নিয়ম (Prospectus) স্থির করিতেছেন। আমরা এই সব পুস্তিকা পাইলে এবিষয়ে বিস্তারিতভাবে আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিব।

যুদ্ধনিবন্ধন বর্তমানসময়ে যখন গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশানুযায়ী কলিকাতাস্থ অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকার্য বন্ধপ্রায় হইয়াছে, তখন এই নূতন প্রচেষ্টাগুলি যাহাতে বিশেষ ফলবতী হয় তাহার জন্য আমরা শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর প্রত্যেককেই এই কার্যে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করি।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইএ যাইয়া দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য ৪লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ৮দিনে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে তাঁহার তিরোধান অবধি আজ পর্যন্ত মাত্র ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল। যাহাতে বিশ্বভারতী কর্তৃক এই টাকা বিশ্বভারতীর প্রকৃত গঠনমূলক কার্যে ব্যয়িত হইয়া দীনবন্ধুর প্রকৃত স্মৃতিরক্ষা করা হয় তাহা কামনা করি।

পুস্তক সমালোচনা

ভারতের দেব-দেউল—শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪৪।

ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন যুগের প্রাচীন দেবায়তনকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ ও সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। যে-ধর্ম ত্যাগের সাধনায় মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে সে-ধর্মের প্রেরণা ভারতবাসীর ভক্তিভাবিত চিত্তে এই শিক্ষা দিয়াছে যে কি ভাবে নিজ সম্পদ্ রাশি দেবারাধনায় ও দেব-দেউলের সৌষ্ঠব সম্পাদনে নিয়োজিত করা যায়। শিল্পীভক্ত তাহার বহুসাধনার ধ্যান মুর্তিমান্ করিয়া পরমারাধ্য দেবনিকেতনকে অপূর্ব শ্রী ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই ত্যাগনিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের বাটালির আঁচড়ে ও রঙের তুলিকাপাতে কত দেব-দেউল উৎকীর্ণ শোভামহিমায় ও চিত্রিত দীপ্তিচ্ছটায় জাতীয় জীবনে শিক্ষা, ধর্ম ও সভ্যতার আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছে। ভাবমুগ্ধ কলানুরাগী সাহিত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বর্তমান গ্রন্থখানিতে ভারতের সেই সকল দেব-দেউলের বিমোহন চিত্র সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় এরূপ গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচার থাকিলেও বঙ্গভাষায় ইহার সংখ্যা খুবই কম। অতএব গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টায় পাঠকসমাজ বিশেষ আনন্দলাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার বাঙ্গালার ছাত্র ও ছাত্রীসমাজের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থখানিতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন একথা তিনি তাঁহার প্রস্তাবনায় স্বীকার করিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। কাজেই ভারতের দেব-দেউল সংক্রান্ত বিপুল শিল্পৈশ্বর্যের বহুমুখী তথ্যের আলোচনা ইহাতে দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে স্থলবিশেষে প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যার দিগ্‌দর্শন বা আভাস প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে প্রত্নতত্ত্বের জটিল সমস্যা ও সন্দেহবাদ দূর হয় না। সম্ভবতঃ পুরাতত্ত্বের সন্দেহজাল বিস্তৃতির দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়, তাই যাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সমস্যাভার পীড়িত না হয়—বরং একের পর এক একটী দেব-দেউল শিল্পসৌন্দর্যে পাঠকের ভাবুক মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ইহাই বর্তমান গ্রন্থখানির লক্ষ্য কেন্দ্র। ইহাতে সুধী গবেষকের অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্ত হয় না সত্য, কিন্তু সহৃদয় পাঠকের আনন্দবৃত্তি যে স্ফূর্তি লাভ করে ও সাধারণ নরনারীর চিত্তে রসপ্রচুর আনন্দ পরিবেশনের সুযোগ লাভ হয়—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বয়ং গ্রন্থকার স্পষ্টই বলিয়াছেন—সাধারণ নরনারীর, বিশেষতঃ ছাত্র ও ছাত্রীগণের চিত্তে যাহাতে এইসব স্থান ও শিল্পসম্পদ্

দেখিবার আগ্রহ জন্মায় তাহার জন্যই এই পুস্তক রচিত হইল। সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা এই পুস্তক পাঠে হয় ত মিটিবে না।"

গ্রন্থখানিতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শিল্পীর স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রণ নৈপুণ্যের সংক্ষিপ্ত অথচ সুসমঞ্জস বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইলোরার কৈলাস মন্দিরে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রশোভা—উহার গুহাকন্দরে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন—এই তিন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট বিভিন্ন ভাবধারার প্রানবন্ত সমাবেশ—সৌন্দর্যের রসানুভূতিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। খাজুরাহোর জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব দেবদেউলগুলির শিল্পনিদর্শন একই ধারায় গঠিত বলিয়া মনে হয়। ধর্মের একাত্মতার অনুভূতির কাছে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বুঝি চির অবলুপ্ত। সাধক শিল্পী ধর্মের উদার দৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন, তাই "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এই একাত্মতার ধ্যান একটী বিশিষ্ট শিল্পসত্তায় রূপভেদের মধ্য দিয়াও অক্ষুন্ন গরিমায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভেড়াঘাট জব্বলপুরে চৌষট্টি যোগিনী ও হরপার্বতীর মন্দির বৃত্তান্ত পাঠে যেরূপ মহাশক্তি কালীর শক্তি সাধনার প্রেরণা অন্তরে বিকাশলাভ করে, তেমনি ভীলসার বাসুদেব মন্দিরের রমণীয় শোভা পাঠকের চিত্তমুকুরে আনন্দরস ঘন পরম মধুর রূপ প্রতিফলিত করে। হিন্দু ও বৌদ্ধগণের পরমমোক্ষস্থান গয়াক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি। গ্রন্থকার সংক্ষেপে ইহার যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন তাহা অনেক তথ্যের উপর আলোকসম্পাত করে। সাঁচী, ভীলসা, ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ বৌদ্ধস্তূপের যে-শিল্পকলার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে পাঠকচিত্ত পুলক ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়। বৈষ্ণব ভক্তগণের পরমকাম্য বৃন্দাবন স্থলীর মন্দির শোভা, শৈবতীর্থ ভুবনেশ্বরের মন্দির, কোণারকের সূর্যমন্দির, কাশ্মীরের মার্তণ্ডমন্দির, মহাবলিপুরমের পঞ্চপাণ্ডবের রথ, মাদুরার মীনাক্ষীদেবীর মন্দির, মাউণ্ট্ আবুর জৈনশিল্প শোভিত মর্মর প্রস্তর ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রতীক সর্ববৃহৎ শ্রীরঙ্গম্ মন্দির—ইত্যাদি বহুবিধ দেবদেউলের এক একটী নিখুঁত মনোমুগ্ধকর চিত্রের সমাবেশ বর্তমান গ্রন্থখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়াছে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য এই যে বাঙ্গলা দেশের নিজস্ব শিল্প প্রতিভার বিবরণ প্রকাশে গ্রন্থকার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নদীমাতৃক বর্ষাপীড়িত বাঙ্গালাদেশে শিল্পনৈপুণ্য প্রধানতঃ চিত্রাঙ্কণেই নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু পাল ও সেন রাজত্বকালের স্থাপত্য শিল্প আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহার নিজস্ব শিল্পসম্পদ্ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের পঞ্চরত্নশিখর বা চারি চালা বা আটচালা বিশিষ্ট রথাকৃতি ছাদনির্মাণ কৌশল পৃথিবীর সর্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। ফরিদপুরের মথুরাপুর দেউলের গাত্রে শোভিত টেরাকোটা বা পোড়া ইষ্টকের মূর্তি ও চিত্রাবলী একাধারে তেজঃ, গরিমা ও সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের অভিব্যঞ্জক। দিনাজপুরের কান্ত নগরের নবরত্ন শিখর কান্তজীর মন্দিরের চিত্তাকর্ষক কারুকার্যে বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের নিখুঁত শ্রী মূর্তিমতী হইয়া শোভা পায়। এই সকল বৃত্তান্ত পাঠে বাঙ্গালীর চিত্ত অবশ্যই আনন্দ ও গৌরবলাভ করিবে সন্দেহ নাই।

৬

বর্তমান গ্রন্থখানিতে কয়েকটী দেব-দেউলের মনোরথ চিত্রের সমাবেশ থাকায় ইহা বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ছাপা খুবই সুন্দর—বিষয়সূচী ও নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক গ্রন্থসূচীর সমাবেশ থাকায় ইহার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ইংরেজী লেখকদের বহুমত উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু প্রায়ই উহার বঙ্গানুবাদ দেন নাই। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সেই সকল মতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলে আরও সৌষ্ঠব হইত বলিয়া মনে করি। যাহা হউক গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস ও আশা পোষণ করি।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। নির্বাণ—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

২। সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী।

৩। জ্ঞানদাস রচিত যশোদার বাৎসল্য লীলা—শ্রীসুকুমার ভট্টচার্য, এম.এ. সম্পাদিত। কলিকাতা।

৪। মৃত্যুর পরে ও পুনর্জন্মবাদ—শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত। বেনারস সিটি।

৫। শ্রীশ্রীশুকদেব কথামৃত—প্রথম ভাগ। শ্রীকালীপদ বিশ্বাস কতৃক সংকলিত। কলিকাতা।

৬। শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র শব্দানুশাসনম্—মুনি হিমাংশুবিজয় ন্যায়সাহিত্য কর্তৃক সম্পাদিত। আমেদাবাদ।

৭। The Hamsa-Duta of Vamana Bhatta Bana: Edited by By Jatindra Bimal Chaudhuri Ph.D.

৮। Wittgensteinian Philosophy: By Mr. G. N. Mathrani. B. A. etc. সিন্ধু।

সাময়িক সাহিত্য—বৈশাখ, ১৩৪৯

ধর্ম ও দর্শন

উদ্বোধন—অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

ব্রহ্মবিদ্যা—অনৃত্য ও ঋত জগৎ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

„ —সাধন-পথ—শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়।

„ —সাধনা ও সেবা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস।

ভারতবর্ষ—ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মসাধনা—শ্রীসরোজকুমার দাস, এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি।

„ —আচার্য পূজাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান—শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ।

ইতিহাস

„ —অজাত শত্রুর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ—স্বামী সুন্দরানন্দ।

„ —রক্ষ, ভাটি এবং বঙ্গাল দেশ—ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্-ডি।

উদ্বোধন—রবীন্দ্রনাথ ও সমাজতত্ত্ব—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল।

„ —তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্যে বাঙ্গালীর অবদান—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, পি-এইচ্-ডি, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ।

সাহিত্য

উদ্বোধন—বাংলা শিশু-সাহিত্য—শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এ, বি-টি।

ভারতবর্ষ—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিতে বাঙ্গালীর দান—শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, এম.এ।

—রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এইচ্-ডি।

প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ইংরেজী প্রবাদ-বাক্য ও তাহাদের তাৎপর্য—অধ্যাপক শ্রীশশীমোহন চক্রবর্তী, এম্-এ।

ফরহাদ খাঁর সেতুর শিলালিপি—শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

প্রাচীন কামরূপের শাসননীতি—শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই।

মনসা-মঙ্গলের কয়েকখানি মুদ্রিত সংস্করণ—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এম্.এ।

৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

গোপীচন্দ্রের পাঁচালীর কয়েকটী শব্দ—শ্রীরাজমোহন নাথ, বি ই।

শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র—অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, এম্-এ।

পুরাতন পত্রিকা

নবজীবন

১২৯৩ সাল

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ সংকলিত।

ভাদ্র—দিল্লী—লেখক দিল্লীর একটী প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠির ও চন্দ্রগুপ্তের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রবন্ধকারের মতে শকাব্দারম্ভ কালে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের পর ২৫২৬ বৎসর গত হইয়াছিল। লেখক আরও বলিয়াছেন যে জেনারেল কানিঙহামের মতে যে চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক্‌গ্রন্থোক্ত 'সান্দ্রকোটম্‌' এক ব্যক্তি তাহা ভ্রম। তাহার মতে খ্রী° পূ° ১২৪৩ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যলাভ করেন গ্রীক গ্রন্থ বর্ণিত 'সান্দ্রকোটম্‌' পরবর্তী কোন অনার্য রাজা হওয়া সম্ভব। প্রবন্ধটী যুক্তিপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

ফাল্গুন—জয়দেব—গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব গোস্বামীর রাগমার্গের অপূর্ব বিশ্লেষণ—প্রবন্ধটী অতিসুন্দর।

চৈত্র—প্রাচীন ভারত—প্রাচীন ভারতীয় ভূগোল ও ধর্মমত সম্বন্ধীয় আলোচনা। মিসরীয় ও ভারতীয় মতের ঐক্য। বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্যাপিরাসের লিপিতে এমন অনেক কথা আছে যাহার হুবহু উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রবন্ধকার স্থির করেছেন যে প্রাচীন মিসরীয় ধর্মমত ভারতীয় ধর্মমতের নিকট অনেকাংশে ঋণী।

চৈত্র—জয়দেব—গীত গোবিন্দ মহাকাব্যের অপূর্ব সমালোচনা।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ—বাংলার শেঠ বংশ—জগৎ শেঠের বাংলার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

জ্যৈষ্ঠ—রুচি ও রস—তথাকথিত সুরুচি কাব্যে কিরূপে রসের পরিপন্থী হইতে পারে তদ্বিষয়ক আলোচনা।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—কপালকুণ্ডলার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা।

সাময়িক সংবাদ

বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সার যদুনাথ সরকার ও ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই নূতন ইতিহাস সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাস তিনখণ্ডে সমাপ্ত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইসচেন্সেলর—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার শীঘ্রই ভাইসচেন্সেলর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। আমরা নূতন ভাইসচেন্সেলরকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

শোক সংবাদ

রমাপ্রসাদ চন্দ—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় এলাহাবাদে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। রাজসাহীতে বাস করার সময় তিনি স্বর্গত সুধী অক্ষয় কুমার মৈত্র ও দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায় মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠন ও বিস্তারে রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিটেণ্ডেণ্ট হইয়া ১২ বৎসর পূর্বে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তিনি বহু প্রামাণ্য-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যোগ দান করিয়াছিলেন। চন্দ মহাশয়ের মৃত্যুতে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।

सद्दृष्टिज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमार्गः सनातनः।
आविरासीद्‌ यतोवन्दे तमहं वीरमच्युतम्॥ १॥

टीका। सदिति। सद्दृष्टिः सम्यग्दर्शनम्, एवं ज्ञानपदेन सूत्रोक्तं सम्यग् ज्ञानम्। वृत्तपदेन सम्यक् चारित्रम्। अत्र सत्‌शब्देन सम्यग् बोधकेन प्रत्येकं सम्बध्यते। तदव्यवहितपर सूत्रे स्फुटी भविष्यति। एतत्त्रितयं आत्मा स्वरूपं यस्य सः। तस्मादत्र भुवने सनातनः शाश्वतः। मोक्षमार्गः कैवल्य पन्था येनाविष्कृतः तमच्युतं अविनश्वरं वीरं जिनदेवम्। वन्दे नमस्करोमीति। यस्मात् सम्यज्ज्ञानादिकं प्रादुरभूत् तं देवं प्रणमामीतिभावः। वीरमिति। विशेषेण ईरयति लोकमानसे शान्त्युद्रेकं सम्यज् ज्ञानञ्च जनयति इति वीरः। जयति रागादीन् सर्वान् यः स जिनः। "जिनोऽर्हति बुद्धे च पुंसिस्याज्जित्वरेत्रिषु" इति कोषः। जिनदेवोपदेशज्ञापकं दर्शनं जैनदर्शनम्। दृश्यते ज्ञायते येन तद्दर्शन मिति दृशे र्ज्ञानार्थतेति॥ क॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় মোক্ষমার্গ। যাহার উপদেশ দ্বারা সনাতন মোক্ষপথের দর্শন সমাজে আবির্ভূত হইয়াছে তিনিই অমর বিশ্বপ্রভু, সকল সদ্‌গুণাধার অবিনশ্বর সেই জিন দেবকে গ্রন্থের প্রারম্ভে নমস্কার। এক সময়ে অবতীর্ণ হইয়া বীর প্রভু সম্যক্ জ্ঞান প্রভৃতির উপদেশ দ্বারা মানবের কল্যাণ ও নির্বাণের নিমিত্ত যাহা প্রচার করিয়াছিলেন সে সকল তত্ত্ব পুনঃ প্রচার করিবার প্রয়োজন হয়, যেহেতু প্রচারিত তত্ত্ব সকল কালের প্রভাবে সমাজ মধ্যে লোকের অনাদরেও লুপ্ত হইয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাচীন জিন দেবের উপদিষ্ট, তদনুসারে প্রভাচন্দ্রাচার্য ও বর্ণনা করিয়াছেন॥ ক॥

सूत्रारम्भः

सम्यग्दर्शनावगमवृत्तानि मोक्षहेतुः॥ १॥ *

टीका। सम्यगिति। सम्यग् दर्शनं, सम्यज्ज्ञानं, सम्यक् चारित्रम्। सम्मिलितमेतत्त्रितयं मोक्षसाधनमित्यर्थः। अत्रावगमवृत्तपदाभ्यां ज्ञानचारित्रयोर्ग्रहणं भवति।

* सभाष्यतत्वार्थाधिगम सूत्रपाठएवमेव दृश्यते। "सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः॥" इति अः १, सूत्र १। अनयोः सूत्रयोरेकार्थता।

नन्वत्र प्रत्येकं मोक्षहेतुः। मोक्षो जीवस्य नित्यं कर्म्मबन्धरहितस्य अलोकाकाशगमनम्। चरमनिवृ त्तिर्वा। त्रिषु मध्ये एकस्याभावे अन्यद्द्वयं नैवमोक्ष-साधनं भवति। त्रिषुमध्ये पूर्व्वस्यलाभेऽवश्यमपरलाभः। उत्तरलब्धौ नियत-म्पूर्वलाभः। समञ्चतीति सम्यक्। अयं शब्दः निपातोवा। सङ्गतं प्रशस्तं वा दर्शनं सम्यगदर्शनम्। अनयोर्ज्ञानचरित्रयोरपि प्रशस्तत्वमीदृग्बोध्यम्। अन्यदग्रे वक्ष्यते ॥ १ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চারিত্র এই তিনটি সম্মিলিতভাবে মোক্ষের কারণ রূপে কীর্তিত আছে। উমাস্বাতি আচার্যের সভাষ্য সূত্র পাঠ অন্য প্রকার, যথা,—"সম্যক্দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ"। 'জ্ঞান'পদের স্থানে 'অবগম' পদ এবং 'চারিত্র' এই পাঠের স্থলে 'বৃত্ত' এই পদটি সূত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু উভয় সূত্রস্থ পদ বিভিন্ন হইলেও একার্থের বোধক। সূত্রের অর্থ উক্ত ভাষ্যে এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধিনামক টীকাতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। সভাষ্য সূত্রের টীকা সমূহ এবং ভাষ্যের বিবরণ এই সূত্র গ্রন্থ সমাপ্তির পর পরিব্যক্ত হইবে ॥ ১ ॥

* সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে পাঠ এইরূপ সম্যগ্‌দর্শন জ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ।" ইতি অঃ ১, সূঃ ১।

जीवादि सप्ततत्त्वम् ॥ २ ॥

टीका। जीवादिति। अत्रादिपदात् अजीवादयः षड्ज्ञेयाः। तथाहि जीवाजीवाश्रव-सम्बर-निर्जर-बन्धमोक्षाः। एतानि जीवादयः सप्ततत्त्वानि सप्तपदार्था-इत्यर्थः। जैनागमेतु एतेषां सप्तविधानां तत्त्वसंज्ञेति। वेदान्तदर्शने भाष्य-टीकाकृद्भिः सप्तपदार्था इत्यभानि। एवं षड्दर्शनसमुच्चयेऽन्यत् पुष्कलं वर्णित-मस्ति। सूत्रमिदं प्रथमाध्यायेऽत्र द्वितीयं स्थानं गतम्। स भाष्यतत्त्वार्थाधि-गमसूत्रेषु अत्राध्याये चतुर्थं स्थानं प्राप्तम्। तत्रैवंपाठरीतिः "जीवाजीवाश्रव-बन्धसम्बरनिर्जर-मोक्षास्तत्त्वम्"। अत्र तु आदिपदोपादानेनाजीवादीनां षण्णां संग्रहः कृतः। परमत्रार्थभेदोनास्ति। अपरेषु अष्टसहस्री प्रभृतिदर्शनसन्दर्भेषु एतेच सप्त पदार्थाः प्रसिद्धिं गताः सम्यग् विचारिताश्च। द्वितीयेऽध्याये जीवादी-नामपरं वृत्तं वक्ष्यते ॥ २ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে আদিপদ দ্বারা অজীব প্রভৃতি ষট্ পদার্থ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জর ও মোক্ষ এই সাতটী তত্ত্ব বা পদার্থ জৈনাগমে চির খ্যাত আছে। গ্রন্থকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবাদি সপ্তপদার্থের লক্ষণ বলিবেন। সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগম সূত্রে এই সূত্রটী চতুর্থ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রভাচন্দ্রাচার্যের তত্ত্বার্থ সূত্রের এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সূত্রে তত্ত্ব সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত। উমাস্বাতির সভাষ্য সূত্রে প্রত্যেক জীবাদির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ আছে। এই স্থলে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক পাঠ ভেদ নাই। সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র ॥২॥

तदर्थ श्रद्धानं सम्यगदर्शनम् ॥ ३ ॥

टीका। तदिति। तत् तेषां जीवादि सप्त पदार्थानां तत्त्वानामित्यर्थः। तेषां योऽर्थस्तस्मिन् निश्चयात्मकः यः सम्यक् श्रद्धानं अभिरुचि विशेषः। तथाहि

"रुचिर्जिनोक्ततत्त्वेषु सम्यक् श्रद्धानमुच्यते।
जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन च ॥"

एषाऽभिरुचिः स्वाभाविकी भवति अनादिसिद्धकृपातः। अथवागुरोः सकाशाल्लब्धज्ञानेन च सा भवेदिति। सैवाभिरुचिः सम्यग्दर्शननाम्नाख्याता शास्त्रेषु। सभाष्यसूत्रे पाठक्रमश्चेत्थम्। यथा तदर्थ इत्यत्र तत्त्वार्थ इति पाठोऽस्ति। परमनेननार्थ प्रभेदः स्यात्। सम्यगदर्शनमिति तत्त्वेन भावतो निश्चितमित्यर्थः। तत्त्वानां अर्थानां श्रद्धानं तत्त्वेन वा अर्थानां श्रद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानमिति। प्रचुर मन्यद्भाष्येऽस्ति ॥ ३ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত জীব, অজীব প্রভৃতি সাতটি পদার্থে যে সম্যক্ (যথার্থ) অভিরুচি নির্বিশেষ শ্রদ্ধা বা তাহাই সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ সুসঙ্গত প্রশস্ত দর্শন। সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে 'তদর্থ' স্থানে 'তত্ত্বার্থ' এইরূপ পাঠ বিদ্যমান আছে। ইহাতে সূত্রস্থ পদার্থের কোন বৈপরীত্য হয় নাই। সামান্য পাঠ ভেদ মাত্র, তদ্দ্বারা অর্থের প্রভেদ হয় নাই। ইহা সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র। শ্রীমৎ প্রভাচন্দ্রাচার্য সূত্রানুসারে 'তদর্থ' পদ দ্বারা তত্ত্বার্থ-ই বুঝিতে হইবে। সংক্ষেপে পদার্থ সূচিত করা হয় বলিয়াই সূত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥৩॥

तदुत्पत्तिर्द्विविधा ॥ ४ ॥

टीका। तदिति। तस्य सम्यगदर्शनस्य। उत्पत्तिः सम्यक् प्रत्ययः

प्रतीतिरिति। द्विविधा द्वैविध्यं भवति। अर्थाद्द द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां स्यात्। स च प्रकारः निसर्गात् स्वभावात् सम्यग् दर्शनम्। अधिगमः सम्यग् दर्शनञ्च। द्विहेतुकत्वाद्द द्विविधमित्यर्थः। निसर्गः स्वभावः परिणामः अपरोपदेश इति यावत्। यद्वा निसर्गः आगमोक्तः। गुरोः सविशेषज्ञानमधिगमः। सभाष्य सूत्रे उमास्वातिना "तन्निसर्गादधिगमाद्वा" इति सूत्रितम्। तत्रैतत्तृतीय सूत्रम्। अन्यद्दभाष्ये सर्वदर्शन संग्रहे च सुबोधमुल्लिखितमस्ति। तच्च सम्यग् दर्शनं "प्रशमसंवेद-निर्वेदानुकम्पा-स्तिक्याभिर्व्याक्त लक्षणमेव तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग् दर्शनमिति" भाष्यकृदाह ॥ ४ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বোক্ত সম্যক্দর্শনের উৎপত্তি দুই প্রকার হইয়া থাকে। সম্প্রতি উক্ত দুইরূপ অর্থাৎ আগমোক্ত নিসর্গ (জৈনশাস্ত্র নির্দিষ্ট) এবং গুরুর উপদিষ্ট অধিগম দ্বারা সম্যক্ দর্শন হইবে। এই সূত্রে তৎশব্দদ্বারা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সভাষ্য উমাস্বাতি সূত্রে "তন্নিসর্গাদধিগমাদ্বা" এইরূপ তৃতীয় সংখ্যক সূত্রদ্বারা সবলভাবে লিখিত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থে এইরূপ সূত্রের পাঠ ভেদ। ভাষ্যকারের মতে 'প্রশম, সংবেগ, নির্বেদ, অনুকম্পা, আস্তিক্য, অভিব্যক্তি লক্ষণকে তত্ত্বার্থ শ্রদ্ধা বা সম্যক্দর্শন বলা হইয়াছে' ॥৪॥

नामादिना तन्न्यासः ॥ ५ ॥

टीका। नामेति। एतैर्नामादिभिः सम्यग् दर्शनादीनां तथैव जीवादीनाञ्च तत्त्वानां न्यासः निक्षप इत्यर्थः। स्पष्टतया व्यवस्थापनं विभाजनञ्च क्रियते। तथाहि विस्तरेण लक्षणतः विधानतश्चाधिगमार्थं न्यासोनिक्षेप इति भाष्यकृतः। नाम संज्ञाकर्मेत्येकार्थ वाचकम्। नामजीवः स्थापनाजीवः द्रव्यजीवो भावना जीवः इति। सर्व्वमन्यद्दभाष्ये षट्खण्डागमादिमूलग्रन्थेच विशेषप्रसिद्धमस्ति। चेतनस्याचेतस्य च द्रव्यस्य जीव इति नाम क्रियते अयं नाम जीवः। काष्ठ पुस्तकचित्रितादिषु स्थाप्यते योजीवः सः स्थापना जीव इति। भाष्येऽन्यद्दर्णितमस्ति। सभाष्योमा स्वाति सूत्रमीदृशं "नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यासः।" अनयोरेवं पाठनिर्देशो दृश्यते। पूर्व्वोक्त द्वितीय सूत्रे उमास्वातिकृतचतुर्थं सूत्रस्य "जीवाजीवास्रव बन्ध सम्वर निर्जरमोक्षास्तत्त्वम्" इत्यस्यान्तर्भावः पूर्व्वं कथितः ॥ ५ ॥

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ | ১১শ সংখ্যা

বৈদিক যজ্ঞ

রায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহরায় বাহাদুর, এম্-এ, বিদ্যার্ণব

গীতাশাস্ত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ বর্ণনায় বলা হইয়াছে—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥"
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২

"সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি অর্থাৎ অবরব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ—যাহা হইতে এই সৃষ্টিপ্রবাহ লিয়াছে, পরবর্তীকালে যিনি ব্রহ্মা নামে কথিত হইয়াছেন, তিনি প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিয়া লিয়াছিলেন—তোমরা যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর, যজ্ঞ তোমাদের অভিলষিত ভাগসকল প্রদান করিবে।" "যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধনা কর, দেবগণও তামাদিগকে পরিপুষ্ট করুন (হিতসাধন করুন)। এইরূপে পরস্পরের সংবর্দ্ধনা দ্বারা যাহা তামাদের পরম অভীষ্ট বস্তু তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা পরিপুষ্ট ইয়া তোমাদের অভিপ্রেত ভোগ্যসামগ্রী সকল প্রদান করিবেন। অতএব যে ব্যক্তি াহাদিগকে সেই দেবপ্রসাদে লব্ধবস্তু নিবেদন না করিয়া (অর্থাৎ দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞ না রিয়া) নিজের ভোগে আনয়ন করে তাহাকে চোর বলিয়া জানিবে।"

এই তিনটি শ্লোকের মধ্যে অতিশয় নিপুণতার সহিত প্রাচীন বৈদিকযুগের াৰ্যদিগের যতকিছু আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিকাশ, কৃষ্টি ও সভ্যতা তাহা অবগত হইবার সূত্র

সূত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে। তাহাদের সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যজ্ঞের প্রাধান্য। ছান্দোগ্য শ্রুতির ঋষি বলিলেন, সমগ্র মানবজীবনটাই এক যজ্ঞ।

ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন,—

"যাহারা যজ্ঞরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে নাই তাহারা কুকর্মান্বিত, তাহারা ঋণী রহিল এবং সেই অবস্থাতেই তলাইয়া যায়"। বর্তমান কালেও যাহারা সে প্রকার দুর্গতি-পরায়ণ তাহারাও সেইরূপ তলায় যাউক। তাহাদিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদিগের দুর্গতি অনিবার্য, কিন্তু যাহারা পূর্বাপর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও দান করিয়া থাকে তাহাদের পরমবাঞ্ছনীয় স্থানে গতিলাভ হয়—যথায় অতিমনোরম নানাপ্রকার ভোগের সামগ্রীসকল নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছে।" (১০—৪৪—৬, ৭ ঋক্)

অপর ঋষি বলিতেছেন—

"সঙ্কীর্ণমনা লোকের ভোজন মিথ্যা, এই ভোজন তাহার মৃত্যু স্বরূপ। সে দেবতাকেও দেয় না (অর্থাৎ যজ্ঞ করে না), বন্ধুকেও দেয় না; কেবল নিজে ভোজন করে। ইহা কেবল পাপভোজন।" (১০-১১৭-৬)

এই বেদমন্ত্র অনুসরণ করিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥"

"যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুব্যক্তিরা সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হন, কিন্তু যাহারা নিজের ভোজনের জন্য পাক করে তাহারা দুরাচারী, তাহারা পাপই আহার করে।"

বৈদিক আর্যদিগের জীবনের প্রতি কার্যের মধ্যেই যজ্ঞের প্রাধান্য ছিল।

বেদশাস্ত্রপ্রতিপাদিত যজ্ঞের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ইত্যাদির কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অতএব প্রসঙ্গক্রমে কিছু অবান্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ কৃপা করিয়া উহাতে ধৈর্যচ্যুত হইবেন না।

ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি মানবজাতির প্রাচীনতম রচিত গ্রন্থ। ইহারা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট ও প্রকাশিত শাস্ত্র। ইহাদিগের মধ্যে যে সকল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্ত্র তাহাদের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। কোন কোন মন্ত্র যে ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ এর রচনা, বর্তমানে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন। আবার কোন কোন মন্ত্রে এমন সব নৈসর্গিক ব্যাপারের উল্লেখ আছে, যাহা দশ বার হাজার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্ত্রগুলিও যে ৩০০০ খ্রীঃ পূর্বের পরবর্তী রচনা নহে তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অতি প্রাচীন ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির রচনার সময় ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ ধরিলেও ১৫০০ বৎসর ব্যাপিয়া এই সকল মন্ত্র রচনার কাল হয়। এই সুদীর্ঘকালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন

ঋষির দৃষ্ট মন্ত্রগুলি যখন সংখ্যাবহুল হইয়া পড়িল, ইহাদিগকে যথাযথভাবে রক্ষা করা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সে সময় লিপি বিদ্যার আবিষ্কার হয় নাই। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতিমূলে ইহারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। কাল ও স্থানভেদে ইহাতে পাঠান্তর হওয়া স্বাভাবিক ও ঘটিয়াছিলও তাহা। এইরূপে বিভিন্ন শাখার সৃষ্টি হয়। কালে কোন কোন শাখা লোপ পাইয়াছে, অনেক মন্ত্রও আর বর্তমানে পাওয়া যায় না। চরণ ব্যূহের সময় পাঁচ শাখার উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়। ঋঙ্মন্ত্র রচনার যুগ অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরে অনুমান ৩০০০ খৃঃ পূঃ মহর্ষি বেদব্যাস অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে এই সকলের সংগ্রহস্বরূপ শ্রেণীবিভাগক্রমে ঋগ্বেদ সংহিতা সংকলন করেন। চরণব্যূহের সময়ও পাঠান্তরভেদে এই সংহিতার পাঁচ শাখা ছিল। বর্তমানে তাহারও চারি শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে—একমাত্র শাকল শাখা অবশিষ্ট রহিয়াছে। সায়নাচার্য ইহার ভাষ্য করিয়াছেন এবং ইহাই একমাত্র ঋগ্বেদসংহিতা। বেদব্যাস-কৃত অনেক মন্ত্র এই বর্তমান সংহিতাতে পাওয়া যায় না—তাহার প্রমাণ এই যে কোন কোন উপনিষদে এই সকল মন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাহাদের বিষয়ও বর্ণিত হইয়াছে অথচ বর্তমান সংহিতায় উহা নাই। আবার এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়, পরবর্তী কালে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইচ্ছাপূর্বক পাঠান্তর আরোপ, এমন কি প্রক্ষিপ্ত দোষও ঘটিয়াছে। সেই প্রাচীন যুগেই এই সকলের উপর বেদাচার্যদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বেদের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। এইজন্য বেদের অনুক্রমণীর সৃষ্টি। অনুক্রমণীতে ঋগ্বেদসংহিতার প্রত্যেক মন্ত্রের ছন্দ, দেবতা, ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ছন্দোনুক্রমণিতে ছন্দ, আর্ষানুক্রমণিতে প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি, অনুবাকানুক্রমণিতে দশমণ্ডলে সঙ্কলিত এই সংহিতার অন্তর্গত ৮৫ অনুবাকে প্রত্যেকের প্রথম চরণ বা চরণাংশ এবং সূক্ত সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বৃহদ্দেবতাতে প্রত্যেক মন্ত্রের দেবতা কে তাহা দেখান হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রত্যেক সূক্তের প্রতীক মন্ত্রের প্রথম চরণ বা চরণাংশ সহ উহার ঋষি, দেবতা ও ছন্দ নির্দ্দিষ্ট আছে। শৌণক ঋষি বর্তমানে প্রচলিত শাকল শাখা সংহিতার মন্ত্র, পদসূক্ত, এমন কি অক্ষর সংখ্যা পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাতে দশমণ্ডল, ৬৪ অধ্যায়, ২০০৬ বর্গ, ১০১৭ সূক্ত আছে। ঋঙ্মন্ত্রসংখ্যা ১০৫৮০, পদসংখ্যা ১৫৩৮২৬, অক্ষর সংখ্যা ৪৩২০০০।

যাহাতে কোনরূপ প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেজন্য নানারূপ পাঠ-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল। যথা নির্ভুজ ও প্রতৃণ পাঠ। মন্ত্রটি যেরূপ রচিত হইয়াছে, ঠিক সেরূপ পাঠ নির্ভুজ প্রণালী। প্রতৃণ প্রণালীতে অনেকপ্রকার ভেদ আছে। যথা, পদপাঠ, জটাপাঠ, ক্রমপাঠ। মহর্ষি বেদব্যাস ঋগ্বেদ সংহিতার ন্যায় অপর তিন বেদ যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদও সঙ্কলন করিয়াছেন। এই সকল সঙ্কলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বৈদিক যজ্ঞগুলির যথাযথ অনুষ্ঠানে তদনুকূল উপদেশ প্রদান করা।

যজুর্বেদের প্রধান ঋত্বিক অধ্বর্যু। তাঁহার ও তাঁহার সহকারীদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানে

সাহায্যের জন্য এই বেদের সঙ্কলন। অধ্বর্যু মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র প্রযোগ করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঋঙ্‌মন্ত্রের প্রয়োগও বিধি ছিল। এই সংহিতায় ৭০০ ঋঙ্‌মন্ত্র আছে।

যজুর্বেদের দুই শাখা—কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও শুক্ল যজুর্বেদ। কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতায় অধ্বর্যু ব্যবহারের যজুঃ ও ঋক্ মন্ত্রসকল সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহাতে কিরূপে মন্ত্রগুলি নিয়োগ করিতে হয় তাহার বিবৃতি ও ব্যাখ্যায়ক ব্রাহ্মণ আছে। যজুর্মন্ত্র, ঋঙ্‌মন্ত্র ও তাহাদের ব্রাহ্মণগুলি একত্র করিয়া কৃষ্ণযজুর্বেদ সংহিতা।

শুক্ল যজুঃ সংহিতাতে ব্রাহ্মণ নাই, ইহার ব্রাহ্মণাংশ স্বতন্ত্র। ইহা শতপথ ব্রাহ্মণ।

ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রগুলি বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত, যজু সংহিতায় ঋষি বা দেবতাদিগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মন্ত্রগুলি হয় নাই। যজ্ঞীয় উপকরণগুলির যথাযথ ভাবে বিনিয়োগই এই মন্ত্রগুলির প্রধান বিষয়।

সামবেদ সংহিতা—ইহাতে মাত্র ৭৫টি মন্ত্র ভিন্ন অবশিষ্ট সকল মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। যে সকল ঋঙ্‌মন্ত্র যজ্ঞানুষ্ঠানকালে গান করা হইত সেইগুলি এই সংহিতায় গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশ ঋগ্বেদের ৮ম ও ৯ম মণ্ডল হইতে গৃহীত। সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে এই সকল গান করা হইত। ঋঙ্‌মন্ত্রগুলির মধ্যে নানা অক্ষর যোজনা দ্বারা ইহাদিগকে সঙ্গীতে পরিণত করা হইত। এতৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রহিয়াছে। সঙ্গীতের তান ও লয় ঠিক রাখিবার জন্য যে সকল নূতন অক্ষর যোজনা করা হইত তাহাদের নাম স্তোত্র।

অথর্ববেদ সংহিতা—ইহা মন্ত্রের সংগ্রহ। ইহাদের অধিকাংশই ঋঙ্‌মন্ত্র। ইহাদের প্রায় ১২০০ মন্ত্র ঋগ্বেদের প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডলে দেখা যায়, মাঝে মাঝে পাঠের পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন এই বেদে এক অষ্টাংশ পরিমাণ যজুর্মন্ত্র আছে। শ্রৌতযজ্ঞে এই বেদের কোন স্থান নাই। যে সকল ঋঙ্‌মন্ত্র শান্তি, পুষ্টি, অভিচারাদি কর্মে প্রয়োগ হইত তাহারা বিশেষভাবে এই বেদে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনার্য জাতিগুলি আর্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাহাদের অনেক আচার নীতিও এই বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এইজন্য দীর্ঘকাল এই বেদ আর্যসমাজের উন্নততর স্তরে বেদের মর্যাদা পায় নাই। ত্রয়ী বিদ্যা ঋক্, যজুঃ ও সামই বেদ ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কর্তৃক এই বেদবিভাগ-কার্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বেদমন্ত্রের বিভাগ নহে। যজ্ঞে বিভিন্ন বেদের ঋত্বিক্‌দিগের ব্যবহারের মন্ত্রগুলি পৃথক করিয়া সুষ্ঠুরূপে তাঁহাদের যাঁহার যাঁহার কর্ম যাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে—এই লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে।

বেদমন্ত্রগুলি যজ্ঞে যথোচিতভাবে যাহাতে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির রচনা। প্রত্যেক বেদেরই স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, যথা—

ঋগ্বেদের—ঐতরেয়, কৈষিতকী বা সাংখ্যায়ন, পৈঙ্গিরহস্য।

সামবেদের—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, জৈমিনি ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের চারি শাখা—কাঠক, কপিস্থল, মৈত্রায়ণী ও তৈত্তিরীয় সংহিতা। তৈত্তিরীয়কে আপস্তম্ব সংহিতাও বলে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এই সংহিতার অন্তর্ভুক্ত।

শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত বাজসনেয়ী সংহিতা, ইহার ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ও শতপথ উভয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত দুই শাখা—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন।

অথর্ব বেদের গোপথ ব্রাহ্মণ।

ইহা হইতে দেখা যাইবে, একমাত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এক বিশাল সাহিত্য, ইহাদের মধ্যে শতপথব্রাহ্মণের বিশেষ প্রাধান্য। ইহাদের সকলেরই প্রধান বিষয় যজ্ঞ। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ, মন্ত্রগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ, মন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ ও মন্ত্র প্রয়োগ ইত্যাদি যাহাতে নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য বেদের ছয় অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের সৃষ্টি। এই সকল হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, একমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান-গুলিকে মধ্যবিন্দু করিয়া বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই যজ্ঞ কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগের মধ্যে কেবল পুরোহিতদিগের বুজরুকিই দেখিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের মতে মন্ত্রগুলি spell, incantations, charms, ঐন্দ্রজালিক যাদুমন্ত্র এবং যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি sorcery, witchcraft, black art—ঐন্দ্রজালিক ডাইনি বিদ্যামাত্র।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পর্কে প্রধানগ্রন্থ। ইহাদিগের সম্বন্ধে প্রোঃ ম্যাক্‌ডনেলের মন্তব্য :—

"Their main object being to explain the sacred significance of the ritual of those who are already familiar with the sacrifice, the descriptions they give of it are not exhaustive, much being stated only in outline, or omitted altogether. They are ritual text books, which, however in no way, aim at furnishing a complete survey of the sacrificial ceremonial to those who do not know it already."

তাঁহার এই মন্তব্য ঠিক এবং এইজন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য। যাঁহারা যজ্ঞে পৌরাহিত্যে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে আজীবন যত্নসহকারে সাধনাদ্বারা যজ্ঞের খুটিনাটি যত কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান অর্থ, সে সকল অভ্যাস করা প্রয়োজন ছিল।

এই সকল ব্রাহ্মণগ্রন্থ সম্বন্ধে অপর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিন্টার্নিজ (Winternitz) বলিতেছেন,—

"The Brahmins are a splendid proof of the fact that an enormous amount of religion can be connected with infinitely little morality."

এই তো ব্রাহ্মণগ্রন্থ সম্বন্ধে নীতিহীনতার অভিযোগ—এমন কি উপনিষদ্‌গুলি সম্বন্ধেও এরূপ কঠোর মন্তব্যের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু ইউরোপের একজন প্রধান দার্শনিক সোপেনহার এই সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"In the whole world there is no study except that of the originals (of the Upanishads) so benificient and so elevating as that of the Oupanekhat (Upanishad). It has been the solace of my life, it will be the solace of my death."

আর একজন পার্শিক দার্শনিক, যিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন—তাঁহার রচিত ("The Philosophy of the Upanishad" গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন—

"They are the work of rude age, a deteriorated race and a barbarous and unprogressive community."

অল্প কথায় এরূপভাবে শ্লেষ্মার বিষোদ্গার বিশেষ বাহাদুরির পরিচায়ক বটে—

বেদান্তদর্শন গ্রন্থ উপনিষদ্গুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ইহার গভীর দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রোফেসার মোক্ষমূলার উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহার যে প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে ইহার স্থান পাশ্চাত্য যে কোন দর্শন শাস্ত্রের অনেক উপরে(১)। জড় বিজ্ঞানের দিক দিয়া বর্তমানে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও অপূর্বরূপে ইহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে, যদিও ইহা যে এক জ্ঞানময় চৈতন্য সত্ত্ব ("সত্যং জ্ঞানমনন্ত সত্তা") অদ্যাপি তাহার কোন প্রমাণ জড়তত্ত্বের মধ্যে পাওয়া যায় নাই (২)।

উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির অধিকৃত বিষয়ের জ্ঞান ঋষিগণ যজ্ঞ হইতে লাভ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণভাগের অংশবিশেষ মাত্র।

---

(১) "He writes" :—"It is astounding that such a system as the Vedanta should have been slowly elaborated by the indefatigable and intrepid thinkers of India thousands of years ago, a system that even now makes one feel giddy as in mounting the last step of the swaying spire of an ancient Gothic Cathedral. None of our philosophers not-excepting Heracletus, Plato, Kant or Hegel has ventured te erect such a spire, never frightened by storms or lightning, stone follows on stone, in regular succession, after once the first step has been made, after once it haf been clearly seen, that in the beginning there can have been but One as there will be but One in the end. whether we call it Atman or Brahman."

(২) প্রোঃ জে, ডবলিউ, এন্ সুলিভান সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে "Atoms and Electrons" গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন :—"What does the Universe in essence consist of ? "Material" says the physicist relying on experience, undergone by him as a denizen of the phenomenal world the world of manifestation, that is, on the evidence obtanied through the physical faculties drawn exclusively from the world."

"Spiritual" says the idealist also, relying on experience but of another kind.

"Each rejects or trews with suspicion the evidence adduced by the other. Each is right within his own limits, for his limits are too restricted to represent all reality. In the totality of thing there is something more than the phenomenal world of the physicist there is the world of the unmanifest, also there is something more than the noumenat world of the idealist—there is the world manifestation."

"Regarded as two they are nothing but names denoting and differentiating two distinct states of the original One substance,"

প্রাণিজগতে মানবের যে এত প্রাধান্য তাহার মূলকারণ মানবের বাক্‌শক্তি। বাক্য-প্রয়োগে ভাষার সৃষ্টি। ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন :—

"জ্ঞানিগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। শিশুদিগের হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রদেশে উৎকৃষ্ট নির্দোষ জ্ঞানসকল সঞ্চিত রহিয়াছে, বাগ্দেবীর করুণায় তাহা প্রকাশিত হয়। যজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তরে ভাষার সন্ধান পাইলেন, এবং তাহা আহরণ করতঃ নানাস্থানে বিস্তার করিলেন।" (১০—৭১—১) এক্ষণে বলা হইল, ভাষার সন্ধান মিলিল অন্তঃকরণে। ইহার পরিপোষক যুক্তি পাওয়া যাইতেছে অপর এক ঋষির উক্তির মধ্যে—বাক্ চারি প্রকার, যাহারা মেধাবী ঋত্বিক (অর্থাৎ সুনিপুণ যজ্ঞক্রিয়াশীল) তাঁহারা তাহা অবগত আছেন। ইহাদিগের মধ্যে তিনটি গুহায় নিহিত থাকে, সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে না, চতুর্থ বাক্ যাহা মনুষ্যগণ তাহাই বলিয়া থাকে (১—১৬৪—৪৫)। এই মন্ত্রটির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব।

মনুষ্যরা যে বাক্য বলিয়া থাকে দার্শনিক দেবভাষায় তাহাকে বৈখরী বাক্ বলে, যে তিনটি গুহায় নিহিত থাকে, সাধারণ লোক যাহা জানিবার শক্তি রাখে না, তাহারা পরা-পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাক্ নামে কথিত হয়। মন্ত্রের তাৎপর্য বাক্‌স্বরূপে শব্দব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রপঞ্চের উদ্ভব হইয়াছে।

জগৎ প্রকাশের প্রণালী, যথা,—

শব্দব্রহ্ম প্রথমতঃ নিজের মধ্যে দুই রকম স্পন্দন উৎপন্ন করেন, ইহাদের একটি শব্দ; তাহা দ্বারা মানসরাজ্যে প্রথম জ্ঞানাত্মক কম্পনের স্ফুরণ হয়, তদনন্তর তাহা উর্দ্ধগামী হইয়া কণ্ঠনালির সাহায্যে উচ্চারিত শব্দরূপে বহির্গত হয়; অপরটি অর্থরূপী স্পন্দন; ইহা শব্দ-শক্তির প্রভাবে মানসরাজ্যে যাবতীয় বস্তুর কল্পনা, ও বাহ্যজগতে তাহাদের শব্দানুভূতি উৎপন্ন করে। ইহারা উভয়ই এক জ্ঞান শক্তির উচ্ছ্বাস (Emanations)। এই জ্ঞানশক্তি বাক্।

শব্দ ও অর্থ স্বরূপতঃ একই, সুতরাং ইহাদিগের সম্বন্ধ নিত্য। শব্দ ব্রহ্মের ভাবাত্মক স্পন্দন হইতে উপজাত, সূক্ষ্ম শব্দ ও অর্থ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতে প্রক্ষিপ্ত (projected) হইলে তাহা ঐ স্থূল শব্দ দ্বারা নির্দেশিত স্থূল অর্থ বা বস্তু রূপে প্রকাশমান হয়। সেইজন্য বাস্তব জগতে শব্দের এই বৈখরী ভাবকে ভাষা বলা হয়, যাহা আশ্রয় করিয়া চিন্তাগুলির অভিব্যক্তি হয়।

মধ্যমাভাবে ইহা সূক্ষ্ম মানসিক জগতে অন্তঃকরণ, সংকল্প ও মনসাত্মক ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াস্থান (seat of volition); শব্দ তাহার সেই ভাব—যাহা হইতে জ্ঞাতারূপে নাম সৃষ্টি হয়, এবং অর্থরূপে সেই নামের অনুরূপ পদার্থটির বাস্তবিক সত্তার ভাবনা হয়।

মধ্যমার পূর্ববর্ত্তী বাক্যের যে পশ্যন্তী অবস্থা ইহা বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াস্থান (seat of intellect). যাহা বাকের প্রথম স্ফুরণের উন্মুখান অবস্থা তাহা পরা। এই অবস্থায় বাক্ পরা

সম্বিতের অব্যবচ্ছেদ (undifferentiated condition) রূপে বীজস্বরূপ। উপনিষদ্ যাহাকে "স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি" বলেন ইহা সেই অবস্থা।

শব্দব্রহ্মের এই ভাবাত্মক স্পন্দন হইতে জগতের অভিব্যক্তি। এ দেশের কোন কোন প্রাচীন দর্শন ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে উহা স্ফোট নামে অভিহিত হইয়াছে।

যে সকল বর্ণযোগে শব্দগুলি উচ্চারিত হয় তাহারা পৃথকভাবে কিম্বা সম্মিলিতভাবে কোন অর্থ বহন করিতে পারে না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন "গো" শব্দ। 'গ' এবং 'ও' এই উভয় বর্ণের যোগে এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পৃথকভাবে 'গ্' এবং 'ও', অথবা 'গো' উচ্চারণের কোন অর্থ হয় না, কিন্তু যখনই 'গো' এই শব্দ উচ্চারণ করা যায় ইহার মধ্য দিয়া আমাদের অন্তরে অনুভূতির রাজ্যে এমন একটি প্রাণীর চিত্র ভাসমান হয়, যাহাতে একসঙ্গে গলকম্বল লেজ, পিঠের কুঁজ, ক্ষুর ও শিং বর্তমান আছে—এইরূপ প্রতিভাত হয়। যে শক্তি এই সকলকে এক সঙ্গে ফুটাইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করে তাহা স্ফোট। এই স্ফোট অনাদি। 'গো' দ্বারা যে জাতিবাচক পদার্থটি বুঝায় তাহা পূর্ব হইতে বর্তমান এক অনাদি বস্তু; সেই বস্তু "ব্রহ্ম"।

বৈয়াকরণদিগের মতে স্ফোট অধিকারী, অনাদিনিধন, সর্বব্যাপক শব্দ ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে এই জগতের প্রকাশ।

"নিষ্কর্ষে তু ব্রহ্মৈব 'স্ফোট' ইতি ভাবঃ"

—কুণ্ডভট্ট-রচিত স্ফোট নির্ণয়

৭৪ কারিকা ব্যাখ্যা···

ভর্তৃহরি অবস্থাভেদে স্ফোটের তিন প্রকার ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। স্ফোট যখন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হয় তখন ইহা বৈখরী। বৈখরীরূপে উচ্চারিত হইবার পূর্বে বক্তার অন্তঃকরণে, এবং ইহা শ্রবণের পর শ্রোতার অন্তঃকরণে স্ফোটের প্রতিভাস হয়। স্ফোটের পারমার্থিক অবস্থা পশ্যন্তী এবং ইহাই পরা বাক্। ইহা অনাদি, অনন্ত, চৈতন্য স্বরূপ সর্বপ্রকার বিকার-বর্জিত পরম ব্রহ্ম।

"ইত্যাপুক্তে পরং ব্রহ্ম যদনাদি তদক্ষরম্।
তদক্ষরং শব্দরূপং সা পশ্যন্তী পরা হি বাক্॥"

সোমানন্দ—শিবদৃষ্টি ১।২

(ক্রমশঃ)

ঈশ্বর

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করতীর্থ যতি *

মনের একাগ্রতা অর্থাৎ সমাধি লাভ হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর-উপলক্ষে পাতঞ্জল দর্শন কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়া অতঃপর বলিয়াছেন যে—"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" (১।২৩) অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয়। 'প্রণিধান' শব্দের অর্থ সম্যক্ আত্মসমর্পণ। প্র=প্রকর্ষ (সম্যক্), নিধান=আশ্রয়। ঈশ্বরে সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণ করার নাম 'ঈশ্বর-প্রণিধান'। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে ঈশ্বরসত্তা অনুভবপূর্বক তাহাতেই আত্মনিবেদন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাকে 'প্রণিধান' বলে। "কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎসর্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্॥" এই শাস্ত্রোক্তি অনুসারে কার্যের আরম্ভ, মধ্য ও অবসান সময়ে হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া করিতেছি, এইরূপ অনুভব করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ কর্ম হইতে ঈশ্বরের আভিমুখ্য লাভ হওয়ায় তদনুগ্রহে পারমার্থিক বিশেষজ্ঞান লাভ হয়। এ কথার পর ঈশ্বর কি? তদুত্তরে পাতঞ্জল দর্শন বলিয়াছেন—"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" (১।২৪)—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়, এই চতুর্বিধ ব্যাপার হইতে যে বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত পুরুষবিশেষ অসম্পৃক্ত (অস্পৃষ্ট বা অসংযুক্ত), তাঁহার নাম 'ঈশ্বর'। অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান বা অনাত্ম-প্রত্যয় নাই, অস্মিতা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি নাই, সুখে অনুরাগ এবং দুঃখে দ্বেষ নাই, এবং মৃত্যুজনিত অমূলক ভীতি নাই। ঈশ্বরের কোন কর্ম নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি ভূলোকস্থ স্থাবর জঙ্গমের ন্যায় পরিণামশীল নহেন,—সর্বদা এক অবস্থাপন্ন; অপিচ তাঁহার কোনরূপ ইচ্ছা নাই। ইহাই হইল পাতঞ্জল-বর্ণিত ঈশ্বরের স্বরূপ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ·········কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥" (গীতা, ৭।৬-১১) অর্থাৎ আমি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই দৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান। হে ধনঞ্জয়, আমি ভিন্ন জগতের সৃষ্টি সংহারের কারণান্তর আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। আমি জলের রসস্বরূপ, চন্দ্রসূর্যে প্রভাস্বরূপ, সমস্ত বেদে প্রণবস্বরূপ, আকাশে শব্দস্বরূপ এবং মনুষ্যে পৌরুষস্বরূপ। আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ-স্বরূপ, অগ্নিতে তেজঃস্বরূপ, সর্বভূতে জীবনস্বরূপ, এবং তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ। হে পার্থ,

---

* শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাধীন শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রী১০৮ স্বামী শ্রীশঙ্করতীর্থ যতি মহারাজ।

আমাকে সনাতন অর্থাৎ নিত্য এবং সর্বভূতের বীজ বলিয়া জানিও। আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি এবং তপস্বিদিগের তেজ। আমি বলবান্‌দিগের কামরাগ-বিবর্জিত বল, অর্থাৎ সাত্ত্বিক স্বধর্মানুষ্ঠান-সামর্থ্য। আমি সর্বপ্রাণিতে ধর্মের অবিরোধি কামরূপে অবস্থিত আছি। ইত্যাদি—

অপিচ—"মায়াততমিদং সর্বং…………মৎস্থানীত্যুপধারয়।" (গীতা, ৯।৪-৬) অর্থাৎ আমি অব্যক্ত বা অপ্রকটরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত, আমি কিন্তু সে সকলে অবস্থিত নহি। পরমার্থতঃ ভূতগণও আমাতে অবস্থিত নহে, আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ। আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নহি। কিরূপে? যেমন আকাশে অবস্থিত বায়ু সর্বত্রগামী ও মহান্ অথচ অবয়ব না থাকায় আকাশের সহিত অসংশ্লিষ্ট, ভূতগণও সেইরূপ নিরাকার, পরিপূর্ণ এবং নিরবকাশ আমাতে অবস্থিত জানিও।

এই সকল কথার আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বর না থাকিলে জগৎ থাকে না, ভূতসকল থাকে না, ইন্দ্রিয়গুলি থাকে না,—কিছুই থাকে না। ঈশ্বর জাগতিক সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন বলিয়া এই জগৎ আছে, ভূতসকল আছে, আমি আছি;—ঈশ্বর না থাকিলে জগৎ থাকিত না, ভূতসকল থাকিত না, ইন্দ্রিয় থাকিত না, আমি থাকিতাম না। কাজেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সহিত আমার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে। বায়ু না থাকিলে যেমন উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তেমন ঈশ্বর না থাকিলে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

জ্ঞানিগণ তত্ত্ব বিচারাবলম্বনে এইরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া কালে তাহাতে প্রবেশ করেন। জ্ঞানী ও কর্মিদিগের উপাসনাবিধিতে এই প্রভেদ যে কর্মিগণ তাঁহাদের ঈশ্বরকে রাজাসনে উপবেশন করাইয়া, ভৃত্যরূপে সর্বতোভাবে তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান করিয়া ফল লাভ করিতে ভালবাসেন, আর জ্ঞানীরা ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া, তাহাতে আত্মসত্তা একীকৃত করিয়া তন্ময়তা লাভ করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরই হইয়া যান। কর্মী ও জ্ঞানিদিগের সাধনবিষয়ে এই গুরুতর প্রভেদ।

ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীর উপাসনা করেন। তাহার ভাব এই যে—যিনি জগতের কারণভূত জলস্বরূপ, যিনি মণি পাষাণাদি স্থাবরে জ্যোতিঃস্বরূপ, তৃণ, বৃক্ষ ও ওষধিতে রসস্বরূপ; যিনি মনুষ্য, পশু, কীটাদি জঙ্গমে চেতনাস্বরূপে বিরাজমান, তিনিই ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর এবং তিনিই পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ এই ত্রিলোকস্বরূপ,—তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করুন। —এখানে সেব্যসেবকের স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই, অথচ ইহা উপাসনা;—কেবল উপাসনা নহে, সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা,—এমন উপাসনা আর নাই।

কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল, উপাসনা মাত্রই কর্মাঙ্গ। এমন কি 'নিদিধ্যাসন'কেও উপাসনায় অন্তর্গত বলিয়া ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের

চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম সূত্রভাষ্যে আচার্যপাদ বলিয়াছেন—"অপি চোপাসনং নিদিধ্যাসনং চেত্যন্তর্নীতাবৃত্তিগুণৈব ক্রিয়াভিধীয়তে" অর্থাৎ নিদিধ্যাসনও একরূপ উপাসনা বিশেষ, তাহাতেও ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া চলিতে থাকে, এইভাবে ইহাকে 'ক্রিয়া' বলিতে হয়।

তারপর কর্ম এবং কর্মাঙ্গ ক্রিয়ামাত্রই চিত্তশুদ্ধিকর। কর্ম কখনও জ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু হইতে পারে না। কারণ কর্ম স্বয়ং অজ্ঞান। সেই অজ্ঞান কখন জ্ঞানের প্রসূ হইতে পারে না। তবে যে আমরা কাহাকেও কাহাকেও কর্ম করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করিতে দেখি, সে কেবল জন্মান্তরের জ্ঞানবিচার দ্বারা যাহাদের ইহজীবনে আত্মজ্ঞান বিকাশোন্মুখ হয়, অথবা প্রতিবন্ধকতাবিশেষ দ্বারা জ্ঞান ফুটিতে অবকাশ পায় না, তাহারা ইহজন্মে সামান্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা সেই প্রতিবন্ধকতা রহিত করিতে পারিলে, পূর্বজন্মের জ্ঞানবিচারের ফলস্বরূপ বর্তমান দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন —ইহাই বুঝিতে হইবে। এইজন্যই আমরা সেই সেই স্থলে কর্মদ্বারা জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাই।

এখানে, নিদিধ্যাসন কাহাকে বলে, এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে; সেই আশঙ্কা পরিহারের জন্য বলা যাইতেছে যে, "একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে"।—যাহা শাস্ত্র হইতে শ্রুত, বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনা দ্বারা অবধারিত, এবং যাহা মননের অর্থাৎ শাস্ত্রানুকূল যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিচারিত, সুতরাং নিঃসন্দিগ্ধ, এমন বিষয়ে যে চিত্তের একতানভাব (একাগ্রতা), তাহার নাম 'নিদিধ্যাসন'। ধ্যান ও নিদিধ্যাসন প্রায় সমানার্থক শব্দ। 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' (পাতঞ্জল দঃ ৩।২)—প্রত্যয়ের (জ্ঞানবৃত্তির) একতানতার নাম 'ধ্যান'। ধ্যানের প্রত্যয় যেন তৈলের বা মধুর ধারার মত একতান। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদিত রহিয়াছে বোধ হয়। নিদিধ্যাসন = নি — ধ্যৈ + সন্ + অনট্ = শ্রবণ-মনন দ্বারা নিঃসন্দেহ হইলে নিশ্চয়ীকৃত বস্তুকে স্বতঃ অনায়াসে ভাবনা করা। "শ্রবণ-মনন-নির্বিচিকিৎসেঽর্থে বস্তুনি একতানবত্তয়া চেতঃস্থাপনং নিদিধ্যাসনং ভবতি।"—পৈঙ্গলোপনিষৎ।

গীতায় ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও উল্লেখ আছে যে—"ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি…… …মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" (৫।১৪, ১৫) অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃষ্টি করেন না, এবং কর্মফল-সংযোগও ঘটাইয়া দেন না; কিন্তু স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির স্বরূপ এই যে,—সে স্বয়ংই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্তিত হয়। ঈশ্বর কাহারও পুণ্য বা পাপ গ্রহণ করেন না। তবে যে লোকে ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলাম ভাবিয়া তুষ্ট রহে, তাহার কারণ কি? না,—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান সর্বতোভাবে আচ্ছাদিত থাকায় লোকে মোহিত হইয়াই অজ্ঞানবশতঃ ঐরূপ অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—"স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সুধীঃ।" ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—'বিবেকমাচ্ছাদয়তি জগন্তি জনয়ত্যলম্।' গীতাতেও অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।'

এ সকল কথা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, জীব আপনাপন কর্মবশতঃ সুখদুঃখাদি ভোগ করে, উহাতে ঈশ্বরের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক নাই। জীবের আপনা পন শুভাশুভ

কর্মফলই, জীবের পক্ষে পরলোকের যথেপ্সিত গতিলাভের একমাত্র অবলম্বন। স্বীয় কৃতকর্ম ভিন্ন আর কেহই পরকালের সহায় নাই। দেবীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্মবীজসমুদ্ভবাঃ। নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ॥"

সাধারণের মধ্যে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে,—কপিলের সাংখ্যদর্শন ঈশ্বর মানে না, পতঞ্জলির যোগদর্শনে বিকল্পে ঈশ্বরের নাম করা হইয়াছে। অতএব মহর্ষি কপিল নিরীশ্বর সাংখ্যের এবং মহর্ষি পতঞ্জলি সেশ্বর সাংখ্যের প্রবর্তক। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়েই বেদ মানিয়া ঈশ্বরকেঁ পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন, কাজেই পুরুষ ও প্রকৃতি ভিন্ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কারণ প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া স্বতন্ত্র ঈশ্বর নাই বা থাকিতে পারে না। সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষকে একত্র করিলেই ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং এই বিচারাবলম্বনে বলা যায় যে, সাধারণের প্রবাদমূলক নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্যের প্রবর্তক বলিয়া যে যথাক্রমে পরমর্ষি কপিল ও পতঞ্জলির উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য এবং অলীক কল্পনা মাত্র।

আর্যদিগের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরকে সুখ দুঃখের নিয়ন্তা বলেন, তাঁহারা জানেন **সর্বসমষ্টিরূপ এই জগৎপ্রপঞ্চই ঈশ্বরের মূর্তি**। অতএব তাঁহাকে কর্মফলদাতাস্বরূপ ধরা যায়। এরূপস্থলে **কর্ম ও ঈশ্বর চরমে এক হইয়া যাইতেছে**। আবার অন্যেরা বলেন,—'যাহা কিছু আছে, তাহার যে স্রষ্টা—তিনিই ঈশ্বর'। এখন কথা হইতেছে এই, কিছু থাকিলেই যে তাহার একজন স্রষ্টা থাকিবে, সর্বত্র এমন মনে করার হেতু নাই। যেহেতু তাহা হইলে, ঈশ্বরও ত একটা কিছু, সুতরাং তাহারও স্রষ্টা থাকা চাই। এইভাবে তর্ক করা হইলে ক্রমে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে,—যাহা আছে, তাহাকে ঈশ্বর বলিব না, অথচ যাহার স্রষ্টা আছে কিনা জানি না সেই সম্বন্ধে একটা স্রষ্টা কল্পনা করিয়া লইয়া, তাহাকে ঈশ্বরবোধে ভক্তি করিব।

এজন্য প্রাচীন আর্য দার্শনিকদিগের মত এই যে, এই জগৎপ্রপঞ্চ বাহিরের কোন ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, ইহা পর্যায়ক্রমে একবার ব্যক্ত হয়,—তখন তাহাকে বলে, 'সৃষ্টি', পুনরায় যখন অব্যক্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয় 'প্রলয়'। এই অবস্থাটিকে লক্ষ্য করিয়া সর্বসমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বরের দুইটি মূর্তি কল্পিত হয়; যথা—সৃষ্টিসময়ে **জগন্মূর্তি**, আর প্রলয়ে **অব্যক্তমূর্তি**। এজন্য আর্যগণ বলেন, ঈশ্বর অব্যক্ত মূর্তি হইতে বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, পুনরায় প্রলয়ের সময়ে অব্যক্ত মূর্তি ধারণ করেন। এই যে ঈশ্বরের দ্বিবিধ মূর্তি দেখান গেল,—ইহার মধ্যে ব্যক্ত অবস্থাটি আবার দুইভাগে বিভক্ত। যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। সুতরাং ঈশ্বরের তিনটি মূর্তি ধরা যায়;—স্থূল, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত। স্থূলমূর্তির নাম 'বিরাট', সূক্ষ্ম মূর্তির নাম 'হিরণ্যগর্ভ', এবং অব্যক্ত মূর্তির নাম 'ঈশ্বর'। অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই নামও বলা হইয়া থাকে। এই স্থূল সূক্ষ্ম ও অব্যক্তের অভিব্যক্তি জগৎ প্রপঞ্চ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্থূলের নাম 'জাগ্রত', সূক্ষ্মের

নাম 'স্বপ্ন', অব্যক্ত অবস্থার নাম 'সুষুপ্তি'। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—
"জাগ্রে ব্রহ্মা স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তৌ চ মহেশ্বরঃ।"

তাহাতেই আমরা বলিতে পারি যে, **ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা বা নির্মাতা নহেন, জগতই ঈশ্বরের রূপ।** জীবগণও ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহে, ঈশ্বরের এক একটি অংশমাত্র। ঈশ্বরের যেমন বিনাশ নাই, ঈশ্বরের অংশ বলিয়া জীবেরও ধ্বংস নাই। এজন্য মনুষ্যের মত জীবই সাধনাদির বলে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়। অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঈশ্বরের সেই সর্বসংহারের মূর্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। হিমালয়, পার্বতীর মধ্যে মহেশ্বর-রূপ দর্শনে ভীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ভীতোঽস্মি সাম্প্রতং দৃষ্ট্বা রূপমন্যং প্রদর্শয়।' ফলতঃ প্রত্যেক জীব, সেই ঈশ্বরের অংশ বিধায়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঈশ্বরের স্থূল, সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত কারণরূপ বিদ্যমান আছে। আমরা জাগ্রদবস্থায় ঈশ্বরের স্থূল জগদ্রূপকে ভোগ করি, স্বপ্নে সূক্ষ্মমূর্তির উপভোগ হয়, আবার সুষুপ্তি সময়ে এই উভয়বিধ ভোগের অতীত ঈশ্বরের অব্যক্ত সত্তাতে প্রবেশ করিয়া থাকি।

যোগ সাধন করিতে গেলে যে ভাবে ধারণা, ধ্যান, সমাধির অভ্যাস করার বিধান আছে, তদনুসারে এই সুষুপ্তিস্বরূপ ঈশ্বরকে চিত্তক্ষেত্রে ধারণা করা যাইতে পারে না। সুতরাং তৎপ্রতি ধ্যান ও সমাধি হওয়াও অসম্ভব। চিত্ত ঈশ্বরকে ধারণা করিবে কিরূপে? উহা ত' জাগ্রৎ বা স্বপ্নরাজ্যের কোন বস্তু নয়। ঈশ্বরাবস্থাতে চিত্ত প্রবেশ করিলেই চিত্তের লয় ঘটিয়া থাকে। চিত্ত নিজে যেখানে লয়প্রাপ্ত হয়, সেখানে দ্বিতীয় বস্তু ধারণা করা চিত্তের সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধ্যান হইতেই পারে না, ইহাতে এমন কথা বলা হইল না। যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়া ভিন্নও ব্রাহ্মণদিগের নিত্যনৈমিত্তিক উপাসনাদি ব্যাপারে যে সকল বেদমন্ত্রের প্রয়োগ আছে, নিয়ত তদনুশীলন করিতে থাকিলে ঈশ্বরের এই সর্বসংহারক মূর্তি গৌণভাবে চিন্তা করা হইয়া থাকে। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান মনুষ্যগণ এই সকল তত্ত্বে প্রবেশ করিতে অসমর্থ দেখিয়া প্রাচীন মুনিঋষিগণ তাহাদের জন্য রজস্তমোভাবাপন্ন বিবিধ কর্মকাণ্ডের উপদেশ করিয়াছেন। তাহারা বিধিমত কর্ম করিতে থাকিলে সাংখ্যতত্ত্ব বিচার না করিয়াও হৃদয়মধ্যে এই সকল তত্ত্বের স্ফুরণ অনুভব করিয়া থাকেন। এজন্য তাহাদের আর সাংখ্যশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিশিষ্ট আয়াস ভোগ করিতে হয় না। কর্মজনিত শ্রমদ্বারাই চরম পথে অগ্রসর হইতে পারেন। বহুকাল বঙ্গদেশে সাংখ্যশাস্ত্রের চর্চা ছিল না, কিন্তু কর্মকাণ্ডের বিশেষ আদর ছিল। তাহাতেই বঙ্গদেশীয় কর্মকাণ্ডকুশল পুরোহিতগণ বিস্তৃতভাবে ভূতশুদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের মধ্যে চব্বিশতত্ত্বের বিষয় চিন্তাপূর্বক দেহ শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহারাই কর্ম করিয়া অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়াছেন। হায়, সেদিন আজ কোথায়!

শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডের ভাব এখনকার লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। পূর্বকালে

যাঁহারা যজ্ঞাদি করিয়া সত্ত ফল দেখাইয়াছেন, তাঁহারাও যজ্ঞাদির বিজ্ঞান জানিতেন না; এক্ষণে যাহারা মন্ত্র পড়িয়া সাপের বিষ নামায়, কি কারণে ঝাড়া দ্বারা বিষের শক্তি খর্ব হয়, তাহা বলিতে পারে না। জানাটা 'সবিজ্ঞান' না হওয়াতে উহা শুনা কথাই রহিয়া গিয়াছে, দেখা কথার মত অনুভূতিলব্ধ হয় নাই। বেদের প্রতি লোকের অনাস্থা হওয়াতেই, কর্মকাণ্ডের প্রতি নিষ্ঠা নাই, সুতরাং ফললাভেরও প্রত্যাশা নাই। শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলে, সেই অভাব দূর হইয়া আর্যসন্তান কর্মকাণ্ডে শ্রদ্ধাবান হইতে পারে, এমন আশা করা যায়।

'যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণাং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥'

ওঁ তৎসৎ ওঁ

গীতায় 'চাতুর্বর্ণ্য' বিচার

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

পূর্ব প্রবন্ধে (শ্রীভারতী, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) বলা হইয়াছে, গীতার "চাতুর্বণ্য" যৌগিক তত্ত্বের দিক দিয়া মানবের চারিটা জাতি নির্দেশ করে না, উহা নিষ্কাম কর্ম-যোগ (জ্ঞানযোগ) নির্দেশক। বিষয়টাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে ক্রিয়া, ধ্বনি ও ভাব এ তিনটী অভেদাত্মক বা সমসূত্রে গ্রথিত অর্থাৎ ক্রিয়া থাকিলেই সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি থাকিবে এবং ধ্বনি থাকিলে ক্রিয়া থাকিবে। ধ্বনি ব্যতীত ক্রিয়ার এবং ক্রিয়া ব্যতীত ধ্বনির অস্তিত্ব নাই ; পক্ষান্তরে, ক্রিয়া যে ভাবের বা প্রকারের, ধ্বনিও তদ্রূপই হইবে। ক্রিয়ার মৃদুমধ্য-অধিমাত্র ভেদে ধ্বনিরও তদ্রূপ প্রকারভেদ হইবে। আবার ক্রিয়ার কাল পর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়ার কর্তাও (পরিচালকও) তৎসঙ্গে সংলগ্ন থাকিবে, কারণ ক্রিয়াসহ কর্তা সংলগ্ন না থাকিলে ক্রিয়া অস্তিত্বহীন। কর্তাই ক্রিয়ার আধার এবং ক্রিয়া আধেয়। আধার ও আধেয় এক নহে, উহা পরস্পর বিপরীত ; কাজেই কর্তা নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় অবস্থা অবলম্বনেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই তত্ত্বগুলি ভালরূপ বুঝিতে না পারিলে "চাতুর্বণ্য" তত্ত্ব সম্যক্ ধারণাতেই আসিবে না এবং তদবস্থায় কল্পনার পর কল্পনা আসিয়া বিভ্রান্ত করিবে।

বিশ্বসৃষ্টির স্পন্দনের ভিতরে দুইটা অবস্থা বর্তমান—বিক্ষেপণ ও আকর্ষণ। বিক্ষেপণের অন্তরালে আকর্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া বিক্ষেপণকে সংযত ও সুরক্ষিত রাখিয়াছে ; নতুবা শুধু বিক্ষেপণে সৃষ্টিবিপর্যয় ঘটিত। বিক্ষেপণ থাকা কাল পর্যন্ত আকর্ষণ অননুভব্য, কিন্তু বিক্ষেপণ নিবৃত্ত হইলে পর আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া স্বতঃই তাহার নিঃশব্দপূর্ব স্বরূপে চলিয়া যায়। বিক্ষেপণ একটা গতি এবং বিক্ষেপণের অভাবকারী বলিয়া আকর্ষণ অগতি। বিক্ষেপণ না থাকিলে আকর্ষণকে কে জানিত ? আকর্ষণ সঙ্কোচাত্মক একটা ক্রিয়া দৃষ্ট হইলেও বস্তুতঃ ইহা ক্রিয়া নহে। বিক্ষেপণে স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিলে পর বিক্ষেপণের নিবৃত্তিতে পুনঃ স্বরূপে প্রত্যাগমন কালে বিক্ষেপণের অভাবকারী আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই আকর্ষণটা সম্পূর্ণ বিক্ষেপণসাপেক্ষ। এই আকর্ষণেও ধ্বনি বিজড়িত : এই ধ্বনি বিক্ষেপণাত্মক ধ্বনির সংহারকারী। এই ধ্বনির শেষ পরিণতি নিঃশব্দ, নিস্পন্দ অবস্থা। বিক্ষেপণ ও আকর্ষণে চারিটা ধ্বনি-শব্দ বা বর্ণ জড়িত। এই চারিবর্ণের ভেদে জীব-জগতের পদার্থনিচয়ের ভেদ ও বৈচিত্র্য। গুণকর্মের ভেদে (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের

ও স্পন্দনের ক্রিয়াভেদে) চারিবর্ণের ভেদ হইয়া সংযোগ, বিয়োগ বা চালনা ভেদে জীবদেহের ও সৃষ্ট পদার্থসমূহের ভেদবৈষম্য হইয়াছে। ইহা যেমন সৃষ্টির সর্বত্র, তেমনি সর্বমানবদেহে প্রাণীমাত্রেরই দেহে বর্তমান। এই চাতুর্বর্ণ্য-তত্ত্ব সম্যক অবগত না হইলে সাধনার ব্যাপার বুঝা দুরূহ। দেশ ভেদে মানবের ভাষার ভেদ হইলেও এই চাতুর্বর্ণ্যের ভেদ হয় না। মানব দেহে যে স্বভাবজ গত্যাত্মক ক্রিয়া বর্তমান, যাহা জীবিতকাল পর্যন্তই অবিরাম গতিতে, এমন কি সুষুপ্তিদশায়ও দেহীর ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা না করিয়াই স্বভাবের নিয়মে চলিয়াছে এবং যাহার অভাবে মৃত্যু সংঘটিত হয়, ঐ ক্রিয়াতত্ত্ব বুঝিলেই চাতুর্বণ্য বুঝা যাইবে। ঐ ক্রিয়ার উপর দেহের স্বাতন্ত্র্য নাই। উহার কর্তা দেহ নহে। উহার কর্তা দেহাতিরিক্তভাবে দেহ মধ্যেই অবস্থিত। গীতাতে আছে :—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥" (১৩।২২)

অর্থাৎ "তিনি আত্ম পুরুষ, এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও দেহ হইতে ভিন্ন, কারণ তিনি সাক্ষীস্বরূপ অনুগ্রাহক বিধানকর্তা, প্রতিপালক মহেশ্বর ও অন্তর্যামী।"—বিক্ষেপণাত্মক বহির্গতিকে শ্বাস (অপানবায়ু) এবং আকর্ষণাত্মক গতিকে প্রশ্বাস (প্রাণবায়ু) কহে। এই শ্বাস ও প্রশ্বাস-সহচর ধ্বনি মূলতঃ চারিটী—তাহাই চতুর্বর্ণ। এই চতুর্বর্ণের গোড়াতে বা আদিতে "ম্"-কারাত্মক অস্ফুট ধ্বনি রহিয়াছে যাহাকে প্রণব কহে। এই প্রণবই বিক্ষেপণ গত্যাধিক্যে আহত হইয়া চারিবর্ণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেহাভ্যন্তরে ক্রিয়াপ্রান্তে দেহাতিরিক্তভাবে অবস্থান করিয়া ঐ ক্রিয়া যিনি পরিচালনা ও নিয়মিত করিতেছেন তিনিই ক্রিয়ার কর্তা। এই কর্তাসন্নিধানে যাইবার জন্য বা কর্তাকে পাইবার জন্যই সাধনা। ক্রিয়াপ্রান্তে যাইতে পারিলেই কর্তার সন্ধান পাওয়া যায়, সুতরাং তন্নিমিত্ত ঐ ক্রিয়াই একমাত্র অবলম্বনীয়; কিন্তু ক্রিয়া কোনরূপ সত্তাবান বা আকারবিশিষ্ট পদার্থ নহে যে, কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা ধরিতে পারা সম্ভব, ক্রিয়া একটা আলোড়ন বা নড়চড়মাত্রই—যাহা অবলম্বন ব্যতীত অপ্রকট থাকে। সুতরাং ক্রিয়ার গতিতে ভেদ জন্মাইতে বা তাহা অবলম্বন করিতে যাওয়া ব্যর্থপ্রয়াস। কিন্তু পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ক্রিয়া ও ধ্বনি অভেদাত্মক। সুতরাং ধ্বনি দ্বারা বা তদবলম্বনে ক্রিয়ার ভেদ করা বা ক্রিয়াপ্রান্তে যাওয়া সম্ভবপর এবং ধ্বনি ধরিবার ইন্দ্রিয় রহিয়াছে শ্রবণেন্দ্রিয়। কর্ণযোগে ধ্বনি ধরিয়া দিক্ নির্ণয় করতঃ উৎপত্তি স্থানের দিকে যাইতে থাকিলে প্রান্তদেশে পৌছিয়া কর্তার সন্ধান পাওয়া যায়। ধ্বনি শ্রবণের পর দিক্ নির্ণয় না করিলে লক্ষ্য স্থির হয় না। বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রথমতঃ আমরা দিক্ নির্ণয় করি, তৎপর ধ্বনি ধরিয়া ধ্বনি-প্রান্তে পৌছিয়া কর্তার (বংশী বাদকের) সন্ধান পাই। উহাও তদ্রূপই। এখন দেখিতে হইবে, দেহের সহজাত ক্রিয়াতে কি ধ্বনি বর্তমান এবং উহার গতিবিধিই বা কিপ্রকারের এবং তাহা অবলম্বনের প্রণালী কীদৃশ। তাহা হইলেই নির্ণয় করিতে হইবে শ্বাস ও প্রশ্বাস-তত্ত্ব এবং তৎসহচর ধ্বনি-তত্ত্ব।

এইগুলি কল্পিত কথার কথা নহে, কার্যতঃ অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

শ্বাসক্রিয়া যখন বিক্ষেপণে নাসারন্ধ্রপথে বহির্গমন করে, তখন যুগপৎ ঐ ক্রিয়ার অপরাংশ দেহাভ্যন্তরপথে কণ্ঠাদি অতিক্রম করিয়া মূলাধার (লিঙ্গমূল) পর্যন্ত গমন করে। পুনঃ যখন প্রশ্বাস ঊর্ধ্বগমন করে, তখন নাসাপথগামী ক্রিয়াংশ দ্বিদল (ভ্রূমধ্যস্থান, কপালবিবর) অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরাংশ মূলাধার হইতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথগামী অংশ দ্বিদলে পৌঁছে। পুনঃ অধঃগমনে শ্বাসক্রিয়া যেমন নাসাপথ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি আভ্যন্তরীণ অংশ কণ্ঠ পর্যন্ত নামিলেই মূলাধার হইতে ঊর্ধ্বগামী অংশ ইহার সঙ্গে কণ্ঠে মিলিত হয়। এই জন্যই কণ্ঠ সম্মিলনের স্থান। এইভাবে যাওয়া-আসা, আসা-যাওয়া জীবিতকাল পর্যন্ত অবিরাম চলিয়াছে। ইহা যেন ঠিক একটা জোয়ার ভাটার ক্রিয়া। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল।

নাসাপথগামী বহির্গতির (শ্বাসের) প্রতি লক্ষ্য করিলে শ্রুত হইবে, ঊর্ধ্বদিক হইতে "উঁ"-কারাত্মক ধ্বনি বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে "হ"-কারাত্মক ধ্বনির সঙ্গে জড়িত হইয়া অর্থাৎ "হুঁ"-কারাত্মক ধ্বনি করিয়া বাহিরে চলিয়া যায় এবং যুগপৎ ঐ ক্রিয়ার অপর অংশ অভ্যন্তর পথে "হ্"-কারাত্মক ধ্বনি করিয়া মূলাধার পর্যন্ত গমন করে। এই "হ্" কুম্ভন। প্রসবাদি কালে সুস্পষ্ট শ্রুত হয়। পক্ষান্তরে, প্রশ্বাসকালে আকর্ষণমূলে শ্বাসক্রিয়ার ঊর্ধ্বগমনে নাসাপথে যে ধ্বনি শ্রুত হয় তাহা "উঁ" এবং মূলাধার হইতে ঊর্ধ্বগমনে কণ্ঠ পর্যন্ত যে ধ্বনি তাহা "অ"। ইহার অপর একটী প্রমাণ, মুখ-বিবর বন্ধ করিয়া শুধু নাসাপথ দিয়া শ্বাসক্রিয়া পরিচালনা করিলে শ্রুত হইবে বিক্ষেপণে "হুঁ" এবং আকর্ষণে "উঁ" অর্থাৎ নাসাপথে যাতায়াত কালে "উঁ-হুঁ" ধ্বনি হইতেছে। আবার নাসাপথ রুদ্ধ করিয়া শুধু মুখবিবর দিয়া শ্বাসক্রিয়া পরিচালনা করিলে, শ্রুত হইবে, বিক্ষেপণে "হ্" এবং আকর্ষণে "অ" অর্থাৎ যাতায়াতে 'অ-হ' ধ্বনি হইতেছে। দেহ ও দেহের ক্রিয়ার তারতম্যে ধ্বনিরও মৃদু মধ্য অধিমাত্র ভেদ হইয়া থাকে। তবেই দেখা গেল, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াসহচর যে ধ্বনি তাহা "উঁ-হুঁ" "অ-হ্"। এই গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে এই হয়, যথা :—

উঁ = উ + ম্
হুঁ = হ্ + অ = হ + উ + ম্
অ-হ্ = অ-হ্

} = অ-হ-উ-ম্। এই চারিটা বর্ণই "চাতুর্বর্ণ্যম্"।

"চত্বারঃ বর্ণাঃ এব ইতি "চাতুর্ব্বর্ণম্"। স্বার্থে ষঞ্ প্রত্যয়। "চতুর্ব্বর্ণ" শব্দ যে অর্থের বাচক তাহাই তাহার স্বার্থ অর্থাৎ ইহা চারিটা বর্ণ, অক্ষর বা ধ্বনির বাচক। অন্য কিছুর নহে। (পূর্ব প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে, বর্ণ অর্থাৎ অক্ষর বা ধ্বনি বা শব্দ)। এই বর্ণচতুষ্টয় যে শুধু মানব-দেহেই নিবদ্ধ তাহা নহে। ইহা সৃষ্টি-স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র বিদ্যমান। শ্বেতাশ্বেতরোপ-

নিষদে আছে—"সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্‌হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে"। পূর্বে বলা হইয়াছে, বিক্ষেপণের অন্তরালে আকর্ষণ না থাকিলে সৃষ্টি বিপর্যয় ঘটিত, তাই বিক্ষেপণের "হুঁ" কারের অন্তরালে বিন্দুসংযুক্ত আকর্ষণাত্মক 'উঁ' বর্তমান থাকিয়া বিক্ষেপণকে সংযত ও সুরক্ষিত রাখিয়াছে। বিক্ষেপণ উৎপত্তির গোড়াতে এবং আকর্ষণের লয়ের স্থানে "ম" কারাত্মক যে সূক্ষ্মধ্বনি (প্রণব), তাহা "হ্" সংযোগে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া "উঁ"কারে পরিণত হইলে পর "হ্" কারের ক্রমাগত ঘাত প্রতিঘাতে স্খলিত হইতে হইতে ক্রমবিকাশে দেহ মধ্যে ৪৯টী মৌলিক ধ্বনির পত্তন হইয়াছে। বহির্গতিতে যে "হুঁ", ইহার "হ" কারই বিক্ষেপণের ভাগ এবং উঁ (অ-উ-ম্=ওঁ) আকর্ষণের ভাগ এবং আকর্ষণের ভাগই বিক্ষেপণকে সংযত রাখিয়াছে। এই বিক্ষেপণাংশ ("হ"কে যদি (অ হ-উ-ম্) হইতে বিযোগ বা বিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হয়, তবে অবশিষ্ট থাকে (অ-উ-ম্) যাহা ঊর্ধ্বগতি বা আকর্ষণমূলে একীভূত উঁ বা ওঁ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া একাক্ষর বা অদ্বয় "ম্" কারাত্মক সূক্ষ্ম ধ্বনিতে পর্যবসিত হইয়া নিঃশব্দ নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয় পরমাত্ম স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়। ঐ নিঃশব্দাবস্থাই ব্রহ্মস্বরূপ! দেবদেব মহাদেব পার্বতীকে ব্রহ্মোপদেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নিঃশব্দন্তং বিজানীয়াৎ সভাবো ব্রহ্ম পার্বতি!" এই অ-উ-ম = ওঁ ধ্বনির পরিণতি "ম্"কার বলিয়াই বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে "ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম"। এই একাক্ষর প্রণবে ও ব্রহ্মে অভেদ "হংস প্রণবয়োরভেদঃ" এই জন্যই প্রণবকে ব্রহ্ম বলা হয়। শব্দ বা প্রণব-সাধনাতে বাহ্যিক বিষয়েতে জ্ঞান করিতে হয় বলিয়া আকার-জ্ঞানের সূচনা ও বাসনা কামনার উদ্রেক হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনা কহে। এই নিষ্কাম কর্মযোগ-বিষয়ক উপদেশ দিতে গিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোক দ্বারা ঐ তত্ত্বের সূত্রপাত করেন। ইহার সঙ্গে অষ্টপাশের অন্তর্গত "জাতির" কোনই সম্পর্ক নাই।

শ্লোকটীর ভিতরে যে "ময়া" আছে, তদ্দ্বারা রূপকের ভিতরে প্রণবের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদে, শব্দব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, বিষ্ণু, গুরু ও প্রণব একার্থবাচক বলিয়া কথিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের গুরু এবং গুরুরূপেই উপদেশ দিয়াছিলেন। গুরুস্বরূপ প্রণব হইতেই বর্ণচতুষ্টয়ের উদ্ভব, এইজন্যই "ময়া" বলিয়াছিলেন। শ্লোকটীর ২য় চরণে আছে, "তস্য কর্তারমপিমাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্" অর্থাৎ তাহাদের (চারিবর্ণের) কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা বলিয়াই জানিও এই অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট, অনিশ্চিত উক্তির তাৎপর্য এই যে, প্রণব-অবস্থায় স্বরূপাবস্থা ব্যতীত শব্দতন্মাত্র অবস্থার বিকাশ হওয়ায় স্পন্দনাভিঘাতে আহত হইতে হইতে প্রণবই ব্যাপ্তস্পর্শাকারে পরিণত হইয়া দৃঢ়ানুভূতির আকার ধারণ করায় চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে; তজ্জন্যই প্রণব বা গুরুই চারিবর্ণের মুখ্য কর্তা। পক্ষান্তরে, প্রণবের অস্তিত্ব স্বরূপাবস্থা (ব্রহ্মস্বরূপ) ব্যতীত নহে বলিয়া স্বরূপাবস্থাও কর্তাই, তবে এই সম্পর্কটা গৌণ। কর্তাই হয়েন অথবা কর্তা নহেন, এই অস্পষ্ট উক্তির ইহাই কারণ। যেমন সূর্য্যকিরণ জাগতিক বস্তুনিচয় প্রকাশ করিলেও সূর্য মুখ্য কর্তা নহেন, কিরণই মুখ্য কর্তা,

অথচ কিরণের অস্তিত্ব সূর্য ব্যতীত নহে বলিয়া গৌণভাবে সূর্যও কর্ত্তাই, উহাও তদ্রূপই। "জাতির" প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে স্বতঃই প্রতীতি হইবে যে, জাতির সহিত ঐ শ্লোকের কোনই সম্পর্ক নাই। কোন বাস্তব পদার্থ বা সত্ত্বাবান আকার না থাকিলেও মানব কল্পনা দ্বারা, শূন্যে গন্ধর্বনগর সৃষ্টির ন্যায়, ভাষাগত একটা কল্পিত আকার গঠন করিয়া, ঐ কল্পিত আকারকে বিষয়বোধে তাহাতে কল্পিত নাম বা সংজ্ঞা আরোপ করিয়া ঐ সংজ্ঞানুযায়ী উহা বুঝিতে অভ্যাস করে। অভ্যাস দৃঢ় হইয়া পড়িলেই জ্ঞান ঐ আকার দ্বারা অধ্যস্ত হয়। ইহা ছাড়া জাতির আকার আর কি হইতে পারে? এই কল্পিত স্বরূপের স্থান স্বরূপ-সাধনার বা নিষ্কাম কর্মযোগ সাধনার ত্রিসীমানার ভিতরেও নাই। এক শ্রেণীর সাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ভাষাবিদ্ ভাষ্যকার গীতার মর্ম একে আর বুঝিয়া কপোলকল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সর্বধর্মময়ী গীতার মর্যাদা লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছেন। এখন সুধী পাঠকবৃন্দ চিন্তা করিয়া দেখুন গীতোক্ত "চাতুর্বর্ণ্যং" দ্বারা মানবকল্পিত চারিটা জাতি নির্দেশ করে কিনা।

ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, বিক্ষেপণ গতি বারিত করিতে হইলে "হ্"কার বিলোপ করিয়াই করিতে হইবে, অন্য কোন উপায়ে নহে। বিক্ষেপণাত্মক "হ"কে প্রবল পরিপুষ্ট রাখিয়া ব্রহ্মচিন্তা সম্ভবই নহে। "হ্"কার বিলোপ না করিয়া সাময়িক একটা ব্রহ্মচিন্তার উদ্রেক হইলেও বহির্গতির প্রভাবে তাহার স্থায়িত্বের কোনই সম্ভাবনা নাই। "হ্"কার ধ্বংসের উপায় বা কৌশলটাই নিষ্কাম কর্মযোগ-সাধনা। ভগবান্ ঐ কৌশলটার আভাস দিতে গিয়াই "চাতুর্বর্ণ্যং" বলিয়াছিলেন। ভগবান্ ইতিপূর্বে (২য় অঃ ৫০) "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্" দ্বারা যে অস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন পরে তাহারই আভাস দিলেন এই ৪র্থঃ অঃ ১৩শ শ্লোকের ভিতর দিয়া এবং তাহা আরো বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিলেন ৪র্থঃ অঃ ২৯।৩০ শ্লোকগুলি দ্বারা। ৮ম অঃ ২৪।২৫।২৬শ শ্লোকগুলিও এই কর্মেরই সমর্থন করে। এই যে সাধনার কৌশলটা ইহা এক অভিনব তত্ত্ব ও গুহ্য এবং গুরুগম্য।

কাব্য ও মহাকাব্য

শ্রীপান্নালাল চক্রবর্তী এম্. এ., সাহিত্যভূষণ

১। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং।" সুতরাং কাব্য গদ্যে, পদ্যে, কিম্বা উভয়েই রচিত হইতে পারে।

২। কাব্য দুই প্রকার—দৃশ্য ও শ্রব্য। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ, যথা মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। এতদ্ব্যতীত গদ্য-পদ্যময় আর একপ্রকার কাব্য দৃষ্ট হয়—তাহাকে চম্পূকাব্য বলে।

৩। বাচ্য এবং অর্থালঙ্কারের দিক দিয়া কাব্যকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য থাকিলে কাব্যকে ধ্বনি-কাব্য এবং বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব বিদ্যমান থাকিলে তাহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গকাব্য কহে।

৪। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিকে মহাকাব্য, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতিকে খণ্ডকাব্য, সপ্তাবশতক প্রভৃতিকে কোষকাব্য, এবং নাটকগুলিকে দৃশ্যকাব্য বলা যায়।

৫। ইহা ব্যতীত আর একপ্রকার কাব্য আছে, তাহাকে গীতিকাব্য কহে। তান-লয়-বিশুদ্ধ এবং সুরসম্বদ্ধ শ্লোকসমূহকেই উক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ব্রহ্মসংগীত, বৈষ্ণব পদাবলীর নাম করা যাইতে পারে।

৬। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু কাব্যকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বিষয়নিষ্ঠ এবং আত্মনিষ্ঠ (objective and subjective)। সভ্যতার আদিম ও মধ্যযুগে এই বিষয়নিষ্ঠ কাব্যের বিকাশ ও বৃদ্ধি। ইহাতে "নিসর্গের অভিনব উল্লাস" এবং জাগতিক ঘটনাবলীর পরস্পর অভিঘাতে সঞ্জাত বিস্ময় বর্তমান। সভ্যতার পরিণত অবস্থায় কবির ব্যক্তিত্ববোধ যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন সে বিষয়কে "আপন মনের মাধুরী" মিশাইয়া দেখিতে শিখিল। গাথাকাব্য, মঙ্গলকাব্য এবং মহাকাব্যকে প্রকৃত বিষয়নিষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাবতীয় সাহিত্যই অর্থাৎ অভিনয়াত্মক, বর্ণনাত্মক, নাট্য, কথা এবং রোমান্স-সাহিত্য আত্মনিষ্ঠ সাহিত্য পদবাচ্য।

৭। মহাকাব্যকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—Authentic ও Literary. রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড্ প্রভৃতিকে প্রথম পর্যায়ে এবং মেঘনাদবধ, রঘুবংশম্, Paradise Lost প্রভৃতিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলা যায়।

৮। Authentic শ্রেণীর মহাকাব্যের লক্ষণগুলি বিচার করিতে যাইয়া ইদানীন্তন কালের পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন,—ইহা হইবে সরল, বিষয়নিষ্ঠ, দৃঢ় এবং সমুন্নত—

বাস্তববস্তুর সমাবেশ ইহাতে প্রচুর পরিমাণে থাকিবে—ইহা আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্তু বহুকাল যাবৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণের নিকট এই তথ্যটী উদিত হয় নাই। তাই তাঁহারা এতকাল ধরিয়া মহকাব্যের যে সংজ্ঞা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল কয়েকটী বা হ্যস্থূল লক্ষণ। লক্ষণগুলি এখানে লিখিত হইল।

৯। বহুসর্গ থাকিবে, একজন ধীরোদাত্তগুণসমন্বিত নায়ক থাকিবেন, তিনি ক্ষত্র-বংশসম্ভূত ও দেবস্বভাব হইবেন, প্রধান রস হইবে শৃঙ্গার, বীর-শান্ত ইহাদের মধ্যে একটী, ইহার মধ্যে নাটকের পঞ্চসন্ধি থাকিবে, ঐতিহাসিক বা অনুরূপ কোন কাহিনীকে আশ্রয় করিয়া কাব্যের গল্পাংশ গঠিত হইবে, ইহা চতুর্বর্গের একটী ফলপ্রসূ হইবে, প্রারম্ভে আশীর্বচন, মঙ্গলাচরণ, নমস্করণ প্রভৃতি থাকিবে, সূর্য-চন্দ্র, উষা-সন্ধ্যা-রাণী প্রদোষ, সম্ভোগ-বিরহ, বিবাহ, সন্তানজন্ম, রণপ্রয়াস প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে এবং সর্গের নামকরণ হইবে কবি, তাঁহার বিষয়বস্তু, নায়ক বা অন্য কাহারও নামানুসারে।

১০। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য এপিক্ এবং প্রাচ্য মহাকাব্য এতদুভয়ের লক্ষণ বিচার করিয়া বাঙ্গালা মহাকাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে চারিটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাহা হইতেছে আখ্যানভাগ, ভাষা, নায়কাদির চরিত্রাঙ্কন এবং ভাব ও রস।

১১। আখ্যানভাগে একত্ব, সমগ্রত্ব, এবং গৌরব থাকিবে। যে মহাপুরুষের অবদান কীর্তিত হইতেছে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র চরিত্র ও ঘটনাবলী একত্ব প্রাপ্ত হয়। আখ্যান-বস্তুর কালগত ঐক্যও বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। সর্গদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান থাকিলে এই একত্বের হানি হয়। ঘটনাবস্তুর সহিত যাহা সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে তাহার অবতারণা থাকিলে কাহিনীর সমগ্রত্বের হানি হয়। যাহার অবতারণা ঘটনা-বস্তুর পরিপুষ্টি বা পরিণতির জন্য করা প্রয়োজন তাহা বর্জিত বা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ নাটকীয় পঞ্চসন্ধির উল্লেখ করিয়া, মহাকাব্যের এই একত্ব ও সমগ্রত্বের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহাকাব্যের গৌরব রক্ষার্থে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষুদ্রতম অংশেও মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য, মহিমা, ও সমুন্নতি থাকিবে। মহাকাব্য পাঠে আত্মা হইবে সুদৃঢ় ও সমুন্নত। যাহা কিছু তরল, লঘু, প্রগল্‌ভ, তুচ্ছ, এবং অতি সাধারণ তাহা বর্ণিত হইতে পারে না—কারণ, মহাকাব্যে কোমল কান্তের ললিত বিলাসের স্থান নাই। সূর্যোদয়, সন্ধ্যা, বিভিন্ন ঋতু, মৃগয়া, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতির বর্ণনা করিতে বলিয়া প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের এই সমুন্নতির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

১২। প্রসাদ এবং ওজোগুণসমন্বিত ভাষাই মহাকাব্যে ব্যবহৃতব্য। স্বাভাবিকতা, স্বচ্ছন্দতা, গতিশীলতা এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ শব্দাবলী ব্যবহারে এই ওজোগুণ রক্ষিত হয়। এইজন্য মহাকবিগণকে মধ্যে মধ্যে ইচ্ছানুযায়ী শব্দাবলী প্রণয়ন করিতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত উপমা, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন অলঙ্কারের প্রয়োগে ভাষার সমুন্নতি রক্ষিত হয়।

১৩। ধীরোদাত্তগুণ-সমন্বিত নায়ক-চরিত্রাঙ্কণদ্বারা মহাকাব্যের গৌরব সাধিত হয়। কিন্তু একবিধ চরিত্রাঙ্কণদ্বারাই ত' আর সেই গৌরব রক্ষিত হইতে পারে না! সেইজন্য নায়কের গুণাবলীকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য বহুবিধ চরিত্রসৃষ্টি প্রয়োজন। নাটকীয় বর্ণনভঙ্গীর দ্বারা সেই সকল চরিত্র রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্যদ্বারা নায়কের মহত্ব বৃদ্ধি করিয়া যবনিকান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১৪। মহাকাব্যের ভাব স্বাভাবিক, আবেগপূর্ণ, ও গৌরবোদ্দীপক হওয়া প্রয়োজন, নচেৎ মহাকাব্যের মর্যাদা হয় ক্ষুন্ন। অতি সাধারণ, অতি পরিচিত, অসম্ভব এবং অনভিজ্ঞাত ভাবের আমদানী ইহার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। রসবর্ণনার প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণের নির্দেশ বহুমানে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। ভাব ও রস বর্ণনায় অনৌচিত্য দোষই প্রধান দোষ।

১৫। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের "রামায়ণ" মহাকাব্য পদবাচ্য কিনা তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা বিচার করিয়া মহাকাব্যের যে লক্ষণ বিচার করা গেল, মহাকবি বাল্মীকি-কৃত রামায়ণ-কাব্যে উহার সকলগুলিই বিদ্যমান। এই কারণে ইহাকে মহাকাব্যের পর্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ঘটনার জটীলত্বের মধ্য দিয়া আখ্যানবস্তুর একত্বে আত্মার দার্ঢ্য ও সমুন্নতিবিধানকারী মহিমাময় গাম্ভীর্যপূর্ণ আখ্যান-বস্তুর পরিপুষ্টিকর বিষয়াবলীর অবতারণায়, নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বস্তুপুঞ্জের বর্ণনায়, ক্ষত্রবংশসঞ্জাত ধীরোদাত্তগুণ-সমন্বিত মহান্ নায়ক চরিত্রাঙ্কনে, আবেগময়ী ভাব এবং ওজোগুণসম্পন্ন ভাষাপ্রদানে রামায়ণ আজিও প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। শুধু বাহ্যিক লক্ষণগুলির দ্বারা বিচার করিলে ইদানীন্তন কালে লিখিত "বৃত্রসংহারও" মহাকাব্যের শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু তর্কের খাতিরে, আলঙ্কারিক সূত্র প্রয়োগ বলে ইহাদিগকে মহাকাব্য-পর্যায়ে স্থান দিলেও অতৃপ্ত মন যেন তাহাতে ভরিয়া উঠে না। ভাষায় অপ্রকাশ্য মনের সেই অতৃপ্তি দূরীভূত করিতে হইলে আমাদিগকে রামায়ণ মহাভারতেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

১৬। এক কবি যখন আর এক কবির কাব্য-সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তখন তাহা হইয়া উঠে অপূর্ব। কবি-চিত্তের রসঘন অনুভূতিতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয় তিনি তদ্দ্বারাই বিচার-কার্যে অগ্রসর হন। সে বিচার সূক্ষ্মভাবে ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্রানুসরণ না করিলেও, রসিকজনের তাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের সমালোচনা করিয়াছেন, ভাব ও রসের ক্ষেত্রে তাহার স্থান অতি উচ্চ। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিনিষেধ দ্বারা পরিচালিত না হইলেও তিনি অনুভূতি বলে রামায়ণের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রামায়ণকে মহাকাব্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁর মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি লিখিয়াছেন, "এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটী সমগ্র দেশ একটী সমগ্র যুগ আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবসাধারণের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে। এই শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়।

বস্তুতঃ ব্যাস, বাল্মীকি কাহারও নাম ছিল না। ও ত' একটা উদ্দেশে নামকরণ মাত্র। আধুনিক কোন কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা করিয়াছে। এইজন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলেই চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে—রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। শ্রদ্ধার সহিত শুদ্ধ হইয়া বিচার করিতে হইবে, সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

১৭। "বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক্ বলে এইরূপ সাধারণের ধারণা। রামায়ণেও যুদ্ধব্যাপার যথেষ্ট আছে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। "দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভি গুণৈর্যুতং। শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভি র্যোমুক্তঃ নরচন্দ্রমাঃ॥" রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনের জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে,তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য।

শুক্রনীতিসার

বঙ্গানুবাদ—পূর্বানুবৃত্ত

শ্রীগণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন

রাজা রাজধানীতে বাসকালে দৈনিক কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিবেন। ২৭৫। রাজা রাত্রির শেষপ্রহরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দুই মুহূর্ত (৪ দণ্ড=১৩৬ মিনিট) পর্যন্ত নিয়ত (বরাদ্দ) আয় কত ও নিয়ত ব্যয় কত, কোষভূত (ধনভাণ্ডারের) দ্রব্যের কত ব্যয় বরাদ্দ আর কত ব্যয় হইয়াছে. ব্যবহারে (মোকর্দ্দমায়) এবং মুদ্রা সম্পর্কে কত ব্যয় হইয়াছে, এই সকল লেখা হইতে প্রত্যক্ষরূপে জানিবেন এবং অদ্য কত ব্যয় হইবে, তাহা জানিয়া তত্তুল্য দ্রব্য কোষাগার হইতে লইবার হুকুম দিবেন। (ইহা বাজেট পরিদর্শন)। ২৭৬-৮। পরে এক মুহূর্ত (২ দণ্ড বা ৪৮ মিনিট) মধ্যে বেগনির্মোক্ষ (শৌচক্রিয়া) এবং স্নান শেষ করিবেন। পরের দুই মুহূর্ত মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যা, পুরাণ-শ্রবণ এবং দান করিবেন। প্রাতর্মুহূর্তে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর এক মুহূর্ত মধ্যে) গরু (পাঠান্তরে —হাতী) ঘোড়া গাড়ী চড়িয়া ব্যায়াম করিবেন। ২৭৯। পরের মুহূর্তকাল পারিতোষিক দান করিবেন। তৎপরের চার মুহূর্ত ধান্য, বস্ত্র, স্বর্ণ, রত্ন, সেনা ও দেশ (অথবা সেনার প্রতি আদেশ) প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিলেখন (লিখিত আদেশ) এবং আয়-ব্যয়ের আলোচনা করিবেন। তাহার পরে এক মুহূর্তমধ্যে আপনার সুহৃৎগণের সহিত রাজা সুস্থচিত্তে ভোজন করিবেন। ২৮০-১। অনন্তর এক মুহূর্ত জীর্ণ এবং নূতন দ্রব্যাদি দেখিবেন। পরে দুই মুহূর্ত বিচারপতিগণের দ্বারা বিচারিত মোকদ্দমার শেষবিচার করিবেন (Final Apeal Court)। পরের দুইমুহূর্ত মৃগয়া ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিবেন। একমুহূর্ত ব্যূহাভ্যাস (সৈন্য সাজান পর্যবেক্ষণ Arraying) করিবেন। এক মুহূর্ত সায়ংসন্ধ্যায় অতিবাহিত করিবেন। ২৮২-৩। একমুহূর্ত ভোজনে কাটাইবেন। দুইমুহূর্ত গুপ্তচরের নিকট হইতে সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিবেন, এবং শেষ আটমুহূর্ত নিদ্রার সময়। ২৮৪। এইরূপ ত্রিশমুহূর্তাত্মক দিবারাত্রিকে বিভাগ করিয়া যে রাজা কালাতিপাত করেন তিনি সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করেন। ২৮৫। কিন্তু রাজা স্ত্রী-সম্ভোগ এবং মদ্য সেবনে বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। যেকালে যে কার্য উচিত নিঃশঙ্কচিত্তে তৎক্ষণাৎ সেইকার্য করিবেন। কেননা যথাকালের বৃষ্টি সকলকে পুষ্ট করে এবং অকালের বৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়। ২৮৬।

নীতিমান্ অনীতিনীতিবিদ্ (নীতিশূন্যতার দোষ বুঝিবার শক্তিসম্পন্ন) রাজা অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী চার পাঁচ বা ছয়জন শ্রেষ্ঠযামিক (প্রহরী) কর্তৃক সর্বদা স্বীয় (রাজার) কার্যস্থানগুলি গোপন (অর্থাৎ সুরক্ষিত) করিবেন। ২৮৭-৮। প্রতিদিন যামিকদিগের বদলী করিবেন। ঐ কার্যস্থানগুলির দৈনিক সংবাদ লেখকাধিপের (Secretary) নিকট হইতে

শুনিবেন। ২৮৯। গৃহপংক্তিমুখে (গৃহশ্রেণীর প্রারম্ভে) চৌকীদারের দ্বার (ঘাঁটী) থাকিবে। এই চৌকিদারগণের মাহিনা গৃহস্থগণের নিকট হইতে আদায় হইবে। (অর্থাৎ চৌকিদারী tax প্রজার দেয়)। রাজা এই যামিকগণের দৈনিক কার্যের বৃত্তান্ত (report) উহাদিগের নিকট হইতে শুনিবেন অথবা ঐ যামিকদিগের নিকট হইতে গৃহস্থদিগের দিনচর্যা শুনিবেন। ২৯০। যামিকগণ (Police) যাহারা গ্রাম হইতে বাহিরে যাইবে এবং যাহারা গ্রামে আসিবে তাহাদিগকে যত্নপূর্বক শোধন (পরীক্ষা search) করিবে এবং লগ্নক (ছাড়পত্র অথবা জামিন) পাইয়া গতায়াত করিতে দিবে। ২৯১। যাহারা প্রখ্যাতবৃত্তশীল (অর্থাৎ প্রসিদ্ধ কর্মাদিদ্বারা সুপরিচিত) তাহাদিগকে বিনা পরীক্ষাদিতে ছাড়িয়া দিবে। চোর এবং লম্পট-গণের নিবারণের জন্য প্রতি বীথিতে প্রহরীগণ রাত্রিকালে অর্ধযাম (১॥০ ঘণ্টা) অন্তর ভ্রমণ করিবে। ২৯২½।

রাজা সর্বদা প্রজাদিগকে কিভাবে শাসন করিবেন তাহা এক্ষণে বলা হইতেছে। হুকুম দিয়া (লোকদ্বারা) দাস (ক্রীতদাস), ভৃত্য, স্ত্রী, পুত্র, শিষ্যকে কখনও কড়াকথা বলাইবে না বা দণ্ড দিবে না। তুলাশাসনমান (দাঁড়ী পাল্লা এবং ওজনের সের বাটখারা প্রভৃতি), নাণক (মুদ্রা=টাকা), নির্যাস (আরক Extract), স্বর্ণাদি ধাতু, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, চর্বি, পিষ্টক (চূর্ণ দ্রব্য) প্রভৃতিতে কখনও কূট (চালাকী অর্থাৎ ওজনের তফাত এবং অন্য দ্রব্যাদিতে ভেজাল) চালাইবে না; জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে লিখাইয়া লইবে না। ২৯৩-৬। উৎকোচ (ঘুষ) লইবে না, স্বামীর কার্য বিলোড়ন অর্থাৎ মনিবের কার্য হাসিল করিবার জন্য কাহাকেও লোভ দেখাইয়া কার্য লইবে না। অপকার্যকারী, চোর, জার, রাজবিদ্রোহী, শত্রু এবং অনুরূপ অপকারকারী ব্যক্তিগণকে গুপ্ত না রাখিয়া লোক সমাজে তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দিবে। মাতা, পিতা, পূজনীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং সাধু ব্যক্তিকে অপমান বা উপহাস করিবে না। স্বামীস্ত্রীতে, প্রভুভৃত্যমধ্যে, ভাইয়ে ভাইয়ে, গুরু শিষ্যে এবং পিতা পুত্রে ভেদ জন্মাইয়া দিবে না। বাপী, কূপ, আরাম, সীমা, ধর্মশালা এবং সুরালয়ে যাইবার রাস্তা বন্ধ করিবে না। আর হীনাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ লোকের পথের বাধা জন্মাইবে না। ২৯৭-৩০০½। দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান, মৃগয়া, শস্ত্রধারণ (অস্ত্ররক্ষা বা অস্ত্রনীতি পরিচালনা To use arms or keep arms under arms act); গো গজ অশ্ব উষ্ট্র মহিষ মানুষ স্থাবর রজত স্বর্ণ রত্ন মাদকদ্রব্য এবং বিষ এইগুলির ক্রয় বিক্রয়; মদসন্ধান (চোয়ান), ক্রয়পত্র-দানপত্র-ঋণ-নির্ণয়-পত্র (deeds of sale, gift and loan) এবং চিকিৎসাকার্য; এই সমুদয় কার্য রাজাজ্ঞা ব্যতীত হইতে পারিবে না। ৩০১-৩½। মহাপাপের অভিসম্পাত, নিধি (ভূগর্ভে লুক্কায়িত অস্বামিক অর্থ) প্রাপ্তি, নবসমাজের নিয়মবিধান, জাতিদূষণ, জাতিপাত করা, অস্বামিনাষ্টিক ধন সংগ্রহ (পোড়ে পাওয়া অর্থাদির গ্রহণ), মন্ত্রভেদ (পরামর্শ প্রকাশ) এবং রাজার দোষকীর্তন কখনও করিবে না। ৩০৪-৫½। স্বধর্ম হানি, মিথ্যাব্যবহার, পরস্ত্রী বলাৎকার, মিথ্যাসাক্ষ্য, জালদলিল, অপ্রকাশ-প্রতিগ্রহ (ঘুস লওয়া), নির্ধারিত খাজনার অধিক আদায়, চুরি, এই সকল সাহস

এবং স্বামীদ্রোহ কদাচ মনেও করিবে না। ৩০৬-৭ই। দর্প, বল, বাহুবল প্রয়োগে মাহিনা, শুল্ক (customs), ভাগ (অংশ বা কর), বৃদ্ধি (বাড়্তি) আদায়ের জন্য কাহারও প্রতি সর্বদা পীড়ন করিবে না। ৩০৮ই। পরিমাণ (ভূমির মাপ), উন্মান (তরলদ্রব্যের মাপ) এবং মান (ধানাদির মাপ) রাজনির্ধারণ অনুসারে ধার্য হইবে। ৩০৯। সকল প্রজাই সদ্‌গুণ সাধনে দক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে। আততায়ীকে নিগৃহীত করিয়া সাহসের অধিকারীর (magistrate) নিকট সমর্পণ করিবে। ৩১০। উৎসর্গকৃত বৃষাদিকে উৎসর্গকারী বাঁধিয়া রাখিবে। আমার এই আদেশ সর্বদা মানিবে; যে ইহার অন্যথা আচরণ করিবে সেই পাপী ব্যক্তিকে অতি কঠিন দণ্ড দেওয়া হইবে। ইহা রাজা নিত্যই ঢেঁরা দিয়া প্রজাদিগকে জানাইয়া দিবেন। এই (পূর্বোক্ত) শাসনবাক্য গুলি লিখিয়া চতুষ্পথে স্থাপন করিবেন। ৩১১-২ই।

রাজা সর্বদাই দুর্জন ও শত্রুগণের প্রতি উদ্যতদণ্ড হইয়া থাকিবেন। ৩১৩। রাজা নীতিপূর্বক প্রজাপালন করিবেন এবং পথিকের সুখের জন্য পথ-সংস্কার করিবেন। ৩১৪। পথিকের পীড়াদায়ী দস্যুদিগকে চেষ্টা করিয়া বধ করিবেন। ৩১৪ই।

এক বৎসরে যে আয় হইবে তাহাকে ছয় ভাগ করিবে। উহার তিনভাগ সৈন্যরক্ষার্থে ব্যয় হইবে। অর্ধভাগ দানার্থে ব্যয় হইবে। অর্ধভাগ প্রকৃতির (প্রধান রাজপুরুষ) জন্য ব্যয় হইবে। অর্ধভাগ মাহিনাতে ও অর্ধভাগ রাজার নিজের জন্য ব্যয় হইবে এবং অবশিষ্ট একভাগ রাজকোষে রক্ষিত হইবে। সামন্ত প্রভৃতিও এই নিয়ম রক্ষা করিবে কিন্তু সামন্ত অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর এ নিয়ম পালন আবশ্যক নাই। ৩১৫-৭।

নৃপতি প্রাপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত যশ প্রাপ্ত কীর্তি প্রাপ্ত ধন এবং প্রাপ্ত গুণের রক্ষায় ও অপরের রাজ্যাধিকারবিষয়ে উদ্যম রাখিবেন। ৩১৮। আত্মরক্ষায় এবং শত্রুসংহারে সর্বদা অতি যত্নশীল থাকিতে হইবে। শৌর্য পাণ্ডিত্য বক্তৃত্ব, দাতৃত্ব, বল, প্ররাক্রম এবং নিত্য উত্থান (উৎসাহ) কখনও ত্যাগ করিবেন না। ৩১৯ই।

যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জন্য অথবা স্বামিকার্যের জন্য প্রাণভয় ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধ করে সেই ব্যক্তি শূর। ৩২০ই। যে ব্যক্তি পক্ষপাতশূন্য হইয়া সযত্নে বালকেরও সুবাক্য গ্রহণ করেন এবং ধর্মের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। ৩২১ই। যে ব্যক্তি রাজার সমক্ষেও নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার দোষসকল কীর্তন করেন এবং ঐ দোষগুলিকে রাজার গুণরূপে প্রশংসাবাদ করেন না, তিনিই বক্তা। ৩২২ই। যে ব্যক্তির উপযুক্ত পাত্রবিশেষে অদেয় কিছুই থাকে না, এমন কি ভার্যা, পুত্রাদি ধন এবং নিজেকেও দান করিতে পারে, সেই দাতা। ৩২৩ই। যে গুণ দ্বারা লোক শঙ্কাশূন্য হইয়া কার্য করিতে

---

১ গ্রামের আয়ের দ্বাদশাংশ গ্রামের প্রধানরা পাইবেন। এই অংশ ইংরাজি অনুবাদে অতিরিক্ত আছে, আমাদের আদর্শ পুস্তকের মূলে ইহা নাই। এখন হইতে শ্রীযুক্ত বিনয় সরকারের ইংরাজি অনুবাদের যেখানে প্রমাণ ধরিব, সেখানে শুধু (বিনয়) এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করিব)।

সমর্থ হয়, তাহাকেই বল বলে। ৩২৪। যে গুণ দ্বারা অন্যান্য নরপতিসকল কিঙ্করের ন্যায় বশীভূত হয়, তাহার নাম পরাক্রম। যুদ্ধের অনুকূল ব্যাপারকে উত্থান বলিয়া কীর্তন করা হয়। ৩২৫।

খাদ্যে বিষপ্রয়োগভয়ে কপি ও কুক্কুট প্রভৃতি দ্বারা অন্নপরীক্ষা করিবেন। বিষাক্ত অন্ন দেখিয়া হংসগণ খোঁড়া হয়, ভৃঙ্গ কূজন (অস্পষ্ট শব্দ) করে, ময়ূরগণ নৃত্য করে, কুক্কুট চীৎকার করে, ক্রৌঞ্চ মত্ত হয়, বানর মলত্যাগ করে, বভ্রুর (বেজীর) গায়ের লোম খাড়া হইয়া উঠে, সারিকা (ময়না) বমি করে, এইজন্য এই সকলের দ্বারা খাদ্য পরীক্ষা করিবে। ৩২৬-২৭।

প্রত্যহ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত, এই ছয় রসযুক্ত খাদ্য খাইবে। কিন্তু দুই বা তিন রস যুক্ত খাদ্য খাইবে না। খাদ্যে উপযুক্ত রসের অল্পতা হইলে বা আধিক্য হইলে তাহা খাইবে না। কটু, মধুর, ক্ষার একত্র মিশ্রিত খাইবে না। ৩২৮½।

রাজা মন্ত্রীদিগের সহিত প্রজাপুঞ্জের আবেদন শ্রবণ করিবেন। ৩২৯। রাজা সাবধান হইয়া প্রধান প্রধান ব্যক্তি, মহিলা, নট, গায়ক, স্তুতিপাঠক, এবং ঐন্দ্রজালিকগণের সহিত উপবনে বিহার করিবেন। ৩৩০। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে গজ, অশ্ব এবং রথের চালনা অভ্যাস করিবেন এবং সৈনিকগণের ব্যূহ রচনা প্রণালী স্বয়ং শিক্ষা করিবেন ও শিখাইবেন। ৩৩১। ব্যাঘ্রাদি বনচর পশু ও ময়ূরাদি পক্ষী লইয়া ক্রীড়া করিবেন এবং মৃগয়াকালে হিংস্র প্রাণীগণের বধ করিবেন। ৩৩২। শৌর্যবৃদ্ধি, সর্বদা লক্ষ্যস্থির, আলস্যশূন্যতা এবং শস্ত্র ও অস্ত্রের দ্রুত পরিচালনা শক্তি এইগুলি মৃগয়ারগুণ, কিন্তু হিংসাই ইহার গুরুতর দোষ। ৩৩৩½। রাজা অস্ত্রশস্ত্রে সংরক্ষিত হইয়া অত্যন্ত সতর্কতার সহিত প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে ভয়ের সময় গুপ্তচরের নিকট হইতে প্রজাগণের, রাজপুরুষগণের, প্রকৃতিবর্গের, শত্রুগণের, সৈনিকগণের, সভ্যগণের, বান্ধবগণের, অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীগণের ইঙ্গিত চেষ্টা ও অভিমত যত্নপূর্বক জানিবেন এবং তাহা লিখিয়া লইবেন। ৩৩৬। যে নৃপতি অসত্যবাদী গূঢ়চরের শাস্তি প্রদান না করেন, তিনি প্রজার প্রাণ ও ধনাপহরণকারী ম্লেচ্ছপদবাচ্য হন। ৩৩৭। বর্ণী (ব্রহ্মচারী), তপস্বী, সন্ন্যাসী, এবং নীচসিদ্ধরূপধারী (ঐন্দ্রজালিক) গূঢ়চরকে সেই সেই বেশধারীর ছলে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। ৩৩৮। তাহাকে সংশোধন না করিলে রাজা রাজত্বের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ও বুঝিতে পারেন না। যে রাজা গুপ্তচরের সংশোধন না করেন তাঁহার নিকট ঐ চর মিথ্যা বলিতে ভয় পায় না। ৩৩৯। প্রকৃতিবর্গ ও অধিকারী বর্গ হইতে গুপ্তচরকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিবেন। ৩৩৯½।

সর্বদা রাজ্যের একজন নায়ক হইবে। বহুজনকে রাজ্যের নায়ক করিবে না। ৩৪০। রাজা রাজত্বের কোনও স্থান নায়কহীন রাখিবেন না। যদি রাজবংশে বহুপুরুষ থাকে তাহা হইলে, তাহার মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ তিনি রাজা হইবেন এবং অপরে তাঁহার কার্যসাধক হইবেন। অন্য সকল সহায় অপেক্ষা ইহারা অভ্যুদয় সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সহায়। ৩৪২। রাজকুলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি বধির, কুষ্ঠরোগী, বোবা, অন্ধ বা নপুংসক হয়, তাহা হইলে তিনি রাজপদ পাইবেন না;

তাহার ভ্রাতা অথবা তৎপুত্র (স্বীয়পুত্র) ও ঐরূপ অবস্থাপন্ন হইলে রাজ্য পাইবে না। ৩৪৩। (জ্যেষ্ঠের অনুপযুক্ততায় উত্তরাধিকারী নির্ণয়) জ্যেষ্ঠের অব্যবহিত পরবর্তী ভ্রাতা এবং (তদভাবে) জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজ্য পাইবে। যেমন অগ্রজের অভাব হইলে কনিষ্ঠেরা রাজ্যভাগী হয় (১)। দায়াদ (জ্ঞাতি) গণের ঐক্য মত্য (অর্থাৎ অধিকারী নির্ণয় বিষয়ে মতের স্থিরতা) রাজার পরম হিতকর। ৩৪৪। দায়াদগণের মতদ্বৈধতা, রাজ্যের এবং কুলের বিনাশের কারণ। অতএব রাজা দায়াদগণকে নিজের ভোগের তুল্য ভোগদান করিবেন; এবং নিজের অপ্রতিহত আজ্ঞার অধীনে তাহাদিগকে ছত্র সিংহাসন দিয়া তুষ্ট করিবেন। ৩৪৫। রাজাদিগের রাজ্যের ভাগ হওয়া কখনও মঙ্গলজনক হয় না। রাজ্য খণ্ডের খণ্ডে বিভক্ত হইলে শত্রুর গ্রহণের যোগ্য হয়। ৩৪৬। অতএব রাজা দায়াদগণকে রাজকরের চতুর্থাংশ দিয়া রাজত্বের চারিদিকেই বসবাস করাইবেন অথবা দেশাধিপ (Governors of Provinces) করিবেন। ৩৪৭। অথবা গো, হস্তী, ঘোটক, উষ্ট্র এবং কোষের আধিপত্যে নিয়োগ করিবেন। মাতা বা মাতৃতুল্যাকে পাকশালায় নিযুক্ত করিবেন। ৩৪৮। বান্ধব এবং শ্যালকগণকে সেনাধিকারে নিয়োগ করিবেন। গুরু এবং সুহৃদ্‌বর্গকে নিজের দোষ দর্শনকার্যে নিযুক্ত করিবেন। ৩৪৯। বস্ত্র অলঙ্কার এবং তৈজস দ্রব্যের সুদর্শনে (পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানে) স্ত্রীগণকে নিযুক্ত করিবেন। কে, কি করিতেছে বা করিতেছে না এই সমস্ত রাজা স্বয়ং দেখিবেন এবং পর্যায়ক্রমে মুদ্রা দিবেন (অর্থাৎ উহাদের কার্যসম্বন্ধে নিজের লিখিত অভিমত —remarks—দিবেন)। ৩৫০।

রাত্রিতে বিশোধিত নির্জন অন্তর্গৃহে (গৃহাভ্যন্তরস্থিত গৃহে) এবং দিবাভাগে বিশোধিত নির্জন অরণ্যে মন্ত্রিগণের সহিত রাজা ভাবিবিষয়ের মন্ত্রণা করিবেন। ৩৫১। সুহৃদ্‌গণ, ভ্রাতাগণ, পুত্রগণ, বান্ধবগণ, সেনাপতিগণ এবং সভাসদ্‌গণের সহিত রাজা সভায় (in council house) রাজত্বসম্বন্ধীয় বিষয় পরামর্শ করিবেন। ৩৫২।

সভাগৃহকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম (অর্থাৎ পশ্চাৎভাগের) অর্দ্ধাংশের মধ্যস্থলে রাজার আসন হইবে। রাজার দক্ষিণ এবং বাম পার্শ্বস্থানে পার্শ্বকোষ্ঠগগণ (দেহরক্ষীগণ bodyguards, Aid-de-camp) থাকিবে। পশ্চাদ্ভাগে দক্ষিণ দিক্ হইতে বামদিক্ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং দৌহিত্রগণের বসিবার স্থান হইবে। ৩৫৪। রাজার অগ্রে ডান দিকে পিতৃব্য কুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সভ্য (সভাসদ্‌বর্গ) এবং সেনাপতি বসিবে। রাজার পূর্ব্ব দিকে (অর্থাৎ রাজার মুখের দিকে মুখ করিয়া) পৃথক্ আসনে মাতামহকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, মন্ত্রী, বান্ধব, শ্বশুর এবং শ্যালকগণ বসিবে। অগ্রে বামভাগে অধিকারীগণ (officers) বসিবে। ৩৫৫-৬। দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বে জামাতা এবং ভগিনী-পতির বসিবার স্থান হইবে। রাজার নিকটে অথবা সিংহাসনের অর্দ্ধাংশে আপনার সমান সুহৃৎকে বসাইবেন। (যাহার পুত্র নাই দত্তক আছে সেস্থলে) দৌহিত্র বা ভাগিনেয়র স্থানে

---

(১) (Bombay Ed. 'যথাগ্রজস্ত' এই অর্দ্ধশ্লোক এখানে নাই)

দত্তক পুত্র বসিবে এবং পুত্রপৌত্রস্থানে ভাগিনেয় দৌহিত্র বসিবে। ৩৫৭-৮। পিতার ন্যায় শ্রেষ্ঠ আসনে আচার্যের স্থান হইবে। সাধারণ লোকসকল দুই পার্শ্বের অগ্রভাগে (অর্থাৎ শেষদিকে) থাকিবে। মন্ত্রীর পশ্চাতে লেখকগণ বসিবে। পরিচারকবর্গ সকলের পৃষ্ঠদেশে (অর্থাৎ পশ্চাতে) থাকিবে। পার্শ্বদেশে স্বর্ণদণ্ডধারী প্রবেশ-নতি-বোধক (রাজসভায় প্রবেশকারী ও প্রণামকারীর নামাদি পরিচয় প্রদানকারী) অর্থাৎ নকিব কর্মচারীদ্বয় থাকিবে। ৩৫৯-৬০।

রাজা বিশিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া সুভূষণ উত্তমকবচ উত্তম বস্ত্র এবং মুকুট পরিয়া উন্মুক্ত অস্ত্র এবং সিদ্ধাস্ত্র গ্রহণ পূর্বক বিশেষ সতর্কতার সহিত সিংহাসনে হৃষ্টচিত্তে উপবেশন করিবেন। 'আপনি সর্বাপেক্ষা অধিকদাতা, ধীর, এবং ধার্মিক', এই কথা শুনিবেন না, যাহারা ইহা শুনায় তাহাদিগকে বঞ্চক বলিয়া জানিবেন। যে মন্ত্রিসকল কাহারও প্রতি অনুরাগ হেতু অথবা লোভবশতঃ কিংবা রাজার ভয়ে (কার্য বিশেষে) চুপ করিয়া থাকেন, রাজা রাজত্বের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাদিগকে শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া ধরিবেন না। ঐ সকল মন্ত্রীদিগের অভিমত পৃথক্ পৃথক্ লিখাইয়া লইবেন এবং নিজের মতের সহিত তাহা বিচার করিবেন এবং যাহা বহু সম্মত অর্থাৎ অধিক লোকের মতানুযায়ী তদনুসারে কার্য করিবেন। ৩৬১-৪½।

বিচক্ষণ রাজা প্রত্যহ গজ, অশ্ব, রথ, অন্যান্য পশু, ভৃত্যসকল, ক্রীতদাসগণ, সম্ভার সরঞ্জাম (provisions) এবং সৈন্য সকলের বিষয় যত্নসহকারে জানিয়া কার্যক্ষমদিগকে রাখিবেন এবং একেবারে অকর্মণ্যদিগকে ত্যাগ করিবেন। ৩৬৫-৬। অযুত ক্রোশ দূরস্থিত সংবাদ এক দিনেই পাইবার ব্যবস্থা রাখিবেন। বৃত্তি দিয়া সকল রকম বিদ্যা এবং কলাবিদ্যা শিখাইবেন এবং তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে সেই সেই কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ও কলাবিদ্‌গণকে প্রতি বৎসরে সম্মান প্রদান করিবেন। ৩৬৭-৮। রাজা সর্বদা বিদ্যা ও কলাবিদ্যার পুষ্টিসাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। রাজার নিকটে সম্মুখে এবং পশ্চাদ্‌ভাগে ভীষণ নতি-নীতিবিশারদ (adept in the rules of etiquette and morality—নমস্কারাদি দ্বারা রাজকীয় সম্মান রাখিবার রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ), সিদ্ধাস্ত্র এবং উন্মুক্ত অস্ত্রধারী ভটগণ (body-guards) নিযুক্ত থাকিবে। রাজা প্রত্যহ প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত গজারূঢ় হইয়া নগরে ভ্রমণ করিবেন। ৩৬৯-৭০। কুকুর যদি রাজযোগ্যযানে আরোহণ করে তাহা হইলে সে কি রাজতুল্য হয় না? আর রাজা যদি (পরিচ্ছদ ও পরিজন বিরহিত হইয়া) একা বহির্গত হন তাহা হইলে কবিরা কি তাঁহাকে কুকুরের সহিত তুলনা করিতে পারেন না?। ৩৭১। এই কারণে নরপতি আপনার তুল্য গুণযুক্ত মিত্রবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইবেন। কিন্তু নীচভাবে কখনও বাহির হইবেন না। ৩৭২।

মিথ্যাই নীচ এবং সত্য সদাচারই সাধু, ইহাই কথিত হয়। নীচ ব্যক্তিগণ সাধু ব্যক্তিগণ হইতেও আপনারা অতিশয় ভদ্র—এই ভাব দেখায়। ৩৭৩।

রাজা স্বয়ং প্রতিবৎসর গ্রাম, পুর, এবং দেশ (district or provinces) সকল পরিদর্শন করিবেন এবং তৎ তৎস্থানের প্রজাবৃন্দের মধ্যে কাহারা অধিকারীগণ হইতে

উত্তম ব্যবহার পাইয়াছে এবং কাহারা উৎপীড়িত হইয়াছে তাহাও দেখিবেন আর উহাদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবেন; কিন্তু তিনি কর্মচারীর পক্ষপাতী না হইয়া প্রজাপক্ষ গ্রহণ করিবেন। ৩৭৪-৫। একশত প্রজা যে অধিকারীর নামে দোষ দেয় তাহাকে কর্মচ্যুত করিবেন। অমাত্যও যদ্যপি একবার অন্যায় কার্য করে তাহা হইলে তাহাকে নির্জনে দণ্ড দিবেন কিন্তু বারংবার অন্যায় করিলে তাহাকে কর্মচ্যুত করিবেন। অধীন রাজা যদ্যপি অন্যায় কার্যকারী হন তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য ও যথাসর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করিবেন।৩৭৬-৭। বিজিতরাজ্যে সর্বদা ধর্মাধিকরণ (বিচারালয় courts) স্থাপন করিবেন এবং পরাজিত নৃপতিকে তাঁহার অবস্থার উপযুক্ত বৃত্তি (ভাতা pension) দিবেন। ৩৭৮। অনুরক্তা, সুরূপা, উত্তম বস্ত্রপরিহিতা, প্রিয়বাদিনী, উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিতা, শুদ্ধ চরিত্রা প্রমদাকে শয্যায় গ্রহণ করিবেন। ৪৭৯। রাজা দুই যাম (৬ঘণ্টা) শয়ন করিয়া অত্যন্ত সুখলাভ করিবেন (অর্থাৎ ক্লান্তি অপনোদন করিবেন)। রাজা স্বস্থান (স্বীয় পদমর্যাদা position) ত্যাগ করিবেন না এবং নীতি অবলম্বন করিয়া শত্রুদিগকে জয় করিবেন। ৩৮০। দন্ত, কেশ, নখ এবং নৃপতি স্থানভ্রষ্ট হইলে শোভা পায় না। রাজা অত্যন্ত বিপদ্‌কালে সর্বসময়ের জন্যই গিরিদুর্গ-গুলিতে আশ্রয় লইয়া থাকিবেন। ৩৮১। এবং ঐ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক নিজের রাজত্ব উদ্ধার করিবেন।১ (উক্ত অবস্থাপন্ন) রাজা বিবাহ, দান ও যজ্ঞীয় অর্থ ব্যতিরেকে প্রজাদিগের ধনের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু অসজ্জনের যাবতীয় ধন দস্যুর ন্যায় গ্রহণ করিবেন; আর একস্থানে প্রত্যহ থাকিবেন না এবং কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না। ৩৮২-৮৩। রাজা সর্বদা সাবধান থাকিবেন এবং দস্যুকর্মে সর্বদা উদ্যোগী ক্রূরকর্মা ও নির্লজ্জ হইয়াও কাহার প্রাণনাশ করিবার চিন্তাও করিবেন না, আর পরদার ও কুলকন্যার ধর্ষণে বিমুখ থাকিবেন। পুত্রের ন্যায় পালিত ভৃত্যগণও সময়ে (দুঃসময়ে) শত্রুতা করিয়া থাকে। বিফলতা ঘটিলেও প্রযত্নের (অর্থাৎ উদ্যমের) দোষ হয় না, (এই চেষ্টার বিফলতা) ভাগ্য বলিয়াই ধরিতে হইবে। কর্ম (চেষ্টা) সুবিফল (আগাগোড়া অকৃতকার্য) দেখিয়া তপস্যা করিয়া স্বর্গে যাইবেন (অর্থাৎ তপস্যা করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিবেন)। ৩৮৪-৮৬।

রাজকৃত্য অর্থাৎ রাজার কর্তব্য কর্ম (duties of king) সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে মিশ্র অধ্যায়ে আরও অধিক বলিব। রাজকার্য-নিরূপক প্রথম অধ্যায় বলা হইল। ৩৮৭।

ইতি শুক্রনীতিসারে শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ জাতবপ্রভাকর কর্তৃক অনুদিত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

১ ৩৮২ শ্লোকের পর অর্ধশ্লোক বেশী আছে—নিরাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অত্যল্প কর্মসম্পাদন করিতেও অপর লোকের সহায়তা ব্যতীত একজন লোকের পক্ষে দুষ্কর হইয়া ওঠে, অতএব সুবিস্তৃত রাজ্য পরিচালনে অপরের সহায়তা ব্যতীত একজন কি করিয়া সমর্থ হইবে? । ১ । রাজা সর্ববিধ বিদ্যায় কুশল এবং সুমন্ত্রবিদ্ (Pastmaster in statecraft) হইয়াও মন্ত্রিগণকে ত্যাগ করিয়া একাকী কখনও মন্ত্র (Political interest রাজত্বের শুভাশুভ) বিচার করিবেন না। ২। প্রাজ্ঞ রাজা সভ্য (Councillors), অধিকারী, প্রকৃতি, এবং সভাসদ্‌গণের সুচিন্তিত মন্ত্রণা গ্রহণ করিবেন কিন্তু কখনও কেবল নিজের মতের বশবর্তী হইবেন না। ৩। রাজা যদি স্বাতন্ত্র্য (স্বেচ্ছাচরিতা) অবলম্বন করেন তাহা হইলে অনর্থ উপস্থিত হয়—সত্বই রাষ্ট্র এবং প্রকৃতি ভেদপ্রাপ্ত হয়। ৪ আপ্তবাক্য, অনুভব, আগম, এবং অনুমান দ্বারা প্রত্যেক পুরুষের বুদ্ধি বৈভবের বিভিন্নতা দেখা যায়। ৫। প্রত্যক্ষ, সাদৃশ্য, সাহস, শীল এবং বল দ্বারা ব্যবহারের বিচিত্রতা এবং উন্নতির হ্রাস বৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হয়। ৬। এই সকল (ভেদাভেদ) একজন মনুষ্য বুঝিয়া উঠিতে পারে না; অতএব রাজা রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত সহায় গ্রহণ করিবেন। ৭। সৎকুলজাত, গুণে ও শীলে সমৃদ্ধ, শূর, ভক্ত (অনুরক্ত), প্রিয়বাদী, হিতোপদেশ প্রদানকারী, ক্লেশসহিষ্ণু, ধর্মানুরক্ত, ক্ষমাবান্, শুচি (শুদ্ধচরিত্র), নির্মৎসর (পরস্পর বিদ্বেষ রহিত), কাম, ক্রোধ ও লোভবিবর্জিত এবং আলস্যশূন্য এইরূপ ব্যক্তিগণই (রাজার) সহায় হইবেন। ইহারাই বুদ্ধিবলে কুমার্গগামী নরপতিকে সৎপথে আনিতে সক্ষম। ৯। রাজা কুসহায়সম্পন্ন হইলে স্বধর্ম হইতে এবং রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যেমন কুসহায়প্রাপ্ত দিতিনন্দন দৈত্যগণ কুকর্ম করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল। ১০। এমন কি বীর, বলবান্ দুর্যোধনাদি নৃপতিগণও (কুসহায়প্রাপ্ত হইয়া) ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে নরনাথ নিরভিমানী এবং সুসহায়সম্পন্ন হইবেন। ১১।

যুবরাজ এবং অমাত্যবর্গ মহীপতির দুই হাত; তাঁহারাই তাঁহার দক্ষিণ এবং বাম চক্ষু ও কর্ণ বলিয়া কথিত হয়। ১২। তাঁহারা ব্যতীত নৃপতি বাহু, কর্ণ ও চক্ষুহীন হইয়া থাকেন। অতএব নরনাথ বিবেচনার সহিত যুবরাজ এবং অমাত্য নিয়োগ করিবেন, অন্যথায় (সুবিচার পূর্বক নিয়োগ না করিলে) অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ১৩।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি. এ.

পূর্বোল্লিখিত মতবাদসমূহের আলোচনা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল,—

(১) বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, এবং বিনা বিচারে অন্যের মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

(ক) "নিম্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়"—ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র। নামের শেষে "আনন্দ" যুক্ত থাকিলেই যে সন্ন্যাসি সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে হইবে, এই প্রকার সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ীর গুরুপরম্পরায় "নিত্যানন্দ" নাম দৃষ্ট হয়। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না।

(খ) বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে ৩৬৭, ৩৭৭, ৩৮৮ এবং ৩৮৯ পৃষ্ঠায় সে সকল যুক্তিদ্বারা নিম্বার্কাচার্যের অবস্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা পূর্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এই সকল যুক্তি সমীচীন নহে এবং পরস্পর বিরোধী, সুতরাং এই স্থলে আলোচনা অনাবশ্যক।

(২) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীযুক্ত ভৌমিক মহাশয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) (ক) শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের গ্রন্থে যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে মনে হয় তিনি উক্ত স্বামিজীর মতে প্রভাবিত হইয়াছেন।

(খ) অধিকন্তু ইঁহারা উভয়েই বলেন যে নিম্বার্কের সময় শক্তিবাদের অভ্যুদয়, যেহেতু তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে "শক্তিকারণবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন।" শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বীয় ভাষ্যে বৌদ্ধমত, জৈনমত ও পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই কারণে যদি কেহ বলেন যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার যুক্তিকে কেহ সুযুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে ভারতে মুসলমানগণের আক্রমণের সময় শক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়; সুতরাং নিম্বার্কের স্থিতিকাল একাদশ শতাব্দী। এই সকল যুক্তির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। হিন্দুর মূর্তিশাস্ত্রের তত্ত্বগবেষণায় মথুরায় শিল্পসামগ্রী যথার্থ ই কামধেনু। মথুরার পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান সময়ে ভূগর্ভ হইতে প্রায় দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন অনেক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে সিংহবাহিনী দুর্গা, মহিষাসুরমর্দিনী, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শক্তিবাদ এদেশে নূতন নহে।

(গ) যেহেতু খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে রাধার নাম ও তত্ত্বের সূত্রপাত

হইয়াছিল (কেনেডি সাহেবের মতে), সেই কারণে ঠিক এই সময়েই নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব হয়,—এই যুক্তি সারবান্ নহে। ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে পঞ্চম শতাব্দীর অমরকোষ অভিধানে রাধার নাম দেখা যায়। অমরকোষ প্রণেতা এবং কবি কালিদাস সমসাময়িক। কালিদাসের কাল খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী; (দ্রষ্টব্য—"শ্রীভারতী" চৈত্র সংখ্যা, ১৩৪৮ সন, পৃঃ ৪৭৩)। শ্রীরাধার নাম আমরা প্রথমে কোথায় দেখিতে পাই, এই বিষয়ে যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহারা বঙ্কিম বাবুর "কৃষ্ণচরিত্রের" দ্বিতীয় খণ্ডে দশম পরিচ্ছেদে "শ্রীরাধা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। সংক্ষেপে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থ "দেবী ভাগবতে" রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কেনেডি সাহেবের মত যে ভ্রান্ত এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টের প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্বে রচিত "গাথা সপ্তশতী" নামক গ্রন্থেও ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীরাধার এবং কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) "নিম্বার্ক জয়দেবের প্রায় সমসাময়িক—এই অনুমান সত্য নহে। বঙ্কিম বাবু বলেন,—"গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজপণ্ডিতগণের দ্বারাও স্বীকৃত।"

জয়দেব গোস্বামী নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, ইহা পূর্বাবধি প্রসিদ্ধ আছে। জয়দেবের স্থাপিত মন্দির এখনও তাঁহার জন্মভূমি কেন্দুলি গ্রামে আছে। এই মন্দিরের মহন্ত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত।

"শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামীর পূজিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্যগদি সলিমাবাদে এযাবৎ যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা আমি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছি।··· আকবরের প্রসিদ্ধ গায়ক তান সেনের গুরু শ্রীহরিদাস স্বামীর "টাট্টি" নামক স্থান শ্রীবৃন্দাবনে এযাবৎ বর্তমান আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই স্থানে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থানের মতন পূর্বকাল হইতে গুরুপরম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তদ্‌দৃষ্টে জানা যায় যে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ পুরুষ উর্ধ্বে ও শ্রীহরিদাস গোস্বামীর ৬৩ পুরুষ উর্ধ্বে শ্রীনিম্বার্কস্বামী অবস্থিত। এই কথা ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ সন্তদাস স্বামী তাঁহার "দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তে" লিখিয়াছেন এবং আমিও ঐ গুরুপরম্পরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কেহ ইচ্ছা করিলেও তাহা দেখিয়া আসিতে পারেন। ইহাদ্বারা কি নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না যে শ্রীনিম্বার্কাস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহুপূর্বে (এবং আচার্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের পূর্বে) আবির্ভূত ছিলেন? এই গুরুপরম্পরা আদালতেও প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।"*

* সুপরিচিত আইনগ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু (N. D. Bosu) এড্‌ভোকেট্ মহাশয় "ভারতের সাধনা" নামক মাসিক পত্রের ১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতের আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবুর অনুমান যে শ্রীনিম্বার্কস্বামীর আবির্ভাবকাল মধ্বাচার্যের কিছু পরে, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে নহে। বলা বাহুল্য এই মত গ্রাহ্য নহে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিম্বার্কস্বামী জয়দেব গোস্বামী হইতে বহু প্রাচীন অতএব "নিম্বার্কাচার্য একাদশ শতাব্দীতে ধর্মপ্রচার করেন" এই কথা ভিত্তিহীন।

(৩) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল শ্রীবৃন্দাবনে যদি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাইতেন এবং অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই নিম্বার্কাচার্য ও জয়দেবের যোগসূত্রের বিষয়ে অনেক তথ্যের মীমাংসা করিতে পারিতেন। "শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীকৃত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে (History of the Vaishnab Sect) নিম্বার্কাচার্যের নামের পর্যন্ত উল্লেখ নাই"—এই কথায় শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব সূচিত হয় না, বরং শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় বৃন্দাবনের বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলের অনুসন্ধান করেন নাই ইহাই প্রমাণিত হয়। বৃন্দাবন নিম্বার্কসম্প্রদায়ের সাধুদিগেরই কেন্দ্রস্থান। পাশ্চাত্য মনীষী হেষ্টিংস সাহেব কর্তৃক ১৯০৯ খ্রী° অব্দে প্রকাশিত "Encyclopaedia of Religions and Ethics" নামক গ্রন্থে এবং তাঁহার বহুপূর্বে (১৮৭৭ খ্রী°) সুপ্রসিদ্ধ মনিয়র ইউলিয়মস্ সাহেব তাঁহার প্রণীত "Hinduism" নামক গ্রন্থে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) সকল ভাষ্যকারই তাঁহাদের সময়ের প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু শ্রীনিম্বার্ক স্বামী বা তাঁহার শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের ভাষ্যে আচার্য শঙ্করের বা আচার্য রামানুজের মতের খণ্ডন বা উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এই কথা রাজেন্দ্রবাবুও তাঁহার সম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই অনুমান হয় যে শ্রীনিম্বার্ক স্বামী আচার্য শঙ্করের পূর্বেকার আচার্য *। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া, ডি, লিট্, (লণ্ডন) মহোদয় নিম্বার্ক ভাষ্যের সহিত শঙ্করভাষ্যের তুলনা করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে নিম্বার্ক ভাষ্যে যে সৌগত (অধুনা বৌদ্ধ) ও জৈনমতের উল্লেখ আছে তাহা আচার্য শঙ্করের বর্ণিত বৌদ্ধ ও জৈন মত অপেক্ষা প্রাচীন। ...রাজেন্দ্রবাবুর সম্পাদিত "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক গ্রন্থে শ্রীদেবাচার্যের কাল ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া দেখা যায়। "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকায় রাজেন্দ্র বাবু নিজেই লিখিয়াছেন, "ইঁহার জন্মসময় ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি নিম্বার্ক ভাষ্যের চতুঃসূত্রীর উপর—'বেদান্তজাহ্নবী' নামক এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈতমত বিশেষভাবে খণ্ডন করেন। ইঁহার গুরু কৃপাচার্য। ইঁহার শিষ্য সুন্দর ভট্ট।" রাজেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে শ্রীদেবাচার্যের ১২ পুরুষ উপরে শ্রীনিম্বার্কাচার্য অবস্থিত। সুতরাং রাজেন্দ্র বাবুর নিজ উক্তি মতেও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারিত হয় না।"†

---

* এই স্থলে দ্রষ্টব্য যে শ্রীভারতিকেশবকাশ্মীরি ভট্টাচার্য বিরচিত শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার "তত্ত্বপ্রকাশিকা" টীকার উপসংহার ভাগে লিখিত আছে যে—

"ব্যাখ্যাতমাদৌ তদমত্রবোধাদাচার্যবর্যেণ হরিপ্রিয়েণ।
নিম্বার্কনামাতিগভীরবোধং শ্রীনারদানুগ্রহভাজনেন॥"

† শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

পূর্বে বলিয়াছি, প্রবন্ধান্তরে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে, নিম্বার্ক-ভাষ্য রচনার কাল দশম শতাব্দী।

(৫) পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় একটি আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে নিম্বার্কের কাল ৮৮৫ হইতে ১১৪৩ খ্রীষ্ট অ০। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যুক্তি এই প্রবন্ধের মধ্যেই আলোচিত হইতেছে।

(৬) যে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীকর ভাষ্যের ভূমিকায় ভূমিকালেখক বলিয়াছেন যে, নিম্বার্ক মধ্বাচার্যের পরবর্তী, তাহাতে দেখা যায় যে তিনি কেবল কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। উপরিলিখিত এবং পরবর্তী কারণে তাঁহার মত গ্রাহ্য নহে।

(৭) সর্বশেষে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকার মহোদয়ের মতের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি শ্রীনিম্বার্কের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান দক্ষিণ ভারতের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দুইটি গুরুপরম্পরাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র সমূহে প্রচলিত সকল গুরুপরম্পরা যদি তিনি আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুসন্ধানে অপূর্ণতা লক্ষিত হইত না। তিনিও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না যে ঠিক্ কখন শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায়,—'As to when he (Nimbarka) flourished we have no definite information; but he appears to have lived sometime after Ramanuja'.

তাঁহার মতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য দেহরক্ষা করেন ১১৬২ খ্রী০ অব্দে। যে যুক্তিদ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় হইলেও ভ্রমশূন্য নহে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রচলিত গুরুপরম্পরার সহিত যদি আচার্যদিগের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের আবির্ভাবকালের যোগসূত্ররক্ষা করিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে নিম্বার্কাচার্য রামানুজাচার্যের অনেক পূর্ববর্তী। এই প্রকার ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করাই সঙ্গত। এই প্রকার বিচার প্রণালীর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দেবাচার্যের সময় ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। "যুগরুদ্রেন্দু" অর্থাৎ ১১১২ সংবতে তাঁহার জন্মকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১১১২ বিক্রম সংবতে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইয়া থাকে। গুরুপ্রণালী হইতে দেখা যায় যে, দেবাচার্য হইতে ১২ জনের পূর্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্য অবস্থিত। এই ১২ জনে স্থূলতঃ তিশ শত বৎসর হইলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রীল নিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া স্থূলতঃ ধরিয়া লওয়া যায়। আবার অন্যদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরি শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালীতে দেখা যায় যে, কেশব কাশ্মীরির ১৬ জনের পূর্বে শ্রীল দেবাচার্যের আবির্ভাব হয়। স্থূলতঃ চারিজনে একশত বৎসর ধরিলে কেশব কাশ্মীরির আবির্ভাবের চারিশত বৎসর পূর্বে দেবাচার্যের আবির্ভাব কাল ধরা যায়। ইহাতে

দেখা যায় যে, ১০৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবাচার্যের আবির্ভাবকাল। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, উহার ৩০ বৎসর পূর্বে ১০৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দেবাচার্য আবির্ভূত হন। গুরুপ্রণালী অনুসারে কেশব কাশ্মীরির ২৮ জনের পূর্বে শ্রীনিম্বার্ক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং এমতে শ্রীমৎ নিম্বার্কের আবির্ভাবকাল স্থূলতঃ কেশব কাশ্মীরির সাতশত বৎসর পূর্বে। ইহাতেও শ্রীনিম্বার্কের প্রাদুর্ভাব কাল অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারে। এইরূপ আনুমানিক গণনায় পঞ্চাশ বা একশত বৎসরের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। তদনুসারে শ্রীমৎ নিম্বার্কদেব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে না হইয়া সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে হওয়ায় বিস্ময়ের বিষয় নহে। *

আধুনিক কালের মাপকাঠির সাহায্যে যোগীশ্বর মহাপুরুষদিগের জীবিত কাল নির্ণয় করা দুরূহ। ৺জগবন্ধু মৈত্র কর্তৃক লিখিত "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"—নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করিলে বিষয়টি সম্যক্ বোধগম্য হইবে ;—

হরিদ্বারে সুপ্রশস্ত গঙ্গাতীরে চারি পাঁচ লক্ষ সাধু কুম্ভমেলা উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুজরাট প্রদেশের একজন প্রাচীন সাধু গোস্বামী মহাশয়কে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি তোমাদের দেশের নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়াছি। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে গুজরাট প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স পনর কি ষোল বৎসর ছিল।" গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়ে আপনি এই দীর্ঘজীবন লাভ করিলেন?" সাধু বলিলেন, "হঠ যোগের দ্বারা আমি এই দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত "আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ" নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৬৩৮ পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই, "শঙ্কর সম্প্রদায়ের গৌড়পাদ একজন সিদ্ধ যোগী। ইনি যতদিন ইচ্ছা দেহ রাখিতে পারেন।"

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের দিগ্বিজয়ী প্রস্থানত্রয় ভাষ্যকার শ্রীকেশব কাশ্মীরির সময়, আলাউদ্দিন খিলিজির সময় হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় পর্যন্ত। আলাউদ্দিন খিলিজির শাসন-কাল,—১২৯৬ খ্রী° অ° হইতে ১৩২০ খ্রী° অ°। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকটকাল, ১৪৮৫ খ্রী° অ° হইতে ১৫৩৩ খ্রী° অ°। কেশব কাশ্মীরি যোগী ছিলেন। সুতরাং দীর্ঘায়ু হওয়া সম্ভব। ইনি অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

এই সম্প্রদায়ের শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য ১২৫ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার পট্টশিষ্য শ্রীকর্ণহর দেবাচার্য (কাহ্নর দেবাচার্য) ৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে সাধুমহাপুরুষগণের দীর্ঘজীবন ভোগ করা, এবং সম্প্রদায়ের আচার্য পদবীতে অবস্থিতির

---

* "মাসিক বসুমতী"—১৩৪২,—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্. এ. বি, এল্) মহাশয়ের লিখিত "বৈষ্ণব-মতবিবেক" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাল, এক নহে। সুতরাং, গুরুপরম্পরা যাহা সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে,* তাহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহাদের জীবিতকালের ঐতিহাসিক ঘটনা বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া একটি স্থূল গণনা করিলে গড়পড়তায় কত বৎসর আয়ু হয়, তাহা ধরা যাইতে পারে।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার সাহায্যে নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল,—

(১) শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান ১৫৩৩ খ্রী°। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে (আনুমানিক ১৫২৫ খ্রী°) শ্রীকেশব কাশ্মীরির তিরোভাব। শ্রীকেশব কাশ্মীরি হইতে শ্রীসন্তদাস বাবাজী মহারাজ ২২ পুরুষ অন্তর। শ্রীসন্তদাসজী দেহ রক্ষা করেন ১৯৩৫ খ্রী°। হিসাব করিলে দেখা যায় যে এই চারিশত বৎসরে গড়পড়তা আয়ু প্রায় ১৯ বৎসর।

(২) শ্রীদেবাচার্য হইতে শ্রীকেশব কাশ্মীরি ১৮ পুরুষ। শ্রীদেবাচার্যের জন্ম ১০৫৫ খ্রী°। শ্রীকেশব কাশ্মীরির দেহরক্ষা আনুমানিক ১৫২৫ খ্রী°। সুতরাং গড়ওড়তা আয়ু ২৬ বৎসর।

(৩) মোগল সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬—১৬০৫ খ্রী°। আকবরের গায়ক প্রসিদ্ধ তানসেনের গুরু সিদ্ধ শ্রীহরিদাস স্বামী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তান সেনের সহিত সম্রাট্ আকবর ইঁহার দর্শনার্থী হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের নিকট রাজপুর নামক গ্রামে ধনী ব্রাহ্মণ বংশে ১৫২৭ সম্বতে (অর্থাৎ খ্রী° ১৪৮০) ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীজয়দেব গোস্বামী দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। সুতরাং উভয়ের ব্যবধান প্রায় চারিশতাব্দী। টাট্টিস্থানের গুরুপরম্পরায় দেখা যায় যে, শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ১৪ পুরুষ নিম্নে শ্রীহরিদাস স্বামী। সুতরাং গড়পড়তা আয়ু ২৮ বৎসর।

(৪) শ্রীভট্টদেবাচার্য হইতে শ্রীসন্তদাস স্বামী ২১ পুরুষ অধস্তন। শ্রীভট্ট হিন্দীভাষায় "শ্রীযুগলশত" নামক গীতিকাব্যরূপ ভজন পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের সর্বশেষ দোঁহা হইতে দেখা যায় ১৩৫২ বিক্রম সংবতে গ্রন্থ রচিত হয়। ১৩৫২ বিক্রম সংবৎ = ১২৯৫ খ্রী° অ°। শ্রীসন্তদাস স্বামী দেহরক্ষা করেন ১৯৩৫ খ্রী° অ°। হিসাব করিলে দেখা যায় ২১ পুরুষে ৬৪০ বৎসর; সুতরাং গড়পড়তা আয়ু প্রায় ৩০ বৎসর।

(৫) নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রীকন্থর দেবাচার্য ১৬৩৭ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ ১৫৮০ খ্রী° অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। শ্রীসন্তদাস স্বামী মহারাজ ১৯৩৫ খ্রী° অব্দে দেহত্যাগ করেন অর্থাৎ সন্তদাসজী মহারাজ কন্থর দেবাচার্যের (কর্ণহর দেবাচার্য) ৩৫৫ বৎসর পর দেহরক্ষা করেন। উভয়ের মধ্যে ১৮ পুরুষ ব্যবধান। সুতরাং গড়পড়তা আয়ু প্রায় ২০ বৎসর।

(৬) শ্রীদেবাচার্য হইতে শ্রীসন্তদাস স্বামী ৩৯ পুরুষ অন্তর এবং ৮৮০ বৎসর ব্যবধান। শ্রীদেবাচার্যের জন্ম ১০৫৫ খ্রী° অ°। শ্রীসন্তদাসজীর দেহরক্ষা ১৯৩৫ খ্রী° অ°। সুতরাং প্রতি পুরুষে গড়পড়তা কাল প্রায় ২৩ বৎসর।

---

*"শ্রীভারতী", ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শীল এম্. এ., বি. এল্., মহোদয় লিখিত "শ্রীশ্রীনিম্বার্কাচার্য" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বর্তমান প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে গুরুপরম্পরা লিখিত হইবে।

গণনার সুবিধার জন্য শ্রীনিম্বার্কাচার্য হইতে গুরুপরম্পরা নিম্নে লিখিত হইল।

১। শ্রীনিম্বার্ক ভগবান ২। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ৩। বিশ্বাচার্য ৪। শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য ৫। শ্রীবিলাসাচার্য ৬। শ্রীস্বরূপাচার্য ৭। শ্রীমাধবাচার্য ৮। শ্রীবলভদ্রাচার্য ৯। পদ্মাচার্য ১০। শ্রীশ্যামাচার্য ১১। শ্রীগোপালাচার্য ১২। শ্রীকৃপাচার্য ১৩। শ্রীদেবাচার্য ১৪। শ্রীসুন্দর ভট্টাচার্য ১৫। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য ১৬। শ্রীউপেন্দ্র ভট্টাচার্য ১৭। শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮। শ্রীবামন ভট্টাচার্য ১৯। শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০। শ্রীপদ্মাকর ভট্টাচার্য ২১। শ্রীশ্রবণ ভট্টাচার্য ২২। শ্রীভূরি ভট্টাচার্য ২৩। শ্রীমাধব ভট্টাচার্য ২৪। শ্রীশ্যাম ভট্টাচার্য ২৫। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য ২৫। শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য ২৭। শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য ২৭। শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য ২৮। কেশব ভট্টাচার্য ২৯। গঙ্গিল ভট্টাচার্য ৩০। শ্রীকেশব কাশ্মীরি ভট্টাচার্য ৩১। শ্রীশ্রীভট্টাচার্য ৩২। শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য ৩৩। শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য ৩৪। শ্রীকাহ্নর দেবাচার্য ৩৫। শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্য ৩৬। শ্রীচতুর চিন্তামণি দেবাচার্য (নাগাজী মহারাজ) ৩৭। শ্রীমোহন দেবাচার্য ৩৮। শ্রীজগন্নাথ ৩৯। মাখন দেবাচার্য ৪০। শ্রীহরি দেবাচার্য ৪১। শ্রীমথুরা দেবাচার্য ৪২। শ্রীস্বামী শ্যামল দাসজী ৪৩। শ্রীস্বামী হংসদাসজী ৪৪। শ্রীস্বামী হীরাদাসজী ৪৫। শ্রীস্বামী মোহন দাসজী ৪৬। শ্রীস্বামী নেনাদাসজী কাঠিয়া ৪৭। শ্রীস্বামী ইন্দ্রদাসজী কাঠিয়া ৪৮। শ্রীস্বামী বজ্রং দাসজী কাঠিয়া ৪৯। শ্রীস্বামী গোপাহ দাসজী কাঠিয়া ৫০। স্বামী দেবদাসজী কাঠিয়া ৫১। শ্রী১০৮ স্বামী রামদাসজী কাঠিয়া (ব্রজবিদেহী মহন্ত) ৫২। শ্রী ০৮ স্বামী সন্তদাসজী মহারাজ (ব্রজবিদেহী মহন্ত)।

বৃন্দাবনের শ্রীনিম্বার্ক আশ্রমের গুরুপরম্পরা হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল।

(৭) রাজপুতনার অন্তর্গত কিষেণগড় ষ্টেটের মধ্যে সলেমাবাদ নামক স্থানে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সর্বমান্য গদি শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের অন্যতম শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবাচার্য কর্তৃক স্থাপিত হয়। এই স্থানের গুরুপরম্পরা বিশেষ প্রামাণিক। এই গুরু-পরম্পরাতেও পূর্বোক্ত গুরুপরম্পরার ৩৩ সংখ্যা (শ্রীস্বভূরাম দেবাচার্য) পর্যন্ত একপ্রকার। অবশিষ্ট নামগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

৩৩। শ্রীপরশুরাম দেব ৩৪। শ্রীহরিবংশ দেব ৩৫। শ্রীনারায়ণ দেব ৩৬। শ্রীবৃন্দাবন দেব ৩৭। শ্রীগোবিন্দ দেব ৩৮। শ্রীগোবিন্দশরণ দেব ৩৯। শ্রীসর্বেশ্বর শরণ দেব ৪০। শ্রীনিম্বার্কশরণ দেব ৪১। শ্রীগোপেশ্বরশরণ দেব ৪২। শ্রীঘনশ্যাম শরণ দেব ৪৩। শ্রীবাল কৃষ্ণ দেব (বর্তমান)।

শ্রীপরশুরাম দেবাচার্যের কাল খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। শ্রীবালকৃষ্ণ দেবের কাল বিংশতি শতাব্দীর মধ্যভাগ। উভয়ের ব্যবধান ১০ পুরুষ এবং ৪০০ বৎসর। সুতরাং গড়-পড়তা আয়ু ৪০ বৎসর।

(৮) সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫—২৭ খ্রীঃ) খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাবের অন্তর্গত রোহতক জেলার খাঁড়া নামক স্থান হইতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত

নরহরি দেব নামক জনৈক সিদ্ধ মহাপুরুষ বর্ধমানে আগমন করেন, এবং বর্ধমান সহরের রাজগঞ্জে অবস্থান করেন। এইস্থানে ১৬০৮ খ্রী° অব্দে তিনি রাজগঞ্জ অঞ্চলের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি ১০১ বৎসর উক্তস্থানে বাস করিয়া নিরুদ্দেশ হয়েন। তাঁহার দুই শিষ্য, সুখদেব ও দয়ারাম। তিনি নিরুদ্দেশ হইবার পূর্বে সুখদেব গোস্বামীকে বর্ধমান রাজগঞ্জ অঞ্চলের মহন্ত আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহার দ্বিতীয় শিষ্য দয়ারাম গোস্বামী বর্ধমান জেলার উখড়া নামক স্থানে উখড়া অঞ্চল স্থাপন করেন। সুখদেব গোস্বামীর শিষ্য গঙ্গারাম দেব নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার চূর্ণীনদীর তীরে আড়ংঘাট নামক স্থানে আড়ংঘাট্ অস্থল স্থাপন করেন। সুখদেব গোস্বামীব অন্যতম শিষ্য গোপালদেব মেদিনীপুর জেলায় চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুব অঞ্চল স্থাপন কবেন। এই চারিটি অস্থলে গুরুপরম্পরা যথারীতি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীনিম্বার্ক আশ্রম হইতে সংগৃীত উপরিলিখিত গুরুপরম্পরার ৩৫ সংখ্যক শ্রীপরমানন্দ দেবাচার্যেব গুরুভ্রাতা শ্রীমথুবদেব, শ্রীমথুরদেবেব শিষ্য শ্রীশ্যামদেবেব শিষ্য শ্রীসেবা দেব, শ্রীসেবাদেবেব শিষ্য শ্রীনবহবি দেব। শ্রীনরহরি দেব হইতে বর্ধমান রাজগঞ্জ অঞ্চলের বর্তমান মহন্ত শ্রীমনোহর শবণ দেব ৯ পুরুষ অন্তর। এই অঞ্চলের গুরুপ্রণালী হইতে দেখা যায় যে এই ৯ পুরুষে ১১জন মহন্ত। শ্রীনবহরি দেব বর্ধমান অঞ্চলের ভিত্তি স্থাপন করেন ১০১৫ সালে (অর্থাৎ খ্রী' ১৬০৮)। বর্তমান মহন্ত শ্রীমনোহর শরণ দেব ১৩২৭ সালে (খ্রী' ১৯২০) মহন্তপদ লাভ কবেন। এই ৯ পুরুষে ৩১২ বৎসর হয়; সুতবাং প্রতি পুরুষে গড়পড়তা প্রায় ৩৫ বৎসব হয়।

(৯) উখডা অঞ্চলের গুরুপরম্পবা হইতে দেখা যায় যে শ্রীদয়ারাম দেব হইতে বর্তমান মহন্ত শ্রীরামশরণ দেব পর্যন্ত ৭ পুরুষ। এই ৭পুরুষে ১১ জন মহন্ত। শ্রীদয়ারাম দেব কর্তৃক উখডা অঞ্চল স্থাপিত হয় ১১১৯ সালে। বর্তমান মহন্ত ১৩৪৭ সালে মহন্তপদ লাভ করেন। আমরা দেখিতে পাই এই ৭ পুরুষে ২৩৭ বৎসর হয়; সুতরাং গড়পড়তা প্রায় ৩৪ বৎসর।

(ক্রমশঃ)

লেখমালায় সরস্বতী

(পূর্বানুবৃত্ত)

স্বর্গত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

পথ্যাস্বস্তি ও সরস্বতী

কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে, বাক্ পথ্যাস্বস্তি নামে প্রসিদ্ধ। পথ্যাস্বস্তির অধিষ্ঠান ছিল উত্তরে। ঐ ব্রাহ্মণের টীকাকার এখানে বলিয়াছেন—ভাষা এখানে ভাল করিয়া বোঝা যায় ও বলা হইয়া থাকে; কারণ, কাশ্মীরে সরস্বতীর আবাস এবং বদরিকাশ্রমে বেদধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে।*

বস্তুতঃ লোকে ভাষা শিক্ষা ও বিদ্যালাভের জন্য সুপ্রাচীন শিক্ষা-কেন্দ্র তক্ষশিলা গমন করিতেন। তক্ষশিলা উত্তরে অবস্থিত। আর উত্তরপ্রদেশেই সরস্বতী বাক্‌দেবীত্ব লাভ করেন। গৃহ্যসূত্রে ও ব্রাহ্মণে উত্তরদিকে সরস্বতীর আহ্বানের উপদেশ আছে।

দুষ্টা সরস্বতী

দুষ্ট সরস্বতী স্কন্ধে চাপার কথা আমদের দেশে অজ্ঞাত নয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বিষ্ণু সরস্বতীকে 'বাক্‌দুষ্টা', 'কলহপ্রিয়া' বলিয়াছেন। উদ্ভট কবিতায়ও সরস্বতী 'প্রকৃতি-মুখরা'। সরস্বতীর এরূপ হইবার কারণ কি ?

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সরস্বতীর দুইটী গুণের কথা কল্পনা করিয়াছেন, একটী সত্যরূপ, অপরটী মিথ্যারূপ।

মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী

বৌদ্ধযুগের পূর্বের গ্রন্থে সরস্বতীর বর্ণশ্বেত বলিয়া সর্বত্র উক্ত। পুস্তক ও লেখনীর সঙ্গে কতদিন সরস্বতীর সম্বন্ধ তাহা স্থির করা কঠিন। তবে এসম্বন্ধ যে অনেক পরে হইয়াছিল তাহার নিদর্শন নবম, দশম শতাব্দের গ্রন্থাদিতে দেখা যায়। (?)

গ্রন্থনামে সরস্বতী

সরস্বতী কণ্ঠাভরণ—(১) রত্নেশ্বর প্রণীত [Ulwar 1089]

সরস্বতী কণ্ঠাভরণ—(২) একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র। ভোজদেব রাজার রাজত্বকালে কোন পণ্ডিতের দ্বারা লিখিত। ইহাতে রাজার সুখ্যাতি বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।—(৩) জগদ্ধর প্রণীত—Ulwar 1088 (৪র্থ পরিচ্ছেদ) সরস্বতীতন্ত্র—[রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sans. Mss. p. 261, 447.]

---

* Miller, Ancient Sanskrit Literature p p 180, 346; Weber History of Indian literature p 50 : হরিদাস ভট্টাচার্য—নব্যভারত, ১৩৩০ (চৈত্র পৃঃ ৬৩৪

সরস্বতী দানবিধি—কমলাকর প্রণীত।

সরস্বতী দ্বাদশ নামস্তোত্র—আশ্বলায়ন প্রণীত। [রাজেন্দ্র মিত্র ৮৯২ পৃঃ Burnell. 208 a.]

সরস্বতী পুরাণ—বা শারদাপুরাণ—'হিমাদ্রি'তে ইহার যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'সরস্বতী পুরাণে সরস্বতীমাহাত্ম্য'—Buhler p. 539.

সরস্বতীয় বেদান্ত—স্বামপ্রকাশ সরস্বতী [Rice এর Catalogue of Sanskrit Manuscript in Mysore & Coorg. Bangalore 1884. p. 184.]

সরস্বতীবিলাস—বিদ্বচ্চকোরা ভট্ট প্রণীত। [Gustav Oppert এর Lists of Sanskrit manuscripts in Private Libraries of Southern India. P. 8324.]

সরস্বতীবিলাস-কাব্য—রমণাপতি প্রণীত—[কাব্যমালা]

সরস্বতীবিলাস—উড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের 'প্রতাপরুদ্রদেব' রাজার অনুমত্যানুসারে সংগৃহীত। শবিদ্বল্লভ মিশ্র প্রণীত (Adyar Library 7).

সরস্বতী স্তোত্র—আশ্বলায়ন প্রণীত (Ulwar 2418)

ওঁঙ্কার—জৈনদিগের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ও অস্মামৎ ধর্মসম্প্রদায় কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করার রীতি প্রচলিত আছে—তাহার মধ্যে শ্বেতাম্বরী মন্দিরের দুইটী এখানে প্রকাশ করা গেল,—(১) ওঁঙ্কার (২) হ্রীঙ্কার।

(১) ওম্—ব্রাহ্মণে ওম্ শব্দে ত্রিমূর্তি বোঝায়। অ=বিষ্ণু, উ=শিব, ম=ব্রহ্ম। শ্বেতাম্বরীরা ইহাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, অ+আ+স্ (বা অ)+উ+ম্, এবং তাহাদের অর্থ, অ=অর্হৎ ; আ=আচার্য ; য=সিদ্ধ, অশরীর বা অপুনর্ভব ; উ=উপাধ্যায় ; ম=মুনি। এই চিহ্নসকল সাধারণতঃ কোন রঙ্গীন প্রস্তরে বা মণ্ডপের (মন্দির) অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালে অঙ্কিত থাকে ও ওঁঙ্কার নামে অভিহিত হয়। আজকাল যেরূপে 'ওম্' লেখা হইয়া থাকে ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। ইহাতে কাল পাথরের একটী গোলাকার 'অনুস্বার' আছে, তাহার নীচে একটী পীতবর্ণের প্রস্তরে আ (বা ও) অক্ষরের অনুযায়ী চিহ্ন ও সর্বনিম্নে অর্ধগোলাকার একটী চিহ্ন থাকে। এইরূপে অঙ্কিত চিত্রমধ্যে নিম্নের অর্ধ-গোলাকার স্থানের মধ্যে 'মুনি', তাহার উপরিস্থ সমান্তরাল চিহ্ন মধ্যে 'উপাধ্যায়', রক্তবর্ণ দণ্ডের মধ্যে 'সিদ্ধ', পীতবর্ণের মধ্যে 'আচার্য' ও কাল পাথরের উপর 'অনুস্বারে' অঙ্কিত থাকে 'অর্হৎ'।

হ্রীঙ্কার—ঐরূপ নানাবিধ রঙের প্রস্তরে খোদিত আর একটী চিহ্ন আছে—তাহার নাম হ্রীঙ্কার। ইহার অনুস্বার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে, তাহার পর শ্বেত প্রস্তরে, তাহার পর রক্তবর্ণ প্রস্তরে, বাকী নিম্নদিকে সমস্ত পীতবর্ণ প্রস্তরে অঙ্কিত। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিতে ২৪ জন জৈন (তীর্থঙ্কর) মূর্ত্তি আছে। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে—মুনি সুব্রত ও নেমি ; শ্বেতবর্ণে—চন্দ্রপ্রভা

ও পুষ্পদন্ত, রক্তবর্ণে—পদ্মপ্রভা ও বসুপূজ্য, নীলবর্ণে—মল্লি ও পার্শ্ব, অবশিষ্ট জৈনদিগের মধ্যে ছয়জন করিয়া দুইভাগে ও একজন করিয়া দুইভাগে অঙ্কিত থাকে। এইরূপে ২৪ জন জৈন ইহাতে অঙ্কিত থাকে।

দেশনামে সরস্বতী

১। সরস্বতী-নগর—মহাভারতে মৌষল পর্বের ৭ম অধ্যায়ে সরস্বতী-নগরের উল্লেখ আছে। ইহা কুরুক্ষেত্রের অন্তর্বর্ত্তী সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত শিরসা।

২। সারস্বত—বরাহপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে সারস্বত নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ইহা আজমীঢ়ের নিকট পুষ্কর-হ্রদ।

৩। সারস্বত বা সারস্বতপুর—ইহা জৈমিনিভারতের বীরবর্মার রাজধানী ছিল (৪৭ অঃ)। এই নগরটী হস্তিনাপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত (হেমকোষ)।

৪। সরস্বতীপুর—এটী বগুড়া জেলা, খাট্টা পরগণার আদমদীঘি থানায় অবস্থিত একটী গ্রাম।

৫। বাগ্দেবী পাড়া—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে বাগ্দেবীপাড়া নামে একটী পল্লী আছে।

সরস্বতী কবচ

শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্বতঃ
শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈঃ স্বাহা ভালং মে সর্বদাবতু॥
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শোত্রে পাতু নিরন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবত্যৈ সরস্বত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু॥
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্বদাবতু।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা চোষ্টং সদবতু॥
ওঁ শ্রাং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপঙিক্তং সদাবতু।
ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু॥
ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধৌ মে শ্রীং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু॥
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্॥
ওঁ হ্রীং ক্লীং বার্ণ্যৈ স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু।
ওঁ সর্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু॥
ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্বং সদাবতু।
ওঁ সর্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু॥
ওঁ সর্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু।
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা॥

সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু।
ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং সদাবতু।
ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু॥
ওঁ সর্বাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।
ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু॥
ঐং সর্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহেশান্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু॥
হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু।
ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্বতোঽবতু॥

সরস্বতীচালন

তয়োরাদৌ সরস্বত্যাশ্চালনম্ কথয়ামি তে।
অরুন্ধত্যেব কথিতা পুরাবিদ্ভিঃ সরস্বতী॥
যস্যা সঞ্চালনে নৈব স্বয়ং চলতি কুণ্ডলী।
ইডায়াং বহতি প্রাণে বদ্ধা পদ্মাসনং দৃঢ়ং॥
দ্বাদশাঙ্গুলদৈর্ঘ্যং চ অম্বরং চতুরঙ্গুলম্।
বিস্তীর্য তেন তন্নাডীং বেষ্টয়িত্বা ততঃ সুধীঃ॥
অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং তু হস্তাভ্যাং ধারয়েদ্দৃঢ়ম্।
স্বশক্ত্যা চালয়েদ্বামে দক্ষিণেন পুনঃপুনঃ॥
মুহূর্ত্তদ্বয়পর্যন্তং নির্ভয়াচ্চালয়েৎ সুধীঃ।
ঊর্ধ্বমাকর্ষয়েৎ কিঞ্চিৎ সুষুম্নাং কুণ্ডলীগতা॥
তেন কুণ্ডলিনী তস্যাঃ সুষুম্নায়া মুখং ব্রজেৎ।
জহাতি তস্মাৎ প্রাণোঽয়ং সুষুম্নাং ব্রজতি স্বতঃ॥
তুন্দে তু তাণং কুর্যাচ্চ কণ্ঠসঙ্কোচনে কৃতে।
সরস্বত্যাশ্চালনেন বক্ষঃ স্যাদূর্ধ্বগো মরুৎ॥
সূর্যেণ রেচয়েদ্বায়ুং সরস্বত্যাস্তু চালনে।
কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা বক্ষঃ স্যাদূর্দ্ধগো মরুৎ॥
তস্মাৎ সংচালয়েন্নিত্যং শব্দগর্ভাং সরস্বতীম্।
যস্যাঃ সংচালনে নৈব যোগী রোগৈঃ প্রমুচ্যতে॥
গুল্মং জলোদরপ্লীহো যে চান্যে তুন্দমধ্যগাঃ।
সর্বে তে শক্তিচালেন রোগা নশ্যন্তি নিশ্চয়ম্॥

সরস্বতী

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥ —ঋগ্বেদ ১।৩।১০
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
ধীনামবিত্র্যবতু ॥ —ঋগ্বেদ ৬।৬১।৪
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিং ॥ —ঋগ্বেদ ৬।৬১।৭
উত স্যা নঃ সরস্বতী জুষাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অস্মিন্।
মিতজ্ঞুভির্নমস্যৈরিয়ানা রায়া যুজা চিদুত্তরা সখিভ্যঃ ॥ —ঋগ্বেদ ৭।৯৫।৪

বাচ্

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামন্ববিংদন্নৃষিষু প্রবিষ্টাং।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবংতে ॥ —ঋগ্বেদ ১০।৭১।৩
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ংতীং ॥ —ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৩

অগ্নি ও সরস্বতী

হোতারং ত্বা বৃণীমহেঽগ্নে দক্ষস্য সাধনং।
যজ্ঞেষু পূর্ব্যং গিরা প্রয়স্বংতো হবামহে ॥ —ঋগ্বেদ ৫।২০।৩
সা নো বিশ্বা অতি দ্বিষঃ স্বসৄরন্যা ঋতাবরী।
অতন্নহেব সূর্যঃ ॥ —ঋগ্বেদ ৬।৬১।৯

সোম ও সরস্বান্

নৃচক্ষসং ত্বা বয়মিংদ্রপীতং স্বর্বিদং।
ভক্ষীমহি প্রজামিষং ॥ —ঋগ্বেদ ৯।৮।৯
পাপিবাসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ।
ভক্ষীমহি প্রজামিষং ॥ —ঋগ্বেদ ৭।৯৬।৬

অশ্বী ও সরস্বতী

উতা যাতং সংগবে প্রাতরহ্নো মধ্যংদিন উদিতা সূর্যস্য।
দিবা নক্তমবসা শংতমেন নেদানীং পীতিরশ্বিনা ততান ॥ —ঋগ্বেদ ৫।৭৬।৩
প্রাতর্দেবীমদিতিং জোহবীমি মধ্যংদিন উদিতা সূর্যস্য।
রায়ে মিত্রাবরুণা সর্বতাতেলে তোকায় তনয়ায় শং যোঃ ॥ —ঋগ্বেদ ৫।৬৯।৩

উষা ও সরস্বতী

অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবংত বস্তবে।
উদীরয় প্রতি মা সুনৃতা উষশ্চোদ রাধো মঘোনাং ॥—ঋগ্বেদ ১।৪৮।২
উভে যত্তে মহিনা শুভ্রে অংধসী অধিক্ষিয়ংতি পূরবঃ।
সা নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাং ॥—ঋগ্বেদ ৭।৯৬।২

উষা ও বাচ

এষা স্যা নব্যমায়ুর্দধানা গূঢ্বী তমো জ্যোতিষোষা অবোধি।
অগ্র এতি যুবতিরহ্রয়াণা প্রাচিকিতৎ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিং ॥—ঋগ্বেদ ৭।৮০।২
সসর্পরীরভরত্তূয়মেভ্যোঽধি শ্রবঃ পাংচজন্যাসু কৃষ্টিষু।
সা পক্ষ্যানব্যমায়ুর্দধানা যাং মে পলস্তিজমদগ্নয়ো দদুঃ ॥—ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১৬

বৃহস্পতি (ব্রহ্মণস্পতি) ও সরস্বতী

ত্বামিদ্ধি সহস্পুত্র মর্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে।
সুবীর্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত যো ব আচকে ॥—ঋগ্বেদ ১।৪০।২
ত্রাতারং ত্বা তনূনাং হবামহেঽবস্পতর্রধিবক্তারমস্ময়ুং।
বৃহস্পতে দেবনিদো নি বর্হয় মা দুরেবা উত্তরং সুম্নমুন্নশন্ ॥—ঋগ্বেদ ২।২৩।৮
যস্ত্বা দেবি সরস্বত্যুপব্রূতে ধনে হিতে।
ইংদ্রং ন বৃত্রতূর্যে ॥—ঋগ্বেদ ৬।৬১।৫
সরস্বতী দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিংদো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি ॥ —ঋগ্বেদ ৬।৬১।৩

ইন্দ্র ও সরস্বতী

যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা অনাশস্তা ইব স্মসি।
আ তূ ন ইংদ্র শংসয় গোষ্বশ্বেষু শুভ্রিষু সহস্রেষু তুবীমঘ ॥—ঋগ্বেদ ১।২৯।১
অংবিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমংব নস্কৃধি ॥—ঋগ্বেদ ২।৪১।১৬

বায়ু ও সিন্ধু (সরস্বতী)

প্র বায়ুমচ্ছা বৃহতী মনীষা বৃহদ্রয়িং বিশ্ববারং রথপ্রাং।
দ্যুতদ্যামা নিযুতঃ পত্যমানঃ কবিঃ কবিমিয়ক্ষসি প্রযজ্যো ॥—ঋগ্বেদ ৬।৪৯।৪
রমধ্বং মে বচসে সোম্যায় ঋতাবরীরুপ মুহূর্তমেবৈঃ।
প্র সিংধুমচ্ছা বৃহতী মনীষাবস্যুরহ্বে কুশিকস্য সূনুঃ।—ঋগ্বেদ ৩।৩৩।৫

বাচ ও বিশ্বকর্মা

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভুব ॥—ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৮
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।—ঋগ্বেদ ১০।৮২।৫

উপাধিতে সরস্বতী

যিনি খুব বড় পণ্ডিত, যাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, তাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলিয়া থাকে, "স্বয়ং দেবী সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠলগ্না।" প্রবাদে কালিদাসকেই সরস্বতীর বরপুত্র বলা হইয়াছে। প্রত্যুত জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সহিত জ্ঞানী সুধীজনের সম্বন্ধ ঘটানো আমাদের দেশের রীতি। ক্রমশঃ জ্ঞানীর সহিত সরস্বতীর নাম গুণবাচক উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের পূর্বে বিদ্যাবত্তার পরিচয়-সূচক উপাধি কাহারও নামের সহিত যুক্ত হইতে দেখা যায় না। বোধ হয় শঙ্করই সর্বপ্রথম গুণবাচক উপাধির প্রবর্তক। তিনিই সর্বপ্রথম 'দশনামী' সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য প্রভৃতি দশটী উপাধি তাহারই প্রমাণস্বরূপ আজও বর্তমান। উপাধিতে সরস্বতী সর্বপ্রথম শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। আমরা 'দশনামী' সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ভারতী' উপাধিযুক্ত সম্প্রদায় দেখিতে পাই। ইহার পর হইতে 'সরস্বতী' উপাধি যথেষ্ট দেখা যায়। বড় বড় পণ্ডিতের নামের সঙ্গে 'সরস্বতী' উপাধি বিরল নহে। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত বেশী যে, সকল পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিতে গেলেই একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। আমরা নিম্নে প্রাচীন এবং বর্তমান সময়ের কয়েকজন 'সরস্বতী' উপাধিযুক্ত পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। (স্থানাভাববশতঃ সকল পণ্ডিতের নাম দেওয়া যাইবে না।)

বালসরস্বতী বা বাল সরস্বতী মদন—অর্জ্জুনবর্মা অমরুশতকের টীকা রচনা করেন। অমরুশতকের প্রথম কবিতার টীকায় তিনি (পৃঃ ২) উপাধ্যায় মদনের শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে লিখিত একটী শ্লোক উদ্ধৃত করেন। 'পারিজাতমঞ্জরী'কার রাজগুরু মদন ও উপাধ্যায় মদন অভিন্ন ব্যক্তি। ইনিই অর্জুনবর্মার তিনখানি দানপত্রের রচয়িতা। 'রসিক সঞ্জীবনী'তে মদনের রচিত অন্যান্য শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে। অর্জুনবর্মার রাজত্বকালে রাজগুরু মদন একখানি নুতন নাটক রচনা করেন। নাটকখানির নান্দী (Prologue) হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই নাটকের প্রথম অভিনয় সরস্বতী [১] দেবীর মন্দিরে হইয়াছিল [২]।

---

(১) সারদাদেবী (১. ৩) বা ভারতী (১. ৬)।

(২) J. A. S. B. Vol. V. 379 ; J. A. O. S. Vol VII. p. p. 29 and 38.

প্রোফেসর অপার্ট (Prof. Oppert) তাঁহার সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় বালসরস্বতী-রচিত 'বালসরস্বতীয়ম' নামক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। Prof. Aufrecht ইহা উপাধ্যায় মদন-লিখিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।১ বালসরস্বতী মদন জৈন আশাধরের নিকট কাব্যপদ্ধতি শিক্ষা করেন। আশাধর, মালবরাজ অর্জুন এবং তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারী দেবপাল ও জৈতুগিদেবের (জয়সিংহ) সমসাময়িক।২

১৬০৮ শকাব্দের মহাদেবেন্দ্র সরস্বতীর মেলুপক দানপত্রে কয়েকজন সরস্বতী উপাধিধারী পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় ৩। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

	নাম	দানপত্র	শকাব্দ
১।	সদাশিব সরস্বতীর শিষ্য মহাদেব সরস্বতী	বীর নৃসিংহের 'কুদিয়ন্তন্দল দানপত্র	১৪২৯
২।	মহাদেব সরস্বতীর শিষ্য চন্দ্রচূড় সরস্বতী	কৃষ্ণদেব রায়ের Conjevaram plates	১৪৪৪
৩।	চন্দ্রশেখর সরস্বতীর শিষ্য সদাশিব সরস্বতী	কৃষ্ণদেব রায়ের Udayambakan Grant	১৪৫০
৪।	চন্দ্রশেখর সরস্বতীর শিষ্য মহাদেবেন্দ্র সরস্বতী	মহাদেবেন্দ্র সরস্বতীর Melupaka Grant	১৬০৮

এতদ্ব্যতীত বহু বিশিষ্ট বৈদান্তিক আচার্যের নামে সরস্বতী উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত সাধুদের দশটী সম্প্রদায়ের অন্যতম সরস্বতী সম্প্রদায়ভুক্ত যথা—

(ক) নৃসিংহ সরস্বতী—ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন।

(খ) মধুসূদন সরস্বতী—খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকে মুগলসম্রাট্ শাহ্‌জহানের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।

(গ) ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী—

(ঘ) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী—ইনি আর্য সমাজের প্রবর্তক ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

---

(১) Catalogus Catalogorum Vol. I, p. 425.

(২) Dr. Bhandarkar's Report for 1883-84, p. 104f.
Buhler—Z, D, M, G, Vol, XLVII, p, 94 ;
এবং Prof. Kielhorn, above Vol. V. App. p. 52. note 3.

(৩) Epigraphia Indica Vol. 14, p. 356,

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

মায়াবাদ

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য, বি. এ.

উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর এই 'মায়াবাদে'র প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কিছু বলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই; তবে তাঁহার মায়াবাদ সম্পর্কে আমাব সামান্য বক্তব্য আছে। যথাসাধ্য তাহাই বর্ণনা করিতেছি।

যোগর্ষি শঙ্কর যে সময় বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করিতেছিলেন, সেই সময তিনি নিশ্চয়ই এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি জগতকে 'মায়া' বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার এই মন্তব্য আব কখনও পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পান নাই। ভগবানেব বিরাট সৃষ্টি জগতৎকে তিনি অস্তিত্বহীন বলিয়াই মনে করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছিলেন "রজ্জুতে সর্প ভ্রম" বৎ, অর্থাৎ কোন কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ রজ্জুকে সর্পের ন্যায় মনে কবিয়া থাকেন। বস্তুতঃ রজ্জু কদাচ সর্প হইতে পারে না। সেইরূপ এই বিরাট জগতকেও জীব ভ্রমহেতু স্থিতিমান বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই জগতের কোন অস্তিত্ব নাই। এই বিরাট জগত কালে লয় হইয়া যাইবে। জীব ভ্রম বশতঃ ইহাব পৃথক্ সত্ত্বা অনুভব করিয়া থাকে।

'মায়া' শব্দের অর্থ আমরা 'মিথ্যা' বা 'অলীক' বলিয়া জানি। তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য জগতকে মিথ্যা বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন। এই স্থলে প্রথম বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন। উপনিষদে পাওয়া যায় যে, বিরাট ভগবান্ পরমপুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইরূপে বর্তমান থাকিয়া সৃষ্টি করেন। পরম পুরুষ স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রেরণায় তাঁহার স্বভাবের বিকৃতি না ঘটিলে সৃষ্টি হইতে পারে না। পরন্তু বিরাট শক্তিমান্ ভগবানের প্রাকৃতিক অংশের স্বভাব হইল 'আত্মবিকাশ' করা, যাহাকে বলা চলে সৃষ্টি। পরমপুরুষ প্রকৃতিকে তাঁহার সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করেন মাত্র। প্রকৃতির সমুদয় শক্তিটুকুর মধ্যেই বিকাশের প্রেরণা। ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, পুরুষ এবং প্রকৃতির সম্মিলিত চেষ্টাতেই সৃষ্টির আরম্ভ। এই সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই আমরা ইহার সত্ত্বা সম্পর্কে অবহিত হই। ইহা স্থূলদর্শীর কথা। চক্ষের সম্মুখে কোন বস্তু না দেখিলে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা

সন্নিহান থাকেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা কি প্রতিপন্ন হয় না যে, যে বস্তুর সৃষ্টি করিবার জন্য পরমপুরুষ এবং প্রকৃতি সহযোগিতা করিয়া থাকেন ইহা পূর্বেই তাঁহাদের মধ্যে নিহিত থাকে? পুরুষ স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় বলিয়া তিনি ইহার সৃষ্টির চেষ্টা করিতে পারেন না; কিন্তু প্রকৃতি স্বভাব বশতঃ স্বীয় দেহ-নিহিত বস্তুর বিকাশের জন্যই পরম পুরুষের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইহা হইতে এইটুকু বলা চলে যে যাহা সকলের গোচরীভূত নয়, তাহাই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

জগতের সমস্ত বস্তুই সকলের গোচরীভূত হইবে এমন কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। স্থূল জগতেই আমরা ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। শব্দ সকলেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন; এই সঙ্গে ইহা ভাবিলে চলিবে না যে কাহারও কোন শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিলোপ হইয়া গেল। ইহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে 'বেতার যন্ত্রে'র সম্মুখে যাইতে হইবে। পরন্তু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন 'শব্দ ব্রহ্ম'। ইহার বিনাশসাধন হয় না। বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে শব্দের অস্তিত্ব চিরকালই স্বীকার্য। এই স্থলে আরও একটি উদাহরণ প্রয়োগ করা চলে। জলেতে "বুদ্বুদ" উঠিয়া পরক্ষণেই জলে মিলিয়া যায়। এই হেতু ইহা বলা চলে না যে 'বুদ্বুদে'র কোন অস্তিত্ব নাই। জলের মধ্যে 'বুদ্বুদ'-শক্তি রহিয়াছে বলিয়াছি, জলের আলোড়নে ইহার বিকাশ দৃষ্ট হয়। শুধু 'বিকাশে'ই অস্তিত্ব বুঝায় না; ওতঃপ্রোতভাবে সৃজনীশক্তির সঙ্গে মিশিয়া থাকিলেও ইহার অস্তিত্বের অল্পতা ঘটে না। স্বাভাবিক নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলেই কোন বস্তুর বিকাশ দৃষ্ট হয়। এই নিয়ম জীব জগতেও সর্বত্র প্রযোজ্য। দুগ্ধের মধ্যে মাখন থাকে, ইহা প্রথম দৃষ্ট হয় না; দুগ্ধের বিকৃতিভাব না হইলে, অর্থাৎ দধি না হইলে ইহা হইতে সহজে মাখন উঠান চলে না; কিন্তু তাই বলিয়া দুগ্ধে প্রথম মাখন দৃষ্ট না হইলেও ইহাতে মাখন নাই এইরূপ বলা চলে না।

এই স্থান হইতে ইহাই প্রতিবোধ্য হয় যে সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে এমন একটা বস্তু রহিয়াছে যাহার বিকাশকেই আমরা সৃষ্টি বলিয়া জানি এবং বুঝি। এই বস্তুর সৃষ্টি হউক আর নাই হউক, ইহা চিরকাল এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছেই। ক্ষণে ক্ষণে ইহার প্রকাশ হয়, ক্ষণে ক্ষণে আবার অপ্রকাশ অবস্থায় থাকে। যাহা চিরকাল এমনি অবস্থায় থাকে এবং আছে তাহাই সত্য। যেহেতু সত্যবস্তু চিরস্থায়ী। তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমেয় যে সৃষ্টি-তত্ত্বের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সত্য বস্তুর বিকাশ-সাধন করা। পরন্তু পরমপুরুষ এবং প্রকৃতির প্রচেষ্টায় এই সত্যবস্তুর বাহ্যিক প্রকাশ গোচরীভূত হয়। এই বিরাট জগতও তাঁহাদেরই একীভূত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আমরা জগতকেও সত্যবস্তু বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। যেহেতু ইহা সত্য বস্তুরই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। ইহা কোন সময় অপ্রকাশাবস্থায় থাকিতে পারে। কিন্তু কখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না। কারণ ইহা অপ্রকাশাবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে নিহিত থাকে; এবং এই কারণেই প্রকৃতি স্বভাব বশতঃ পুনঃ

ইহার সৃষ্টি করিতে যত্ন করেন; ফলে তিনি পরমপুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপেই জগতের বাহ্যিক প্রকাশ ও অপ্রকাশ চিরকাল ব্যাপিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরন্তু জগত যদি বিলয় হইয়া যাইত, তবে কদাচ ইহার পুনঃ সৃষ্টি আশা করা চলিত না। কিন্তু সৃষ্টিতত্বের ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, যুগে যুগে জগতের বিকাশ এবং অবিকাশ সাধিত হইতেছে।

এই ক্ষণে আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে পুনঃ ফিরিয়া আসি। আমরা দেখিতেছি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য জগতকে মায়া অথবা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রমাণে আমরা এই মত গ্রহণে সমর্থ নহি। এই স্থলে আরও কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহার মতের সত্ত্বা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে "রজ্জুকে সর্প ভ্রম" বৎ। ইহার উত্তরে এই বলা চলে যে যদি কোন ব্যক্তি ভ্রম বা ভুলবশতঃ রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করে, তবে কি সেই ভ্রমের জন্য রজ্জু দায়ী? কাহারও যদি কামেলা রোগ হয় এবং সেই রোগের প্রকোপ হইতে সমস্ত বস্তুকেই ইনি হরিদ্রা রঙের দেখিয়া থাকেন, তবে কি এইজন্য বস্তুসকল দায়ী হইবে? সময় সময় জীবের এমন অবস্থা আসে যে, সে বিভিন্ন বস্তুতে ভুলবশতঃ নানাপ্রকার বিকৃতাবস্থা দর্শন করিয়া থাকে। দ্রষ্টার ভুল হেতু দৃষ্ট বস্তুর বিকৃতভাবের জন্য দ্রষ্টা নিজেই দায়ী; দৃষ্ট বস্তু নহে। যেহেতু দ্রষ্টার দর্শনেব মধ্যে কোন সত্ত্বাব প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারণ যে বস্তু তাহার চক্ষে বিকৃত, ইহাই অন্যান্য জীবগণের নিকট প্রকৃত। পরন্তু অন্যান্যদের দর্শনের মধ্যে সত্ত্বার প্রমাণ পাওযা যায। এক রকমের কাঁচ আছে যাহা চোখে দিলে যুগপৎ নানা রঙ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা চোখে দিয়া আকাশের দিকে তাকাইলে ঐ কাঁচের রঙ্ অনুযায়ী লাল, নীল, সবুজ, সাদা, হল্‌দে প্রভৃতি অনেক রঙে সজ্জিত আকাশ দৃষ্ট হয়। এই কাঁচ প্রয়োগজনিত দর্শন হেতু দ্রষ্টা যে ভুল দেখিল, এই জন্য কি আকাশ দায়ী? আকাশ ত তাহার স্বাভাবিক রূপ লইয়া অবস্থান করিতেছে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি একটা বিষয় এক মনে ভাবিতেছেন, তাঁহার সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি তাহা টের পাইলেন না। পরক্ষণে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন যে, কেহ তাঁহার সম্মুখ দিয়া যায় নাই। এই স্থলে ইহা সত্য যে, তিনি ঐ ব্যক্তির যাতায়াত বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু একটি ব্যক্তি যে সেই দিক দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা-ত সত্য। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে একজনের নিকট 'সময় বিশেষে' যাহা মিথ্যা, অন্যজনের নিকট তাহাই সত্য। পরন্তু অবিকৃতাবস্থার বিষয়ই আমাদের গ্রহণীয় হইবে। যে ব্যক্তি এক মনে অন্য বিষয় চিন্তা করিতেছেন তাঁহার মন বিকৃত; যে সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল সে অবিকৃতাবস্থায়ই গিয়াছে; যেহেতু সে ভাল করিয়াই বুঝিতেছে যে ঐ ব্যক্তির সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।

তাহা হইলে আমরা এই উপসংহারে আসিতে পারি যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য যে অবস্থায় থাকিয়া জগতকে মায়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা চরম অবস্থা নয়। একটু চিন্তা

করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই গোচরীভূত হইবে যে পূর্বোক্ত যুক্তি সমুহের দ্বারা 'মায়াবাদ' স্বীকার্য নহে। পরন্তু জগতের চিরসত্বাই যে গ্রহণীয় তাহা বুঝা যাইবে। এতদ্ব্যতীত আমরা মূল জগতেও দেখিতে পাই যে, কোন বস্তুই কোন কালে একেবারে অস্তিত্বহীন হয় না। যেমন বৃক্ষ, মানুষ বা অন্যান্য জন্তু। ইহা সত্য যে, কালে ইহারা বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কদাচ লুপ্ত হয় না—যেমন, ভস্ম। সব জিনিষ পোড়াইলেই ভস্ম হয়, ইহা ঐ জিনিষের বিকৃতাবস্থা। অনেকে বলিবেন ভস্ম কালে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু সত্যই কি তাহা হয়? ভস্ম কখনও লুপ্ত হয় না; মাটির সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃভাবে মিশিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না।

এমনিভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেরই বোধগম্য হইবে যে জগতের কোন বস্তুই চিরকালের তরে লুপ্ত হইয়া যায় না। সময় সময় অপ্রকাশিত থাকে মাত্র। বিরাট জগতের পক্ষেও এ নিয়মই প্রযোজ্য।

---

(২)

ভারতীয় ঋতু-বিভাগ

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম্‌-এ.

সূর্যের উত্তর-দক্ষিণ গতি অনুসারে বৎসরের ঋতু-বিভাগ হইয়া থাকে। সূর্যতাপের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্যন্ত পৃথিবীবাসী সকলেই তাহার প্রভাব অতি কঠোরভাবেই অনুভব করে। রবিকরের প্রাখর্য ও অপ্রাচুর্যই যে গ্রীষ্ম, শীত প্রভৃতির কারণ তাহা সকলেই জানেন। সূর্যাতপের প্রাখর্য ও দিনমানের দৈর্ঘ্য উভয়ই রবির উত্তর ও দক্ষিণ অয়নের উপরে নির্ভরশীল। সুতরাং সূর্যের যে উত্তর-দক্ষিণ গতি রহিয়াছে তাহাই পৃথিবীর গ্রীষ্মবর্ষাদি পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ। পার্থিব গোলকের মেরুদণ্ড ঈষৎ তির্যক্‌ভাবে অবস্থিত বলিয়া জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। এই তির্যক্ অবস্থান না থাকিলে সূর্যের উত্তর-দক্ষিণ গতি দৃষ্ট হইত না, পৃথিবীর সর্বত্রই দিবারাত্রি চিরকাল সমপরিমাণ হইত, সূর্যাতপের ন্যূনাধিক্য ঘটিত না—ফলে পৃথিবীর ঋতু-পরিবর্তন লোপ পাইত, বর্ষার পরে শরতের আগমন ঘটিত না, শীতের পরে বসন্তের সাক্ষাৎ মিলিত না, বস্তুত পৃথিবী বৈচিত্র্যহীন হইয়া পড়িত।

রবির এই উত্তর-দক্ষিণ গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ৭ই চৈত্র বা ২১শে মার্চ সূর্য্য দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া বিষুবরৃত্ত লঙ্ঘন করিয়া উত্তরমণ্ডলে প্রবেশ করে। এই দিনে

পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমপরিমাণ। এই দিবসকে Vernal Equinox day বা বাসন্ত-ক্রান্তিপাত দিবস বলে। তৎপর সূর্য ক্রমে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ৭ই আষাঢ় বা ২২শে জুন দিবসে উত্তর অয়নের শেষ সীমায় উপস্থিত হয় এবং স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই দিন হইতে দক্ষিণ-গতি আরম্ভ হইয়া থাকে। ইহাকে Summer Solstice day বা দক্ষিণায়ন দিবস বলে। এই দিনে উত্তর গোলার্ধে দিবামান সর্বাল্প। অতঃপর দক্ষিণমুখী সূর্য পুনরায় ৭ই আশ্বিন বা ২৩শে সেপ্টেম্বর বিষুববৃত্তে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাকে Autumnal Equinox day বা শারদক্রান্তিপাত দিবস বলে। তৎপর ৭ই পৌষ বা ২২শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণ-গতির শেষপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া স্থৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকে। তৎপরদিবস হইতে সূর্যের উত্তরায়ন প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাই Winter Solstice day বা উত্তরায়ন দিবস।

সূর্য বিষুববৃত্তের উত্তরে আগমন করিলে উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্মাধিক্য এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীতাধিক্য হইয়া থাকে। এই উত্তরাবস্থিতিকাল ছয় মাস ধরিয়া উত্তর মেরুতে সূর্য উদিত হইয়া থাকে এবং দক্ষিণ মেরুতে সূর্য অস্তমিত।

ভারতীয় ঋতুবিভাগ উত্তরায়ণ দিবস ৭ই পৌষ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। ৭ই পৌষ হইতে ৭ই ফাল্গুন পর্যন্ত শীত ঋতুকে বৈদিক কালে তপস ও তপস্য মাস নামে অভিহিত করা হইত। ৭ই ফাল্গুন বসন্ত ঋতুর আরম্ভ—ইহার অন্তর্গত মাসদ্বয়ের নাম মধু ও মাধব। গ্রীষ্মকালের অন্তর্গত মাসদ্বয় শুক্র ও শুচি ৭ই বৈশাখ হইতে ৭ই আষাঢ় পর্যন্ত বিস্তৃত। তৎপর বর্ষা ঋতুর আরম্ভ। নভস ও নভস্য মাস এই ঋতুর অন্তর্গত। ৭ই ভাদ্র হইতে ভারতীয় শরৎকাল আরম্ভ, ইহার অন্তর্গত মাসদ্বয় ইষ ও উর্জ। ৭ই কার্তিক হইতে যে হেমন্তকাল আরম্ভ তাহার দুই মাসের বৈদিক নাম সহস ও সহস্য। তৎপর পুনরায় শীতকাল আরম্ভ।

সাধারণ লোকের ধারণা যে ৩০শে পৌষই উত্তরায়ণ দিবস এবং ৩০শে আষাঢ় দক্ষিণায়ন দিবস। প্রকৃতপক্ষে অয়ন-চলনবশতঃ উক্ত অয়নান্ত দিবসদ্বয় ২৩ দিন পূর্বে সংঘটিত হইতেছে। বর্ষা ঋতু ও নভস মাস ৭ই আষাঢ় হইতেই আরম্ভ হয় এবং এই দিবসই দক্ষিণায়ন দিবস। সেইরূপ উত্তরায়ন দিবসও ৭ই পৌষে আসিয়া পড়িয়াছে। উত্তরায়ন দিবসের স্নানাদি ধর্মকৃত্য ও পৌষ পার্বণ উৎসব ঐ ৭ই পৌষ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

আমাদের কথা

ভারতী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে কলিকাতা নগরীতে যে একটি আদর্শ বালক ও একটী আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল, সেই দুইটী বিদ্যালয় গত দশহরা দিবসে (৮ই আষাঢ়, ১৩৪৯) এই নগরীর একটি জনবহুল অঞ্চলে (১, গৌর লাহা স্ট্রীট্) স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে রাইট্ অনারেবল্ লর্ড সিংহের অভিভাষণ ও মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের বক্তৃতায় ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যধারার বিষয় সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধব্যাপার নিবন্ধন বালক-বালিকাদের শিক্ষাসমস্যা জটিল হইয়াছে সুতরাং বর্তমান সময়ে যখন অন্যান্য পুরাতন বিদ্যালয়গুলি বন্ধপ্রায় হইয়াছে, সে সময়ে নূতন বিদ্যালয়ের স্থাপনা প্রশংসনীয়। এই বিদ্যালয় দুইটীর মুদ্রিত নিয়মাবলী ও পাঠ্যবিষয় দেখিয়াও সুখী হইলাম। বালক-বালিকাদের ধর্ম ও নীতিমূলক শিক্ষা, শিল্পবিষয়ক শিক্ষা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে কার্যে পরিণত হইলে বর্তমান যুগে এই দুইটী বিদ্যালয় যে আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ইহাদের আশু উন্নতি কামনা করি।

* * * *

ভারতী মহাবিদ্যালয় এই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই ইহার পরিকল্পিত কর্মধারায় কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইহার গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ তিনটী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতেছে—(ক) ধর্মগ্রন্থ—ইহার ধর্মতত্ত্ব কলেজ (Theological College)এর অধ্যক্ষ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ., পি. এচ. ডি. মহাশয় বৈষ্ণব ও তন্ত্রশাস্ত্রের যে গভীর তত্ত্বমূলক বক্তৃতা ধারাবাহিকরূপে প্রদান করিতেছেন, সেইগুলি 'Hindu Mysticism' নামে ইহার ধর্মগ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে (খ) ডঃ ডি. সি. দাসগুপ্ত 'মহাবীর অতিরিক্ত বক্তৃতায়' "জৈন শিক্ষাপদ্ধতি" সম্বন্ধে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন ঐগুলি শিক্ষা-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে (গ) জৈনশাস্ত্র গ্রন্থও মুদ্রিত হইতেছে। দালমিয়া নগরের জৈনধর্ম ও শাস্ত্রানুরাগী বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রসাদ জৈন মহাশয় জৈনধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কার্যের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরও অনুকরণীয়। ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন পুস্তকাগারগুলিও ক্রমশঃ গঠিত হইতেছে। শুনিলাম যাহাতে শীঘ্রই কলিকাতা সন্নিকটস্থ ভাগীরথীতীরে মহাবিদ্যালয়ের স্থায়ী স্থান হয় তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে। দেশের বর্তমানে বিশেষ দুর্দিন, কিন্তু সেজন্য শিক্ষা ও গঠনমূক কার্যগুলি বন্ধ রাখা সমীচীন নহে। সেজন্য প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে ও শিক্ষানুরাগী ধনী ব্যক্তিকে এই সব কার্যে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করি।

* * * *

যুদ্ধনিবন্ধন বর্তমানে দেশে বহু খাদ্যদ্রব্যের ও বহু নিত্যব্যবহার্য বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। Industrial Survey (শিল্পোন্নতি ব্যবস্থা-নির্বাচন) কার্যের জন্য একটি কমিটিও সম্প্রতি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও অত্যাবশ্যকীয় বহু দ্রব্যাদির জন্য দেশে বহু ধনী ব্যক্তি থাকাসত্বেও কয়েকটী শিল্প কেন্দ্র গঠিত হইল না। অন্যান্যদেশে যুদ্ধের অস্বাভাবিক সময়েই বহু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে দেশবাসীদের চিরন্তন অর্থাভাব ও বর্তমান দ্রব্যাভাবের কোন সুব্যবস্থাই হইতেছে না।

দৃষ্টান্তরূপে একটী বিষয় বলা যাইতে পারে—কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য পুস্তক প্রকাশকার্য অনেকস্থানে বন্ধপ্রায়। যন্ত্রাভাবে কাগজশিল্প গঠিত হইতে না পারে, কুটীরশিল্পরূপে হাতে তৈয়ারী কাগজ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হইবার কোন কারণ নাই আশা করি দেশের উন্নতিকামী ব্যক্তিরা এই সব বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

পুস্তক সমালোচনা

বাঙলায় দেশী বিদেশী (বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন)—লেখক বিনয় সরকার। কলিকাতা চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬। মূল্য আট আনা।

এই রচনা "বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন" নামে অধ্যাপক ডক্টর বিনয় কুমার সরকার সম্পাদিত "আর্থিক-উন্নতি" মাসিকে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল (চৈত্র ১৩৪৮, বৈশাখ ১৩৪৯ মার্চ-এপ্রিল ও এপ্রিল মে ১৯৪২)। বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের গবেষক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় এম. এ মহোদয় কোন সংবাদপত্র সেবীর সহিত উক্ত বিষয়ে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল বর্তমান পুস্তিকায় প্রশ্নোত্তর ছলে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয় সরকার একজন খ্যাত্যাপন্ন লেখক। বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার দান অসীম। বিনয় বাবুর লেখার মধ্যে আর একটী বিশেষত্ব এই যে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী গতানুগতিক সাহিত্যের ভাবধারা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু তাঁহার ভাবধারা তিনি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেন যে পাঠকমাত্রেই তাঁহার ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে কষ্টবোধ করেন না। আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে লেখক বঙ্গসংস্কৃতি বলিতে কি বুঝায়, অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণে কিরূপে বর্তমান বঙ্গ-সংস্কৃতির উদ্ভব হইল ইত্যাদি বিষয়ে লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গ-সংস্কৃতির পাঠকমাত্রকেই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র আশ

জ্ঞানদাস-রচিত যশোদার বাৎসল্যলীলা—শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য এম. এ সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম. এ পি এইচ্. ডি, লিখিত ভূমিকা ও শব্দটীকা সংবলিত। কলিকাতা বাণীসঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২২ মূল্য সাধারণ পক্ষে ৸৹ ও সদস্যপক্ষে ॥৹।

বঙ্গসাহিত্যে জ্ঞানদাসের দান বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের দানের ন্যায় অত বিশাল না হইলেও তাঁহার নাম বৈষ্ণবসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। বর্তমান পুস্তিকায় জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটী সম্পূর্ণ নূতন পালা প্রকাশিত করিয়া সম্পাদক একদিকে যেমন পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে গবেষণাকার্যে তাঁহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন অন্যদিকে তাঁহার এই সম্পাদনায় বৈষ্ণবসাহিত্যের যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে তাহা স্বীকার্য। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং বর্তমান পালাটী প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণের নিকট সমাদর লাভ করিবে।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

বিদ্যাপতি—দ্বিতীয় সংস্করণ। স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র, এম. এ. (রায় বাহাদুর) কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীশরৎকুমার মিত্র, বি. এল্ কর্তৃক, কলিকাতা, ৮৫নং গ্রে স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য লেখা নাই।

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া প্রকাশক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় বঙ্গভাষার একটী মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। স্বর্গত মনীষি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে ও অন্তবিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী ১৩১৬ সালে সম্পাদন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহার পর সুদীর্ঘ ৩৩বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে "বসুমতী" হইতে একখানি বিদ্যাপতির পদাবলী বাহির হইযাছিল। পবে নগেন্দ্র বাবু নিজেই উহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় স্বর্গত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়েব উপর দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদনের ভার অর্পণ করেন। তিনি নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের পদগুলি ও মিথিলাগীত-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আরও কতকগুলি পদ আহরণ করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুসারে সাজাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে যেমন পদের নীচে তাহাব ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সেরূপ না করিয়া ব্যাখ্যা ও শব্দার্থ দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রায ছিল। দ্বিতীয়খণ্ডে একটী বিস্তৃত ভূমিকাও সংযোজিত হইবে, এইরূপ কল্পনা ছিল। এই সঙ্কল্প অনুসাবে বিদ্যাপতির সমগ্র পদগুলি তিনি ১৩৪১ সালে প্রথম খণ্ডরূপে প্রকাশ করেন। দ্বিতীযখণ্ডেব কার্যও তিনি কিছু আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১ম হইতে ৩১০ সংখ্যক পদ পর্যন্ত তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। তিনি ১৩৩৬ সালের চৈত্রমাসে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে ইহার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র মহাশয় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিবার ভার রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত করেন। রাযবাহাদুর ইহার ব্যাখ্যাংশ সম্পূর্ণ করিয়া একটী শব্দসূচী সংযোগ করিয়াছেন। বর্তমান সংস্কবণে পদগুলি নূতনভাবে সাজানো হইয়াছে। অনেক নূতন পদও সংযোজিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে মোট পদসংখ্যা ছিল ৯৩৫, বর্তমান সংস্করণে পদের সংখ্যা ১০৭০। এখনও অনুসন্ধান করিলে বিদ্যাপতির অপ্রকাশিত পদ আরও প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। খগেন্দ্র বাবু বৃন্দাবন হইতে কয়েকটী পদ পান, তাহা তিনি গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে প্রার্থনার পদ ৬টী ও চতুর্মাসের বিরহপদ ৪টী।

বর্তমান সংস্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য রায়বাহাদুর-লিখিত সুদীর্ঘ মুখবন্ধ, তাহাতে পাওয়া যায় বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির একটী 'Critical estimate', যাহার সাহায্যে বিদ্যাপতির পাঠক পদাবলীর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জ্ঞাত হইবেন এবং পদাবলীপাঠকালে ইহা তাঁহার অনেক উপকারে লাগিবে। গ্রন্থের ভূমিকায় বিদ্যাপতি ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত

আলোচনার সঙ্গে তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, বিদ্যাপতি রচনার কালনির্ণয়, এদেশে কয়জন বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল, পদাবলীর পাঠনির্ণয়, পদনির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা আছে, এসমস্ত বিষয়ও চিন্তাশীল পাঠকের নিকট কম মূল্যবান্ নহে। বর্তমান গ্রন্থের আর একটী বৈশিষ্ট্য বিদ্যাভূষণ 'নিবেদন' শীর্ষক একটী ভূমিকা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বিদ্যাপতি ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনার সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় কবিবরের পদাবলীর একটী চিন্তাপূর্ণ চূড়ান্ত হিসাব দাখিল করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'নিবেদনে' বলিতেছেন—"বিদ্যাপতির প্রকৃত পদাবলী নির্ণয় অসম্ভব। আবার একাধিক বিদ্যাপতি থাকাও অসম্ভব নয়। যাহাই হউক না কেন মৈথিল তালপত্রের পুঁথি ও নেপালের পুঁথির উপর নির্ভর করা যায়।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই দুই পুঁথির উপর নির্ভর করিয়াই পদ নির্বাচন করিয়াছেন। এই 'নিবেদনে' তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন বিদ্যাপতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সমস্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের একটী 'প্রমাণপঞ্জি'। ইহার দ্বারাও চিন্তাশীল পাঠক বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠে অনেক সাহায্য পাইবেন। গ্রন্থের শেষে শব্দার্থসূচী প্রদত্ত হইয়াছে; ইহাতে অনেক মৈথিল শব্দের আধুনিক বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় পাঠকের অনেক বিশেষ বোধসৌকর্য হইয়াছে। মোটেব উপর বঙ্গভাষার দুই জন কৃতি অধ্যাপকের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি যে বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে তাহা পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। তবে বড় দুঃখের বিষয় এই যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার আবদ্ধ কার্যেব পরিসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ও যে তাঁহাব কীর্তিস্তম্ভ গ্রন্থেব দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া যাইতে পাবিলেন না, ইহাও কম পরিতাপের বিষয় নহে। তবে যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে এবং যতদিন বিদ্যাপতি বঙ্গের সুধীমণ্ডলীর নিকট আদৃত হইবে, ততদিন বঙ্গের এই দুই কৃতি সন্তানের নাম পাঠকের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

পুস্তকখানি ছাপা ও প্রচ্ছদপট মনোরম হইয়াছে।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

(১) ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কলিকাতা।

(২) বাংলা গদ্যের চার যুগ অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিবরণ—শ্রীমনোমোহন ঘোষ, এম্. এ. পি-এইচ্. ডি. কলিকাতা।

(৩) দারিদ্র্যমোচন—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা।

(৪) শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্য — শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা।

(৫) তুর্কী বীর কামালপাশা—মৌলবী রেজাউল করিম, কলিকাতা।

(৬) নারী—শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ, কলিকাতা।

(৭) শক্তিসঙ্গম তন্ত্র, ২য় খণ্ড। তারাখণ্ড, Gaekward's Oriental Series, No. XCI.

(৮) শ্রীবিচারবিন্দু, প্রথম অধ্যায়—স্বামী মঙ্গলানাথ।

সাময়িক সাহিত্য—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯

ধর্ম ও দর্শন

উদ্বোধন—ব্যবহারবাদ—স্বামী সুন্দরানন্দ।

,, —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

,, —গীতার বয়স ও শ্লোক সংখ্যা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

,, —বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলন—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা—অনৃত ও ঋত জগৎ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

,, —মরণের পর (১৩)—শ্রীতুলসীদাস কর।

,, —আত্মানুভূতি—শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

সাহিত্য

ব্রহ্মবিদ্যা—উত্তরাধিকার-তত্ত্ব (৯)—শ্রীঅনুতোষ দাশগুপ্ত।

বঙ্গশ্রী—বাঙ্গালার বাঁইচ গান—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ, এম্-এ।

,, —বঙ্কিমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীশ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ. বি-এল্।

,, —গোবিন্দ দাস—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

,, —বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের অভিযান—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার।

ইতিহাস

বঙ্গশ্রী—মহারাণা প্রতাপসিংহ—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত, এম্-এ. বি-এল্।

উদ্বোধন—রাজগৃহ ও নালন্দা—শ্রীগদাধর সিংহ রায়, এম্-এ. বি-এল্।

বিবিধ

উদ্বোধন—ভারতের রাষ্ট্রভাষা—ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম্-এ. পি-এইচ্-ডি।

পুরাতন পত্রিকা

নবজীবন

১২৯৪ সাল

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ বি. এ. সঙ্কলিত

ভাদ্র—পৌত্তলিকতা—প্রাচীন আর্যেতর সমাজে পৌত্তলিকতার প্রচার ও প্রসার সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ।

আশ্বিন—পাতঞ্জল যোগসূত্র—পাতঞ্জল দর্শনের সূত্র ও তাহার বিশদ ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাটী অতি প্রাঞ্জল, আজকাল দর্শন শাস্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা বড় দেখা যায় না।

আশ্বিন—ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার—খৃষ্টীয় আদিম চার্চ ও Gnostic System সম্বন্ধীয় আলোচনা। লেখক প্রশ্ন করিতেছেন Roman Catholic মণ্ডলীর কিরূপে উৎপত্তি হইল?

কার্ত্তিক—হিন্দু বিবাহ—ঐ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ। প্রসঙ্গক্রমে লেখক বাল্যবিবাহের দোষগুণ আলোচনা করিয়াছেন।

কার্ত্তিক—পাতঞ্জল যোগসূত্র—আশ্বিনের প্রবন্ধের পূর্বানুবৃত্ত।

পৌষ—পাতঞ্জল যোগসূত্র—আশ্বিনের প্রবন্ধের পূর্বানুবৃত্ত।

পৌষ—ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম প্রচার—লেখক প্রবন্ধটীতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে Buddhism ও Gnostic System উভয়ই এক এবং খৃষ্টীয় ধর্ম প্রথমে বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রচারিত হইযাছিল।

পৌষ—পাতঞ্জল যোগসূত্র—আশ্বিনের প্রবন্ধের পূর্বানুবৃত্ত।

সাময়িক সংবাদ

মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকার বাংলা সংস্করণ—মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকার একটী বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইবার আয়োজন করা হইয়াছে। কলিকাতার শক্তিপ্রেস হইতে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইবে এবং আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় উক্ত পত্রিকার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

"রবীন্দ্র-রচনাবলী"র একাদশ খণ্ড—বিশ্বভারতী নিয়মিতরূপে "রবীন্দ্র-রচনাবলী" প্রকাশ ক'রে আসচেন। আষাঢ় মাসে একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা' লেকচারার—মৌলানা আজাদের নাম সুপারিশ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কমলা লেকচারার পদে নিয়োগ করার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় হইতেছে "মুসলিম ও ভারতীয় সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত, সমন্বয় ও সমুন্নতি"।

——o——

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা স্থাপনা, দ্রব্য, ভাব এই তিনের প্রথম গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব নাম, স্থাপনা, দ্রব্য, ভাব এই চারি পদার্থ অনুযোগ দ্বারা জীব, অজীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস বা নিক্ষেপ হইবে। উমাস্বাতি আচার্যের মতে "নামস্থাপনাদ্রব্যভাবতস্তন্ন্যাসঃ" এই পাঠ বিস্তৃতরূপে আছে। এই নাম প্রভৃতির অর্থ পরে সুস্পষ্ট ভাবে বলা যাইবে ॥৫॥

प्रमाणे द्वे ॥६॥

टीका। प्रमाण इति। प्रमेयप्रतीतौ प्रमाणप्रयोजनम्। यतः "मानाधीना मेयसिद्धिः"। सर्वत्रैव प्रमेयप्रमाणप्रमातारः पदार्थप्रतीतौ अपेक्षन्ते। एवमेव वात्स्यायनीये न्याय भाष्येचास्ति "प्रमाणतोऽर्थ प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम्" इति। सामर्थ्यमत्र योग्यता बोध्या। सूत्रेऽत्र द्वे इति निर्देशात् शास्त्रोक्तं प्रत्यक्षं परोक्षञ्चेति द्वावेव प्रमाणपदार्थौ मन्तव्यौ। प्रमीयते ज्ञेयस्वरूपावधारणं क्रियते येन तत्प्रमाणम्। तत् समानजातीयेभ्योऽनुकृष्यासमानजातीयेभ्योव्यावृत्त्य यत्तदेव ज्ञेयम्। उमास्वातिसूरीणां सभाष्ये ग्रन्थे दशमसूत्रं "तत्प्रमाणे" इत्थमस्ति। परन्त्वनेनाभिन्नार्थबोधकत्वमनयोः। केवलसंक्षेप विस्ताररूपेण कथनमिति। तत्र नवमसूत्रे यद्व "मतिश्रुतावधिमनःपर्य्यायकेवलानिज्ञान"मिति पञ्चविधं ज्ञानमुक्तम्। तत् पञ्चविधं ज्ञानं द्वयोःप्रमाणयोरन्तर्भूतमिति पश्चाद्व वक्ष्यते। एवञ्च सभाष्यसूत्रग्रन्थे प्रोक्तं "आद्ये परोक्षम्"। "प्रत्यक्षमन्यत्" (१-११-१२) इति। आद्ये मतिज्ञानश्रुतज्ञाने द्वे परोक्षे प्रमाणे भवतः। अन्यानि अवधि मनःपर्याय केवलानि त्रीणि प्रत्यक्षेऽन्तर्नीतानि। एवमनुमानोपमानागमार्थापत्तिसम्भवाभावैतिह्यानि प्रमाणानि सर्वाणि वाद्यन्तरस्वीकृतानि मतिश्रुतयोरन्तर्भूतानि। इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजन्यत्वादिति ॥६॥

সব্যাখ্যানুবাদ। প্রমাণ ভিন্ন প্রমেয় (পট, ঘট, মঠাদি) জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব সকল দার্শনিকই স্বীয় স্বীয় মতে দর্শনোক্ত বিষয় জ্ঞানের জন্য একাধিক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল চার্বাক, এক মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ বিষয়েও দার্শনিকগণের মত ভেদ আছে। সূত্রে দুই সংখ্যার উল্লেখ থাকাতে শাস্ত্রোক্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে প্রমাণের ভিন্নতা জানা যায়, সভাষ্য উমাস্বাতির দশম সূত্রে ও একাদশ সূত্রে মতি,

শ্রুত, অবধি, মন পর্যায়, কেবল, এই পঞ্চবিধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের মধ্যে পরিগণনীয়। অনুমান, উপমান প্রভৃতি জ্ঞানও মতি শ্রুতজ্ঞানের অন্তর্গত ॥৬॥

नयाः सप्त ॥७॥

टीका । नया इति । पूर्वं संक्षेपेण ज्ञानस्वरूप मुक्तं । विहिते च द्वे प्रमाणे । चारित्रं पश्चादवक्ष्यते । सम्प्रति नयान् व्याकुर्वन्ति । ते च यथा शास्त्रोक्ताः नैगमः संग्रहः व्यवहारः ऋजुसूत्रः शब्दः समभिरूढ़ः एवम्भूतश्चेति सप्त नयशब्द-वाच्या भवन्ति । सभाष्यसूत्रे उमास्वातिना "प्रमाणनयैरधिगमः" इति षष्ठसूत्रे उक्ताः । परं तेषां संख्याविभक्तानां पृथङ्नामोल्लेखश्च प्रथमाध्यायस्यान्ते चतुस्त्रिंशत् सूत्रेकृतः । तथाहि "नैगमसंग्रहव्यवहार ऋजुसूत्र शब्दाः नयाः" इति पञ्चधा भिन्ना उक्ताः । पश्चान्नैगमस्य द्विविधभेदः देशपरिक्षेऽपी सर्वपरिक्षेपीचेति । पुनः शब्दस्त्रिभेदः कथितः साम्प्रतः समभिरूढ़ः एम्भूतश्चेति । अत्र श्वेताम्बरीयाणां मते नयाः पञ्चविधाः । परमत्रसूत्रे "आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ" इत्यष्टविधाः प्रोक्ताः । अन्यद्भाष्ये प्रपञ्चितम् । दिगम्बरीयाणां मते सप्तविधा नया २तेषामागमप्रसिद्धा-इतीदृशे मतद्वैधेऽपि नमूलतत्त्वहानिरिति । तथा हि सांख्यभाष्ये प्रोक्तं "सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद्ग विदुषां किमशोभनमिति" ॥७॥

সব্যাখ্যানুবাদ। নয় পদার্থ সাত প্রকার। পূর্বে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও দুই প্রকার প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। চারিত্র সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। শাস্ত্রোক্ত নয় শব্দ দ্বারা নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র শব্দ, সমভিরূঢ, এবম্ভূত এই সাত প্রকার অবধারিত হইয়াছে। ভাষ্যকার উমাস্বাতি "প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ" তত্রত্য ষষ্ঠসূত্র দ্বারা সাধারণ ভাবে নিশ্চয় করিয়া প্রথম অধ্যায়ের শেষে নয় পদার্থের নাম উল্লেখ পূর্বক পূর্বোক্ত সূত্রের আশয় চতুস্ত্রিংশৎ (৩৪) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সভাষ্য গ্রন্থ হইতে এই সূত্র সন্দর্ভে ভিন্নরূপ আশয় বর্ণনা অষ্টম সূত্র দ্বারা করা হইয়াছে। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে নৈগম প্রভৃতি নয় আট প্রকার। শ্বেতাম্বরীয় জৈনাগমে সাত প্রকার প্রসিদ্ধ ॥৭॥

तैरधिगमस्तत्त्वानाम् ॥८॥

टीका । तैरिति । तैः पूर्वोक्त द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यां नयैश्च भुवने सवषां तत्त्वानां पदार्थानाम् । अधिगमः यथार्थज्ञानं भवति । "प्रमाणनयैरधिगमः"

इत्यत्र इत्थमेव सूत्रितः आचार्यैः। तत्त्वानामितिपदं सभाष्यसूत्रेणापि सन्निविष्टम्। तत्राधिकं तत्पदः दृश्यते। परमदं तत्त्वपदप्रदानेन अधिगम ज्ञानस्य निखिल-ज्ञेय पदार्थः सूचितः तत्र सभाष्य षष्ठसूत्रे एतत् पदं नास्ति। जीवाजीवा-स्रव-सम्बर-निर्जरबन्धमोक्षाणां सप्तपदार्थानां एवं नामस्थापन-द्रव्य-भावपदार्थानां च तत्त्वानां अधिगमः सम्यग् ज्ञानं स्यादिति ॥८॥

সব্যাখ্যানুবাদ। পূর্বের কথিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ এবং নৈগম, সংগ্রহ, ব্যবহার, ঋজুসূত্র, শব্দ এই পাঁচ প্রকার নয় দ্বারা জীব, অজীব, আস্রব বন্ধ, সম্বর, নির্জর, মোক্ষ ঈদৃশ সপ্তপদার্থরূপ তত্ত্ব সকলের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। নাম, স্থাপন, দ্রব্য, ভাব, এই চারি প্রকার অনুযোগ দ্বারাও জীব প্রভৃতি সপ্তপদার্থের ন্যাস বা নিক্ষেপ (স্পষ্টরূপে জ্ঞান) হয়। ভাষ্যের হিন্দী ভাষানুবাদে বিস্তৃতরূপে সকল বিষয় বর্ণিত আছে ॥ ৮ ॥

सदादिभिश्च ॥ ९ ॥

टीका। सदिति। सत् प्रभृति पदैः तत्त्वानां विशेष ज्ञानं भवति। अत्रादिपदेन संख्या-क्षेत्र-स्पर्शन-कालान्तर-भावाल्प बहुत्वादयोऽष्टौवोध्याः। मतान्तरे तु सप्त इति। अल्पबहुत्वयोरेकत्वस्वीकारात्। सत् पूर्व्वकं एभिरनु-योगैरष्ट संख्याका एते षटखण्डागमेषु सुप्रसिद्धा विस्तृतरूपेण वर्णिताश्च सन्ति। "सत्संख्याक्षेत्र स्पर्शने"त्यादिसूत्रे सभाष्ये यदुक्तं तदत्राभिन्नार्थकम्। अन्यदष्टम-सूत्रे उमास्वातिभाष्ये पुष्कलमस्ति। तत्र सूत्रोक्तं प्रतिपदं व्याख्यानञ्च विद्यते ॥ ९ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। সৎ প্রভৃতি দ্বারাও তত্ত্ব বিশেষের জ্ঞান হয়। এই সূত্রে 'আদি' শব্দ দ্বারা সংখ্যা, ক্ষেত্র, স্পর্শ, কালান্তর, ভাব, অল্প, বহুত্ব নামের সহযোগে অনুযোগ দ্বারা গ্রহণের নির্দেশ করা হইয়াছে। ষট্‌খণ্ডাগম প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকলের বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সূত্রের সহিত সভাষ্য উমাস্বতির "সৎসংখ্যাদি" আট্ সূত্রের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই ॥ ৯ ॥

मत्यादीनि ज्ञानानि * ॥ १० ॥

टीका। मतीति। अत्र ज्ञानस्य पञ्चविधत्वं प्रदर्श्यते। अस्मिन्नादि-

* "মত্যাদীনি (পঞ্চ) জ্ঞানানি" ঈদৃশঃ পাঠভেদোঽস্তি ॥

शब्देन श्रुतावधिमनःपर्य्याय-केवलानां चतुर्णां संग्रहोबोध्यः। तद्व यथा मतिज्ञानं श्रतज्ञानमवधि ज्ञानं मनः पर्य्यायज्ञानं केवलज्ञानमिति आगमशास्त्रानुसारेण पञ्च-विधान्येतानि ज्ञानानि। मत्यादीनि पञ्चज्ञानानीति सूत्रस्य पाठान्तरमप्यस्तीति। प्राचीन शास्त्रतः श्रुतादीनां चतुर्णां मतिज्ञानपूर्व्वकत्वं ज्ञेयम्। मतिज्ञानस्याव-ग्रहादयः श्रुतज्ञानस्यचाङ्गानङ्ग प्रविष्टादयः अवधिज्ञानस्य भवप्रत्ययादयः मनः-पर्य्यायस्य ऋजुमत्यादयः सन्ति। केवलज्ञानस्य तु न सन्त्येव। अन्यत् पश्चाद्व-वक्ष्यते ॥ १० ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মতি প্রভৃতি জ্ঞান পাঁচ প্রকার। সূত্রে আদি শব্দ দ্বারা শ্রুত জ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনপর্যায়জ্ঞান, এবং কেবলজ্ঞান এই চারিটি গ্রহণ করা হইয়াছে। যেহেতু সকল জ্ঞানই মতিপূর্বক হইয়া থাকে, ইহাই আগম শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে এইটি নবমসংখ্যক সূত্র ॥ ১০ ॥

क्षयोपशमहेतवः† ॥ ११ ॥

टीका। क्षयेति। मति प्रभृति ज्ञानानि क्षयोपशम-क्षयहेतुकानि भवन्ति। मति श्रुतावधि मनः पर्य्यायानि चत्वारि ज्ञानानि मतिज्ञानावरणादि कर्म्मणां क्षयोपशमतः स्युः। अतः क्षायोपशमिकत्वमिति तेषाम्। केवलज्ञानस्य आवरणादिघाति कर्म्म स्वभावात् क्षयादेव उत्पन्नत्वं स्यात्। अतः क्षायिक संज्ञा तस्य स्यात्। कर्म्म द्विविधं घातिकर्म्माघातिकर्म्म चेति। क्षयोपशम-विषयः पश्चाद्व वक्ष्यते। अत्र प्रागवदादि शब्दार्थः ज्ञेयः ॥ ११ ॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায় এই চারিটি জ্ঞান মতিজ্ঞানের আবরণাদি কর্মের প্রকৃতি হইতে ক্ষয়-উপশমরূপে প্রকাশিত হয়। এই হেতু তাহাদিগকে "ক্ষায়োপশমিক" সংজ্ঞায় শাস্ত্রে আখ্যাত। এবং কেবলজ্ঞান জ্ঞানাবরণাদি চারি প্রকার ঘাতি কর্ম প্রকৃতি হইতে ক্ষয় দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে "ক্ষায়িক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কর্ম দ্বিবিধ—ঘাতী ও অঘাতী। ঘাতি কর্ম চারি প্রকার, অঘাতী কর্ম চারি প্রকার, উভয় মিলিত হইয়া আট প্রকার ॥ ১১ ॥

---

† "ক্ষয়োপশম (ক্ষয়) হেতবঃ" ইথং পাঠান্তারমপি দৃশ্যতে।

শ্রীভারতী

চতুর্থ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ | ১২শ সংখ্যা

দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্. এ.

মরজগতে কত বস্তুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কত কার্যই আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু ঐ সকল বস্তু কোথা হইতে আসিল, ঐ সকল কার্যের কারণ কি, এই জগতের সহিত ঐ সকল বস্তুর কি সম্বন্ধ; আর সেই কারণের সহিত ঐ সকল কার্যের কিরূপ সম্পর্ক তাহা প্রায়ই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই কার্যকারণভাবের ভাবনায় মানুষ এপর্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছে তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ—সৃষ্টিতত্ত্ব ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কার্যকারণভাব বুঝিবার জন্য মানুষ এ পর্যন্ত যাহা কিছু ভাবিয়াছে যাহা কিছু বিচার করিতে পারিয়াছে সেই ভাবনার, সেই বিচারের সমষ্টিই "দর্শন"। যে কার্য ও কারণ লইয়াই মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; যাহার ভাবনা না ভাবিয়া মানুষ সমাজে উন্নতির পথে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারে না—যাহার তত্ত্বই মানবের সকল বিদ্যার মূলভিত্তি—সেই কার্য ও কারণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যাহা কিছু ধরিতে পারিয়াছে, যাহা কিছু মানুষের জ্ঞান-গরিমার সমুজ্জ্বল নিদর্শন—যাহা কিছু মানবের গৌরব করিবার—একমাত্র ধরিবার বস্তু, সেই ভাবনা—সেই তত্ত্ব—সেই বস্তুই দর্শন, তাহাই দর্শনশাস্ত্র—তাহাই সকল শাস্ত্রের অপরিহার্য অবলম্বন। যতদিন মানুষের শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানলাভ না হইতেছে ততদিন তাহার পক্ষে অভ্যুদয়বার্তাও সুদূরপরাহত। সুতরাং অভ্যুদয় কামনা করিলে, শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকিলে, শাস্ত্র অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। শাস্ত্রই দর্শন আর কার্যকারণভাব লইয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা। অতএব এই কার্যকারণতত্ত্বই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। কার্য কি, কারণ কি, কার্য ও কারণে কিরূপ সম্বন্ধ, ইহার বিচার করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান কাজ। এই কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার জন্যই ভারতে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত

দর্শনের উদ্ভব। এই ছয়টী দর্শনকে 'আস্তিক' দর্শন বলে। চার্বাক, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক ও জৈন ভেদে 'নাস্তিক' দর্শনও ছয়টী।

যাঁহারা বেদ মানেন না, যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই নাস্তিক। ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয় না। ঈশ্বর একটি নামমাত্র। কেহ কেহ ঈশ্বরকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন; কেহ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন; কেহ যজ্ঞপুরুষ বলিয়া জানেন; কেহ প্রমাণপুরুষ বলিয়া জানেন; আর কেহ বা আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; কাজেই ঈশ্বর বলিয়া কোনও বস্তু স্বীকার না করিলেও আস্তিক্যে বাধা পড়ে না; তবে, যদি কেহ বেদ না মানেন বা পরলোকে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছুতেই আস্তিক বলা যায় না—তিনি বাস্তবিকই নাস্তিক। এইজন্যই নাস্তিক দর্শনে কোথাও বেদ, কোথাও বা পরলোক, আর কোথাও বা দুইটিই অস্বীকৃত হইয়াছে, আর এইজন্যই ঐগুলি নাস্তিক দর্শন।

যে কার্য-কারণভাবের ভাবনারূপ এক অকম্প্য ভিত্তির উপর এই সকল দর্শনশাস্ত্র, এমন কি জগতের সমুদায় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝানের জন্য এদেশে যত প্রকার দার্শনিক মত প্রচারিত হইয়াছে তাহাই আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ বা ছিল না: সকল কারণ মিলিত হওয়ার পরক্ষণেই কার্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কার্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহারা পরস্পর অভিন্ন হইতে পারে না—এরূপ সিদ্ধান্তের নামই 'আরম্ভবাদ'। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চারি প্রকার পরমাণুই পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিয়াছে—ইহারাই দ্ব্যণুকাদিরূপে কার্য "আরম্ভ" করে—ইহারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সূত্র হইতে বস্ত্রের উদ্ভব। অবয়ব ও অবয়বী এক বস্তু নহে; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। সূত্র ও বস্ত্র এক বস্তু নহে। সূত্র বস্ত্রের উপাদান কারণ—ইহাই বস্ত্রের সহিত সূত্রের সম্বন্ধ। সংক্ষেপে ইহাই আরম্ভবাদের মূল তত্ত্ব। প্রধানতঃ ন্যায়দর্শনের বক্তা গোতম ও বৈশেষিকদর্শনের বক্তা কণাদ আরম্ভবাদী।

সাংখ্যদর্শনের বক্তা কপিল ও পাতঞ্জল দর্শনের বক্তা পতঞ্জলি প্রধানতঃ পরিণামবাদী। ইঁহাদের দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণামবাদই স্থান পাইয়াছে। ইঁহাদের মতে সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধানই জগতের কারণ। এই প্রধান বা প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমে জগৎ রূপে "পরিণত" হইয়াছে। ইঁহারা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন না। কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সূক্ষ্ম অবস্থায় কারণে বিদ্যমান থাকে, কারকব্যাপারে তাহা অভিব্যক্ত হয়—ইহাই তাঁহাদের মত। ইঁহারা কার্যের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব অঙ্গীকার করেন না। তৎপরিবর্তে আবির্ভাব ও তিরোভাবই বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে, কার্য ও কারণ ভিন্ন নহে, অভিন্ন। অনভিব্যক্ত বা তিরোহিত অবস্থায় কার্য কারণে বর্তমান ছিল, সম্প্রতি অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। যাহা 'অসৎ' তাহা কখনও 'সৎ' হইতে পারে না, আবার যাহা 'সৎ' তাহা কখনও 'অসৎ' হয় না। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব—ইহারই নাম 'পরিণামবাদ।'

বেদান্তের সকল মতের মধ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ'ই সর্বাপেক্ষা আদৃত এবং শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত। আচার্য শঙ্কর বিবর্তবাদী। জগৎ মায়িক, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহাই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টিতত্ত্ব; আর ইহাতেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রতিষ্ঠা। স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, নিজের মায়া অবলম্বন করিয়া মিথ্যা জগৎ রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মেও জগদ্ভ্রম হইয়া থাকে। রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ যেমন সর্প কল্পিত হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ মায়াবশতঃ ব্রহ্মেও জীবকর্তৃক জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে যেমন সর্পের বাস্তবিক সত্তা নাই, ঠিক তেমনি ব্রহ্মেও জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। জগতের সমস্তই মায়াপরিকল্পিত, সুতরাং উহা ব্রহ্মের "বিবর্ত"ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব। এইজন্যই ইহার নাম 'বিবর্তবাদ' বা 'মায়াবাদ'।

এইরূপে, ভারতীয় দার্শনিক মত পর্যালোচনা করিলে পূর্বোক্ত 'আরম্ভবাদ,' 'পরিণামবাদ' ও 'বিবর্তবাদ'ই যে ইহাদের মূলে অবস্থিত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সকল মতের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য দর্শনও ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও 'আরম্ভবাদ' (Theory of Atomic agglomeration), 'পরিণামবাদ' (Theory of Evolution) ও 'বিবর্তবাদ' (Theory of Illusion) স্থান পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের মূলে যে একরূপ পরিণামবাদ (Theory of Evolution) অবলম্বিত হইয়াছে, যাহা মহামতি ডারউইন সাহেবের (Dr. Darwin) নামে প্রচলিত তাহা ভারতীয় সাংখ্যাদি দর্শনে ব্যবস্থাপিত পরিণামবাদেরই রূপান্তর। সাংখ্যেরা দার্শনিক চিন্তায় সূক্ষ্মের দিকেই চলিয়া গিয়াছেন; আর ডারউইন সাহেব জড়ের দিকেই জোর দিয়াছেন। সাংখ্যেরা জগতের মূল কারণ প্রধান হইতে সৃষ্টির রহস্য বুঝাইয়া গিয়াছেন; আর ডারউইন সাহেব মূল উপাদানের তত্ত্ব না বলিয়া যুক্তির আশ্রয়ে ঐহিক স্থূল জড় বস্তুর স্বভাব বুঝাইবার জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা যে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তাকেও কতকটা প্রভাবিত করিয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Idealism বলিয়া যে মতবাদ আজকাল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা যে ভারতীয় বিবর্তবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য দেশ আজকাল গৌরব বোধ করিয়া থাকেন, সেই মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও প্রাচীন ভারতে যথেষ্টই হইয়াছিল। সাংখ্যদর্শনে এরূপভাবে বুদ্ধির ভেদ দেখান হইয়াছে যে, তাহাতে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। পাতঞ্জলদর্শনে পাঁচটী চিত্তভূমির বিবরণ একরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, তাহাতে মনোরাজ্যের আলোচনাই যে পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান কার্য, ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব ও মীমাংসাদর্শনের কর্মতত্ত্ব এক প্রয়োজনীয় বিষয়। এই জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের যেরূপ ধারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে মনোবিজ্ঞানের (Psychology) ও নীতি-বিজ্ঞানের

(Ethics) সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন ও নব্যন্যায়ে 'ব্যবসায়জ্ঞান' ও 'অনুব্যবসায়জ্ঞান' স্বীকার করিয়া ন্যায়াচার্যেরা জ্ঞান-তত্ত্বের যেরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা দর্শনশাস্ত্রে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। 'এই ঘট' (অয়ং ঘটঃ), এরূপ জ্ঞান 'ব্যবসায়জ্ঞান'। 'আমি ঘট জানিতেছি' (ঘটমহং জানামি), এরূপ জ্ঞান 'অনুব্যবসায়জ্ঞান'। ন্যায়াচার্যদের মতে জ্ঞান নিজে প্রকাশমান নহে, অন্য জ্ঞান দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতে জ্ঞানতত্ত্বের ভিতর দিয়া মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। কেবল তাত্ত্বিক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াই ভারতের দার্শনিকেরা স্ব স্ব কর্তব্য শেষ করিয়া যান নাই; তাঁহারা কার্যবিজ্ঞানেরও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়াদি দর্শনের 'কদম্বকোরকন্যায়' ও 'বীচিতরঙ্গন্যায়ে' শব্দের শ্রবণক্রিয়ার তত্ত্ব অধুনা পাশ্চাত্ত্য জড়বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদে জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষভাবেই পর্য্যালোচিত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রের আলোচনা ভারতে এরূপভাবেই হইয়াছিল যে, গঙ্গেশের নব্যন্যায় 'তত্ত্বচিন্তামণি'র মত অমূল্য গ্রন্থ জগতে আর একখানি রচিত হইতে পারে নাই। ঐ গ্রন্থের প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রত্যক্ষ, অনুমানখণ্ডে অনুমান, উপমানখণ্ডে উপমান ও শব্দখণ্ডে শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে বিচার করিয়া গঙ্গেশ এক অভিনব উপাদেয় ছাঁচে ন্যায়শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এজন্য তাঁহার 'তত্ত্বচিন্তামণি' নব্যন্যায় নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গেশ প্রমাণকাণ্ডের এরূপভাবে বিচার করিয়া গিয়াছেন ও এরূপ একটি নৈয়ায়িক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ ন্যায়দর্শনেরই পরিশিষ্ট হইলেও মৌলিক নূতন শাস্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহাব সম্মান না করিয়া পারা যায় না। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক দুইটি মতকে এক ছাঁচে ঢালিয়া তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও এগ্রন্থে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার আবিষ্কৃত নব্যন্যায একটি পৃথক্ শাস্ত্র রূপেই গণ্য হইয়াছে। সাংখ্যের পরিশিষ্ট হইলেও পাতঞ্জল দর্শন যেমন একটি পৃথক্ শাস্ত্র, সেইরূপ ন্যায়ের পরিশিষ্ট হইলেও গঙ্গেশের নব্যন্যায় একটি পৃথক্ শাস্ত্র। ইহাকে 'প্রমাণবিদ্যা'ও বলা যাইতে পারে। যদিও গঙ্গেশের পূর্বেই প্রশস্তপাদভাষ্য, সপ্ত-পদার্থী, লক্ষণাবলী, ন্যায়লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থেই নব্যন্যায়ের সূত্রপাত দেখা যায়, তথাপি 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থেই ইহার সর্বপ্রথম পূর্ণ বিকাশ। এইজন্য গঙ্গেশের নামেই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা নব্যন্যায়কেও ন্যায়দর্শনের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের মত কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

যে সৃষ্টিতত্ত্ব দার্শনিক গবেষণার মূল ভিত্তি, সেই সম্পর্কেও ভারত যে তিনটি মত আবিষ্কার করিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোনরূপ মত জগতে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

মহর্ষি দীর্ঘতমা অক্ষপাদ গোতমের তর্কবিদ্যা—ন্যায়দর্শন আরম্ভবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলিয়াছি, আরম্ভবাদে কার্য ও কারণ পরস্পর ভিন্ন। সূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া

বস্ত্র হয় বটে, কিন্তু ঐ সূত্রগুলিই বস্ত্র নহে। সূত্রগুলি বস্ত্রের কারণ ও বস্ত্র তাহার কার্য। সূত্রসমষ্টিই বস্ত্র হইতে পারে না; কেননা কার্য ও কারণ একই বস্তু হইলে, কার্যনির্মাণে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কার্য ও কারণ পরস্পর অভিন্ন হইলে, কারণের ন্যায় কার্যও পূর্বসিদ্ধ বলিয়া কার্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতে পারে না। বিশেষতঃ কার্য ও কারণ যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে কার্যের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, কারণের দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। মাটির দ্বারা জল আহরণ করা যায় না, কিন্তু ঘটের দ্বারা জল আহরণ করা যায়; বস্ত্রের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা যায় কিন্তু সূত্রের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা যায় না। সুতরাং কার্য ও কারণ এক বস্তু নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। উভয়ে এক বস্তু হইলে মাটি ও ঘটের কার্য, বস্ত্র ও সূত্রের কার্য একই রকমের হইত। এইরূপে আরম্ভবাদীরা কার্য ও কারণ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করেন। সৃষ্টির পূর্বে এমন কোন বস্তু ছিল না যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্টির বিষয় হইতে পারিত। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূল হইতে হইতে এত বড় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাণু এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে, তাহাকে প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; কাজেই সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষদৃশ্য কোনরূপ পদার্থই ছিল না, 'অসৎ' হইতেই 'সৎ'-এর সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চারি প্রকার পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্‌, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা, এই কয়প্রকার নিত্য বস্তু বর্তমান ছিল; কিন্তু ইহাদের কোনটিই প্রাকৃত চক্ষুর বিষয় হইতে পারে না। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে পার্থিব পরমাণু সকল পরস্পর মিলিত হয় ও ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে থাকে। এইরূপে অতিসূক্ষ্ম জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয় পরমাণু সকল মিলিত হইয়া যথাক্রমে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম জল, অগ্নি ও বায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে ঐ চারিপ্রকার পরমাণু সৃষ্টি "আরম্ভ" করে, আর তাহাতেই পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই ইহার নাম 'আরম্ভবাদ' বা 'পরমাণুবাদ'। এই আরম্ভবাদ বা পরমাণুবাদ এখন জগতে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে প্রচারিত। নব্য-নৈয়ায়িকেরা ও জড-বিজ্ঞানবিদ্‌রা এই মতের উপরই স্ব স্ব আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। অবশ্য জডবিজ্ঞানবিদ্‌রা পরিণামবাদের উপরও অনেক আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি জড়-বিজ্ঞানে আরম্ভবাদই বিশেষ আদৃত; কারণ, পরমাণুর ব্যাপার লইয়াই জডবিজ্ঞান ব্যস্ত; আর এই পরমাণু আরম্ভবাদেরই পদার্থ; সুতরাং আরম্ভবাদই জডবিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনীয় মত। পরমাণু সম্পর্কে উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে; কাজেই পরমাণুবাদ যে একটা কল্পনামাত্র নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। যদি কল্পনামাত্রই হইত, তাহা হইলে এতদিন এত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারিত না। এইজন্যই এই মতবাদটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। অধুনা জড়বিজ্ঞান ও নব্যন্যায়ের উন্নতিতে পরমাণুবাদের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কাজেই এই পরমাণুবাদ কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

একটী স্থূল কার্যকে ভাগ করিতে গেলে উহাকে ভাগ করিতে করিতে এমন একটা সূক্ষ্মতম ভাগে গিয়া পৌঁছিতে পারা যায় যে, তাহাকে আর ভাগ করা যায় না; সেই সূক্ষ্মতম ভাগের নামই পরমাণু। যাহা হইতে আর সূক্ষ্ম কিছুরই সম্ভব হয় না তাহাই ত পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য পদার্থ। ইহার আর অবয়ব নাই। যাহা সাবয়ব তাহা অনিত্য। সুতরাং নিরবয়ব পরমাণু নিত্য, ইহা নিশ্চিত। এই নিরবয়ব পরমাণুর মিলন কিরূপে সম্ভব, ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে। যদি পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণুর সূক্ষ্মতম অংশ আমাদের প্রাকৃত চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না এইমাত্র বলিয়া, পরমাণুরও অবয়ব অঙ্গীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে পরমাণুর অনন্ত অবয়বধারা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এইরূপে পরমাণুকেও অনিত্য সাবয়ব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে, কোথাও আর বিরাম হইতে পারে না, কিছুরই ব্যবস্থা করা যায় না; সংসারে সমস্তই অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, পরমাণুর অবয়বধারাও যদি কোথাও বিশ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে "ঐ বস্তুটি বড় আর এইটি ছোট", এরূপ ব্যবহার করা যায় না। ইহাতে সর্ববাদিসিদ্ধ অনুভব ও সত্যের অপলাপ করিতে হয়। একটী অতি বড় পর্বত ও একটি অতি ক্ষুদ্র সর্ষপ সমান হইয়া যায়।

অবয়বগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া যে বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে দুইটি অবয়ব মিলিত হইয়া বস্তুট উৎপন্ন হয়, সেই অবয়ব দুইটি কোন না কোন সময়ে বিভক্ত হইবেই হইবে, আর উহাদের বিভাগে কার্যদ্রব্যটিও বিনাশ পাইবে। ফলে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুময় এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও একদিন না একদিন অতি সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির বহির্ভূত পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে। সুতরাং সর্ষপ ও পর্বতের অবয়বধারা যদি অনন্ত হয়, তাহা হইলে 'সর্ষপটি ছোট আর পর্বতটি বড', এরূপ বলা যায় না; দুইটিই সমান হইয়া পড়ে। অতএব, সকল কার্যবস্তুর বিভাগ করিতে করিতে এমন একটা অংশে গিয়া পড়া যায়, যাহাকে নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তাহাও অনিত্য এবং সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে পর্বত ও সর্ষপ তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ায়, 'ঐটি ছোট আর এইটি বড়', এরূপ ব্যবহার চলে না। এইরূপে পরমাণু যে নিত্য ও নিরবয়ব, ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুময় স্থূলভূতগুলির উপাদান কারণ, অনন্ত নিত্য ও অদৃশ্য পরমাণু-পুঞ্জের সত্তা এইভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। ঈশ্বরেচ্ছায় ও জীবাদৃষ্টবশতঃ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ঐ পরমাণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করে, তাহাতে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম প্রপঞ্চ গড়িয়া উঠে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, যাহার কোনরূপ অবয়ব নাই, যাহা নিরবয়ব তেমন দুইটি পরমাণু কিরূপে মিলিত হইতে পারে? একটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত আর একটি নিরবয়ব পরমাণুর মিলন ত সম্পূর্ণই অসম্ভব; কারণ, 'সাবয়ববৃত্তি সংযোগ' সাবয়ব দ্রব্য দুইটিকেই অপেক্ষা করিয়া থাকে; নিরবয়ব দ্রব্য দুইটি পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না;

কাজেই পরমাণু নিরবয়ব হইলে সংযোগের অভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না, আর সাবয়ব হইলে মেরু ও সর্ষপের তুল্যপরিমাণত্ব ঘটে। এই দুইটি দোষের একটি ছাড়াইতে পারিলেও অপরটি ছাড়ান যায় না; সুতরাং আরম্ভবাদের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে, পরমাণুবাদ আর টিকিতে পারে না। কিন্তু, ইহার উত্তর অতি সহজ। আকাশ, কাল প্রভৃতি নিরবয়ব পদার্থের সহিত যেমন সাবয়ব বৃক্ষের সংযোগ সম্ভব, ঠিক সেইরূপ জীবের অদৃষ্টবশতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিরবয়ব পরমাণুর সংযোগ বা মিলন যুক্তিসিদ্ধই হয়; এই পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া অসঙ্গত নহে। তবে বিবর্তবাদীদের ন্যায় এই সংসার ও ইহার সৃষ্টিতত্ত্ব অনির্বচনীয়, ইহা মায়া ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, এরূপ বলিতে যাওয়া সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বটে।

যাহা আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু যাহার স্বরূপ বুঝাইতে পারি না, বুঝাইতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না, তাহা 'মায়া' ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তাহা বাস্তবিক অনির্বচনীয়। তাহা 'সৎ' ও নয়, 'অসৎ'-ও নয়, কিন্তু ভাব-রূপ; 'সৎ' ও 'অসৎ', এই দুই শব্দের দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, অতএব তাহা অনির্বচনীয়। যাহা আছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যাহার সত্যত্ব অপলাপ করা যায় না; কিন্তু যাহার স্বরূপ বুঝান সর্বথা অসম্ভব, তাহাই ত অনির্বচনীয়, তাহাই ত মায়া। একটি ঐন্দ্রজালিককে এক ঘণ্টার মধ্যে বীজ হইতে গাছ গড়িয়া তুলিতে দেখিলে যেমন তাহার এ কার্যকে ইন্দ্রজাল বা মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না—কারণ, আমি নিজেই তাহার ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অন্যকে বুঝান ত দূরের কথা—অথচ ঐ কার্যটিকে অসৎ বলিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায় না, কাজেই অনির্বচনীয়—মায়া বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ যে সংসারকে আমি 'সৎ' বলিয়া বুঝি, কিন্তু বিচারের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, তাহার তত্ত্ব যে অনির্বচনীয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহাই মায়া। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহাকে যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। এইরূপে বিবর্তবাদীরা সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

পরিণামবাদীরা 'জড়া প্রকৃতি' হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, এরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু যাহার মোটেই চৈতন্য নাই, তাহা নিজেই কি প্রকারে অপরের সুখ ও দুঃখ ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির ঠিক পূর্বেই তাহার প্রবৃত্তি হয় কেন? তৎপূর্বে ত প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সমানাবস্থায় থাকায় প্রকৃতি সৃষ্টি আরম্ভ করিতে পারে না। এইরূপে প্রকৃতির স্বভাবই যে সৃষ্টি করা তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ সৃষ্টি করাই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি সর্বদাই সৃষ্টি করিতে থাকিবে, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধানাবস্থা কখনও সম্ভবপর হইতে পারিবে না। কাজেই, পরিণাম-বাদে সৃষ্টিরহস্য বুঝিতে যাওয়া কঠিন। সুতরাং, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ—

এই তিনটিই যে পরিণামে অনির্বাচ্যবাদে গিয়া পর্যবসন্ন হইবে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব কার্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার শক্তি মানুষের নাই বলিলেই চলে।

এই তিনটি মতের কিরূপে ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, এস্থলে প্রসঙ্গতঃ, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে।

ন্যায়ের আরম্ভবাদ হইতে সাংখ্যের পরিণামবাদ কিরূপে আসিল?

কার্য যদি কারণের মধ্যে নাই থাকে, তবে কিরূপে অকস্মাৎ কার্যটীর **সত্তা** উপস্থিত হইল, ইহা বুঝা যায় না। কার্যের যদি কোনরূপ সত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে সে সত্তার একটা **কারণ** থাকা আবশ্যক হইবেই। হয়, ইহা কারণের মধ্যে কোন না-কোন আকারে ছিলই, অথবা ইহা কারণসামগ্রীর সমবধান বা মিলন বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম কল্প ন্যায়ে স্বীকৃত নহে; দ্বিতীয় কল্প স্বীকৃত। কিন্তু, ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্যটি সত্য না অসত্য? যদি অসত্য হয় তবে ইহাকে কিরূপে কারণসামগ্রী হইতে ভিন্ন বস্তু বলা যাইবে এবং কিরূপেই বা ইহা অকস্মাৎ আসিয়া পড়িল? যদি বল, কারণসামগ্রী-গুলিই সত্য, তবে কারণসামগ্রীর মিলনকে অসৎ বলা যাইবে কিরূপে? যদি কার্যের কোনরূপ সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে এ সত্তা ত পূর্বে ছিল না, কিন্তু কারণসমবধানবশে জন্মে; অতএব ইহা সম্পূর্ণ নূতন এবং কারণ হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ, যদি কারণসমবধানকে অসৎ বল, তবে ইহাকে আর সৎ বলা যায় না: ইহাকে একটা আভাসমাত্র—appearance—বলিতে হয়। যদি ইহাকে সৎ বল, তবে হয়, ইহা কারণ হইতে ভিন্ন হইবে, নয়, অভিন্ন হইবে। প্রথম কল্পে, সদ্বস্তুর বাহুল্য বাড়িয়া যাইবে; দ্বিতীয় কল্পে, স্বরূপতঃ কার্য ও কারণ অভিন্ন বা এক বস্তু রূপে গণ্য হইবে; কার্যের সত্তাকে কেবল আভাসমাত্র গণ্য করিতে হইবে। তবেই ন্যায়মতে কারণসমবধানটি সদ্বস্তু না হইয়া, কেবল আভাসরূপেই পরিগণিত হইবে; এবং ইহাকে কেবল আভাসরূপেই সৎ বলিতে হইবে; এবং এই আভাসের মধ্যে কেবল মূল কারণটিকেই সৎ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তবেই, কার্যটী **নূতন** রূপে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে উহার **কারণ** হইতে ভিন্ন করিয়া বুঝা যাইবে না।

আবার, যদিও নিত্য কারণদ্রব্য হইতে একটা সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর উদ্ভব স্বীকার করা যায়, তথাপি কার্য যখন কারণের মধ্যে নাই, তখন বালুকা হইতে তৈল কেন উদ্ভূত হইবে না? যদি কার্যবস্তুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বতঃ উৎপন্ন হয় এবং উহা কারণে শক্তিরূপে না থাকা মানা যায়, তবে তুল্যজাতীয় কারণ হইতে তুল্যজাতীয় কার্য হয়, একথা খাটে কৈ? কেননা, কারণের সঙ্গে ত কার্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। তবেই, বিশেষ বিশেষ কারণের সঙ্গে, উহার বিশেষ বিশেষ কার্যের সম্বন্ধ আছে মানিতেই হইবে। কার্য যদি কারণের মধ্যেই না থাকে, তবে কারণের সহিত সম্বন্ধে আসিবে কি প্রকারে? 'ন্যায়কন্দলী' যে বলিয়াছেন, "যাহা অনভিব্যক্ত এবং যাহা অর্থক্রিয়াসম্পাদনে অসমর্থ, তাহাকে ত অসৎ বলিতেই হইবে",

ইহা ঠিক নহে ; কেননা, উহা শক্তিরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে এবং উপযুক্ত অবস্থা পাইলেই কার্যরূপে দেখা দিবে। আর, যদি কারণের মধ্যে কার্যের সত্তা না মানিয়া লও, তবে কারণ কেন উহাকে উৎপন্ন করিবে ?

সাংখ্যের পরিণামবাদের মধ্যেই বিবর্তবাদকে পাওয়া যায়।

কার্য ও কারণের সত্তা দুইটা পৃথক্ বস্তু নহে। দুই-ই এক বস্তু। কারণেরই সত্তা কার্যে দেখা দেয় ; কেননা, কার্যটি কারণের রূপান্তর বা পরিবর্তিত অবস্থা মাত্র। কার্য একটা প্রতীতি—appearance or phenomenon—মাত্র নহে। উহাতে কারণেরই সত্তা নিহিত আছে। কারণটিই ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং উহাই কার্যরূপে পরিবর্তিত আকারে দেখা দেয়। ক্রমিক অবস্থাভেদের মধ্য দিয়া কারণটিই আপনাকে লইয়া যায়, যে পর্যন্ত না উহা চরম অবস্থায় বা চরম পরিণামে উপস্থিত হইতেছে। সাংখ্যের এই মীমাংসার মধ্যেই কিন্তু বিবর্তবাদের মূল নিহিত আছে।

সাংখ্যমতে কার্য সত্য ; কেননা, উহা কারণেরই ত পরিণতি। কিন্তু, পরিণতির অর্থ রূপান্তর বা আকারের ভেদ ব্যতীত আর কিছু নহে। স্বরূপ ঠিকই থাকে। কেননা, পরিণাম অর্থে যদি কারণের **সম্পূর্ণ** পরিণাম বলা যায়, তবে ত প্রত্যেক পরিণামকেই একটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয় ; যেহেতু, প্রতি পরিণামই ত পূর্ব পরিণাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদি আংশিক পরিণাম হয়, বল, তবে জিজ্ঞাস্য হইবে, এই অংশ কি কারণ হইতে স্বতন্ত্র, না কারণের সহিত অভিন্ন ? যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহা অসম্ভব। যদি অভিন্ন হয়, তবে সমগ্র কারণটাই পরিবর্তিত হইয়াছে ; সুতরাং কার্যকে কারণ হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। এই ভাবে পরিণামবাদকে ঠিক বুঝা যায় না। নূতন কিছু না থাকিলে, কার্যকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু বলিবে কিরূপে ? নূতন যখন নয়, তখন উহাতে কারণই নূতন আকারে দেখা দেয় বলিতে হইবে। কারণই সত্য, উহার কার্যাকারটি কেবল রূপভেদ মাত্র। উহাতে কারণের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ নিজ স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই পরিবর্তিত হয়। ইহা ত বিবর্তবাদ।

জৈনদর্শনে আত্মার স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ

শ্রীনাথমল টাটিয়া, এম্. এ.

জৈনদর্শনসম্মত আত্মার স্বরূপনির্ণয়ের পূর্বে তদভিমত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। আবার অস্তিত্বসাধক যুক্তি বলিবার পূর্বে অস্তিত্ববাধক যুক্তির খণ্ডনও করা উচিত। অতএব অস্তিত্ববাধক যুক্তি ও তাহার খণ্ডন এবং অস্তিত্বসাধক যুক্তি—এই বিষয়গুলির আলোচনায় সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হইব। তাহার পর আত্মার স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রযাস পাইব।

আত্মার অস্তিত্ববাধক যুক্তি ও তাহার খণ্ডন

অনাত্মবাদীরা বলেন—নাস্ত্যাত্মা অকারণত্বান্মণ্ডুকশিখণ্ডবৎ[১] —অর্থাৎ আত্মা নাই, যেহেতু তাহার কোন কারণ নাই—যেমন ভেকের কেশপাশ। বস্তু থাকিলে তাহার কারণ অবশ্য থাকিবে। আত্মার কোন কারণ নাই। অতএব আত্মা নাই।

শ্রীমদ্ভট্টাকলঙ্কদেব[২] এই অনুমানের খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—আত্মনিহ্নবো ন যুক্তঃ সাধনদোষদর্শনাৎ। হেতুরয়মসিদ্ধো বিরুদ্ধোঽনৈকান্তিকশ্চ[৩] —অর্থাৎ অনাত্মবাদীর উক্ত অনুমানের হেতুটী দোষদুষ্ট, যেহেতু উহা অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক।

কোনও হেতু যদি 'পক্ষে'[৪] না থাকে অর্থাৎ তাহার 'পক্ষ'সত্তা সন্দিগ্ধ হয় তবে সেই হেতুটী অসিদ্ধ। জৈন আগমে মিথ্যাদর্শন, অবিরতি ইত্যাদি নরকগতি, তির্যক্‌গতি প্রভৃতির কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। জৈনদর্শনের মতে নরকগতি নারকীজীবেরই একটী পর্যায়[৫] দ্রব্য ও পর্যায় কথঞ্চিৎ অভিন্ন। অতএব মিথ্যাদর্শন ও অবিরতি প্রভৃতিকে নারকীজীবরূপ দ্রব্যের কারণ বলিলে জৈনদর্শনবিরুদ্ধ কিছুই বলা হইবে না। সুতরাং কারণের অভাব থাকায় আত্মার অস্তিত্ব নাই—এইরূপ যে অনুমান করা হইয়াছে উহা অসঙ্গত ও অসিদ্ধ—যেহেতু অকারণত্বরূপ হেতুটী 'পক্ষ'ভূত আত্মায় নাই। অকারণত্বহেতুটী একটী পর্যায়। পর্যায় পর্যায়ান্তরে থাকে

---

১ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ° ৮৪ বা° ১৬

২ ইনি একজন প্রসিদ্ধ দিগম্বর জৈন দার্শনিক। ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে ইঁহার সময় ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ। ইঁহার রচিত অষ্টশতী, তত্ত্বার্থরাজবার্তিক, ন্যায়বিনিশ্চয, লঘীয়স্ত্রয়ী, বৃহত্রযী প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট দর্শন ও ন্যায বিষয়ক গ্রন্থ।

৩ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ ৮৪ বা° ১৬-১৭

৪ যে ধর্মীতে কোন ধর্মের অনুমান করা হয় তাহার নাম পক্ষ। যেমন 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ'—এস্থলে পর্বত 'পক্ষ'।

৫ ভাবান্তরং সংজ্ঞান্তরং চ পর্যায়ঃ (স্বোপজ্ঞভাষ্য—তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ৫।৩৭)। যেমন কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি সুবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়।

না, কেবল দ্রব্যেতেই থাকে। এদিকে অনাত্মবাদী আত্মা বলিয়া কোনও দ্রব্য স্বীকার করেন না। অতএব অকারণত্ব পর্যায়টী কোথায় থাকিবে?—এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। হেতুটীর কোনও আশ্রয় না থাকায় অনাত্মবাদীর নিজ যুক্তিতেই আশ্রয়াসিদ্ধিরূপ বাধা উপস্থিত হয়।

যে-হেতু সাধ্যধর্মের ব্যাঘাতক অর্থাৎ তাহার অভাবের সাধক সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস। জৈনদর্শনে—দ্রব্যার্থিক দৃষ্টি[১] ও পর্যায়ার্থিক দৃষ্টি[২] —এই দুই দৃষ্টিতে বস্তুতত্ত্ব বিচার করা হয়। দ্রব্যার্থিক দৃষ্টিতে দ্রব্যের অর্থাৎ বস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, কেবল নিত্য সদ্ভাব অর্থাৎ নিত্য সত্তা আছে। পর্যায়ার্থিক দৃষ্টিতে দ্রব্যের উৎপাদ (appearance) ব্যয় (disappearance) ও ধ্রুবত্ব (permanence) এই তিনটীই আছে।[৩] অতএব দ্রব্যার্থিক দৃষ্টিতে যথার্থ সৎপদার্থ মাত্রই অকারণ, যেহেতু উৎপৎস্যমান বস্তুর সত্তা কারণাপেক্ষী হইলেও নিত্য বিদ্যমান বস্তু কারণের অপেক্ষা রাখে না। অতএব অকারণত্বহেতুটী আত্মার নাস্তিত্বের সাধক না হইয়া তাহার অস্তিত্বেরই সাধক হওয়ায় বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হইল।

যে-হেতু সপক্ষ[৪] ও বিপক্ষ[৫] —এই দুইটীতেই থাকে তাহাকে অনৈকান্তিক বলে। এখানে অকারণত্বহেতুটীর দ্রব্যার্থিক দৃষ্টিতে বিপক্ষসত্তা পূর্বে সিদ্ধ করা হইয়াছে। মণ্ডূক-শিখণ্ডাদিরূপ[৬] সপক্ষেও তাহার সত্তা আছে, কারণ তাহারা অসৎপদার্থ বলিয়া তাহাদের কারণ থাকিতে পারে না। মণ্ডূকশিখণ্ডাদিরও কাল্পনিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। কারণ তাহা না করিলে তাহাদের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন করা অসম্ভব হইবে, যেহেতু সর্বথা বিষয়াভাব হইলে তাহার বিষয়ে কিছু বিধান বা নিষেধ করা সম্ভব নহে।

অনাত্মবাদীরা উক্ত অনুমানে যে 'মণ্ডূকশিখণ্ডবৎ'—এই দৃষ্টান্তটী দিয়াছেন তাহা সাধ্যসাধনোভয়ধর্মবিকল[৭] অর্থাৎ মণ্ডূকশিখণ্ড অস্তিত্বশূন্য ও অকারণ নহে। তাহার অস্তিত্ব ও কারণ উভয়ই আছে। ইহাতে অবশ্য আপাততঃ পূর্বাপর বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে কারণ মণ্ডূকশিখণ্ডের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয়ই স্বীকার করা হইল। কিন্তু পর্যায়ার্থিক দৃষ্টির কথা মনে

---

১ যখন গুণ বা পর্যায়গুলির অবজ্ঞা করিয়া কেবল দ্রব্যমাত্রকে লক্ষ্য করিয়া কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, তখন তাহা দ্রব্যার্থিক দৃষ্টিতে বলা হইল। পীতবর্ণ সুবর্ণের একটী 'গুণ', কটককুণ্ডলাদি সুবর্ণের 'পর্যায়'।

২ যখন দ্রব্যাংশকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল পর্যায়কে লক্ষ্য করিয়া কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তখন পর্যায়ার্থিক দৃষ্টিতে বলা হইল।

৩ শ্রীকুন্দকুন্দাচার্য (খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ?)—পঞ্চাস্তিকায়সময়সার—

উপ্পত্তীব বিণাসো দব্বস্স য ণত্থি অত্থি সব্ভাবো।
বয় উপ্পাদং ধুবত্তং করন্তি তস্সেব পজ্জায়াঃ॥ গা° ১১॥

৪ যে পদার্থ অনুমেয় ধর্মবিশিষ্ট বলিয়া নিশ্চিত তাহার নাম 'সপক্ষ'। যেমন—পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এস্থলে রন্ধনশালা 'সপক্ষ'। প্রকৃতস্থলে অসৎপদার্থমাত্র সপক্ষ।

৫ যে পদার্থ অনুমেয় ধর্মশূন্য বলিয়া নিশ্চিত, তাহার নাম বিপক্ষ। যেমন পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এস্থলে জলাদি 'বিপক্ষ'। প্রকৃতস্থলে সৎপদার্থমাত্র বিপক্ষ।

৬ পৃষ্ঠা ১ প্রবন্ধের অষ্টম পঙ্‌ক্তি দ্র°।

৭ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ ৮৪ বা° ১৭

রাখিলে কোনই বিরোধ থাকিবে না। মণ্ডূকশিখণ্ডের অস্তিত্ব ও সকারণত্ব পর্যায়ার্থিক দৃষ্টিতেই সাধিত হইবে। জৈনদর্শন জীবকে অনাদি ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করে। নানা কর্মবশে জীব নানা পর্যায় অর্থাৎ নারকী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করে। কোনও জন্মে যে-জীব মণ্ডূকপর্যায়ে ছিল, সেই জীবই আবার কর্মবশে সুন্দরী যুবতীর রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে এবং সেই যুবতী-গৃহীত আহারাদি হইতে অঙ্গাবয়ব পুষ্ট হওয়ায় শিখণ্ড বা কেশপাশ উদ্‌গত হয়। যে জীব একদিন মণ্ডূকরূপে বর্তমান ছিল সেই-জীবই অনিন্দ্য কেশপাশ শোভায় আর একদিন জন্মান্তরে অনবদ্য যুবতীর রূপ ধারণ করিল, অতএব এস্থলে বর্তমান শিখণ্ডের সহিত অতীত মণ্ডূকের একপ্রকার সম্বন্ধ কল্পনা করিলে কল্পনাটী একেবারে অসঙ্গত হইবে না। এইভাবে মণ্ডূক-শিখণ্ডের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। যুবতী-গৃহীত আহারাদিই এস্থলে মণ্ডূকশিখণ্ডের কারণরূপে কল্পিত হইতে পারে। অতএব মণ্ডূকশিখণ্ডের সকারণত্বও সিদ্ধ হইল। সুতরাং মণ্ডূকশিখণ্ডের যে-দৃষ্টান্ত উল্লেখে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকারে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে উহা সাধ্যসাধনরূপ উভয় ধর্মের অভাবে অসঙ্গত।

এই আলোচনাটী আপাততঃ যুক্তিসিদ্ধ প্রতীত না হইলেও ইহা যে জৈনদর্শনবিরোধী নহে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আকাশকুসুমের অস্তিত্ব এবং সকারণত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ মনোরঞ্জক কল্পনা জৈনদর্শনে পাওয়া যায়, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এখানে উহার চর্চা করিলাম না।

যাঁহারা বলেন—নাস্ত্যাত্মা, অপ্রত্যক্ষত্বাচ্ছশশৃঙ্গবৎ[১] —এই অনুমানের দ্বারা আত্মার নাস্তিত্ব সিদ্ধ হইল, তাঁহাদের খণ্ডন করিতে শ্রীমদ্ভট্টাকলঙ্কদেব বলিয়াছেন—অয়মপি ন হেতুঃ, অসিদ্ধবিরুদ্ধানৈকান্তিকতাঽপ্রচ্যুতেঃ[২] —অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষত্বও হেতু হইতে পারে না যেহেতু তাহাও অসিদ্ধ, বিরুদ্ধ ও অনৈকান্তিক।

সর্বকর্মবিনির্মুক্ত শুদ্ধ আত্মা কেবলজ্ঞানের প্রত্যক্ষ। বদ্ধ ও ঈষদ্বদ্ধ আত্মা অবধি-জ্ঞান ও মনঃপর্যায়জ্ঞানেরও[৩] প্রত্যক্ষ। অতএব অপ্রত্যক্ষত্বহেতুটী 'পক্ষ'ভূত আত্মায় না থাকায় অসিদ্ধ।

যদি—'অপ্রত্যক্ষ' —এই স্থলে পর্যুদাস[৪] স্বীকার করা হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন বলা

---

১ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ' ৮৫ প° ১

২ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ° ৮৫ প° ১-২

৩ জ্ঞান পাঁচ প্রকার - মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান। প্রথম দুইটী পরোক্ষ ও বাকীগুলি প্রত্যক্ষ। জৈনমতে ইন্দ্রিয়-সাহায্য ব্যতিরেকে যে-জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাকে পরোক্ষ জ্ঞান বলে। পরবর্তী জৈননৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে মুখ্য ও সাংব্যবহারিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে সাংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে যে-জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে মতিজ্ঞান বলে। শব্দনিমিত্তক জ্ঞান শ্রুত। এখানে শব্দ বলিতে জৈনদের আগমগুলিকে বুঝিতে হইবে। আত্মার দ্বারা সীমিত-জ্ঞানকে (limited knowledge) অবধিজ্ঞান বলে। যে-জ্ঞানের দ্বারা আত্মা ভৌতিক মনের অবস্থাগুলি জানিতে পারে তাহা মনঃপর্যায়। সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানকে কেবলজ্ঞান বলে।

৪ পর্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদে ন নঞ্‌। অভাব দুই প্রকার—অন্যোন্যাভাব বা ভেদ এবং প্রসজ্য

হয়, তবে স্পষ্টতঃ আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব হেতুটী সাধ্যাভাবসাধক হওয়ায় বিরুদ্ধ হইল। আর যদি প্রসজ্যপ্রতিষেধ[১] স্বীকার করা হয় তবে প্রতিষেধসিদ্ধিতে প্রতিষেধ্য পদার্থ আবশ্যক বলিয়া প্রতিষেধ্য আত্মা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মা স্বীকার করা চলে না। অতএব হেতুটী আশ্রয়াসিদ্ধ হইল।

অপ্রত্যক্ষ হেতুটী সপক্ষ শশশৃঙ্গাদিতে এবং বিপক্ষ বিজ্ঞানাদিতে থাকায় অনৈকান্তিক নামক হেত্বাভাস হইল। যথার্থ হেতু বলিয়া উহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। পূর্বোক্ত প্রকারে 'শশশৃঙ্গবৎ'—এই দৃষ্টান্তটীও সাধ্যসাধনোভয়ধর্মবিকল। অতএব আত্মার অস্তিত্ব-বাধক যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইল।

আত্মার অস্তিত্বসাধক যুক্তি

চক্ষুঃ, রসন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলি রূপ, রস প্রভৃতির গ্রাহক বলিয়া তাহাদের নাম গ্রহণ। বিষয়ের জ্ঞান ও তাহার অনুস্মরণ ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা সম্ভব নহে, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি অচেতন। বিজ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব হইলেও তাহা ক্ষণিক বলিয়া উহার দ্বারাও অনুস্মরণ সম্ভব নহে। অতএব জ্ঞান ও অনুস্মরণ—এই দুইটী ফলের উপপত্তির জন্য নিত্যচেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাই আত্মার অস্তিত্বসাধক যুক্তিরূপে শ্রীমদ্ভট্টাকলঙ্কদেব বলিয়াছেন—গ্রহণবিজ্ঞানাসম্ভবিফলদর্শনাদ্ গ্রহীতৃসিদ্ধিঃ[২]—অর্থাৎ গ্রহণ (ইন্দ্রিয়) ও বিজ্ঞান—এই দুইটীতে যে-ফলের উপপত্তি অসম্ভব সেই-ফলের উপপত্তির জন্য আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

এখানে বিজ্ঞানাদ্বৈতবাদী বৌদ্ধ শঙ্কা করিতে পারেন—"আমরা বিজ্ঞানসন্ততি স্বীকার করি। তাহার দ্বারাই বিষয়জ্ঞান ও তাহার অনুস্মরণের উপপত্তি হউক।" ইহার উত্তরে জৈন দার্শনিক বলিবেন—বিজ্ঞানসন্ততি পারমার্থিক না অপারমার্থিক? যদি অপারমার্থিক হয় তবে অপারমার্থিকতাই তাহার দোষ। আর যদি পারমার্থিক হয়, তবে তাহা স্থির না ক্ষণিক? যদি তাহা ক্ষণিক হয়, তবে কি প্রকারে ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞানের সাহায্যে অনুস্মরণ সম্ভব? অনুস্মরণ সম্ভব না হইলে অনুস্মরণফলের অনুপপত্তি তদবস্থই রহিল। আর যদি স্থির হয় তবে তাহা জৈনদর্শনসম্মত আত্মার নামান্তর মাত্র। এই কথাটী একটী সুন্দর শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যথা—

স্থিরমথ সন্তানমভ্যুপেয়াঃ প্রথয়ন্তং পরমার্থসৎস্বরূপম্।
অমৃতং পিব পূতয়ানয়োক্ত্যা স্থিরবপুষঃ পরলোকিনঃ প্রসিদ্ধেঃ ॥[৩]

প্রতিষেধ বা শুদ্ধ অভাব। ভেদ বা অন্যোন্যাভাবে যাহা হইবে তাহা ভিন্ন। নব্যন্যায়ের পরিভাষায় প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই সৎ হইবে।

১ প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্।

২ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ ৮৫ বা° ১৮

৩ রত্নাকরাবতারিকা—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার ৭.৫৫

আত্মার স্বরূপ

তত্ত্বার্থসূত্রকার উমাস্বাতি[১] বলিয়াছেন—উপযোগঃ লক্ষণম্[২]—অর্থাৎ উপযোগ[৩] (চৈতন্য) আত্মার লক্ষণ। এই উপযোগে—জ্ঞান ও দর্শন—এই উভয়েরও সমাবেশ করা হয়। দর্শনের দ্বারা বস্তুর সত্তামাত্র গৃহীত হয়। তাহার বিশিষ্ট গ্রহণ জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে। কাজেই জ্ঞান ও দর্শন পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব চেতনা, জ্ঞান ও দর্শন—এই তিনটীর দ্বারা অজীব হইতে জীবকে পৃথক্ করা হয়। এই তিনটী হইল জীবের গুণ। জীব নানা কর্ম্মবশে কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও দেবরূপে, কখনও তির্য্যক্‌রূপে, কখনও বা নারকী জীবরূপে অবস্থান করে। এইগুলি হইল জীবের পর্য্যায়। তাই শ্রীকুন্দকুন্দাচার্য[৪] 'পঞ্চাস্তিকায়সময়সারে' বলিয়াছেন —

ভাবা জীবাদীয়া জীবগুণা চেতনা য উবওোগো।
সুরণরণারয়তিরিয়া জীবস্‌স য পজ্জয়া বহুগা॥'[৫]

অর্থাৎ জীব, পুদ্‌গল প্রভৃতি পঞ্চ আস্তিকায়[৬] (spatial) দ্রব্য ভাবপদার্থ। তাহাদের পারমার্থিক সত্তা আছে। চেতনা ও উপযোগ জীবের গুণ। দেবত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জীবের পর্য্যায়। এখানে উপযোগ বলিতে জ্ঞান ও দর্শন বুঝিতে হইবে।

সৎপদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে তত্ত্বার্থসূত্রকার বলিয়াছেন—উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ[৭]—অর্থাৎ যাহার উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রবত্ব—এই তিনটীই বিদ্যমান আছে তাহা সৎ। গুণ ও পর্যায়—এই দুইটীর উৎপাদ ও ব্যয আছে কিন্তু দ্রব্যের উহা নাই। তবে দ্রব্য তাহার নিজের গুণ ও পর্যায় হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন বলিয়া দ্রব্যেরও কথঞ্চিৎ উৎপাদ ও ব্যয স্বীকার করিতে হয়, অতএব সৎপদার্থমাত্রেরই উৎপাদ, ব্যয় ও ধ্রৌব্য—এই তিনটীই স্বীকার করিতে হইবে। দ্রব্যার্থিক ও পর্য্যায়ার্থিক দৃষ্টির কথা পূর্বে বলিযাছি। দ্রব্যার্থিক দৃষ্টিতে জীবের উৎপত্তি

---

১ ইনি তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রকার। খ্রীস্টীয় প্রথমশতাব্দী ইঁহার আবির্ভাবকাল। ইঁহার উপলব্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। প্রশমরতিপ্রকরণ, জম্বুদ্বীপসমাসপ্রকরণ ও পূজাপ্রকরণ ইঁহারই রচিত।

২ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ২।৮

৩ উপযোগ দ্বিবিধ —সাকার ও অনাকার। জ্ঞান সাকারোপযোগ। দর্শন অনাকারোপযোগ। জ্ঞানোপযোগ অষ্টবিধ—মতিজ্ঞানোপযোগ, শ্রুতজ্ঞানোপযোগ, অবধিজ্ঞানোপযোগ, মনঃপর্যযজ্ঞানোপযোগ, কেবলজ্ঞানোপযোগ, মত্য-জ্ঞানোপযোগ শ্রুতাজ্ঞানোপযোগ ও বিভঙ্গজ্ঞানোপযোগ। দর্শনোপযোগ চারি প্রকার চক্ষুর্দর্শনোপযোগ, অচক্ষুর্দর্শ-নোপযোগ, অবধিদর্শনোপযোগ ও কেবলদর্শনোপযোগ (স্বোপজ্ঞভাষ্য তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ২।৯)।

৪ ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের জন্য পঞ্চাস্তিকায়সার—Bibliothica Jainica Seris Vol. III—Introdiction দ্রষ্টব্য।

৫ সংস্কৃত ছায়া—ভাবা জীবাদ্যা জীবগুণাশ্চেতনা চোপযোগঃ।
সুরনরনারকতির্যঞ্চো জীবস্য চ পর্যায়া বহবঃ॥ গাথা ১৬॥

৬ যাহা প্রদেশ অধিকার করিয়া থাকে তাহা অস্তিকায। জীব, ধর্ম, অধর্ম, আকাশ ও পুদ্‌গল—এই পাঁচটী অস্তিকায়। ধর্ম ও অধর্ম যথাক্রমে গতি (motion) ও স্থিতির (rest) উপকারক (condition)। পুদ্‌গল বলিতে জড়পদার্থমাত্রকে বুঝায়।

৭ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ৫।২৯

বা বিনাশ নাই। পর্য্যায়ার্থিক দৃষ্টিতে জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। শ্রীকুন্দকুন্দাচার্য্যও বলিয়াছেন—

মণূসত্তণেণ নঠ্ঠো দেহী দেবো হবেদি ইদরো বা।
উভয়ত্ত জীবভাবো ণ ণস্সদি ন জায়দে অণ্ণো ॥[১]

জৈনদর্শনাভিমত আত্মার ধর্মগুলি বলিতে শ্রীবাদিদেবসূরি[২] স্বরচিত 'প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন—চৈতন্যস্বরূপঃ, পরিণামী, কর্ত্তা, সাক্ষাদ্ভোক্তা, স্বদেহপরিমাণঃ, প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নঃ, পৌদ্গলিকাদৃষ্টবাংশ্চায়ম্[৩] — এখানে চৈতন্যশব্দের অর্থ উপযোগ। উপযোগের ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছি। প্রতিসময়ে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় গ্রহণ করাকে পরিণমন (evolution) বলে। পরিণমন ও পরিণাম সমানার্থক। আত্মার সর্বদা পরিণমন হইতেছে বলিয়া আত্মা পরিণামী। আত্মা অদৃষ্টাদির কর্ত্তা। সে সুখদুঃখাদি স্বয়ং ভোগ করে বলিয়া তাহাকে সাক্ষাদ্ভোক্তাও বলা হইয়াছে। আত্মা স্বদেহ-পরিমাণ অর্থাৎ স্বগৃহীতশরীরব্যাপক। জৈনদর্শনে আত্মা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ সে যে-সময়ে যে-দেহে থাকে সেই সময়ে সেই দেহপরিমাণ হইয়া থাকে। আত্মার এই হ্রাস ও বৃদ্ধির প্রতিপাদন করিতে তত্ত্বার্থসূত্রকার বলিয়াছেন—প্রদেশসংহারবিসর্গাভ্যাং প্রদীপবৎ[৪] —প্রকাশ্যমান স্থানের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রদীপালোকের যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় সেই প্রকার গৃহীত দেহের পরিমাণ অনুসারে আত্মার আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আত্মা প্রতি-শরীর ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্। আত্মা পৌদ্গলিকাদৃষ্টবান্ অর্থাৎ পুদ্গলঘটিতকর্মপরতন্ত্র। আত্মা সর্বদা সূক্ষ্মকর্মপুদ্গলে (Subtle Karmic matter) পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। সে যখন ক্রোধ মান প্রভৃতি কষায়[৫]যুক্ত অবস্থায় থাকে এবং তৎকালে মানসিক, বাচিক বা কায়িক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তখন সেই অতি-সূক্ষ্ম অদৃশ্য কর্মপুদ্গল চতুর্দিক হইতে তাহাতে প্রবেশ করে এবং তজ্জন্য বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষরূপ কর্মবন্ধ হয়। আত্মা এই কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে—আত্মার স্বরূপপ্রসঙ্গে যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বারা অন্য দর্শন-সম্মত আত্মার স্বরূপ হইতে জৈনদর্শনসম্মত আত্মার স্বরূপের ভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে। আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ ও পরিণামী বলায় নৈয়ায়িকসম্মত জড়স্বরূপ কূটস্থনিত্য আত্মার নিষেধ করা হইল। কর্তৃত্ব ও সাক্ষাদ্ভোক্তৃত্ব—এই দুইটী ধর্মের দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত

---

১ সংস্কৃত ছায়া—মনুষ্যত্বেন নষ্টো দেহী দেবো ভবতীতরো বা।
উভয়ত্র জীবভাবো ন নশ্যতি ন জায়তেঽন্যঃ ॥ পঞ্চাস্তিকায়সময়সার গাথা ১৭

২ ইঁহার সময় খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।

৩ অ. ৭ সূ. ৫৬

৪ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ৫।১৬

৫ ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ—এই রিপু চতুষ্টয়ের পারিভাষিক শব্দ কষায়।

করায় কপিলমতের তিরস্কার করা হইল। আত্মাকে স্বদেহপরিমাণ বলায় নৈয়ায়িক মতের সর্বব্যাপিত্ব নিষিদ্ধ হইল। প্রতি দেহে আত্মা পৃথক্ বা ভিন্ন এইরূপ নির্দেশ করায় আত্মাদ্বৈত-বাদকেও অনভিপ্রেত বলা হইল। আবার পৌদ্গলিক অদৃষ্ট স্বীকার করায় নাস্তিকাদি মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে। নৈয়ায়িক প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মতনিরাসের অনেক সারগর্ভ এবং সুদৃঢ় যুক্তি রত্নাকরাবতারিকা গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে[১]।

জীবের শ্রেণীবিভাগ (Classification)

জীব[২] দ্বিবিধ—সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব সর্বকর্মের ক্ষয় করিয়া মুক্ত হয়। জৈনদর্শন নিত্যমুক্ত জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যে জীব কর্মবন্ধনে বদ্ধ সে জীব সংসারী। সংসারী জীব ভব্য ও অভব্যভেদে দ্বিবিধ। 'সম্যগ্ দর্শনজ্ঞানচারিত্রপরিণামেন ভবিষ্যতীতি ভব্যঃ'[৩]—যাহার সম্যগ্‌দর্শন[৪], সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চারিত্র রূপ পরিণমন অবশ্যম্ভাবী সে ভব্য। বস্তুতঃ যে আত্মোন্নতির পথে আসিযাছে সে ভব্য। আর যে তাহার বিপরীত সে অভব্য।

সংসারী জীব দুই প্রকার—ত্রস (mobile) ও স্থাবর (immobile)। পৃথিবীকায়িক শুদ্ধপৃথিবীশর্করাবালুকাদি, অপ্‌কায়িক হিমাদি ও বনস্পতিকায়িক শৈবালাদি জীব স্থাবর। স্থাবর ব্যতিরিক্ত আর সকলেই ত্রস। উক্ত পৃথিবীকায়িক প্রভৃতি এবং তেজস্কায়িক অঙ্গারাদি ও বায়ুকায়িক উৎকলিকাদি—এরা সকলেই একেন্দ্রিয়। ইহাদের কেবল স্পর্শেনেন্দ্রিয়ই আছে। কৃমি, শঙ্খ, শুক্তিকা প্রভৃতির স্পর্শন ও রসন—এই দুইটী ইন্দ্রিয় আছে। পিপীলিকা প্রভৃতির স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ—এই তিনটী ইন্দ্রিয় আছে। ভ্রমর, মক্ষিকা, দংশ, মশক প্রভৃতির স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ ও চক্ষুঃ—এই চারিটী ইন্দ্রিয় আছে। অবশিষ্ট মৎস্য, ভুজঙ্গ, পক্ষী প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়। ইহারা সকলেই অমনস্ক অর্থাৎ ইহাদের "ঈহোপহযুক্তা গুণদোষবিচারণাত্মিকা সম্প্রধারণ-সংজ্ঞা" নাই। কিন্তু মনুষ্যের তাহা থাকায় মনুষ্য সমনস্ক। মনঃশব্দ এখানে পারিভাষিক—তাহার অর্থ সম্প্রধারণ-সংজ্ঞা।[৫]

আত্মার ক্রমবিকাশ

সংসারী জীবকে মুক্তির পথে কতকগুলি অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ভব্য জীবের ক্রমশঃ আত্মবিকাশ হয়। ক্রমিক আত্মবিকাশের পথে চতুর্দশ ক্রমবিকশিত আত্মার অবস্থা কল্পনা করা হইয়াছে। এই অবস্থাগুলির প্রত্যেকটীকে এক একটী গুণস্থান বলে। এই চতুর্দশটী গুণস্থানের নাম যথাক্রমে—মিথ্যাত্ব, সাসাদন, মিশ্র (সম্যক্ত্ব‌মিথ্যাত্ব), অবিরতসম্যক্ত্ব, দেশবিরত, প্রমত্তবিরত,

---

১ রত্নাকরাবতারিকা—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার ৭।৫৬, পৃ° ১৪৬—১৫৬

২ 'জীব' ও 'আত্মা' সমানার্থক। অতএব এই প্রবন্ধটীতে একটীর পরিবর্তে অপরটী নিঃসঙ্কোচভাবে লেখা হইয়াছে।

৩ তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ ৭৭ বা. ৭

৪ সম্যগ্‌দর্শনের অর্থ সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা

৫ স্বোপজ্ঞভাষ্য—তত্ত্বার্থসূত্র ২।২৫

অপ্রমত্তবিরত, অপূর্বকরণ, অনিবৃত্তকরণ, সূক্ষ্মসম্পরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগকেবলী ও অযোগকেবলী।

প্রথম গুণস্থানে অবস্থিত জীব অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। তাহার বস্তুতত্ত্বের কোন জ্ঞানই থাকে না। ক্রমে সেই জীব সম্যগ্‌দর্শনের একপ্রকার অস্পষ্ট আভাস পায়। এঅবস্থায় একপ্রকার বিচিত্র আস্বাদন পাওয়া যায় বলিয়া এই অবস্থার নাম 'সাসাদন' বা সাসাদন সম্যগ্‌দৃষ্টি। তৃতীয় গুণস্থানটী মিথ্যাত্ব ও সম্যগ্‌দৃষ্টির সন্ধিস্থল। চতুর্থ গুণস্থান হইতে বাস্তবিক বিকাশ আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় জীব সম্যগ্‌দৃষ্টি পাইলেও ব্রতপালনপর হয় না বলিয়া এই অবস্থার নাম অবিরত-সম্যক্ত্ব। পঞ্চমগুণস্থানবর্তী জীব অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি ব্রতগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পালন না করিয়া আংশিকভাবে পালন করে বলিয়া সেই অবস্থার নাম দেশবিরত গুণস্থান। ষষ্ঠগুণস্থানে জীব ব্রতগুলিকে ভালভাবে পালন করে কিন্তু তাহার প্রমাদ থাকে বলিয়া সেই অবস্থাটীর নাম প্রমত্তবিরত। সপ্তম গুণস্থানবর্তী জীব অপ্রমত্ত ও ব্রতপর।[১]

এই অবস্থা হইতে উদ্ধগমনের দুইটী পথ—ক্ষপকশ্রেণি ও উপশমশ্রেণি। ক্ষপকশ্রেণির জীব কর্মের ক্ষয় করিতে করিতে ক্ষীণমোহ (with delusions totally destroyed) নামক দ্বাদশ গুণস্থানে উপস্থিত হয়। ক্ষীণমোহ গুণস্থানে পৌছিতে পারিলে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। আর যদি সপ্তম গুণস্থান হইতে আত্মা দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করে অর্থাৎ যদি সে পূর্বকৃত কর্মগুলির ক্ষয় না করিয়া উপশম (suppression) করিতে করিতে অগ্রসর হয় তবে সে উপশান্তমোহ নামক একাদশ গুণস্থানে পৌছায়। এই গুণস্থানটী বিপজ্জনক। এখান হইতে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব শ্রেয়স্কাম জীবের ক্ষপকশ্রেণি গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর। অষ্টম গুণস্থানবর্তী আত্মার একটী অপূর্ব শক্তি জন্মায়। এই অবস্থায় জীব শুক্লধ্যানের অধিকারী হয়। উপশমকশ্রেণি ও ক্ষপকশ্রেণি—এই উভয় শ্রেণিরই জীবকে এই অবস্থার মধ্য দিয়া উর্ধ্বগমন করিতে হয়। নবম গুণস্থানটির অপর নাম বাদরসম্পরায়। বাদরসম্পরায় অর্থাৎ স্থূল কষায়বৃত্তিগুলির দমন করিতে জীব প্রযত্নশীল থাকে বলিয়া এই গুণস্থানটীর নাম বাদরসম্পরায়। সূক্ষ্মসম্পরায়ের অর্থ এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। একাদশ ও দ্বাদশ গুণস্থানের কথা পূর্বে বলিয়াছি। ত্রয়োদশ গুণস্থানে যোগ

---

১ এই সাতটী গুণস্থানের নামগুলিকে একটু সযত্ন হইয়া লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র—এই তিনটীর ক্রমবিকাশের সহিত জীব মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাদের কোন একটীর বিকাশ রুদ্ধ হইলে জীবের উন্নতি রুদ্ধ হইবে। জ্ঞান ও চারিত্রের পরস্পরোপকারিত্ব প্রতিপাদন করিতে শ্রীমদ্ভট্টাকলঙ্কদেব দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

হতং জ্ঞানং ক্রিয়াহীনং হতা চাজ্ঞানিনাং ক্রিয়া।
ধাবন্ কিলান্ধকো দগ্ধঃ পশ্যন্নপি চ পঙ্গুলঃ॥
সংযোগমেবেহ বদন্তি তজ্জ্ঞা ন হ্যেকচক্রেণ রথো প্রযাতি।
অন্ধশ্চ পঙ্গুশ্চ বনে প্রবিষ্টৌ তো সম্প্রযুক্তৌ নগরং প্রবিষ্টৌ॥ (তত্ত্বার্থরাজবার্তিক পৃ° ১০)

ও কষায়—এই দুইটী বন্ধহেতুর মধ্যে কেবল যোগ (মানসিক, বাচিক ও কায়িক ক্রিয়া) থাকে বলিয়া কর্মবন্ধ হয় না। এই অবস্থাটীকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় জীব কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। অন্তিম অর্থাৎ চতুর্দশ গুণস্থানে আত্মায় কোন যোগ অর্থাৎ ত্রিবিধ ক্রিয়া থাকে না। এই অবস্থাই চরম অবস্থা। ইহাই মুক্তি। তত্ত্বার্থাধিগম-সূত্রকার বলিয়াছেন—কৃৎস্নকর্মক্ষয়ো মোক্ষঃ[১]—তখন আত্মা—

কম্মমলবিপ্পমুক্কো উঢ্ঢং লোগস্স অন্তমধিগন্তা।
সো সব্বণাণদবসী লহদি সুহমণিন্দিয়মণন্তম্‌॥[২]

(অর্থাৎ) কর্মমলবিপ্রমুক্ত হইয়া উর্দ্ধদিকে লোকাকাশের[৩] অন্ত পর্যন্ত গমন করে। তখন সেই সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী আত্মা অনন্ত অনিন্দ্রিয় সুখ (ও বীর্য) লাভ করে।

---

১ তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র ১০।৩

২ ছায়া—কর্মমলবিপ্রমুক্ত উর্দ্ধং লোকস্যান্তমধিগম্য।
স সর্বজ্ঞানদর্শী লভতে সুখমনিন্দ্রিয়মনন্তম্‌॥ পঞ্চাস্তিকায়সময়সার গাথা ২৮॥

৩ জৈনদর্শনে—জীবাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায় ও পুদ্গলাস্তিকায়—এই পাঁচটী অস্তিকায় স্বীকার করা হয়। তন্মধ্যে আকাশাস্তিকায় দ্বিবিধ লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। অনন্ত আকাশের যে অংশটুকুতে চরাচর পদার্থ থাকে তাহা লোকাকাশ। তদ্ভিন্ন সমস্ত অলোকাকাশ। অলোকাকাশ একেবারে শূন্য। অতএব তাহাতে গতির সহায়ক ধর্মাস্তিকায় না থাকায় অলোকাকাশে আত্মার গতি নাই। কাজেই সিদ্ধ আত্মা লোকাকাশের অন্তে বিরাজ করে।

শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কালনিরূপণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ, বি. এ.

(১০) আড়ংঘাট অঞ্চলের স্থাপয়িতা শ্রীগঙ্গারাম দেব ১১৬০ সালে আড়ংঘাটে আসিয়াছিলেন। বর্তমান মহন্ত শ্রীসনৎকুমার শরণদেব ১৩৪৭ সালে মহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই গুরুপরম্পরা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে শ্রীগঙ্গারাম দেব হইতে বর্তমান মহন্ত ৯ পুরুষ অন্তর। এই ৯ পুরুষে ১০ জন মহন্ত ছিলেন। এই ৯ পুরুষে ১৮৭ বৎসর হয়; সুতরাং গড়পড়তা প্রায় ২১ বৎসর।

(১১) ১১৬০ সালের চেতুয়া বৈকুণ্ঠপুর অঞ্চলের স্থাপয়িতা শ্রীগোপাল দেব হইতে বর্তমান মহন্ত শ্রীবলদেব শরণ ৯ পুরুষ অন্তর। শ্রীবলদেব শরণ দেব ১৩৩২ সালে মহন্তপদ প্রাপ্ত হন। এই ৯ পুরুষে ১৭২ বৎসর। সুতরাং গড়পড়তা ১৯ বৎসর।

(১২) শ্রীসন্তদাসজী মহারাজের গুরুদেব শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা দেহরক্ষা করেন ১৯০৯ খ্রী° অ°। শ্রীদেবাচার্যের জন্ম ১০৫৫ খ্রী° অ°। তাঁহার ৩৮ পুরুষ নিম্নে শ্রীরামদাসজী কাঠিয়া বাবা। এই ৩৮ পুরুষে ৮৫৪ বৎসর হয়; সুতরাং প্রতিপুরুষে গড়পড়তা ২২ বৎসর।

উপরিলিখিত বারটি দৃষ্টান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই যে যথাক্রমে গড়পড়তা আয়ু ১৯।২৬।২৮।৩০।২০।২৩।৪০।৩৫।৩৪।২১।১৯।২২, মোটের উপর গড়পড়তা প্রায় ২৭ বৎসর। অতএব নিম্বার্কীয় গুরুপরম্পরায় গড়পড়তা জীবিত কাল ২৭ বৎসর।

শ্রীনিম্বার্কাচার্য হইতে শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ ৫২ পুরুষ অন্তর। প্রতি পুরুষে ২৭ বৎসর ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে ৫২ পুরুষে ১৪০৪ বৎসর হয়। শ্রীসন্তদাসজী মহারাজ দেহরক্ষা করেন ১৯৩৫ খ্রী° অ°। ১৯৩৫ হইতে ১৪০৪ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫৩১। সুতরাং শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব কাল অন্তত: ৫৩১ খ্রী° অ° বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না।

আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার অনুকূলে দুইটি যুক্তি পাওয়া যাইতেছে—

(১) "বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে" দেখা যায়, "নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতি কাল পঞ্চম শতাব্দী।" এই শতাব্দী খ্রী° শতাব্দী না হইয়া "বিক্রম" শতাব্দী বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। কারণ, সেই সময়ে দেশে বিক্রমাব্দই প্রচলিত ছিল। খ্রী° প্রথম শতাব্দী আরম্ভ হইবার ৫৭ বৎসব পূর্বে বিক্রম শতাব্দী আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং (৫৩১-৫৭) ৪৭৪ (অর্থাৎ পঞ্চম) বিক্রম শতাব্দীতে শ্রীনিম্বাকাচার্যের আবির্ভাব।

(২) হরিভদ্রসূরী,—ইনি ছিলেন জৈন, জাতিতে ব্রাহ্মণ। চিত্রকূট পর্বতের নিকট চিত্তৌভানগরে জিতারি নামক রাজার পুরোহিত ছিলেন। ইনি 'চৈত্যবন্দনবৃত্তি' 'অনেকান্ত জয়পতাকা,' 'ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ষড়্‌দর্শন-সমুচ্চয়ে হরিভদ্রসূরী বেদান্তদর্শন বা উত্তর মীমাংসার নাম করেন নাই।

"বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা।
জৈমিনীয়ং চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো॥"

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে সেই সময়ে বেদান্তসূত্র রচিত হয় নাই, কিম্বা তাহার আলোচনা, অধ্যয়ন বা অধ্যাপন অকালে রহিত হইয়া গিয়াছিল। আমরা পুরুষোত্তমাচার্যের 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা' হইতে জানিতে পারি যে, কলিকালে একসময় বেদান্ত-চর্চা রহিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব হয় এবং তিনি বেদান্তের পুনরুদ্ধার করেন। ন্যায়ের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে অথবা সাংখ্যকারিকায় বেদান্তের মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস দেখা যায় না। ইহাতেও মনে হয় যে এক সময়ে বেদান্তের চর্চা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, হরিভদ্র-সুরীর কালসম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ইনি খ্রী° পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য নিম্বার্কের পরবর্তী এবং নিম্বার্কই সর্বপ্রথম বেদান্ত-চর্চার পুনরুদ্ধার করেন।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের কাল সম্বন্ধে সম্প্রতি বাংলা ভাষায় যে সকল আলোচনা প্রবন্ধাকারে মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে,[১] তন্মধ্যে "শ্রীসুদর্শন" এবং "শিবম্" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (M. A. B. L., Advocate) মহাশয় যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য শ্রীশঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী। সতীন্দ্রবাবু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, চতুঃসম্প্রদায়ের আচার্যগণের মধ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যই প্রাচীনতম। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই কথা বলিয়াছেন।

হেষ্টিংস্ সাহেব-সম্পাদিত "Encyclopaedia of Religion & Ethics" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে "ভক্তিমার্গ" নামক প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ গ্রিয়ারসন্ সাহেব চতুঃসম্প্রদায়ের পরিচয় প্রদান কালে লিখিয়াছেন যে, নিম্বার্ক অথবা নিম্বাদিত্য-প্রবর্তিত সনকাদি সম্প্রদায় ভাগবত সম্প্রদায়-সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম—"The Sanakadi Sampradaya founded by Nimbarka or Nimbaditya is certainly the oldest of the Bhagbat Churches", (vol II. p. 545) সুপ্রসিদ্ধ মনীষী মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেবও তাঁহার প্রণীত "Hinduism" নামক গ্রন্থের (১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ) ১৩৮ পৃষ্ঠায় নিম্বার্কসম্প্রদায়কে চতুঃসম্প্রদায়ের মধ্যে "First in chronological order" বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"It should be noted here that the Poet Jaydeva who is thought to have lived in the I2th century may be said to have followed Nimbarka in pursuing the doctrine of devolution to Krishna by his celebrated poem Gitagovinda"[২]

স্যর্ ভাণ্ডারকার মহোদয় ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার

---

১ "ভারতের সাধনা" (১৩৪০ আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ দ্র°। বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক "শ্রীসুদর্শন" পত্রিকা (১৩৪৫ বৈশাখ ও মাঘ সংখ্যা দ্র°) এবং "শিবম্" (১৩৪৫) পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

২ "শ্রীসুদর্শন" ১৩৪৫ সন, বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় লিখিত "শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য" নামক প্রবন্ধ হইতে ইহা উদ্ধৃত।

প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পূর্বে মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ "Hinduism" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং নিম্বার্ক সম্প্রদায়কে চতুঃসম্প্রদায়ের মধ্যে "First chronological order" বলিয়া লিখিয়াছেন। শুর্‌ ভাণ্ডারকার কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন দেখা যায় না।

নিম্বার্কসম্প্রদায়ের দুইটি গুরুপরম্পরা তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটিতে তিনি শ্রীনিম্বার্কাচার্য হইতে ৩৭জন আচার্যের নাম পাইয়াছেন, এবং দ্বিতীয়টিতে ৪৫ জন আচার্যের নাম পাইয়াছেন। ৩২ সংখ্যক "শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য" পর্যন্ত উভয় তালিকায় এক প্রকার দৃষ্ট হয়। আমরা অনেক গুরুপরম্পরায় দেখিতে পাই যে ৩২ সংখ্যক শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্য গুরুপরম্পরাগুলির মধ্যে কোনও ভেদ নাই। প্রাচীন কাল হইতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা যে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে, ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। প্রাচীন কাল হইতে ভরতপুরের ভাট কর্তৃক নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকার মহোদয় দক্ষিণ ভারতের মাত্র একটি গুরুপরম্পরা অবলম্বনে শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তী বলিয়া গোস্বামী দামোদরের নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্ত দামোদর গোস্বামী ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের সময় হইতে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রচারকার্য বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরা "হরিব্যাসী" সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁহার ১২ জন প্রধান শিষ্যের নামানুসারে পরবর্তীকালে বারটি "দ্বারা" (শাখা) চলিয়া আসিতেছে এবং এইজন্যই হরিব্যাস দেবাচার্যের পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক গুরুপরম্পরা। কিন্তু বারটী শাখার প্রবর্তক হরি-ব্যাসের শিষ্যগণের মধ্যে দামোদর গোস্বামী নামে কেহ কোন শাখার প্রবর্তক ছিলেন না।

শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের গুরু শ্রীভট্টদেবাচার্য ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে "শ্রীযুগলশত" রচনা করেন। ব্রজমণ্ডলের মথুরা নগরীতে সংবৎ ১৩২০ অব্দে (খ্রী° অ° ১২৬৩) শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের জন্ম হয়। সুতরাং তাঁহার দামোদর গোস্বামী নামে কোন সাক্ষাৎ শিষ্য ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব। শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের শিষ্য শ্রীপরশুরাম দেবাচার্যকৃত "পরশুরাম-সাগর" ব্রজভাষার অমূল্য রত্ন। ইহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর নিকটবর্তী। সুতরাং শ্রীহরিব্যাস দেবাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তী কোনও শিষ্যের জীবিতকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের মতে শুর্‌ ভাণ্ডারকার মহোদয়ের প্রাপ্ত এই গুরুপরম্পরার কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নাই।

আমরা দেখাইয়াছি যে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব অন্ততঃ ৫৩১ খ্রীস্টাব্দ। এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে ৫০ কি ৬০ বৎসর বয়সে শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, খ্রী° ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ নিম্বার্ক ভাষ্যরচনার কাল।

সম্পূর্ণ

সামান্য ও বিশেষ

(সাংখ্যীয় দৃষ্টি)

শ্রীপূর্ণব্রহ্ম সাংখ্যশ্রমী

সামান্য ও বিশেষ এই দুই পদ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাষায় সামান্য শব্দ তুচ্ছ, সাধারণ, অপ্রবল, গৌণ ইত্যাদি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর বিশেষ শব্দ সেইরূপ তদ্বিপরীত অর্থে অর্থাৎ অতুচ্ছ, অসাধারণ, প্রবল, মুখ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। "সামান্যানি ত্বতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্ত্তন্তে"—যোগভাষ্যোদ্ধৃত এই পাঞ্চশিখ সূত্রে সামান্য শব্দ গৌণ বা অপ্রবল অর্থে এবং অতিশয়ের, প্রবলের বা মুখ্যের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ ঐ প্রকার অর্থ মূল করিয়া দর্শনশাস্ত্রে সামান্য ও বিশেষ শব্দ যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা এই নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সামান্য ও বিশেষ বিরুদ্ধার্থক পদ। সামান্য অর্থে জাতি, বিশেষ অর্থে ব্যক্তি। সামান্য অনেকসমবেত এরূপ অর্থের দ্যোতক পদ, আর বিশেষ একনিষ্ঠ পদ।

এ বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে যথাবশ্যক জ্ঞানের স্বরূপ ও ভেদ বুঝিতে হইবে। সর্বপ্রকার জানার নাম জ্ঞান। জ্ঞান প্রধানতঃ দুই প্রকার—শব্দার্থজনিত জ্ঞান ও সাক্ষাৎ জ্ঞান। শব্দ বা পদসকল কোন এক অর্থে আমরা সঙ্কেত করিয়া থাকি। তদ্দ্বারা সঙ্কেতজ্ঞ ব্যক্তির শব্দার্থ বা পদার্থজ্ঞান হয়। ক্রিয়া ও কারক-পদযুক্ত ভাষার নাম বাক্য। অন্য কথায়, উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয় (Predicate) রূপে বিন্যস্ত পদসকলের নাম বাক্য। কোন একটীমাত্র পদেও বাক্যবৃত্তি থাকে। যেমন, দেখিতেছি=আমি দৃশ্যকে দেখিতেছি। পদার্থ (পদের অর্থ) হইতে আমাদের যে জ্ঞান হয় তাহাকে পদার্থবিজ্ঞান (Conception) বা পদজ বিজ্ঞান বা পদানুপাতী বিজ্ঞান (শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ—যোগসূত্র ১।৯ অনুপাতী অর্থাৎ পদশ্রবণ করিয়া তৎপরে তাহা হইতে তৎসম্বন্ধে যাহা বুঝা যায় তাহা) বলে। (আধুনিক ভাষায় পদার্থবিজ্ঞান বলিলে অনেক গোল হইবে। তাই আমরা 'পদজবিজ্ঞান' ব্যবহার করিলাম।) বিজ্ঞান শব্দের প্রাচীন অর্থ উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাংখ্য, বৌদ্ধ ও উপনিষদ্ এই সমস্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় বিজ্ঞানশব্দ (চিত্ত এবং চিত্তবৃত্তিও বিজ্ঞানের নামান্তর। যথা—বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানস্কন্ধকে চিত্ত বলেন। "চিত্তং চেতসিকং রূপম"; ইহার মধ্যে চিত্ত বিজ্ঞানস্কন্ধ, চেতসিক সংজ্ঞা, বেদনা ও সংস্কারস্কন্ধ। "শ্রুতমাগমবিজ্ঞানম্"—যোগভাষ্য। সেইরূপ ইহা এবং প্রত্যক্ষবিজ্ঞানও প্রমাণরূপ চিত্তবৃত্তির অন্তর্গত।) অনেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানসাধন শক্তির যে মিলিত জ্ঞান তাহাই বুঝায়। যেমন, বৃক্ষ পদ। এই পদের বিজ্ঞান এইরূপে হয়—বৃক্ষ দেখিলে বৃক্ষের রূপজ্ঞান হয়, ছুঁইলে স্পর্শজ্ঞান হয়, ঠুকিলে শব্দজ্ঞান ও কাঠিন্যাদির জ্ঞান হয়। বৃক্ষ পদের বা নামের দ্বারা ঐ সকল সঙ্কেত করিয়া আমরা স্মরণ রাখি, পরে বৃক্ষ শব্দ

শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলে চক্ষুঃ কর্ণাদি সমস্ত করণশক্তির যে চৈতসিক মিলিত জ্ঞান (Conception) হয় তাহাই বৃক্ষপদজ বিজ্ঞান।

এক এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাকে আলোচন জ্ঞান (Sensation, percept) বলে। "অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পং। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুগ্ধবস্তুজম্॥" অর্থাৎ প্রথমে নির্বিকল্পক আলোচন-জ্ঞান হয়। তাহা বালক বা মূক ব্যক্তির বা মোহকর বস্তুজাত জ্ঞানের সদৃশ। এক একটী আলোচনজ্ঞান নামাদিশূন্য কেবল জ্ঞানমাত্র। (আলোচন-জ্ঞান বৌদ্ধদের সংজ্ঞা বা সংজ্ঞাস্কন্ধ।) আর বিজ্ঞান যথা—কর্ণের দ্বারা শ্রুত অগ্নির সোঁ সোঁ শব্দ, চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট অগ্নির রূপ, তাপানুভবের দ্বারা অগ্নির স্পর্শ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আলোচন-জ্ঞানসকল মানস প্রক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ জাত্যাদিবাচক অগ্নি এই নামের সহিত মিলিত হইয়া তৎপদানুপাতী যে বিজ্ঞান হয় তাহাকে সাংখ্যাদি শাস্ত্রে অগ্নির প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান বলে। "ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধর্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাবসীয়তে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা॥" অর্থাৎ পরে জাত্যাদি ধর্মের দ্বারা বস্তু যে বুদ্ধি কর্তৃক নিশ্চিত হয় তাহাই প্রত্যক্ষ, ইহাতে Perception ও Conception দুইই মিলিত থাকে। আর একপ্রকার বিজ্ঞান আছে যাহাকে মানসবিজ্ঞান, শব্দজবিজ্ঞান বা শুধু বিজ্ঞান বলা যায়। তাহা নাম (বিশেষ্য, বিশেষণ) ও আখ্যাতরূপ (ক্রিয়া) পদের অর্থজনিত বিজ্ঞান। পদ হইতে (ধ্বনি ব্যতীত) যদি কিছু অর্থ বুঝি, সেই অর্থবোধই পদজ বিজ্ঞান। উহা বাস্তব অথবা অবাস্তব বৈকল্পিক বিষয়ক হইতে পারে।

পদসকল সামান্য বা অনেক সমবেত অর্থে সঙ্কেতীকৃত হওয়ায় পদজ বিজ্ঞান সামান্য বিজ্ঞান। যথা, যোগভাষ্যে—"শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়ং ন হ্যাগমেন শক্যো বিশেষোভিধাতুং, কস্মাৎ? নহি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দঃ" অর্থাৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা সামান্যবিষয়ক। কারণ, শব্দ বা পদসকল বিশেষ অর্থে সঙ্কেত করা সাধ্যায়ত্ত নহে। মনে কর একটী দেখিলে ইষ্টক দেখিয়া তাহার বর্ণের নাম দিলে 'ইষ্টক লাল'। যে দেখিয়াছে সে তাহা স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারে। কিন্তু যে দেখে নাই তাহাকে শতসহস্র শব্দের দ্বারা ইষ্টকের ঠিক সেই বিশেষরূপ বুঝাইতে পারিবে না। আকারাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। যথা, চতুষ্কোণ শব্দের অর্থ বুঝাইতে পার, কিন্তু তাহার মধ্যে যে অশেষ প্রকার ভেদ আছে, যাহা চোখের দ্বারা দেখা যায়, তাহা শত শত বৎসর বলিলেও বুঝাইয়া শেষ করিতে পারিবে না। অতএব ইষ্টক এই শব্দ শুনিয়া তদনুপাতী যে বিজ্ঞান হয় তাহা বিশেষ বিজ্ঞান। সামান্য ও বিশেষের এই ভেদ স্মরণ রাখিলে এই বিষয় সম্যক্ পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ ভাষার দ্বারা যাহা বুঝি তাহা সমস্তই সামান্য বিজ্ঞান এবং ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা সাক্ষাৎ জানি তাবন্মাত্র বিশেষ বিজ্ঞান। সামান্য ও বিশেষ জ্ঞান যথার্থতঃ ও অযথার্থতঃ অনুসারে পঞ্চপ্রকার চিত্তবৃত্তিরূপে বিভক্ত হয়। যথা—প্রমাণ=যথার্থ জ্ঞান, বিপর্যয়=অযথার্থ জ্ঞান, বিকল্প=অযথার্থকে যথার্থরূপে ব্যবহার্য জ্ঞান, নিদ্রা=যথার্থতা-অযথার্থতার অভিভূত জ্ঞান এবং স্মৃতি =ঐ সকলের পুনর্জ্ঞান। ইহারা সব সুখদুঃখমোহযুক্ত থাকে, যোগদর্শনে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

পূর্বে লক্ষিত প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান নাম, জাতি, আদিসহ সাক্ষাৎ জ্ঞান। সুতরাং তাহা সামান্য-বিশেষ-আত্মক। কিন্তু তাহাতে বিশেষই প্রধান। যথা, যোগভাষ্যে—"সামান্য বিশেষাত্মনোহর্থস্য বিশেষাবধারণ প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্।" অর্থাৎ 'অর্থ' (বা 'বিষয়') এই শব্দ দ্বারা আমরা যাহা বুঝি তাহা সামান্য ও বিশেষ-আত্মক। তন্মধ্যে চিত্তের যে বিশেষাবধারণ প্রধানা জ্ঞানবৃত্তি তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব দ্রব্য এই পদের দ্বারা যাহা বুঝি তাহা সামান্য-বিশেষের সমবায়। "সামান্য-বিশেষ সমুদায়োঽত্র দ্রব্যং"—যোগভাষ্য ৩।৪৪

অনেক ব্যক্তির সাধারণ নাম জাতি। জাতিবাচক পদের অর্থ সব সামান্য। গুণবাচক পদ (Abstract term), গুণিবাচক পদ (Concrete term) সমূহবাচক পদ (Collective term) ইত্যাদি সমস্তই জাতিবাচক বা অনেকসমবেত বলিয়া সামান্য পদার্থ। পদার্থ= "পদের অর্থ", ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ফলে পদ শুনিয়া তাহার যে অর্থ বুঝি তাহা সামান্য এবং বিশেষ অর্থে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎ যে জ্ঞান হয় তাহা ভাবমাত্র জ্ঞান। ইহাই এ বিষয়ে সার কথা। কেবল সামান্য যাহা পদজ বিজ্ঞান, তাহা কখনও সাক্ষাৎকৃত হয় না। বস্তুরূপ বিশেষই সাক্ষাৎকৃত হয়। মনুষ্য বা মনুষ্যত্ব কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না, চৈত্র মৈত্রাদি বিশেষ মনুষ্যকেই দেখা যায়।

সামান্য ও বিশেষ এই পদদ্বয় আপেক্ষিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অনেক ব্যক্তির সাধারণ নাম সামান্য। আর সেই ব্যক্তিসকল তত্তুলনায় বিশেষ। (বিশেষ এই পদটীও সামান্য পদ অর্থাৎ কতকগুলি এক জাতীয় পদার্থের সাধারণ নাম বিশেষ।) ব্যক্তিসকল আবার কতকগুলি বিশেষের সাধারণ নাম হইতে পারে। যেমন, অসংখ্য বিশেষ বিশেষ গরুর নাম গো বা গোজাতি, আবার প্রত্যেক গরুরূপ ব্যক্তিসকল (যাহাদের সাধারণ নাম গো) কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাধারণ নাম। পরতম জাতি (Phylum), পরজাতি (Genus), অপরজাতি (species) প্রভৃতি আপেক্ষিক সামান্য এবং তাহারা ব্যাপকতর জাতির তুলনায় বিশেষ। এইরূপে বিশেষ চলিতে চলিতে শেষে অন্ত্য বিশেষে যাইয়া উপনীত হয়। সামান্যও তেমনি পরতম সামান্যে উপনীত হয়।

সত্তা এই পদের অর্থ পরসামান্য। "ন হি সত্ত্বং পদার্থো ব্যভিচরতি"—যোগভাষ্য। অর্থাৎ সব পদার্থ ই সৎ। অভাবার্থক পদের অর্থ মনের ভাববিশেষ বলিয়া সৎ। সত্তা এই রূপে সব পদার্থে সমবেত বলিয়া চরম বা পরসামান্য। সেইরূপ অন্ত্যবিশেষও আছে। যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা সাক্ষাৎ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই সেই বিষয়ের সাধারণ অন্ত্য বিশেষ। কারণ তদপেক্ষা আর বিশেষজ্ঞান সাধারণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। যোগজ অলৌকিক ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা যাহা জানা যায় তাহাই প্রকৃত অন্ত্যবিশেষ। বাহ্যপদার্থের মূর্তি (সংস্থান বিশেষ) এবং ব্যবধির (আকারের) নাম বিশেষ বলিলে, তবে পরমাণুর মূর্তি এবং ব্যবধিই অন্ত্য বিশেষ হইবে। সাংখ্যের পরমাণু তন্মাত্র বা সূক্ষ্ম একাকার ক্ষণব্যাপী শব্দমাত্র, রূপমাত্র, রসমাত্র, গন্ধমাত্র জ্ঞান। তাহাই বাহ্যের চরম জ্ঞান বলিয়া চরম বিশেষ বা অবিশেষ। অবিশেষ

অর্থে এখানে অবান্তর বিশেষশূন্য। "বিশেষাঃ ষড়্‌জগান্ধারাদয়ঃ শীতোষ্ণাদয়ো নীলপীতাদয়ঃ কষায়মধুরাদয়ঃ সুরভ্যাদয়ঃ"—তত্ত্ববৈশারদী। তন্মাত্রজ্ঞান যে ক্ষণব্যাপী শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ইহা প্রত্যক্ষ বিষয় বলিয়া শুধু অনুমানগম্য নহে।

বৈশেষিকরাও অন্ত্যবিশেষের কথা বলেন। কিন্তু তাঁহাদের পরমাণু অনুমেয় পদার্থ, প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। প্রত্যক্ষ হইলে শব্দাদি জ্ঞানের যে সূক্ষ্মাবস্থা বা তন্মাত্র তাহাই হইবে। বৈশেষিকদের এবং প্রাচীন গ্রীকদের পরমাণু শব্দাদিশূন্য হইলে বা সাংখ্যীয় তন্মাত্র লক্ষণান্তর্গত না হইলে তাহা অনুমেয় মাত্র হইবে এবং কদাপি বাহ্যরূপে সাক্ষাৎকারযোগ্য হইবে না। সুতরাং সেই বিশেষ গ্রাহ্যরূপে অজ্ঞেয় বিশেষ বা বাঙ্‌মাত্র বিশেষ হইবে। বৈশেষিকরা বলেন, "অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অন্তেঽবসানে বর্ত্ততে ইতি অন্ত্যঃ যদপেক্ষয়া বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। ঘটপদাদীনাং দ্ব্যণুকপর্যন্তানাং তত্তদবয়ব-ভেদাৎ পরস্পরভেদঃ। পরমাণূনাং ভেদকো বিশেষ এব স তু স্বত এব ব্যাবৃত্তঃ। তেন তত্র বিশেষান্তরাপেক্ষা নাস্তি ইত্যর্থঃ।"—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী। অর্থাৎ ঘটপটাদির যে বিশেষ তাহা পরস্পরকে ব্যাবৃত্তকারী ভেদক গুণ হইতে হয়। আর বৈশেষিকরা যাহাকে পরমাণু বলেন সেই পরমাণুদের বিশেষ আপেক্ষিক নহে, কিন্তু নিরপেক্ষ বলিয়া অন্ত্য। কিন্তু সেই পরমাণুর বিশেষ কি? তাহা প্রত্যক্ষ হইলে শব্দাদি গুণক হইবে, অপ্রত্যক্ষ হইলে অজ্ঞেয় কিছু এইরূপ সামান্যমাত্র হইবে; আর পরমাণুরা ব্যবহিত দ্রব্য হইলে তাহারা ব্যবধিযুক্ত (যাহাকে তাঁহারা পারিমাণ্ডল্য বলেন তাহা) হইবে; সুতরাং অচিন্ত্য পদার্থ হইবে। (আধুনিক পরমাণু বা Election-ও মূলতঃ অজ্ঞেয় পদার্থ।) সাংখ্যের বিশেষ সেইরূপ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতিগম্য ভাবপদার্থ। সাংখ্যের পরমাণুতে অন্ত্যবিশেষ সাক্ষাৎকৃত হইলে (সমাধি নির্ম্মল জ্ঞানশক্তির দ্বারা) সেই বিষয়ের যোগজ চরম প্রজ্ঞা হয়। 'জাতিলক্ষণ দেশৈরন্যতানবচ্ছেদাত্তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ"—৩।৫৩ যোগসূত্র সভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অনুমান ও আগম হইতে জাত নিশ্চয়জ্ঞান সামান্যজ্ঞান। "সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয়মনুমানং ন বিশেষ প্রতিপত্তৌ সমর্থম্।—যোগভাষ্য ১।২৫, অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা সামান্যমাত্র নিশ্চয় হয়; তাহা বিশেষ জ্ঞান জননে সমর্থ নহে। যেখানে প্রাপ্তি বা যতটুকু হেতু পাওয়া যায় সেখানে ততটুকুই গতি বা ততটুকুর জ্ঞান হয়। "যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতির্যত্রা-প্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিবিত্যুক্রম"—যোগভাষ্য ১।৪৯। আগম প্রমাণজাত নিশ্চয়ও ভাষামূলক বলিয়া সামান্য জ্ঞানই উৎপাদন করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ সেরূপ নহে। তাহাতে যে জ্ঞান হয় তাহাই বিশেষ বিজ্ঞান। সামান্য বিজ্ঞান ভাষা বা তাদৃশ সঙ্কেত হইতে হয়। বিশেষ বিজ্ঞান ভাষা ব্যতীতও হয়। তাহাকে নির্বিকল্প জ্ঞান বলে। ভাষাজনিত জ্ঞান সবিকল্পক। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্প থাকে বলিয়া ইহা সবিকল্পক সামান্য বিজ্ঞান। যেমন, গো শব্দ। ইহা থাকে কণ্ঠাদিতে, তাহার অর্থ যে গো-পশু তাহা থাকে বাহিরে এবং গো-জ্ঞান থাকে মনের ভিতরে। গো এই পদজনিত জ্ঞানে পৃথক্ এই তিন দ্রব্য অবিবিক্তভাবে থাকে বলিয়া

ইহা বিকল্প লক্ষণে পড়ে। (অবাস্তব অর্থযুক্ত বাক্যের অর্থ, অথচ যাহা আমাদের ব্যবহার্য তাহাই শব্দ জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য বিকল্প নামক বিজ্ঞানের স্বরূপ ইহা স্মার্য।) যোগশাস্ত্রে ইহাকে নির্বিতর্কা ও নির্বিচারা প্রজ্ঞা বলে। জ্ঞানশক্তির দ্বারা নামের বাক্যের সাহায্য ব্যতীত যে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় তাহাই নির্বিকল্পক বিজ্ঞান। এইরূপ বাক্যহীন সাক্ষাৎ অনুভূত যথার্থ বিজ্ঞানের নাম ঋত। আর বাক্যের দ্বারা যে যথার্থ বিজ্ঞান হয় তাহা সত্য। "ঋতং পদিষ্যামি সত্যং পদিষ্যামি", এই শ্রৌত বাক্যের এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা", "শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ"—এই ১।৪৮-৪৯ যোগসূত্রদ্বয় সভাষ্য দ্রষ্টব্য। ঋত অর্থে সাক্ষাৎ অনুভূয়মান তথ্য, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সামান্য ও বিশেষ যেখানে বিরুদ্ধার্থক সেখানে উপরোক্তভাবে সামান্য ও বিশেষের প্রতিপাদ্য অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা ছাড়া সামান্য-অসামান্য, বিশেষ-অবিশেষ এইরূপ যুগ্মবিরুদ্ধ পদ যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে ঐ শব্দসকলের অর্থ অন্য রকম হইতে পারে। "বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গাণি গুণপর্বাণি" এই যোগসূত্রে বিশেষ শব্দ আকাশাদি চরম বিকৃতির নাম। উহাদের প্রকৃতি বা উপাদান-কারণ অবিশেষ। যেমন ভূত বিশেষ, তন্মাত্র তাহাদের অবিশেষ; ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ, অস্মিতা তাহাদের অবিশেষ। সেইরূপ অসামান্য শব্দ নিজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—"স্বালক্ষণ্যং বৃত্তি স্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।"—সাং কাং ২৯। ধর্মধর্মিদৃষ্টিতে বর্তমান বা সাক্ষাৎ ধর্মই বিশেষ, অতীতানাগত ধর্ম সামান্য। "যদা তু সামান্যেন সমন্বাগতো ভবতি"- যোগভাষ্য ৩।১৪ দ্রষ্টব্য। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং"—সাং কাং। এখানে বিশেষ অর্থে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শরীর। লিঙ্গ তাহাদের সামান্যজনক।

উপরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ বিজ্ঞান সাক্ষাৎ বিজ্ঞান। অতএব সাক্ষাৎকারযোগ্য পদার্থই বিশেষ হইতে পারে। যাহা ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ—যেমন প্রকৃতি ও পুরুষ, তাহার বিশেষ বিজ্ঞান কিরূপে সম্ভব? বৈশেষিকদের মুক্তআত্মাগত বিশেষ ঐ লক্ষণে পড়িতে দোষ নাই। কারণ, তাঁহাদের আত্মা সগুণ। যোগশাস্ত্রেও পুরুষগত বিশেষের কথা উল্লিখিত আছে। যথা—"ভূতসূক্ষ্মগতঃ পুরুষগতো বা বিশেষঃ।" কিন্তু পুরুষগত অর্থে গ্রহীতৃপুরুষগত। গ্রহীতা সম্প্রজ্ঞাত যোগের বিষয় বলিয়া সাক্ষাৎকারযোগ্য। যথা—"গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু পুরুষেন্দ্রিয়ভূতেষু……"যোগভাষ্য। অর্থাৎ এখানে পুরুষ শব্দ গ্রহীতৃপুরুষ বা পুরুষাকারা বুদ্ধির নামান্তর এবং সম্প্রজ্ঞাতের বিষয়। যেখানে পুরুষ প্রকৃতির সাক্ষাৎকার উক্ত হয়, সেখানে সাক্ষাৎকার শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের বা জ্ঞানশক্তির দ্বারা সাক্ষাৎ জানা নহে। ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানশক্তির বিষয়ভূত দ্রব্যেরই সেরূপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হয়। (মন যে অভ্যন্তর জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।) অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সাক্ষাৎকার বলিলে বুঝিতে হইবে যে এমন অবস্থায় যাওয়া যেখানে ইন্দ্রিয়শক্তি রুদ্ধ হইয়াছে। এইজন্য বলা হয়, চিত্তবৃত্তি রুদ্ধ হইলে পুরুষ সাক্ষাৎকার হয় বা

জ্ঞাতার স্বরূপে অবস্থিতি হয়। সেইরূপ অব্যক্ত অবস্থায় যাইলে অব্যক্তা প্রকৃতির সাক্ষাৎকার হয়। এইরূপস্থলে সাক্ষাৎকার অর্থে উপলব্ধি।

অতীন্দ্রিয় বিষয় লক্ষিত করিতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান নিষেধ করিয়া করিতে হয়। সমস্ত নিষেধ করিয়া ভাবার্থক কয়েকটী পদের দ্বারা যদি অচিন্ত্য পদার্থ লক্ষিত করিতে হয় তবে সেই ভাবার্থক পদের অর্থ শব্দজ বিজ্ঞান হইলেও তাহাকে বিশেষ বলিলে বলিতে পার। কারণ তথায় সামান্য ও বিশেষ এক। যাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচিন্ত, অলক্ষণ, একাত্মপ্রত্যয়সার তাহাই আত্মা। এখানে প্রথম চারিটী পদ নিষেধাত্মক, একাত্মপ্রত্যয়সার ভাবাত্মক। ঐ নিষেধার্থক পদদ্বারা বিশেষিত যে আত্মপ্রত্যয়মাত্র তাহাই আত্মা। এইরূপে পুরুষ ও আত্মা সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হইতে পারে। সাম্যাবস্থ এই বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত যে প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতিমাত্র তাহাই প্রকৃতি। এইরূপে অন্তবিশেষের বা বিশিষ্ট সামান্যের দ্বারা অতীন্দ্রিয় অব্যক্তা প্রকৃতি লক্ষিত করা হয়। এখানে ধর্ম ধর্মী অভিন্ন বলিয়া ধর্মধর্মিদৃষ্টি বা সামান্য-বিশেষ শেষ হয়।

উপসংহারে বক্তব্য যে, ভূততত্ত্ব, তন্মাত্রতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই সকল দৃশ্যতত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তদ্বিষয়ে যাহা জানি তাহাই তত্তদ্বিষয়ক বিশেষ। উহাদের নাম জাতি সহকারে জানিলে কোনও দ্রব্যরূপে উহাদের প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান হয়। আর নাম, জাতি ছাড়িয়া জানিলে উহাদের সেই বিজ্ঞানকে নির্বিকল্পক বিজ্ঞান বা পরম প্রত্যক্ষ বলে। সাধারণ ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। বিবেকরূপ বিচারপূর্বক নিরোধ সমাধির দ্বারা পুরুষতত্ত্ব অধিগত হইলে তাহাকে পুরুষের উপলব্ধি নামক সাক্ষাৎকার বলে। বিবেক জ্ঞানে যে চরম বিচার থাকে অর্থাৎ অস্মীতিমাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে পুরুষ বিশিষ্ট তাহাই পুরুষোপলব্ধির পূর্বতবর্তী অন্তিম সামান্য বিজ্ঞান বা অন্তিম ভাবারূপ পদজবিজ্ঞান। "অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে" অর্থাৎ অস্তি এই চরম সামান্য জ্ঞানপূর্বক লক্ষিত করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। তাহার পর "যতো বাচো নিবর্ততন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" এইরূপে সামান্য ও বিশেষ বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া পরম পদার্থ যে আত্মা তাহার উপলব্ধি করিতে হয়। বাক্য ও মনের নিবৃত্তির উপায় নিম্নস্থ শ্রুতিতে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। "যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" অর্থাৎ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বা সর্বদা ধ্রুবস্মৃতিমান সাধক বাক্যকে মনে নিয়ত করিবেন। মনকে জ্ঞান-আত্মায় নিয়ত করিবেন অর্থাৎ বাক্যশূন্য হইয়া 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপ অহংতত্ত্বে বা সত্ত্বে (মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং) নিয়ত করিবেন। জ্ঞান আত্মাকে মহান্ শান্ত আত্মায় নিয়ত করিবেন। এইরূপে মহদাদি তত্ত্বের নির্বিকল্প প্রজ্ঞা বা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা দ্বারা চিত্তবৃত্তি বা দৃশ্য নিরোধ করিয়া সামান্য-বিশেষের অতীত পরমপুরুষকে উপলব্ধি করিতে হয়।

অহিংসাবাদ

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত

বর্তমানকালের অবিমিশ্র অহিংসাবাদ মূলতঃ হিন্দু আদর্শের পরিপন্থী। হিন্দুশাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অবিমিশ্র অহিংস হইতে হইলে প্রথমেই দেহ ও মন তদুপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হয়; কেননা, হিংসা-প্রবৃত্তি ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা করে না। দেহ-মন সুগঠিত না করিয়া ও ইন্দ্রিয়গুলি সংযমিত না করিয়া অহিংস হইবার চেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়া সম্ভবই নহে। আততায়ী আমার ঘরবাড়ী বিদগ্ধ করিবে, ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে থাকিবে, স্ত্রীলোকগণের প্রতি অত্যাচার করিতে থাকিবে ও বিবিধপ্রকার লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন করিয়া জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, আর আমি কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিকটে দাঁড়াইয়া আততায়ীর কর্ণে অহিংসাবাণী শুনাইয়া আপ্যায়িত করিতে থাকিব এবং আমার মনে কোন প্রকার উত্তেজনার ভাব উদ্দীপিত হইতে পারিবে না, এহেন অসম্ভব ও অসঙ্গত প্রয়াসটাই ভ্রান্তি। দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত ও আয়ত্ত থাকিলে অহিংসাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয় না। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে অহিংসার উপযোগী করিবার প্রথম ও প্রধান উপকরণ আহার-সংযম; কেননা, আহার দ্বারা দেহোপাদান গঠিত হয়। দৈনন্দিন বিক্ষেপণমূলে দেহের ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয় পূরণ করাই আহারের স্থূল উদ্দেশ্য, সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য জ্ঞানের ভেদ করা। দেহোপাদান যেরূপ গুণবিশিষ্ট হয়, জ্ঞানও তদাকার ধারণ করে, "আহার শুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধিঃ"। সাত্ত্বিক আহার দ্বারা দেহ গঠিত হইলে জ্ঞান স্বতঃই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হয়। তদবস্থায় মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত হয়। দেহ ও দেহগত স্বাভাবিক ক্রিয়া অনুকূল না হইলে অর্থাৎ তদুপরি প্রতিষ্ঠিত না হইলে, হিংসার স্বাভাবিক নিবৃত্তি আসিতেই পারে না। এই জন্যই বহু গবেষণা করিয়া ঋষিগণ ব্রহ্মচর্যাদি কৃচ্ছ্র নিয়ম পালন দ্বারা দেহ মন গঠনের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। জ্ঞানে দ্বন্দ্বভাবাদি অপেক্ষার বুদ্ধি থাকাকাল পর্যন্ত, ভোগ-বাসনা অঙ্কুরাকারেও বর্তমান থাকাকাল পর্যন্ত, অহংকে পরিপুষ্ট রাখিয়া অনধিকারে অহিংসা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গেলে ফল "উল্‌টো বুঝিলি রাম" হইয়া পড়িবে। সূক্ষ্মভাবে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বহুকাল হইতে বংশানুক্রমে সমাজদেহে ব্রতভঙ্গের বিষময় ফল অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং হিন্দুভারতের মর্কট দেহ রোগাধারে পরিণত হইয়াছে এবং ধৃতির অভাবে অকালোচিত বাসনা-কামনা উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত এবং অসংযত করিয়া তুলিয়াছে। তজ্জন্য উচ্চ গবেষণা বা মৌলিক চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় অবিমিশ্র অহিংসাবাদ ব্যর্থ হইলে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। দেহের যে উপাদানে যেরূপ বুঝায় তদুপাদানবিশিষ্ট হইয়া তদ্বিপরীত বুঝা কদাচ সম্ভব নহে। প্রত্যেকেরই যুক্তি-তর্ক, বিচার-মীমাংসা তাহার দেহের উপাদান

অনুরূপ। উপদেশ শ্রবণে সাময়িক অহিংসার উদ্রেক হইলেও, দেহোপাদান ঐ আকাঙ্ক্ষাকে পোষণ করিয়া সর্বক্ষণ উজ্জীবিত রাখিবার অনুরূপ না হইলে, ঐ আকাঙ্ক্ষা স্থায়ী হইতে পারে না। তাহাতে বিরতি বা বিতৃষ্ণা আসিয়া পড়িলে, তজ্জন্য স্পৃহা পর্যন্ত চিরতরে বিলোপ হইয়া যাইবে।

অবিমিশ্র অহিংস হইতে হইলে বিষয়-সঙ্গ ও বিষয়াশক্তি বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিষয় ব্যতীত বাসনা নাই। বাসনা ত্যাগই বিষয়ত্যাগ। জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থই বিষয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চভূতই বিষয়। জগতের সর্ব বিষয় এমন কি নিজ দেহের প্রতিও অনাস্থা না জন্মিলে, তাহাতে অনাদর জন্মিয়া বাসনা ত্যাগের স্পৃহাই উৎপন্ন হইতে পারে না। বিষয়-সঙ্গমূলে অনুকূল প্রতিকূলবোধ হইতেই আসক্তি-বিরক্তি জন্মে, এবং এই আসক্তি-বিরক্তিই হিংসার জনক। ইহা অঙ্কুরাকারেও থাকাকাল পর্যন্ত অহিংসা একটা কথার কথা মাত্র। অহিংস হইতে হইলে দেহ-মন গঠনের নিমিত্ত বিচার দ্বারা বিষয়ের অকল্পিত বিষয়স্বরূপ অবগত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে বিষয় মাত্রই, এমন কি নিজ দেহও যে অলীক, অসার, ক্ষণভঙ্গুর তাহা জ্ঞানে স্বতঃই উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এসমুহ অনিত্য বিষয়ের প্রতি স্বতঃই অনাদর ও বীতস্পৃহা জন্মিতে থাকিবে। এই অবস্থায় স্থায়ীত্ব লাভ করিতে হইলে দেহ তাহা পোষণ করিয়া রাখিবার উপযোগী থাকা প্রয়োজন। বিষয়-বিরতিরই অপর নাম সন্ন্যাস। ইহার পরিণাম তুরীয়াবস্থা, যে অবস্থায় বিষয় নাই, কল্পনা নাই, দ্বন্দ্বভাব নাই, অপেক্ষার বুদ্ধি নাই, বাসনা নাই সুতরাং হিংসাও নাই। ইহাই অবিমিশ্র অহিংসার স্বরূপ, এরূপ প্রসিদ্ধি। সর্বমানব এরূপ অহিংসার অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে কতিপয় নির্দিষ্ট হিংসাত্মক কার্যকেও অহিংসার অন্তর্ভূত করিয়া রাখা হইয়াছে। গরুড়পুরাণান্তর্গত "গীতাসার" গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ এইরূপ, যথা :—

"কর্মণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তং ভূতানাং যদহিংসনম॥
অহিংসা পরমোধর্ম হ্যহিংসা পরমং সুখম।
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা ত্বহিংসা সা প্রকীর্তিতা॥
যথা নাগপদেহন্যানি পদানি পদগামিনাম।
সর্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে।
এবং সর্বং হি হিংসায়াং ধর্মার্থমপিধীয়তে॥"

অর্থাৎ "সর্বদা কর্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল জীবের ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম অহিংসা। অহিংসা শ্রেষ্ঠধর্ম, অহিংসা পরম সুখ; কিন্তু শাস্ত্রবিধি অনুসারে যে হিংসা বিহিত হয় তাহাও অহিংসা বলিয়া কীর্তিত হয়। যেরূপ পাদচারিগণের সকল পদচিহ্নই

হস্তী পদের দ্বারা অচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম-হিংসা দ্বারা সমস্ত দোষই আচ্ছাদিত হয়।"—

শাস্ত্রবিহিত হিংসা বা ধর্ম-হিংসার স্বরূপ এইরূপ :—

"স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্যন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধিযুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ! লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥" (গীতা)

এই ভগবৎ বাক্যগুলি ইহাই প্রতিপাদন করে যে, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম; সুতরাং তাহাতে প্রাণীবধরূপ হিংসা হইলেও ধর্মসম্পর্কে উহাতে অহিংসাচ্যুতি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, "আততায়ী বধার্হণঃ" অর্থাৎ আততায়ী বধ্য (১ম স্কঃ ৭ম।৫৩)। বশিষ্ঠসংহিতায় উক্ত হয়—

"আততায়িনং হত্বা নাত্র প্রাণমিচ্ছোঃ কিঞ্চিৎ কিল্বিষমাহুঃ।
আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥
স্বাধ্যায়িনং কুলে জাতং যো হন্যাদাততায়িনম্।
ন তেন ভ্রূণহা সস্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি॥"

অর্থাৎ "আত্মরক্ষার্থ আততায়ীকে বধ করিবে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই, ইহা কথিত আছে। বেদান্তপারগ ব্যক্তিও যদি আততায়ী হইয়া আইসে, তাহা হইলে সেই হননেচ্ছু ব্যক্তিকে বধ করিবে, তাহাতে ব্রহ্মঘাতী হইবে না। স্বাধ্যায়-সম্পন্ন সৎকুলজাত ব্যক্তিও আততায়ী হইলে তাহাকে বধ করিবে, তাহাতে ঘাতক ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে না; কেননা, আক্রান্তের ক্রোধাভিমানিনী দেবতা আততায়ীর ক্রোধকে নিবর্তিত করে।"—

"আততায়ীর" সংজ্ঞা দিতে গিয়া বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন :—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েত আততায়িনঃ॥"

অর্থাৎ "অগ্নিদ (গৃহদাহক), বিষদাতা, উত্তোলিতাস্ত্র, ধনাপহারী, এই ছয় প্রকার আততায়ী।" এই সমুদয়ই বধ্য, সুতরাং এই বধও অহিংসার অন্তর্গত। বিষ্ণু সংহিতাতে আছে :—

"নাস্তিরাজ্ঞাং সমরে তনুত্যাগসদৃশো ধর্মঃ।
গো ব্রাহ্মণ নৃপতিমিত্র ধনদার জীবিত রক্ষণাদ্ যে
হতাস্তে স্বর্গভাজঃ। বর্ণসঙ্কর রক্ষণার্থে চ॥"

অর্থাৎ "ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগের সমান আর ধর্ম নাই। গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী বা জীবন—এই সকল রক্ষা করিতে গিয়া, কিংবা বর্ণসঙ্কর হওয়ার প্রতিবন্ধক হইতে গিয়া মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইবে।"—

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা :—

"য আহবেষু বধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥
পদানি ক্রতুতুল্যানি ভগ্নেষবিনিবর্তিনাম্।
রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম॥"

অর্থাৎ "যাঁহারা রাজ্যরক্ষার্থ সম্মুখরণ করিতে অকূট (যাহা বিষাদিলিপ্ত নহে) অস্ত্রাঘাতে নিহত হন, তাঁহারা যোগীদের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। নিজ সৈন্যসামন্ত বিমুখ হইলেও যাঁহারা শত্রুসৈন্য অভিমুখে অগ্রসর হন, তাঁহারা তৎকালে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন। আর যাহারা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, রাজা তাহাদের পুণ্য হরণ করেন।"—

পরাশর সংহিতা :—

"দ্বাবিমৌপুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডল ভেদকৌ।
পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চরণে চাভিমুখে হতঃ॥
যং যজ্ঞসঙ্ঘৈস্তপসা চ বিদ্যয়া
স্বর্গৈষিণো যাত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্রবীরাঃ
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তেঃ॥"

অর্থাৎ "যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখযুদ্ধে হত, এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোকগামী হন। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যাদ্বারা স্বর্গপ্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীরপুরুষেরাও সেই লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"—

মহানির্বাণ তন্ত্র :—

"সর্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।"

অর্থাৎ "সমাহিতচিত্তে সর্বোপচার দ্বারা পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে।"— তদ্ব্যতীত মনু-সংহিতা অন্যান্য সংহিতা, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ আদিতে বৈধ হিংসার উল্লেখ রহিয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টকে দমন করিতে গিয়া প্রাণিবধ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তিনি ধর্মরাজ্যের সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ অসুর নিপাত করিয়াই গীতাতেও তিনি বলিয়াছেন :—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

এই মহাবাক্যে যে দুষ্কৃতগণকে বিনাশের কথা আছে তাহা কি বৈধ হিংসা নয় ?

যাঁহারা অবিমিশ্র অহিংসাবাদ প্রচারে পঞ্চমুখ, যাঁহারা তথাকথিত অহিংসা দ্বারা হিংসা জয় করিবার স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহাদের অহিংসাবাদের ভিতরে গৃহদাহক, বিষদাতা, উদ্যতাস্ত্র, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী, দারাপহারী প্রভৃতি দুষ্কৃতগণকে নিহত করিবার, কিংবা অস্ত্রধারণে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার, কি গো ব্রাহ্মণ, রাজা, বন্ধু, ধন, স্ত্রী বা জীবন রক্ষার্থে নিজ জীবনপাত করিবার, কি যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া সম্মুখযুদ্ধে শত্রু-সংহার করিবার বিধান আছে কিনা ? যদি না থাকে, তবে তাঁহাদের তথাকথিত অহিংসা-মন্ত্র গৃহত্যাগী বনবাসী সন্ন্যাসীদের নিকট প্রচার করাই শ্রেয় ; কেননা, কর্মী গৃহী অবিমিশ্র অহিংসাবাদ অনুসরণে অসমর্থ। ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি শাস্ত্রানুযায়ী কর্মীগণে যোগ্যতা অর্জন না করিয়া অনধিকারীর ন্যায় অহিংসাবাদ ঐরূপভাবে অনুসরণ করিতে গেলে অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশী। পক্ষান্তরে হিন্দু তাহার ধর্মশাস্ত্র ও ঋষিবাক্য লঙ্ঘন বা উপেক্ষা করিয়া প্রাকৃত জীবের কপোলকল্পিত নির্দেশ পালন করিতে গিয়া হিন্দু আদর্শ ম্লান করিতে প্রস্তুত কিনা তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। ভোগবাসনা উদ্দীপ্ত রাখিয়া, অহংভাবকে নিত্য জাগ্রত রাখিয়া অবিমিশ্রভাবে অহিংস হইবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

শুক্রনীতিসার

বঙ্গানুবাদ—পূর্বানুবৃত্ত

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ধর্মপত্নীর গর্ভজাত ঔরস পুত্রকে যুবরাজ করা হইবে। তিনি মুদ্রা (রাজসহি মোহর) ব্যতীত যাবতীয় রাজকর্ম করিতে সমর্থ। ১৪। উক্ত পুত্রের অভাবে নিজের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ পিতৃব্য, ছোটভাই, জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র, অপর পত্নীর পুত্র, পুত্রীকৃত পুত্র (পুত্রিকা পুত্র), দত্তক পুত্র, দৌহিত্র এবং ভাগিনেয়কে (পাঠান্তরে স্বপ্রিয়=আপনার প্রিয় ব্যক্তিকে) যথাক্রমে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজা স্বীয় মঙ্গলের জন্য মনে মনেও উহাদের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না। ১৫-১৬।

রাজা স্বধর্মনিরত, শূর, ভক্ত ও নীতিমান্ রাজবংশীয় বালকগণকে যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন। ১৭। কারণ উহারা অরক্ষিত থাকিলে (not properly guarded) অর্থলোলুপ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে; অথবা উহারা রক্ষিত হইয়াও যদি কোনও রূপ ছিদ্র পায় তাহা হইলে সিংহশাবক যেমন হস্তী পাইলেই বিনাশ করে তদ্রূপ রাজপুত্রগণ রক্ষাকারীর (রাজার) হন্তা হইয়া থাকে। রাজপুত্রগণ মদমত্ত মাহুতশূন্য হস্তীর ন্যায় নিরঙ্কুশ। ১৮-১৯। তাহারা পিতাকেই যখন হত্যা করে তখন ভ্রাতা বা অপরকে বিনাশ করিবে ইহা আর বেশী কি। কি মূর্খ কি বালক সকলেই স্বামিত্ব ইচ্ছা করে, তখন যুবা প্রভুত্ব ইচ্ছা করিতেই পারে। ২০। রাজা রাজপুত্রগণকে আপনার অত্যন্ত নিকটে রাখিবেন এবং উপযুক্ত ভৃত্যবর্গের সহায়তায় ছল অবলম্বন করিয়া তাহাদের মনোভাব সর্বদা স্বয়ং জানিবেন। ২১। রাজা অমাত্যবর্গের সাহায্যে পুত্রগণকে সুনীত, শাস্ত্রকুশল, ধনুর্বেদবিশারদ, ক্লেশ-সহিষ্ণু, বাগ্‌দণ্ডপারুষ্য অনুভব করিবার শক্তিসম্পন্ন, বীরত্বসম্পন্ন, যুদ্ধে প্রবৃত্তিমান্, সকল প্রকার কলাবিদ্যাবিশারদ, অঞ্জস (যথার্থ নির্ণয়ে সমর্থ) এবং সুবিনীত করিবেন।২২-২৩। নরপতি উৎকৃষ্ট বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া মনোহর ক্রীড়াদ্রব্যদ্বারা লালন করিয়া (উপযুক্ত) আসন (অর্থাৎ পদমর্যাদা) দ্বারা সম্মান করিয়া এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্বারা পালন করিয়া যৌব-রাজ্যের উপযুক্ত করিয়া রাজপুত্রগণকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। কারণ, কুমার অবিনীত হইলে শীঘ্র কুলবিনাশ করে।২৪-২৫। রাজপুত্র অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ ঐপুত্র পরিত্যক্ত হইয়া কষ্ট পাইলে শত্রুপক্ষের আশ্রয় লইয়া পিতাকে নিহত করে। ২৬। রাজপুত্র ব্যসনলিপ্ত হইলে, সেই ব্যসন আশ্রয় করিয়াই তাহাকে কষ্টে ফেলিবে। দুষ্ট গজের ন্যায় ঐ উচ্ছৃঙ্খল কুমারকে সুখবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবেন (অর্থাৎ বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে আয়ত্তে রাখিতে হইবে অথচ তাহাতে তাহার কষ্ট হইবে না)। ২৭।

দায়াদগণ (জ্ঞাতিবর্গ) অত্যন্ত দুর্বৃত্ত হইলে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যাঘ্রাদি দ্বারা,

শত্রুগণ দ্বারা অথবা কৌশল করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন। ২৮। ইহার অন্যথা করিলে ঐ দায়াদগণ প্রজাপুঞ্জের এবং ভূপতির বিনাশের কারণ হয়। দায়াদগণ আপনাদের উৎকৃষ্ট গুণাবলীর দ্বারা নরপতিকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবেন। ২৯। ইহার অন্যথা হইলে তাহারা স্বীয় প্রাপ্ত অংশ হইতে এবং জীবন হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। ২৯½।

যাহারা সপিণ্ড নহে এবং অন্য বংশে উৎপন্ন—এরূপ দত্তক পুত্র প্রভৃতিকে স্বীয় পুত্র বলিয়া কখন মনেও স্থান দিবে না। যেহেতু তাহারা ধনশালী ব্যক্তি দেখিয়াই দত্তক পুত্র হইতে ইচ্ছা করে। ৩০-১।

পূর্বোক্ত দত্তক পুত্র অপেক্ষা স্বকুলোৎপন্ন কন্যার পুত্র বরং শ্রেষ্ঠ। কারণ দুহিতা পুত্রের ন্যায় মানবগণের প্রত্যেক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৩২। অতএব পুত্র এবং দৌহিত্রের মধ্যে পিণ্ডদানে কোনও বিশেষ (অর্থাৎ ভেদ) নাই।

রাজা ভূমি এবং প্রজাপালনের জন্য দত্তক পুত্র পালন করিবেন। ৩৩। রাজা এবং ধনী প্রজা (অর্থাৎ জনসাধারণ) পালনের জন্য দত্তক স্বীকার করিবেন অন্যথা (অর্থাৎ নির্ধন ব্যক্তির)দত্তকের প্রয়োজন নাই। পরোৎপন্ন২ পুত্রকে স্বপুত্র মনে২ করিয়া লোকে যথাসর্বস্ব প্রদান করে, কিন্তু কি আশ্চর্য লোক (সৎকার্যে বা দেশসেবায়) দান করে না বা যাগযজ্ঞ করে না। ৩৪½।

কুমার যুবরাজত্ব পাইয়াও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইবে না। ৩৫। সম্পত্তির মদে মত্ত হইয়া মাতা, পিতা, গুরুজন, ভ্রাতা, ভগিনী, (বংশের) অন্যান্য ব্যক্তি এবং রাজবল্লভগণ এবং মহাজন (অর্থাৎ প্রজাসাধারণ)কে রাষ্ট্রে রাজত্ব মধ্যে অপমান বা পীড়ন করিবে না। (Line 74-75 in the Eng. trans. অতিরিক্ত আছে)। অত্যন্ত অভ্যুদয় সম্পন্ন হইয়াও পিতার আজ্ঞাধীনে থাকিবে। ৩৬-৩৭। পিতার আজ্ঞা পালন করা পুত্রের পরম ভূষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, ভার্গব পরশুরাম (পিতার আজ্ঞায়) মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও বনে গমন করিয়াছিলেন। ৩৮। পিতার তপোবলেতেই ভার্গব মাতাকে এবং রামচন্দ্র রাজত্ব পাইয়াছিলেন। যিনি শাপ দিতে এবং অনুগ্রহ করিতে সমর্থ তাঁহার আজ্ঞাই গরীয়সী হয়। ৩৯। সমস্ত সহোদরগণের উপর আপনার আধিক্য অর্থাৎ সমৃদ্ধি ও প্রভুত্ব দেখান উচিত নহে, কারণ অংশ পাইবার উপযুক্ত ভ্রাতৃগণকে অপমান করায় দুর্যোধন নষ্ট হইয়াছিল। ৪০। উত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়াও পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় রাজপুত্রগণ ঐ পদভ্রষ্ট হইয়া ভৃত্যের ন্যায় থাকে। যেমন যযাতির ও বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের হইয়াছিল। (মহাভারত, আদি পর্ব, ৮৪ অধ্যায়, এবং বাল্মীকি রামায়ণ বালকাণ্ড, ৬২ অধ্যায় দেখুন)। অতএব পুত্রগণ কায়মনোবাক্যে সতত পিতার সেবাকার্যে তৎপর থাকিবে। ৪২। যে কার্যে পিতা সন্তুষ্ট থাকেন নিয়ত সেই কার্যই করিবে, এমন কার্য করিবে না যাহাতে পিতা কিছুমাত্র দুঃখিত হন। ৪১-৩। যাহাতে পিতা প্রীতি লাভ করেন স্বয়ং সেই প্রিয়কার্য করিবে। পিতা যাহা অপ্রিয় বিবেচনা করেন তাহাই নিজের অপ্রিয় ভাবিবে। ৪৪। পিতার অসম্মত বা বিরুদ্ধ কার্য করিবে না। চার

(গুপ্তচর) এবং সূচক (চুগলীখোর, কাণভাঙ্গিনী)গণের দোষে যদি পিতা অন্যরূপ হয় (অর্থাৎ পিতার উপযুক্ত ব্যবহারের অন্যথাচরণ করেন) তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া তাঁহাকে নিভৃত স্থানে বুঝাইবে। অন্যথায় (ইহাতে অপারগ হইলে) সূচকদিগকে সর্বদা গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। ৪৫-৬। প্রকৃতিবর্গের মনোভাব কপট ব্যবহার দ্বারা অবগত হইবে। প্রতিদিন প্রভাতে পিতা, মাতা এবং গুরুকে প্রণাম করিবে, তৎপরে রাজাকে আপনার প্রতি-দিনের সম্পাদিত কার্য নিবেদন করিবে। এইরূপে রাজপুত্র গৃহকে অবিরোধী করিয়া অর্থাৎ রাজকুলের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া গৃহে বাস করিবে।৪৭-৮। বিদ্যা, কর্ম এবং শীলতা দ্বারা সানন্দে প্রজারঞ্জন করিবে এবং স্বয়ং ত্যাগী ও উৎসাহ-সম্পন্ন হইয়া সকলকে নিজবশে আনিবে। ৪৯। এইরূপ চরিত্রের রাজপুত্র অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিবে। ৫০। সহায়বান্ এবং অমাত্য-পরিবৃত হইয়া দীর্ঘকাল বসুন্ধরাকে ভোগ করিবে। যুবরাজের হিতজনক কর্তব্য কার্য সমাসতঃ (সঙ্ক্ষেপে) বলা হইল। ৫১।

সংক্ষেপে অমাত্যাদি কর্মচারীগণের লক্ষণ বলা হইতেছে। মৃদুত্ব (নরমভাব softness) গুরুত্ব (ভার heaviness) প্রমাণ (মাপ) (Eng. Trans. প্রমাণের লঘুত্ব lightness or heaviness of weight) বর্ণ (রং) ও শব্দ (আওয়াজ) দ্বারা পরীক্ষিত হইলেও যেমন স্বর্ণকে আবার গলাইয়া পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করা হয় তেমনি কর্ম দেখিয়া, একত্র বাস করিয়া গুণ, শীল ও কুল বিচার করিয়া ভৃত্যকে (অমাত্যাদি কর্মচারিবৃন্দকে) সতত পরীক্ষা করিবে, ইহাতে বিশ্বাস্ত হইলে তবে বিশ্বাস করিবে। কেবল জাতি বা কুল লক্ষ করিলে চলিবে না। ৫২-৪। কার্য, চরিত্র এবং গুণই যেমন পূজা পায় তেমন জাতি ও কুল পায় না। জাতি কিম্বা কুল শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পাবে না। ৫৫। বিবাহ ও ভোজনকার্যে সর্বদা কুল ও জাতির বিচার করিবে।

সত্যবাদী, গুণবান্, অভিজনবান্ (বিখ্যাতবংশসম্ভূত), ধনী, সৎকুলোৎপন্ন, সুশীল, উত্তমকর্মকারী, এবং আলস্যবিহীন ব্যক্তি যেমন আপনার কার্য করে তাহা হইতেও স্বামির কার্য কায়মনোবাক্যে চতুর্গুণ যত্নসহকারে অধিক করে।৫৬-৫৭½। যে ভৃত্য (কর্মচারী) মাহিনাতেই সন্তুষ্ট, মিষ্টভাষী, কার্যকুশল, শুদ্ধচরিত্র, দৃঢ়তাসম্পন্ন, পরোপকারে কুশল, অপকারে পরাঙ্মুখ, প্রভুর অনিষ্টচেষ্টাকারী পুত্র বা পিতার প্রতি লক্ষকারী স্বামী যদি অন্যায় পথে যায় সে সেরূপ করে না। সুবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বামিবাক্যে অপ্রতিবাদী, স্বামীর ন্যূনতার অপ্রকাশক, সৎকার্যে দীর্ঘ-সূত্রতারহিত, অসৎকার্য সম্পাদনে বিলম্বকারী, স্বামীর ভার্য্যা, পুত্র ও মিত্রের ছিদ্র (দোষ) কখনও দেখে না, এবং তাহাদের প্রতি প্রভুর ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন (অর্থাৎ স্বামিকে যেভাবে দেখিবে তাঁহার ভার্য্যাদের প্রতিও সেই ভাব থাকিবে), আত্মশ্লাঘাশূন্য, স্পর্দ্ধাশূন্য, ঈর্ষাশূন্য, পরনিন্দা-পরাঙ্মুখ, পরের অধিকার গ্রহণে অনিচ্ছুক, নিঃস্পৃহ, সদা প্রফুল্ল, প্রভুর সম্মুখে তাঁহার প্রদত্ত বস্ত্র ভূষণাদি ব্যবহারকারী, বেতনের অনুপাতে ব্যয়কারী, জিতেন্দ্রিয়, দয়ালু, শূর এবং প্রভুর অকার্য গোপনে প্রভুর নিকট প্রকাশকারী—এইরূপ কর্মচারীই শ্রেষ্ঠ। ৫৮-৬৪। ইহার বিপরীত

গুণসম্পন্ন কর্মচারী নিন্দনীয় হইয়া থাকে। যে ভৃত্যগণ অল্প বেতন পায়, যাহারা (প্রভু কর্তৃক) দণ্ডের দ্বারা বিশেষ পীড়িত হইয়াছে, যাহারা শঠ, কাতর (কার্যভীরু), লোভী ?,মুখে মিষ্টভাষী, মত্ত, (নেশাখোর) ব্যসনী, রুগ্ন, উৎকোচাভিলাষী, দ্যূতক্রীড়ক, নাস্তিক, দাম্ভিক, মিথ্যাবাদী, নিন্দুক, অপমানিত, কটুবাক্যে মর্মাহত *, শত্রুর মিত্র, শত্রুর সেবক, পূর্বশত্রুতাযুক্ত, কোপন স্বভাব, সাহসিক (অবিমৃষ্যকারী) এবং অধার্মিক তাহারা উৎকৃষ্ট কর্মচারী নহে। সংক্ষেপে উৎকৃষ্ট ও অধম ভৃত্যের লক্ষণ বলা হইল। ৬৫-৮।

পুরোহিতাদির লক্ষণ সংক্ষেপে বলা হইতেছে।

পুরোহিত, প্রতিনিধি, প্রধান, সচিব, মন্ত্রী, প্রাড্‌বিবাক, পণ্ডিত, সুমন্ত্রক, অমাত্য ও দূত এই দশটিকে রাজার প্রকৃতি কহে। ৬৯-৭০। দূত হইতে পুরোহিত পর্যন্ত প্রকৃতিবর্গ ক্রমশঃ দশমাংশ অধিক বেতন পাইয়া থাকে। কাহারও মতে সুমন্ত্র, পণ্ডিত, মন্ত্রী, প্রধান, সচিব, অমাত্য, প্রাড্‌বিবাক্, ও প্রতিনিধি লইয়া রাজার আট প্রকৃতি। ৭১-২। রাজার এই আট প্রকৃতির মাহিনা একরূপ হইবে। দূত আবার ও ইঙ্গিতজ্ঞ হইবে ; ইনি এই প্রকৃতির অনুগ অর্থাৎ অধীন বলিয়া কথিত। ৭৩। পুরোহিত এই প্রকৃতিবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনি রাজার ও রাষ্ট্রের প্রধান সহায়। তাঁহার পরে প্রতিনিধি। তদনন্তর প্রধান। তৎপরে সচিব। পরে মন্ত্রী। অতঃপর প্রাড্‌বিবাক। অনন্তর পণ্ডিত। তৎপরে সুমন্ত্র। পরে অমাত্য। শেষে দূত। ইহারা পরপর গুণানুসারে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ৭৪ ৬।

মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানসম্পন্ন, বেদত্রয়ে অধিকারী, কর্মতৎপর, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, লোভমোহবিবর্জিত, ষড়ঙ্গবিদ্, সাঙ্গধনুর্বেদবিদ্, অর্থধর্মবিদ্ (well-veised in Economics), নীতিশাস্ত্র ও অস্ত্র-বিদ্যা ও ব্যূহরচনাদি কার্যে কুশল, এবং যাহার কোপের ভয়ে রাজাও ধর্ম-নীতিতে রত থাকেন এইরূপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি পুরোহিত। শাপ এবং অনুগ্রহে সক্ষম যে পুরোহিত তিনিই আচার্য (Primate) হইবেন। ৭৭-৯।

প্রকৃতিদিগের সুমন্ত্রণা ব্যতীত নিশ্চয়ই রাজ্য নাশ হইয়া থাকে। যাহারা রাজাকে নিরোধন (control) করিতে পারে (পাঠান্তরে যাহারা রাজাকে অপথ হইতে নিবৃত্ত করে) তাহারাই সুমন্ত্রী। ৮০। যে প্রকৃতিবর্গ হইতে রাজার ভয় হয় না তাহাদিগের দ্বারা কি রাজ্যের বৃদ্ধি হয়? তাহারা স্ত্রীলোকের বস্ত্রালঙ্কার বিভূষণের ন্যায় রাজ্যের ভূষণস্বরূপমাত্র হইয়া থাকে। ৮১। যাহাদিগের মন্ত্রনায় রাজ্য, প্রজা, বল, কোষ ও সুনৃপত্ব বর্ধিত না হয় এবং রিপু নাশ না হয়, সেই সকল মন্ত্রিতে কি প্রয়োজন ? । ৮২ ।

যিনি কোন্‌টী কার্য এবং কোন্‌টী অকার্য তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন তিনি প্রতিনিধি-প্রধান (chief minister) সর্বদর্শী হইবেন। সচিব (Military minister) সেনাবিৎ

---

* বোম্বাই সংস্করণে অর্দ্ধ শ্লোক নাই।

† এই আট প্রকৃতির নামের শ্লোক ইংরেজী সংস্করণে নাই।

হইবেন অর্থাৎ সেনাসম্বন্ধে যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীন হইবে। মন্ত্রী (minister) নীতি-কুশল হইবেন। পণ্ডিত ধর্মতত্ত্ববিদ্ হইবেন। যিনি লোকশাস্ত্র অর্থাৎ লোক ব্যবহার এবং নীতি (law) অবগত আছেন তিনি প্রাড্ বিবাক (chief justice)। ৮৩-৪। যিনি দেশকালের বিষয় সম্যক্ অবগত আছেন তিনিই অমাত্য (foreign minister)। যিনি সুমন্ত্র (finance minister) তাঁহাকে আয়ব্যয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে। যিনি ইঙ্গিত, আকার ও চেষ্টা দর্শনে অবস্থা বুঝিতে সক্ষম, স্মরণশক্তিসম্পন্ন, দেশকাল বুঝিয়া ব্যবহারে সমর্থ, সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্গুণশালী, মন্ত্রণাকুশল, বাগ্মী ও ভয়শূন্য তিনিই দূত (ambassador)। ৮৫-৬। প্রতিনিধি অহিত হইলেও যে কার্য তখনই করা উচিত তাহা রাজাকে বুঝাইবে, করাইবে এবং করিবে; আর যাহা হিত হইলেও তখন করা উচিত নয় তাহা করিবে না, বা বুঝাইবে না। ৮৭-৮। সমস্ত রাজকার্যের মধ্যে সত্য এবং অসত্য কার্যসমূহ প্রধান (chief minister.) বিচার করিবেন। ৮৯।

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, উষ্ট্র এবং বৃষ কতগুলি বিশেষ কার্যোপযোগী আছে তাহা; বাদ্য শব্দের সঙ্কেত অনুসারে ব্যূহ রচনায় সমর্থ ব্যক্তিবর্গ; (সংবাদ সংগ্রহার্থ) প্রাক্প্রত্যকগামী লোক (অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ প্রেরিত লোক) গণের, রাজচিহ্নযুক্ত শস্ত্রাস্ত্রধারী ব্যক্তিগণের, পরিচারকগণের, হীন, মধ্যম ও উত্তম কর্মচারীগণের, অস্ত্রসমূহের, অস্ত্রজাতির (কত রকমের অস্ত্র আছে তাহার), অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্ঘ (দল) গুলির, প্রাচীনের মধ্যে কতগুলি কার্যক্ষম, কতগুলি নূতন, কতগুলি কার্যে অসমর্থ; শস্ত্র, গোলা ও অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) যুক্ত সাংগ্রামিক (গোলন্দাজ) কতগুলি আছে এবং সম্ভার (যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি সরঞ্জাম) কত আছে এই সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া সচিব (military minister.) এই সমুদয় সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা যথাযথভাবে রাজাকে নিবেদন করিবে। ৯০-৯৪।

মন্ত্রী (minister) সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড ইহাদের প্রয়োগ কাহার প্রতি হইবে, কখন হইবে, কি প্রকারে হইবে, তাহাতে কি ফল হইবে এবং ঐ ফল বেশী হইবে কি মধ্যম হইবে কি অল্প হইবে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া রাজাকে নিবেদন করিবে। ৯৫।

প্রাড্ বিবাক (chief Justice) সভামধ্যে সভ্যগণের সহিত সাক্ষিদ্বারা, দলিল পত্রদ্বারা, ভোগদ্বারা (দখলদ্বারা) এবং ছল দ্বারা বাদীর মকদ্দমাটী স্বেচ্ছাকৃত অথবা যথার্থরূপে উপস্থাপিত ইহা বিচার করিয়া দিব্যসংসাধনদ্বারা (অর্থাৎ শপথ রূপ প্রমাণ দ্বারা—affidavit) এবং কাহার কি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আছে তাহাদ্বারা, যুক্তি দ্বারা, প্রমাণ দ্বারা, অনুমান্ উপমান্ (সাদৃশ্যপ্রমাণ) লোক-ব্যবহার এবং বহুসম্মতসিদ্ধান্ত (নজীর) দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাজাকে বুঝাইয়া দিবে। ৯৬-৯৮।

পণ্ডিত—বর্তমান ধর্ম, প্রাচীন ধর্ম, লোকাচার, শাস্ত্রের নির্দেশ ও তাহার খণ্ডন এবং লোকাচারের ধর্ম কি এইগুলি সমালোচনা করিয়া ইহকাল এবং পরকালে সুখপ্রদ ধর্ম রাজাকে বুঝাইয়া দিবেন। ৯৯-১০০।

সুমন্ত্র (Revenue Minister) আলোচ্যবর্ষে এই পরিমাণে দ্রব্য তৃণশস্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে এত ব্যয় হইয়াছে এবং এত স্থাবর অস্থাবর অবশিষ্ট আছে, ইহাই রাজাকে নিবেদন করিবে। ১০১।

অমাত্য (Finance Minister) বর্তমান বৎসরে কত পুর (নগর), গ্রাম ও অরণ্য আছে, কত জমি চাষ হইয়াছে, উহার কত ভাগ পাওয়া গিয়াছে, ভাগশেষ কত আছে (অর্থাৎ কত কর আদায় হয় নাই) কত ভূমি চাষ হয় নাই, কত শুল্ক ও দণ্ডাদি হইতে কত আয় হইয়াছে, অকৃষ্ট পণ্য (বিনা চাষে উৎপন্ন) কত হইয়াছে, বনজাত দ্রব্য কত পাওয়া গিয়াছে, আকর (খনি) জাত দ্রব্য কত পাওয়া গিয়াছে, নিধি প্রাপ্তি কত হইয়াছে, বেওয়ারিস মাল কত পাওয়া গিয়াছে, হারান দ্রব্য এবং চোরের নিকট হইতে কত দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে এবং কত সঞ্চিত দ্রব্য আছে তাহা বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া রাজাকে নিবেদন করিবে। ১০২-১০৫।

এই দশটি প্রধান প্রকৃতির লক্ষণ এবং কার্য সংক্ষেপতঃ বলা হইল ইহাদের লিখিত বিবরণ হইতে রাজা সমস্ত জানিবেন। ১০৬।

নরপতি ইহাদিগকে পরস্পরের কর্মে (আবশ্যক মত) বদল করিবেন। ১০৭। অধিকারীকে (রাজা) নিজ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা প্রদান করিবেন না। এবং এই দশ প্রকৃতিকে তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন। ১০৮।

প্রত্যেক অধিকারে তিনজন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিবে ; উহাদের মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি মুখ্য (প্রধান chief or head) হইবে। অবশিষ্ট দুইজন দর্শক (সহকারী) হইবে। ইহারা তিন, পাঁচ, সাত বা দশ বৎসরের জন্য এক কার্যে নিযুক্ত থাকিবে। ১০৯-১০। কিন্তু উহাদের কার্য কৌশলের পারদর্শিকতা অনুসারে ঐ নিয়মের পরিবর্তন হইবে। রাজা কখনও কাহাকেও বহুকাল এক অধিকার প্রদান করিবেন না। ১১১। যে অধিকারে যাহাকে সক্ষম দেখিবেন তাঁহাকে সেই অধিকারে নিযোগ করিবেন। বহুকাল অধিকার-মদ পান করিয়া কোন ব্যক্তি মাতাল না হয়। ১১২। এক কার্যের উপযুক্ততার প্রমাণ পাইলে তাহাকে অন্যকার্যে নিয়োগ করিবে। তৎপদানুগত (অর্থাৎ সহকারী) অন্য ব্যক্তিকে কুশল (কর্যদক্ষ) দেখিয়া তাহার পদে নিযুক্ত করিবে। যদি ঐরূপ ব্যক্তির অভাব হয় তাহা হইলে অপর ব্যক্তিকে ঐপদে ঐ মহিনায় নিয়োগ করিবে। কিন্তু যদি পূর্বোক্ত কর্মচারীর পুত্র ঐ পদের উপযুক্ত থাকে তাহা হইলে তাহাকে ঐ পদ দিবে। ১১৩-৪। যেমন যেমন (কার্য-কুশলতা দ্বারা) শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হইবে তদনুসারে ক্রমশঃ ঐ শ্রেষ্ঠপদ দেওয়া হইবে এবং শেষে প্রকৃতির পদ পাইবে। ১১৫।

অধিকারের বল (অর্থাৎ কার্যের আধিক্য) তদনুসারে বহু দর্শক নিযুক্ত হইবে অথবা দর্শক ব্যতীত একজন অধিকারী নিযুক্ত হইবে (অর্থাৎ কার্য বেশী হইলে বেশী লোক ও কম থাকিলে একজন লোকই কার্য চালাইবে)। ১১৬।

অন্যান্য কর্মসচিব (কর্মদক্ষ) ব্যক্তিগণকে পৃথক্‌ভাবে গজ, অশ্ব, রথ, পদাতি, পশু,

উষ্ট্র, মৃগ, পক্ষি, সুবর্ণ, রত্ন, রজত, বস্ত্র, বিত্ত অর্থাৎ সাধারণ রাজকোষ (পাঠান্তরে বিতান অর্থাৎ তাঁবু প্রভৃতি) ধান্য, পাকশালা, আরাম, সৌধগৃহ-সম্ভার (উপকরণ furniture), দেবসেবা এবং দান কার্যগুলির প্রত্যেকটীর পৃথক অধিপতি নিয়োগ করিবেন। ১১৭-৯।

প্রতিগ্রামে এবং প্রতিনগরে সাহসাধিপতি (দণ্ডদাতা magistrate), গ্রামনেতা (civil officer), ভাগহার (তহসীলদার collector of revenue) লেখক (পাটওয়ারী-মুহুরী clerk), শুল্কগ্রাহ (collector of taxes, tolls & duties) এবং প্রতীহার (চৌকীদার বা সংবাদবাহক) এই ছয়টী বিভাগের পৃথক্ পৃথক্ ছয়টী কর্তা নিযুক্ত করিতে হইবে। ১২০-১২১।

তপস্বী, দাতা, শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ, পৌরাণিক, শাস্ত্রবিদ্, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রবিদ্, আয়ুর্বেদবিদ্ (চিকিৎসক), কর্মকাণ্ডবিদ্, তান্ত্রিক, অন্যরূপ বিশেষ গুণবান্, বিশেষ বুদ্ধিমান্, বিশেষ জিতেন্দ্রিয়, এইরূপ বিশিষ্ট পূজনীয় ব্যক্তিগণকে রাজা বৃত্তি, (মাসিক বা বার্ষিক বৃত্তি) দান (পুরস্কার peresent) বা মান (রাজসম্মান title or honours) দিয়া পোষণ করিবেন। রাজা ঐরূপ না করিলে লোকের কাছে নিন্দিত হন এবং অযশলাভ করেন। ১২২-৪।

যে সকল বহুসাধ্যকার্য (বহুলোকের সাহায্যে যে কার্য হয় অথবা বহুমুখ কার্য) আছে তাহাতে ঐ কার্য সম্পাদনে দক্ষ ব্যক্তিগণকে ঐ ঐ কার্যের অধ্যক্ষ করিয়া দিবেন। ১২৫।

এমন অক্ষর নাই যাহা মন্ত্র নয়, এমন মূলই নাই যাহা ঔষধ নয় এমন পুরুষই নাই। যে অযোগ্য, কিন্তু যোজক (যথাযথ প্রয়োগ কর্তা) দুর্লভ। ১২৬।

যে ব্যক্তি "প্রভদ্রক" প্রভৃতি হস্তীর জাতিভেদ জানে, চিকিৎসা জানে, শিক্ষা দিতে পারে, ব্যাধি বুঝিতে পারে, পালন বিষয়ে অভিজ্ঞ, তালু জিহ্বা ও নখের গুণ বোঝে, আরোহণও গতি বোঝে, তাহাকে হস্তী রক্ষায় নিযোগ করিতে হইবে। এইরূপ (বিশেষজ্ঞ) হস্তিপালকই হস্তীর প্রিয় হয়। ১২৭-৮।

যে অশ্বের মতলব বোঝে, জাতি, বর্ণ, ও ভ্রম (রোমের আবর্ত্ত—ডোমরা) দ্বারা গুণ বোঝে, গতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বল, সার, ব্যাধি, হিতাহিত, পালন, পরিমাণ, যান (গাড়ী বা সওয়ারের উপযোগী) দাঁত, বয়স, এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন শূর, ব্যূহবিদ্ (ব্যূহ বিষয়ে অভিজ্ঞ) এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অশ্বের অধিপতি করিবে। ১২৯-৩০।

যে পূর্বোক্ত গুণগুলি থাকা ছাড়া ভারবাহী অশ্বের জোড় মিলাইতে সক্ষম, রথের সার-বোধসম্পন্ন এবং রথের গমন, ভ্রমণ ও পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, রথগতি দ্বারা সুলক্ষিত শস্ত্র এবং অস্ত্রের পতন নিবারণে দক্ষ এবং প্রতিপক্ষের অশ্বের আক্রমণ হইতে স্বীয় অশ্বের রক্ষা করিবার কৌশলসম্পন্ন এমন ব্যক্তি রথপ (সারথি) হইবে। ১৩১-২।

শূর ব্যূহবিশারদ, অশ্বের গতিবিদ্, প্রাজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধনিপুণ এইরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে যাদি (অশ্বারোহী) সৈন্য করিবে। ১৩৩।

চক্রিত (circular), রেচিত (দ্রুত লম্ফগতি galloping at full speed), বল্গিত (দূর

লম্ফন long jump), ধৌরিত (লম্ফগতি trotting) আপ্লুত (উল্লম্ফন high jump), তুর (কদমে গতি ও দ্রুত গতি speedy), মন্দ (ধীরগতি slow), কুটিল (প্রতারণাশীল), সর্পণ (বক্র), পরিবর্তন (গতির হ্রাসবৃদ্ধি) এবং আস্কন্দিত (হাঁটাগতি walk) এই একাদশ প্রকার অশ্বের চাল যে বোঝে এবং অশ্বের সামর্থ্য অনুসারে যথারীতি অশ্বকে চাল শিখাইতে পারে (পাঠান্তরে অশ্বের সামর্থ্য অনুসারে ঋতু (season) বিশেষ মত গতিভেদ শিখাইতে পারে) সেই শিক্ষক। ১৩৪-৫।

অশ্বের পরিচর্যায় নিপুণ, জিন ও সাজ পরাইতে অভিজ্ঞ, শক্তিসামর্থ্যযুক্ত, শক্তশরীর ও সাহসিক এইরূপ ব্যক্তিকে সহীস (groom) করিবে। ১৩৬।

নীতিপরায়ণ, শস্ত্র অস্ত্র ব্যূহাদি বিদ্যায় বিশারদ, নীতিবিদ্যাবান্ (হুকুম তামিলকারী, অথবা শত্রুদিগকে দমন করিতে পারে), বালক নয়, মধ্যবয়স্ক (যুবক), বিক্রমশীল, অনুদ্ধত, দৃঢ়াঙ্গ, স্বধর্ম্মনিরত, নিত্যপ্রভুভক্ত এবং রিপুদ্বেষী, এইরূপ ব্যক্তিগণকে রাজা জয়ার্থী হইয়া সেনাধিপ ও সৈনিক করিবেন। ইহারা শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ ও সঙ্কর জাতি হইতে পারে। ১৩৭-৯।

পাঁচ বা ছয়টী পদাতির উপরে একজন প্রভু থাকিবে, তাহার নাম **পত্তিপাল**। ত্রিশজনের অধিপতি **গৌল্মিক**। ১৪০। একশতপদাতিকের উপর একজন **শতানীক**, (captain) তাহার সহকারী (lieutenant) **অনুশতিক সেনানী**, এবং লেখক থাকিবে। ১৪০-১। এক হাজারের উপর একজন **সাহস্রিক** অধ্যক্ষ (general) এবং দশহাজারের উপর একজন **আযুতিক** প্রধান অধ্যক্ষ (commander) হইবে। ১৪১-২।

শতানীক প্রভাতে এবং সায়াহ্নে সৈন্যদিগকে উত্তমরূপ যুদ্ধোপযোগী হইবার জন্য যুদ্ধভূমিকা (রণসজ্জা অথবা রণভূমির বিশেষত্ব) এবং ব্যূহাভ্যাস শিক্ষা দিবে। ১৪৩। **অনুশতিকের**ও ঐকার্য, তিনি শতানীকের সাধক (সহযোগী lieutenant) এবং তিনি যুদ্ধসম্ভার (সরঞ্জম) ও সৈনিকগণের কার্যযোগ্যতা জানিবেন। ১৪৪।

সেনানী সৈনিকদিগকে এবং যামিকের কার্য নির্দেশ করিবেন। **পত্তিপ** যামিক-দিগের পরিবর্তন করিবে। ১৪৫।

গুল্মপ যামিকদিগের সতর্কতা (অর্থাৎ উহারা ঠিক পাহারা দিতেছে কি না) তদ্বিষয়ে জানিবেন। ১৪৬।

লেখক জানিবেন যে কত সৈন্য আছে, ইহার মধ্যে কতগুলি বেতন পাইতেছে কতগুলি প্রাচীন হইয়াছে এবং কে কোথায় গিয়াছে। ১৪৭।

নায়ক বিশটী হস্তীর অথবা বিশটী অশ্বের অধ্যক্ষ হইবে।'

(ক্রমশঃ)

ভক্তের ভগবান

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির সাধক কবি চণ্ডীদাস আপন সাধনলব্ধ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই।'

কবিবর সেক্সপিয়র তাঁহার 'হ্যামলেট' নাটকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এইরূপ মহতী উক্তি করিয়াছেন—'What a piece of work is a man! How noble in reason! How infinite in faculty, in action how like an angel! In apprehension how like a god! The beauty of the world! The paragon of animals'.

শ্রীরবীন্দ্রনাথও গাহিয়াছেন—

'মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্বে মম তোমারি মহিমা।'

এই বৈচিত্র্যময় জগতে মানুষের এই উচ্চাসন লাভ কেবলই শ্রীভগবানের কৃপায় সম্ভব হইয়াছে, কারণ God created man in His own image, in the image of God created he him.

এই বিরাট বিশ্বে মানুষ একটি ক্ষুদ্র প্রাণী তাহার দেহ ক্ষণভঙ্গুর, তাহার আয়ুষ্কাল অল্প, তথাপি সে জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কেন? ইহার উত্তর এই—মানুষ মননশীল বলিয়া, মননশীলতাতে মানুষের বিশেষত্ব। যোগবাশিষ্ট বলেন—

তরবো.হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননে হি জীবতি॥

শ্রীভগবান মানুষকে মন দিয়াছেন এবং মননের ও হিতাহিত বিচারের শক্তি দিয়াছেন, তাই তাহার জীবনধারণ সার্থক হইয়াছে। মানুষের বিদ্যাবত্ত, বুদ্ধিমত্তা, কার্যকুশলতা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলির মূলে মননশীলতা। মানুষ মননশীল বলিয়া, উক্ত গুণরাজি যাহা শ্রীভগবান্ তাহাতে বীজাকারে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, কালে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। মনন সহায়ে মানুষ অশেষবিধ জ্ঞান অর্জন করিয়াছে এবং তাহার ফলে এবং বাহ্য প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারের কত গুপ্তনিধি আবিষ্কার করিয়া সে ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার এই মননক্রিয়া কেবলই

বাহ্য প্রকৃতিতে পর্যবসিত না হইয়া ভগবৎ কৃপায় সাধুসঙ্গফলে যখন অন্তর্মুখী হইয়া মানবাত্মাতে লগ্ন হয় এবং নিত্য অভ্যাসে, সংযমে ও নিষ্ঠায় এই মনন গভীর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ ধ্যানে পরিণত হয়, তখন মানুষ আত্মস্থ দেবতার সংস্পর্শ লাভ করে এবং অবর্ণনীয় আনন্দের অধিকারী হয়। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।" এ আনন্দের উপমা নাই, এ আনন্দের অন্ত নাই, এ আনন্দের বিরাম নাই। সর্বত্র আনন্দ আর আনন্দ, কিবা অন্তরে, হৃদয় গুহাতে ; কিবা বাহিরে—উজ্জ্বল তপনে, বিজন কাননে ; আকাশের নীলিমায়, নির্মল জ্যোৎস্নায় ; জলদের গায়ে, মৃদুল বায়ে ; পাখীর রবে, ফুলের সৌরভে, পল্লবের দলে, তটিনীর জলে কেবল আনন্দ। এ আনন্দময় খণ্ডানন্দ নয়, ভূমানন্দ, কারণ এ বিষয়ানন্দ নয়, ব্রহ্মানন্দ। এ অবস্থায় যে সাধক উপনীত হ'ন তিনি উপলব্ধিতে বলেন—'There is one thing grander than the sea ; that is the sky. There is one thing grander than the sky, that is the human soul'*, যে আনন্দ পুরুষ 'মমাত্মা' হইয়া রহিয়াছেন, সেই 'সর্বভূতাত্মা' হইয়া নিজ মহিমায় সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন ; স্বামী বিবেকানন্দের মত বলেন—

'সকল আমাতে, আমাতে সকল,
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।'

তিনি তখন দিব্য-চক্ষু লাভ করিয়া দেখিতে পান—সেই আনন্দময় পুরুষের আদেশে 'অগ্নি ও সূর্য তাপ দিতেছেন, দিবা রাত্রির এবং রাত্রি দিবার অনুসরণ করে। আলস্য ত্যাগ করিয়া বায়ু সর্বদাই সঞ্চরণ করিতেছে, জল প্রবাহিত হয়, বসুমতী দুর্বহ ভার বহন করিতেছে, মেঘসকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। নদনদী প্রাণীসকলকে তৃপ্ত করিতেছে, তরুলতা ফুলফল ধারণ করে। চন্দ্র পর্যায় ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ছয় ঋতুর পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে, কাল চিরপ্রবহমান, জীবসকল আপন আপন কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। মৃত্যু তাঁহারই আদেশ পালন করিবার জন্য ধাবমান্ হয়।

এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনঃপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে ইহা ভাবিয়া যিনি 'শ্রীজগন্নাথঃ' তিনিই 'মন্নাথঃ' হইয়া 'শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং, মনসো মনঃ, বাচোহবাচং, প্রাণস্য প্রাণঃ, চক্ষুশ্চক্ষুঃ' হইয়া এই দেহমন্দিরে বাস করতঃ আমাকে কৃতার্থ করিতেছেন। তখন তিনি শ্রীজগন্নাথে, শ্রীহৃদয়নাথে একান্ত ভক্তিমান্, স্থিরমতি ও তদ্গতপ্রাণ হ'ন ; ইহার ফলে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা তাঁহাকে আর বশে আনিতে পারে না ; মায়া, মমতা, অভিমান, অহঙ্কার তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে ; রাগদ্বেষে, শত্রুমিত্রে, শীত-উষ্ণে সুখেদুঃখে, শুভাশুভে, স্তুতিনিন্দায়, মানাপমানে তাহার ভেদবুদ্ধি থাকে না ; সর্বভূতব্যাপিনী মৈত্রী, প্রীতি ও দয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করে ; যদি কেহ তাঁহার শত্রু থাকে, তবে তাহার প্রতি তিনি সদাই

* Victor Hugo.

ক্ষমাশীল; সংসারে ঘাত প্রতিঘাতে তিনি সর্বদা অবিচলিত; আত্মদেবের পূজা এবং সাধারণ সাংসারিক কর্ম সমান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করেন; পরনিন্দা, ও আত্মপ্রশংসা বিষবৎ বর্জন করেন; বিবেকবুদ্ধিতে সুদৃঢ়, সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, সতত প্রফুল্ল, ভোগে উদাসীন, কায়মনোবাক্যে সংযমী, সর্বপ্রকার ভয় ও উদ্বেগশূন্য, কর্মে দক্ষ এবং দৃঢ়নিশ্চয়, সর্বকামনা বর্জিত এবং শোকমুক্ত হ'ন। তাঁহার কর্ম, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার যোগ, তাঁহার ভক্তি, তাঁহার যাহা কিছু শ্রীভগবানকে তাঁহার প্রাণারামকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি গদ্‌গদ্ স্বরে বলেন তাঁহার প্রাণারামের উদ্দেশে—

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব,
ত্বমেব ধাতা চ পাতা ত্বমেব.
ত্বমেব সর্বম্ মম দেবদেব।'

ঈদৃশ সাধক এক্ষণে হইলেন নরোত্তম, শুধু নরোত্তম নয়, সাধুত্তম, ভক্তোত্তম। ইঁহার নির্মল চরিত্র শ্রীভগবানের বড় প্রিয়, ইহার চরিত্রমাধুর্যে তিনি সদাই মুগ্ধ, কারণ পবিত্রতায়, সাত্ত্বিকতায় ইহা শ্রীভগবানের সহিত এক। তাই কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

'ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান,
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।'

ভক্ত তাঁহার প্রিয় ইহা তিনি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—"ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ"। শ্রীমদ্ভাগবতে তিনি বলিয়াছেন—"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্"। শুধু ইহাই নয়, তিনি ভক্তাধীন। ভক্তের জন্য তিনি কি না করেন? তিনি বলিয়াছেন—

ভক্তাধীন চিরদিন
আমি এ তিন সংসারে।
ভক্তের দ্বারে আছি বাঁধা,
তা কি জান না, ভক্ত দিলে বাধা,
যত্নে ধারণ করি মস্তক উপরে।
হই ভক্ত অনুরক্ত
চারি বেদে আছে ব্যক্ত
দেখ ভক্তপদ রাখি হৃদয়ে ধ'রে।
আমি ভক্তের রিপু,
নাশিলাম হিরণ্যকশিপু,
প্রহ্লাদে রাখিলাম,
নরসিংহ রূপ ধ'রে ॥*

---

* দাশুরায়ের পদ।

যিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', 'যিনি মহতো মহীয়ান্', যিনি 'মহন্তাং বজ্রমুদ্যতম্' 'সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, যাঁহা হইতে হয়' এমন দেবতা হইয়া পড়েন ভক্তের প্রেম-ভক্তি-ভালবাসার বশ (captive of love)। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্। তবে ইহার রহস্য এই—ভক্তের দিব্য চরিত্র তাঁহাকে আকর্ষণ করে; like attracts like. তিনি আছেন সর্বত্র, সর্বত্র ত প্রকট হ'ন না; কেবল ভক্তের টানে, ভক্তের জন্য সাকার হইয়া দেখা দেন, তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ভক্ত তাই বলিয়াছেন—

"ওগো জেনেছি জেনেছি তারা! তুমি জান ভোজের বাজি,
যে তোমায় যেমনই ভাবে তাতে তুমি হও মা রাজি।"

তিনি ত সচ্চিদানন্দ, তবু ভক্তের দুঃখ তাঁহাকে দুঃখ দেয়, ভক্তের ব্যথা তাঁহাকে ব্যথিত করে, ভক্তের ক্রন্দনে তিনি ক্রন্দন করেন; আবার ভক্তের আনন্দে তিনি আনন্দিত হ'ন। ভক্ত ও শ্রীভগবান্ যেন একসুরে বাঁধা দুটি বেহালা; প্রথমটির তন্ত্র কোন কারণে স্পন্দিত হইলে, দ্বিতীয়টির তন্ত্রও সমভাবে স্পন্দিত হয়। শ্রীভগবান্ সব অনুভব করেন বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে বলিয়াছেন 'সর্বানুভূঃ'। গোপীদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন—

"প্রাণ প্রিয়ে! শুন মোর সত্য বচন।
তোমা সবার কারণে ঝুরো মুঞি রাত্রি দিনে
মোর দুঃখ না জানে কোন জন॥'

ভক্তের দুঃখে তিনি যে কত কাতর তাহা কে বলিবে? ভক্তের দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি অঘটন ঘটন করেন, অসাধ্য সাধন করেন, অসম্ভবকে সম্ভব করেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ক্ষুধিত প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলেন, আর দেবদুর্লভ ঠাকুর প্রহ্লাদকে দেখা দিলেন—

"স্ফটিক স্তম্ভেতে প্রকট নৃহরি
হইয়া তাহার বশ।"

এবং তাহাকে দুঃখমুক্ত করিলেন। বালক ধ্রুব গহন কাননে তৃষিত হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলেন—"কোথা তুমি পদ্মপলাশলোচন হরি! আমায় দেখা দাও"; আর যোগীজনদুর্লভ শ্রীহরি তাহাকে দেখা দিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন—অন্ধ বিল্বমঙ্গল ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিলেন—

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈক বন্ধো!
হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈক সিন্ধো।
হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

আর কি ঠাকুর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি রাখাল বালকবেশে আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে হাতে ধরিয়া বৃন্দাবনধামে লইয়া গেলেন এবং স্বীয় প্রাণ-মনোমোহনরূপ দেখাইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

পাণ্ডবেরা যখন বনবাসী, তখন দুর্বাসা ঋষি ৬০ হাজার শিষ্য সঙ্গে লইয়া পাণ্ডব দিগের কুটিরে অতিথি হইলেন। পাণ্ডবকুটিরে অন্ন নাই, কেমন করিয়া অতিথি সেবা হইবে; অতিথি সেবা না হইলে ঋষির দারুণ কোপাগ্নিতে সকলে পুড়িয়া মরিবেন—এই দুশ্চিন্তায় আকুল হইয়া পাণ্ডব সহধর্মিণী দ্রৌপদী, যিনি সখ্যভাবে শ্রীভগবানকে বাঁধিয়াছিলেন, কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলেন—"দ্বারকানাথ। আজ বড় দুর্দিন, এই দুর্দিনে দেখা দাও, আমাদের রক্ষা কর।" কিছুক্ষণ পরে জগৎপ্রভু তথায় আসিলেন; দ্রৌপদী তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন—"সখে! আসিতে তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? আজ যে আমাদের বড় বিপদ।" প্রভু বলিলেন "তুমি আমাকে আজ দ্বারকানাথ বলিয়া ডাকিয়াছ, তাহাতেই আসিতে বিলম্ব হইল; দ্বারকা এখান হইতে অনেক দূরে। হৃদয়নাথ বলিয়া যদি ডাকিতে, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার দেখা পাইতে।' শ্রীভগবান্ গীতায় যে বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম" তাহারই ইঙ্গিত করিলেন। এক ব্যক্তি এক সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবান্ কেমন?" সাধু উত্তরে বলিয়াছিলেন—"তাঁকে ভাব যেমন"। যাহা হউক, পাণ্ডবসখা দ্রৌপদীর নিকট তাবৎ বিপদের বিষয় অবগত হইয়া কিরূপ অলৌকিক উপায়ে বিপন্ন পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিলেন মহাভারতের পাঠকেরা তাহা জানেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে একটি ভক্তের কাহিনী—যাহা সাধুমুখে শুনিয়াছি—ভক্তটির মনোবাসনা পূর্ণ ও তাহার ভববন্ধন মুক্ত করিবার জন্য জগজ্জননী তাহার কন্যার মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পর্ণকুটিরে প্রকট হইয়াছিলেন। বিবরণটি এইরূপ—

এই বঙ্গভূমির একটি গ্রামে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার পত্নী ও একটি কন্যা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। ব্রাহ্মণ ছিলেন যথার্থ ধর্মানুরাগী; দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি জগজ্জননীর পূজায়, নামজপে ও সদগ্রন্থপাঠে অতিবাহিত করিতেন; যজনযাজন ক্রিয়ায় যাহা পাইতেন তাহাতেই তাঁহাদের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহ হইত। কন্যাটি সুন্দরী ছিল বলিয়া তাহার বিবাহ, বিনা যৌতুকে, একটি ধনবান্ বিপ্রের একমাত্র পুত্রের সহিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় জগজ্জননী কালিকা দেবীর প্রতিমা আনাইয়া আপন বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর পূজা করিয়া ধন্য হইতেন এবং তাঁহার ব্রাহ্মণী ঐ পূজার সব আয়োজন ও ভোগ পাক করিয়া বিশেষ সহায়তা করিতেন। এক বৎসর কালীপূজার দিন প্রাতে ব্রাহ্মণী হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। এতদবস্থায় ব্রাহ্মণ গত্যন্তর না দেখিয়া বৈবাহিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন এবং কন্যাটিকে মাত্র দুইদিনের জন্য তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কুটিরে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধনশালী বৈবাহিক কটূক্তি করিয়া বলিলেন—"তোমার পর্ণকুটিরে পরিচারিকা ও পাচিকার কার্য করিবার জন্য এ বাটীর কুলবধূকে পাঠাইতে পারিব না, তুমি অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া লইও।" এই কঠোর বাক্যে ব্রাহ্মণ অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং বৈবাহিকের বাটী ত্যাগ করিয়া আপন কুটিরে ফিরিবার পথে কাঁদিয়া

কাঁদিয়া মা জগদম্বাকে আপন মনোদুঃখ জানাইয়া বলিলেন—"মা! এ বৎসর তোমার পূজা, ভোগ প্রভৃতি কেমন করিয়া সুসম্পন্ন হইবে? তুমি ভিন্ন আমার আর যে কেহ নাই মা! দুর্গে! কালিকে! দুর্গে! কালিকে! দুর্গে! কালিকে! পাহিমাম্! দুর্গে! কালিকে! দুর্গে! কালিকে! দুর্গে! কালিকে! রক্ষমাম্॥" ভক্তবৎসলার কাছে ভক্তের এই ক্রন্দন পৌঁছিল; তিনি ভক্তের দুঃখ নিবারণের জন্য সন্ধ্যার সময় ঐ ব্রাহ্মণের কন্যার সাজে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণের কুটিরে আসিয়া সেই কন্যার অনুরূপ কণ্ঠস্বরে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা, এই যে আমি এসেছি, তুমি ভাবছ কেন? তোমার পূজার সকল যোগাড় করিয়া দিতেছি, তুমি চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া আসন করিয়া বস। মহামায়া আপন মায়ায় ব্রাহ্মণকে এমন অভিভূত করিলেন যে ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, তাঁহার আপন কন্যাই তাঁহার কুটিরে আসিয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল না। ব্রাহ্মণ তখন সানন্দে জগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিলেন; এদিকে জগজ্জননী কন্যার সাজে আসিয়া প্রথমে পীড়িতা ব্রাহ্মণীর পরিচর্যা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন, তাহার পর পূজার সব আয়োজন করিয়া দিলেন এবং দেবীর ভোগান্ন পাক করিলেন। মায়ের পূজা, আরত্রিক ও ভোগ হইয়া যাইলে পর নিমন্ত্রিত লোকেরা প্রসাদ পাইলেন; প্রসাদ গ্রহণের পর তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন যে, এরূপ তৃপ্তি আর কখনও তাঁহাদের হয় নাই। রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাত হইল; তখন কন্যা বলিলেন "বাবা, তোমার পূজার কার্য সম্পন্ন হইয়াছে; মা! তুমি সুস্থ হইয়াছ; এখন আমি যাইতে পারি?" অতিশয় অনিচ্ছায় ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে সজল নয়নে কন্যাকে "এস মা আমাদের!" বলিয়া বিদায় দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; আর তাঁহাদের পূর্ব চৈতন্য ফিরিল না; সাধনোচিত ধামে প্রস্থানের সময় কেবল তাঁহাদের মুখ হইতে একটিবার বাহির হইয়াছিল—"জয় মা আনন্দময়ী।"

এইরূপে শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের কামনা সফল করেন। তাই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ব সাধুসন্ত সমাজে উক্ত যে শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। শ্রীভগবান্ যে চিরদিনই ভক্তের প্রেমে আবদ্ধ—তাই তিনি ভক্তাধীন, তিনি ভক্তের ভগবান্। মহাত্মা তুলসী দাসের বাণী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"রামসিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা॥"

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১)

প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ, বি. এ.

বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদাদি গ্রন্থ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে অতি উচ্চধরণের ব্যাকরণশাস্ত্র প্রচলিত ছিল। বৈদিকমন্ত্র সকল ব্যাখ্যা করিবার জন্য সর্বদাই ব্যাকরণের আশ্রয় লওয়া হইত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় স্পষ্টই ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায়। "বাগ্‌বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবণ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু।" অর্থাৎ পুরাকালে বেদরূপ বাক্য অখণ্ডাকারে বর্তমান ছিল। তাহার পর দেবতাগণের প্রার্থনায় ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ ও পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। গোপথ ব্রাহ্মণে আমরা ব্যাকরণের পরিভাষা সমূহের একটী বৃহৎ তালিকা দেখিতে পাই। "ওঁকারং পৃচ্ছামঃ, কো ধাতুঃ, কিং প্রতিপদিকম, কিম্ নামাখ্যাতম, কিং লিঙ্গং, কিং বচনং, কা বিভক্তিঃ, কঃ প্রত্যয়ঃ, ক স্বরঃ, উপসর্গো নিপাতঃ, কিং বৈ ব্যাকরণম, কে বিকারঃ, কো বিকারী, কতি মাত্রাঃ, কতি বর্ণাঃ, কত্যক্ষরাঃ, কতি পদাঃ, কঃ সংযোগঃ, কিং স্থানানুপ্রদান কারণম, শিক্ষকাঃ কিমুচ্চারয়ন্তি, কিং ছন্দঃ, কো বর্ণঃ ইতি পূর্ব-প্রশ্নাঃ (গোপথ ব্রাহ্মণ ১৷২৪)। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুবাকে কথিত আছে "ওঁ শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা বলং। সাম সন্তানঃ॥" ইহা হইতে বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটী ব্যাকরণের পরিভাষার কথা পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাচীন কাল হইতেই শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। মন্ত্র সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের প্রয়োগের জন্য নানা শাস্ত্ররচনার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে সেই সকল গ্রন্থ লুপ্ত হইলে 'নিরুক্ত' রচনার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমরা যাস্কপ্রণীত 'নিরুক্তের' মধ্যে ব্যাকরণের মূল আলোচনা ও অনেক প্রচলিত ও অপ্রচলিত বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। শব্দশাস্ত্র যে অনন্ত সে বিষয়ে সমাজ যথেষ্ট সচেতন ছিল। পরবর্তীকালে আমরা যে 'অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং' কথা শুনিতে পাই তাহা অতি প্রাচীন উক্তিরই প্রতিধ্বনি। পাণিনী-ব্যাকরণের মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলিতেছেন 'এবং হি শ্রূয়তে— "বৃহস্পতি ইন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্র প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপরায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্রং অধ্যয়নকালো নান্তং জগাম কিং পুনরদ্যত্বে। যঃ সর্বথা চিরাং জীবতি বর্ষশতং জীবতি। অর্থাৎ বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্যবর্ষ সহস্র শব্দশাস্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি ইহার অন্ত পান নাই। বৃহস্পতি যেখানে

অধ্যাপক ও ইন্দ্র অধ্যেতা সেই স্থলেই শব্দশাস্ত্র শেষ হইল না। আজকালের লোক কি করিবে। তাহারা বড় জোর ১০০ বৎসর বাঁচে। তাহাদের উহা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। প্রকৃতই বেদশাস্ত্র এত বিপুল ছিল, তাহার বিভিন্ন প্রকার আলোচনার জন্য এত গ্রন্থাদি প্রচলিত ছিল যে, স্বতঃই মানুষ উহার দুরাবগাহতা ও বিশালতা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। উহাদের অত্যল্প যাহা বর্তমানকালে প্রচলিত তাহা আয়ত্ত করিতেই একজনের সারা জীবন কাটিয়া যায়। এই কারণে বৈদিক মন্ত্রগুলিকে সহজ উপায়ে বুঝিবার জন্যই পরবর্তীকালে ব্যাকরণশাস্ত্র বা শব্দ-শাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। উত্তর কালে ব্যাকরণ 'বেদাঙ্গ' এই আখ্যালাভ করে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এই ষট্ বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন 'প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণং ॥'

মহর্ষি পাণিনী-রচিত ব্যাকরণের নাম "অষ্টাধ্যায়ী।" এই 'অষ্টাধ্যায়ী' রচিত হইবার পূর্বে প্রত্যেক বেদেরই 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থ বর্তমান ছিল। এখনও কয়েকখানি 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। শৌনিক-রচিত 'ঋক্ প্রাতিশাখ্য', 'তৈত্তিরীয় প্রতিশাখ্য', প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে পদচ্ছেদ, সন্ধিচ্ছেদ, উদাত্তানুদাত্তাদি উচ্চারণ আলোচিত হইয়াছে। ইহাই ব্যাকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত সন্ধি, সমাস প্রভৃতির প্রাথমিক আলোচনার অবস্থা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রতিশাখ্যগুলি স্বীয় বেদের আলোচনায় সীমাবদ্ধ হওয়ায় উত্তরকালে ব্যাকরণশাস্ত্র রচনার প্রয়োজন হইয়াছিল।

মহর্ষি পাণিনীর পূর্বে যে বহু শব্দবিৎ আচার্য বর্তমান ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার রচিত ব্যাকরণ হইতেই জানিতে পারি। অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, কাশ্যপ, কুৎস, গালব, গৌতম, পারাশর্য, ভারদ্বাজ, মণ্ডুক, যাস্ক, বশিষ্ঠ, বৈশম্পায়ন, শাকটায়ন, স্ফোটায়ন প্রভৃতি আচার্যের নাম তিনি অতি শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তীযুগে ইহাদের অনেকেরই গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে।

সায়ণাচার্যের মতে বৈয়াকরণগণের মধ্যে আদি বৈয়াকরণ ইন্দ্র। বোপদেব-রচিত কবিকল্পদ্রুমেও ইন্দ্র নাম পাওয়া যায়।

'ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশালি-শাকটায়ন
পাণিন্যমর জৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ ॥'

বৌদ্ধসাহিত্যে ইন্দ্র-ব্যাকরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে কলাপ-ব্যাকরণ ইন্দ্রব্যাকরণের অংশ বিশেষ। শুনা যায়, তিব্বতীয় ভাষায় চন্দ্রব্যাকরণ এখনও পাওয়া যায়। তবে ইহা নিশ্চিত যে এসকল ব্যাকরণ ভারতবর্ষে বিশেষ সমাদরের সহিত প্রচলিত হয় নাই এবং পাণিনী ব্যাকরণের প্রচলনের পর হইতে উহাদের পঠন পাঠন বন্ধ হইয়া যায়।

মহর্ষি পাণিনী-রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' এক অপূর্ব গ্রন্থ। উহাতে কিছু কম ৪০০০ হাজার সূত্র আছে। সূত্রগুলি অতি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ (যাঁহারা কথায় কথায় ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব অনুভব করিয়া আক্ষেপ করিয়া

থাকেন) সকলে উচ্চৈস্বরে উহার প্রশংসা করিয়াছেন এবং এত প্রাচীনকালে (পাণিনীর রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৫ শতাব্দী বা তৎপূর্ব) এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হন। যাহা হউক, এই পাণিনীর আলোচনার ও বৈদিক গবেষণার ফলে পাশ্চাত্য দেশে philology বা ভাষাতত্ত্ব আলোচনার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সে দেশে বিগত শতাব্দীতে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হইয়াছে ও বর্তমানে হইতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে পাণিনীর পঠন পাঠন একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দু একজন পণ্ডিত বা অধ্যাপক পাণিনীর ব্যাকরণের পক্ষপাতী বটে, কিন্তু সাধারণ হইতে তাঁহারা সেরূপ সহানুভূতি পান না। বঙ্গদেশে পাণিনী ব্যাকরণের আলোচনা ব্যাপকভাবে হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা বারান্তরে উহার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য-আলোচনার চেষ্টা করিব।

---

(২)

ভারতীয় ধর্ম-বিবর্তনে গৌড়-বঙ্গের স্থান ও দান

শ্রীপান্নালাল চক্রবর্তী এম. এ, সাহিত্যভূষণ

হিন্দুস্থানে গৌড়-বঙ্গ চিরদিন-ই অগ্রণী। ভারতেতিহাসের সুবর্ণ যুগ হইতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও দান করিয়াছে অসংখ্য অভিনব প্রচেষ্টা। ধর্মাশ্রয়ী ভারতের ধর্ম-বিবর্তনে গৌড-বঙ্গ কিরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল, এ-প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাহাই।

ভারতের মর্মাশ্রয় করিয়া আছে তা'র ধর্ম। কত শক-হূণ-কুশান-কাণ্ব-গুপ্ত-মৌর্য-পাঠান-মোগল-দিনেমার-পর্তুগীজ আসিল—যাইল। ক্ষণে ক্ষণে তাহার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে এই ধর্ম-সংস্থান বজায় ছিল। মহাপুরুষেরা একান্তে বসিয়া নির্জনে রক্ষা করিয়াছিলেন ভারতের মর্মকেন্দ্র।

বিহারের শৈল-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব যে ধর্মপ্রচার করিলেন, সম্রাট্ অশোক ও হর্ষবর্ধন তাহাকে আশ্রয় দিলেন। নিরীশ্বরবাদী, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, মৌন বৌদ্ধ ধর্ম তাই সর্বস্থানে প্রসারলাভ করিল এবং অচিরকাল মধ্যে গ্রাস করিল হিন্দুধর্মকে। এমন সময়ে

আসিলেন বাংলার বিদ্রোহী হিন্দু নরপতি শুর-সেন-পাল বংশ। হিন্দুধর্ম আবার মাথা নাড়া দিল। কুল্লুক ভট্ট, বাচস্পতি মিশ্র, জয়দেব-কবি হিন্দু-বন্দনা করিলেন। ফলে, হিন্দু ও বৌদ্ধে অনিবার্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এর পর আসিলেন পরম বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য। হিন্দুধর্মের এই গ্লানি—শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, রামীয় প্রভৃতি ইহার এত মত ও পথ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন এ-ধর্ম ধ্বংসোন্মুখী। দৃঢ়হস্তে তাই তিনি বেদান্তের ভাষ্য লিখিলেন—আসমুদ্র হিমাচল ভারতে তিনি বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেন; দেশ হইতে বৌদ্ধধর্মকে বিলুপ্তপ্রায় করিয়া তিনি প্রচার করিলেন—"ঈশ্বর আছেন এবং তিনি এক, তাঁকে দেখা না গেলেও বোঝা যায়—ঠিক বায়ুর মতই।"

তার পরে আসিল মুসলমান। হিন্দুর দেব-মন্দিরে মস্‌জিদের মীনার উঠিল। সেই সমস্ত অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং হিন্দুর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারে প্রয়াসী হইলেন দাক্ষিণাত্যের ছত্রপতি শিবাজী ও যশোহর-ভূষণার মহারাজ প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়। প্রত্যেক ইতিহাস-পাঠক এসব বিষয় জানেন।

ইংরাজ আমলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া সর্ব-ধর্ম-সংরক্ষণ-নীতি-গ্রহণ করায় হিন্দুধর্ম পুনরায় আলোকের পথে আত্মপ্রকাশে সচেতন হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন গ্লানি ত' একেবারে যায় নাই! এই গ্লানির একটু ইতিহাস আছে।

শঙ্করাচার্যের সময় হইতেই কতকগুলি বিতাড়িত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিদ্রোহ-কল্পে ভারতের অসভ্য অনার্যদিগের সহিত জোট্ পাকাইতেছিলেন। পরে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, শিবাজী প্রভৃতি হিন্দুকুলচূড়ামণিগণ যখন অন্যান্য-মত খণ্ডন করিয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবতাগণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন তাহারা সেই সুযোগ গ্রহণ করিল। বিতাড়িত বৌদ্ধ সম্প্রদায় তখন কালী, ধর্ম, শীতলা প্রভৃতি কতকগুলি অনার্য দেব-দেবীর মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম পুনঃ প্রচারে প্রয়াসী হইলেন। উভয় বৌদ্ধ ও অনার্য সম্প্রদায় তখন মিলিতভাবে সশব্দে হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত হিন্দু তখন প্রমাদ গণিয়া তাহাদিগকে আপন দেবতামণ্ডলীর অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর আরম্ভ হইল এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধর্মের অত্যাচার। হিন্দু বলিয়া ইহারা বাহিরে পরিচিত হইল কিন্তু অন্তরে রহিল বৌদ্ধ। হিন্দু ধর্ম বিলোপ-মানসে ইহারা আরম্ভ করিল অশেষবিধ অনাচার ও কদাচার। শক্তি-সাধনার নামে তাহারা মদ্য-মাংস আহার করিত, লোকসমাজে উলঙ্গ থাকিত, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সাজিয়া তাহারা গোপনে নারী-সাহচর্য ভোগ করিত এবং শ্মশানে মশানে আস্তানা গাড়িয়া ভণ্ডামীর দ্বারা দেশের অশিক্ষিত নিম্ন সম্প্রদায় ও মহিলাগণকে স্বীয় মতে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হইত। এ-ঢেউ রাঢ়-বঙ্গেই লাগিয়াছিল বেশী। কয়েকশত বর্ষব্যাপী এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় অবাধে বাংলার বক্ষে বিচরণ করিয়াছিল। ইহাদের সংস্পর্শে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন কলুষিত হইয়াছিল যথেষ্ট। অননুকরণীয় প্রকাশ-ভঙ্গীতে

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর কাহিনী "আনন্দমঠে" গল্পাকারে যে সুষ্ঠু আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, বোধহয় ইহাই তাহার পূর্বাভাষ মাত্র*।

ইহার পর আসিলেন পণ্ডিতকুলচূড়ামণি, স্বর্ণকান্তি, নবদ্বীপচন্দ্র, শচীদুলাল শ্রীচৈতন্য। বাংলার এই ধর্ম-বিপর্যয়ে তিনি আন্তরিক ব্যথিত হইলেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্যবলে তিনি সর্বমত খণ্ডন করিয়া প্রচার করিলেন প্রেমধর্মের বাণী—স্নিগ্ধ বৈষ্ণবধর্ম। তাঁর মত-সাপক্ষে গ্রন্থরচনা ক'রে এবং তাঁকে সঙ্গদান ক'রে তাঁ'র সহায় হ'য়েছিলেন বাসুদেব সার্বভৌম, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, কেশবভারতী, ঈশ্বরপুরী, রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকর্ণপুর, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং আরও কতজন। তাঁ'র পাণ্ডিত্যে অভিভূত হ'য়ে, তাঁ'র রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে, তাঁ'র প্রাণোন্মাদী কীর্তন শ্রবণে মুগ্ধ হ'য়ে, তাঁ'র সেই ভক্তজন-পরিবেষ্টিত-কলেবর সাশ্রুনেত্রে কৃষ্ণ-ভ্রমে তমাল-আলিঙ্গন দর্শনে, এবং সর্বোপরি এই নব-প্রচারিত ধর্মের মাধুর্যে মোহিত হ'য়ে সেদিন ভারতের তিনভাগ লোকই বৈষ্ণব হ'য়েছিল! সেদিন কত জগাই মাধাই উদ্ধার হ'ল, রায় রামানন্দ দাক্ষিণাত্যের প্রধান মন্ত্রীপদ ত্যাগ ক'রে এলেন, দুণ্ডীরামতীর্থ বণিকবেশ পরিত্যাগ ক'রে তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিলেন, যবন হরিদাস বৈষ্ণব হ'ল, মথুরার বারমুখী বেশ্যা শ্রেষ্ঠা বৈষ্ণবী ব'লে পরিগণ্যা হ'ল, লোচনদাস তাঁর চিকিৎসা-ব্যবসা পরিত্যাগ ক'রে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। সেদিন বাংলার সুবর্ণ-যুগ!

কিন্তু বিদ্বেষ-পরায়ণ ঐ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রচারে পরাস্ত হ'লেও এই সব বঙ্গগৌরব সর্বজনমান্য ধর্মগুরুর নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে যথেষ্ট। তা'রা তখন এদেশে **রামাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়** বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদের রচিত তন্ত্র শাস্ত্রে খুব অসংযত আচার-ব্যবহারের কথাই পাওয়া যায়। নারীর সহিত ব্যভিচার তাহাদের কাছে শাক্তের ধর্ম। নিজেদের এই অসংযত আচারের ব্যভিচারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য তাই তাহারা প্রচার করিয়াছে যে, পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাসও নাকি একজন শূদ্রাণী বিধবা রামীর সহিত অবৈধ সংশ্রবে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এ-কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে যে, বৈষ্ণব কুলতিলক, ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য, পণ্ডিতপ্রবর, চিরকুমার চণ্ডীদাস গোপনে শব-সাধনা করিতেন এবং প্রকাশ্যভাবে কাব্যে কৃষ্ণকীর্ত্তনাবলী রচনা করিতেন। কিন্তু বলিয়াছি ত' যে আমাদের ইতিহাস বড় জটিল, সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তাই প্রবচন ও কুৎসাকাহিনীও আজ ইতিহাস বলিয়া চলিয়া যাইতেছে। বর্তমান সত্যানুসন্ধিৎসার যুগে সবাক্ চিত্রে চণ্ডীদাসের এই আরোপিত কাহিনীকে রূপদান করিয়া শিল্পীখ্যাতি অর্জন করিলেও, সুধীজন উহাকে খাঁটী শিল্প হিসাবেই গণ্য করেন—ইতিহাস রূপে মান্য করেন না।

---

* ১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ("হিন্দু বৌদ্ধ যুগ" অধ্যায়)—৺দীনেশচন্দ্র সেন ২। শ্যামল ও কজ্জল—৺দীনেশচন্দ্র সেন ৩। আনন্দমঠ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত) —বঙ্কিমচন্দ্র। ৪। Annals of Rural Bengal—Hunter ৫। Gleig's Memoirs (Warren Hasting's Letters to the Court of Directors). Vol. I

ইহার পর ইংরাজ আমলে আসিলেন স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। বাংলার বিভ্রান্ত জনবৃন্দকে কদাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা লেখনী ধারণ করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র-সর্বস্ব-সার "বেদান্ত" অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যে অপূর্ব বৈদান্তিক ধর্ম প্রচার করিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই 'ব্রাহ্মধর্ম' বলিয়া পরিচিত হইল। বাংলার পূববাসীজন ধর্মের জন্য কত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছে, কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছে, অরণ্যের নির্জনোপান্তে বসিয়া কত সাধনা করিয়াছে, কতশত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছে; ধর্মের উচ্চতম স্তরে যাইবার জন্য তাঁহাদের সেই ব্যাকুল বাসনা কিন্তু ইহাতে তৃপ্ত হইল না।

আধুনিকতম যুগে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ কর্ণধারগণ সর্বধর্মসার সেবাধর্ম ও মানবধর্মের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ধর্মপ্রাণ এই জাতি এখন তটভূমিতে দাঁড়াইয়া ধর্মপ্রবাহের এই তরঙ্গ-লীলার সৌন্দর্যে আত্মনিমজ্জন করিতেছে।

সংক্ষেপে ইহাই হইল বাংলার ধর্মজগতের ইতিহাস। দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতন বা অর্থনৈতিক বিবর্তনের কথা জানিলেই ইতিহাস জানা হয় না। ধর্মের ঘাত-সংঘাত, বিকাশ ও বৃদ্ধি এবং অনুবর্তনের কথাও ইতিহাসের অন্তর্গত—উহার একটা অধ্যায় বা স্তর বিশেষ; সুতরাং ধর্মজগতের এই গতিশীল আবর্তনের কথাকে ইতিহাসের কোঠা হইতে বাদ দিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই বিজ্ঞানের যুগেও আমরা ইতিহাস বলিতে বুঝি কয়েকজন সম্রাট্ ও সমর-নায়কের কথা। অথচ আদিমতম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত চলার পথে মানব আঁকিয়া গিয়াছে অসংখ্য রেখা। যেদিন আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে মানবের এই বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথাকে ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব, সেদিনেরই ইতিহাস হইবে সত্য ইতিহাস—তাহার সর্ব গ্লানি ও কুজ্ঝটিকা দূর হইবে মাত্র সেই দিন।

---

(৩)

পৃথিবীর কয়েকটী সুবৃহৎ ও বিখ্যাত পাঠাগার

শ্রীযুগলকিশোর পাল বি-এল্.

আমার পূর্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমেরিকা গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩০০ শতেরও অধিক এবং তাহাদের পুস্তকসংখ্যা সর্বসমেত সার্ধ পাঁচ কোটীরও অধিক।

কোন ইউরোপীয় দেশ এ বিষয়ে আমেরিকার সমকক্ষ হইতে পারে না। গ্রেটবৃটেন ও ইউরোপীয় দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইবে। নিম্নে কতকগুলি বিখ্যাত পুস্তকাগারের সামান্য পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

প্যারিসের ন্যাশানাল্ লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ৩৭০০০০০। ন্যাশানাল্ লাইব্রেরীর ন্যায় অধিক সংখ্যক পুস্তক পৃথিবীর অন্য কোনও পুস্তকাগারে নাই। বর্তমান সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ফলে এই জগদ্বিখ্যাত পাঠাগারের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে সে বিষয় আমরা অবগত নহি। ইহার পর বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর স্থান, এই লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ২৩০০০০০। আমেরিকার ওয়াসিংটন সহরেব কংগ্রেস লাইব্রেরীব পুস্তকসংখ্যা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সমান। পৃথিবীর আরও কয়েকটী বিখ্যাত পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা দেখানো হইল।

লেলিনগ্রাড্ সাধারণ লাইব্রেরী—২০৪৪০০০
প্রাসিয়ান্ স্টেট্ লাইব্রেরী—১৭৭০০০০
মিউনিক্ সাধারণ লাইব্রেরী—১৪০০০০০
স্ট্রাস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী—১২০০০০০
ম'দ্রিদ্ ন্যাশনাল্ লাইব্রেরী—১১২৫০০০
ভীয়েনা স্টেট্ লাইব্রেরী—১০০০০০০
ভীয়েনা ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরী—১০০০০০০

ইউরোপের বড লাইব্রেরীগুলির সংখ্যা ৩০৯টী, সমস্ত লাইব্রেরীর মোট পুস্তকসংখ্যা—১২ কোটী ৯০ লক্ষ। আমেরিকাব যুক্তবাষ্ট্রে ১১৪টি বড পুস্তকাগার আছে। সমস্তগুলির মোট পুস্তকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ। ইহা ব্যতীত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ২৭টী, এসিয়ায় ৭৩টী, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭টী ও আফ্রিকায় ৩টী বড লাইব্রেরী আছে।

ইউরোপের মধ্যে একমাত্র জার্মানীতে ১৬০টী বড লাইব্রেরী আছে। তাহাদের মোট পুস্তকসংখ্যা ২ কোটী। ইংলণ্ডে ১০১টী বড লাইব্রেরী আছে, তাহাদের পুস্তকসংখ্যা ১ কোটী ৭০ লক্ষ। ইটালীর ৮৫টি বড় লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা ১ কোটী ৫০ লক্ষ।

ইউরোপের লাইব্রেরীর মধ্যে পারিসের ন্যাশনাল্ লাইব্রেরী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ১৩৬৭ খ্রীঃ অব্দে উহা স্থাপিত হয়। ইহার পরে স্থাপিত হয় ভীয়েনার লাইব্রেরী ১৪৪০ খ্রীঃ অব্দে। ইউরোপে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সহিত যে সমস্ত লাইব্রেরী আছে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটী খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থাপিত শুনা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর মধ্যে স্পেনের স্যালমানকা লাইব্রেরী সর্বাপেক্ষা প্রাচীন; ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে উহা স্থাপিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী অপেক্ষা বড়। রোমের প্রাচীন ভ্যাটিক্যান্ লাইব্রেরীর পুস্তকসংখ্যা মাত্র ৫ লক্ষ, কিন্তু প্রাচীনত্বের দিক হইতে এই লাইব্রেরীর স্থান অনেক উচ্চে।

আমাদের কথা

বর্তমান সংখ্যার সঙ্গে শ্রীভারতীর ৪র্থ বর্ষ সমাপ্ত হইল। পূর্বের তিন বৎসরে 'শ্রীভারতী' ইহার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থানুযায়ী ভারতীয় জ্ঞান সম্ভার সাধারণের ও পাঠকবর্গের নিকট কতখানি বিতরণে সক্ষম হইয়াছে তাহার বিবরণী পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের কার্যাবলী আগামী সংখ্যার সহিত দেয় একত্র প্রবন্ধ সূচী হইতে জানিতে পারা যাইবে। আগামী সংখ্যা হইতে প্রবন্ধ নির্বাচনে—যাহাতে জ্ঞান ও কৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় সামঞ্জস্যের সহিত প্রকাশিত হয় তার জন্য অধিকতর চেষ্টা হইবে এবং যাহাতে ইহা ভারতীয় জ্ঞান কৃষ্টির শুধু মুখ্য নহে, পরন্তু একটি আদর্শ পত্রিকায় পরিণত হয় সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইবে। এই কার্যের জন্য আমরা পাঠকবর্গ, গ্রাহকবর্গ ও লেখকবর্গের সহানুভূতি ও তাঁহাদের সুচিন্তিত মন্তব্য আশাকরি।

* * * *

ইতিপূর্বেই জানাইয়াছি যে, বর্তমানে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত করিতে পারা যাইতেছে না, সেজন্য আমরা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি জ্ঞাপন করিতেছি। আগামী ভাদ্রসংখ্যা যথানিয়মে জন্মাষ্টমী দিবসে প্রকাশিত হইবে ও পরবর্তী সংখ্যা যাহাতে প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হয় তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

আমরা লেখকবর্গকেও এই অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করিয়া প্রত্যেক বিষয় এক একটী সংখ্যার মধ্যেই যাহাতে স্ব-সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করেন।

* * * *

কলিকাতা ও নিকটস্থ স্থানসমূহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি (স্কুল-কলেজ) যাহা গত ডিসেম্বর মাস হইতেই প্রায় বন্ধ হইয়াছিল এবং গ্রীষ্মাবকাশের পর অল্প কয়েক দিনের জন্য খোলা হইয়াছিল তাহা আবার বন্ধ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ে ভারতবর্ষের প্রায় একবৎসর সময় নষ্ট হইল কেবল যুদ্ধজনিত আশঙ্কায়। ইংলণ্ড কিংবা চীন দেশে—যেখানে পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ চলিতেছে, সেখানে কি শিক্ষা বা যে কোন গঠনমূলক কর্ম ও অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে? তাহা ত নহেই বরং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজ আরও ব্যাপকভাবে চলিতেছে। কর্তৃপক্ষগণ কি এ বিষয়ে অবহিত হইবেন?

পুস্তক সমালোচনা

ন্যায় প্রবেশ—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তর্কতীর্থ প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১।৵০+১৬৪। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীভারতী গ্রন্থমালার ৮ম গ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট্ বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন (যথা Vedic Series, Linguistic Series, Philosophical Series) তাহাদের মধ্যে ইহা দার্শনিক বিভাগীয় ১ম গ্রন্থ। ভবিষ্যতে এই বিভাগে আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া Institute আশা করেন। ন্যায় প্রবেশের লেখক পণ্ডিত অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও প্রথিতযশা অধ্যাপক। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসাধারণ। তিনি অনেকদিন নবদ্বীপের পাকা টোলের অধ্যাপক ছিলেন ও কয়েক বৎসর সুদূর হোলকার রাজ্যে ইন্দোর সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রের একাধিক গ্রন্থ তাঁহার সম্পাদনায় Calcutta Sanskrit Seriesএ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী হইতে তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের উপর বিশিষ্ট অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা বঙ্গদেশে ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে। যে ন্যায়শাস্ত্র বঙ্গদেশের একান্ত গৌরবের বস্তু তাহার উপযুক্ত অধ্যাপক আর পাওয়া যায় না। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা বঙ্গভাষায় তাঁহাদের প্রতিভার নিদর্শনও কিছু রাখিয়া যা'ন না। এ-হেন সময়ে একজন প্রাচীন পণ্ডিত লিখিত ন্যায়ের গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রকৃতই খুব আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি বাস্তবিকই অতি সুন্দর হইয়াছে। যাহারা প্রাচীন ও নব্যন্যায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এই দর্শনের পরিভাষাগুলি বুঝিতে কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ঐ সকল পরিভাষা অতি সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ৮টী অধ্যায়ে গ্রন্থকার ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সমস্ত পদার্থগুলির বিচার করিয়াছেন ও প্রামাণিক টীকা উল্লেখ করিয়া ও উহাতে স্বীয় প্রাঞ্জল টিপ্পনী সংযোগ করিয়া বিষয়গুলি অতি বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিলে "ন্যায় বিভীষিকা" অনেকটা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে লেখনী সংযত করিতে বাধ্য হইলেও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় যত অধিক প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থের শেষে গ্রন্থ-বর্ণিত শব্দ সমূহের একটী সূচী দেওয়া আছে। ইহাতে reference এর যথেষ্ট সুবিধা হইবে। ফলকথা গ্রন্থকার গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন

তাহা সহজেই বুঝা যায়। গ্রন্থের "ন্যায় প্রবেশ" নাম সার্থক হইয়াছে। আমরা আশা করি সুধীবর্গ ও ছাত্রবর্গের নিকট ইহা উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত এসোসিয়েশন প্রভৃতি বিদ্যায়তনগুলি গ্রন্থখানিকে তাঁহাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্গত করিয়া গ্রন্থকারের শ্রম সফল করিবেন।

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ

Astronomical Ephemeris of Geocentric Places of Planets for 1942.—উজ্জয়িনীর শ্রীজিওজি মানমন্দির হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫২+৭, মূল্য ॥৵০।

আমাদের দেশে পঞ্জিকার প্রচলন বহুকাল হইতেই রহিয়াছে। কিন্তু Ephemeris আকারে গ্রহের স্পষ্টাবস্থান মাত্র সম্বলিত পঞ্জিকার গণনা ও প্রচার অল্পদিন হইল আরম্ভ হইযাছে। এই Ephemeris খানি সাযনমতে গণিত হওযায Raphaelএর বিখ্যাত Ephemerisএর সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রাত্যহিক বিষুবকাল, রবি চন্দ্র হইতে নেপচুন পর্যন্ত গ্রহের সাযন স্ফুট, এবং ৪দিন অন্তর গ্রহদিগের ক্রান্তিও প্রদত্ত হইযাছে। তিথ্যন্তকাল প্রদত্ত হয় নাই বটে, তবে প্রত্যহ চন্দ্র ও রবির ত্রিংশৎজনিত অন্তর দেওযা আছে, তাহা হইতে অল্পায়াসেই তিথ্যন্তকাল কষিয়া বাহির করা যায।

এই Ephemerisএর এক বিশেষত্ব এই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে যে উজ্জযিনী-গত মধ্যরেখা গৃহীত হইযা আসিয়াছে, তাহাই ইহাতে আদি দ্রাঘিমা বা মধ্যরেখা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই নূতন প্রচেষ্টার জন্য ইহার কর্তৃপক্ষীরগণ অবশ্যই প্রশংসার্হ। ইহাতে সময় গণনা ভারতীয় স্ট্যাণ্ডর্ড সময অনুসারে করা হইযাছে, এজন্য সকলের পক্ষেই ইহার ব্যবহার সহজসাধ্য হইয়াছে। এই Ephemeris খানা সাযনমতে গণিত না হইয়া নিরয়ণমতে গণিত হইলে ভারতীয় জ্যোতিষীরা আরও অধিক উপকৃত হইতে পারিত। আশা করি, প্রকাশকগণ পরবর্তী বৎসরে ইহা প্রকাশের সময় এ বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

ভগবান্ বুদ্ধাবতার (হিন্দি)—পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ শাস্ত্রী, বেদ-ব্যাকরণতীর্থ প্রণীত। অখিল ভারতীয় হিন্দু ধর্ম সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক ১০২ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৩৯+৮। বুদ্ধদেবের একটী ব্লক সংবলিত।

ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সামান্যভাবে অনেক তথ্যই লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগের তত্ত্বযুক্ত উপদেশ আছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষার্থীকে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

A Brief History of the Chauhans of Ajmer (1941)—By Panchanana Raya B.A.—Jaipur State Press হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২৪।

গ্রন্থকার Historical Review of Hindu India লিখিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তিকাখানি উপরি উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহাতে গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 'তেজলরাজ' বা 'অচলরাজ' এবং বাংলার বল্লাল সেন একই ব্যক্তি। পুস্তিকার শেষে আজমীরের রাজবংশের একটী বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলার ইতিহাসের পাঠকগণের নিকট পুস্তকখানি বেশ অমোদপ্রদ হইবে।

শ্রীযুগলকিশোর পাল

নূতন গ্রন্থসংবাদ

১। ধর্ম-সাধনা—শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। গীতার জীবনবাদ—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন, কলিকাতা।

৩। বেদস্তুতি—অধ্যাপক শ্রীকুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, মেদিনীপুর।

৪। রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ীপরিকল্পনা—শ্রীসরসীলাল সরকার, কলিকাতা।

৫। ঋগ্বেদ, প্রথম খণ্ড—শ্রীমতিলাল দাস, কলিকাতা।

৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অপ্রকাশিত রচনা 'শ্রীরামপ্রসাদ"—শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

৭। শ্রীপদামৃত মাধুরী, চতুর্থ খণ্ড—শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসী ও অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ রায় বাহাদুর সম্পাদিত।

৮। কবি-প্রণাম—বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত।

সাময়িক সাহিত্য—আষাঢ় ১৩৪৯

দর্শন ও ধর্ম

প্রবাসী—বঙ্গীয় গ্রাম্যশব্দ-কোষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী।

" —বুদ্ধ ও শঙ্কর—শ্রীঅনিলবরণ রায়।

" —বল কাহাকে বলে ?—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

বঙ্গশ্রী—বৈষ্ণবদর্শন ও যুগধর্ম—শ্রীকান্তীন্দুভূষণ চৌধুরী এম-এ, ডিপ্‌-লিব., কাব্যতীর্থ।

উদ্বোধন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকাশ-রহস্য—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

" —অদ্বৈতবাদের ব্যাপ্তি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ।

" —শারীর বিজ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব—স্বামী বাসুদেবানন্দ।

ব্রহ্মবিদ্যা—বোপদেব ও ভাগবতপুরাণ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

" —পুনর্জন্ম-ধারা—শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র।

সাহিত্য

প্রবাসী—সাহিত্যিক—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

" —প্রাচীন ভারতীয় কাব্যের উদ্দেশ্য ও রঘুবংশ—শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা।

ভারতবর্ষ—কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—শ্রীসুরেনাথ মৈত্র।

" —বিদ্যাপতির শ্রীরাধা—শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী।

বঙ্গশ্রী—সেক্সপিয়ার ও বাংলার নাট্যকার—শ্রীমাখনলাল সেন।

" —বঙ্কিম-প্রসঙ্গ—শ্রীউপগুপ্ত শর্মা।

" —জ্ঞানদাস—শ্রীকালিদাস রায়।

বিবিধ

প্রবাসী—মনুষ্যেতর প্রাণীর শিল্পনৈপুণ্য—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য।

" —বাংলা দেশে মূক-বধির শিক্ষা—শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন মজুমদার।

"—নন্দলাল বসু ও ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিক সঙ্কট—শ্রীতারাপ্রসাদ বিশ্বাস।

ভারতবর্ষ—রাষ্ট্র ও নাগরিক—এস্‌-ওয়াজেদ আলি বি-এ (কেণ্টাব) বার-এট্‌-ল।

" —মধু ও মোম—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

" —নারী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, সি-আই-ই।

" —অসতী ও দায়াধিকার—শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল।

বঙ্গশ্রী—বাঙ্গালী-জাতির বর্তমান অবস্থা—শ্রীব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিহাস

প্রবাসী—চিতোর—শ্রীউষাদেবী বি-এ।

পুরাতন পত্রিকা

নবজীবন

১২৯৪ সাল

শ্রীনলিনবিহারী বেদান্ততীর্থ বি. এ. সঙ্কলিত

পৌষ—ইউরোপে দর্শন ও ধর্মপ্রচার—প্রবন্ধ লেখকের মতে বৌদ্ধগণ কর্তৃক ইউরোপে খৃষ্টধর্ম প্রচারিত হইয়াছে। তিনি Roman Catholic Churchএর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে উহার আদি Europeএ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ আচার প্রাচীন খ্রীস্টীয় আচারের সহিত বেশ মিল খায়। পাশ্চাত্য দেশের অনেক পণ্ডিতও তাঁহার এই মত সমর্থন করেন। এই কারণে লেখকের অভিমত এই যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন মৃগদাবে বাস করিতেছিলেন তখন যে ষাটজন শিষ্যকে বিভিন্ন দিকে ধর্মপ্রচারে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেই কেহ Europeএ ধর্মপ্রচার করেন। কালে উহা খৃষ্টধর্মে পরিণত হইয়াছে।

পৌষ—ম্যাক্‌বেথ ও হ্যামলেট—পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা।

মাঘ—পাতঞ্জল যোগদর্শন—যোগদর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। পূর্ব প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

মাঘ—ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট—পৌষের প্রবন্ধের পূর্বানুবৃত্তি।

মাঘ—বৈশেষিক দর্শন—বৈশেষিক দর্শনের কয়েকটী সূত্রের অনুবাদ ও প্রসঙ্গত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীত বৈশেষিক ভাষ্যের সমালোচনা। প্রবন্ধটী সুন্দর।

ফাগুন—বৈশেষিক দর্শন—মাঘের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

চৈত্র—পাতঞ্জল যোগসূত্র—মাঘের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

বৈশাখ—(১২৯৫)—কপালকুণ্ডলা—অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা। কপালকুণ্ডলার প্রেম ও প্রকৃতির সুন্দর বিশ্লেষণ।

বৈশাখ—('৯৫)—পাতঞ্জল যোগসূত্র—চৈত্রের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

জ্যৈষ্ঠ—('৯৫)—পাতঞ্জল যোগসূত্র—বৈশাখের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

আষাঢ়—('৯৫)—পশুপতি—মৃণালিনীর পশুপতি চরিত্রের সমালোচনা।

আষাঢ—('৯৫)—পাতঞ্জল যোগসূত্র—জ্যৈষ্ঠের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

সাময়িক সংবাদ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—আগামী জানুয়ারী মাসে লক্ষ্ণৌ সহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন স্থির হইবে হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার মরিস হ্যালেট কংগ্রেসের উদ্বোধন করিবেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রধান সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

গ্লাসগোতে সার আজিজুল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার সার এম, আজিজুল হক ৩১শে জুলাই ভারতের হাই কমিশনাররূপে গ্লাসগোতে যাইয়া ভারতীয় নাবিক ও অন্যান্য কর্মীদের এক সভায় ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশ। সকল ধর্মের নীতিই এক।

সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ড—সম্প্রতি বিলাতে সার ফ্রান্সিস ইয়ং হাস্‌ব্যাণ্ডের মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশে মুরী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। স্যাণ্ডহার্ষ্টে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ভারতে চাকুরী আরম্ভ করেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অনেক পুস্তক আছে। রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যে নিখিল জগৎ ধর্ম-মহাসম্মেলন হইয়াছিল, তিনি তাহাতেও যোগদান করিয়াছিলেন।

শোক সংবাদ

পরলোকে মহাদেব দেশাই—সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর ভক্তশিষ্য ও অন্তরঙ্গ সহচর মহাদেব দেশাইয়ের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরলোকগমন সংবাদে দেশবাসী মর্ম্মন্তুদ শোকে ম্রিয়মান ও অভিভূত হইয়াছে। তিনি 'হরিজন' ও 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। বাংলা ভাষায়ও তাঁহার জ্ঞান ছিল প্রচুর। দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে মহাপ্রাণ মহাদেব দেশাইয়ের স্মৃতি চির-সমুজ্জ্বল রহিবে।

———০———

षड्‌विधोऽवधिः ॥ १२ ॥

टीका। षडिति। अत्रावधिज्ञानं यत् प्रागुक्तं तत् षट्प्रकार भेदेन भिन्नं भवति। सूत्र षट्संख्याभिनिर्देशाद् अवधिज्ञानस्य षड्‌भेदा भवन्ति। तद्‌यथा आनुगामिकम्, अनानुगामिकम्, वर्द्धमानकम्, हीयमानकम्, अनवस्थितम्, अवस्थितञ्चेति। एतेषां व्याख्यानं "क्षयोपशमनिमित्तः षड्‌विकल्पः शेषाणाम्" इति द्वाविंशतिसूत्रे तद्‌ भाष्येचास्ति। अस्मिन्नपि तदेवोक्तम्। ये च सर्वे क्षयोपशमनिमित्ताद्‌ भवन्ति। भवप्रत्ययोऽवधिज्ञानं यच्च देवानां नारकाणां च स्यादिति। तच्च क्षयोपशमौ विना न भवेदिति। अयं षड्‌भेदः तस्यान्तर्भूतः। अतोऽस्तु तस्मात् पृथग् रूपेण ग्रहणं नस्यात्। अन्यद्‌ वृत्तौ भाष्येचास्ति॥ १२॥

সব্যাখ্যানুবাদ। এই সূত্রে অবধিজ্ঞানকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনুগামী, অননুগামী, বর্দ্ধমান, হীয়মান, অবস্থিত, অনবস্থিত এই ছয় সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই সমুদায়ের কারণ ক্ষয়োপশম জানিবে, ভবপ্রত্যয়-অবধি জ্ঞান নারক ও দেবগণের হইবে। ভবপ্রত্যয় অর্থাৎ ভবহেতুক, ভব নিমিত্তক অর্থ। এই ছয় প্রকার ভেদের মধ্যে ভবপ্রত্যয় ও অন্তর্গত। অতএব সূত্রকার পৃথকরূপে গ্রহণ করেন নাই। সভাষ্য উমাস্বাতিসূত্রের ২২। ২৩ সূত্রেরভাষ্যে বিশেষ যাহা বলা হইয়াছে এই সূত্রে তাহাই কথিত হইয়াছে জানিবে॥ ১২॥

द्विविधोमनः पर्यायः ॥१३॥

टीका। द्विविधः इति। अत्र मनः पर्यायः प्रागुक्तो द्विविधो द्विधा भिन्नः स्यात्। द्विविधेतिकथनान्मनः पर्यायस्य ऋजुमति-विपुलमति भेदेन द्वैविध्यं भवति। पूर्वं अवधिज्ञानमुक्तमेतर्हि मनःपर्याय उच्यते। सभाष्यसूत्रेतु "ऋजु-विमलमतिः मनःपर्यायः" इति वर्तते। ऋजुमतिविमलमत्याख्यं ज्ञानमित्यर्थः। अन्यत् सर्व्वार्थसिद्धौ भाष्येचास्ति ॥१३॥

সব্যাখ্যানুবাদ। মনঃপর্যায় জ্ঞান দুভাগে বিভক্ত, ঋজুমতি ও বিমলমতি। ঋজুমতি মনঃপর্যায় জ্ঞান হইতে বিমলমতি মনঃপর্যায় জ্ঞান বিশুদ্ধতর বা শ্রেষ্ঠ। সভাষ্য সূত্রে এই দুই জ্ঞানের বিষয় স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে ॥১৩॥

अखण्डं केवलम् ॥१४॥

टीका। अखण्डमिति। अत्र यत् केवलज्ञानं तदखण्डमिति। केवलज्ञानस्यतु प्रकारभेदादिकं नास्ति। तथाहि भाष्ये "केवलं परिपूर्णं समग्रमसाधारणं निरपेक्षं विशुद्धं सर्व्वज्ञापकं लोकालोकविषयमनन्तपर्यायमित्यर्थः।" तत्र सूत्रं "सर्व्वद्रव्यपर्य्यायेषु केवलस्य"इति ॥१४॥

সব্যাখ্যানুবাদ। কেবল জ্ঞানের কোনরূপ ভেদ নাই, যেহেতু তাহা অখণ্ড। তাহা কেবল, পরিপূর্ণ, সমগ্র, অসাধারণ, নিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞাপক, অনন্ত ইহা ভাষ্যকারের অভিমত। এইরূপ সভাষ্য ত্রিংশৎসূত্রে "সর্বদ্রব্যপর্যায়েষু কেবলস্য" ইহাতে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে ॥১৪॥

समयं (०)समयमेकत्र चत्वारि ॥१५॥(*)

टीका। समयमिति। कस्मिन् कस्मिन् सयये एकस्मिन् जीवे सकृत् चत्वारि ज्ञानानि भवेयुः। अर्थात् केवलज्ञानं विहाय अन्यानि मति श्रुतावधि मनः पर्य्यायाख्यानि चत्वारि ज्ञानानि भवन्ति। तथाहि कस्मिंश्चिज् जीवे मत्यादिषु एकं ज्ञानं भवति। अन्यस्मिंश्च द्वे ज्ञाने स्याताम्। अन्यस्मिन् जीवे त्रीणि ज्ञानानि भवन्ति। कस्मिंश्चिच्चत्वारि ज्ञानानिसुरिति। अन्यत् सभाष्य "एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः" इति सूत्रे भाष्ये च विस्ताररूपेण वर्णितमस्ति ॥१५॥

इति श्रीमत्प्रभाचन्द्राचार्य्य कृते तत्त्वार्थसूत्रे
श्रीमद् ईश्वरचन्द्र शर्म्मशास्त्रि विरचितायां बालबोधिन्यां टीकायां
प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ (‡)

---

* "সময়ং সময়ঃ" দুইরূপ পাঠ ভেদও দেখা যায়।

† সভাষ্যতত্ত্বার্থাধিগমসূত্র "একাদীনি ভাজ্যানি যুগপদেকস্মিন্নাচতুর্ভ্যঃ।" এই সূত্রের আশয়ের সঙ্গে "সময়ং সময়ং একত্র চত্বারি" এই সূত্রের অভিপ্রায় গত কোন ভেদ দেখা যায় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই সূত্রে পাঠান্তর আছে। যথা—(ক) "একত্র চত্বারি" এইস্থানে "একত্রেক দ্বিত্রিচত্বারি" এইরূপ পাঠ হওয়াই সঙ্গত।

‡ ইতি শ্রীবৃহৎ প্রভাচন্দ্র বিরচিত তত্ত্বার্থসূত্রে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥ আদর্শগ্রন্থে—'বৃহৎ' এইরূপ উল্লেখ থাকাতে প্রথম প্রভাচন্দ্রাচার্য অর্থাৎ তিনজনের মধ্যে যিনি প্রধান ও প্রথম তাহার বিরচিত এইরূপ বোধহয়। অথবা বৃহৎসূত্র অনন্তকাল সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এখনমাত্র ১০৪—৫টী মাত্র সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সভাষ্যতত্ত্বার্থাধিগমসূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ৩৫টী সূত্র। এই গ্রন্থে (এই সন্দর্ভের) সেই ৩৫ সূত্রের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ১৫টী সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

সব্যাখ্যানুবাদ। কেবল জ্ঞান পরিহারপূর্বক শেষ যে মতি, শ্রুত, অবধি, মনঃপর্য্যায় এই চারিটি জ্ঞান এক জীবে বা এক স্থানে এক সময়ে হইতে পারে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে দুই তিন জ্ঞানও একসঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। দুইটি জ্ঞান একযোগে উপস্থিত হয় তো মতিজ্ঞান ও শ্রুতজ্ঞানের হওয়া সম্ভব। তিনটি একসঙ্গে হয়তো মতি, শ্রুত, অবধি জ্ঞানের সম্ভব। অথবা মতি, শ্রুত, মনঃ পর্য্যায় জ্ঞানও হইতে পারে। কিন্তু অন্যের অপেক্ষা শূন্য কেবল জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার সহিত অন্য জ্ঞান থাকিতে পারে না। এই সকল বিষয় "একাদীনিভাজ্যানি" ইত্যাদি সভাষ্য সূত্রে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥১৫॥

ইতি শ্রীমদ্ প্রভাচন্দ্রাচার্য কৃত বৃহৎ তত্ত্বার্থসূত্রে সব্যাখ্যানুবাদে।

প্রথম অধ্যায় ॥১॥

द्वितीयोऽध्यायः

जीवस्य पञ्चभावाः ॥१॥

टीका। जीवस्येति। पूर्व्वं ग्रन्थकृद्भि र्जीवादीनां सप्त संख्याकानां तत्त्वानां उल्लेखः कृतः। सम्प्रति अनेन जीवस्य लक्षणं स्वरूपञ्चोच्यते। तत्त्व-संक्षेपकरणे जीवाजीवौ सप्तसु द्वावेवपदार्थौ भवतः। तत्र जीवपदार्थस्य पञ्चविधा भावा भवन्ति। ते च औपशमिकः क्षायिकः क्षायोपशमिकः औदयिक पारिणामिक-श्चेति पञ्च भावाजीवस्य स्वतत्त्वं भवन्ति। तथा च सभाष्य सूत्रम् "औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च" इति। सूत्र-मिदं जीवस्य पञ्चभावपरिद्योतकम्। तत्र पञ्चानां भावानां नाम्ना कीर्त्तनात्तद्-वृहत्सूत्रमभूत्। अत्र संक्षेपेण सूत्रितम्। परमनयोः सूत्रयोराशय भेदोनास्ति। औपशमिकादयोभावा उत्तरोत्तर सूत्रे तत्र वर्णिताः सन्ति ॥१॥

সব্যাখ্যানুবাদ। জীবের পাঁচ প্রকার ভাব জৈন আগমে প্রসিদ্ধ। সূত্রস্থিত পঞ্চ সংখ্যা দ্বারা শাস্ত্রে উক্ত পাঁচ ভাব এইরূপ, ঔপশমিক ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশমিক, ঔদয়িক, পারি-ণামিক। এই পাঁচটি ভাব জীবতত্ত্বে স্বতঃই বিদ্যমান। সভাষ্য সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে কথিত বিষয় উক্ত জীবের পাঁচ ভাবের পরিপোষক। সেই সূত্রে পাঁচভাবের উল্লেখ থাকাতে তাহা বৃহৎ হইয়াছে। এই সূত্রে সংক্ষেপে বলাতে সূত্র সংক্ষিপ্ত। কিন্তু উভয় সূত্রের অভিপ্রায় একই রূপ। ভাষ্যে ও পরবর্তী সূত্রে পাঁচভাব ব্যাখ্যাত আছে ॥১॥

उपयोगस्तल्लक्षणम् ॥२॥

टीका। उपेति। अत्रोपयोगः लक्षणं जीवस्य भवति। स च उपयोगः द्विविधः। एकः साकारः अपरोऽनाकारश्च। ज्ञानोपयोगः दर्शनोपयोगश्च। अन्यत् तत्र भाष्ये प्रपञ्चितमस्ति। श्रीमदुमास्वाति सूत्रे। तत्रतु "उपयोगोलक्षणम्" इत्युक्तम्। एवं रीत्योभयोरेकार्थ बोधकत्वं वक्तव्यम् ॥२॥